আন্তর্জাতিক সিরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত

জগদ্বিখ্যাত ও বিশুদ্ধ নবিজীবনী

আর রাহিকুল মাখতুম

শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আর রাহিকুল মাখতুম

শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ

বই :	আর-রাহিকুল মাখতুম
লেখক :	শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ
ভাষান্তর :	আবুল হাসানাত কাসিম, রিফাত মাহমুদ, আল-আমিন ফেরদৌস, মুহাম্মাদ ফয়জুর রহমান
সম্পাদনা :	আকরাম হোসাইন, নেসার উদ্দিন রুম্মান, যাহিদ আহমাদ
শারয়ি নিরীক্ষণ :	মুফতি সারোয়ার হুসাইন, মুফতি সালমান মাসরুর, মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম, মাওলানা আসাদুল্লাহ ফুয়াদ
বানান ও ভাষারীতি :	ওমর আলফারুক, মাহবুবুর রহমান, মুজিব হাসান, নাহিদুজ্জামান শাকিল
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টিম

আর রাহিকুল মাখতুম

সমকালীন প্রকাশন

আর-রাহিকুল মাখতুম

শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০২৩

মুদ্রণ ও বাঁধাই

কালারপ্রেস প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.islamiboi.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com

একমাত্র পরিবেশক

লেভেল আপ পাবলিশিং

১১/১, পি কে দাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-96823-9-4

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 850.00 US $15.00 only.

সময়কালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০
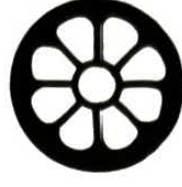
প্রকাশকের কথামালা

সকল প্রশংসা কেবল মহান আল্লাহর জন্য। তিনিই আমাদের একমাত্র মালিক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর সীমাহীন নিয়ামতের সাগরে আমরা ডুবে থাকি সর্বদা। মানবজাতির কল্যাণে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশাল পৃথিবী, অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, গগণচুম্বী পর্বতমালা, রং-বেরঙের ফুলফল, গাছপালা-সহ অসংখ্য মাখলুক। আমাদের প্রতি তাঁর অসীম দয়া ও করুণা কখনো পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন রহমত হিসেবে। তার অনন্য গুণাবলি ও চারিত্রিক মাধুর্য সকল মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি মহান রবের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

আর-রাহিকুল মাখতুম—শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ রচিত এক কালজয়ী গ্রন্থ। বহু ভাষায় অগণিত বার অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও আজ অবধি এ গ্রন্থটির আবেদন এতটুকু কমে যায়নি বরং পাঠকদের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আল্লাহ তাআলার দরবারে জানাই লাখো-কোটি শুকরিয়া। তিনি আমাদের তৌফিক দিয়েছেন বলেই বাংলা ভাষায় আমরা এ বইটি অনুবাদ করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জানাই সমকালীন টিমের সম্মানিত সদস্যদের প্রতি। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অতুলনীয় মেধা ও জ্ঞানের সংস্পর্শ না পেলে কখনোই এটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে সীমাহীন কল্যাণ দান করুন। আমিন।

এবার আসি গ্রন্থটির অনুবাদ প্রসঙ্গে। শুরুতেই বলে রাখা ভালো, আমরা আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, মূল আরবির মতো অনুবাদের ভাষাটাও যেন সহজ-সাবলীল,

ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত থাকে। সকল শ্রেণির পাঠক যেন এই গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হতে পারেন। আমাদের লক্ষ্য প্রতিটি মুসলিম-হৃদয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে উঠুক। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কত কষ্ট তিনি করেছেন! দ্বীনপ্রচারের জন্য কত নির্যাতন-নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি তিনি হয়েছেন! *আর-রাহিকুল মাখতুম* পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকরা যেন নবিজির এই কষ্টটুকু অনুভব করতে পারেন, দিলের ভেতর আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারেন—এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে সার্বিকভাবে সুন্দর ও প্রাঞ্জল করে তুলতে আমাদের চেষ্টার কোনো খামতি ছিল না। লেখার মান ও উৎকর্ষের ব্যাপারে আমরা সবসময় সতর্ক ছিলাম। প্রতিটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম থেকে শুরু কবিতার পেছনেও আমরা দিনের পর দিন শ্রম দিয়েছি। যুক্ত করেছি প্রয়োজনীয় টীকা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তথ্যসূত্র। ব্যক্তি, স্থান ও স্থাপনার বিশুদ্ধ নাম তুলে ধরার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আকরগ্রন্থগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ ঝরঝরে ও মেদহীন করতে গিয়ে মূল আরবি থেকে সরে যাইনি আমরা। বরং লেখকের ভাব ও ভাষার পুরোটা তুলে আনার চেষ্টা করে গিয়েছি। প্রতিটি ঘটনার বিবরণ ও বিস্তারণে লেখক তার জাদুময় ভাষায় সময় ও কাহিনির যে ঘোরলাগা পরম্পরা দেখিয়েছেন, তার সবটাই বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেছি অত্যন্ত সচেতনভাবে। তবু দিন শেষে আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ। তাই লেখার ভেতর ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে, এই বইটি পড়তে গিয়ে যদি কোনো ভুল কিংবা অসংগতি চোখে পড়ে, তবে মেহেরবানি করে সমকালীন প্রকাশন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। নিশ্চয়ই ভুলত্রুটি মানুষের পক্ষ থেকে এবং কল্যাণকর সবকিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন। কাল হাশরের ময়দানে এ কাজের উসিলায় আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।
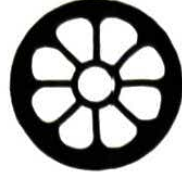
লেখকের কথামালা

১৩৯৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে রাবিতাতুল আলামিল ইসলামির ব্যবস্থাপনায় পাকিস্তানে একটি সিরাত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকগণ ওই সম্মেলনে সিরাতুন-নবি বিষয়ে আন্তর্জাতিক একটি রচনা প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেন। সেখানে বলা হয়, যেকোনো ভাষার মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। এই ঘোষণা লেখক ও সিরাত-প্রেমিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

আমার কাছেও এটি বেশ প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে মনে হয়। কারণ এ ধরনের আয়োজন দেশিবিদেশি লেখকদের মাঝে চিন্তার সেতুবন্ধন তৈরি করে দেয়। তারা তাদের নানামাত্রিক চিন্তা-গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। এতে পাঠকের জ্ঞানসত্তা পরিতৃপ্ত হয়। আর প্রতিযোগিতার বিষয় যদি হয় সিরাতুন-নবি, তাহলে তো কথাই নেই। কারণ সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, সিরাতুন-নবি হচ্ছে মুসলিম সভ্যতার মূল ভিত্তি। এর ওপরই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামি সমাজব্যবস্থা।

এ আমার পরম সৌভাগ্য, আমি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পেরেছি। তবে লিখতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে, সাইয়িদুল মুরসালিন ও খাতামুন নাবিইয়িনের জীবনী লেখার যোগ্যতা আমার নেই। তারপরও এই দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় নেমেছি কেবল একটি কারণেই—নিজের ভেতরকার অন্ধগলিতে আবদ্ধ থাকার চেয়ে নবিজীবনের আলোকিত রাজপথে বিচরণ করা আমার জন্য বেশি নিরাপদ এবং সৌভাগ্যের বিষয়। আমি যদি এই অভিযাত্রায় শেষ পর্যন্ত টিকে যাই, তবে নবিজি ভীষণ খুশি হবেন। আর যদি মাঝপথে ঝরে পড়ি, তবু আফসোস নেই। আমি আশা রাখি, হাশরের ময়দানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য সুপারিশ করবেন। হতে পারে তার প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

এবার আসি রচনাশৈলী প্রসঙ্গে। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমি রাবিতাতুল আলামিল ইসলামির শর্তাবলি যথাসম্ভব মেনে চলেছি। প্রতিটি বিষয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আমার বিশ্বাস, কোনো আলোচনাই পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বা বিরক্তিকর বলে মনে হবে না। যেসকল উৎসগ্রন্থে একই বিষয়ের একাধিক বর্ণনা রয়েছে, আমি সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছি। যেখানে সম্ভব হয়নি, সেখানে নিজে চিন্তা-গবেষণা করে মত দিয়েছি। তবে দলিল-পর্যালোচনায় যাইনি। কারণ এতে কেবল বইয়ের কলেবরই বৃদ্ধি পাবে।

বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণভাবে পূর্ববর্তী আলিমদের মত, পথ ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছি। নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত দিইনি। অবশ্য সেই সময়টুকুও আমার ছিল না। তবে হ্যাঁ, যেসব বর্ণনা পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে অথবা যেখানে আমার মনে হয়েছে, আগের ও পরের ঐতিহাসিকগণ একটি ভুল অভিমত আঁকড়ে ধরে আছেন, সেখানেই কেবল আমি সংক্ষেপে দলিলের দিকে ইঙ্গিত করেছি এবং অগ্রগণ্য মতটি উপস্থাপন করেছি। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

হে আল্লাহ, দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য কল্যাণের ফয়সালা করুন। আপনি ক্ষমাশীল। দয়াময়। মহান আরশের অধিপতি।

সফিউর রহমান মুবারকপুরি

বেনারস, ভারত

সূচিপত্র

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন গোত্র

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই সর্বশেষ নবি ও রাসুল। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্য এই দুনিয়ার বুকে তার আগমন ঘটেছে। নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে তিনি পবিত্র কুরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন। মূর্তিপূজায় লিপ্ত এক মূর্খ জাতিকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসারে তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন প্রতিটি সাহাবির জীবন। রিসালাতের যে সুমহান বাণী নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চারপাশের মানুষদের কাছে প্রচার করেছিলেন, তা আমাদের সামনে হাজির হয়েছে সিরাতুন-নবি (নবিজির জীবনী) আকারে।

সিরাতুন-নবির পূর্ণাঙ্গ চিত্র কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে হলে তৎকালীন আরবের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সেসবের পরিবর্তনে নবিজির অপরিসীম ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা একান্ত জরুরি। এ কারণে আমরা শুরুতেই ইসলামপূর্ব আরবের ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাপনের নানা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। তুলে ধরব নবিজির আগমনকালে আরবের সার্বিক পরিস্থিতি।

আরব ভূখণ্ডের আয়তন ও অবস্থান

আরব—সে তো এক বিশাল মরুভূমি! যত দূর চোখ যায় কেবল বালু আর বালু! দিগন্তবিস্তৃত সেই মরুর বুকে শত শত মাইল বিচরণ করেও দেখা মেলে না এক ফোঁটা সুমিষ্ট জল। নেই কোনো গাছপালা, আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, সবুজ অরণ্য কিংবা ছায়া সুনিবিড় গ্রাম। আরব মানেই যেন ভিন্ন এক দৃশ্যপট। তবে প্রাচীনকাল থেকেই 'আরব' বলতে আরব উপদ্বীপ এবং সেখানকার স্থানীয়দের বোঝানো হয়।

আরব দেশের পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর আর সিনাই উপদ্বীপ। পূর্ব দিকে দেখা মেলে আরব উপসাগর এবং দক্ষিণ ইরাকের কিছু অংশ। ওদিকে আরবের দক্ষিণ দিকটা পরম মমতায় আগলে রেখেছে আরব সাগর—যার বিস্তৃতি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত। বাকি রইল উত্তর দিক। এখানে রয়েছে বৃহত্তর সিরিয়া এবং ইরাকের সামান্য অংশ। কিছু অমীমাংসিত সীমানাও দেখা যায় এখানে-ওখানে। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে আরবের মূল ভূখণ্ড। এর আয়তন প্রায় ১০ থেকে ১৩ লাখ বর্গমাইল।

ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরব অঞ্চল বেশ গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ কাঠামো বিবেচনা করলে, পুরো এলাকাটি চারদিক থেকে নির্জন মরুভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে তৎকালীন আরব ছিল প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত একটি অঞ্চল। বহিরাগত সব ধরনের আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ কারণে প্রাচীনকাল থেকেই আরবজাতিকে সব রকম স্বাধীনতা ভোগ করতে দেখা যায়। অথচ তাদের প্রতিবেশী তখন মহাক্ষমতাশালী দুই বিশাল সাম্রাজ্য! প্রাকৃতিক এই সুরক্ষাবলয় না থাকলে বহু আগেই শত্রুদের আক্রমণে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত আরবজাতির নাম।

বহির্বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকে প্রসিদ্ধ মহাদেশগুলোর ঠিক মধ্যভাগে আরবের অবস্থান। কী জল, কী স্থল—উভয় পথে যোগাযোগব্যবস্থার এক চমৎকার মোহনা এই আরব ভূমি! আর এটা কেনই বা হবে না? আরবের উত্তর-পশ্চিম ভাগ আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশদ্বার। ওদিকে আবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ইউরোপে যাওয়ার এক সহজ সমাধান। আর পূর্ব দিকটা ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকটপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এ কারণে সুদূর হিন্দুস্তান ও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ করাটাও তুলনামূলক সহজ। তাছাড়া জলপথে আরবের সাথে সকল মহাদেশের রয়েছে দারুণ এক যোগাযোগব্যবস্থা। তাই সেসব অঞ্চলের জাহাজ অনায়াসে আরব সমুদ্রবন্দরে নোঙর করতে পারে! এমন অফুরন্ত ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধার ফলেই আরবের উত্তর ও দক্ষিণ দিকটা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিলনমেলায় পরিণত হয়। আর তাই বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিল্পশাস্ত্রীয় সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে এই আরব ভূখণ্ড।

আরবের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী

ঐতিহাসিকদের মতে, বংশপরিক্রমা অনুসারে সমগ্র আরবজাতি প্রধানত ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. আল-আরাবুল বাইদা, প্রাচীন আরবজাতি। ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে তাদের ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। যেমন : আদ, সামুদ, তাসাম, জাদিস, ইমলাক ইত্যাদি।

২. আল-আরাবুল আরিবা, ইয়ারাব ইবনু ইয়াশজাব ইবনি কাহতানের উত্তরসূরি। এদের

কাহতানি আরব নামেও ডাকা হয়।

৩. আল-আরাবুল মুস্তারিবা, ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর। এদের বলা হয় আদনানি আরব।

আল-আরাবুল আরিবা বা কাহতানের উত্তরসূরিরা প্রথমে ইয়েমেনে আবাস গড়ে তোলে। এরপর কালের পরিক্রমায় তারা বিভক্ত হয়ে যায় বিভিন্ন গোত্রে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে ২টি গোত্র—

১. হিমিয়ার, হিমিয়ারিরাও একাধিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—যাইদুল জামহুর, কুজাআ ও সাকাসিক।

২. কাহলান, কাহলানিদের প্রসিদ্ধ গোষ্ঠীগুলো হলো—হামদান, আনমার, তাঈ, মাজহিজ, কিনদা, লাখম, জুজাম, আযদ, আউস, খাযরাজ এবং জাফনার উত্তরসূরি বা শামের রাজন্যবর্গ। পরে এরা গাসসানি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

কাহলান গোষ্ঠীর লোকেরা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে জাযিরাতুল আরবে আসে। ক্রমশ তারা ছড়িয়ে পড়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে। কুরআনে উল্লেখিত[১] 'সাইলুল আরিম' অর্থাৎ প্রবল বন্যা সংগঠিত হওয়ার প্রাক্কালে ইয়েমেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক ধস নামে। কাহলানিদের অধিকাংশ হিজরতের ঘটনা ঠিক তখনই ঘটে। উল্লেখ্য, সে সময় রোমকরা প্রথমে মিশর ও সিরিয়ায় আগ্রাসন চালায় এবং পরবর্তীকালে কুনজর দেয় ইয়েমেনের দিকে। এরপর তাদের জল-স্থলের সকল বাণিজ্যিক রুট দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এমনও হতে পারে, কাহলান ও হিমিয়ার গোত্রদ্বয়ের বিরোধের কারণে কাহলানিরা দেশ ছেড়েছিল। কেননা কাহলানিরা ইয়েমেন ত্যাগের পরও হিমিয়ার গোত্রের লোকেরা সেখানে ছিল। হিমিয়ারিদের সেখানে টিকে থাকা এমন ইঙ্গিতই বহন করে।

কাহলান গোত্রের মুহাজিরদের আবার ৪টি দলে ভাগ করা যায়—

১. আযদ, আযদিরা তাদের গোত্রপতি ও গুরুজন ইমরান ইবনু আমর মুযাইকিয়ার সিদ্ধান্তে হিজরত করে। প্রথমে তারা ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং বসবাসের উপযোগী ভূমির সন্ধানে দিগ্‌বিদিক দূত পাঠায়। এরপর দূত মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রসর হয় উত্তর দিকে। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেফিরে অবশেষে যে-সকল এলাকায় তারা বসতি স্থাপন করে, তার বর্ণনা নিম্নরূপ—

আযদ গোত্রের সালাবা ইবনু আমর প্রথমে হিজায সফর করেন। সেখানে তিনি অবস্থান

---

[১] সূরা সাবা, আয়াত : ১৫-১৯

নেন সালাবিয়া ও জি-কারের মাঝামাঝি স্থানে। পরবর্তী সময়ে তার বংশ বৃদ্ধি পেলে তিনি মদিনায় চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সালাবার উল্লেখযোগ্য উত্তরসূরি হারিসা ইবনু সালাবার দুই সন্তান—আউস ও খাযরাজ।

তাদের আরেক দল হারিসা ইবনু আমর বা খুযাআ সদলবলে হিজাযের বিভিন্ন প্রান্তে দৌড়ঝাঁপ শেষে মাররুজ জাহরান[১] নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এরপর তার লোকেরা হারাম এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং মক্কার আদিবাসী জুরহুম সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করে সেখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলে।

ইমরান ইবনু আমর চলে যায় ওমানে। সে তার সন্তানসন্ততি নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে। তাদেরকে বলা হয় আযদু ওমান। নাসর ইবনু আযদের অনুসারী গোষ্ঠীগুলো তিহামায় অবস্থান নেয়। তাদেরকে বলা হয় আযদু শানুয়া।

জাফনা ইবনু আমর গমন করে সিরিয়ায়। সেও তার পরিবার নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করে। সে গাসসানি রাজবংশের প্রথম পুরুষ। সিরিয়া গমনের প্রাক্কালে হিজাযে তারা গাসসান নামক একটি জলাশয়ের পাশে অবস্থান করে। এরপর তাদের নাম হয়ে যায় গাসসানি।

২. লাখম ও জুযাম, লাখমিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নাসর ইবনু রবিআ। সে ছিল হিরায় রাজত্বকারী মুনজির রাজবংশের প্রথম পুরুষ।

৩. বনু তাঈ, আযদ গোত্র চলে যাওয়ায় তাঈবাসী উত্তরাঞ্চলে সফর শুরু করে। সেখানে তারা অবতরণ করে আজা ও সালমা নামক দুটি পাহাড়ে। তাদের অবস্থানের কারণে পাহাড়দুটি একপর্যায়ে তাঈ পাহাড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪. কিনদা, কিনদাবাসী বাহরাইনে অবতরণ করে। সেখানকার পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় বাধ্য হয়ে তাদেরকে যেতে হয় হাজারামাউতে। কিন্তু সেখানেও তারা একই বিপদের সম্মুখীন হয়। তারপর তারা চলে যায় নাজদে। সেখানে গড়ে তোলে প্রভাবশালী এক সাম্রাজ্য। কিন্তু কিছুদিন যেতে না-যেতেই পতন ঘটে সেই সাম্রাজ্যের। বিলীন হয়ে যায় কালের গহ্বরে।

কুজাআ নামে হিমিয়ার গোত্রের একটি শাখা ছিল, এমন শোনা যায়। তথ্যটি একেবারে নিরেট নয়। এই কুজাআবাসী ইয়েমেন থেকে হিজরত করে ইরাকের উচ্চভূমি বাদিয়াতু সামাওয়াতে বসতি স্থাপন করে। এছাড়াও হিমিয়ারের আরও কিছু শাখা চলে যায় সিরিয়া ও হিজায থেকে উত্তর-দক্ষিণ দিকে।[২]

---

[১] বর্তমান নাম ওয়াদিয়ে ফাতিমা। মক্কার উত্তরে অবস্থিত একটি উপত্যকা। ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই গ্রাম।

[২] এ সকল গোত্র ও তাদের হিজরত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—*মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১-১৩; *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০-২৩৫। ঐতিহাসিক

আল-আরাবুল মুস্তারিবা

আল-আরাবুল মুস্তারিবা সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইরাকি। কুফার অদূরে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 'উর' নামক এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবার, শহর এবং সেখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উঠে এসেছে।[১]

আমরা জানি, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে হাররানে হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে চলে যান ফিলিস্তিনে। ফিলিস্তিন ছিল তার দাওয়াতি কার্যক্রমের মূলকেন্দ্র। এরপর সফর করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে।[২] সফরের ধারাবাহিকতায় একবার পৌঁছেন মিশরে। মিশরের শাসক ফিরাউন[৩] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারাকে বন্দি করে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের হাত অকেজো করে সারাকে রক্ষা করেন। এতে ফিরাউন তার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে এবং এও বুঝতে পারে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার খুবই কাছের একজন বান্দা। শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফিরাউন তাই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হাতে উপহার হিসেবে হাজেরাকে তুলে দেয়।[৪] সারা নিজ

উৎসগ্রন্থগুলোতে এ সকল হিজরতের সময় ও কারণ নিয়ে বেশ মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পর আমাদের কাছে যেটি অগ্রগণ্য মনে হয়েছে, সেটিই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

[১] *তাফহিমুল কুরআন*, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫৩-৫৫৬

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৮

[৩]প্রাচীন মিশরীয় শাসককে 'ফিরাউন' বলা হতো। এটি ছিল একটি উপাধি। যেমন পারস্যসম্রাটকে কিসরা এবং রোমসম্রাটকে কাইসার বলা হতো। তাই ফিরাউন নির্দিষ্ট কারও নাম নয়। ঠিক কবে থেকে মিশরের শাসকগণ এ উপাধি গ্রহণ করেছে, এর সঠিক কোনো তথ্য নেই। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার সময়ে ব্যাপ্তি ৪ হাজার ৮০০ বছর। আর ঐতিহাসিকদের মতে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউনের নাম 'তুতিস'। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউনের নাম 'নাহরাউয়িশ'। 'দ্বিতীয় রামাসিস' হলো মুসা আলাইহিস সালামের সময়কার ফিরাউন। তাই এ কথা বলা যায়, আজ থেকে থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার বছর পূর্বেও মিশরের বাদশাহকে ফিরাউন বলা হতো। আল্লাহই ভালো জানেন। [*কানযুদ্দুরার ওয়া জামিউল গুরার*, আবু বকর দাওয়ারদি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৬, ১৯৭; ইসাল বাবি আল-হালবি]

[৪] কথিত আছে, হাজেরা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন একজন দাসী। কাজি সুলাইমান মানসুরপুরি দাবি করেছেন, 'হাজেরা ছিলেন স্বাধীন নারী এবং ফিরাউনের কন্যা।' বদরুদ্দিন আইনি বলেন, মুকাতিল বলেছেন, 'হাজেরা হুদ আলাইহিস সালামের বংশধর।' আর যাহহাক বলেছেন, 'হাজেরা ফিরাউনের কন্যা।' তবে সারা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যে ফিরাউন আটক করেছিল, হাজেরা তার মেয়ে নয়। এই ফিরাউন হাজেরার বাবাকে হত্যা করে তার সিংহাসন দখল করে এবং হাজেরাকে দাসী বানায়। আল্লাহ তাআলা সারার মতো তাকেও হিফাজত করেন। মূলত হাজেরার বেলায়ও সারার মতো ঘটনা ঘটেছিল। কোনো এক অদৃশ্য

উদ্যোগে ইবরাহিমের সঙ্গে হাজেরার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।[১]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে ফিরে এলে হাজেরার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। এতে সারা খানিকটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে হাজেরাকে শিশুপুত্র ইসমাইল-সহ দেশান্তরিত হতে বাধ্য করেন তিনি।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের নিয়ে হিজাযে চলে যান। সেখানে (বর্তমান বাইতুল্লাহর পাশে) এক বিরান উপত্যকায় তারা অবস্থান করেন। বাইতুল্লাহ তখন ছিল ছোট্ট একটি বালুর টিলা! পাহাড়ি ঢল এই টিলার পাশ ঘেঁষে চারদিকে প্রবাহিত হতো। বর্তমান মাসজিদুল হারামের পাশে, উঁচু স্থানে—যেখানে যমযম কূপ, সেখানেই তাদের জিনিসপত্র রাখা হয়।

মক্কা তখনো বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। চারদিকে কেবল ধু-ধু মরুভূমি। এমন জনমানবশূন্য ও শুষ্ক বালিয়াড়িতে মা-ছেলের খোরাক হিসেবে দেওয়া হয় কেবল এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি! জীবন ধারণের এই সামান্য সম্বলটুকু হাজেরার হাতে দিয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফের ফিলিস্তিনের পথ ধরেন। এদিকে কয়েকদিন যেতে না-যেতেই ফুরিয়ে যায় খাদ্যপানীয়! কিন্তু সবই তো ঘটছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়! তাঁর অনুগ্রহে মরুভূমির বুকে উৎসারিত হয় রহমতের জলধারা—যমযম কূপ! এই কূপ দীর্ঘ সময় ধরে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন এবং জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত ঘটনা তো আমাদের সকলেরই জানা![৩]

মা-ছেলের জীবন কেটে যাচ্ছিল বেশ। এরই মধ্যে একদিন তাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়

শক্তি তাকে সবসময় হিফাজত করত। তাদের দুজনার মাঝে এমন মিল দেখে ফিরাউন উপঢৌকন হিসেবে হাজেরাকে সারার হাতে তুলে দেয়। [*উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৬৯]

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪; আরও বিস্তারিত দেখুন, *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৫৮, ৩৩৬৪

[২] শিশুপুত্র ইসমাইল ও হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন কেবল সারার বাধ্যবাধকতার জন্যই হয়েছিল, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহর হুকুমে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাদের মক্কায় রেখে আসেন। তবে হাজেরা ও তার সন্তানকে সারা সহ্য করতে পারছিলেন না, এ বিষয়টি ইমাম বুখারির বর্ণনায় স্পষ্ট বোঝা যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, 'যখন কিছু খেজুর ও পানি দিয়ে ইবরাহিম ফিরে যাচ্ছিলেন, ইসমাইলের মা হাজেরা তার পিছু অনুসরণ করেন। জিজ্ঞাসা করেন 'আমাদের নির্জন প্রান্তরে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' বারবার জিজ্ঞাসা করার পরেও কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখানে রেখে যাওয়ার হুকুম কি আল্লাহ দিয়েছেন?' ইবরাহিম বলেন, 'হ্যাঁ।' তখন হাজেরা ফিরে আসেন এবং বলেন, 'তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না।' [*সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪]

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

ইয়েমেনের দ্বিতীয় জুরহুম[১] গোত্রের কিছু ব্যক্তি। হাজেরার অনুমতি নিয়ে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে। বলা হয়, এর আগে তারা মক্কার আশেপাশে বিভিন্ন উপত্যকায় অবস্থান করছিল। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম এবং তার যৌবনে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী কোনো একসময়ে মক্কায় আসেন; যদিও এর আগে এই উপত্যকা দিয়ে তাদের যাওয়া-আসা ছিল।[২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মাঝে মাঝে তাদের দেখতে আসতেন। কিন্তু তার এই সাক্ষাৎ-সফরের পরিমাণ নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে কমপক্ষে ৪ বারের কথা জানা যায়।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে স্বপ্নযোগে ইসমাইলকে জবাই করার আদেশ দেন। আর আদেশ পাওয়ামাত্রই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তা পালনে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ঘটনাটি কুরআনুল কারিমে এসেছে এভাবে—

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

তারা উভয়ে যখন (স্বপ্নাদেশের প্রতি) আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তার পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহিম, তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মশীলদের। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।' পরে আমি তাকে মুক্ত করি এক মহান পশুর (কুরবানির) বিনিময়ে।[৩]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর প্রথম পুস্তক *The book of Genesis*-এ বলা হয়েছে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামের

---

[১] বদরুদ্দিন আইনি বলেন, 'জুরহুম নামে দুটি গোত্র ছিল। প্রথম জুরহুম ছিল আদ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারাই মূলত আরবের প্রাচীন অধিবাসী। দ্বিতীয় জুরহুম গোত্র শুরু হয়েছে জুরহুম ইবনু কাহতান থেকে। ইয়ারাব ইবনু কাহতান তার ভাই। জুরহুম ইবনু কাহতান হিজাযে এসে মক্কায় বসতি স্থাপন করে এবং এখানেই তার বংশবিস্তার হয়; আর ইয়ারাব থেকে যায় ইয়েমেনে।' ইসমাইল আলাইহিস সালাম এই দ্বিতীয় জুরহুম গোত্রে বিবাহ করেন এবং তাদের থেকে আরবি ভাষা শেখেন। [*উমদাতুল কারি শারহু সহিহিল বুখারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২১১]

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

[৩] সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০৩-১০৭

চেয়ে বয়সে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। উল্লেখিত ঘটনার পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়, ঘটনাটি ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বেই ঘটেছে। কারণ ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ এসেছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণের পরে।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, পুত্র ইসমাইল যৌবনে পদার্পণের পূর্বে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কমপক্ষে ১ বার মক্কা সফর করেছেন। বাকি ৩ বার সফরের বিবরণ এসেছে *সহিহুল বুখারিতে*।[১] ইমাম বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের সূত্রে নবিজি থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, যার সারাংশ—

'জুরহুম গোত্রের সাথে ইসমাইল আলাইহিস সালামের ওঠাবসা ছিল। সেই সুবাদে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তিনি তাদের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখে নেন্নন। তার এই প্রতিভা দেখে তারা ভীষণ মুগ্ধ হয়, আকৃষ্ট হয় তার প্রতি। এমনকি তাদের এক কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়েও দেয়। বিয়ের পর তার মমতাময়ী মা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ওদিকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী-সন্তানের খোঁজ নিতে মক্কার পথ ধরেন। তার এই সফর ছিল ইসমাইলের বিয়ে-পরবর্তী সময়ে। বাড়িতে এসে তিনি পুত্র ইসমাইলকে না পেয়ে পুত্রবধূর কাছে তার সন্ধান করেন এবং তাদের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে চান। জবাবে পুত্রবধূ নানারকম অভিযোগ করেন, অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, 'তোমার স্বামী এলে তাকে আমার সালাম দেবে আর বলবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।' ইসমাইল আলাইহিস সালাম ঘরে ফেরার পর কিছু একটা অনুভব করলেন। তাই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেউ কি এসেছিল?' স্ত্রী জানাল, 'হ্যাঁ, এরকম-এরকম দেখতে একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিল। আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলাম বাইরে গিয়েছেন।' এতে তিনি তার বাবাকে চিনতে পারেন এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন তার কথার মর্ম। বাবার অসিয়ত অনুযায়ী তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দেন এবং জুরহুম গোত্রের অন্য এক রমণীকে বিয়ে করেন। তিনি মুদাদ ইবনু আমরের কন্যা। আর মুদাদ ছিলেন জুরহুম গোত্রের সর্দার ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি।'[২]

ইসমাইলের দ্বিতীয় বিয়ের পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আরও একবার ফিলিস্তিন থেকে মক্কায় আসেন। এবারও তিনি পুত্রকে না পেয়ে তার স্ত্রীর কাছে খবরাখবর জানতে চান। জবাবে ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্ত্রী আল্লাহর প্রশংসা করেন, তাঁর শোকর আদায় করেন। এবার ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দরজার চৌকাঠ বহাল রাখতে বলে যান।

এরপর তৃতীয়বার যখন মক্কায় আসেন, তখন পুত্র ইসমাইলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৬৪

[২] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০

যমযম কূপের অদূরে একটি বড় গাছের নিচে বসে তিনি তিরে শান দিচ্ছিলেন। পিতাকে দেখে তিনি এগিয়ে যান! পিতা-পুত্রের সম্পর্কে যে গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা, মমতা ও নির্ভরতা—পৃথিবীর আবহমান সে দৃশ্যের অবতারণা ঘটে! সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এটাই ছিল পিতা-পুত্রের প্রথম দেখা! একজন আদর্শ-স্নেহশীল পিতা এবং তার সৎ-বুদ্ধিমান পুত্র এই সুদীর্ঘ সময় যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন, তা সাধারণত দেখা যায় না! এইবার পিতা-পুত্র মিলে কাবাঘরের নির্মাণ-কাজ শুরু করেন এবং আল্লাহর আদেশে মানবজাতির উদ্দেশে হজের ঘোষণা দেন।

মুদাদ-কন্যার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের ১২ জন পুত্রসন্তান[১] জন্মগ্রহণ করে। তারা হলেন—নাবিত বা নাবায়ুত, কাইদার, আদবাইল, মিবশাম, মিশমা, দুমা, মিশা, হাদাদ, তিমা, ইয়াতুর, নাফিস, কাইদুমান।

এই ১২ জন পুত্র থেকে সূচনা হয় ১২টি গোত্রের। প্রথমদিকে তারা সকলে মক্কায় বসবাস করত। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসার কাজে ইয়েমেন, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রায়ই তাদেরকে সফর করতে হতো। পরবর্তী সময়ে আরব উপদ্বীপের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং দুর্ভাগ্যবশত বিলীন হয়ে যায় কালের অতল গহ্বরে। বাকি থাকে কেবল দুটি গোত্র—এক. নাবিত। দুই. কাইদার।

হিজাযের উত্তর প্রান্তে নাবিতের উত্তরসূরি আনবাত-সভ্যতার বিকাশ ঘটে। তারা একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। আশেপাশের রাজ্যগুলো তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। দক্ষিণ জর্ডানে অবস্থিত প্রাচীন নিদর্শনে ভরপুর পেত্রা ছিল এই সাম্রাজ্যের রাজধানী। সে সময় তাদের অবাধ্য হওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করেই রোমকরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তাদের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে সব শেষ করে দেয়! সাইয়িদ সুলাইমান নদভি গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, গাসসানি রাজাবাদশাহ এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারি সাহাবিরা কাহতান-বংশের কেউ নন; বরং তারা ইসমাইলের পুত্র নাবিতের বংশধর। সেসব অঞ্চলে এরাই তাদের উত্তরসূরি।[২]

ওদিকে কাইদার ইবনু ইসমাইলের সন্তানসন্ততি মক্কাতেই বসবাস করতে থাকে। সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আদনান ও তার পুত্র মাআদ এই বংশেরই সন্তান। এরপর থেকে আদনানের উত্তরসূরি তথা আদনানি আরবেরা নিজেদের বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করে। এই আদনান ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঊর্ধ্বতন

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] দেখুন, *তারিখু আরদিল কুরআন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৮-৮৬

একবিংশ পুরুষ। বর্ণিত আছে, নবিজি কখনো বংশধারা বর্ণনা করতে গেলে আদনান পর্যন্ত এসে থেমে যেতেন এবং বলতেন, 'বংশধারা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।'[১] অনেক আলিমের মতে, নবিজির বংশপরম্পরা বর্ণনার ক্ষেত্রে আদনান-পরবর্তী স্তরে যাওয়াও বৈধ। উল্লেখিত হাদিসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করে তারা বলেন, 'সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও আদনানের মাঝে মোট ৪০টি প্রজন্ম গত হয়েছে।'[২]

মাআদের পুত্র নাযার থেকে তার বংশের বিস্তার ঘটে। বলা হয়ে থাকে, নাযার ছাড়া মাআদের আর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। নাযারের ৪ ছেলে। তাদের পরম্পরায় ৪টি বিশাল বিশাল গোত্রের বিস্তার ঘটে। গোত্রগুলোর নাম—ইআদ, আনমার, রবিআ ও মুদার। শেষোক্ত দুটি গোত্র থেকে আরও অনেক শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। যেমন : রবিআ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল আসাদ ইবনু রবিআ, আনাযা, আব্দুল কাইস; বনু ওয়াইলের শাখা বনু বকর ও বনু তাগলিব; তাদের থেকে আবার বনু হানিফা ইত্যাদি।

মুদারের উত্তরসূরি সকল গোত্র প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হলো, কাইস আইলান ইবনু মুদার; আর অপরটি ইলিয়াস ইবনু মুদার। কাইস আইলান থেকে এসেছে—বনু সালিম, বনু হাওয়াযিন, বনু গাতফান। আবার বনু গাতফান থেকে এসেছে—আবস, জুবিয়ান, আশজা ও গনি ইবনু আসার।

আর ইলিয়াস ইবনু মুদারের অন্তর্গত ছিল তামিম ইবনু মুররা, হুজাইল ইবনু মুদরিকা, আসাদ ইবনু খুযাইমার বংশধর এবং কিনানা ইবনু খুযাইমার উত্তরসূরিরা। কুরাইশ ছিল এই কিনানা গোত্রেরই একটি শাখা। তারা ফিহর ইবনু মালিকের বংশধর। আর মালিক ছিল নজরের পুত্র এবং কিনানার দৌহিত্র।

কুরাইশ গোত্রও বটবৃক্ষের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিল অসংখ্য ডালপালা। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো—জামাহ, সাহম, আদি, মাখযুম, তাইম, যাহরা ও কুসাই ইবনু কিলাবের কয়েকটি উপগোত্র। সেগুলো হচ্ছে—আব্দুদ দার ইবনু কুসাই, আসাদ ইবনু আব্দিল উযযা ইবনি কুসাই এবং আব্দু মানাফ ইবনু কুসাই।

আব্দু মানাফের ছিল ৪ ছেলে। আব্দুশ শামস, নাওফিল, মুত্তালিব ও হাশিম। আর এই হাশিমের বংশকেই আল্লাহ তাআলা নবিজির বংশ হিসেবে নির্বাচন করেন। হাশিমের উত্তরসূরি হয়ে দুনিয়ায় আসেন আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব ইবনি হাশিম। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।[৩]

---

[১] দেখুন, *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯১-১৯৪; *আল-আলাম*, যিরিকলি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭-৮, ১৪-১৭

[৩] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬

নবিজি বলেন—

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

আল্লাহ ইবরাহিমের পুত্রদের মাঝে ইসমাইলকে মনোনীত করেছেন, ইসমাইলের বংশধর থেকে বনু কিনানাকে মনোনীত করেছেন, বনু কিনানা থেকে নির্বাচন করেছেন কুরাইশ বংশকে, কুরাইশ বংশ থেকে নির্বাচন করেছেন বনু হাশিমকে আর বনু হাশিম থেকে নির্বাচন করেছেন আমাকে।[১]

আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فِرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا

আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করলেন। তারপর আমাকে অন্তর্ভুক্ত করলেন সর্বোত্তম গোত্র এবং দুই গোত্রের মাঝে উত্তম গোত্রে। এরপর আমাকে বেছে বেছে সর্বোৎকৃষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করলেন। অতঃপর বেছে বেছে আমাকে তাদের সবচেয়ে ভালো পরিবারের অন্তর্গত করলেন। তাই ব্যক্তিসত্তা ও বংশ-বিবেচনায় আমি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।[২]

আদনানের বংশ অনেক বড় হয়ে গেলে তারা পানি ও গাছপালার সন্ধানে আরবের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই সূত্রে আব্দুল কাইস, বনু বকর ও বনু তামিমের কয়েকটি উপগোত্র বাহরাইনে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে। ওদিকে বনু হানিফা ইবনি সআব চলে যায় ইয়ামামায়। ইয়ামামার হুজর নামক শহরে তারা অবতরণ করে। বনু বকরের অন্যান্য উপগোত্র ইয়ামামা, বাহরাইন, কাজিমা উপকূল থেকে নিয়ে ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল যথা উবুল্লা ও হিতে ছড়িয়ে পড়ে।

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬০৫; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩১৭৩১; *আল-মুসনাদুল জামি* : ১২০৬০; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬০৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩১৬৩৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭৫১৭; হাদিসটির সনদ হাসান লিগাইরিহি, আলবানি রাহিমাহুল্লাহ একে জইফ বলেছেন।

বনু তাগলিব ফুরাত নদীবর্তী দ্বীপে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের অনেক শাখাগোত্র বসবাস করতে থাকে বনু বকরের সাথে। আর বনু তামিম বসবাস শুরু করে বসরার মরু অঞ্চলে। বনু সালিম মদিনার অদূরে বসতি গড়ে তোলে। ওয়াদিল কুরা বা কুরা উপত্যকা থেকে নিয়ে খাইবার, পূর্ব-মদিনার দুই পাহাড়ের শেষ সীমা এবং হাররা[১] পর্যন্ত ছিল তাদের বসবাস। এছাড়া সাকিফ গোত্র তায়েফে এবং হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব-মক্কার আওতাস-উপকণ্ঠে বসতি স্থাপন করে। মক্কা-বসরা যাতায়াতের প্রধান সড়ক ছিল সেদিক দিয়ে।

বনু আসাদ তাইমার পূর্বাঞ্চল ও কুফার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করত। তাদের আবাস ও তাইমা অঞ্চলের মাঝখানে তাঈ গোষ্ঠীর ছোট ছোট ঘরবাড়ি ছিল। আর তাদের আবাসস্থল থেকে কুফার দূরত্ব ৫ দিনের পথ। জুবিয়ান গোত্রের পরিব্যাপ্তি ছিল তাইমার কাছাকাছি এলাকা থেকে শুরু করে হাওরান পর্যন্ত। আর কিনানার উপগোত্রগুলো তিহামায় থেকে যায়। কুরাইশের উপগোত্রগুলোও মক্কা ও তার আশেপাশে অবস্থান করে।

এই সকল গোত্র ও গোষ্ঠীর মাঝে কোনো ঐক্য ছিল না। অবশ্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মতো কোনো স্বার্থও তারা নিজেরা খুঁজে বের করতে পারেনি। এমন সময় আগমন ঘটে কুসাই ইবনু কিলাবের। তিনি ঐক্যের ঝান্ডা হাতে নিয়ে সবাইকে এক ছায়াতলে সমবেত করেন। এই ঐক্যের ফলে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়, মর্যাদা বুলন্দ হয়।[২]

আরবের তৎকালীন শাসনব্যবস্থা

যেহেতু আমরা ইসলামপূর্ব আরবের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে চাই, তাই তৎকালীন আরবের শাসনব্যবস্থা, রাজ্য-পরিচালনা, জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মসমূহের ছোট্ট একটি চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। আশা করি, তাতে ইসলামের সূচনালগ্নে আরবের পরিবেশ-পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা বোঝা আপনাদের জন্য সহজ হবে।

ইসলামের বিকাশকালে আরবের শাসকেরা ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগে মুকুটধারী সম্রাট। কিন্তু সম্রাট হলেও এরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়! অপর ভাগে গোত্রপতি ও সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিবর্গ। এদের মুকুট ছিল না ঠিক, কিন্তু মুকুট-পরিহিত সম্রাটদের চেয়ে তারা কোনো অংশে কম নয়! শাসনকার্যে এদের অধিকাংশই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। এমনকি কখনো কখনো মুকুটধারী সম্রাটগণ বাধ্য হতো তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে। মুকুটধারী সম্রাটদের মধ্যে ছিল—ইয়েমেনের বাদশাহ, গাসসানি

[১] মদিনার উত্তরে অবস্থিত একটি জায়গা।

[২] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬

রাজন্যবর্গ ও হিরার সম্রাটগণ। এদের বাইরে তৎকালীন জাযিরাতুল আরবে আর কোনো মুকুটধারী সম্রাট দেখা যায়নি।

ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনব্যবস্থা

ইয়েমেনের আল-আরাবুল আরিবার অন্তর্গত সবচেয়ে প্রাচীন যে জনগোষ্ঠীর খোঁজ পাওয়া যায়, তারা হলো সাবা সম্প্রদায়। উর শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে তাদের অস্তিত্ব ছিল এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দে তাদের সভ্যতার বিকাশ ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। তাদের সময়কাল নিচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ পর্যন্ত : এ সময়কার সম্রাটদের উপাধি ছিল মিকরাবু সাবা। সাবার রাজধানী তখন সিরওয়াহ। মাআরিব শহর থেকে পশ্চিম দিকে এক দিনের দূরত্বে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রাচীন এই শহরটি খুরাইবা নামে পরিচিত ছিল। মাআরিব নামের সুপ্রসিদ্ধ বাঁধের নির্মাণকাজ তাদের সময়েই শুরু হয়। ইয়েমেনের ইতিহাসে এই বাঁধের ভূমিকা অপরিসীম। কথিত আছে, সাবা সম্প্রদায় তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে ঘটাতে একসময় আরবের ভেতরে ও বাইরে উপনিবেশ কায়েম করতে সক্ষম হয়।

২. খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে ১১৫ অব্দ পর্যন্ত : এ সময়ের সম্রাটগণ মিকরাব উপাধি ত্যাগ করে পরিচিত হন ইয়েমেন-সম্রাট উপাধিতে। পাশাপাশি সিরওয়াহের পরিবর্তে রাজধানী করা হয় মাআরিব শহরকে। বর্তমানে সানআ থেকে ৬০ মাইল পূর্বে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

৩. খ্রিষ্টপূর্ব ১১৫ অব্দ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত : এ সময় হিমিয়ার গোত্রের হাতে সাবা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তারা মাআরিবের বদলে রিদেন শহরকে রাজধানী করে। আর রিদেনের নামকরণ করে জুফার নামে। ইয়ারিম শহরের অদূরে মিদওয়ার পাহাড়ে তাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না-যেতেই তাদের অধঃপতন শুরু হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাট ধস নামে। এর কারণ ছিল—প্রথমত হিজাযের উত্তর দিকে আনবাত সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। দ্বিতীয়ত মিশর, সিরিয়া ও হিজাযের উত্তর দিকে রোমানদের আগ্রাসন এবং পরবর্তী সময়ে জলপথের বাণিজ্যিক রুট তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়া। তৃতীয়ত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কোন্দল। এসব কারণেই কাহতানিরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং দূরদূরান্তে হিজরত করে বসতি স্থাপন করে।

৪. ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচার পর্যন্ত : এ সময়ে ইয়েমেনে নানারকম উত্থানপতন ঘটে। একের পর এক বিপদ আসতে থাকে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও গৃহযুদ্ধের ফলে তারা ভিনদেশিদের লক্ষ্যে পরিণত হয় এবং একপর্যায়ে নিজেদের

স্বাধীনতা হারায়। সেই যুগে রোমকরা এডেনে প্রবেশ করে। তাদের সহায়তায় ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মতো হাবশিরা ইয়েমেন দখল করে। এ সময় হামদান ও হিমিয়ার গোত্রদ্বয়ের মাঝে চলমান সংঘাতও তাদের বেশ কাজে দেয়।

৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়েমেনিদের হাত-পা পরাধীনতার জিঞ্জিরে বাঁধা ছিল। এরপর তারা স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু এরই মধ্যে মাআরিব বাঁধে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। ৪৫০ বা ৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের কোনো একসময় মহাপ্রলয়ংকরী বন্যা দেখা দেয়। কুরআনুল কারিমে একে 'সাইলুল আরিম' নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে ইয়েমেনবাসী সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বন্যা-কবলিত অঞ্চল জনশূন্য হয়ে পড়ে। জীবন বাঁচাতে মানুষ নানা দিকে অজানার পথে পা বাড়ায়।

৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে জু-নুওয়াস নামের এক ইহুদি তার দলবল নিয়ে নাজরানের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা চালায়। এ সময় তাদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে। তারা অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। কুরআনুল কারিমে সুরা বুরুজের এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿٤﴾

ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা।[২]

এ ঘটনার পর খ্রিষ্টীয় পুনর্জাগরণ আরম্ভ হয়। নির্যাতিত খ্রিষ্টানদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। তারা রোমান-সম্রাটদের আগ্রাসন প্রতিহত করে আরব ভূমিকে স্বাধীন করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে সংঘবদ্ধ হয়। হাবশিদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাদের জন্য প্রস্তুত করে নৌবহর। ৭০ হাজার হাবশি সেনা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে আরইয়াতের নেতৃত্বে খ্রিষ্টানরা দ্বিতীয়বার ইয়েমেন দখলে নেয়। হাবশার সম্রাটের পক্ষ থেকে আরইয়াত শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আবরাহা নামের এক সেনাপতির হাতে সে নিহত হয়। আবরাহা সম্রাটকে কোনোরকম বুঝ দিয়ে নিজে সেখানকার শাসক বনে যায়। এই সেই আবরাহা, যে তার দলবল নিয়ে বাইতুল্লাহ ধ্বংসের পরিকল্পনা করেছিল। কুরআনে আসহাবুল ফিল বা হস্তীবাহিনী বলে এদেরই বোঝানো হয়েছে।

---

[১] সুরা সাবা, আয়াত : ১৬

[২] সুরা বুরুজ, আয়াত : ৪

এই ঘটনার পর ইয়েমেনিরা পারস্যের সাহায্য কামনা করে। এবার তারা হাবশিদের একেবারে দেশছাড়া করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়িতও হয়। ৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদিকারিবের[১] নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর তারা তাকেই নিজেদের শাসক হিসেবে মেনে নেয়।

মাদিকারিব হাবশিদের একটি দল নিজের কাছে রেখে দেন। তারা তার সেবাযত্ন করত। শোভাযাত্রায় তার সহযাত্রী হতো। কিন্তু সুযোগ বুঝে তারা একদিন তাকে হত্যা করে ফেলে! তার তিরোধানের মধ্য দিয়ে জু-ইয়াযান পরিবারের রাজত্বের অবসান ঘটে। এরপর ধারাবাহিকভাবে পারস্য শাসকরা সানআ শাসন করে। আর ইয়েমেন পরিণত হয় পারস্যের উপনিবেশে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে তাদের সর্বশেষ শাসক বাজান পর্যন্ত। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাজান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে ইয়েমেনে পারস্য-শাসনের সমাপ্তি ঘটে।[২]

হিরার যত রাজাবাদশাহ

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫৭ থেকে ৫২৯ অব্দে কুরুশ দ্য গ্রেট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পারস্য ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পারসিক শাসকবর্গ শাসন করতে থাকে। একপর্যায়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজান্ডার মাকদুনির আগমন ঘটে। তিনি তৎকালীন শাসক প্রথম দারাকে পরাজিত করে পারসিক শাসনের মূলোৎপাটন করেন। এতে সমগ্র পারস্য ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্ত অবস্থায় যে শাসকেরা শাসনকার্য পরিচালনা করে, তারা 'তাওয়াইফ সম্রাট' নামে পরিচিত। এই ধারা অব্যাহত থাকে ২৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ আমলেই কাহতানিরা পারস্যে হিজরত করে। ইরাকের কিছু গ্রাম্য এলাকায় বসবাস শুরু করে তারা। আদনানিরাও হিজরত করে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়। পরে সেখানে স্থান-সংকট দেখা দিলে তারা ফুরাত নদীর দ্বীপাঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

পারসিকরা পুনরায় পারস্যের শাসনক্ষমতা ফিরে পায়। ২২৬ খ্রিষ্টাব্দে সাসানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরদাশিরের হাতে ইতিহাসের এই বাঁক অঙ্কিত হয়। পারসিকদের সুগঠিত করে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় সে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী আরবদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তার শাসনকার্যে অতিষ্ঠ হয়ে কুজাআ সম্প্রদায় সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। অপরদিকে হিরাবাসী ও আনবার গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

---

[১] পূর্ণনাম মাদিকারিব ইবনু সাইফ জু-ইয়াজান আল-হিমইয়ারি।

[২] বিস্তারিত দেখুন—*তাফহিমুল কুরআন*, সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯৫-১৯৮; *তারিখু আরদিল কুরআন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৩ থেকে শেষ পর্যন্ত।

আরদাশিরের শাসনামলে হিরা, ইরাকের সমগ্র মরু অঞ্চল এবং জাযিরা অঞ্চলের রবিআ ও মুদার গোত্রের শাসনভার ন্যস্ত ছিল জাজিমা আল-ওয়াদ্দাহের ওপর। আরদাশির বুঝতে পেরেছিল, আরবদের ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব খাটানো যেমন তার পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করাও অসম্ভব। তবে সে তাদের মধ্য থেকেই এমন একজনকে শাসক বানিয়ে রাখতে পারে, যে শুধু তার সমর্থকই নয়; বরং পক্ষপাতীও হবে। অপরদিকে তাকে আতঙ্কিত করে রাখা রোমান-সম্রাট আক্রমণ করে বসলে তাদের সাহায্যও নেওয়া যাবে। এতে ইরাক ও সিরিয়ার আরবদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে। কারণ সিরিয়ার আরবদের রোমানরা নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছিল। হিরার সম্রাট পারসিক সৈন্যদের ছোট্ট একটি বাহিনী সবসময় নিজের সাথে রাখত। বেদুইন আরবদের আক্রমণ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে সে এই ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিল। ২৬৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জাজিমার মৃত্যু হয়। তখন ছিল আরদাশিরের পুত্র সাবুরের শাসনামল।

জাজিমার মৃত্যুর পর আমর ইবনু আদি ইবনি নাসর আল-লাখমি হিরার ক্ষমতায় বসে। সে-ই ছিল লাখমিদের প্রথম শাসক। দীর্ঘ সময় লাখমি শাসকদের শাসন অব্যাহত থাকে। এরপর সমগ্র পারস্যে কুবাজ ইবনু ফাইরুযের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুবাজের শাসনামলে মাযদাক নামের এক হতভাগার আবির্ভাব ঘটে। সে এক নতুন মতবাদের দিকে মানুষকে আহ্বান করে! কুবাজসহ তার অধীনস্থদের একটি দল এই মতবাদ গ্রহণ করে। এরপর কুবাজ হিরার শাসক মুনজির ইবনু মা-উস-সামাকে এই মতবাদ গ্রহণের আহ্বান জানায়। কিন্তু তার এই দাওয়াত সে অবজ্ঞার সাথে ফিরিয়ে দেয়। এতে কুবাজ ক্ষুব্ধ হয় এবং মুনজিরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। এরপর তার বদলে হারিস ইবনু আমর ইবনি হাজার আল-কিনদিকে ক্ষমতায় বসায়, যে কিনা এর আগেই মাযদাকি মতবাদ গ্রহণ করেছিল।

কুবাজের স্থলাভিষিক্ত হয় কিসরা নওশেরওয়া বা প্রথম খসরু। সে এই ভ্রান্ত মতবাদকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত। এ কারণে সে মাযদাক ও তার অসংখ্য অনুসারীকে হত্যা করে। মুনজিরকে পুনরায় হিরার ক্ষমতায় বসায়। অপরদিকে হারিসকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু হারিস ভয়ে দারু কালব অঞ্চলে পালিয়ে যায়। আমৃত্যু সেখানেই কাটিয়ে দেয় সে।

মুনজির ইবনু মা-উস-সামার পর হিরায় তার উত্তরসূরিদের শাসন চলতে থাকে। একপর্যায়ে ক্ষমতায় আসে নুমান ইবনু মুনজির। তার নামে যাইদ ইবনু আদি আল-ইবাদি কিসরার কাছে কুৎসা রটায়। এতে কিসরা তার ওপর রাগান্বিত হয়। কিসরা নুমানকে ডেকে পাঠালে সে গোপনে শাইবান সম্প্রদায়ের সর্দার হানি ইবনু মাসউদের কাছে যায়। তার কাছে নিজের পরিবার ও ধনসম্পদ গচ্ছিত রেখে এসে কিসরার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিসরা তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয় এবং তার বদলে হিরার সিংহাসনে বসায় ইয়াস ইবনু কুবাইসা আত-তাইকে। এখানেই শেষ নয়; এরপর কিসরা তাকে হানি ইবনু

মাসউদের কাছে রক্ষিত সমুদয় সম্পদ ফেরত আনার জন্য লোক পাঠাতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু হানি তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। এতে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

ঘোষণার পরপরই কিসরার বিশাল অশ্বারোহী দল ইয়াসের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। জু-কার নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মাঝে সংঘটিত হয় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে শাইবান সম্প্রদায় জয়লাভ করে এবং পারসিকরা চরমভাবে পরাজিত হয়। অনারবদের ওপর এটাই ছিল আরবদের প্রথম বিজয়। আর ঘটনাটি ঘটেছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পরে।

ইয়াসের পর হিরার সিংহাসনে কিসরার পক্ষ থেকে একজন পারসিক শাসককে বসানো হয়; যদিও ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসন আবার লাখম পরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমতায় বসে মুনজির নামক এক ব্যক্তি, যার উপাধি আল-মারুর। সে ক্ষমতায় ছিল মাত্র ৮ মাস। কারণ এর পরই মহাবীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মুসলিম বাহিনী নিয়ে তার সাম্রাজ্যে উপস্থিত হন।[১]

সিরিয়ার রাজাবাদশাহ

যেসময় আরবে হিজরতের হিড়িক পড়েছিল, ঠিক সে সময়ে বনু কুজাআর কয়েকটি উপগোত্র সিরিয়ার উপকণ্ঠে হিজরত করে সেখানে বসতি স্থাপন করে। বনু সুলাইহ ইবনি হুলওয়ান ছিল তেমনই একটি উপগোত্র। আর বনু সুলাইহর একটি শাখাগোত্রের নাম ছিল বনু দাজআম ইবনু সুলাইহ। তাদেরকে বলা হয় দাজাআমা। রোমানরা এই শাখাটিকে তাদের আপন করে নেয় যাতে সহজেই স্থল ভাগের আরবদের বিদ্রোহ দমন করা যায়; সেইসাথে পারস্যের বিরুদ্ধেও কাজে লাগানো যায় তাদেরকে। এজন্য তাদেরই একজনকে সেখানকার প্রশাসক বানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বছরের পর বছর তাদের মধ্য থেকেই প্রশাসক নির্বাচিত হতে থাকে। যিয়াদ ইবনুল হাবুলা ছিল তাদের খ্যাতনামা শাসক। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তার শাসনামল বলে গণ্য করা হয়। এরপর গাসসানিদের আগমন তাদের শাসনক্ষমতা বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরা দাজাআমাদের পরাস্ত করে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। রোমানরা তখন সিরিয়ার শাসনভার গাসসানিদের হাতে ছেড়ে দেয়। গাসসানিরা দুমাতুল জানদালকে তাদের রাজধানী ঘোষণা করে। রোমানদের আমলা বা প্রশাসক হিসেবে দীর্ঘদিন সিরিয়া শাসন করে। এরপর ১৩ হিজরিতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলে উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তাদের সর্বশেষ শাসক জাবালা ইবনু আইহাম ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

---

[১] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯-৩২

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪; *আরদুল কুরআন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮০-৮২

হিজাযের শাসনব্যবস্থা

ইসমাইল আলাইহিস সালাম আমৃত্যু মক্কার সর্দার ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনিই বাইতুল্লাহর দেখভাল করতেন।[১] ১৩৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হলে[২] ছেলেদের মধ্য থেকে প্রথমে নাবিত, তারপর কাইদার তার স্থলাভিষিক্ত হন। নাবিতের পূর্বে কাইদার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এই মর্মেও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এরপর নেতৃত্বের ভার যায় তাদের নানা মুদাদ ইবনু আমর আল-জুরহুমির হাতে। এভাবেই মক্কার কর্তৃত্ব জুরহুম গোত্রের হস্তগত হয় এবং তাদের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। এরপর থেকে যদিও শাসনক্ষমতায় ইসমাইল আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিদের কাউকে পাওয়া যায়নি, তবু তাদের পূর্বপুরুষ বাইতুল্লাহর স্থপতি হওয়ায় সমাজে তাদের ছিল বিশেষ মর্যাদা।[৩]

জুরহুমিদের হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজনীতিতে ইসমাইল আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিদের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি। জুরহুমিদের একচেটিয়া প্রভাবে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল বাকি সবার নাম ও অবদান। পরে অবশ্য বুখতুনাসরের আবির্ভাবকালে তাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে আসে। মক্কার আকাশে তখন জ্বলজ্বল করে ওঠে বনু আদনানের রাজনৈতিক ভাগ্য। এর প্রমাণ হচ্ছে, জাতু-ইরকে বুখতুনাসর ও আরবদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে আরবদের নেতৃত্বে জুরহুমি কেউ ছিল না।[৪]

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দে বুখতুনাসরের দ্বিতীয় অভিযানে আদনান গোত্র ইয়েমেনে চলে যায়। তখন বনি ইসরাইলের নবি ইরমিয়া আলাইহিস সালাম মাআদ ইবনু আদনানকে নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান। বুখতুনাসরের তাণ্ডবলীলার অবসান ঘটলে মাআদ মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় তখন জুরহুম গোত্রের জুরশুম ইবনু জালহামা ও তার পরিবার ছাড়া আর কেউই বসবাস করত না। মাআদ এসে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। পরে তাদের কন্যা মাআনাকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। তার নাম রাখা হয় নিযার।[৫]

এরপর দিনে দিনে জুরহুম গোত্রের অবনতি হতে থাকে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে তারা। একপর্যায়ে বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের সঙ্গেও অনাচার করতে দেখা

---

[১] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০-২৩৭

[২] আদিপুস্তক : ২৫ : ১৭; তবে মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক, ইবনু হিশাম, ইবনু খাইয়াত, তাবারি, ইমাম যাহাবি প্রমুখের মতে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইন্তিকাল করেন ১৩০ বছর বয়সে। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭; *তারিখু খলিফা*, ইবনু খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ৩৭৫; *তারিখুল ইসলাম*, ইমাম যাহাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০]

[৩] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০-২৩৭; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১১

[৪] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩০

[৫] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৮

যায় তাদেরকে। পবিত্র কাবার সম্পদ নিজেদের জন্য বৈধ মনে করতে শুরু করে তারা।[১] তাদের এই কর্মকাণ্ড আদনানিদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্ম দেয়। এরই মধ্যে খুযাআ গোত্র মাররুজ-জাহরানে অবতরণ করে। আদনানিদের সঙ্গে পরিচয় ও ওঠাবসার মধ্য দিয়ে তারা জুরহুম গোত্রের অনাচার এবং তাদের ওপর আদনান গোত্রের অসন্তোষ সম্পর্কে জানতে পারে। জুরহুম গোত্রের বিরুদ্ধে এটা তাদের জন্য একটি মোক্ষম সুযোগ হয়ে আসে। সেহেতু তারা বনু আদনানের শাখাগোত্র—বনু বকর ইবনি আব্দি মানাফ ইবনি কিনানার সহায়তা নিয়ে জুরহুম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জুরহুমিরা যুদ্ধে পরাজিত হলে তাদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করা হয়। সে সূত্রে মক্কার শাসনক্ষমতা চলে যায় বিজয়ীদের হাতে। এ ঘটনাগুলো ঘটে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

জুরহুম গোত্রকে দেশান্তরে বাধ্য করা হলে, তাদের কয়েকজন দুর্বৃত্ত কিছু মূল্যবান মালপত্র ও ময়লা-আবর্জনা ফেলে যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে দেয়। ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমর ইবনু হারিস ইবনি মুদাদ আল-জুরহুমি কাবার জন্য প্রদত্ত দুটি সোনার হরিণ ও হাজরে আসওয়াদ যমযম কূপে ফেলে মাটিচাপা দেয়। এরপর জুরহুম গোত্রের সবাইকে সঙ্গে করে ইয়েমেনে চলে যায়। মক্কা ও মক্কার নেতৃত্ব ছেড়ে যেতে ভীষণ কষ্ট হয় তাদের। সে কষ্টের ছাপ ফুটে ওঠে আমরের[২] এই কবিতায়—

হাজুন থেকে সাফা, কোনোখানে নেই কোনো সুহৃদ
মক্কার এই রঙ্গমঞ্চে হতো কত না গল্প-গীত!
অথচ আমরা মক্কাবাসী, কাবার নেগাবান
ভাগ্যদোষে আজকে আমরা অজানায় ধাবমান![৩]

খ্রিষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দী ছিল নবি ইসমাইল আলাইহিস সালামের যুগ। এ হিসেবে মক্কায় জুরহুম গোত্রের একক অবস্থান ছিল খ্রিষ্টপূর্ব একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। আর শাসন-কর্তৃত্ব বহাল থাকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। তাদের পরে মক্কার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চলে আসে বনু খুযাআর হাতে। বনু বকরের তখন কর্তৃত্ব বলতে কিছুই নেই। ওদিকে বনু মুদার তাদের চেয়ে একটু ভালো অবস্থানে ছিল। তাদের হাতে শাসন-কর্তৃত্ব না থাকলেও ৩টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদেরকে দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলো হলো—

---

[১] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩১

[২] মাসউদি বলেন, প্রথমদিকে পারসিকরা কাবার জন্য বিভিন্ন মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন পাঠাত। এই সূত্রে সাসান ইবনু বাবাক স্বর্ণ ও হীরা দিয়ে তৈরি দুটি হরিণ, বেশকিছু তরবারি ও প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ পাঠায়। আমর এগুলো যমযম কূপে নিক্ষেপ করে। [বিস্তারিত দেখুন—*মুরুজুজ জাহাব*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৫]

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৪-১১৫

১. হাজিদের আরাফা থেকে মুযদালিফায় নিয়ে যাওয়া এবং নাফারের দিন তথা জিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে মিনা থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া। বনু ইলিয়াস ইবনু মুদারের শাখাগোত্র বনু গাউস ইবনু মুররা এই দায়িত্ব পালন করত। এদের বলা হতো সুফা। এই অনুমোদনের অর্থ—নাফারের দিনে সুফাদের কোনো লোক কঙ্কর নিক্ষেপ করার আগে অন্য কেউ কঙ্কর নিক্ষেপ করতে পারবে না। কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে সবাই যখন মিনা থেকে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করত, তখন সুফারা গিয়ে আকাবার দুইপাশে অবস্থান নিত। তাদের আগে অন্য কেউ সেই স্থান অতিক্রম করতে পারত না। তাদের যাওয়ার পর সবার জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। সুফা গোষ্ঠীর বিলুপ্তির পর বনু তামিমের শাখা বনু সাদ ইবনি যাইদ মানাত এই দায়িত্ব তাদের কাঁধে তুলে নেয়।

২. কুরবানির দিন সকালে হাজিদের মিনায় নিয়ে যাওয়া। এতে নেতৃত্ব দিত বনু আদওয়ান।

৩. হারাম মাসসমূহ[১] রদবদল বা আগপিছ করা। এটা করত বনু কিনানার শাখা বনু তামিম ইবনু আদি।[২]

মক্কায় বনু খুযাআর শাসনক্ষমতা টিকে ছিল প্রায় ৩ শতাব্দী।[৩] তাদের শাসনামলে আদনানিরা নাজদ এবং ইরাক ও বাহরাইনের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় মক্কায় অবস্থান করত কুরাইশের শাখাগোত্র—হুলুল ও হারাম এবং বনু কিনানার কয়েকটি পরিবার। মক্কার শাসনব্যবস্থা ও বাইতুল্লাহর কোনো বিষয়ে তাদের কিছু বলার অধিকার ছিল না। এভাবেই চলতে চলতে একপর্যায়ে কুসাই ইবনু কিলাবের আগমন ঘটে।[৪]

শৈশবেই কুসাইয়ের পিতা মারা গেলে তার মাতা বনু উজরা গোত্রের রবিআ ইবনু হারাম নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সে তাকে সিরিয়ায় নিয়ে যায়।

---

[১] জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব এই ৪টি মাসকে বলা হয় হারাম বা নিষিদ্ধ মাস। জাহিলি যুগে মক্কার মুশরিকরা এই মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহে জড়াত না। প্রাথমিক যুগে ইসলামও এই বিধান বহাল রেখেছিল। হারাম মাসগুলোতে মুসলিমদের জন্যও জিহাদ বৈধ ছিল না। অধিকাংশ আলিমের মতে পরবর্তী সময়ে এই বিধান রহিত হয়ে গেছে; ফলে এসব মাসেও যুদ্ধ করা বৈধ।

তবে কিছু সংখ্যক আলিমের মতে—এই বিধান রহিত হয়নি; এসব মাসে মুসলিমদের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক জিহাদ বৈধ নয়, শুধু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বৈধ। [বিস্তারিত জানতে দেখুন, *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩২; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত। *আল-মাবসুত*, সারাখসি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৬; দারুল মাআরিফা ; *বাহরুর রায়িক*, ইবনু নুজাইম, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৭; দারুল কিতাব আল-ইসলামি।]

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪, ১১৯-১২২

[৩] *আখবারু মাক্কা*, আল-আসরুকি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৩

[৪] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৭

এরপর কুসাই যৌবনে পদার্পণ করলে মক্কায় ফিরে আসে। তখন মক্কার শাসক ছিল খুযাআ গোত্রের হুলাইল ইবনু হাবশা। সুযোগ বুঝে কুসাই হুলাইলের মেয়ে হুব্বাকে বিয়ের জন্য তার কাছে প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাব পেয়ে হুলাইল আগ্রহের সাথে তার মেয়েকে কুসাইয়ের হাতে তুলে দেয়।[১] হুলাইলের মৃত্যুর পর খুযাআ ও কুরাইশের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে মক্কা ও বাইতুল্লাহর যাবতীয় বিষয়-আশয় কুসাইয়ের নেতৃত্বে চলে আসে।

ইতিহাসগ্রন্থ তালাশ করে এ যুদ্ধ বাধার ৩টি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়—

১. কুসাইয়ের সন্তানসন্ততি, ধনসম্পদ ও মান-মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হুলাইলের অবর্তমানে তিনি নিজেকে বনু খুযাআ ও বনু বকরের লোকদের চেয়ে মক্কার নেতৃত্বের বেশি হকদার মনে করেন। তাছাড়া কুরাইশরা ইসমাইল আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিদের মুখপাত্র হওয়ায় মক্কার সবকিছুতে তারাই অগ্রগণ্য হওয়ার কথা ছিল। এসব দিক চিন্তা করেই তিনি বনু খুযাআ ও বনু বকরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সে লক্ষ্যে কুরাইশ ও বনু কিনানার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন। তার সে প্রস্তাবে সকলেই সাড়া দেয়।[২]

২. বনু খুযাআর ধারণা অনুযায়ী হুলাইল নিজের অবর্তমানে কুসাইকে কাবা ও মক্কার দায়দায়িত্ব গ্রহণের অসিয়ত করে গিয়েছিল।[৩]

৩. হুলাইল তার কন্যা হুব্বাকে বাইতুল্লাহর দায়িত্বশীল নিয়োগ দিয়ে আবু গাসসান খুযাইকে তার উকিল নিযুক্ত করে। এই সূত্রে আবু গাসসান হুব্বার সহকারী হিসেবে কাবার দেখভাল শুরু করে। পরে হুলাইলের মৃত্যু হলে কুসাই কয়েক মটকা মদের বিনিময়ে আবু গাসসানের কাছ থেকে বাইতুল্লাহর দায়িত্ব কিনে নেন। বনু খুযাআ এ ব্যাপারে মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তারা কুসাইকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কুসাই তখন একধাপ এগিয়ে বনু খুযাআকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করতে উঠেপড়ে লাগেন। এ ব্যাপারে কুরাইশ ও বনু কিনানার সঙ্গে কথা বলেন এবং সফল হন।[৪]

হুলাইলের মৃত্যুর পরও সুফারা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এরই মধ্যে একদিন কুসাই তার কুরাইশ ও কিনানা গোত্রের সঙ্গীদের নিয়ে আকাবার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'এই কাজে আমরাই তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার।' তার এ বক্তব্যের জেরে যুদ্ধ বেধে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৭-১১৮

[২] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৭-১১৮

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৮

[৪] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫

যায় উভয় পক্ষের মধ্যে। এ যুদ্ধে কুসাই জয় লাভ করেন। উপায় না দেখে খুযাআ ও বনু বকর কুসাই থেকে দূরে সরে যায় এবং তাকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে বিশাল এক যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হলে মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটে সে যুদ্ধে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় বিচলিত হয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। ফলে সন্ধির ব্যাপারে সম্মত হয় সবাই। মীমাংসার জন্য বনু বকরের ইয়ামার ইবনু আওফকে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করা হয়। সে সিদ্ধান্ত দেয়—

'কাবা ও মক্কার বিষয়ে খুযাআর চেয়ে কুসাই অধিক হকদার। কুসাই তাদের যে রক্ত ঝরিয়েছে, তা একদম বৃথা। তবে খুযাআ ও বনু বকর কুসাইয়ের যে রক্ত ঝরিয়েছে, তার বিনিময় অবশ্যই দিতে হবে। কাবার নিয়ন্ত্রণে কুসাইকে বাধা দেওয়া যাবে না।' এরপর থেকে ইয়ামারের নাম হয়ে যায়—শাদ্দাখ বা বিচূর্ণকারী।[১]

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি তথা ৪৪০ খ্রিষ্টাব্দে[২] মক্কা ও বাইতুল্লাহ কুসাইয়ের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে কুরাইশরা মক্কায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। তারপর জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায়।

কুসাই নেতৃত্বে আসার পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। সেগুলো হচ্ছে—

» তিনি স্বজাতিকে মক্কায় একত্র করে তাদের মধ্যে মক্কার ভূমি বণ্টন করে দেন।

» কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত সকল গোত্রকে তাদের পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেন।

» নাসাআ, সাফওয়ান, আদওয়ান ও মুররা ইবনু আওফকে স্বপদে বহাল রাখেন।[৩][৪]

» মাসজিদুল হারামের উত্তর প্রান্তে 'দারুন নাদওয়া' প্রতিষ্ঠা করেন, যার দরজা স্থাপন করা হয় মসজিদ বরাবর। সে সময়ে এটাই ছিল কুরাইশদের সভাগৃহ। এখানেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হতো। খুঁজে বের করা হতো সকল জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান। কেননা এই সভাগৃহে সবার বক্তব্য গৃহীত হতো, সব সমস্যার সুন্দর সমাধানের ব্যাপারে সকলে সচেষ্ট থাকত।[৫]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৩, ১২৪

[২] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৩২

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫

[৪] তার দৃষ্টিতে এগুলো ছিল ধর্মীয় দায়িত্ব, যাতে কোনোরকম নড়চড় কাম্য নয়।

[৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৫; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬; *আখবারুল কিরাম*, পৃষ্ঠা : ১৫২

কুসাই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে রেখেছিলেন। যেমন—

» দারুন নাদওয়ার সভাপতিত্ব। এই সভাগৃহে বসেই তারা গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, ছেলেমেয়েদের বিয়েশাদি দিত।

» যুদ্ধের ঝান্ডা নিয়ন্ত্রণ। একমাত্র তিনিই যুদ্ধের ঝান্ডা কারও হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার রাখতেন।

» বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ। তিনি ছাড়া কেউ বাইতুল্লাহর দরজা খোলার অধিকার রাখত না। তিনি নিজে বাইতুল্লাহর তদারকি করতেন।

» হাজিদের পানি পান। হাজিদের পানি পান করানোর কাজেও তিনিই নেতৃত্ব দিতেন। তার নির্দেশে অনেকগুলো হাউজে পানি সংরক্ষণ করা হতো। এরপর সে পানিতে খেজুর ও কিশমিশ ছিটিয়ে পানি মিষ্টি করে রাখা হতো। মক্কায় আগত লোকজন সেই মিষ্টি পানি পান করত।[১]

» হাজিদের আপ্যায়ন। এ মহতী কাজের জন্য কুসাই কুরাইশের জন্য খাজনা নির্ধারণ করে—যা হজের মৌসুমে তাদের সম্পদ থেকে কেটে রাখা হয়। এই সম্পদ ব্যয় করে হাজিদের জন্য তারা আপ্যায়নের ব্যবস্থা করত। ফলে অসচ্ছল ও দরিদ্র হাজিরা সেখান থেকে আহার করতে পারতেন।[২]

এই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ কুসাইয়ের একার হাতে ছিল। কিন্তু বয়স বেড়ে গেলে তিনি দায়িত্বভার কিছুটা কমানো প্রয়োজন বলে মনে করেন। তার ছেলে আব্দু মানাফ তখন যথেষ্ট বড়। চারদিকে তার বেশ নামডাক। নেতৃত্বগুণে নজর কেড়েছে সবার। কিন্তু অপর ছেলে আব্দুদ দার একদম বিপরীত। তার মধ্যে প্রতিভার ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাই কুসাই আব্দু মানাফকে বলেন, আমি তোমার হাতে আমার জাতির জিম্মাদারি তুলে দিচ্ছি, যদিও তারা তোমার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন। এরপর তিনি আব্দু মানাফকে তার ওপর অর্পিত কুরাইশদের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করেন; দারুন নাদওয়ার সভাপতিত্ব, বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, যুদ্ধের ঝান্ডা নিয়ন্ত্রণ, হাজিদের পানিপান ও আতিথেয়তার দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

জীবদ্দশায় কুসাইয়ের কোনো কাজে বিরোধিতা করার মতো কেউ ছিল না। মৃত্যুর আগে ও পরে তার আদেশসমূহ সকলে ধর্মীয় কাজ মনে করে পালন করত। তার

---

[১] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩০

মৃত্যুর পরও সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল; কিন্তু বিপত্তি ঘটে আব্দু মানাফের মৃত্যুর পর। তার সন্তানেরা চাচাতো ভাইদের সাথে অর্থাৎ আব্দুদ দারের সন্তানদের সাথে এসব দায়দায়িত্বের ব্যাপারে ঝামেলা শুরু করে। এতে করে কুরাইশ-গোত্র দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একপর্যায়ে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হলে উভয় দল সন্ধির ব্যাপারে সম্মত হয়। সন্ধিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল দায়দায়িত্ব উভয়ের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তখন হাজিদের পানি পান করানো এবং নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে আব্দু মানাফ পরিবারে কাছে। আর দারুন নাদওয়া, যুদ্ধের ঝান্ডা নিয়ন্ত্রণ ও বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় আব্দুদ দারের উত্তরসূরিদের ওপর। এরপর আবার আব্দু মানাফ-পরিবার নিজেদের প্রাপ্ত দায়িত্বের ব্যাপারে লটারি করলে হাশিম ইবনু আব্দি মানাফের নাম ওঠে। সে সূত্রে হাশিম ইবনু আব্দি মানাফই আমৃত্যু হাজিদের পানি পান করানো এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যায়। তার অবর্তমানে দায়িত্ব গ্রহণ করে তার ভাই মুত্তালিব ইবনু আব্দি মানাফ। তারপর দায়িত্ব আসে নবিজির পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের কাঁধে। এভাবে এই দায়িত্ব আবর্তিত হতে থাকে তার উত্তরসূরিদের মাঝে। ইসলামের আবির্ভাবের সময় এই দায়িত্ব ছিল নবিজির চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের কাছে।[১]

এসব পদাধিকার ও দায়দায়িত্ব ছাড়া আরও কিছু বিষয় কুরাইশ গোত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বস্তুত তারা একটি ছোট্ট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। তাদের সেই সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা অনেকটাই এ যুগের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মতো। নিচে এর কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো—

» আল-ইসার তথা মূর্তির কাছে রাখা ভাগ্যপরীক্ষার কাঠি রক্ষণাবেক্ষণ করা। এটি বনু জামাহের দায়িত্বে।

» তাহজিরুল-আমওয়াল তথা মূর্তির সামনে পেশকৃত যাবতীয় নাজরানা বিন্যস্ত করা এবং সেইসাথে ঝগড়াবিবাদ মিটমাট করার ভার ছিল বনু সাহমের কাঁধে।

» শুরা তথা পরামর্শসভার আয়োজন সম্পন্ন করার দায়িত্ব ছিল বনু আসাদের।

» আল-আনশাক তথা রক্তপণ ও জরিমানা আদায় করত বনু তামিম।

» আল-ইকাব তথা জাতীয় ঝান্ডা বহন করত বনু উমাইয়া।

» আল-কুব্বা তথা সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ এবং অশ্ব-পরিচালনা করা। বনু মাখযুম এই

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৯-১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮, ১৭৯

দায়িত্ব পালন করত।

» আস-সাফারা তথা দূতালি করা। এটি ছিল বনু আদির ভাগে।[১]

সমগ্র আরবের শাসনব্যবস্থা

ইতোমধ্যে আমরা কাহতানি ও আদনানি গোত্রগুলোর হিজরত নিয়ে আলোচনা করেছি। আরবের অঞ্চলগুলো তাদের মাঝে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা হিরার কাছাকাছি বসবাস করত; তারা হিরায় নিযুক্ত আরব শাসকের অনুগত। আর যারা সিরিয়ার মরুভূমিতে বসবাস করত, তারা গাসসানি শাসকের অনুগত। তবে আনুগত্যের বিষয়টি কথায় লক্ষ করা গেলেও কাজে ছিল না মোটেই। বরং যেসকল গোত্র জাযিরাতুল আরবের ভেতরে মরু অঞ্চলে বসবাস করত, তারা ছিল স্বাধীন—নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।

বস্তুত সকল সম্প্রদায়েরই স্বতন্ত্র শাসক থাকত, যাদেরকে তারা নিজেরাই নির্বাচন করত। আর প্রত্যেক সম্প্রদায় ছিল স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যের মতো। তাদের রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য, নিজেদের ভূমিরক্ষা এবং শত্রুর মোকাবেলা। এই মূলনীতির সাপেক্ষেই নির্ধারিত হতো যাবতীয় চুক্তি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

সম্রাটের মর্যাদার চেয়ে সেখানকার সর্দারদের মর্যাদা কোনো অংশে কম ছিল না। কী যুদ্ধ কী শান্তি—সর্বাবস্থায় গোত্রের সকলে সর্দারদের আনুগত্য করত। কোনো অবস্থায়ই তারা তাদের অবাধ্য হতো না। শাসনকার্যে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তেমনই, যেমন একনায়কতান্ত্রিক কোনো দেশের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানের থাকে। এমনকি তাদের চোখের ইশারায় হাজারো তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যেত, এক্ষেত্রে কেউ কারণ জানারও প্রয়োজন মনে করত না। তবে নিজেদের মাঝে কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা দেখা দিলে তারা মানুষকে তোষামোদ করত, প্রচুর খরচ করত, অতিথিদের সম্মান জানাত; বদান্যতা, দানশীলতা, সহনশীলতা ও সাহসিকতা দেখাত এবং শত্রু-মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করত। এভাবেই তারা একসময় জনমানুষের চোখে প্রশংসনীয় হতো, বিশেষত কবিদের কাছে; কারণ তারাই ছিল তৎকালীন গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম মুখপাত্র। সর্বোপরি এসব প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই তারা সমসাময়িকদের মাঝে বিশেষ মর্যাদার স্থান দখল করে নিত।

সে যুগের গোত্রপ্রধান ও শাসকদের বিশেষ অধিকার ছিল। সেই অধিকার বলে তারা গনিমতের মাল থেকে মিরবা, সাফি, নাশিতা ও ফুজুল নামে বিশেষ-বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে পারত। কবি বলেন—

---

[১] *তারিখু আরদিল কুরআন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৬

মিরবা-সাফি আপনার জন্য

নাশিতা-ফুজুলেও আপনার হক।

দয়া করে যদি দান করেন কিছু

তবেই জনতা হবে প্রাপক।

» মিরবা : গনিমতের এক-চতুর্থাংশ।

» সাফি : ওই বিশেষ অংশ, যা শাসক বণ্টনের পূর্বেই নিজের জন্য পৃথক করে রাখে।

» নাশিতা : অভিযানে বের হওয়ার পর কাঙ্ক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে পথিমধ্যে শাসক যে সম্পদ লাভ করত।

» ফুজুল : সেই সম্পদ, যার সংখ্যা যোদ্ধাদের সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় বণ্টন করা সম্ভব হতো না। যেমন : উট, ঘোড়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আরব শাসকদের কথা বলা হলো। এবার তাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরব। আরবের তিন পার্শ্বের রাজ্যগুলোর অবস্থা তখন আক্ষরিক অর্থেই শোচনীয়। সেখানকার মানুষেরা মুনিব-গোলাম, শাসক-শাসিত ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ছিল অফুরন্ত ভোগের অধিকার। পক্ষান্তরে শাসিত শ্রেণির কপালে জুটত কেবল দুঃখ-দুর্দশা আর অনন্ত দুর্ভোগ। স্পষ্ট করে বললে, সেকালের প্রজারা ছিল উর্বর শস্যক্ষেতের মতো—যাদের দায়িত্ব শুধু শাসকদের জন্য বেশি বেশি ফসল উৎপাদন করা। আর শাসকদের কাজ ছিল নিজেদের খেয়ালখুশিমতো সেগুলো ভোগ করা। এতে কার ওপর জুলুম হচ্ছে, আর কার হক নষ্ট হচ্ছে—সে ব্যাপারে কারও মাথাব্যথা ছিল না। অপরদিকে সাধারণ মানুষরা চরম কষ্টে দিনযাপন করত। জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার চারদিক থেকে তাদের বেষ্টন করে রেখেছে। যারপরনাই বিপদে একটু দুঃখ প্রকাশ করা কিংবা কারও কাছে একটু অভিযোগ করার মতো কোনো সুযোগ ছিল না তখন। অবর্ণনীয় নির্যাতন মুখ বুজে তাদের সহ্য করতে হতো। শাসক মানেই ছিল স্বৈরাচারী আর অত্যাচারী। তাই চারদিক থেকে ভেসে আসত অধিকারবঞ্চিত মানুষের রোনাজারি ও চিৎকার। এসব রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় যে গোত্রগুলো বসবাস করত, তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়, অনেকটা ভাসমান কচুরিপানার মতো। ভাগ্য তাদের কখন যে কোথায় নিয়ে যাবে, তা কেউ বলতে পারে না। একবার ইরাকে প্রবেশ করলে, পরের বার হয়তো সিরিয়ায় গিয়ে পড়তে হবে।

অভ্যন্তরীণ গোত্রগুলোও বেশ ছিন্নভিন্ন; সাম্প্রদায়িক কোন্দল আর ধর্মীয় মতবিরোধে জর্জরিত। এক কবি বলেছিলেন—

গাযিয়া গোত্রের লোক আমি
তারাই আমার মূল।
তাদের পথেই চলব আমি
ঠিক হোক বা ভুল।

তাদের সামনে এমন কোনো শাসক ছিলেন না—যিনি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাবেন! এমন কোনো মুরুব্বি ছিলেন না, যেকোনো প্রয়োজনে যার কাছে হাজির হওয়া যায়; কঠিন বিপদে যার ওপর ভরসা করা যায়।

তবে হিজাযের শাসনব্যবস্থার প্রতি আরব জনসাধারণ সম্মানের দৃষ্টিতেই তাকাত। সেখানকার শাসকদের তারা ধর্মীয় বিবেচনায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করত। বস্তুত এই শাসনব্যবস্থা ছিল দুনিয়াবি কর্তৃত্ব এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের মিশ্রিত রূপ। এই প্রশাসনের শাসকরাই ছিল আরবদের ধর্মীয় নেতা।

আর হারাম ও হারাম-সংশ্লিষ্টদের জন্য নীতি ছিল এমন—তারা বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের কল্যাণে কাজ করবে; ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে। মূলত তাদের শাসনব্যবস্থা অনেকটা এ যুগের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মতো। কিন্তু এ শাসনব্যবস্থার ভিত এতটা মজবুত ছিল না। বড় কোনো ঝড় বা দুর্বিপাক সামলানো তাদের পক্ষে বলতে গেলে অসম্ভব। তাই তো হাবশিদের আক্রমণে এ শাসনব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছিল।

আরবদের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মীয় মতবাদ

ইসমাইল আলাইহিস সালাম আরবদের কাছে পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেন। বেশিরভাগ আরবই তা গ্রহণ করে নেয়। এরপর থেকে তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত, তাঁর তাওহিদের সাক্ষ্য দিত, তাঁর দেওয়া ধর্ম মেনে চলত। এভাবে চলতে চলতে একটা সময় এসে তারা সেই ধর্মের অনেক কিছুই ভুলে যায়। বাকি থাকে কেবল একত্ববাদ আর ধর্মীয় কিছু রীতিনীতি।

এ সময় খুযাআ গোত্রের সর্দার আমর ইবনু লুহাইয়ের আবির্ভাব ঘটে। আপাদমস্তক ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছে সে। সবরকম দ্বীনি কাজের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল তার। সকলের প্রতি সে যেমন সদাচারী ছিল, তেমনই বিভিন্নভাবে তাদের সহযোগিতাও করত। ফলে মানুষেরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। একসময় তার প্রতি মানুষের মনে উচ্চ ধারণা তৈরি হয়। তাকে তারা অনেক বড় আলিম ও আল্লাহওয়ালা ভেবে বসে।

একবার সে সিরিয়া সফরে যায়। সেখানে গিয়ে সিরীয়দের মূর্তিপূজা করতে দেখে। কাজটি তার ভীষণ ভালো লেগে যায় এবং সে এটাকে উচ্চস্তরের ইবাদতও মনে করে। কারণ সিরিয়ায় অসংখ্য নবি-রাসুলের আগমন ঘটেছিল; তাদের অনেকের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল আসমানি কিতাব। তারপর 'হোবল' নামক একটি মূর্তি এনে সে বাইতুল্লাহর মধ্যখানে স্থাপন করে এবং মক্কাবাসীকে আল্লাহর সঙ্গে শিরকের আহ্বান জানায়। সবাই তার এই আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লি এবং হারামের অধিবাসী।[১] তাদের দেখাদেখি হিজাযবাসীও শিরকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

'মানাত' নামে তাদের আরও একটি প্রাচীন মূর্তি ছিল। লোহিত সাগরের তীরে, কুদাইদ উপত্যকার অদূরে মুশাল্লাল নামক স্থানে সেটি স্থাপিত ছিল।[২] তায়েফবাসীর মূর্তির নাম 'লাত'। আর নাখলা উপত্যকার লোকজনের মূর্তি ছিল 'উযযা'। এছাড়া আরও অনেক মূর্তি দেখা যেত। তবে এ তিনটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এরপর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে শিরক বেড়ে যায়, বৃদ্ধি পেতে থাকে মূর্তির সংখ্যাও। হিজাযের কোনো এলাকা আর মূর্তিবিহীন থাকে না।

জানা যায়, আমর ইবনু লুহাইয়ের অনুগত এক জিন ছিল। সে তাকে নুহ আলাইহিস সালামের জাতির মূর্তিসমূহের সংবাদ দেয়—ওয়াদ্দ, সুওয়াআ, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসরা নামের মূর্তিগুলো জেদ্দায় পুঁতে রাখা আছে। তার দেওয়া তথ্যমতে আমর সেখানে গিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করে এবং তিহামায় নিয়ে যায়। এরপর হজের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের হাজিরা এলে তাদের কাছে সেগুলো হস্তান্তর করে। তারা সেগুলো স্বজাতির কাছে নিয়ে যায়। এভাবে আরবের প্রতিটি গোত্রে মূর্তি পৌঁছে যায়। স্থান পায় সবার ঘরে ঘরে। এমনকি মাসজিদুল হারামকেও তারা প্রতিমার বাজার বানিয়ে ছাড়ে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কাবিজয় করেন, কাবার চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। নবিজির আঘাতে সেগুলো একের পর এক ভেঙে পড়ে। তারপর তার আদেশেই সেগুলো মসজিদ থেকে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হয়।[৩]

এভাবেই শিরক ও মূর্তিপূজা ধর্মীয় কাজ হিসেবে গণ্য হয় জাহিলি যুগের মানুষদের কাছে, যাদের দাবি ছিল—তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারী।

মূর্তিপূজার ক্ষেত্রে তাদের কিছু নিয়মনীতিও দেখা যেত। এগুলোর বেশিরভাগই তৈরি করেছে আমর ইবনু লুহাই। তার প্রতিটি কথা ও কাজ লোকেরা ঐশী বাণী মনে করত। কিন্তু এর ফলে যে ইবরাহিমি দ্বীনের বিকৃতি ঘটছে, তা তাদের কারও বুঝে আসত না।

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৭৯০, ৪৮৬১

[৩] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৩, ৫০-৫৪

তাদের মূর্তিপূজার কয়েকটি পদ্ধতি ছিল এমন—

১. তারা মূর্তিগুলোর পাশে অবস্থান নিত, সেগুলোর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত, বিপদাপদে সাহায্য চাইত, পাশে গিয়ে বিশেষ ধরনের শব্দ তৈরি করত। তাদের বিশ্বাস, এই মূর্তিগুলো আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। এতে তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

২. তারা সেগুলোর উদ্দেশে ভ্রমণ, চারদিকে প্রদক্ষিণ, পূজা ও উপাসনা করত।

৩. মূর্তির সামনে পশু বলি দিয়ে নৈকট্য লাভ করতে চাইত। মূর্তির নামেও পশু জবাই করত মাঝেমধ্যে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে বলেন—

...وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ...﴿٣﴾

যে প্রাণী মূর্তি পূজার বেদিতে জবেহ করা হয়, তা হারাম।[১]

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ...﴿١٢١﴾

যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো তোমরা ভক্ষণ কোরো না।[২]

৪. নৈকট্য লাভের আরও একটি পদ্ধতি হচ্ছে, তারা তাদের খাবার ও পানীয় থেকে মনমতো কিছু অংশ মূর্তির জন্য রেখে দিত। শুধু পানাহারই নয়, বিভিন্ন শস্য ও গবাদি পশুর একটা অংশও এভাবে পৃথক করে রাখত। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলার জন্য তারা একটা ভাগ নির্ধারণ করত এবং বিভিন্ন অজুহাতে আল্লাহর ভাগ থেকে নিয়ে তারা মূর্তির ভাগে রেখে দিত। কিন্তু ভুল করেও তারা মূর্তির ভাগ থেকে আল্লাহর ভাগে কিছু আনত না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১২১

স্বয়ং আল্লাহ যেসব শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তারই একটি অংশ তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে এবং নিজেদের ধারণা অনুসারে বলে, এই অংশ আল্লাহর জন্য আর এই অংশ আমাদের শরিক দেবতাদের জন্য। (তাদের বিচারে) যে অংশ তাদের শরিক দেবতাদের জন্য, তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য, তা ঠিকই পৌঁছে যায় তাদের শরিক দেবতাদের কাছে। বড়ই কদর্য তাদের এ বিচার।[১]

৫. ফল-ফসল ও গবাদি পশুর মানত করে উপাস্যদের সন্তুষ্টি লাভের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ﴿١٣٨﴾

তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্য সংরক্ষিত। আমরা যাদেরকে চাইব, কেবল তারাই এগুলো খেতে পারবে। বিশেষ কিছু গবাদি পশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ। আর কিছু পশু জবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এসবই তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটনা করে বলে (এগুলো আল্লাহর উদ্দেশে জবাই করা হয়েছে)।[২]

৬. গবাদি পশুগুলো আবার—বাহিরা, সায়িবা, ওয়াসিলা ও হাম—এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। ইবনু ইসহাক বলেন, বাহিরা হলো সায়িবার মাদি বাচ্চা। আর সায়িবা বলা হয় সেই উটনীকে, যে লাগাতার ১০টি মাদি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে; যার মাঝে কোনো নর বাচ্চা ছিল না। এমন উটনীকে ছেড়ে দেওয়া হতো। তার পিঠে কেউ আরোহণ করত না। তার পশম কাটা হতো না এবং মেহমান ছাড়া অন্য কেউ তার দুধ পান করত না। এরপর আবারও মাদি বাচ্চা জন্ম দিলে মায়ের সাথে সেটিকেও মুক্ত করে দেওয়া হতো; এ সময় তার কান ছিদ্র করে দেওয়া হতো। মায়ের মতো এটির পিঠেও কেউ আরোহণ করত না। পশম কাটত না। মেহমান ছাড়া অন্য কাউকে তার দুধ পান করানো হতো না। আর সায়িবার এই মাদি বাচ্চাই হলো বাহিরা।

আর যে ছাগল ৫ বারে মোট ১০টি মাদি বাচ্চা জন্ম দিয়েছে এবং এর মাঝে কোনো নর

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩৬

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩৮

বাচ্চা ছিল না, এ ধরনের ছাগলকে ওয়াসিলা বলা হয়। এরপর যদি সেটা আবার কোনো বাচ্চার জন্ম দিত, তখন পুরুষরাই কেবল সেই ওয়াসিলার গোশত খেত, নারীরা নয়। তবে বাচ্চা মারা গেলে ওয়াসিলার গোশত নারী-পুরুষ সবাই খেতে পারত।

হাম বলা হতো এমন উটকে, যার প্রজননে লাগাতার ১০টি উটনী জন্ম নিয়েছে। এমন উটের পিঠ তারা আর ব্যবহার করত না, তার পশমও কাটত না; প্রজনন ছাড়া আর কোনো কাজে সেটি ব্যবহার করত না কেউ। এজন্য উটনীর পালে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হতো।

তাদের এ সকল কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

আল্লাহ বাহিরা, সায়িবা, ওয়াসিলা ও হাম বলে কিছু নির্ধারণ করেননি। কিন্তু কাফিররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেকবুদ্ধি নেই।[১]

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ... ﴿١٣٩﴾

তারা বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য; আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে সমান অংশীদার।[২]

উপরিউক্ত পশুগুলোর আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে।[৩]

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, এই প্রাণীগুলো তাদের দেবতাদের জন্য উৎসর্গিত ছিল। বিশুদ্ধ সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনু লুহাই-ই প্রথম এই সায়িবা-প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছে।[৪]

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৩

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩৯

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৪৬২৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৮৫৬; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১০৯১

আরবরা মূর্তিগুলোর উদ্দেশে কত কী যে করত, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাদের বিশ্বাস, এতে আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যাবে, মূর্তিগুলো তাঁর কাছে সুপারিশ করবে। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিম থেকে জানা যায়—

...مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ...﴿٣﴾

আমরা তাদের ইবাদত করি—যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।[১]

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ...﴿١٨﴾

আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের উপকারও করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশ করে।[২]

আরবের লোকেরা পালকহীন তিন ধরনের তির ব্যবহার করে ভাগ্যনির্ণয় করত। **এক.** তিরে 'হ্যাঁ' ও 'না' লেখা থাকত। বিয়েশাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তারা এগুলো দিয়ে শুভ-অশুভ যাচাই করত। এরপর ইতিবাচক ইঙ্গিত পেলে এগিয়ে যেত। আর নেতিবাচক হলে পরবর্তী বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করত। **দুই.** এ ধরনের তিরে 'পানি' ও 'দিয়াত[৩]' লেখা থাকত। **তিন.** কিছু কিছু তিরে লেখা থাকত—منكم অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্য থেকে'; من غيركم অর্থাৎ 'অন্যদের মধ্য থেকে'; অথবা ملصق অর্থাৎ 'সংশ্লিষ্ট'।

কারও পিতৃপরিচয় নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে তারা হোবল মূর্তির কাছে চলে যেত। সঙ্গে থাকত ১০০টি উট। উটগুলো তিরওয়ালাকে দেওয়ার পর পরিচয় নির্ধারণের জন্য তির বের করত। 'তোমাদের মধ্য থেকে'-সূচক তির বের হলে ওই ব্যক্তি তাদের একজন

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৩৯

[২] সুরা ইউনুস, আয়াত : ১০

[৩] হত্যার জরিমানাস্বরূপ হত্যাকারী বা তার পরিবারের ওপর যে অর্থদণ্ড অর্পিত হয়, তাকে দিয়াত বা রক্তপণ বলা হয়। [*ফাতহুল কাদির*, ইবনুল হুমাম, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৭১; দারুল ফিকর, লেবানন। *তাবয়িনুল হাকায়িক শারহু কানযিদ দাকায়িক*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১২৬; আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়া, কায়রো।]

মর্যাদাবান হিসেবে গণ্য হতো। পক্ষান্তরে 'অন্যদের মধ্য থেকে'-সূচক তির বেরিয়ে এলে তাকে মিত্রপক্ষীয় মনে করা হতো। আর তৃতীয় প্রকার তির বের হলে পূর্বের অবস্থানে বহাল থাকত।[১]

তির দিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার মতো একপ্রকার জুয়াতেও তারা লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ তিরে থাকা চিহ্নের ওপর ভিত্তি করে তারা উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করত।

গণক, জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদদের কথা তারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করত। গণক হলো এমন ব্যক্তি, যাকে অদৃষ্টের জ্ঞান দান করা হয়েছে বলে মনে করা হতো। তারাও নিজেদেরকে বিভিন্ন গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত বলে দাবি করত। তাদের একদল আবার অনুগত জিন দ্বারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারার সক্ষমতা আছে বলে দাবি করত। আরেক দল বলত, তারা বিশেষ ক্ষমতাবলে অদৃশ্যের সংবাদ জানে। আরও একদলের দাবি ছিল—তারা বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ ও জিজ্ঞাসাবাদের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য দিতে সক্ষম। যেমন : কোনো কিছু চুরি হয়ে গেলে, তারা চুরি হওয়ার স্থান, হারানো জিনিসের অবস্থান ইত্যাদি তথ্য দিতে পারত। এদেরকেই বলা হতো জ্যোতিষী। আর জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রমালার অবস্থান ও প্রদক্ষিণ নিয়ে গবেষণা করত। এতে করে তারা অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ঘটতে পারে এমন ছোট-বড় ঘটনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করত। সে যুগে জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসীরা মনে করত, তারকার নিজস্ব ক্ষমতা আছে। যেমন : 'নাও' নামক একটি তারকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিতে পারে। তারা বলত, আজ 'নাও' দেখা গিয়েছে। তাই বৃষ্টি হয়েছে।[২]

অশুভ লক্ষণ আমলে নেওয়ার একটি রীতিও সে যুগে প্রচলিত ছিল। ব্যাপারটা এমন যে, কোনো কাজ করার আগে তারা পাখি কিংবা হরিণের কাছে গিয়ে সেটিকে ধাওয়া করত। ধাওয়া খেয়ে পাখি বা হরিণটি ডান দিকে গেলে শুভ লক্ষণ আর বাম দিকে গেলে অশুভ লক্ষণ বলে গণ্য করত। এই লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে তারা নির্দিষ্ট কোনো কাজে অগ্রসর হতো আর নয়তো বিরত থাকত। একইভাবে কাজে যাওয়ার পথে কোনো পাখি কিংবা প্রাণী পড়লে তারা একে অশুভ লক্ষণ মনে করত।

তাদের এমন আরও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রীতি হলো—খরগোশের পায়ের গোছা ঝুলিয়ে রাখা; নির্দিষ্ট কিছু দিন, মাস, প্রাণী, পরিস্থিতি ও নারীকে অশুভ মনে করা; সংক্রমণ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা। তারা আরও বিশ্বাস করত, হত্যার প্রতিশোধ না-নেওয়া পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির আত্মা শান্তি পায় না। সে একটি প্যাঁচার রূপ ধারণ করে

---

[১] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৬; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫২-১৫৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৮৪৬; *সহিহ মুসলিম* : ৭১; *সুনানুন নাসায়ি* : ১৮৪৬; *মুআত্তা মালিক* : ৪

পানিশূন্য মরুভূমিতে ‘তৃষ্ণা-তৃষ্ণা’ অথবা ‘পানি-পানি’ বলে চিৎকার করতে থাকে। তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হলেই কেবল সে স্থির হয়, শান্তি পায়।[১]

জাহিলি যুগের মানুষেরা অসংখ্য ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল বটে, তবু তাদের মাঝে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের প্রদীপ নিভু নিভু করে হলেও জ্বলছিল। তারা নবি ইবরাহিমের দ্বীনের বেশ কিছু রীতি আঁকড়ে ধরে ছিল। যেমন : বাইতুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, হজ, উমরা, আরাফা-মুযদালিফায় অবস্থান, কুরবানি ইত্যাদি। তবে হ্যাঁ, এই আমলগুলোকে তারা নানারকম বিদআতে জর্জরিত করে রেখেছিল। কিছু নমুনা উল্লেখ করা যাক—

১. কুরাইশরা বলত, ‘আমরা নবি ইবরাহিমের উত্তরসূরি, হারামের পৃষ্ঠপোষক, বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী, মক্কার অধিবাসী। মর্যাদা ও অধিকারে আমাদের সমপর্যায়ে আর কেউ হতে পারে না, এই মর্যাদা ও অধিকার ফলাতে তারা নিজেদের ‘হুমস’[২] বলত এবং হারাম থেকে বের হয়ে হিল্লে (হারামের সীমানার বাইরে) যাওয়া নিজেদের জন্য অশোভনীয় মনে করত।’ এছাড়া তারা আরাফার ময়দানে অবস্থান করত না, সেখান থেকে ফিরেও আসত না। তারা ফিরত মুযদালিফা থেকে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ... ﴿١٩٩﴾

তারপর সেখান থেকে ফিরে আসো, যেখান থেকে সবাই ফিরে আসে।[৩][৪]

২. তারা বলত, হুমসদের জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পনির ও ঘি-জাতীয় খাবার তৈরি করা উচিত নয়। এছাড়া মুহরিম[৫] থাকাকালে তাদের পশমি তাঁবুতে প্রবেশ করা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৭০৭; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০২; *তুহফাতুল আহওয়াযি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯৫

[২] ‘হুমস’ (حُمْسٌ) শব্দটি ‘আহমাস’ (أَحْمَسُ)-এর বহুবচন। অর্থ—বীর, সাহসী, দৃঢ়চেতা; আবার শক্ত জায়গা, কঠিন ভূমি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের ময়দানে বীর ও সাহসী ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা যেমন সবার ওপরে, তেমনই মক্কার স্থায়ী অধিবাসী, কুরাইশি, হারামের পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি মর্যাদার ভিত্তিতে কুরাইশরা নিজেদের ‘হুমস’ বলত। এছাড়াও তারা নিজেদেরকে ‘কতিনুল্লাহ’ বলত। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘কুরাইশরা নিজেদের قَطِيْنُ اللهِ বা আল্লাহর ঘরের অধিবাসী বলত। হজের সময় হিল্ল বা হারামের সীমানার বাইরে যাওয়া তারা নিজেদের জন্য অসম্মানজনক মনে করত।’ [*জামিউত তিরমিযি* : ৮৮৪]

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৯

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৯; *সহিহুল বুখারি* : ১৬৬৫

[৫] হজ বা উমরার উদ্দেশে যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধে তাকে মুহরিম বলে।

নিষেধ, ছায়ার প্রয়োজন হলে কেবল চামড়ার তাঁবুতেই আশ্রয় নিতে হবে।[১]

৩. হজ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে হিল্ল থেকে হারামে প্রবেশকারীদের জন্য হিল্ল থেকে নিয়ে আসা খাবার খাওয়াও উচিত নয়।[২]

৪. তারা হিল্লবাসীদের প্রথম তাওয়াফ হুমসদের পোশাকে করতে আদেশ করত। তাদের মাঝে পুরুষরা কাপড় না পেলে বিনা পোশাকেই তাওয়াফ করত। আর নারীরা কোনোরকম একখণ্ড কাপড় গায়ে জড়িয়ে তাওয়াফে নেমে পড়ত। এ সময় তারা আবৃত্তি করত—

আজকে লাজের নেইকো বালাই, যাচ্ছে দেখা যাক।
নজর দেওয়া কিন্তু বারণ, যতই খোলা থাক।

এ প্রসঙ্গো আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا بَنِيٓ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴿٣١﴾

হে বনি আদম, প্রত্যেক সিজদা তথা সালাতের সময় তোমরা সজ্জা গ্রহণ করে নাও।[৩]

সম্ভ্রান্ত কোনো নারী বা পুরুষ যদি হিল্ল থেকে নিয়ে আসা কাপড় পরেই তাওয়াফ করে ফেলত, তাহলে ওই কাপড় আর কারও ব্যবহারের সুযোগ থাকত না।[৪]

৫. ইহরামের সময় তারা ঘরের সম্মুখ-দরজা ব্যবহার করত না বরং পেছন দিকের দেওয়াল ফুটো করে সেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করত। এটা তাদের চোখে খুবই উত্তম একটি কাজ। কুরআনুল কারিমে এ বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে।[৫]

সেকালে আরবের অধিকাংশ মানুষের ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাস বলতে প্রচলিত ছিল—শিরক, মূর্তিপূজা, অসংখ্য কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস। এসবের পাশাপাশি আরবের ভূমিতে ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারি ও সাবেয়ি[৬] সম্প্রদায়ের লোকেরাও

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০২

[২] প্রাগুক্ত

[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩১

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০২-২০৩; *সহিহুল বুখারি* : ১৬৬৫

[৫] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৯

[৬] ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার কাফিররা নওমুসলিমদের সাবেয়ি বলত। সাবেয়ি অর্থ স্বধর্ম ত্যাগকারী। এই

জায়গা করে নিয়েছিল।

ইহুদি ধর্ম

জাযিরাতুল আরবে ইহুদি সম্প্রদায়ের অবস্থানকে আমরা দুটি যুগে ভাগ করতে পারি।

[প্রথম যুগ] এ সময় ফিলিস্তিনে ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরিদের আগ্রাসনের ফলে ইহুদিরা সেখান থেকে হিজরত করে। তখন তাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে সম্রাট বুখতুনাসরের নেতৃত্বে এই ঘটনা ঘটে। আগ্রাসনকালে তাদের ঘরবাড়ি ও উপাসনালয় ধ্বংস করা হয়। অধিকাংশ ইহুদিকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় বাবেল শহরে। আর কিছু লোক ফিলিস্তিন ছেড়ে হিজাযের উত্তর প্রান্তে আশ্রয় নেয়।[১]

[দ্বিতীয় যুগ] ৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিতুস রোমানির নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে আগ্রাসন চালানো হয়। তখনো তাদের ওপর চলতে থাকে নির্যাতনের স্টিমরোলার। ধুলোয় মিশে যায় উপাসনালয়গুলো। নিরুপায় হয়ে তাদের বহু গোত্র হিজাযে পাড়ি জমায়। ইয়াসরিব, খাইবার, তাইমা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। সেখানে তারা অনেক গ্রাম, কেল্লা ও দুর্গ গড়ে তোলে। পরবর্তী সময়ে এ সকল মুহাজির ইহুদির কারণেই আরবদের মাঝে ইহুদি ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের শুরুর দিকে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনায় এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। খাইবার,[২] নাজির, মুস্তালিক, কুরাইজা,

---

দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদকেও সাবেয়ি বলা যায়। তবে মূলত কুরআন ও ইতিহাসে সাবেয়ি বলে কাদের বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। যেমন : আবুল আলিয়া, আর-রবি ইবনু আনাস, আস-সুদ্দি, জাবির ইবনু যাইদ, যাহহাক ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াইর মতে, 'সাবেয়ি হলো এমন আহলে কিতাব—যারা জাবুর তিলাওয়াত করত।' কেউ কেউ বলেছেন, 'তারা নুহ আলাইহিস সালামের অনুসারী।'

আবার আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি, তিনি মুআবিয়া ইবনু আব্দিল কারিমের সূত্রে শুনেছেন; হাসান আল-বাসরি বলেছেন, 'যারা ফেরেশতার ইবাদত করে, তারা সাবেয়ি।' ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'তারা তাওহিদে বিশ্বাসী, তবে তাদের কাছে কোনো শরিয়ত নেই—যার ভিত্তিতে তারা আমল করবে।'

ইবনু কাসির বলেন, 'তাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। তবে মুজাহিদ ও তার মতানুসারী এবং ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বির ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, সাবেয়ি এমন সম্প্রদায়—যারা ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারি বা মুশরিক নয়; বরং তারা এমন সম্প্রদায়—যারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তবে তাদের কাছে এমন কোনো শরিয়ত নেই, যার অনুসরণ তারা করবে। এজন্যই মক্কার মুশরিকরা কেউ মুসলিম হলে তাকে সাবেয়ি বলত। অর্থাৎ সে দুনিয়ার সকল ধর্ম ত্যাগ করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন। [*তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭১; দারুল কুরআনিল কারিম, বৈরুত]

[১] *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ১৫১

[২] খাইবার কোনো ইহুদি গোত্রের নাম নয়। এটি একটি উপত্যকা। যা মদিনা থেকে ৯৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। মাটির উর্বরতার কারণে বা দুর্গ ও বাগানে সজ্জিত হওয়ায় হিব্রু ভাষায় তা খায়াবর বলা হতো। সেখান থেকেই খাইবার শব্দটি এসেছে। কেউ কেউ বলেছে, আমালিকা সম্প্রদায়ের খাইবার ইবনু কানিয়ার

কাইনুকা সে সময়কার প্রসিদ্ধ ইহুদি গোত্র। আল্লামা সামহুদি[১] সে সময় ইহুদিরা ২০টিরও বেশি গোত্রে বিভক্ত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

বাদশাহ তুব্বান আসআদ আবু কারবের[৩] পৃষ্ঠপোষকতায় ইয়েমেনে ইহুদি ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটে। ইয়াসরিবে যুদ্ধ করতে এসে ইহুদি ধর্ম তার খুব মনে ধরে। তখন বনু কুরাইজার দুজন ইহুদি পাদরিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। এভাবেই ইয়েমেনে ইহুদি ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়।

তার অবর্তমানে ক্ষমতায় আসে তারই পুত্র ইউসুফ জু-নুওয়াস। সে নাজরানি খ্রিষ্টানদের ওপর হামলা চালায়; তাদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করে। কিন্তু তারা সে আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণে সবাইকে গর্তে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারে। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ কাউকেই ছাড় দেয়নি সে। জানা যায়, নিহতের সংখ্যা ছিল ২০ থেকে ৪০ হাজার। ৫২৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে[৪] যার সামান্য অংশ সুরা বুরুজেও উল্লেখ করা হয়েছে।

খ্রিষ্টধর্ম

আরবে খ্রিষ্টধর্ম প্রবেশ করে হাবশি ও রোমানদের আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে। ইয়েমেনে হাবশিদের প্রথম আগ্রাসন ছিল ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে, যা ৩৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। সেই সময়েই ইয়েমেনে খ্রিষ্টধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর কাছাকাছি সময় নাজরানে ফাইমায়ুন নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার থেকে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। নাজরানবাসীকে সে খ্রিষ্টধর্মের দাওয়াত দেয়। তারা তার সততা এবং তার ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরে দলে দলে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে।[৫]

হাবশিদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইয়েমেন থেকে জু-নুওয়াসের নাম-নিশানা মুছে যায়; ক্ষমতায় আরোহণ করে বাদশাহ আবরাহা। সে পরিপূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহের সাথে খ্রিষ্টধর্মের প্রচার-প্রসার শুরু করে। একপর্যায়ে অতি-উৎসাহী হয়ে পড়লে ইয়েমেনে

নামানুসারে এর নাম রাখা হয়। তিনি সফরের সময় সেখানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। লেখক এখানে খাইবার বলতে মূলত সেখানে বসবাসরত বিভিন্ন ইহুদি গোত্রকে বুঝিয়েছেন। [*মুজামুল বুলদান*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৯-৪১০; দারু সাদি, বৈরুত]

[১] *ওয়াফাউল ওয়াফা*, সামহুদি, পৃষ্ঠা : ১১৬

[২] প্রাগুক্ত

[৩] তার রাজত্বকাল ছিল, ৩৭৮-৪৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

[৪] *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৯৭-২৯৮; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০-৩৬

[৫] বিস্তারিত দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১-৩৪

এক বিশেষ গির্জা নির্মাণ করে, যার নাম দেয় 'আল-কাবাতুল ইয়ামানিইয়া'। শুধু তা-ই নয়, সে আরব হাজিদের ইয়েমেন-অভিমুখী করার লক্ষ্যে বাইতুল্লাহ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে উচিত শিক্ষা দেন।

রোমানদের সংস্পর্শে থাকার কারণে আরবের গাসসানি, তাগলিব, তাঈ-সহ প্রভৃতি গোত্র ও সম্প্রদায় খ্রিষ্টধর্মের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি হিরার কয়েকজন বাদশাহও এই ধর্ম গ্রহণ করে।

অগ্নিপূজারি সম্প্রদায়

পারস্যের আশপাশের আরব দেশগুলোতে আগুন উপাসনার এই ধর্ম বেশি বিস্তার লাভ করে। সে সময় ইরাক, বাহরাইন (আহসা), হিজর এবং এর পার্শ্ববর্তী উপসাগরের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে বহু অগ্নিপূজারি বাস করত। পারসিকদের আগ্রাসন চলাকালেও ইয়েমেনের অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করে।

সাবেয়ি সম্প্রদায়

ইরাক ও অন্যান্য দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের অনুসারী কালদানি গোত্রই পরবর্তীকালের সাবেয়ি সম্প্রদায়। সিরিয়ার অনেক মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করে। ইয়েমেনেও এই ধর্মের প্রচলন ছিল। এরপর একসময় ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এতে সাবেয়ি সম্প্রদায়ের ভিত অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না একেবারে; বরং অগ্নিপূজকদের সঙ্গে মিশে কিংবা তাদের প্রতিবেশী হয়ে ইরাকের আরব ও আরব উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে টিকে থাকে যুগ যুগ ধরে।[১]

নানা ধর্মের সমাহার

ইসলামের আগমনকালে এই ছিল আরবদের ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস। বস্তুত সবগুলো ধর্মই তখন ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে। মুশরিকদের অবস্থা এমন যে, তারা নিজেদের ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারী দাবি করলেও; তার ধর্মের আদেশ-নিষেধ ও বিধিবিধান থেকে ছিল বহু দূরে। চারদিক আচ্ছন্ন অন্যায় ও পাপাচারে। কালের আবর্তনে মূর্তিপূজকদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় কুসংস্কার জায়গা করে নিয়েছে তাদের মাঝে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

ইহুদি ধর্ম কপটতা ও স্বেচ্ছাচারিতার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। নেতৃস্থানীয়রা ধর্মপ্রণেতা

---

[১] *তারিখু আরদিল কুরআন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৩-২০৮

হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জনসাধারণের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণের হিসেব নিত তারা। তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সম্পদ উপার্জন। ফলে তাতে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যায়, কুফরি ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহপ্রদত্ত বিধানের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শনের হিড়িক পড়ে চারদিকে।

খ্রিষ্টধর্মেও মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটতে শুরু করে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে এক অভূতপূর্ব মিশ্র ধারণা লক্ষ করা যায়। আরবের যেসব লোক এ ধর্মের অনুসরণ করত, তাদের মধ্যে এর কোনো ইতিবাচক প্রভাবই বিদ্যমান ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা এবং তাদের জীবনব্যবস্থার মাঝে তখন বিস্তর ফারাক। চাইলেও সে জীবনধারা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।

আরবের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর অবস্থা বলতে গেলে মুশরিকদের মতোই। কারণ ধর্মের নামগত ভিন্নতা বাদ দিলে ভেতরে ও বাইরে এবং চিন্তা ও আচরণে তারা সবাই একই রকম। এই একাত্মতার প্রভাব তাদের বিশ্বাস ও জীবনাচারেও পড়েছিল সমানভাবে।

জাহিলি যুগের আরব সমাজ

জাযিরাতুল আরবের রাজনৈতিক ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কথা হলো। এখন আমরা সেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়াবলি সংক্ষেপে তুলে ধরব।

সামাজিক অবস্থা

জাহিলি যুগে আরবের অধিবাসীরা ছিল বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণির জীবনযাপনের পদ্ধতি ও রীতিনীতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—সম্ভ্রান্ত শ্রেণির লোকদের সাথে তাদের স্ত্রীদের সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো। তাদের স্ত্রীরা নিজেদের ইচ্ছা ও আবদার জানানো এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা পেত। তারা এতটাই সম্মানিতা ও সুরক্ষিতা ছিল যে, তাদের এক ইশারায় যুদ্ধ বেধে যেত, রক্তের বন্যা বয়ে যেত। আরবদের দৃষ্টিতে কোনো পুরুষের সম্মান, মর্যাদা ও সাহসিকতার প্রশংসা করতে গেলে বেশিরভাগ সময়ই নারীদের প্রসঙ্গ চলে আসত। কখনো কখনো নারীদের চাওয়াতেই একাধিক গোত্রের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হতো। আবার কখনো তাদের কথাতেই যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। এতকিছুর পরও সে সময়কার পরিবারগুলো ছিল পুরুষপ্রধান। পুরুষ অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানেই তখন বৈবাহিক সূত্রে পুরুষদের সাথে নারীদের সম্পর্ক স্থাপিত হতো। এক্ষেত্রে কোনো নারীর দ্বিমত পোষণের অধিকার ছিল না।

এটা সম্ভ্রান্ত শ্রেণির অবস্থা। তবে আরও একটি শ্রেণি দেখা যেত, যাদের কাছে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ছিল খুবই স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক একটি ব্যাপার। তাদের এই বাধাহীন সম্পর্ককে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদর্যতা ছাড়া অন্য কোনো শব্দে

সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, জাহিলি যুগে ৪ ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল—

১. আমাদের এ যুগের বিয়ের মতো। অর্থাৎ কোনো পুরুষ কোনো নারীর অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেত, তারপর মোহর আদায়ের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন হতো।

২. কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিত যে, ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর সে যেন অমুক পুরুষের সান্নিধ্যে চলে যায় এবং তার মাধ্যমে গর্ভধারণ করে। এরপর ওই লোকের দ্বারা গর্ভধারণের বিষয়টি নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত সে তার স্ত্রী থেকে দূরে থাকত। গর্ভের আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর ইচ্ছে হলে স্ত্রীর কাছে যেত। উঁচু বংশের সঙ্গে নিজ বংশকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই জঘন্য কাজটি তারা করত। এই প্রকারের বিয়েকে বলা হতো গর্ভসঞ্চার-বিবাহ।

৩. ৮-৯ জন পুরুষ একত্রিত হয়ে প্রত্যেকে একই নারীর সঙ্গে মিলিত হতো। এতে ওই নারী গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দিত। এর কিছুদিন পর সে তাদের সবাইকে ডেকে এনে বলত, তোমরা যা করেছ, তা সবাই জানে। এরপর সেই নারী ইচ্ছেমতো তাদের মধ্য থেকে একজনকে সন্তানের পিতা হিসেবে বেছে নিত। এভাবে নিজের সন্তানের বংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীরা ছিল পুরোপুরি স্বাধীন।

৪. অগণিত পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে মিলিত হতো। কাউকেই সে বাধা দিত না। সহজ কথায় যাকে বলে ব্যভিচার। এরা নিজেদের ঘরের সামনে পতাকা টাঙিয়ে রাখত, যাতে খদ্দেররা তাদের চিনতে পারে। এ ধরনের নারীরা সন্তান জন্ম দিলে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে—এমন সব পুরুষ একত্রিত হয়ে গণকদের ডেকে আনত। এরপর তারা ওই নারীর সন্তানকে যার সাথে ইচ্ছা যুক্ত করে দিত। লোকটাও বাচ্চাকে নিয়ে যেত এবং তার পরিচয়ে বড় হতো। এই কুরুচিপূর্ণ জঘন্য কাজটিকে কেউ খারাপ চোখে দেখত না।

নবিজির আগমনের পর বর্তমান যুগের ইসলামি বিবাহ ব্যতীত জাহিলি যুগের সকল বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[১]

উল্লেখিত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও 'বর্শার ফলা' নামে আরেকটি পদ্ধতিতে তারা নারীদের সঙ্গে মিলিত হতো। অর্থাৎ যুদ্ধে বিজয়ী গোত্র পরাজিত গোত্রের নারীদের বন্দি করে নিয়ে আসত এবং তাদের সাথে মিলিত হতো। কিন্তু এ ধরনের মিলনে জন্ম নেওয়া সন্তানদের আজীবন মাথা নিচু করে থাকতে হতো, তাদের কোনো পিতৃপরিচয় থাকত না।

জাহিলি যুগের আরও একটি প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, পুরুষরা যতবার ইচ্ছা বিয়ে করতে পারত। বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। একসাথে আপন দুইবোনকেও

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুন নিকাহ, জাহিলি যুগের বিবাহ-অধ্যায়, হাদিস : ২২৭২; হাদিসটি সহিহ।

বিয়ে করত তারা।[১] এমনকি বাবার মৃত্যুর পর সৎমাকে বিয়ে করা অথবা বাবার সাথে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে, এমন কোনো নারীর সাথে ঘরসংসার করা তখনকার সময়ে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য হতো।[২] অর্থাৎ কেউ এটাকে খারাপ চোখে দেখত না। স্ত্রীদের তারা হাজারবার তালাক দিতে পারত। এরপর কোনো নিয়মের তোয়াক্কা না করে তার সাথেই আবার একই ছাদের নিচে বসবাস করে যেত।[৩]

বস্তুত, যিনা-ব্যভিচার তখন সব শ্রেণির লোকদের মাঝেই দেখা যেত। এক শ্রেণিকে অভিযুক্ত করে আরেক শ্রেণিকে মুক্ত বলার সুযোগ ছিল না তখন। তবে হ্যাঁ, সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী ও পুরুষেরা এসব মন্দ কাজ থেকে নিজেদের পবিত্র রাখত এবং স্বাধীন নারীরা তুলনামূলকভাবে দাসীদের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকত। দাসীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। জাহিলি যুগের অধিকাংশ মানুষ দাসীদের সাথে যিনায় লিপ্ত হওয়াকে সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করত। এই ধরনের দোষে দোষী হওয়াকে আমলেই নিত না তারা।

ইমাম আবু দাউদ তার *সুনান* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একবার এক লোক এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসুল, অমুক তো আমার সন্তান। আমি জাহিলি যুগে তার মায়ের সাথে মিলিত হয়েছিলাম।' তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ইসলামে এরকম দাবির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। জাহিলি যুগের কিছুই এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়। নারী যার অধীনে, সন্তানও তারই। আর ব্যভিচারীর শাস্তি প্রস্তর-নিক্ষেপ।[৪]

---

[১] জাহিলি যুগে একজন পুরুষের কাছে একসাথে দুই বোনের বিয়ের প্রচলন ছিল। ইসলাম এসে এটাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বোনদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য ইসলাম বহাল রাখতে চায়। তাই দুই বোনকে একসাথে এক পাত্রে বিয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কেননা তারা সতিন হলে তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা আর বজায় থাকবে না। [এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সমকালীন প্রকাশনের *হালাল-হারামের বিধান* বইটি দেখুন]

[২] বাবা মারা গেলে বা তালাক দিলেও বাবার স্ত্রী তথা সৎমাকে বিয়ে করা ছেলের জন্য বৈধ নয়। জাহিলি যুগে এই ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইসলামে এই বিয়ের অনুমোদন নেই। কারণ কোনো নারী বাবার বিবাহ-বন্ধনে আসার অর্থ হলো, তিনি সন্তানের মা হয়ে যান। বাবার সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার্থে এই নারী সন্তানের জন্য চিরদিনের মতো হারাম; যাতে তাদের পরস্পরে যৌনসম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার বাসনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এর ফলে তাদের (সন্তান ও সৎমায়ের) মধ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি হবে। [এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সমকালীন প্রকাশনের *হালাল-হারামের বিধান* বইটি দেখুন]

[৩] বিস্তারিত জানতে, সুরা নিসার ২২ও ২৩ নং আয়াত এবং এ-দুটি আয়াতের তাফসির দেখুন।

[৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ২২৭৪; হাদিসটি হাসান সহিহ।

এ প্রসঙ্গে যামআর দাসীর এক সন্তান—আব্দুর রহমান ইবনু যামআকে নিয়ে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ও আবদ ইবনু যামআর বিবাদের ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ।[১]

বিভিন্ন রকম পিতৃ-পরিচয়ের প্রচলন ছিল তখনকার সমাজে। তাদের কেউ কেউ বলত—

কলিজার ধন সন্তানেরা থাকে যেন ভালো।

জগৎজুড়ে ছড়াক তারা আমার বংশের আলো।

তাদের কেউ কেউ লোকলজ্জার ভয়ে নিজের কন্যা সন্তানকে পুঁতে ফেলত। অভাবের কারণে পুত্রসন্তান হত্যার ঘটনাও ঘটত।[২] তবে এটা অতি সাধারণ চিত্র হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ নেই। কারণ শত্রুকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে বংশবৃদ্ধি তাদের জন্য যারপরনাই জরুরি ছিল।

পরিবার, প্রতিবেশী ও গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তাদের ধন-প্রাণ ছিল উৎসর্গিত। সহজ কথায়, গোত্রপ্রীতি, আত্মীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতার ওপর ভর করেই তখন টিকে থাকত সমাজ ও সমাজব্যবস্থা। انصر أخاك ظالما أو مظلوما (তোমার ভাইকে সাহায্য করো, হোক সে জালিম কিংবা মজলুম)—এই প্রবাদটি তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলত। এর যে ইসলামি ব্যাখ্যা অর্থাৎ অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখা—এ কথাটি তখন প্রযোজ্য ছিল না। তবে হ্যাঁ, একই পুরুষের উত্তরসূরিরা নিজেদের মাঝে সম্মান-মর্যাদা নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়াও ছিল নিত্যদিনের ঘটনা, যা কখনো কখনো যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াত। যেমনটি পাওয়া যায় আউস-খাযরাজ, আবস-জুবিয়ান, বকর-তাগলিব ইত্যাদি গোত্রসমূহের মাঝে।

এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের কোনো সম্পর্কই সে যুগে বিদ্যমান ছিল না। তাদের

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২২৭৩; হাদিসটি সহিহ। ঘটনাটি ছিল, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের ভাই উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস জাহিলি যুগে যামআর দাসীর সাথে যিনা করেছিল। তাতে ওই দাসী গর্ভবতী হয় এবং একটি পুত্রসন্তান জন্ম দেয়। মৃত্যুর পূর্বে সে সাদকে অসিয়ত করে যায়—যেন তার সন্তান ফিরিয়ে নিয়ে আসে। মক্কাবিজয়ের পর সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস যামআর ওই দাসীর সন্তানকে নিজের ভাইয়ের সন্তান বলে দাবি করেন। যেহেতু যামআ মারা গিয়েছিল, তাই তার ছেলে আবদ ইবনু যামআকে বলেন ওই বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিতে। আবদ অস্বীকার করলে বিচার যায় নবিজির দরবারে। তিনি ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিচার করেন। বলেন, 'ওই বাচ্চা যামআর। হে আবদ ইবনু যামআ, ওই বাচ্চা তোমার ভাই। ওকে তোমার বাবার দিকে সম্বোধন করবে।' আর সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে বলেন, 'বিছানা যার, সন্তান তার আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (অর্থাৎ পাথর-নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা)।' [*মুয়াত্তা মালিক* : ২০; রিওয়ায়েত ইয়াহইয়া]

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ১৫১; সুরা নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯; সুরা ইসরা, আয়াত : ৩১; সুরা তাকভির, আয়াত : ৮

যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা ব্যয় হতো যুদ্ধের পথে, যদিও ধর্ম ও কুসংস্কারের মিশ্রণে সৃষ্ট কিছু রীতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের এই ভীতি ও শঙ্কাকে কিছুটা হালকা করতে পারত। কখনো-বা আনুগত্য স্বীকার, সন্ধিস্থাপন আর মৈত্রীচুক্তির মাধ্যমেও একাধিক গোত্রের সহাবস্থানের সুযোগ তৈরি হতো। হারাম তথা পবিত্র মাসগুলো তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য ছিল বিশেষ স্বস্তি ও আশীর্বাদস্বরূপ।

মোটকথা, তাদের সমাজব্যবস্থা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। মূর্খতা ও অজ্ঞতা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার তখন নিত্যদিনের সঙ্গী। মানুষের জীবনযাপন ছিল নিতান্তই পশুর মতো। নারীদের পণ্যদ্রব্যের মতো বেচাকেনা করা হতো। মানবিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুবই তুচ্ছ। শাসকদের প্রধান 'দায়িত্ব' শাসিতদের সম্পদ দিয়ে ধনভান্ডার পূর্ণ করা কিংবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা।

অর্থনৈতিক অবস্থা

তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন অনেকটা সামাজিক পরিস্থিতির মতো। আরবের জীবনব্যবস্থার দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ব্যবসা-বাণিজ্য। নিরাপত্তা ছাড়া বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো চলতে পারত না। আর জাযিরাতুল আরবে হারাম মাসের বাইরে নিরাপত্তা ছিল অমাবস্যার চাঁদের মতো। উকাজ, জুল-মাজায, মাজান্নাহর মতো আরবের প্রসিদ্ধ হাট-বাজার ও মেলাগুলো এ মাসগুলোতেই বসত।

শিল্পকর্ম থেকে আরবরা তখন বলতে গেলে যোজন যোজন দূরে। কাপড় বুনন ও চামড়া পাকাকরণের যে পেশায় আরবরা নিয়োজিত, তাদের অধিকাংশই ছিল ইয়েমেন, হিরা ও সিরিয়ার অধিবাসী। তবে হ্যাঁ, জাযিরা-অভ্যন্তরে চাষাবাদ ও পশুপালনের প্রচলন দেখা যেত। তাদের নারীরা সুতা কাটায় ভীষণ পারদর্শী। কিন্তু আফসোস, তাদের সকল উপার্জন যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে যেত। এজন্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অভাব কখনোই পিছু ছাড়ত না তাদের।

চারিত্রিক অবস্থা

অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, জাহিলি যুগে মানুষের মাঝে অসংখ্য মন্দ, নিকৃষ্ট এবং রুচিবিরুদ্ধ স্বভাব লক্ষ করা যেত। পাশাপাশি এটিও সত্য, তারা এমন অনেক উত্তম ও প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত ছিল, যা মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করত। তেমনই কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে তুলে ধরা হলো—

১. **মহানুভবতা ও দানশীলতা :** দান-সাদাকার ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ভেতর সবসময়

প্রতিযোগিতা করে বেড়াত। অপরের সামনে আত্মগর্ব করত সাড়ম্বরে। তাদের বহু কবিতা রচিত হয়েছে বদান্যতার স্তুতি গেয়ে।

ধরা যাক, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের সময় তাদের কারও ঘরে হঠাৎ মেহমান এসে হাজির। এ সময় তাদের সম্বল বলতে আছে একটিমাত্র উটনী। এরপরও স্বভাবজাত উদারতা ও দানশীলতার কারণে তারা মেহমানকে আপ্যায়ন করার এত বেশি তাড়না অনুভব করত যে, তাদের একমাত্র পশুকে জবাই করতেও পিছপা হতো না কখনো! এমনই ছিল তাদের বদান্যতার নমুনা।

সে সময় আরবের লোকেরা দু-হাত ভরে অর্থসম্পদ খরচ করত। এটা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে তাদের রক্তপণে আগ্রহ এবং মোটা অঙ্কের জরিমানা আদায়ের ঘটনাগুলো থেকে। বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি ঢেলে তারা রক্তপাত ও মানবহত্যা থেকে দূরে থাকত এবং প্রতিপক্ষের নেতা ও সর্দারের সামনে এসব কথা গর্বের সাথে প্রচার করে বেড়াত।

আরবদের মহানুভবতার আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মদ ও জুয়ার আসরে টাকা ওড়ানো। হ্যাঁ, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এগুলো বেশ নিন্দনীয়, জঘন্য ও গুনাহের কাজ। কিন্তু তৎকালীন আরব সমাজে মদ্যপান ও জুয়া খেলা সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসেবে গণ্য হতো। তাছাড়া অধিক পরিমাণে মদ বিক্রির মধ্য দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতো মদ-ব্যবসায়ীরা। এভাবে তারা তাদের পারিবারিক দৈন্যদশা দূর করতে পারত। ওদিকে জুয়া খেলা থেকে যা আয় হতো তার পুরোটা কিংবা বৃহৎ একটি অংশ ব্যয় হতো সমাজের দরিদ্র মানুষগুলোর ভাগ্য-উন্নয়নে। আরবের লোকেরা এ কারণেই মদ্যপান ও জুয়া খেলা দান-সাদাকার মাধ্যম মনে করত। শুধু তা-ই নয়, মদ্যপানকে তারা এতটাই ভালোবাসত যে, আঙুর থেকে মদ তৈরি হয় বলে আঙুর গাছকে তারা বলত 'শাজারুল কারাম' বা বদান্যতার বটবৃক্ষ। আর আঙুরের মদকে বলত 'বিনতুল কারাম' বা বদান্যতার রাজকন্যা। এ কারণেই দেখা যায়, কুরআন মদ ও জুয়ার উপকার একদম অস্বীকার করেনি বরং বলেছে—

...وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا... ﴿٢١٩﴾

লাভের তুলনায় এসবের ক্ষতি অনেক বেশি।[১]

জাহিলি যুগের কাব্যগ্রন্থগুলো খুললে তাতে প্রশংসা ও আত্মগর্বের আলাদা অধ্যায়ই পাওয়া যায়। আনতারা ইবনু শাদ্দাদ তার ঝুলন্ত গীতিকায় বলেন—

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৯

পড়ন্ত বেলায় সোনার পেয়ালায় করি যবে মদ্যপান,
ঘোরের মধ্যে অকাতরে আমি কাতরদের করি দান।
মাতাল হলেও ভুলি না আমি বংশীয় মর্যাদা,
ঘোর কেটে গেলেও তাই দান করি সর্বদা।
নিজের ব্যাপারে কী বলব আর; সবাই তো সব জানে
আমি তো সদাই ব্যস্ত থাকি দানের আহ্বানে।

মূলত দানশীলতা ও মহানুভবতার কারণেই আরবের লোকেরা মদ ও জুয়ায় মত্ত থাকত। কারণ তাদের মতে, এটাও ছিল ব্যয়ের বিশেষ একটি পন্থা।

২. সর্বাবস্থায় ওয়াদা রক্ষা : ওয়াদা রক্ষা করা ছিল তাদের কাছে ঋণ আদায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এজন্য তারা নিজেদের সন্তান কুরবানি থেকে শুরু করে বাড়িঘর পর্যন্ত ধ্বংস করে দিত! এক্ষেত্রে হানি ইবনু মাসউদ শাইবানি, সামাওয়ালা ইবনু আদিয়া ও হাজিব ইবনু যারারা আত-তামিমির ঘটনা জানাই যথেষ্ট।[১]

৩. অতিশয় আত্মমর্যাদাবোধ : আত্মমর্যাদাবোধের ফলে তাদের মাঝে প্রচণ্ড সাহসিকতা, প্রবল আত্মসম্মান ও দ্রুত উত্তেজিত হওয়ার মতো বিষয়গুলো লক্ষ করা যায়। তুচ্ছতাচ্ছিল্যের লেশ রয়েছে, এমন কথা শোনামাত্রই তারা তরবারি কোষমুক্ত করত, যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দিত! এসব ক্ষেত্রে তারা জীবন বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করত না।

৪. দৃঢ়তা ও অবিচলতা : সম্মান-মর্যাদার সম্পৃক্ততা রয়েছে, এমন বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার পর কোনো কিছুই আর তা থেকে তাদের ফেরাতে পারত না। কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না।

৫. পাহাড়সম সহনশীলতা : সহনশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা নিয়ে যদিও তাদের মাঝে আত্মপ্রশংসার প্রচলন দেখা যেত, কিন্তু অতিমাত্রার সাহসিকতা এবং দ্রুত যুদ্ধের দিকে ধাবিত হওয়ার মানসিকতার কারণে তা যেন প্রায় অস্তিত্বহীন।

৬. সাদামাটা জীবনযাপন : তারা খুবই সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। শহুরে

---

[১] হানি ইবনু মাসউদ শাইবানির ঘটনা জানতে দেখুন—*আল-আলাম,* যিরিকলি, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬৯; দারুল ইলমি লিল-মালাইন।

সামাওয়াল ইবনু আদিয়ার ঘটনা জানতে দেখুন—*আল-কামিল,* ইবনুল আসির, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৭-৪৬৮।

হাজিব ইবনু যারারার ঘটনা জানতে দেখুন—*আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪১৯; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত। *আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কবলাল ইসলাম,* খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩১৩; দারুস সাকি।

চাকচিক্য ও চাতুর্যময় জীবন যেন তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এজন্য তাদের মাঝে সত্যতা ও সততার চর্চা দেখা যেত। ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিত না কেউ।

সর্বোপরি দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বের তুলনায় জাযিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং আরবদের মাঝে বিদ্যমান উত্তম গুণাবলির কারণেই সর্বজনীন পয়গামের জিম্মাদারি-পালন এবং মানবজাতি ও মানবসমাজের নেতৃত্ব দানের জন্য তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ যদিও তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য খারাপ ছিল, তবে সামগ্রিকভাবে তারা ছিল উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের সমস্যাটুকু দূর করা গেলে মানবসমাজের জন্য তা ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনতে পারত, ঠিক সেই কাজটিই সম্পন্ন করেছে ইসলাম।

প্রতিশ্রুতি পূরণের পর সম্ভবত তাদের চারিত্রিক গুণাবলির মাঝে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল—আত্মমর্যাদাবোধ ও সিদ্ধান্তের ওপর অবিচলতা। তা না হলে হয়তো অনিষ্ট ও অকল্যাণ দূর করে ইনসাফ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে, এমন সক্ষমতা ও দৃঢ়তার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখিত গুণগুলো ছাড়া আরও অনেক গুণে তারা গুণান্বিত। তবে এখানে সবগুলো উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

নবিজির বংশধারা ও পরিবার

বংশধারা

নবিজির বংশধারা ৩টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে নবিজি থেকে আদনান পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে, এর ওপর ইতিহাসবিদ ও বংশধারা-বিশেষজ্ঞদের সহমত লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হয়েছে আদনান থেকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত, এর কিছু অংশ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কারও মতে, এ অংশ বর্ণনা করা যাবে; আবার কারও মতে, বর্ণনা না করাই ভালো। আর তৃতীয় ভাগে আছে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত। এটা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। বংশধারা নিয়ে পূর্বে সামান্য কিছু আলোচনা হয়েছে। এবার এই তিন স্তরের বিস্তারিত দেখা যাক।

[প্রথমাংশ] মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব[১] ইবনি হাশিম[২] ইবনি আব্দি মানাফ[৩] ইবনি কুসাই[৪] ইবনি কিলাব ইবনি মুররা ইবনি কাব ইবনি লুয়াই ইবনি গালিব ইবনি ফিহর[৫] ইবনি মালিক ইবনি নজর ইবনি কিনানা ইবনি খুযাইমা ইবনি

---

[১] প্রকৃত নাম শাইবা।

[২] প্রকৃত নাম আমর।

[৩] প্রকৃত নাম মুগিরা।

[৪] প্রকৃত নাম যাইদ।

[৫] তার উপাধি ছিল কুরাইশ এবং তার দিকেই পুরো গোত্রকে সম্পৃক্ত করা হয়।

মুদরিকা[১] ইবনি ইলিয়াস ইবনি মুদার ইবনি নিযার ইবনি মাআদ ইবনি আদনান।[২]

[দ্বিতীয়াংশ] আদনানের উর্ধ্বতন পুরুষগণ। আদনান ইবনু উদাদ ইবনি হামাইসা ইবনি সালামান ইবনি আউস ইবনি বুয ইবনি কামওয়াল ইবনি উবাই ইবনি আওয়াম ইবনি নাশিদ ইবনি হাযা ইবনি বালদাস ইবনি ইয়াদলাফ[৩] ইবনি তাবিখ ইবনি জাহিম ইবনি নাহিশ ইবনি মাখি ইবনি আইদ[৪] ইবনি আবকার ইবনি উবাইদ ইবনিদ দাআ ইবনি হামদান ইবনি সানবার ইবনি ইয়াসরিবি ইবনি ইয়াহযান[৫] ইবনি ইয়ালহান ইবনি আরআবি ইবনি আইদ[৬] ইবনি দাইশান ইবনি আইসার ইবনি আফনাদ ইবনি আইহাম[৭] ইবনি মিকসার[৮] ইবনি নাহিস ইবনি যারিহ ইবনি সুম্মিইয়ি ইবনি মাযা ইবনি আওদা[৯] ইবনি ইরাম ইবনি কাইদার[১০] ইবনি ইসমাইল ইবনি ইবরাহিম আলাইহিমাস সালাম।[১১]

---

[১] প্রকৃত নাম আমির।

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১-২; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৫-৬; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১-১৪, ৫২

[৩] *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে ইবনু সাদ 'তা'-র পরিবর্তে 'ইয়া' অর্থাৎ 'ইয়াদলাফে'র পরিবর্তে 'তাদলাফ' লিখেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৪] ইবনু সাদ 'মাখি'র পিতার নাম 'আবকা' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৫] *আত-তাবাকাতুল কুবরায়* ইবনু সাদ 'ইয়া'র পরিবর্তে 'নুন' অর্থাৎ 'ইয়াহযান'-এর পরিবর্তে 'নাহযান' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৬] ইবনু সাদ 'আরআবি'-র পিতার নাম 'আইফা' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৭] *আত-তাবাকাতুল কুবরায়* ইবনু সাদ 'ইয়া'র পরিবর্তে 'বা' অর্থাৎ 'আইহামে'র পরিবর্তে 'আবহাম' লিখেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৮] ইবনু সাদ 'আইহাম বা আবহামের' পিতার নাম 'মাকসি' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৯] ইবনু সাদ 'মাযা'র পিতার নাম 'আউস' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[১০] ইবনু সাদ ও ইবনু আসাকির 'দালে'র পরিবর্তে 'যাল' অর্থাৎ 'কাইদার'র পরিবর্তে 'কাইযার' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭, ৫৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত; *তারিখু দিমাশক,* ইবনু আসাকির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা: ৬০; দারুল ফিকর লিত্-তবা ওয়ান নাশর]

[১১] আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরি কালবির বর্ণনায় নবিজির বংশধারার এই অংশ উল্লেখ করেছেন এবং

[তৃতীয়াংশ] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ। ইবরাহিম ইবনু তারিহ[১] ইবনি নাহুর ইবনি সারুআ বা সারুগ ইবনি রাউ ইবনি ফালিখ ইবনি আবির ইবনি শালিখ ইবনি আরফাখশাদ ইবনি সাম ইবনি নুহ আলাইহিস সালাম ইবনি লামিক ইবনি মুতাওশলিখ ইবনি আখনুখ[২] ইবনি ইয়ারিদ[৩] ইবনি মাহলাইল ইবনি কাইনান ইবনি আনুশা ইবনি শিস ইবনি আদম আলাইহিমাস সালাম।[৪]

পরিবার

নবিজির পরিবার তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ হাশিম ইবনু আব্দি মানাফের নামানুসারে 'হাশিমি পরিবার' হিসেবে পরিচিত। তাই হাশিম এবং তার পরবর্তী কয়েকজনের কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরছি—

[হাশিম] আমরা জানি, কাবা ও হজ-সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব নিয়ে বনু আব্দি মানাফ ও বনু আব্দিদ দারের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হলে হাজিদের পান ও আপ্যায়নের দায়িত্ব আসে হাশিমের ভাগে। তিনি ছিলেন যথেষ্ট সম্পদশালী, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। মক্কায় তিনিই প্রথম হাজিদের সারিদ দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার প্রকৃত নাম ছিল আমর। হাশিম অর্থ চূর্ণকারী। সারিদ তৈরি করতে গিয়ে রুটি চূর্ণ করতে হয়। সেখান থেকেই তার নাম হয়ে যায় হাশিম। কুরাইশদের জন্য তিনিই প্রথম দুটি সফরের প্রচলন করেন। একটি শীতের, অপরটি গ্রীষ্মের। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন—

হাজিদের জন্য করেন যিনি রুটি-ঝোলের এন্তেজাম,
মক্কাবাসী সকলের প্রিয়ভাজন আমর তাহার নাম।
সবার জন্য অবারিত তিনি, ছিল না আপন-পর,
তার হাত ধরে মক্কায় এল শীত ও গ্রীষ্মের দুটি সফর।

হাশিমের জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি একবার সিরিয়ার উদ্দেশে বাণিজ্যিক সফরে

ইবনু সাদও বিশ্লেষণের পর উল্লেখ করেছেন। দেখুন, *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪-১৭। ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এ নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

[১] কুরআনে তাকে আযার বলা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এটা তার উপাধি।

[২] বলা হয়, তিনিই ইদরিস আলাইহিস সালাম।

[৩] ইবনু সাদ 'দালে'র পরিবর্তে 'যাল' অর্থাৎ 'ইয়ারিদে'র পরিবর্তে 'ইয়ারিয' উল্লেখ করেছেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৯; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২-৪; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল-আসার,* পৃষ্ঠা : ৬; *খুলাসাতুস-সিরাহ,* ইমাম তাবারি, পৃষ্ঠা : ৬; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮; উৎসগ্রন্থগুলোতে নামের উচ্চারণে অনেক দ্বিমত দেখা যায়। এমনকি অনেক নাম বাদও পড়েছে।

বের হন। মদিনায় পৌঁছে বিয়ে করেন সালমা বিনতু আমরকে। আমর ছিলেন আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য। হাশিম সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। স্ত্রীকে রেখে যান তার পরিবারের কাছেই। আব্দুল মুত্তালিব তখনই তার গর্ভে আসে। ওদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় মৃত্যুবরণ করেন হাশিম।

৪৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র আব্দুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন। কপালে শুভ্র চিহ্ন দেখে মা তার নাম রাখেন শাইবা।[১] ইয়াসরিব তথা মদিনায় তিনি তার নানার পরিবারে বেড়ে ওঠেন। মক্কায় অবস্থানকারী তার দাদার পরিবারের কাছে এসব তথ্য অজানাই থেকে যায়। হাশিমের ছিল চার পুত্র আর পাঁচ কন্যা। পুত্র আসাদ, আবু সাইফি, নাদলা ও আব্দুল মুত্তালিব। আর কন্যাদের নাম যথাক্রমে—শিফা, খালিদা, দইফা, রুকাইয়া ও জান্নাত।[২]

[আব্দুল মুত্তালিব] হাশিমের মৃত্যুর পর হাজিদের পান ও আপ্যায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয় তারই ভাই মুত্তালিব ইবনু আব্দি মানাফের ওপর। তিনিও স্বজাতির কাছে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। তার বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে কুরাইশরা তার নাম দিয়েছে ফাইআজ। শাইবা তথা আব্দুল মুত্তালিব ১০/১২ বছর বয়সে উপনীত হলে চাচা মুত্তালিব তার ব্যাপারে জানতে পারেন। এরপর বেরিয়ে পড়েন তার সন্ধানে। খুঁজে পেয়ে আনন্দ-অশ্রুতে সিক্ত হয় তার চোখ। বুকে টেনে নেন তাকে। সঙ্গে নিয়ে আসতে চান তিনি। কিন্তু শাইবা তো আর মায়ের অনুমতি ছাড়া আসতে পারেন না। তাই 'না' করে দেন। মুত্তালিব তখন শাইবার মায়ের কাছে অনুমতি চান। কিন্তু তিনিও রাজি হন না। মুত্তালিব তখন অভয় দিয়ে বলেন, 'সে তো তার নিজের দেশে যাবে, বাইতুল্লাহর দেখা পাবে।' এ কথা শুনে তিনি অনুমতি দেন। মুত্তালিব শাইবাকে নিজের উটের পিঠে চড়িয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। লোকেরা শাইবাকে গোলাম ভেবে বলে, 'এ তো মুত্তালিবের গোলাম।' মুত্তালিব প্রতিবাদ করে বলেন, 'না, সে আমার ভাই হাশিমের পুত্র।'

শাইবা চাচা মুত্তালিবের কাছেই পরিণত বয়সে পৌঁছেন। এরপর এক সফরে মুত্তালিব ইয়েমেনের রাদমান অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। তার অবর্তমানে তার সকল দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় আব্দুল মুত্তালিবের কাঁধে; পূর্বপুরুষদের ধারাবাহিকতায় তিনিও সবকিছু ঠিকঠাকভাবে পরিচালনা করেন। এমনকি ছাড়িয়ে যান পূর্বসূরির সবাইকে। স্বজাতির কাছ থেকে লাভ করেন সীমাহীন ভালোবাসা আর অসামান্য ভক্তি-শ্রদ্ধা।[৩]

মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তার ভাই নাওফাল আব্দুল মুত্তালিবকে কোণঠাসা করে দায়দায়িত্ব

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৭; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৭

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৩৮

সব কেড়ে নেয়। তখন তিনি আপন চাচার বিরুদ্ধে কুরাইশ বংশের কিছু লোকের কাছে সাহায্য চান। কিন্তু তারা তাকে সাফ-সাফ জানিয়ে দেয়, 'তোমাদের চাচা-ভাতিজার মাঝে আমরা নাক গলাতে চাই না।' তারপর তিনি মামার বংশ বনু নাজ্জারের কাছে গেলেন সাহায্যের জন্য। আব্দুল মুত্তালিবের মামার নাম আবু সাদ ইবনু আদি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ৮০ জন আরোহী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন মক্কার উদ্দেশে। মক্কার কাছাকাছি আবতাহ অঞ্চলে এসে যাত্রাবিরতি করেন। মামার আগমনের খবর পেয়ে ভাগ্নে আব্দুল মুত্তালিব ছুটে যান। বলেন, 'মামা, আগে আমার ঘরে চলুন।' জবাবে তিনি বলেন, 'নাওফালের সাথে দেখা না করে আমি কোথাও যাচ্ছি না।' আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে নাওফালের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন সে কুরাইশ নেতাদের সাথে হাতিমে বসে ছিল। আবু সাদ তার তরবারি কোষমুক্ত করে বলেন, 'বাইতুল্লাহর রবের কসম, আমার ভাগ্নের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সবকিছু ফিরিয়ে না দিলে তোমাকে এখানেই শেষ করে দেব।' সঙ্গে সঙ্গে সে সবকিছু ফিরিয়ে দেয় এবং এ ব্যাপারে গণ্যমান্য কুরাইশদের সাক্ষী রাখে। তারপর তিনি আব্দুল মুত্তালিবের বাড়িতে যান। সেখানে ৩ দিন ছিলেন। এরপর উমরা আদায় করে মদিনায় আসেন।

এই সব ঘটনা চলাকালে নাওফাল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বনু আব্দি শামস ইবনু আব্দি মানাফের সঙ্গে একত্র হয়ে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে মৈত্রীচুক্তি করে। অপরদিকে বনু খুযাআ যখন দেখে, বনু নাজ্জার মদিনা থেকে এসে আব্দুল মুত্তালিবকে সাহায্য করছে, তখন তারা বলে, 'সে যেমন তোমাদের সন্তান, তেমনই আমাদেরও সন্তান। তাই আমরা তাকে সাহায্যের ব্যাপারে অধিক হকদার।' এর কারণ আব্দু মানাফের মা তাদের বংশের কন্যা। তারপর তারা দারুন নাদওয়াতে প্রবেশ করে এবং বনু আব্দি শামস ও নাওফালের বিরুদ্ধে বনু হাশিমের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই মৈত্রীচুক্তিই একসময় মক্কাবিজয়ের কারণ হয়, যে আলোচনা সামনে আসছে।[১]

বাইতুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি হলো—এক. যমযম কূপ খনন। দুই. হস্তীবাহিনীর ঘটনা।[২]

প্রথমটির সারসংক্ষেপ হলো, আব্দুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে যমযম কূপ খননের আদেশ করা হয়, বলে দেওয়া হয় কূপ-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি। অবিলম্বে তিনি খনন সম্পন্ন করেন। তখন জুরহুম গোত্রের পুঁতে রাখা জিনিসপত্র তার দখলে চলে আসে। নির্বাসনের সময় তারা সেগুলো মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। যেমন, কিছু তরবারি, লৌহবর্ম ও দুটি সোনার হরিণ। আব্দুল মুত্তালিব তরবারিগুলো দিয়ে কাবার দরজা তৈরি করেন, হরিণ-দুটো বসান এর দরজায়। এরপর যমযম থেকে হাজিদের পানিপানের ব্যবস্থা করেন।

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি : পৃষ্ঠা : ৪১-৪২

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪২-১৪৭

যমযম কূপ থেকে পানি উত্তোলন আরম্ভ হলে কুরাইশরা আব্দুল মুত্তালিবের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। তারা এই কাজে তাদের শরিক করতে বলে। তিনি বলেন, 'আমার তো কিছু করার নেই। এর জন্য যে আমাকেই বাছাই করা হয়েছে।' কিন্তু এত সহজে তারা পিছু ছাড়তে রাজি নয়। তাই ফয়সালার জন্য বনু সাদের এক গণক নারীর শরণাপন্ন হয় সবাই; কিন্তু ফেরার পথে আল্লাহ তাআলা তাদের এমন এক নিদর্শন দেখান, যা থেকে তারা যমযমের সঙ্গে আব্দুল মুত্তালিবের বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন আব্দুল মুত্তালিব এই মানত করেন, যদি আল্লাহ তাকে ১০টি পুত্রসন্তান দান করেন আর তারা পরিণত বয়সে পৌঁছায়, তাহলে তাদের একজনকে তিনি কাবাচত্বরে কুরবানি দেবেন।

দ্বিতীয়টির সারসংক্ষেপ হলো, আবরাহা ইবনু সাবাহ আল-হাবশি ছিল বাদশাহ নাজাশির পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইয়েমেনের শাসক। আরবদের বাইতুল্লাহয় হজ করতে দেখে সে সানআয় বিশাল এক গির্জা নির্মাণ করে। উদ্দেশ্য—আরব হাজিদের সেই গির্জামুখী করা। লোকমুখে এ কথা জানার পর বনু কিনানার এক লোক একরাতে গির্জায় প্রবেশ করে কিবলার স্থানে মল লেপ্টে দিয়ে আসে। আবরাহা এ ঘটনায় ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। ৬০ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয় বাইতুল্লাহ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। পুরো বাহিনীতে ৯টি বা ১৩টি হাতি। সবচেয়ে বড় হাতিটি আবরাহার নিজের জন্য।

একটানা সফর শেষে তারা মুগাম্মাস উপত্যকায় পৌঁছে। সেখানে তারা সেনাবাহিনী সুবিন্যস্ত করে; হাতিগুলো সাজিয়ে মক্কা-প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী উপত্যকা মুহাসসাবে গিয়ে হাতিগুলো বসে পড়ে। এক পা-ও নড়ে না! একচুলও বাড়তে চায় না কাবার দিকে। ডানে-বাঁয়ে বা পেছনের দিকে নিতে চাইলে হুড়মুড়িয়ে ওঠে; কিন্তু সামনে নিতে চাইলেই বসে যায়! এমন সময় আল্লাহ তাআলা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দেন। পাখিগুলো শক্ত পাথরের কঙ্কর নিক্ষেপ করে আবরাহার বাহিনীর ওপর। এতে তাদের অবস্থা হয় চর্বিত ঘাসের মতো!

আকারে পাখিগুলো ছিল খুবই ছোট। প্রতিটি পাখি ৩টি করে কঙ্কর বহন করেছে। একটি ঠোঁটে আর বাকি দুটি দুই পায়ে। কঙ্করগুলো দেখতে মটরশুঁটির মতো। কারও ওপর পড়লেই তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। কঙ্কর সবার ওপর কিন্তু পড়েনি! কিছু অংশের গায়ে লেগেছিল মাত্র! এ অবস্থা দেখে পালাতে গিয়ে বাকিরা ঢেউয়ের মতো একে-অপরের ওপর আছড়ে পড়ে মরছিল! রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল তাদের লাশ। আবরাহাকে আল্লাহ তাআলা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করেন। তার আঙুলগুলো খসে যায়। খসে পড়তে থাকে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও। সানআয় পৌঁছার পর তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন এক পাখির বাচ্চা। এরপর একদিন বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে মারা যায় সে!

আক্রমণের প্রাক্কালে শঙ্কিত হয়ে কুরাইশরা বিভিন্ন গিরিপথ ও পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়; তবে সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পালিয়ে গেলে তারা নিরাপদে নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসে।[১]

নবিজির জন্মের ৫০ দিন—মতান্তরে ৫৫ দিন পূর্বে মুহাররম মাসে এই ঘটনাটি ঘটে। তখন ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারির শেষ কিংবা মার্চের শুরু। এ ঘটনাটি নবিজির আগমন ও কাবাঘরের মর্যাদা রক্ষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিশেষ সাহায্য ও নিদর্শন। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাই, বাইতুল মাকদিস মুসলিমদের দখলে থাকা অবস্থাতেও আল্লাহর শত্রু—মুশরিকরা একাধিকবার সেখানে হামলা চালিয়ে তা দখলে নিয়েছে। যেমন, বুখতুনাসর খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে আর রোমানরা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে আগ্রাসন চালায়। এর বিপরীতে কাবা ছিল মুশরিকদের দখলে। খ্রিষ্টানরা সে সময় হকের অনুসারী হয়েও কাবা দখল করতে পারেনি। এতে কাবাগৃহের মর্যাদার বিষয়টি সহজেই বোঝা যায়।

হস্তীবাহিনীর ঘটনাটি এমন মোক্ষম সময়ে ঘটে যে, খুব দ্রুতই এর খবর ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে। হাবশিদের সাথে রোমানদের তখন এক মজবুত সম্পর্ক। অপরদিকে পারসিকরা ওত পেতে আছে রোমানদের ঘায়েল করার জন্য। এ কারণে রোমান ও তাদের মিত্রদের গতিবিধির ওপর তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আর তাই হস্তীবাহিনীর পরাজয়ের খবর শোনামাত্রই পারসিকরা হামলা করে বসে ইয়েমেনে। রোম ও পারস্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি। সংগত কারণেই এই ঘটনায় পুরো দুনিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় কাবার প্রতি। কাবা যে আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহর কাছে যে এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, সবার কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

এই ঘটনা মানুষকে বুঝিয়ে দেয়—এটি হচ্ছে সেই ঘর, স্বয়ং আল্লাহ যেটিকে পবিত্রতা ও মর্যাদার জন্য মনোনীত করেছেন। তাই সেখানকার কেউ যদি নবুয়তের দাবি করে, তবে তা হবে এই ঘটনারই পরিপূরক। মুমিনদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের মাঝে নিহিত সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা এটাই, যা বস্তুনির্ভর দুনিয়ার বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে।

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল ১০ জন পুত্রসন্তান। তাদের নাম—হারিস, যুবাইর, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ, হামযা, আবু লাহাব, গাইদাক, মুকাওবিম, সাফফার ও আব্বাস। মোট ১১ জন পুত্রের কথা যারা বলেন, তাদের মতে, আরেকজনের নাম কুসাম। ১৩ জনের কথাও বলেন অনেকে। তাদের মতে, বাকি দুজনের নাম আব্দুল কাবা ও হাজলা। এও বলা হয়, বস্তুত মুকাওবিমের অপর নাম আব্দুল কাবা আর হাজলা মূলত গাইদাকেরই নাম। কুসাম নামে আব্দুল মুত্তালিবের কোনো পুত্রসন্তান ছিলই না।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩-৫৬; *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৬২-৪৬৯

তার ৬টি মেয়ে ছিল। তাদের নাম—উম্মুল হাকিম বা বাইদা, বাররা, আতিকা, সাফিয়া, আরওয়া ও উমাইমা।[1]

[নবিজির পিতা আব্দুল্লাহ] তার মায়ের নাম ফাতিমা বিনতু আমর ইবনি আইজ ইবনি ইমরান ইবনি মাখযুম ইবনি ইয়াকজা ইবনি মুররা। আব্দুল মুত্তালিবের সবচেয়ে সুদর্শন, সচ্চরিত্র ও প্রিয় পুত্র ছিলেন তিনি। তার আরও একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হচ্ছে—তিনি একজন জাবিহ বা আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত।

ঘটনার সারসংক্ষেপ—আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রসংখ্যা ১০ জন। তারা সবাই পরিণত বয়সে পদার্পণ করলে তিনি মানতের ব্যাপারে জানান। সন্তানরাও তার সাথে সহমত পোষণ করে। লটারির জন্য তাদের ১০ জনের নাম হোবল মূর্তির দায়িত্বশীলের হাতে দেওয়া হয়। লটারিতে আব্দুল্লাহর নাম উঠে আসে।

আব্দুল মুত্তালিব তাকে কুরবানির জন্য ধারালো ছুরি নিয়ে কাবাচত্বরে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরাইশরা, বিশেষত বনু মাখযুম তথা তার মামার বংশের লোকেরা ও তার ভাই আবু তালিব এ কাজে বাধা দেন। তখন আব্দুল মুত্তালিব বলেন, 'তাহলে আমার মানত পুরা করব কীভাবে?' তারা তাকে গণকের পরামর্শ নিতে বলেন। গণকের কাছে গেলে সে আব্দুল্লাহ ও ১০টি উটের মাঝে লটারি করতে বলে। লটারিতে যদি আব্দুল্লাহর নাম না আসে, তাহলে ১০টি করে উট বৃদ্ধি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে। এরপর যখন উটের নাম আসবে, তখন সবগুলো জবাই করে দিতে হবে।

ফিরে এসে তিনি আব্দুল্লাহ ও ১০ উটের মাঝে লটারির আয়োজন করেন; কিন্তু প্রতিবার কেবল আব্দুল্লাহর নামই আসে। আর ১০টি করে উট কুরবানির জন্য বরাদ্দ করা হয়। এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে উটের সংখ্যা ১০০-তে পৌঁছুলে লটারিতে উটের নাম আসে। তারপর জবাই করা হয় ১০০ উট। ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয় লোকজনের মধ্যে। হিংস্র প্রাণীদের জন্যও উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় অনেক উট।

এর আগে কুরাইশ ও সমগ্র আরবে দিয়াতের পরিমাণ ছিল ১০টি উট। কিন্তু এই ঘটনার পর দিয়াতের জন্য ১০০ উট নির্ধারণ করা হয়। ইসলামি শরিয়ত তাতে কোনো পরিবর্তন করেনি। নবিজি বলেন, 'আমি দুই জাবিহের উত্তরসূরি।' অর্থাৎ ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং নবিজির পিতা আব্দুল্লাহ।[2]

---

[1] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৮-৯; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬-৬৬

[2] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫১-১৫৫; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৯-৯০; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, শায়খ আব্দুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১২, ২২, ২৩

আব্দুল মুত্তালিব তার ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য আমিনাকে পছন্দ করেন। আমিনা ছিলেন ওহাব ইবনু আব্দি মানাফ ইবনি যুহরা ইবনি কিলাবের কন্যা। সার্বিক বিবেচনায় সে সময় তিনি সর্বোত্তম রমণী। তার পিতা বনু যুহরার সর্দার; অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। মক্কায় আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

কিছুদিন পর আব্দুল মুত্তালিব খেজুর দেখাশোনার কাজে আব্দুল্লাহকে মদিনায় পাঠান। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, বাণিজ্যিক সফরে তিনি সিরিয়া গমন করেন। কুরাইশ-কাফেলার সাথে ফিরতি পথে অসুস্থ হয়ে যান। মদিনায় পৌঁছে যাত্রাবিরতি দেন এবং সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। দারুন-নাবিগা আল-জুদিতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের আগেই তার মৃত্যু হয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত। তবে তিনি নবিজির জন্মের দুই মাস পরে মৃত্যুবরণ করেছেন বলেও কথিত আছে।[১] এ শোকসংবাদ মক্কায় পৌঁছুলে আমিনার তীব্র কষ্টের আড়ালে ধ্বনিত হয় এই কবিতা—

হাশিমের পুত্রকে হারাল বাতহার এই জমিন,
নশ্বর এই নিবাস ছেড়ে মর্ত্যতলে হলো সে লীন।
মৃত্যুর ডাকে সারা দিল সে; মৃত্যু তো এমনি,
ইবনু হাশিম একা নয়; সে তো কাউকেই ছাড়েনি।
থেকে থেকে আজও জেগে ওঠে মনে দুঃসহ সেই স্মৃতি,
খাটিয়ায় যবে নিয়ে গেল তারে ঘটল প্রীতির ইতি।
মৃত্যু যদিও মুছে দিয়েছে তার পার্থিব অস্তিত্ব,
জগৎ থেকে হারাবে না কভু তার অনুপম মহত্ত্ব।

আব্দুল্লাহর রেখে-যাওয়া সম্পদের মধ্যে ছিল ৫টি উট, একপাল মেষ আর ১ জন হাবশি দাসী। তার নাম বারাকাহ, উপনাম উম্মু আইমান। তিনি ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেমা।[২]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৬-১৫৮; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৪৫

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭১

নবিজির নবুয়ত-পূর্ব জীবন

দুনিয়ার বুকে নবিজির আগমন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মক্কায় বনু হাশিম গোত্রে ৯ রবিউল আউয়াল, সোমবার সকালে জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরই হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঘটে এবং পারস্যসম্রাট নওশেরওয়ার ক্ষমতায় আরোহণের ৪০ বছর পূর্ণ হয়। সুলাইমান মানসুরপুরি এবং জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশার বিশ্লেষণ অনুযায়ী দিনটি ছিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ বা ২২ এপ্রিল।[১]

নবিজির সম্মানিতা মাতা বলেন, আমি যখন তাকে প্রসব করি, তখন আমার দেহের ভেতর থেকে এমন এক জ্যোতি উৎসারিত হয়, তাতে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে ওঠে। ইরবায ইবনু সারিয়া থেকে ইমাম আহমাদও এর কাছাকাছি অর্থবোধক একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[২]

নবিজির জন্মলগ্নেই নবুয়তের বেশ কিছু আলামত প্রকাশ পায়। পারস্যসম্রাটের প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধসে পড়ে। অগ্নিপূজকদের পূজার আগুন নিভে যায়। সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে আশপাশের গির্জাগুলোও ভেঙে পড়ে। এসব এসেছে ইমাম বাইহাকির বর্ণনায়;[৩]

---

[১] *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া,* খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬২; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২; *তাবাকাতু ইবনি সাদ,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩

[৩] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১২

কিন্তু মুহাম্মদ আল-গাযালি তা সমর্থন করেননি।[১]

নবিজির জন্মগ্রহণের কিছুক্ষণ পরই তাকে দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পাঠানো হয়। নাতিকে দেখে যারপরনাই আনন্দিত হন তিনি। শিশু মুহাম্মাদকে নিয়ে বাইতুল্লাহর ভেতরে প্রবেশ করেন এবং আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার জন্য দুআ করেন। তারপর নিজেই নাতির নাম রাখেন মুহাম্মাদ। আরব দেশে এর আগে এই নামের প্রচলন ছিল না। আরবদের রীতি অনুযায়ী ৭ম দিনে তার খতনা সম্পন্ন হয়।[২]

আপন মায়ের পর দুধমাতাদের মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে সুওয়াইবার দুধ পান করেন। তিনি আবু লাহাবের দাসী। তখন মাসরুহ নামে তার একটি দুগ্ধশিশু ছিল। এর আগে নবিজির চাচা হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবও তার দুধ পান করেছেন। তার পরে পান করেছে আবু সালামা ইবনু আব্দিল আসাদ আল-মাখযুমি।[৩]

বনু সাদে কয়েক বছর

নবজাতক শিশুকে উপযুক্ত কোনো দুধমাতার হাতে অর্পণ করাই ছিল তখনকার শহুরে আরবদের সাধারণ রীতি। এতে বাচ্চারা শহরের রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকত এবং গ্রামের নির্মল পরিবেশে সুস্থ ও সবল হয়ে বেড়ে উঠত। তাছাড়া গ্রামে থেকে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখাটাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। তাই দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবিজির জন্য দুধমাতার সন্ধান করেন এবং বনু সাদ ইবনু বকর গোত্রের এক নারীকে পেয়ে যান। তার নাম হালিমা বিনতু আবি জুয়াইব। তার স্বামীর প্রকৃত নাম হারিস ইবনু আব্দিল উযযা এবং উপনাম আবু কাবশা। তিনিও একই গোত্রের মানুষ।

হালিমার ঘরে নবিজির দুধ-ভাইবোন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস, উনাইসা বিনতু হারিস এবং হুজাফা বা জুযামা বিনতু হারিস। জুযামার উপাধি শাইমা, যা তার নামের চেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি নবিজিকে কোলে রাখতেন। নবিজির চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস ইবনি আব্দিল মুত্তালিবও তার দুধভাই ছিলেন।

নবিজির চাচা হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবকেও দুধপানের জন্য বনু সাদে পাঠানো হয়।

---

[১] *ফিকহুস সিরাহ,* মুহাম্মদ আল-গাযালি, পৃষ্ঠা : ৪৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৯-১৬০; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া,* খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬২; কথিত আছে, তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৪; ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণিত হাদিস নেই। [দেখুন, *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮]

[৩] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৪; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৩

নবিজি তার দুধমাতা হালিমার কাছে থাকাকালে একদিন হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুধমাতা তাকে দুধপান করান। এভাবে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির দুধভাই হন—সুওয়াইবার দিক থেকে এবং বনু সাদের দিক থেকে।[১]

হালিমা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন; যা তিনি সবিস্ময়ে বর্ণনাও করেছেন। এখানে তার বর্ণনা সবিস্তার তুলে ধরছি—

হালিমা বলেন, একবার আমি বনু সাদ ইবনু বকরের নারীদের সঙ্গে আমার স্বামী ও দুধের ছেলেকে সাথে নিয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের খোঁজে বের হই। সে বছর ভয়ংকর এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ কারণে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি আমরা। আমার একটি গাধি ছিল। সেটি নিয়ে বের হই। উটনীটিও আমাদের সাথে। কিন্তু আল্লাহর কসম, এক ফোঁটা দুধও তা থেকে আমরা পেতাম না।

রাতে আমরা ঘুমাতে পারতাম না। শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় কান্না জুড়ে দিত। আমার স্তন্যদুগ্ধ কিংবা উটনীর দুধে তাদের কিছুই হতো না; তবু বৃষ্টি নামবে, স্বস্তি ফিরে আসবে—এই আশায় আমরা বুক বাঁধতাম। এসব ভেবে আমি আমার সেই গাধিটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। তবে এটা ছিল খুবই ধীরগতির। শীর্ণতা ও দুর্বলতার কারণে সেটা আমার সঙ্গীদের যেন বিপদেই ফেলে দেয়। একপর্যায়ে আমরা দুধের শিশুদের খোঁজে মক্কায় এসে পৌঁছি।

আমাদের সফরসঙ্গিনী প্রত্যেকের কাছেই মুহাম্মাদকে পেশ করা হয়; কিন্তু তার বাবা নেই, এটা শুনে সবাই তাকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ আমরা সবাই শিশুদের বাবার পক্ষ থেকে বড়সড় প্রতিদানের আশা রাখতাম। তাই সবাই বলত, ছেলেটা এতিম, তার মা-দাদা মিলে আর কীই-বা দিতে পারবে! এজন্য সবাই তাকে এড়িয়ে যায়।

ওদিকে আমার সকল সঙ্গিনীই পছন্দমতো শিশু পেয়ে যায়, বাকি থাকি কেবল আমিই। ফিরতি পথ ধরব, এমন সময় আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর শপথ, কোনো শিশু না নিয়ে খালিহাতে ফিরে যেতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। আমি বরং ওই এতিম শিশুটিকেই নিয়ে আসি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা করা যায়। আল্লাহ তাআলা হয়তো তার মাঝেই আমাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন।

তিনি বলেন, তারপর আমি গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিই। সত্যি বলতে কী—অন্য কাউকে না পেয়েই মূলত তাকে নিয়েছিলাম সেদিন।

তারপর বলেন, তাকে নিয়ে আমি আমার বাহনের কাছে আসি। তাকে কোলে তোলার পরই আমার স্তনে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধের সঞ্চার হয়। শিশু মুহাম্মাদ তখন পান করে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯

তৃপ্ত হন; সঙ্গো তার দুধভাইও তৃপ্তি-সহকারে পান করে। তারপর গভীর ঘুমে ডুবে যায় তারা। এর আগে বহু রাত আমাদের নির্ঘুম কেটেছে। আমার স্বামী আমাদের সেই উটনীর কাছে গিয়ে দেখেন, উটনীর ওলানও দুধে টইটম্বুর। তিনি দুধ দোহন করে আনেন। আমরা দুজনেও পান করে পরিতৃপ্ত হই এবং দীর্ঘদিন পর সেদিনই একটি স্বস্তির রাত কাটাই আমরা। সকালবেলা আমার স্বামী আল্লাহর শপথ করে বলেন, জেনে রেখো হালিমা, নিশ্চয়ই তুমি এক বরকতময় শিশুকে গ্রহণ করেছ। জবাবে আমি বলি, আল্লাহর কসম, আমারও তেমনটিই মনে হচ্ছে।

হালিমা বলেন, এরপর আমরা চলতে শুরু করি। আমি উঠি আমার সেই গাধিটির ওপর। সঙ্গো নিই মুহাম্মাদকে। আল্লাহর কসম, এরপর সেটি এত দ্রুত চলতে শুরু করে যে, সবগুলো গাধা পেছনে পড়ে যায়। সখীরা পর্যন্ত তখন আমাকে দুষ্টুমির ছলে বলে, হে আবু জুয়াইবের কন্যা, এ কী কাণ্ড! আমাদের ওপর একটু দয়া করো। এটা কি তোমার সেই গাধিটিই না, যাতে সওয়ার হয়ে আমাদের সঙ্গো এসেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ গো, এটা সে গাধিটিই। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভালো কিছু আছে।

হালিমা আরও বলেন, বনু সাদ অঞ্চলে আমরা আমাদের ঘরে ফিরে আসি। সে সময় সেখানকার চেয়ে শুষ্ক-অনুর্বর ভূমি আল্লাহর জমিনে আর কোথাও আছে বলে আমাদের জানা ছিল না; তবু আমাদের মেষগুলো খেয়েদেয়ে পেট ভরে, দুধভরা ওলান নিয়ে বাড়ি ফিরত। আর আমরা সেই দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হতাম। ওদিকে কেউ এক ফোঁটা দুধও দোহন করতে পারত না। তাদের পশুর ওলান থাকত একেবারে দুধশূন্য। একপর্যায়ে আমার কওমের লোকেরা তাদের রাখালদের তিরস্কার করে বলে, হালিমার রাখাল যেখানে মেষ চড়ায়, তোমরা সেখানে চড়াতে পারো না! কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। তাদের মেষগুলো বরাবরের মতো অনাহারেই থাকত, সামান্য দুধও দোহন করা যেত না। আর আমার মেষগুলো ফিরে আসত তৃপ্ত হয়ে, দুধভরতি ওলান নিয়ে।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমরা প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণ পেতেই থাকি। এভাবে মুহাম্মাদের বয়স যখন ২ বছর পূর্ণ হলো, আমি তাকে বুকের দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিই। এই অল্প সময়ে তিনি এতটা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে বেড়ে ওঠেন, যা অন্য শিশুদের বেলায় সাধারণত দেখা যায় না। ২ বছর বয়সে তিনি সুস্থ-সবল শিশুতে পরিণত হন।

তারপর বলেন, আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে নিয়ে আসি; কিন্তু তার বরকত দেখে মনেপ্রাণে আমরা কামনা করি, তিনি যেন আরও কিছুদিন আমাদের কাছে থাকেন। তাই এ ব্যাপারে আমরা তার মায়ের সঙ্গো আলাপ করি। তাকে বলি—ছেলেটা আরেকটু সবল হওয়া পর্যন্ত যদি আমাদের কাছে রাখতেন! মক্কার রোগব্যাধির কারণে তাকে নিয়ে আমি শঙ্কিত। তিনি বলেন, বারবার বলতে বলতে একসময় মা আমিনা

রাজি হয়ে যান।[১]

এভাবেই নবিজির জন্মের পর ৪ বা ৫টি বসন্ত কেটে যায় বনু সাদে। এরপর তার বক্ষবিদীর্ণের ঘটনা ঘটে। একদিন নবিজি বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন, এমন সময় জিবরিল আমিন আসেন। তাকে তুলে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেন এবং বুক চিরে তার হৃৎপিণ্ড বের করে আনেন। তারপর সেখান থেকে একটি অংশ বের করে বলেন, এটা হলো আপনার মাঝে শয়তানের অংশ। এরপর হৃৎপিণ্ডটি একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেন এবং তার অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করেন। তখন ওই শিশুরা দৌড়ে তার দুধমায়ের কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মাদকে তো হত্যা করা হয়েছে। এ কথা শুনে সবাই সেদিকে গিয়ে দেখে—ভয়ে তিনি বিবর্ণ হয়ে আছেন।[২]

ফিরে এলেন মায়ের কোলে

বক্ষবিদীর্ণের ঘটনার পর হালিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বেশ ভয় পেয়ে যান। তড়িঘড়ি করে তিনি নবিজিকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে আসেন। এরপর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত মমতাময়ী মায়ের কাছেই থাকেন।[৩]

মা আমিনা ইয়াসরিবে (মদিনায়) তার মরহুম স্বামীর কবর যিয়ারতের নিয়ত করেন। মক্কা থেকে সেখানে পৌঁছতে তাকে দীর্ঘ ৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। তার সাথে আছেন শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দাসী উম্মু আইমান। আর তাদের অভিভাবক হিসেবে আছেন আব্দুল মুত্তালিব।[৪] সেখানে তিনি ১ মাস ছিলেন। ফেরার সময় মক্কার উদ্দেশে যাত্রার শুরুর দিকেই আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়।[৫]

দাদার সান্নিধ্যে ছোট্ট নবিজি

দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবিজিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। বাবার পর এবার মাকে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬২-১৬৪

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৩০২

[৩] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[৪] সেই সফরে নবিজির দাদা আব্দুল মুত্তালিবও তাদের সাথে ছিলেন—সিরাতের প্রামাণ্যগ্রন্থাবলিতে এমন তথ্য আমরা খুঁজে পাইনি। প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে কেবল তিন জনের কথা—উম্মু আইমান, নবিজি ও তার সম্মানিতা মা আমিনা।

[৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৫০

হারান নবিজি—এ যেন পুরোনো কষ্টের আগুনে নতুন যন্ত্রণার হাওয়া। পালাক্রমে বিপদে পতিত হতে দেখে এতিম নাতির প্রতি দাদার হৃদয়ে মমতার জোয়ার এসে ভিড় করে। ছেলেদের চেয়ে নাতিকে তিনি বেশি ভালোবেসে ফেলেন। একা বলে তাকে অবহেলা নয়; বরং ছেলেদের ওপর প্রাধান্য দেন।

আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বাইতুল্লাহর ছায়ায় একটি বিছানা বিছানো হতো। নানা প্রয়োজনে ছেলেরা সেখানে এলে, বিছানার চারপাশে বসত। তার সম্মানার্থে কেউ ওপরে উঠত না; কিন্তু নবিজি যথারীতি সেই বিছানায় উঠে বসতেন। তখন চাচারা তাকে সরিয়ে নিতে গেলে, আব্দুল মুত্তালিব দেখলে বলতেন, 'তোমরা আমার এ নাতিকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, অবশ্যই সে বড় কিছু হবে।' এরপর আব্দুল মুত্তালিব নবিজিকে তার কোলঘেঁষে বসাতেন আর নাতির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। শিশু মুহাম্মাদের আচার-আচরণ দেখে ভীষণ মুগ্ধ হতেন তিনি।[১]

নবিজির বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন, তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে নবিজিকে তার চাচা আবু তালিবের হাতে তুলে দেন। আবু তালিব ছিলেন নবিজির পিতা আব্দুল্লাহর আপন ভাই।[২]

নবিজির অভিভাবক প্রিয় চাচা আবু তালিব

আবু তালিব তার ভাতিজার জিম্মাদারি বেশ নিষ্ঠার সাথেই পালন করেছেন সবসময়। আপন ছেলের মতো নবিজিকে বুকে টেনে নিয়েছেন তিনি। নিজের সন্তানদের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন তাকে। কখনো কটু কথা শোনাননি, কখনো রাগান্বিত হননি তার ওপর। দীর্ঘ ৪০ বছরেরও অধিক সময় নবিজি তার প্রিয় চাচার সান্নিধ্য পেয়েছেন। চাচা আবু তালিব সবসময় তাকে বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করেছেন। যখন সমগ্র কুরাইশ গোত্র তার বিপক্ষে চলে গিয়েছে, তখনো তিনি প্রিয় ভাতিজার পাশে ছিলেন। যথাসময়ে সেসব আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

হঠাৎ নেমে এল বৃষ্টির ধারা

জাহলামা ইবনু উরফুতা বলেন, আমি একবার মক্কায় যাই। সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। কুরাইশরা তখন বলে, ভাই আবু তালিব, উপত্যকা শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে; পরিবার-পরিজন অনাহারে আছে। চলুন না, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করি! এ কথা শুনে আবু তালিব এক বালককে নিয়ে বের হন। বালকটিকে মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো লাগছিল। থেকে থেকে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছিল তার চেহারা থেকে। আশেপাশে আরও

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৮

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৯; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭

অনেক বালক ছিল। আবু তালিব বালকটিকে সঙ্গে করে কাবার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেন। বালকটি তার আঙুল ধরে রেখেছিল। আকাশে তখন মেঘের নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু আবু তালিব তাকে নিয়ে সেখানে বসতেই এদিক-সেদিক থেকে মেঘেরা ছুটে আসতে থাকে। সহসাই আকাশ ভেঙে নামে বৃষ্টির ধারা। নিম্নভূমিতে পানি জমে ওঠে, উপত্যকাগুলো উপচে পড়ে। চারদিকে দেখা দেয় সবুজের সমারোহ। এদিকে ইঙ্গিত করে আবু তালিব বলেন—

তার চেহারার দোহাই দিয়ে
করা হয় বৃষ্টির প্রার্থনা,
বিধবা, এতিম ও দুস্থরা পায়
তার কাছে সান্ত্বনা।[১]

খ্রিষ্টান পাদরির ভবিষ্যদ্বাণী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ১২ বছর অথবা ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন,[২] তখন তিনি চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ার উদ্দেশে বের হন। বুসরায় তারা যাত্রাবিরতি করেন। বুসরা তখন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত, হাওরান রাজ্যের রাজধানী; রোমান-আওতাধীন আরবাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। সেই শহরে জারজিস নামে এক পাদরি ছিলেন। তবে বুহাইরা নামে সে অধিক পরিচিত। কাফেলা যাত্রাবিরতি করলে, বুহাইরা তাদের কাছে যান। তাদেরকে সম্মান দেখান ও আদর-আপ্যায়ন করেন। এর আগে কখনো তাকে এমনটি করতে দেখা যায়নি। হতে পারে এবার নবিজির উপস্থিতি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। এই অনুমান একেবারে মিথ্যে নয়। নবিজির মধ্যে তিনি নবুয়তের বৈশিষ্ট্যাবলি দেখতে পান। তাকে অনাগত কালের নবি বলে শনাক্ত করেন এবং তার হাত ধরে তিনি বলেন, এই তো বিশ্বজগতের নেতা। ধরার বুকে তাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। আবু তালিব বলেন, আপনার এ কথার প্রমাণ কী? তিনি বলেন, গিরিপথ দিয়ে আসার সময় এমন কোনো পাথর ও গাছ ছিল না, যা তাকে সিজদা করেনি। নবি ছাড়া অন্য কারও প্রতি এরা সিজদাবনত হয় না। তাছাড়া তার কাঁধের নিচে আপেলের মতো নবুয়তের চিহ্ন রয়েছে। আর এ ব্যাপারে আমরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে জেনেছি। ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় তিনি নবিজিকে নিয়ে সিরিয়ায় যেতে আবু তালিবকে নিষেধ করেন। পরামর্শ

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৫-১৬

[২] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার,* পৃষ্ঠা : ৭

অনুযায়ী আবু তালিব তার লোকজন দিয়ে নবিজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।[১]

মক্কার বুকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ১৫ হলে কুরাইশ ও তাদের মিত্র— কিনানা এবং কাইস আইলানের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসের পাতায় যা হারবুল ফিজার (পাপীদের লড়াই) নামে সুপরিচিত। এই যুদ্ধে বয়স ও মর্যাদার বিবেচনায় কুরাইশ ও কিনানা—উভয় গোত্রের নেতৃত্ব দেয় হারব ইবনু উমাইয়া। যুদ্ধে দিনের প্রথম ভাগে কাইস গোত্রের অবস্থান ভালো থাকলেও মধ্যভাগে কিনানা গোত্র এগিয়ে থেকেছে। পবিত্র মাস ও স্থানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করে যুদ্ধ করায় এর নাম দেওয়া হয় 'হারবুল ফিজার'। নবিজিও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তির কুড়িয়ে এনে চাচাদের হাতে তুলে দিতেন।[২]

শান্তির পথে মক্কাবাসী

এই যুদ্ধের পরই পবিত্র জিলকদ মাসে হিলফুল ফুজুল (শান্তিসংঘ) অনুষ্ঠিত হয়। এ লক্ষ্যে কুরাইশের বিভিন্ন শাখাগোত্রকে আহ্বান করা হয়। তাদের মধ্যে ছিল বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, আসাদ ইবনু আব্দিল উযযা, যাহরা ইবনু কিলাব এবং তাইম ইবনু মুররা। বয়স ও সম্মানের খাতিরে তারা আব্দুল্লাহ ইবনু জাদআন তামিমির বাড়িতে বসে। সেখানে তারা সম্মিলিতভাবে এই শপথ করে—পুরো মক্কায় যে-ই জুলুমের শিকার হবে, সকলে মিলে তার পাশে দাঁড়াবে। আর জালিমকে তার জুলুমের দায় নিতে বাধ্য করবে। নবিজিও এই শপথ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবিজি বলেন—

لَقَدْ شَهِدْتُّ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهِ حُمْرٌ النَّعَمِ ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ

আব্দুল্লাহ ইবনু জাদআনের বাড়িতে যে শপথ-অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম, তা আমার কাছে লাল উটনীর চেয়ে বেশি প্রিয়। ইসলামের এ যুগেও এমন কোনো আহ্বান করা হলে আমি তাতে সানন্দে সাড়া দেব।[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮০-১৮৩; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৪-১৮৭; *কলবু জাযিরাতিল আরব*, পৃষ্ঠা : ২৬০; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৩, ১৩৫; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল

এই শপথ গোঁড়ামি থেকে সৃষ্ট জাহিলি জাত্যভিমান নস্যাৎ করে দেয়। বিশেষ এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সাম্যচুক্তি সম্পাদিত হয়। তা হলো—

ইয়েমেনের যুবাইদ অঞ্চলের এক লোক পণ্য নিয়ে মক্কায় আসে। আস ইবনু ওয়ায়িল আস-সাহমি নামে মক্কার আরেক লোক তার পণ্য কিনে নেয়; কিন্তু মূল্য পরিশোধে টালবাহানা শুরু করে। নিরুপায় হয়ে সে বিক্রেতা আস ইবনু ওয়ায়িলের মিত্রগোষ্ঠী—আব্দুদ দার, মাখযুম, জামহা, সাহমা, আদি ও অন্যান্য গোত্রের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না। তখন সে আবু কুবাইস পাহাড়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে। কবিতার মাধ্যমে সে তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া জুলুমের বিবরণ তুলে ধরে। যুবাইর ইবনু আব্দিল মুত্তালিব সেখান দিয়েই তখন যাচ্ছিলেন। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে তিনি জানতে চান, কী কারণে সে অবহেলিত? এরপরই ওই সকল গোত্র একত্রিত হয়, যাদের কথা হিলফুল ফুজুল-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। শপথের পর তারা সকলে আস ইবনু ওয়ায়িলের কাছে গিয়ে ওই লোকটির পাওনা আদায় করে ছাড়ে।[১]

নবিজির কর্মমুখর জীবনযাপন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনের প্রারম্ভে নির্দিষ্ট কোনো পেশায় নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, একটা সময় তিনি মেষ চড়িয়েছেন। কখনো দুধভাইদের সঙ্গে বনু সাদে,[২] আবার কখনো মক্কায় অর্থের বিনিময়ে।[৩] তাছাড়াও ২৫ বছর বয়সে তিনি উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন।

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তিনি বাণিজ্যিক স্বার্থে তার পণ্যদ্রব্য দেখাশোনার জন্য পুরুষদের নিয়োগ দিতেন। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের বাণিজ্যিক সফরেও পাঠাতেন। কুরাইশদের প্রধান পেশা ব্যবসা। তিনি নবিজির সততা, আমানতদারিতা ও সচ্চরিত্রের ব্যাপারে জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান। সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এই আশ্বাস দেন—অন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে তিনি ভালো পারিশ্রমিক দেবেন। আর এই সফরে তার গোলাম মাইসারাও নবিজির সঙ্গ দেবে। নবিজি সানন্দে খাদিজার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরপর তারা মালামাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং যথাসময়ে মাইসারাকে নিয়ে

ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩০-৩১

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৬

[৩] *ফিকহুস সিরাহ,* পৃষ্ঠা : ৫২

পৌঁছে যান সিরিয়ায়।[১]

খাদিজার সঙ্গে শুভবিবাহ

ব্যবসার কাজ সেরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে এলেন। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবার তার বাণিজ্যে এমন আমানত ও বরকত দেখতে পেলেন, যা এর আগে দেখেননি। উপরন্তু নবিজির অমায়িক আচরণ, উত্তম চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সত্যকথন ও আমানতদারিতা সম্পর্কে মাইসারার দেওয়া খবর তাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তোলে। তিনি যেন তার হারানো ও কাঙ্ক্ষিত সম্পদের সন্ধান পেয়ে যান নবিজির মাঝে। মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাকে প্রায়ই বিয়ের প্রস্তাব পাঠাত; বরাবরই সেসব প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু নবিজির প্রতি তার ভালো লাগা তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করে। তিনি বান্ধবী নাফিসা বিনতু মুনাব্বির কাছে মনের এ কথা খুলে বলেন। নাফিসা সোজা নবিজির কাছে গিয়ে খাদিজাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রাথমিকভাবে নবিজি সম্মত হন এবং চাচাদের সাথে কথা বলেন। তারাও খাদিজার চাচার সাথে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেন। এভাবে সাধারণ রীতি অনুসারে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বিয়ের আকদ-অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুদার গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা উপস্থিত হন। সিরিয়া থেকে ফেরার দুই মাসের মাথায় নবিজি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়েতে মোহর হিসেবে ২০টি বকরি প্রদান করেন। বিয়ের সময় খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল ৪০ বছর। বংশমর্যাদা, ধনসম্পদ ও বুদ্ধিমত্তার বিবেচনায় তিনি ছিলেন সর্বোত্তম নারী। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। এমনকি তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, নবিজি আর কাউকে বিয়ে করেননি।[২]

ইবরাহিম ছাড়া নবিজির সকল সন্তানের মা তিনিই। প্রথম সন্তান কাসিম। তার নামানুসারেই নবিজির উপনাম আবুল কাসিম। এরপর জন্মগ্রহণ করেন যাইনাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহকে তাইয়িব ও তাহির নামেও ডাকা হতো। নবিজির ছেলে-সন্তান সবাই শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। আর কন্যারা সবাই ইসলামের সময়কাল পেয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে হিজরতও করেছেন; তবে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছাড়া নবিজির জীবদ্দশায় সবাই মৃত্যুবরণ করেন। আর ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন নবিজির ইন্তেকালের ৬ মাস পর।[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৭-১৮৮

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৯-১৯০; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৫৯; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৭

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯০-১৯১; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৬০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড :

কাবাঘর নির্মাণ এবং সমস্যার সমাধান

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন ৩৫ বছর। কুরাইশরা কাবা পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। কাবা তখন একেবারে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ইসমাইল আলাইহিস সালামের যুগে এর উচ্চতা ছিল মাত্র ৯ হাত। শুধু তা-ই নয়, ওপরে তখন কোনো ছাদও ছিল না। এই সুযোগে কিছু চোর ভেতরে থাকা মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নেয়। তাছাড়া প্রাচীন স্থাপনা হিসেবে যুগে যুগে বহু ঝড়ঝাপটা গিয়েছে এর ওপর দিয়ে। কালের দৈর্ঘ্যে দেওয়ালগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। নবুয়তের ৫ বছর আগে মক্কায় প্রবল বন্যা দেখা দিলে বাইতুল্লাহর ভেতরেও পানি প্রবেশ করে। এতে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। তাই এর মর্যাদার দিকে লক্ষ রেখে কুরাইশরা পুনর্নির্মাণে বাধ্য হয়।

সবাই একমত হয়, নির্মাণ-কাজে কেবল উত্তম সম্পদই ব্যয় করা হবে। যিনা, সুদ বা জুলুম-ভিত্তিক উপার্জনের অর্থ দেওয়া যাবে না। পুরোনো ভবন ভাঙা নিয়েও তারা বেশ শঙ্কিত। তখন ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা মাখযুমি সাহস করে শুরু করেন। তার কিছু হয়নি দেখে বাকিরা তাকে অনুসরণ করে। ভাঙতে ভাঙতে তারা মাকামে ইবরাহিম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর শুরু হয় নির্মাণ কাজ। কাজের সুবিধা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিজেদের মাঝে কাবার বিভিন্ন অংশ বণ্টন করে নেয় তারা। প্রত্যেক গোত্রকে একটি করে অংশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা পৃথকভাবে পাথর জমা করে নির্মাণ কাজ শুরু করে। পুরো কাজটির তত্ত্বাবধান করেন বাকুম নামের এক রোমান নির্মাণশিল্পী।

পুরোদমে কাজ চলতে থাকে। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সময় এলে তাদের মাঝে ভীষণ মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। চার-পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকে তাদের বাগ্‌বিতণ্ডা। পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে এগোয়। অবস্থা দেখে মনে হয়—এই বুঝি পবিত্র ভূমিতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল! এমন নাজুক পরিস্থিতিতে আবু উমাইয়া ইবনু মুগিরা মাখযুমি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, 'আগামীকাল মসজিদের দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথমে প্রবেশ করবে, তিনিই আমাদের এ সমস্যা সমাধান করবেন।' সকলেই তার কথা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় পরদিন নবিজিই সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করেন। তারা তাকে দেখে আনন্দ-ধ্বনি দিয়ে ওঠে, 'আরে, এ তো আল-আমিন। আমরা তাকে পেয়ে সন্তুষ্ট, এ তো মুহাম্মাদ।' কাছে গিয়ে তারা ঘটনা খুলে বলে। বর্ণনা শুনে নবিজি একটি চাদর আনতে বলেন। পাথরটি চাদরের মাঝখানে রাখা হয়। নবিজি বিবদমান প্রত্যেক গোত্রের নেতাদের চাদরের চারকোনায় ধরতে বলেন। এরপর বলেন পাথরটি উঁচু করে নিয়ে যেতে। পাথরটি নেওয়া হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৭, পৃষ্ঠা : ৫০৭; সামান্য মতবিরোধ রয়েছে এবং গ্রহণযোগ্য মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

নিজ হাতে তা যথাস্থানে স্থাপন করেন। চমৎকার এই সমাধানে সমগ্র জাতি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়।

নির্মাণকালে কুরাইশদের হালাল উপার্জনে সংকট দেখা দিলে উত্তর দিক থেকে ৬ হাত পরিমাণ জায়গা ভবনের বাইরে রাখা হয়। সেই স্থানটির নাম হিজির ও হাতিম। ভূমি থেকে দরজা ওপরে তুলে দেওয়া হয়, যাতে তাদের অনিচ্ছায় কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ভবনের উচ্চতা ১৫ হাত হলে ৬টি স্তম্ভের ওপর ছাদ নির্মাণ করা হয়।

নির্মাণ শেষে কাবাঘর চতুর্ভুজ আকৃতি ধারণ করে। উচ্চতা দাঁড়ায় ৪৯ ফুট। হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত দেওয়াল এবং বিপরীত পাশের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট করে, দরজা স্থাপিত দেওয়াল এবং এর বিপরীত দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট করে, মাতাফ থেকে ৫ ফুট ওপরে হাজরে আসওয়াদ এবং ভূমি থেকে সাড়ে ৬ ফুট ওপরে দরজা স্থাপন করা হয়। ভবনের বাইরে থাকা জায়গাটুকু বেষ্টনীর ভেতরে থাকে। এর উচ্চতা দাঁড়ায় ১০ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১ ফুট। 'শাজারওয়ান' নামে এর নামকরণ করা হয়। এটুকু কাবারই অংশ। কিন্তু কুরাইশরা তা বাইরে রাখে।[১]

নবুয়তের আগে কেমন ছিলেন নবিজি?

ছোটবেলা থেকে মানবজাতির সকল উত্তম গুণে গুণান্বিত হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন সঠিক চিন্তা ও নির্ভুল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনুপম আদর্শ। তার মাঝে উত্তম বুদ্ধিমত্তা, সুস্থ চেতনা, সঠিক লক্ষ্য-নির্ধারণ ইত্যাদি যোগ্যতার মিলন ঘটেছিল। তিনি দীর্ঘ সময় নীরব থেকে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে তারপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও অসামান্য বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি জীবনের বাঁকগুলো ধরে ফেলেন; সেইসাথে মানুষের ধ্যানধারণা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সার্বিক পরিস্থিতিও উপলব্ধি করেন। এতে সমাজের কুসংস্কার ও মন্দপ্রবণতা থেকে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সহজ হয়। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে নিজের ও অন্যের যেসকল বিষয়ের সম্মুখীন হতে হতো, তা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন তিনি। ভালো মনে হলে গ্রহণ করতেন; নয়তো দূরে থাকতেন। তাই তো তিনি মদ্যপান করতেন না, বেদিতে জবাইকৃত পশুর মাংস খেতেন না, মূর্তিপূজার অনুষ্ঠান বা মজলিসে যেতেন না। ছোটবেলা থেকেই তিনি বাতিল উপাস্যদের ঘৃণা করতেন। এমনকি তার দৃষ্টিতে এর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছু ছিল না। কেউ লাত-উযযার

---

[১] কাবানির্মাণ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯২-১৯৭; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৬২-৬৩; *সহিহুল বুখারি* : ১৫৮৪; *মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪-৬৫

নামে কসম করলে তিনি তা শুনতেই পারতেন না।[১]

সন্দেহ নেই, তাকদির তাকে সর্বদা হিফাজত করেছে। যখনই তার মন পার্থিব কোনো ভোগ্যসামগ্রীর প্রতি ঝুঁকেছে কিংবা মন্দ কোনো রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ ، كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بِسُوءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ ، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ لَيْلَةً لِلْغُلَامِ الَّذِي كَانَ يَرْعَى مَعِي بِأَعْلَى مَكَّةَ : لَوْ أَبْصَرْتَ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةَ ، وَأَسْمُرَ بِهَا كَمَا يَسْمُرُ الشَّبَابُ! فَقَالَ : أَفْعَلُ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي أَوَّلِ دَارٍ بِمَكَّةَ ، سَمِعْتُ عَزْفًا ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: عُرْسُ فُلَانٍ بِفُلَانَةٍ. فَجَلَسْتُ أَسْمَعُ ، فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أُذُنِي فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَعُدْتُ إِلَى صَاحِبِي ، فَسَأَلَنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ لَيْلَةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأَصَابَنِي مِثْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ.

জাহিলি যুগের মানুষদের কার্যকলাপের দিকে আমি মাত্র ২ বার ধাবিত হয়েছি; তবে প্রতিবারই আল্লাহ তাআলা আমাকে রক্ষা করেছেন। তারপর আর কখনো সেসবের ইচ্ছা করিনি। পরে তো আল্লাহ তাআলা নবুয়ত দ্বারা আমাকে সম্মানিতই করলেন।

আমরা মক্কার উঁচু ভূমিতে মেষ চরাতাম। একরাতে আমার সাথে থাকা রাখালকে বললাম, তুমি যদি আমার মেষগুলো একটু দেখতে, তাহলে আমি মক্কায় গিয়ে যুবকদের মতো একটু গল্পগুজব করে আসতাম। সে রাজি হয়। আমিও বের হয়ে যাই। মক্কার প্রথম বাড়ির কাছে যেতেই বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কী হচ্ছে? তারা জানাল, বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। আমি উপভোগ করার জন্য বসে পড়লাম। তখন আল্লাহ তাআলা আমার কান বন্ধ করে দিলেন। আমি বিভোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে রোদের তাপে আমার ঘুম ভাঙে। আমি আমার সেই সঙ্গীর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বিস্তারিত সবকিছু খুলে বলি। এরপর আরেক রাতে একই কাণ্ড ঘটাই। কিন্তু সেবারও এক প্রচণ্ড ঘুম আমাকে জাপটে ধরে। এরপর আর কোনো মন্দ ইচ্ছা আমার মনে জাগেনি।[২]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৮

[২] *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৯; *আল-কামিল ফিত তারিখ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩৯; এই

কাবাঘর নির্মাণকালে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁধে করে পাথর আনা-নেওয়া করেন। তখন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, 'আপনি পরনের কাপড় খুলে কাঁধে রাখুন, তাতে পাথরের আঘাত আপনার গায়ে লাগবে না।' (কাপড় খুলতেই) তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরামাত্রই বলে ওঠেন, 'আমার কাপড়। আমার কাপড়।' অমনি তাকে সে কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়।[১] অপর এক বর্ণনায় আছে, এরপর আর কখনো নবিজির সতর দেখা যায়নি।[২]

নবিজি স্বজাতির মাঝে উত্তম বৈশিষ্ট্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাদের মাঝে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সদাচারী, চরিত্রবান ও সর্বোত্তম প্রতিবেশী। অতুলনীয় ধৈর্যশীল, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং নম্র স্বভাবের অধিকারীও ছিলেন তিনি। তার মতো ক্ষমাশীল, দানশীল, সৎকাজে অগ্রগামী, প্রতিশ্রুতি পূরণ ও আমানত রক্ষায় বদ্ধপরিকর আর কেউ ছিল না। উত্তম গুণাবলি ও উন্নত স্বভাবের সমন্বয় ঘটেছিল তার মাঝে। তাই তো স্বজাতি তাকে 'আল-আমিন' বলে ডাকতে শুরু করে। তার সম্পর্কে উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তিনি পরের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিতেন, অসহায়কে সবরকম সাহায্য করতেন, অতিথিদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করতেন, বিপদাপদে সকলের পাশে দাঁড়াতেন।'[৩]

হাদিসটির শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম হাকিম ও যাহাবি এটিকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম ইবনু কাসির *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াতে* (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮৭) জইফ বলেছেন।

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৩৪০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪১৪০; *সহিহুল বুখারি* : ৩৮২৯

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৬০; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৮৬৫; *মুসনাদুল বাযযার* : ১৭৬

নবিজির নবুয়ত-পরবর্তী জীবন

হেরা গুহায় নবিজি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। ইতোমধ্যে সেই পুরোনো ভাবনা তার এবং তার জাতির মাঝে চেতনাগত ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তোলে। এ সময় তার নির্জন পরিবেশ ভালো লাগতে থাকে। কিছু ছাতু ও পানি নিয়ে তিনি জাবালুন-নুরে অবস্থিত হেরা গুহায় চলে যান; ইবাদত-বন্দেগি করে সময় কাটান। পাহাড়টি মক্কা থেকে ২ মাইল দূরে। গুহাটিও সংকীর্ণ—দৈর্ঘ্যে চার হাত আর প্রস্থে পৌনে দুই হাতের মতো। নবিজির পরিবার তার খোঁজখবর রাখে। তিনি পুরো রামাদান সেখানে কাটিয়ে দেন। দরিদ্র কেউ এলে তাকে সাহায্য করেন। ইবাদত-বন্দেগিতে নিমগ্ন থাকেন। পার্থিব জগৎ এবং এর পেছনে ঘটে যাওয়া অলৌকিক বিষয়াবলি নিয়ে ভেবে যান। যে ধ্বংসাত্মক শিরক ও ভ্রষ্ট রীতিনীতিতে সমগ্র জাতি লিপ্ত, সেসব তার কাছে একটুও ভালো লাগে না। কিন্তু এ থেকে তাদের নিয়ে বের হওয়ার মতো কোনো সঠিক পথ ও পন্থাও তার জানা নেই। এমন কোনো উপায় তার সামনে এখনো আসেনি, যা তিনি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেন।[১]

নবিজির এই নিঃসঙ্গতা আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনারই অংশ, যাতে তাকে অদূর ভবিষ্যতে মুক্তির দিশারী হিসেবে প্রস্তুত করে নেওয়া যায়। যিনি কিনা সমগ্র মানবজাতির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেন, তার নিজের পরিবর্তন ছাড়া এ মহান লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর ছিল না। অবশ্যই তাকে কিছু সময় নিঃসঙ্গ, একাকী কাটাতে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৫-২৩৬; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭; *ফি জিলালিল কুরআন*, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ১৬৬

হবে; পার্থিব জীবনের ছোটবড় সবরকম ব্যস্ততা ও কোলাহল থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

এভাবেই আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিয়ে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। তাকে নবুয়ত ও রিসালাতের মহান আমানত-গ্রহণ, ভূপৃষ্ঠে বিশাল পরিবর্তন সাধন এবং ইতিহাসের গতিপথ পালটে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়ার আগে ৩ বছর তাকে একাকিত্বে রাখেন। কখনো তার পুরো মাসও কেটে যেত নিঃসঙ্গতায়। এ সময় তিনি আধ্যাত্মিক সফরে সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতেন যাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

জিবরিলের আগমন এবং ওহি নাযিলের ঘটনা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ৪০ বছর পূর্ণ হলো। এখন তিনি পরিপূর্ণ, পরিপক্ব। সাধারণত এই বয়সেই রাসুলদের ওপর রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। নবিজির জীবনাকাশে নবুয়তের নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে ওঠে। পদে পদে রিসালাতের নিদর্শন প্রকাশ পেতে শুরু করে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সত্যস্বপ্ন। অর্থাৎ তখন স্বপ্নে তিনি যা-ই দেখতেন, তা-ই বাস্তবে পরিণত হতো। এভাবেই কেটে যায় ছয়-ছয়টি মাস। নবুয়তের ব্যাপ্তি মোট ২৩ বছর। আর এই ৬ মাস নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। নবিজির নিঃসঙ্গতার তৃতীয় বছর রামাদান মাসে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীর প্রতি রহমত বর্ষণের ইচ্ছা করেন। তাই নবিজিকে নবুয়ত প্রদান করা হয়। জিবরিল আলাইহিস সালাম কুরআনুল কারিমের কয়েকটি আয়াত নিয়ে নবিজির কাছে আসেন।[১]

সকল দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, কুরআন নাযিলের প্রথম দিনটি ছিল সোমবার। রামাদানের একবিংশ রাত। এ হিসেবে খ্রিষ্টীয় তারিখ ৬১০ সালের ১০ আগস্ট। সেদিন চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী নবিজির বয়স ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন। আর সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন।[২]

---

[১] ইবনু হাজার বলেন, ইমাম বাইহাকি বর্ণনা করেন, সত্যস্বপ্নের সময়কাল ছিল ৬ মাস। এই হিসেবে নবুয়তের শুরুটা হয় নবিজির জন্মের মাস তথা রবিউল আউয়াল মাসে; যখন তার ৪০ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছিল। আর জাগ্রত অবস্থায় ওহির সূচনা হয় রামাদান মাসে। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭]

[২] আল্লাহ তাআলা প্রথম কোন মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবুয়তের মর্যাদাপ্রদান এবং ওহি নাযিলের মাধ্যমে মর্যাদাবান করেছিলেন; তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে দ্বিমত দেখা যায়। তাদের এক দলের মতে, তা ছিল রবিউল আউয়াল মাসে। অন্য দলের মতে, রামাদান মাসে। রজব মাসের পক্ষেও মত দিয়েছেন কেউ কেউ। [দেখুন—*মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৭৫]

আমরা দ্বিতীয় মত তথা রামাদান মাসকে প্রাধান্য দিয়েছি। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন—(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) রামাদান ওই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। [সুরা বাকারা, আয়াত

নবুয়তপ্রাপ্তির এ মহান ঘটনাটি আমরা উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জবানে শুনব। এ ঘটনার মধ্য দিয়েই ঈমানের প্রদীপ জ্বলে ওঠে, যা কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূরীভূত করে, বদলে দেয় জীবনের রূপরেখা ও ইতিহাসের গতিপথ। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসুলের কাছে প্রথম যে ওহি আসে, তা ছিল ঘুমন্ত অবস্থায় সত্যস্বপ্ন হিসেবে। সে সময় যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন, তা একেবারে প্রভাতের আলোর মতো প্রকাশিত হতো। এরপর তার কাছে নির্জনতা ভালো লাগতে শুরু করে। তিনি হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটাতেন। লাগাতার কয়েক দিন অবস্থান করে পরিবারের কাছে গিয়ে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতেন। সেগুলো শেষ হয়ে গেলে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে আবার কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন।

একদিন নবিজি হেরা গুহায় অবস্থান করছেন। হঠাৎ এক ফেরেশতা আবির্ভূত হন তার সামনে। তিনি বেশ ঘাবড়ে যান তাকে দেখে। ফেরেশতা ধীর পায়ে এগিয়ে আসেন তার দিকে। নবিজির চোখে ভয়, বিস্ময়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। ফেরেশতা বলে ওঠেন,

---

: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) নিশ্চয় আমি তা কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। [সুরা কদর, আয়াত : ১] আর এ কথা সকলেরই জানা, কদরের রাত রামাদান মাসের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার বাণী—'নিশ্চয় আমি তা এক বরকতপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।'—কথাগুলো দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া নবিজি রামাদান মাসেই হেরা গুহায় সময় কাটাতেন। আর জিবরিল আলাইহিস সালাম সেই মাসেই এসেছিলেন বলে প্রসিদ্ধ।

তারপর রামাদানের ঠিক কোন তারিখে ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল; তা নিয়েও দ্বিমত রয়েছে। কেউ বলেন, ৭ তারিখ। কেউ বলেন, ২৭ তারিখ। আবার কেউ বলেন, ২৮ তারিখ। [দেখুন—প্রাগুক্ত, *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯) তবে, খুদারি ২৭ তারিখের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। [*মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুদারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯]

আমরা ২১ তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছি; যদিও এ ব্যাপারে কারও মত দেখা যায় না। কারণ সিরাত-বিশেষজ্ঞদের সকলে কিংবা অধিকাংশ একমত যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সূচনা হয়েছিল সোমবার। একাধিক মুহাদ্দিস কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবারে সিয়াম রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এই দিনে ওহি অবতীর্ণ হয়েছে। অপর এক হাদিসে আছে, নবিজি বলেন, এটা এমন এক দিন যেদিন আমি দুনিয়ায় এসেছি এবং এমন এক দিন যেদিন আমি নবুয়ত পেয়েছি বা আমার ওপর ওহি নাযিল হয়েছে। [দেখুন, *সহিহ মুসলিম* : ১১৬২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৫৩৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৮৪৭৬; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৩১৬৮]

সেই বছর রামাদান মাসে সোমবারের তারিখগুলো ছিল—৭, ১৪, ২১ ও ২৮। একাধিক সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কদরের রাত রামাদানের শেষ দশকের বেজোড় তারিখেই হয়েছিল। এবার আমরা যদি সুরা কদরের প্রথম আয়াত, কাতাদা থেকে বর্ণিত হাদিস অনুসারে সোমবারের নবুয়তপ্রাপ্তির বিষয়টি এবং আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত হিসেব অনুসারে সেই বছর রামাদানে সোমবারের বিষয়টি সামনে রাখি, তাহলে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাদানের একবিংশ রাতেই নবুয়ত লাভ করেছিলেন।

'পড়ুন!' নবিজি উত্তর দেন, 'আমি তো পড়তে পারি না!' তারপর সেই ফেরেশতা তাকে জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চাপ দেন। নবিজি এতে ভীষণ কষ্ট অনুভব করেন। কিছুক্ষণ পর ফেরেশতা তাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় বলেন, 'পড়ুন!' নবিজি আগের মতো একই জবাব দেন, 'আমি তো পড়তে পারি না!' ফেরেশতা তখন আবার জড়িয়ে ধরেন তাকে। খুব জোরে চাপ দেন। নবিজি আগের মতোই ভীষণ কষ্ট অনুভব করেন। ফেরেশতা তাকে ছেড়ে দেন। এভাবে তিনবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তারপর ফেরেশতা বলতে শুরু করেন—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣

পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত নিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। তার হৃৎপিণ্ড তখন কাঁপছিল। তিনি খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসে বলতে থাকেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও'। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। এতে তার ভীতি কেটে যায়। তিনি খাদিজার কাছে ঘটে যাওয়া কাহিনি বর্ণনা করে বলেন, 'আমি নিজেকে নিয়ে শঙ্কায় আছি।'

খাদিজা অভয় দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায়-দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের সেবাযত্ন করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'

এরপর খাদিজা নবিজিকে নিয়ে চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কাছে যান। তিনি জাহিলি যুগে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় লিখতে পারতেন। শুধু তা-ই নয়, হিব্রু ভাষায় ইনজিল কিতাব ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতিবৃদ্ধ ও অন্ধ। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে বলেন, 'ভাই, আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ?' নবিজি যা দেখেছিলেন, তার সবই বর্ণনা করেন।

তখন ওয়ারাকা তাকে বলেন, 'তিনি তো সেই বার্তাবাহক ফেরেশতা, যাকে আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক

[১] সুরা আলাক, আয়াত : ১-৩

থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে দেশান্তরিত করবে।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তারা কি আমাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছ, এমন কিছু যে-ই নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গেই বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

এর কিছু দিন পরই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন। ওহির অবতরণ তখন কিছু সময়ের জন্য বন্ধ ছিল।[১]

ইমাম তাবারি ও ইবনু হিশামের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, হঠাৎ ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পর নবিজি হেরা গুহা থেকে বের হয়ে আসেন। তারপর আবার ফিরে গিয়ে সান্নিধ্যের পূর্ণতা লাভ করেন। এরপর থেকে মক্কায় অবস্থান করেন। তাবারির বর্ণনা থেকে নবিজির হেরা-গুহা থেকে বের হয়ে আসার একটি কারণ জানা যায়। চলুন বর্ণনাটি দেখা যাক—

ওহি আসার ঘটনা বর্ণনার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সৃষ্টিকুলের মাঝে কবি ও উন্মাদদের আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতাম। এদের দু-চোখে দেখতেই পারতাম না আমি।

নবিজি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি কবি বা উন্মাদ হয়ে যাব আর কুরাইশরা আমাকে নিয়ে সমালোচনা করবে—এমনটি কস্মিনকালেও হতে পারে না। আমি বরং পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফ দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেব, তারপর নিজেকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেব।[২] এই উদ্দেশ্যে আমি বের হলাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছলে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩

[২] ওহির বিরতিকালে (فَتْرَةُ الْوَحْيِ) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছিলেন। চেয়েছিলেন পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে। এ ঘটনাটি ইমাম বুখারি, আব্দুর রাজ্জাক, আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তাদের হাদিসগ্রন্থসমূহে ইবনু শিহাব যুহরির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ ও সনদে বর্ণিত হলেও এর সত্যতা প্রমাণিত নয়।

ইসলামি শরিয়তে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া যেমন কবিরা গুনাহ, তেমনই হারাম কাজের চেষ্টা করা বা সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করে এমন কাজও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আত্মহত্যা ইসলামি বিধানে কবিরা গুনাহ। তাই আত্মহত্যার চেষ্টাও কবিরা গুনাহ। আর নবিজির ব্যাপারে উম্মাহর সকল আলিম একমত—তিনি নবুয়ত লাভের পূর্বে ও পরে সব ধরনের কবিরা গুনাহ থকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাকে হিফাজত করেছেন। [*লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিইয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৫; মুআসসাসাতুল খাফিকিন ওয়া মাকতাবাতুহা, দামেশক]

তাহলে নবিজির থেকে এমন কাজ হওয়া কীভাবে সম্ভব! সনদ যাচাই করলে দেখা যায়, ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরি রাহিমাহুল্লাহ থেকে। এটি নবিজি বা কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত নয়, বরং

আসমান থেকে এক উচ্চ আওয়াজ আমার কানে ভেসে এল। আমাকে সম্বোধন করে

তা ইমাম যুহরির কথা। তিনি একজন তাবিয়ি, তার বর্ণনা মুরসাল। আর মুরসাল সূত্রে বর্ণিত ঘটনা শরিয়তে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। সেটা যদি আবার কোনো অকাট্য প্রমাণিত বিষয়ের বিপরীতে হয়, তাহলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম যুহরি পূর্ণ হাদিসটি ধারাবাহিক বর্ণনা করলেও এ ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে বলেন, 'فِيمَا بلغنا; অর্থাৎ এ ব্যাপারে আমাদের কাছে যে খবর পৌঁছেছে।' ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ কথার দ্বারা বোঝা যায়, এটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথা নয়, বরং যুহরির কথা—যার ধারাবাহিকতা নবিজি থেকে প্রমাণিত নয়।' শামসুদ্দিন কিরমানি বলেন, 'যুহরির কথার দ্বারা এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, এ ঘটনা নবিজি থেকে প্রমাণিত নয়।' [*ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৫৯-৩৬০; দারুল মাআরিফা, বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি] ঘটনাটি ইমাম যুহরি থেকে মা'মার বর্ণনা করেছেন। মা'মার ছাড়া যুহরির ছাত্রদের মধ্যে আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারি *সহিহুল বুখারিতে* 'বাদউল ওহি' (بَدْءُ الْوَحْيِ) অধ্যায়ে (হাদিস : ৩) যুহরির আরেক ছাত্র উকাইলের সূত্রে একই হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে এ ঘটনাটি নেই।

ইবনু হাজার আসকালানি বলেন, 'আবু নুআইম তার গ্রন্থ *মুস্তাখরাজে* ইমাম বুখারির উস্তায ইয়াহইয়া ইবনু বুকাইরের সূত্রে উকাইল থেকে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে ঘটনাটি নেই। তবে এর পরের হাদিস, যেটি মা'মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেখানে ঘটনাটি আছে।' আবু বকর আল-ইসমাইলি বলেন, 'এ ঘটনা শুধু মা'মারের বর্ণনায় রয়েছে।' ইমাম যুহরি থেকে লাইস ইবনু সাদের সূত্রে ইমাম আহমাদ (২৫৮৬৫), ইমাম মুসলিম (১৬০) একই হাদিস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণনায় নবিজির আত্মহত্যামূলক ঘটনার বর্ণনা নেই। [প্রাগুক্ত]

আবু শামা আল-মাকদিসি বলেন, 'এ ঘটনা যুহরির নিজের অথবা অন্য কারও বর্ণনা; আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার নয়। কেননা এ বিষয়ে হাদিস বর্ণনায় তিনি কখনো 'فِيمَا بلغنا; অর্থাৎ 'আমার কাছে যে খবর পৌঁছেছে' শব্দ ব্যবহার করেননি। আর আয়িশা এটা বলবেনই বা কেন?' [*শারহুল হাদিসিল মুকতাফা ফি মাবআসিন নাবিয়িল মুস্তফা*, পৃষ্ঠা : ১৭৭] কারণ এ কথা তো সেই বলবে, যে অন্যের মাধ্যমে খবর পেয়েছে। কিন্তু তিনি তো স্বয়ং নবিজি থেকে সবকিছু শুনেছেন। এজন্যই আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সবসময় হাদিস বর্ণনা করতেন এমনভাবে, যাতে সহজেই বোঝা যেত—তিনি নবিজি থেকে শুনেছেন অথবা নবিজি তাকে বলেছেন।

কেউ কেউ 'فِيمَا بلغنا' এই বাক্যটি ছাড়া ঘটনাটি সরাসরি মূল হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু মারদাওয়াইহি তারিক ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে মা'মার থেকে 'فِيمَا بلغنا' বাক্য ছাড়াই উল্লেখিত ঘটনাটি-সহ পূর্ণ হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনা পরিত্যাজ্য। কারণ এই বর্ণনার সনদে মুহাম্মাদ ইনবু কাসির আস-সানআনি নামের এক রাবি আছেন, যিনি দুর্বল। অথচ মা'মার থেকে আব্দুর রাজ্জাক একই হাদিস فِيمَا بلغنا সহ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি 'সিকাহ রাবি' বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।

এছাড়াও ইবনু সাদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে এবং ইবনু জারির তাবারি আবিদ ইবনু উমাইর থেকে 'فِيمَا بلغنا' উল্লেখ করা ছাড়া হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে প্রত্যকের সনদে ত্রুটি থাকায় তাদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু সাদের সনদে ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি আবি মুসা নামের এক রাবি আছেন যিনি মাতরুক বা পরিত্যাজ্য।

আর তাবারির বর্ণনাটি মুরসাল। কারণ আবিদ ইবনু উমাইর সাহাবি নয় বরং তাবিয়ি। যদিও তিনি নবিজির জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেছেন। আরেকটি বিষয় হলো, এ সনদে একজন বর্ণনাকারী আবু হুমাইদ (এটা তার

বলল, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসুল আর আমি জিবরিল।'

নবিজি বলেন, আমি মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে জিবরিলকে স্পষ্ট মানব-আকৃতিতে দেখতে পেলাম। তার দুই পা তখন আকাশের দিগন্তে ঝুলছিল। জিবরিল বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসুল আর আমি জিবরিল।'

তারপর নবিজি বলেন, আমি অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেদিকে। এরই মধ্যে যে উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলাম, তা ভুলে যাই। অনেকটা থমকে যাওয়ার মতো। আমি মুখ ফিরিয়ে আকাশের অন্যদিকে তাকাই, সেখানেও দেখি ফেরেশতা জিবরিল। তখন আমি না সামনে এগুতে পারছি, আর না পেছনে ফিরে যেতে পারছি। এভাবেই নির্বাক কেটে যায় কিছু সময়। এদিকে খাদিজা আমার সন্ধানে লোক পাঠায়। তারা পুরো মক্কা তালাশ করে আমাকে না পেয়ে চলে যায়। আর আমি একই জায়গায় অনড় আটকে থাকি। এরপর তিনি চলে যান, আমিও ঘরে ফিরি।[১] এসে খাদিজার উরুতে হেলান দিয়ে বসে

উপনাম, মূল নাম মুহাম্মাদ আর-রাযি) তিনি অত্যন্ত দুর্বল রাবি। ইমাম আবু জুরআসহ অনেকেই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা যে নবিকে নির্বাচন করেছেন বনি আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে, যিনি আল্লাহর প্রেরিত সকল নবি-রাসুলের সর্দার, তিনিই কিনা দুশ্চিন্তার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আত্মহত্যার মতো গর্হিত কাজ করতে যাবেন—সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী কোনো মানুষ এটা কখনো কল্পনাও করতে পারে না! ইসলামের জন্য মারাত্মক আঘাত যাকে সহ্য করতে হবে, দ্বীনের কাজে পাড়ি দিতে হবে বিপৎসংকুল পথ—তিনি কীভাবে লোকনিন্দার ভয়ে ধৈর্য হারিয়ে বেছে নেবেন আত্মহননের পথ! এমন মহান ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কখনো এমন হতে পারে না!

বরং নবিজি তো ছিলেন মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় বড় বিপদ-অতিক্রমকারী। তার জীবনে এমন সব বিপদ এসেছে যা আর কোনো নবি-রাসুলের জীবনে আসেনি। এ কারণেই তিনি তার উম্মতকে বলে গিয়েছেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ ، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي ، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي

হে লোকসকল, কোনো ব্যক্তি অথবা মুমিনদের মধ্যে কেউ কোনো বিপদে পড়লে সে যেন অন্য কারও বিপদের দিকে না তাকায়, বরং আমার ওপর আপতিত বিপদের কথা স্মরণ করে। কারণ আমার উম্মতের মধ্যে আমার থেকে কঠিন বিপদ আর কারও ওপর আসবে না। [*সুনানু ইবনি মাজাহ,* ১৫৯৯; হাদিসের সনদ সহিহ।]

[বিস্তারিত জানতে দেখুন—*লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিইয়া,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৫; মুআসসাসাতুল খাফিকিন ওয়া মাকতাবাতুহা, দামেশক। *ফাতহুল বারি,* ইবনু হাজার, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৫৯-৩৬০; দারুল মাআরিফা , বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরি। *শারহুল হাদিসিল মুকতাফা ফি মাবআসিন নাবিয়িল মুস্তফা,* পৃষ্ঠা : ১৭৭; মাকতাবাতুল উমরাইনিল ইলমিয়া, আরব আমিরাত। *লিসানুল মিজান,* ইবনু হাজার, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪১৫; দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া।]

[১] *তারিখুত তাবারি,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০১; দারুল মাআরিফ, মিশর।

পড়ি। খাদিজা জানতে চাইলেন, 'হে আবুল কাসিম, কোথায় ছিলেন আপনি? এদিকে আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছি। সারা মক্কা খুঁজেও তারা পায়নি আপনাকে!' তারপর তাকে সব খুলে বলি। সে অভয় দেয়, 'হে প্রিয়তম, আপনি সাহস রাখুন। ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে খাদিজার প্রাণ, আমি আশাবাদী—আপনি এই উম্মতের নবি হতে যাচ্ছেন।'[১]

তারপর তিনি ওয়ারাকার কাছে গিয়ে সব খুলে বলেন। ওয়ারাকা সমর্থন করে বলেন, 'এ তো খুবই ভালো কথা। আল্লাহর কসম, তার কাছে যিনি এসেছেন; তিনি তো সেই মহান বার্তাবাহক ফেরেশতা, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের কাছে আসতেন। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ এই উম্মতের নবি। তুমি তাকে গিয়ে বলো, সে যেন অবিচল থাকেন, ভেঙে না পড়েন।'

খাদিজা ফিরে এসে নবিজিকে ওয়ারাকার কথাগুলো জানান।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আমিনের সান্নিধ্য লাভের পর মক্কায় ফিরলে ওয়ারাকা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিস্তারিত বিবরণ শুনে তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তুমি এই উম্মতের নবি। তোমার কাছে তিনিই এসেছিলেন, যিনি আসতেন মুসা নবির কাছে।'[২]

ওহি বন্ধের সময়কাল

ওহি ঠিক কত দিন বন্ধ ছিল?—এ প্রশ্নের জবাবে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইবনু সাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সময়টা ছিল অল্প কয়েক দিন।[৩] সার্বিক বিবেচনায় এই মতটিই গ্রহণযোগ্য; বরং সুনির্দিষ্ট বলে মনে হয়। টানা ৩ বছর বা আড়াই বছর বন্ধ ছিল মর্মে যে বর্ণনাগুলো প্রচলিত, সেগুলো কোনোভাবেই সঠিক নয়। এখানে সেসব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

ওহি বন্ধ থাকার দিনগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ কষ্টে কাটাতেন। বিষণ্ণতা আর হতাশায় ভুগতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা এখানে তুলে দিচ্ছি—

কিছুদিনের জন্য ওহি বন্ধ থাকে। এতে নবিজি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়েছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি সেখান

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭-২৩৮

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৮ (সংক্ষেপিত)

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭; খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬০

থেকে লাফ দিতে যাবেন[১], সাথে সাথে জিবরিল আলাইহিস সালাম তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলতেন, 'হে মুহাম্মাদ, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসুল।' এতে নবিজির অস্থিরতা দূর হয়ে যেত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন তিনি। ওহি বন্ধ থাকার অবস্থা দীর্ঘায়িত হলেই নবিজি একই উদ্দেশ্যে আবার চলে যেতেন। আর যখনই তিনি পর্বতের চূড়ায় পৌঁছতেন, তখনই জিবরিল আলাইহিস সালাম তার সামনে আত্মপ্রকাশ করে আগের সেই কথাগুলোই বলতেন।[২]

ওহি নিয়ে দ্বিতীয়বার জিবরিলের আগমন

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ওহি কিছুদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল, যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভয় কেটে যায় এবং দ্বিতীয়বার তার মনে ওহি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়।[৩] এরপর যখন নবিজি পেরেশানি থেকে মুক্ত হন, বাস্তবতা উপলব্ধি করেন এবং নিশ্চিত হন যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে নবি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, তার কাছে এখন থেকে বার্তাবাহক আসবে, তিনি আসমানের সংবাদ তাকে জানাবেন, তখন তার মধ্যে ওহির প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবং আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। তার এই আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাই পরে ওহির অবতরণ ত্বরান্বিত করে। জিবরিল আলাইহিস সালাম দ্বিতীয়বার তার কাছে আসেন। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবিজিকে ওহি বন্ধের সময়কাল সম্পর্কে বলতে শুনেছেন—

بَيْنَا أَنَا أَمْشِي ، إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا ، مِنَ السَّمَاءِ ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ.

একদিন আমি হাঁটছি, হঠাৎ আসমান থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আমি ওপরে তাকিয়ে দেখি—সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও জমিনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট। এতে আমি ভয় পেয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কাছে ফিরে এসে বলি, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তারপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ

---

[১] ১০২ নম্বর পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯৮২; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৩৯৭; *মুসনাদু ইসহাক ইবনি রাহওয়াই* : ৮৪০

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭

করেন, 'হে চাদরে-আবৃত ব্যক্তি! উঠে পড়ুন, সতর্ক করুন। আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন এবং পরনের পোশাক পবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।' এরপর থেকে ওহি পুরোদমে ধারাবাহিকভাবে নাযিল হতে থাকে।[১]

ওহি নাযিলের পদ্ধতি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত ও নবুয়তপ্রাপ্তির পরবর্তী জীবন নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে ওহির প্রকারভেদ জানা প্রয়োজন। কারণ ওহিই হলো রিসালাতের উৎস; দাওয়াতের প্রাণ।

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ ওহি নাযিলের ৭টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পদ্ধতিগুলো হলো—

১. সত্যস্বপ্ন; এর মাধ্যমে নবিজির ওহির সূচনা হয়।

২. নিজ আকৃতি গোপন রেখে ফেরেশতা নবিজির কলবে ওহি ঢেলে দিতেন। যেমন : নবিজি বলেন, 'জিবরিল আমার হৃদয়ে ফুঁকে দিয়েছেন, রিজিক শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মৃত্যুবরণ করবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তমভাবে রিজিক অন্বেষণ করো। রিজিক লাভে দেরি হলে অন্যায় পথে যেয়ো না। কারণ আল্লাহর কাছে যা আছে, তা কেবল আনুগত্য দ্বারাই পাওয়া সম্ভব।'

৩. ফেরেশতা কখনো কখনো মানবাকৃতি ধারণ করে নবিজির সামনে উপস্থিত হতেন। তারপর তাকে সম্বোধন করে কথাবার্তা বলতেন। আর নবিজি তার কথামালা মুখস্থ করে নিতেন। এই স্তরে মাঝে মাঝে সাহাবিরাও তাকে দেখতে পেতেন।

৪. নবিজি ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতেন। এটি ছিল সবচেয়ে কঠিন পর্যায়। কারণ ফেরেশতা তখন নবিজির সঙ্গে একেবারে মিশে যেতেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড শীতের সময়ও নবিজির কপাল বেয়ে ঘাম ঝরত; বাহনের ওপর থাকলে বাহন মাটিতে বসে পড়ত। একবার নবিজির উরু যাইদ ইবনু সাবিতের উরুর ওপর থাকাকালে ওহি অবতীর্ণ হয়। যাইদ তখন এতটা ভার অনুভব করেন যে, তার মনে হচ্ছিল উরু চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

৫. নবিজি ফেরেশতাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পেতেন। এরপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী ওহি অবতীর্ণ হতো। এমনটি দুইবার ঘটেছে। সুরা নাজমে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪; *আল-লুলু ওয়াল মারজান* : ১০০; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১৪৯১৮; *মুসনাদু আবি দাউদ আত-তয়ালিসি* : ১৭৯৯

৬. আল্লাহ নিজে নবিজির ওপর ওহি অবতীর্ণ করতেন। যেমনটা হয়েছে আসমানের ওপরে মিরাজের রাতে সালাতের রাকাত সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে।

৭. ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ ও নবিদের মাঝে কথোপকথন। যেমন, আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গো কথা বলেছেন। এই স্তরটি কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গো কথোপকথন ইসরা বা মিরাজের হাদিস থেকে প্রমাণিত।

কেউ কেউ আরও একটি পদ্ধতি বাড়িয়ে বলেন, ৮টি পদ্ধতিতে ওহি নাযিল হয়েছে। অষ্টম পদ্ধতিতে কোনোরকম পর্দা ব্যতীত সামনাসামনি নবিজির সঙ্গো আল্লাহ তাআলার কথোপকথন হয়েছে। কিন্তু এই অভিমতটি পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আলিমের কাছে বিরোধপূর্ণ। এখানে ওহি নাযিলের ৮টি পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো;[১] যদিও বিশুদ্ধ মতানুসারে অষ্টম পদ্ধতিটি প্রমাণিত নয়।

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮

নবিজির কাঁধে সুমহান দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ① قُمْ فَأَنذِرْ ② وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ⑥ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦

হে চাদরে-আবৃত ব্যক্তি, উঠে পড়ুন, সতর্ক করুন। আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন এবং পরনের পোশাক পবিত্র রাখুন, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। অধিক পাওয়ার আশায় দান করবেন না। আর আপনার রবের জন্যই ধৈর্যধারণ করুন।[১]

ওপরের আয়াতগুলোতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশকিছু আদেশ করা হয়েছে। আদেশগুলো বাহ্যত সহজ-সরল হলেও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। প্রভাব-প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী ও দীর্ঘমেয়াদি। কারণ—

» সতর্ক করার কারণ—দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, তাদেরকে পরকালের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া, যেন তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে এবং হৃদয়ে ভয়ভীতির সঞ্চার হয়।

» রবের বড়ত্ব প্রকাশের কারণ—পৃথিবীতে যারা ক্ষমতাশীল ব্যক্তিবর্গ আছে, তারা

[১] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১-৬

অচিরেই নিঃস্ব হয়ে যাবে, তাদের সকল ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সবশেষে পৃথিবীতে টিকে থাকবে কেবল এক আল্লাহর বড়ত্ব।

» পবিত্র থাকা এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকতে বলার কারণ হচ্ছে, তিনি যেন নিজেকে ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকে পবিত্র রাখেন। সবরকম আত্মিক দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যান এবং এতটা পূর্ণতা ও পরিপক্কতা অর্জন করেন, যেন একজন মানুষ হিসেবে তিনি আল্লাহর অবারিত রহমত, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা লাভের উপযুক্ত হন। এভাবে তিনি একপর্যায়ে মানবসমাজের জন্য সর্বোত্তম দৃষ্টান্তে পরিণত হন। তখন বিশুদ্ধ অন্তরমাত্রই তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তিনিও তার ভাবগাম্ভীর্য দ্বারা বক্র হৃদয়ের প্রবণতাগুলো ধরতে পারবেন। এভাবে একসময় সমগ্র দুনিয়া তার কাছে এসে ধরা দেবে।

» নিজের অবদানের মোহে না পড়ার অর্থ হচ্ছে, তিনি তার কার্যক্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষাকে বিশাল কিছু মনে না করে একের পর এক কাজ করে যাবেন। পরিশ্রম, কুরবানি ও আত্মোৎসর্গ করতে থাকবেন। এরপর আবার সেসব ভুলে গিয়ে আল্লাহর প্রতি এতটাই মনোনিবেশ করবেন যেন নিজের ওইসব দান ও অবদানের কথা মনেই না পড়ে।

» শেষ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অচিরেই তিনি তার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বিরোধিতা, হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-উপহাসের শিকার হবেন। তাকে ও তার সঙ্গীদের মেরে ফেলার চক্রান্ত করা হবে। তার পাশে দাঁড়ানো মুমিনরা ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবে। এমন সব পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা সবাইকে ধৈর্যধারণের আদেশ করেছেন। এটা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই।

আল্লাহু আকবার! ওপরের আদেশগুলো বাহ্যিকভাবে অনেকটা সরল। পালনের দিক থেকেও কত সহজ। কিন্তু আসলে এই বিষয়গুলো অনেক ব্যাপক আর তাৎপর্যপূর্ণ!

মৌলিকভাবে উল্লেখিত আয়াতগুলো দাওয়াত ও তাবলিগের বিষয়াবলি ধারণ করে। কারণ সতর্ক করা বা ভীতিপ্রদর্শন থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ায় যে কাজগুলো সংঘটিত হচ্ছে, অচিরেই তার কর্তারা নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। যেহেতু দুনিয়ায় মানুষের সকল কাজের প্রতিফল দেওয়া হয় না; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সম্ভবও নয়। সুতরাং ভীতিপ্রদর্শন অপার্থিব একটি দিনের দাবি রাখে। আর সেই দিনটিকেই কিয়ামতের দিন, বিচারের দিন, হাশরের দিন ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আর এজন্যও পার্থিব জীবনের বাইরে এক বিশেষ জীবন আবশ্যক।

সবগুলো আয়াত বান্দার কাছে এটাই দাবি করে যে, বান্দা আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দেবে, সকল বিষয় তাঁর কাছে ন্যস্ত করবে, আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না কখনো, প্রবৃত্তির তাড়না ভুলে গিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে গুরুত্ব দেবে, নিজের ভালো বা মন্দ লাগা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিক করবে এবং সকল পরিস্থিতিতে কেবল তাঁরই ওপর নির্ভর করবে। এ হিসেবে আল্লাহর দিকে আহ্বানের উপজীব্য হবে—

» তাওহিদ বা একত্ববাদ।

» শেষ দিবসের প্রতি ঈমান।

» আত্মশুদ্ধি, যা কল্যাণকর ও ভালো কিছু অর্জনে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি এমন সব অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিহারে প্রেরণা জোগায়, যেগুলো মন্দ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

» সবকিছু আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করা।

» আর এ সবকিছুর পূর্বশর্ত হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের প্রতি ঈমান রাখা এবং তার অনুপম নেতৃত্ব ও অসামান্য নির্দেশনা মেনে চলা।

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে আরও বোঝা যায়, নবিজিকে সুউচ্চ কণ্ঠে এই মহান বিষয়ের ঘোষণা দিতে আদেশ করা হয়েছে। তাকে ঘুমের আরাম ও কম্বলের উষ্ণতা ছেড়ে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কষ্টের দিকে ধাবিত হতে বলা হয়েছে—

হে চাদরে-আবৃত ব্যক্তি, উঠে পড়ুন, সতর্ক করুন।

যেন তাকে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য বেঁচে আছে, সে আরামে থাকতেই পারে। কিন্তু যার ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তার আবার ঘুম কীসের? স্বস্তি কীসের? উষ্ণ বিছানার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। শান্তির জীবন আর ভোগবিলাস তার জন্য নয়; বরং আপনি উঠে ওই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করুন, যা আপনার অপেক্ষায় রয়েছে। সেই বোঝা কাঁধে তুলুন, যা আপনার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ধাবিত হোন কষ্ট, পরিশ্রম আর মুজাহাদার দিকে। উঠে পড়ুন, ঘুমের সময় আর নেই। এখন লাগাতার বিনিদ্র রজনী কাটানোর সময়, দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করে নেওয়ার সময়। তাই আপনি উঠে সেসবের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

সন্দেহ নেই, উল্লেখিত নির্দেশগুলো যথেষ্ট ভারী ও ভীতিকর, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘরের আরামদায়ক বিছানা থেকে তুলে এনেছে, দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মানুষের বোধ এবং জীবনের বাস্তবতার সংঘাতময় পরিস্থিতির সামনে।

নবিজি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ মহান দায়িত্ব পালন করে যান। দীর্ঘ এ সময়ে তিনি কখনো বিশ্রাম নেননি, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেননি। নিজের জন্য কিংবা পরিবারের জন্য কিছু করেননি। অবিরত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছেন, নিজের কাঁধে বিরাট বোঝা বয়ে গেছেন; কখনো সামান্য নুয়ে পড়েননি। পৃথিবীর মহান আমানতের বোঝা, সমগ্র মানবজাতির বোঝা, আকিদা-বিশ্বাসের বোঝা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কষ্ট ও যাতনার বোঝা ছিল তার একার কাঁধে। নিরবচ্ছিন্নভাবে চলা যুদ্ধের ময়দানে তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় লড়াই করে গেছেন। তার ওপর এই মহান দায়িত্ব অর্পণের পর থেকে এত লম্বা সময়ে কখনো কোনো কারণে তিনি সাময়িক বিরতিও নেননি। আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে তাকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।[১]

এই যে পরিশ্রম ও কষ্টক্লেশ নবিজি সুদীর্ঘ সময় ধরে সহ্য করে গেছেন, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমরা সামনের পাতায় তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় ও পরিক্রমা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি কার্যক্রমকে আমরা দুটি বিশেষ যুগে ভাগ করতে পারি; যার প্রত্যেকটি আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যুগ দুটি হলো—

» মক্কার যুগ। ব্যাপ্তি প্রায় ১৩ বছর।

» মদিনার যুগ। ব্যাপ্তি পূর্ণ ১০ বছর।

এই উভয় যুগ আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, যার একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। উভয় যুগে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার স্থান-কাল-পাত্র নিয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়গুলো প্রতিভাত হয়।

মক্কার যুগকে মোট ৩টি স্তরে ভাগ করা যায়—

প্রথম পর্যায় : গোপনে দাওয়াতি কার্যক্রম, যা চলেছে মোট ৩ বছর।

দ্বিতীয় পর্যায় : মক্কাবাসীদের মাঝে প্রকাশ্য ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারণা। এটি চলেছে নবুয়তের চতুর্থ বছরের শুরু থেকে দশম বছরের শেষ পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্যায় : মক্কার বাইরে দাওয়াতি কার্যক্রম। নবুয়তের দশম বছরের শেষ থেকে মদিনায় হিজরত করা পর্যন্ত এটি অব্যাহত ছিল।

---

[১] *ফি জিলালিল কুরআন*, সুরা মুযযাম্মিল ও মুদ্দাসসিরের তাফসির-অংশ, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ১৬৮-১৭২

প্রথম পর্যায় : ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন

দাওয়াতি কাজের সূচনা

শুরু থেকেই মক্কা আরবদের ধর্মীয় রাজধানী। তাই কাবার তত্ত্বাবধায়কেরা ছিল তাদের কাছে পরম পবিত্র। প্রতিমার পৃষ্ঠপোষকেরা সেখানেই বসবাস করত। প্রতিমার প্রতি যাদের সীমাহীন ভক্তি, তাদের শুদ্ধিকরণ নিঃসন্দেহে সুকঠিন, যা অন্য কোনো বিষয়ে হলে হয়তো কিছুটা সহজ হতে পারত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এই গুরুদায়িত্ব পালন যিনি করবেন, তাকে সুউচ্চ হিম্মতের অধিকারী হতে হবে—যিনি হাজারও ঝড়ঝাপটায় অটল-অবিচল থাকবেন, একটুও হেলে পড়বেন না। আর সার্বিক বিবেচনায় প্রজ্ঞার দাবি এটাই ছিল যে, দাওয়াতি কাজের শুরুটা নিভৃতেই হোক, যেন বিষয়টি মক্কাবাসীর কাছে 'মেঘহীন বৃষ্টি' মনে না হয়।

কাছের মানুষদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে তার কাছের মানুষ, পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। এমন সবার কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেন, যাদের প্রতি তার সুধারণা ছিল এবং তারাও তাকে ভালো জানতেন। তিনি তাদের সত্যানুরাগী ও কল্যাণকামী হিসেবে জানতেন। আবার তারাও নবিজির সততা ও সত্যতার প্রতি অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কে অবগত। তাই অবিলম্বে এমন কয়েকজন কালিমার দাওয়াত কবুল করে নেন, নবিজির মহত্ত্ব, বড়ত্ব ও সত্যকথনের ব্যাপারে যাদের মনে কখনো সামান্য সন্দেহও জাগেনি। ইসলামের ইতিহাসে তাদের 'সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তীগণ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের মাঝে সবার আগে ছিলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা,

নবিজির ক্রীতদাস যাইদ ইবনুল হারিসা ইবনি শুরাহবিল আল-কালবি[১], অন্তরঙ্গা বন্ধু আবু বকর ও চাচাতো ভাই আলি ইবনু আবি তালিব—তিনি তখন নবিজির তত্ত্বাবধানে থাকা ছোট্ট এক বালক। দাওয়াতি মেহনতের প্রথম দিবসেই তারা সবাই ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।[২]

এরপর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পুরো উদ্যমে দাওয়াতি কাজ শুরু করে দেন। তিনি ছিলেন নম্র-ভদ্র, সদাচারী, সচ্চরিত্র ও সকলের প্রিয়পাত্র। তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং উত্তম আচরণ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের কারণে স্বজাতির অনেকেই তার কাছে আসত। এই সুযোগে তার প্রতি আস্থাশীল কয়েকজনকে তিনি দ্বীনের দাওয়াত দেন। এতে উসমান ইবনু আফফান আল-উমাবি, যুবাইর ইবনুল আওয়াম আসাদি, আব্দুর রহমান ইবনু আওফ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবনু উবাইদিল্লা আত-তাইমি কালিমার দাওয়াত কবুল করেন। ৮ জনের এই দলটি সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাদের ইসলামের অগ্রপথিক বলা হয়।

প্রথমদিকে ইসলামের ছায়াতলে যারা এসেছেন, বিলাল ইবনু রবাহ আল-হাবশিও তাদের একজন। তারপর আসেন এই উম্মতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি, বনু হারিস ইবনু ফিহরের কৃতি সন্তান আবু উবাইদা আমির ইবনুল জাররা, আবু সালামা ইবনু আব্দিল আসাদ, আরকাম ইবনু আবিল আরকাম আল-মাখযুমি, উসমান ইবনু মাজউন ও তার দুই ভাই—কুদামা ও আব্দুল্লাহ, উবাইদা ইবনুল হারিস ইবনি আব্দিল মুত্তালিব ইবনি আব্দি মানাফ, সাইদ ইবনু যাইদ আল-আদাবি ও তার স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব আল-আদাবিয়া, খাব্বাব ইবনুল আরত, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ আল-হুজালিসহ আরও অনেকে। তারা হলেন সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী। প্রত্যেকেই কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিশামের মতে, তারা ছিলেন সংখ্যায় ৪০ জন।[৩] তবে তাদের কারও কারও ব্যাপারে 'সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী' হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

বেশকিছু নারী-পুরুষ ধাপে ধাপে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর একটা সময় মক্কায় ইসলামের খবর ছড়িয়ে পড়ে, নানারকম আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয় তখন।[৪]

---

[১] তাকে বন্দি করে এনে গোলাম বানানো হয়েছিল। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ক্রয়সূত্রে তার মালিক। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেন। একদিন তার বাবা ও চাচা তার ব্যাপারে জানতে পেরে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিতে আসে, তখন তিনি নবিজির সান্নিধ্যকেই গ্রহণ করেন। এরপর নবিজি তাকে পুত্র বানিয়ে নেন। এজন্য আরবদের রীতি অনুসারে তাকে যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলা হতো। ইসলাম এসে এ ধরনের 'পুত্র বানানোর রীতি' বাতিল ঘোষণা করে।

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬২

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬২

তারা সকলেই গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে একত্রিত হতেন, প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নির্দেশনা দিতেন। কারণ তখনো দাওয়াতি কার্যক্রম ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অপ্রকাশ্যেই চলছিল। সুরা মুদ্দাসসিরের প্রথম আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর ওহির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এ সময় যে আয়াত ও সুরার অংশগুলো অবতীর্ণ হতো, তা ছিল ছোট ছোট ও ছন্দবদ্ধ। শেষ হতো খুব চমৎকারভাবে। এর প্রশান্ত ও আকর্ষণীয় অন্ত্যমিল কোমল এক আবহের সঙ্গে মিলিয়ে যেত। জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্য ভেসে বেড়াত চোখের সামনে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মুমিনরা যেন চলে যেত অন্য এক জগতে, চারপাশের কোলাহল থেকে দূরে-বহুদূরে।

দিনে ২ ওয়াক্ত সালাত!

মুকাতিল ইবনু সুলাইমান বলেন, ইসলামের শুরুর দিকে আল্লাহ তাআলা সকাল-সন্ধ্যা দুই ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। কুরআনুল কারিমের আয়াত থেকে এমনটিই বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

আপনি সকাল ও সন্ধ্যায় আপনার রবের প্রশংসা-সহ তাসবিহ পাঠ করুন।[১]

ইবনু হাজার বলেন, ইসরা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিরা সালাত আদায় করতেন, তা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়ার পূর্বে অন্য কোনো ফরজ সালাত ছিল কি না, তা নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে দুই ওয়াক্ত সালাত ফরজ ছিল। হারিস ইবনু উসামা, ইবনু লাহিআর সূত্রে যাইদ ইবনুল হারিসা থেকে বর্ণনা করেন যে, ওহি নাযিলের প্রথমদিকে জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওজু করা শিখিয়ে দেন। ওজু শেষ করার পর নবিজি এক-অঞ্জলি পানি নিজের নিম্নাঙ্গের ওপর ছিটিয়ে দেন। একই রকম *ইবনু মাজাহর* বর্ণনাও পাওয়া যায়। বারা ইবনু আযিব ও ইবনু আব্বাস থেকেও কাছাকাছি অর্থের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্বাসের হাদিসে বলা হয়েছে, 'সেটি ছিল প্রথম ফরজ।'[২]

ইবনু হিশাম উল্লেখ করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার

---

[১] সুরা গাফির, আয়াত : ৫৫

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৮৮

সাহাবিরা সালাতের সময় হলে নির্জন পাহাড়ের উপত্যকায় গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে সালাত আদায় করতেন। আবু তালিব একবার আল্লাহর রাসুল ও আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সালাত আদায় করতে দেখে এ বিষয়ে জানতে চান। বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে পেরে তিনি তাদের অবিচল থাকতে বলেন।[১]

কুরাইশদের কানে ইসলামের বাণী

বাস্তবতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, দাওয়াতের এই স্তরটি যদিও অপ্রকাশ্যে ও ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল, তারপরও এর সংবাদ একসময় কুরাইশদের কানে পৌঁছে যায়। কিন্তু প্রথমদিকে তারা এ বিষয়টি নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায়নি। মুহাম্মাদ আল-গাযালি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, লোকমুখে ইসলামি দাওয়াতের কথা কুরাইশদের কানে গেলে, তারা প্রথমে এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। সম্ভবত তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাধারণ ধার্মিকদের মতো মনে করেছিল, যাদের সকল ধর্মীয় আলাপ বৈরাগ্যবাদ ও সংসার বিরাগের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকত। এমন হয়ে থাকলে তাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কারণ তার আগেও অনেকে এ ধরনের মতবাদ প্রচার করেছে। যেমন : উমাইয়া ইবনু আবিস-সালত, কায়িস ইবনু সাআদা, আমর ইবনু তুফায়েল এবং আরও অনেকে।

তবে কিছুদিন যেতে না-যেতেই তাদের ভুল ভাঙে। নবিজির প্রকৃত অবস্থা এবং ইসলাম ও তার দাওয়াতি কার্যক্রমের গতি-প্রকৃতি জেনে তারা রীতিমতো আঁতকে ওঠে। এরপর থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নবিজির সার্বিক পদক্ষেপ ও দাওয়াতি কার্যক্রমের ব্যাপারে নজরদারি বাড়িয়ে দেয় তারা।[২]

৩ বছর পর্যন্ত এ দাওয়াতি কার্যক্রম গোপনে ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এরই মধ্যে মুমিনদের এমন একটি দল তৈরি হয়ে যায়, যাদের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ওপর এবং যারা রিসালাতের দাওয়াত সর্বত্র পৌঁছে দিতে সদাপ্রস্তুত। এমন একটি দল গড়ে উঠলে নবিজির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ চলে আসে, তিনি যেন স্বজাতির কাছে প্রকাশ্যে দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাদের সকল বিভ্রান্তি ও প্রতিমাপ্রীতির অসারতা তুলে ধরেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৭

[২] *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৬

দ্বিতীয় পর্যায় : মক্কার বুকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত

দ্বীন প্রচারে আল্লাহর আদেশ

কুরআনুল কারিমে দ্বীনের দাওয়াত-বিষয়ক আল্লাহ তাআলার প্রথম বাণী—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।[১]

এটি সুরা শুআরার আয়াত। এ সুরার শুরুতে মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে—যাতে তার নবুয়তপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে বনি ইসরাইল-সহ তার হিজরত, ফিরাউন ও তার জাতির হাত থেকে মুক্তি এবং পরিশেষে ফিরাউনের দলবল ডুবে মরা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়াদি ফুটে উঠেছে। ফিরাউন ও তার জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, এই সুরায় তার সবই উঠে এসেছে।

আমার মনে হয়, আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াতের আদেশ দেওয়ার সময়ই এ বিবরণ তুলে ধরেছেন, যেন প্রকাশ্য দাওয়াত-পরবর্তী পরিস্থিতি তার সামনে থাকে এবং তিনি বুঝেশুনে দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে পারেন। স্বজাতির লোকদের মিথ্যাচার ও অত্যাচার যেন তাকে তার মিশন থেকে বিরত রাখতে না পারে।

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ২১৪

মুসা আলাইহিস সালামের পাশাপাশি এই সুরায় নুহ, আদ, সামুদ, ইবরাহিম ও লুত আলাইহিমুস সালামের জাতি এবং আইকাবাসীদের মধ্য থেকে যারা রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের পরিণতিও আলোচিত হয়েছে। সেসব আলোচনা এবং বিশেষত ফিরাউন ও তার জাতি-সম্পৃক্ত বিষয়গুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অদূর ভবিষ্যতে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা যেন তাদের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পায় এবং যারা অব্যাহতভাবে মিথ্যাচার করেই যাবে, তারাও যেন আল্লাহর আজাবে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জেনে নেয়। সর্বোপরি মুমিনরাও যেন বিশ্বাস রাখে যে, উত্তম পরিণতি তাদের জন্যই, মিথ্যাবাদীদের জন্য নয়।

আপনজনদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত

প্রকাশ্য দাওয়াত-সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু হাশিমকে দাওয়াত দেন। তাদের সাথে বনুল মুত্তালিব ইবনু আব্দি মানাফের লোকজনও ছিল। উপস্থিত লোকদের সংখ্যা ৪৫ জনের মতো হবে। নবিজি কথা শুরু করবেন, এমন সময় আবু লাহাব বলতে শুরু করে—'এখানে যারা আছে, তারা সকলেই তোমার চাচা কিংবা চাচাতো ভাই। তাই ভণিতা না করে যা বলার স্পষ্ট করেই বলো। দেখো, তোমার স্বজাতির এত ক্ষমতা নেই যে, তারা সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে লড়বে। আর তোমার কিছু হলে আমাকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং তোমার বাপদাদার বংশের লোকেরাই তোমার জন্য যথেষ্ট। (আর এখন যা করছ, তা যদি চালিয়েই যাও, তাহলে কুরাইশ গোত্রগুলোর জন্য তোমাকে আক্রমণ করা সহজ হয়ে যাবে। সমগ্র আরবজাতিও তাদের সাহায্য করবে।) তুমি যেভাবে নিজের বাপ-দাদাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ, এমনটা কখনো করতে দেখিনি কাউকে।' এসব শুনে নবিজি চুপ হয়ে যান। কোনো কথা না বলে চলে আসেন সেই মজলিস থেকে।

নবিজি দ্বিতীয়বার তাদের সমবেত করে বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমি তাঁর গুণগান করছি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাঁর ওপর ভরসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই।'

তারপর তিনি বলেন, 'একজন পথপ্রদর্শক কখনো তার আপনজনদের মিথ্যা বলে না। ওই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এবং সাধারণভাবে সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল। কসম আল্লাহর, তোমরা যেভাবে ঘুমাও, সেভাবে একদিন মারা যাবে; আবার যেভাবে ঘুম থেকে জেগে ওঠো, সেভাবেই একদিন পুনরুত্থিত হবে। তোমাদের প্রতিটি কাজের হিসেব নেওয়া হবে। এরপর প্রতিদান হবে স্থায়ী জান্নাত বা জাহান্নাম।'

এসব কথা শুনে আবু তালিব বলেন, 'আমাদের কাছে তোমাকে সাহায্য করা কতটা

প্রিয়, তোমার উপদেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ অথবা তোমার কথার সত্যায়ন কতটা জরুরি—এসব জানতে চাওয়ার দরকার নেই। এখানে তোমার বাবার বংশের সকলেই রয়েছে। আমিও তাদেরই একজন। তবে হ্যাঁ, তোমার চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি সবার আগে থাকব। তাই যেসব ব্যাপারে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে, তাতে তুমি অবিচল থাকো। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব। কিন্তু আমার মন আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ছাড়তে সায় দেয় না।'

আবু লাহাব বলে, 'নিঃসন্দেহে এটা ভ্রষ্টতা! অন্যরা তাকে থামানোর আগে—ভালো চাও তো—তোমরাই থামিয়ে দাও।' জবাবে আবু তালিব বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে আছি কেউ তাকে একটা টোকাও দিতে পারবে না।'[১]

সাফা পাহাড়ে একদিন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের পক্ষ থেকে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে থাকেন। এ কাজে বাধা এলে আবু তালিব সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এতে তিনি একটু সাহস পান। একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে সুউচ্চ আওয়াজে সবাইকে ডাকেন। ডাক শুনে কুরাইশের একাধিক শাখাগোত্র সমবেত হয়। তিনি তাদেরকে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানান। ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে এই ঘটনার কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

যখন অবতীর্ণ হয়—'وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ' অর্থাৎ 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন', তখন নবিজি সাফা পাহাড়ে উঠে (নাম ধরে) ডাক দেন, হে বনু ফিহর, হে বনু আদি...। নবিজির ডাক শুনে তারা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হয়। যে আসতে পারেনি, সেও প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়। আবু লাহাব থেকে শুরু করে কুরাইশের অনেকেই উপস্থিত হয় সেখানে। নবিজি তখন সকলের উদ্দেশে বলেন, 'আচ্ছা, আমি যদি আপনাদের বলি যে, পাহাড়ের ওপাশে একদল শত্রু আপনাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন?' সকলে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, করব। কারণ আমরা কখনোই তোমাকে মিথ্যে বলতে দেখিনি।' নবিজি তখন বলেন, 'আমি আপনাদের সবাইকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি, যা খুবই সন্নিকটে।' এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে ওঠে, 'তোমার সারাদিন মন্দ কাটুক! এটা বলার জন্য তুমি আমাদের এখানে ডেকেছ?' সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের এই আয়াত-দুটি অবতীর্ণ হয়—

---

[১] *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৭৭-৭৮

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয়, ধ্বংস হোক তার সত্তা। তার অর্থ ও উপার্জিত সম্পদ—যা তার কোনো কাজে আসেনি।[১]

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহও আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই ঘটনার অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۝٢١٤

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।[২]

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে নবিজি ছোট-বড়, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, 'হে কুরাইশ, তোমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে বনু কাব, তোমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো।' এরপর তিনি নিজ কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেন—

وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ ، إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا

হে ফাতিমা, নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা আল্লাহর সামনে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। তবে হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, (দুনিয়ায়) আমি তা রক্ষা করে যাব।[৩]

নবিজির এই উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তার নিকটাত্মীয়দের জানিয়ে দিয়েছিলেন, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রাণ হলো—রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে যে গোঁড়ামি তাদের মাঝে ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সতর্কবাণীর উত্তাপে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৭৭০; *সহিহ মুসলিম* : ২০৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৩৬২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৮০১

[২] সুরা শুআরা, আয়াত : ২১৪

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২০৪; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৩১৩; *রিয়াজুস সালিহিন* : ৩২৯; *সহিহুল আদাবিল মুফরাদ*, পৃষ্ঠা : ৪৭

হকের জয়গান শিরকের অবসান

দ্বীনি দাওয়াতের এই আওয়াজ মক্কার আনাচে-কানাচে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এরপর অবতীর্ণ হয় আল্লাহ তাআলার বাণী—

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, তা আপনি উচ্চকণ্ঠে ছড়িয়ে দিন। আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।[১]

এই আদেশ পাওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌত্তলিকতার ভ্রষ্টতা ও তুচ্ছতা সকলের সামনে তুলে ধরেন; মূর্তির প্রকৃত অবস্থা ও মূল্যহীনতা বুঝিয়ে বলেন; বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে সেগুলোর অক্ষমতা বর্ণনা করেন। নবিজি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'যারা এসব প্রতিমার পূজা করছে, এগুলোকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসিলা মনে করছে, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট।'

প্রকাশ্যে মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের বিভ্রান্তি তুলে ধরার পর কুরাইশরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে, নবিজির বক্তব্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। নবিজির হাত ধরে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, তারা সেটা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিতে চায়। তাদের মনে এই শঙ্কা—অচিরেই কুরাইশদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যাবে।

এসব ভেবে তারা যারপরনাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কারণ তারা খুব ভালো করে জানত, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্যকে বাতিল করা এবং রিসালাত-আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো—নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও সর্বোচ্চ নতিস্বীকার। এই ঘোষণার পর তাদের সমস্ত কিছু আল্লাহর হয়ে যাবে। তখন নিজেদের জানমালের ওপরই তাদের কোনো ইচ্ছাধিকার থাকবে না; অন্যদের ওপর তো নয়ই। পাশাপাশি ধর্মীয় মোড়কে আরবদের ওপর তাদের যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, সেটাও তারা হারাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টির সামনে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। নিম্নশ্রেণির লোকদের ওপর জুলুম-নির্যাতনসহ সকাল-সন্ধ্যা যেসব পাপাচারে তারা লিপ্ত, সেগুলোও আর করতে পারবে না। এই অর্থ বুঝতে পেরেই তাদের অন্তর এমন 'অবমাননাকর' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সায় দিচ্ছিল না। তাদের এই বিরুদ্ধাচরণের সম্মানজনক ও কল্যাণকর কোনো উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নেশায় মত্ত। কুরআনের ভাষায়—

---

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৯৪

بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝٥

বরং মানুষ ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়।[১]

তারা এ বিষয়গুলো খুব ভালো করেই বুঝতে পারে। কিন্তু যে মানুষটার সততা ও সত্যতা এতটা গ্রহণযোগ্য, যে নেতৃত্ব ও উত্তম চরিত্রের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, তার বিরুদ্ধে কীই-বা করার আছে তাদের! বাপদাদার ইতিহাসে তার কোনো উপমা বা নমুনা তাদের জানা ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে তাদের কী করার থাকতে পারে! এসব নিয়ে তারা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

অনেক চিন্তাভাবনার পর একটা উপায় তাদের মাথায় আসে। তারা ঠিক করে, নবিজির চাচা আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলবে, তিনি যেন তার ভাতিজাকে ফেরান। কথাগুলো খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হবে, প্রয়োজনে সম্মান-মর্যাদা ও বাস্তবতার দোহাই দিয়ে বলতে হবে, উপাস্যদের পরিহার করার যে আহ্বান, তাদের উপকার ও ক্ষমতা অস্বীকার করার যে বক্তব্য—এসব নিঃসন্দেহে নিকৃষ্ট গালি ও চরম অপমানের মতো। শুধু তা-ই নয়, এতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, তাদের ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী বলা হচ্ছে।

আবু তালিবের সাথে কুরাইশদের বৈঠক

ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলে, 'আবু তালিব, তোমার ভাতিজা আমাদের উপাস্যকে হেয় করেছে, ধর্মের নিন্দা করেছে, জ্ঞানীদের নির্বোধ বলেছে, পূর্বপুরুষদের পথভ্রষ্ট বলছে। হয় তুমি তাকে ফেরাও আর নয়তো তাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। কারণ তোমার সাথে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। আমরাই তাকে দেখে নেব।' আবু তালিব খুব ঠান্ডা মাথায়, নম্র ভাষায়, বিনয়ের সাথে জবাব দেন। তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে তারা ফিরে যায়। ওদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে থাকেন।[২]

দ্বীন থেকে হাজিদের দূরে রাখার চক্রান্ত

এ সময় কুরাইশদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। তা হলো, প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক মাস; এরই মধ্যে হজের মৌসুম চলে এসেছে।

---

[১] সুরা কিয়ামা, আয়াত : ৫

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৫

তারা জানে, হজের সময় আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোকজন মক্কায় আসবে। তাই আগত আরব মেহমানদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন কিছু বলতে হবে, যেন তারা তার কথায় প্রভাবিত না হয়। এই পরিকল্পনা নিয়ে তারা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার কাছে হাজির হয়। ওয়ালিদ তাদের বলে, 'তোমরা তার ব্যাপারে বলার মতো সুনির্দিষ্ট কিছু খুঁজে বের করো, যাতে শব্দ ব্যবহারে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা না দেয়; অন্যথায় তোমরাই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে এবং এতে তোমাদের কথার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হবে।' তারা বলে, 'তাহলে তুমিই বলো, কী বলা যায়?' সে বলে, 'বরং তোমরাই বলো, আমি শুনছি।' তারা বলে, 'আমরা তাকে গণক বলব।' ওয়ালিদ বিরোধিতা করে বলে, 'আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। আমি বহু গণক দেখেছি। গণকের যে আচরণ-উচ্চারণ, তার মাঝে সেগুলো নেই।' তারা বলে, 'তাহলে পাগল বলব। পুনরায় ওয়ালিদের জবাব, 'সে পাগলও নয়। আমরা তো জীবনে কম পাগল দেখিনি। পাগলামির যে আলামত, সেসব তার মাঝে একটুও নেই।' তারা বলে, 'তাহলে আমরা তাকে কবি বলব। সে বলে, সে কবি নয়। কবিতার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। কোনোভাবেই তার কথামালা কবিতা হতে পারে না।' তারা প্রস্তাব দেয়, 'তবে কি তাকে জাদুকর বলব?' সে বলে, মুহাম্মাদ জাদুকরও হতে পারে না। আমরা বহু জাদুকরের জাদু দেখেছি। তারা যে ফুৎকার দেয়, গিঁট দেয়—এসবের কিছুই সে করে না।' আগত কুরাইশ-দল শেষমেশ হতাশ হয়ে বলে, 'আমরা তাহলে কী বলব!' এবারে ওয়ালিদ বলতে শুরু করে, 'আল্লাহর কসম, তার কথায় মুগ্ধতা-মিষ্টতা মেশানো। তার কথামালা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তোমরা তার বিরুদ্ধে যা-ই বলো না কেন, তা যে মিথ্যা, মানুষেরা তা ধরে ফেলবে। তারপরও তাকে তোমরা জাদুকর নাম দিতে পারো। সে এমন কিছু জাদুকরী কথাবার্তা বলে, যাতে পিতা-পুত্র, ভাই-ভগ্নি, স্বামী-স্ত্রী এবং ব্যক্তি ও পরিবারের মাঝে বিচ্ছেদ তৈরি হয়।' এই সিদ্ধান্তের ওপর স্থির হয়ে তারা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার কাছ থেকে ফিরে যায়।[১]

কিছু কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, ওয়ালিদ তাদের এসব প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তখন তারা তার কাছে পরামর্শ চায়। সে তাদের কাছে সময় চেয়ে নেয়। এ নিয়ে বিস্তর ভাবে। এরপর তার কাছে উল্লেখিত মতটি তুলনামূলক কার্যকর ও নিরাপদ মনে হয়।[২]

ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে সুরা মুদ্দাসসিরের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাতে তার চিন্তাফিকিরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭১

[২] দেখুন, *ফি জিলালিল কুরআন*, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ১৮৮

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, ধ্বংস হোক সে; কীভাবে সে মনস্থির করেছে! আবার ধ্বংস হোক সে; কীভাবে সে মনস্থির করেছে! সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, তারপর সে ভ্রু কুঁচকে ফেলেছে এবং মুখ বিকৃত করেছে। এরপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে এবং অহংকার করেছে। তারপর বলেছে, এ তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া কিছু নয়। এ তো মানুষের উক্তি ছাড়া কিছু নয়।[১]

সিদ্ধান্ত স্থির হলো, এবার বাস্তবায়নের পালা। মক্কার সকল প্রবেশপথে আগন্তুকদের অপেক্ষায় তারা অবস্থান নেয়। তাদের পাশ দিয়ে যারাই হারামে প্রবেশ করে, নবিজির ব্যাপারে তারা তাদের সতর্ক করে দেয়।[২]

এসবের মধ্যেও নবিজি যথাসময়ে আগন্তুকদের অবতরণস্থল, উকাজ, মাজান্না, জুল-মাজায এবং অন্যান্য মেলা ও মিলনকেন্দ্রে গিয়ে গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি যখনই কোথাও যাচ্ছিলেন, আবু লাহাব তার পিছু পিছু গিয়ে বলছিল, 'তোমরা তার কথায় কান দিয়ো না; সে একজন ধর্মত্যাগী, মিথ্যাবাদী।'

এতে করে আরবরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়ে আরও ভালোভাবে জানতে আগ্রহী হয় এবং তাদের মাধ্যমে সমগ্র আরব ভূমিতে তার আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে।

দ্বীন প্রচারে যত বাধা

কুরাইশরা যখন বুঝতে পারল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনোভাবেই তার কাজ থেকে ফেরানো সম্ভব নয়; তখন তারা আবার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করে। নবিজির দাওয়াতি মিশন সমূলে উৎপাটনের জন্য তারা যেসকল পন্থা অবলম্বন করেছিল, তার সারাংশ নিচে তুলে ধরছি—

[এক] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের উপহাস ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করা—এসব করে তারা মুসলিমদের মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করতে চাইত। নবিজির ওপর খুবই ফালতু ও হাস্যকর অপবাদ দিত। তারা

[১] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১৮-২৪

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭১

তাকে পাগল বলত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

তারা আপনাকে বলে, তোমার ওপর নাকি কুরআন নাযিল হয়েছে! তুমি তো একটা পাগল![১]

তারা তার কথাকে জাদু ও মিথ্যা বলত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾

তারা অবাক হয় এটা ভেবে যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছে। আর কাফিররা বলে, এ তো এক মিথ্যাচারী জাদুকর।[২]

তারা তাকে বাঁকা চোখে দেখত। তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

কাফিররা যখন কুরআন শোনে, তখন তারা যেন কড়া দৃষ্টিতে আপনাকে আছড়ে ফেলবে এবং তারা বলে, সে তো একজন পাগল।[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার দুর্বল সাহাবিদের নিয়ে কোথাও বসতেন, তারা উপহাস করে বলত, কুরআনের ভাষায়—

...أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا... ﴿٥٣﴾

আমাদের সবার মধ্য থেকে এদেরকেই বুঝি আল্লাহ আপন অনুগ্রহ দান করেছেন?[৪]

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ৬

[২] সুরা স-দ, আয়াত : ৪

[৩] সুরা কলাম, আয়াত : ৫১

[৪] সুরা আনআম, আয়াত : ৫৩

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন?[১]

তাদের সেসব ঘটনা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন এভাবে—

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾

যারা অপরাধী, তারা মুমিনদের উপহাস করত এবং তারা যখন তাদের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করত, তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেত, তখনো হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা মুমিনদের দেখত, তখন বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত। অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে পাঠানো হয়নি।[২]

[দুই] নবিজির শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের ব্যাপারে মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করা, তার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অবান্তর যুক্তি দাঁড় করানো—এসব তারা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার করে বেড়াত, যেন জনসাধারণ তার দাওয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার সময়ই না পায়। কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾

তারা বলে, এগুলো তো আগেরকার লোকদের উপাখ্যানমাত্র, যা সে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে এসবেরই চর্চা হয়।[৩]

[১] প্রাগুক্ত

[২] সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ২৯-৩৩

[৩] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৫

...إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ...

এটা তার উদ্ভাবিত মিথ্যা মাত্র। অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে এতে।[১]

...إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ...

এক ব্যক্তি তাকে এসব শিখিয়ে দেয়।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে তাদের কথাগুলো কুরআনের পাতায় এভাবে ফুটে উঠেছে—

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ...

তারা বলে, এ কেমন রাসুল, যে খাবার খায় আবার হাটে-বাজারে চলাফেরাও করে![৩]

কুরআনুল কারিমে তাদের এসব অসার আপত্তি ও কুযুক্তির খণ্ডন করা হয়েছে নানাভাবে।

[তিন] কুরআন থেকে জনমানুষকে ফিরিয়ে রাখা। বর্ণিত আছে, নজর ইবনুল হারিস কুরাইশদের একবার বলে, 'শোনো কুরাইশের লোকেরা, তোমরা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছ, ভবিষ্যতে যা তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। মুহাম্মাদ তোমাদেরই একজন। সে ছিল তোমাদের মাঝে সকলের প্রিয়, সবচেয়ে সত্যবাদী, সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। এরপর পরিণত বয়সে সে তার নিজস্ব মতবাদ নিয়ে হাজির হলো। তখন তোমরা তাকে জাদুকর বললে। আল্লাহর কসম, সে জাদুকর নয়। আমরা জাদু ও জাদুকরদের কৃতকর্ম দেখেছি। তারপর তোমরা তাকে গণক বললে। আল্লাহর কসম, সে গণক নয়। আমরা গণকদের কাজকর্ম দেখেছি। এরপর কবি বললে। আল্লাহর কসম, সে কবিও নয়। আমরা কবিতা দেখেছি এবং কবিতার ধরন ও প্রকারভেদ সম্পর্কে আমরা জানি। তারপর বললে পাগল। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। আমরা পাগলদের পাগলামি দেখেছি। তবে তার মাঝে এ ধরনের কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনি। শোনো আমার কুরাইশের ভাইয়েরা, নিজেদের কী গতি হবে, তা নিয়ে ভাবো।

---

[১] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৪

[২] সুরা নাহল, আয়াত : ১০৩

[৩] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৭

আল্লাহ কসম, তোমাদের ওপর বিশাল কিছু নেমে এসেছে।'

নজর ইবনুল হারিস একবার হিরায় গমন করে। সেখান থেকে সে পারস্যের রাজাদের গল্প এবং বাদশাহ রুস্তম ও ইসফানদিয়ারের কাহিনি জেনে আসে। এরপর যখনই নবিজি কোনো মজলিসে জিকিরের পুরস্কার এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার পরিণতি নিয়ে আলোচনা করতেন, সেখানে হাজির হয়ে সে বলত, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ কিছুতেই আমার চেয়ে ভালো গল্প বলতে পারবে না।' এরপর সে পারস্যের রাজাবাদশাহ, রুস্তম ও ইসফানদিয়ারের কাহিনি শুরু করে দেয় আর লোকদের জিজ্ঞেস করে, 'তোমরাই বলো, মুহাম্মাদের গল্প কি আমার গল্পের চেয়ে ভালো?'[১]

নজর কয়েকজন দাসী কিনে এনেছিল। এরপর যখনই সে বুঝতে পারত, নবিজির প্রতি কেউ আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন সে একটা দাসী ওই ব্যক্তির পেছনে লেলিয়ে দিত। দাসীটি তাকে পানাহার, গানবাজনা আর খেল-তামাশায় মজিয়ে রাখত, যেন ইসলামের প্রতি কোনো আকর্ষণ তার হৃদয়ে আর অবশিষ্ট না থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন[২]—

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ... ﴿٦﴾

এক শ্রেণির লোক আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অনর্থক কথাবার্তা সংগ্রহ করে।[৩]

[চার] গোঁজামিলের চেষ্টা। তারা নবিজিকে প্রস্তাব দিল, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। অর্থাৎ মুশরিকরা তাদের কিছু ধর্মীয় রীতি ত্যাগ করবে, আবার নবিজিও ইসলামের কিছু বিধান ছেড়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন—

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾

তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।[৪]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৯-৩০০, ৩৫৮; *তাফহিমুল কুরআন,* সাইয়িদ আবুল আলা মওদুদি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮-৯; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১১৭-১১৮

[২] সুরা লুকমান, আয়াত : ৬

[৩] *তাফহিমুল কুরআন,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯

[৪] সুরা কলাম, আয়াত : ৯

এ বিষয়ে ইমাম ইবনু জারির ও তাবরানি থেকে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায়—মুশরিকরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব পেশ করল, তিনি পূর্ণ ১ বছর তাদের উপাস্যদের উপাসনা করবেন, তারপর আবার তারা পূর্ণ ১ বছর নবিজির রবের ইবাদত করবে।

আবদ ইবনু হুমাইদ থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে, তারা বলেছিল, 'তুমি যদি আমাদের প্রভুদের মেনে নাও, আমরাও তোমার রবকে মেনে নেব।'[১]

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ইবনি আসাদ ইবনি আব্দিল উযযা, ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা, উমাইয়া ইবনু খালফ, আস ইবনু ওয়াইল আস-সাহমি নবিজির গতিরোধ করে। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে নবিজিকে প্রস্তাব জানায়, 'চলো মুহাম্মাদ, আমরা তোমার উপাস্যের উপাসনা করব আর তুমিও আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করবে। এতে আমরা সবাই একটা মীমাংসায় পৌঁছতে পারব। তখন তোমার উপাস্য যদি আমাদের উপাস্যদের তুলনায় উত্তম হয়, তাহলে আমরা তাঁর থেকে কল্যাণ লাভ করব। আর আমাদের উপাস্যরা যদি তোমার উপাস্যের চেয়ে উত্তম হয়, তবে তুমিও তাদের থেকে কল্যাণ লাভ করবে।' তাদের এই প্রস্তাবের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সুরা কাফিরুন অবতীর্ণ করেন—

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

বলুন, হে কাফিরগণ, তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদত করি না এবং আমি যার ইবাদত করি, তোমরাও তার ইবাদতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদতকারী নই। আমি যার ইবাদত করি, তোমরাও তার ইবাদতকারী নও। তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য, আমার দ্বীন আমার জন্য।[২][৩]

আল্লাহ তাআলা এই শক্ত জবাবের মাধ্যমে তাদের হাস্যকর প্রস্তাবটি ধূলিসাৎ করে দেন।

---

[১] *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০৫, ৫০১

[২] সুরা কাফিরুন, আয়াত : ১-৬

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬২

তাদের প্রস্তাব বিষয়ে বর্ণনায় বৈপরীত্য আসার কারণ হতে পারে, সমতা ও সমঝোতার জন্য তারা বিভিন্নভাবে ও কয়েকবার চেষ্টা করেছে।

অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

নবুয়তের চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে মুশরিকরা তা বন্ধ করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ বা মাস তাদের সকল প্রচেষ্টা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ। নির্যাতন-নিপীড়নের পথে তারা তখনো পা বাড়ায়নি। কিন্তু যখন তারা দেখল, এভাবে ইসলামের দাওয়াত থামানো যাচ্ছে না, তখন তারা আবার পরামর্শ সভায় সমবেত হলো। ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংগঠন ছিল তাদের। সকলেই কুরাইশের নেতৃস্থানীয়। আর এদের নেতৃত্ব দিত আবু লাহাব। চিন্তাভাবনা ও পরামর্শের পর তারা নবিজি ও তার সাহাবিদের বিরুদ্ধে এবার চরমপন্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক করে—কোনোভাবেই আর ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ এবং নবিজি ও তার সাহাবিদের জুলুম-নির্যাতনের ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়া যাবে না। সব রকমের ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন করা হবে তাদের।[১]

সভায় তারা মুসলিম নিপীড়নের সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবায়নের উদ্যোগও নেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। মুসলিমরা দুর্বল ছিল বলে তাদের নির্যাতন করা তুলনামূলক সহজ। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, শত্রু-মিত্র সকলেই তাকে সম্মান করে চলে। তার মতো মানুষকে শ্রদ্ধা না করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, নির্বোধ ও নিম্নশ্রেণির লোক ছাড়া কেউ তাকে ছোট করে দেখে না, তাছাড়া তিনি সবসময় আবু তালিবের আশ্রয়ে থাকেন, যে কিনা মক্কার প্রভাবশালীদের একজন, যিনি বংশগতভাবেই সম্মানিত, তার জিম্মা ও নিরাপত্তা অন্য সবার ওপরে, সেহেতু কুরাইশরা সরাসরি তাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে অদম্য বিপ্লব তাদের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও পার্থিব কর্তৃত্বের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে, সে ব্যাপারে তারা আর কতদিন সহ্য করে যাবে?

নবিজির বিরুদ্ধে তারা ভয়ংকর শত্রুতা পোষণ করতে থাকে। হতভাগা আবু লাহাব ছিল তাদের সবার আগে। কুরাইশরা এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার বহু আগেই এই লোক নবিজির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রেখেছে। আমরা আগেই জেনেছি, বনু হাশিমের মজলিস এবং সাফা পাহাড়ের জনসভায় সে কী আচরণ করেছে। কিছু কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাফা পাহাড়ের ঘটনার সময় সে নবিজিকে আঘাত করার জন্য হাতে পাথরও নিয়েছিল।[২]

---

[১] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬২

[২] *আল-কাশশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিজিত তানজিল*, আল্লামা জামাখশারি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮১৩;

নবুয়তপ্রাপ্তির আগে নবিজির দুই কন্যা—রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমের সঙ্গে আবু লাহাব তার দুই পুত্র—উতবা ও উতাইবার বিয়ে দেয়। পরে ক্ষেপে গিয়ে সে দুই ছেলেকে তালাক দিতে নির্দেশ দেয় এবং তারাও তালাক দিয়ে দেয়।[১]

নবিজির দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে আবু লাহাব সুসংবাদ দিতে বন্ধুদের কাছে ছুটে যায়। মহা-আনন্দের সাথে তাদের বলে, 'আরে...মুহাম্মাদ তো নির্বংশ হয়ে যাচ্ছে!'[২]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, আবু লাহাব হজের মৌসুমে লোকসমাগমে এবং হাট-বাজারে নবিজির পিছু নিয়ে তার নামে মিথ্যা বলে বেড়াত। এমনকি তারিক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুহারিবির বর্ণনা থেকে বোঝা যায়—সে কেবল মিথ্যে অপবাদ দিয়েই থেমে থাকেনি; বরং নবিজিকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত পর্যন্ত করেছে।[৩]

আবু লাহাবের স্ত্রী, যে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন—উম্মু জামিল বিনতু হারব ইবনি উমাইয়া—নবিজির প্রতি শত্রুতা পোষণের ক্ষেত্রে স্বামীর চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। সে রাতের বেলায় নবিজির চলার পথে ও দরজার সামনে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। বেশ রুক্ষভাষী আর ঝগড়াটে এক নারী। শুধু তা-ই নয়; মিথ্যে অপবাদ দেওয়া, চক্রান্ত করা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সে ভীষণ পটু। নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহি ছিল এই হতভাগিনী। এজন্য কুরআনুল কারিমে তাকে 'হাম্মা-লাতাল-হাতাব' বা 'ইন্ধন বহনকারিণী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তার স্বামীর ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের সুরা অবতীর্ণ হয়েছে জেনে উত্তেজিত হয়ে সে নবিজির কাছে আসে। নবিজি তখন বাইতুল্লাহর কাছে মাসজিদুল হারামে বসে আছেন। সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। আসার সময় আবু লাহাবের স্ত্রী দু-হাতভরে পাথর নিয়ে এসেছে। সে তাদের কাছাকাছি এলে আল্লাহ তাআলা নবিজি থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে রাখেন। এতে সে কেবল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই দেখতে পায়। তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই যে আবু বকর, তোমার বন্ধুটা কোথায়? শুনলাম, সে নাকি আমাকে আর আমার স্বামীকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলেছে! আল্লাহর কসম, তাকে সামনে পেলে এই পাথরগুলো তার মুখে মারতাম আমি! আর কবিতা লিখতে আমরাও পারি।' এরপর সে আবৃত্তি করে—

দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত। *আত-তাফসিরুল কাবির,* ফখরুদ্দিন রাযি, খণ্ড : ৩২, পৃষ্ঠা : ৩৪৯; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত।

[১] *ফি জিলালিল কুরআন,* খণ্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ২৮২; *তাফহিমুল কুরআন,* খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫২২

[২] *তাফহিমুল কুরআন,* খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৯০

[৩] *সহিহ ইবনু খুযাইমা : ১৫৯; মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৪২১৯; সহিহু ইবনি হিব্বান : ১৬৮৩; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি, ১১০৯৬;* হাদিসের সনদ সহিহ।

মুযাম্মামের অবাধ্য আমরা
মানি না তার বিধিবিধান,
তাই ছুড়ে ফেলে দিয়েছি আমরা
তার আনীত ধর্মজ্ঞান।[১]

তারপর সে চলে গেলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সে আপনাকে দেখেনি। আপনি কি তাকে দেখেছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন, সে আমাকে দেখেনি। নিশ্চয় আল্লাহ আমার থেকে তার দৃষ্টি সরিয়ে রেখেছিলেন।'[২]

ইমাম আবু বকর আল-বাযযারও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় আছে, আবু লাহাবের স্ত্রী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বলেছিল, 'আবু বকর, তোমার সঙ্গী (কোনো এক কবিতায়) আমাকে নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করেছে।' তখন আবু বকর বলেন, 'না, এই ঘরের রবের কসম, তা হতে পারে না। তিনি কবিতা রচনা করেন না; কবিতা তার মুখে শোভাও পায় না।' সে তখন বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

আবু লাহাব নবিজিকে এভাবে কষ্ট দিত, অথচ সে তার আপন চাচা ও প্রতিবেশী। তার ও নবিজির ঘর ছিল পাশাপাশি। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও তাকে কষ্ট দিত। নবিজিকে যারা তার নিজ বাড়িতে এসে কষ্ট দিত, তাদের মধ্যে রয়েছে আবু লাহাব, হাকাম ইবনু আবিল আস ইবনি উমাইয়া, উকবা ইবনু আবি মুইত, আদি ইবনু হামরা আস-সাকাফি ও ইবনুল আসদা আল-হুজালি। এরা সকলেই নবিজির প্রতিবেশী। কিন্তু হাকাম ইবনু আবিল আস ছাড়া আর কারও কপালে ইসলামের কালিমা জোটেনি। নবিজি সালাত আদায়কালে এদের কেউ কেউ ছাগলের নাড়িভুঁড়ি এনে তার মাথার ওপরে তুলে দিত। তার চুলায় রান্না বসানো হলে কিছু লোক এমনভাবে ময়লা-আবর্জনা ছুড়ে মারত যেন তা রান্নার পাতিলে গিয়ে পড়ে। অবশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু আড়ালে সালাতের জায়গা বানিয়ে নেন। তারপরও সেই মানুষগুলো তার বাড়িতে ময়লা ফেলত। নবিজি তখন ঘর থেকে বের হয়ে বলতেন, 'ও বনু আব্দি মানাফ, প্রতিবেশীর

---

[১] ইবনু ইসহাক বলেন, নবুয়ত লাভের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতি কাজ শুরু করলে কুরাইশরা তাকে ব্যঙ্গ করে মুযাম্মাম বলে ডাকত। নাউজুবিল্লাহ। মুযাম্মাম শব্দটির অর্থ নিন্দনীয় ব্যক্তি; যাকে তিরস্কার করা হয়েছে; যার মুখে চুনকালি পড়েছে। মুযাম্মাম (مُذَمَّمٌ) শব্দটি ذَمٌّ থেকে এসেছে। অপরদিকে মুহাম্মাদ শব্দটির অর্থ প্রশংসিত ব্যক্তি। নবিজি বলেন, তোমরা কি এটা ভেবে খুশি হবে না যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে কুরাইশদের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন? তারা আমাকে মুযাম্মাম বলে ডাকে। অথচ আমি তো মুহাম্মাদ। [*মুসনাদু আহমাদ* : ৮৪৫৯; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬; শারিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিইয়াতিল মুত্তাহিদা]

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৫-৩৩৬

সাথে এটা কোন ধরনের আচরণ!' তারপর তিনি ময়লাগুলো রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে আসতেন।[১]

হতভাগা উকবা ইবনু আবি মুইতের নিকৃষ্টতা আরও এগিয়ে ছিল। ইমাম বুখারি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করেন—

'একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর কাছে সালাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথিরা কিছুটা দূরে বসে আছে। আগের দিন একটি উট জবাই করা হয়েছে। আবু জাহল বলল, কে আছ এখানে, যে উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসবে আর মুহাম্মাদ সিজদায় গেলে তার দুই কাঁধের মাঝ বরাবর ছুড়ে মারবে? সে সময় সম্প্রদায়ের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি[২] উঠে দাঁড়াল। সে এই জঘন্য কাজটা করতে ইচ্ছুক। এরপর আল্লাহর রাসুল সিজদায় গেলে তার দুই কাঁধের মাঝখানে তা ছুড়ে মারল। তাই দেখে হাসাহাসি করে একে অপরের ওপর ঢলে পড়তে লাগল দুর্বৃত্তরা। আমি তখন অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলাম। হায়, যদি আমার প্রতিরোধের সাধ্য থাকত, তবে অবশ্যই আল্লাহর রাসুলের পিঠ থেকে তা সরিয়ে নিতাম। আল্লাহর রাসুল সাধারণত দীর্ঘ সিজদা করতেন। কিন্তু সেদিন মাথা তুলতে পারছিলেন না বিধায় সিজদা আরও দীর্ঘ হচ্ছিল। অবশেষে এক ব্যক্তি গিয়ে ফাতিমাকে খবর দিল। ফাতিমা সাথে সাথে এলেন। তিনি তখন বালিকা। তিনি সেগুলো তার ওপর থেকে ফেলে দিলেন। তাদের বকাঝকা করলেন।

আল্লাহর রাসুল সালাত শেষ করে উচ্চকণ্ঠে তাদের জন্য বদদুআ করলেন। তিনি যখন দুআ করতেন, সাধারণত তিনবার করে করতেন এবং যখন কিছু প্রার্থনা করতেন, তখনো তিনবার করেই করতেন। তিনি তিন-তিনবার বললেন, হে আল্লাহ, আপনার ওপরেই কুরাইশদের বিচারের ভার ন্যস্ত করলাম। তার এ আওয়াজ শোনামাত্রই তাদের হাসি উবে গেল। তারা তার বদদুআয় ভীষণ ভয় পেল।

তারপর তিনি বললেন—হে আল্লাহ, আবু জাহল ইবনু হিশাম, উতবা ইবনু রবিআ, শাইবা ইবনু রবিআ, ওয়ালিদ ইবনু উকবা, উমাইয়া ইবনু খালফ ও উকবা ইবনু আবি মুইতের শাস্তির ভার তোমার ওপর ন্যস্ত করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সপ্তম আরেকজনের কথা উল্লেখ করেছিলেন; তবে আমি তা স্মরণ করতে পারছি না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ যে পবিত্র সত্তা সত্যসহ রাসুলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম, তিনি যাদের নাম সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি তাদের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। পরে তাদেরকে টেনেহিঁচড়ে বদর

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৬

[২] লোকটির নাম উকবা ইবনু আবি মুইত। ইমাম বুখারি এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। [*সহিহুল বুখারি* : ৩১৮৫]

প্রান্তরের একটি নোংরা কূপে নিক্ষেপ করা হয়।[১]

উমাইয়া ইবনু খালফ নবিজিকে দেখলেই নিন্দা করত; কখনো আড়ালে, কখনো সামনে। তার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ①

সামনে ও পেছনে নিন্দাকারী প্রত্যেকের ভাগ্যে রয়েছে দুর্ভোগ।[২]

ইবনু হিশাম বলেন, হুমাযা বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে প্রকাশ্যে মানুষের নিন্দা করে, চোখ রাঙিয়ে কথা বলে, অন্যদের কটাক্ষ করে। আর লুমাযা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে গোপনে মানুষের দোষচর্চা করে এবং মানুষকে কষ্ট দেয়।[৩]

উমাইয়ার ভাই উবাই ইবনু খালফ ছিল উকবা ইবনু আবি মুইতের সমমনা। উকবা একবার নবিজির কাছে বসে তার কথাবার্তা শোনে। উবাই এটা জানতে পেরে তাকে ভীষণ গালমন্দ করে এবং তাকে নবিজির চেহারা মুবারকে থুতু নিক্ষেপ করতে বলে। হতভাগা তা-ই করে। উবাই নিজে একবার আল্লাহর রাসুলের দিকে পচা হাড় গুঁড়ো করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।[৪]

আখনাস ইবনু শারিক আস-সাকাফি নবিজিকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। কুরআনুল কারিমে তার ৯টি অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ⑩ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ⑪ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ⑫
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ⑬

আপনি এমন কারও অনুসরণ করবেন না, যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, একের কথা অপরের কাছে বলে বেড়ায়, যে ভালো কাজে বাধা দেয়, যে সীমালঙ্ঘন করে, যে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাবের, তার ওপর কুখ্যাত।[৫]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫২০; *মুস্তাখরাজু আবি আওয়ানা* : ৭২১৭; *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১৭৭২৯; *শারহুস সুন্নাহ,* বাগাবি : ৩৭৪৫

[২] সুরা হুমাযা, আয়াত : ১

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৬-৩৫৭

[৪] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬১-৩৬২

[৫] সুরা কলাম, আয়াত : ১০-১৩

আবু জাহল মাঝেমধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নবিজির কুরআন তিলাওয়াত শুনত। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনা, আনুগত্য করা, কুরআন থেকে শিক্ষা নেওয়া কিংবা পরকালের ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোনো আলামত তার মাঝে দেখা যায়নি। সে প্রতিনিয়ত কথা ও কাজের মাধ্যমে নবিজিকে কষ্ট দিত, আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিত। এরপর সে এসব কুকর্ম নিয়ে দম্ভ করে বেড়াত! তার সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি।[১][২]

আবু জাহল প্রথম যেদিন নবিজিকে মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করতে দেখে, সেদিন থেকেই তাকে বাধা দিতে শুরু করে। নবিজি মাকামে ইবরাহিমে সালাত আদায়কালে একবার সে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ডেকে ওঠে, 'এই মুহাম্মাদ, তোমাকে আমি এসব করতে নিষেধ করেছি না?' এটা বলে সে আরও হুমকি-ধামকি দিতে শুরু করে। নবিজিও তখন রেগে যান এবং তাকে ধমক দেন। আবু জাহল বলে, 'মুহাম্মাদ, কীসের গরম দেখাচ্ছ তুমি আমার সাথে? আরে, এই এলাকায় আমার চেয়ে বড় জনবল আর কার আছে, শুনি?' তার এমন উদ্ধত আচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা সুরা আলাকের এই আয়াতটি নাযিল করেন[৩]—

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

সে যেন তার দলবল ডেকে আনে।[৪]

অপর এক বর্ণনায় আছে, নবিজি তার গলা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলেন, কুরআনের ভাষায়—

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾

---

[১] সুরা কিয়ামা, আয়াত : ৩১

[২] *ফি জিলালিল কুরআন,* খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ২১২

[৩] সুরা আলাক, আয়াত : ১৭

[৪] *ফি জিলালিল কুরআন,* খণ্ড : ৩০, পৃষ্ঠা : ২০৮

তোমার জন্য দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ। আবারও বলছি, তোমার জন্য রয়েছে দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ।[১]

তখন আল্লাহর এ নিকৃষ্ট শত্রুটি বলে ওঠে, 'আমাকে ভয় দেখাতে চাও, মুহাম্মাদ? তুমি আর তোমার রব আমার কিছুই করতে পারবে না। জেনে রেখো, এই এলাকায় আমার চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেউ নেই।'[২]

নবিজির ধমক খেয়ে যে তার নির্বুদ্ধিতা দূর হয়েছে তা কিন্তু নয়; বরং এই দুর্ভাগার স্পর্ধা আরও বেড়েছে। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু জাহল একদিন বলে, 'আচ্ছা, তোমাদের সামনে মুহাম্মাদের চেহারা মাটিতে ঘষে দিলে কেমন হয়?' জবাবে বলা হয়, 'হ্যাঁ, খুবই ভালো হয়।' হতভাগা আবু জাহল তখন বলে, 'লাত ও উযযার কসম! আবার যদি আমি তাকে সালাত আদায় করতে দেখি, তাহলে অবশ্যই তার ঘাড় চেপে ধরব কিংবা চেহারা মাটিতে ঘষে দেব।' আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সালাত আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহল তার কাছে আসে। উদ্দেশ্য ছিল তার ঘাড় মুবারক চেপে ধরা। কিন্তু কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবু জাহল হঠাৎ ভয় পেয়ে ফিরে যায়, সাথিদের দিকে দুহাত বাড়িয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার জুড়ে দেয়। উপস্থিত লোকেরা জানতে চায়, 'কী হলো তোমার?' তার জবাব, 'তার ও আমার মাঝে আগুনের বিশাল বড় এক গর্ত দেখতে পেলাম।' আল্লাহর রাসুলকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, 'সে যদি আমার কাছে আসত, তবে অবশ্যই ফেরেশতারা তাকে চার হাত-পায়ে ধরে তুলে নিয়ে যেত।'[৩]

কী জনসাধারণ কী নেতৃস্থানীয়—সকলের কাছেই নবিজি একজন সুমহান ব্যক্তিত্ব ও পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাছাড়া তিনি তখন আবু তালিবের পরম প্রিয়ভাজন, যিনি মক্কার অন্যতম সম্মানিত ব্যক্তি। এরপরও তাকে এত এত জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। অপরদিকে সাধারণ মুসলিমরা নিতান্তই দুর্বল। তাদের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো তো কোনো ব্যাপারই ছিল না। হয়েছেও তা-ই। সে সময় যখনই কেউ ইসলামের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছে, সাথে সাথে তার ওপর তারই গোত্রের লোকেরা একের পর এক অত্যাচারের নিকৃষ্ট নমুনা সৃষ্টি করেছে। আর যারা ছিল নিচু বংশের লোক, তাদের ওপর প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এমন সব নির্যাতন করেছে, যার বিবরণ শুনলে অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠবে।

---

[১] সুরা কিয়ামা, আয়াত : ৩৪-৩৫

[২] *ফি জিলালিল কুরআন*, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ৩১২

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৭৯৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৬১৯

ইসলাম ও মুসলিমদের অন্যতম প্রধান শত্রু ছিল আবু জাহল। কোনো সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন কারও ইসলামগ্রহণের সংবাদ পেলে সে তাকে তিরস্কার করত, লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করত, তার জানমাল নিয়ে নানারকম ভয়ভীতি দেখাত। আর যদি অসহায় কারও ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে জানতে পারত, তার ওপর হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত।[১]

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম কবুল করেছেন, এই খবর শুনে তার চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাই দিয়ে পেঁচিয়েছে। এরপর সেখানে তীব্র কালো ধোঁয়া সৃষ্টি করেছে, যেন তিনি কষ্ট সইতে না পেরে ইসলাম ত্যাগ করেন।[২]

মুসআব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের খবর পেয়ে তার মা খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ করে দেন। শুধু তা-ই নয়, মুসআবকে বাড়ি থেকেও বের করে দেন। অথচ শৌখিনতার দিক থেকে তিনি ছিলেন অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু ইসলামগ্রহণের পর তাকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। একসময় তার দেহের চামড়া হয়ে যায় সাপের চামড়ার মতো খসখসে।[৩]

বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উমাইয়া ইবনু খালফের গোলাম। উমাইয়া তার গলায় রশি বেঁধে বাচ্চাদের হাতে তুলে দিত। বাচ্চারা তাকে নিয়ে মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত। এভাবে একসময় তার গলায় গভীর দাগ পড়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, উমাইয়া তাকে গাছের সাথে বেঁধে লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পেটাত। দ্বিপ্রহরের আগুনের মতো রোদে সে তাকে মক্কার খোলা প্রান্তরে নিয়ে যেত। সেখানে তপ্ত বালুর ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের ওপর বিশাল এক পাথর চাপিয়ে দিত। এরপর বলত, 'আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদকে অস্বীকার করে লাত-উযযার উপাসনা না করলে মৃত্যু পর্যন্ত এমনটা চলতেই থাকবে।' এমন অবর্ণনীয় নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি বলতেন, 'আহাদ, আহাদ; আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।' এসব নির্যাতন-নিপীড়ন চলাকালে একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তিনি এক হাবশি গোলামের পরিবর্তে মতান্তরে ৫ বা ৭ রৌপ্য উকিয়ার বিনিময়ে তাকে কিনে আজাদ করে দেন।[৪]

আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বনু মাখযুমের গোলাম। সপরিবারে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাদের ইসলামগ্রহণের কথা জানতে পেরে মুশরিকরা আবু জাহলের নেতৃত্বে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাদেরকে প্রখর রোদে উত্তপ্ত

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২০

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭

[৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৬০

[৪] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৬১; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৭-৩১৮

বালুর ওপর ফেলে নির্যাতন শুরু করে। একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদের এমন অবস্থা দেখে বলেন, 'শোনো ইয়াসিরের পরিবার, তোমরা একটু ধৈর্য ধরো। নিশ্চয় জান্নাত তোমাদের ঠিকানা।' তীব্র যন্ত্রণায় আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাবা ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুবরণ করেন। এরপর আবু জাহল বল্লম দিয়ে আম্মারের মা সুমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার লজ্জাস্থানে আঘাত করলে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তিনিই ইসলামের জন্য প্রথম শাহাদাত-বরণকারী নারী।

আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তারা কখনো তীব্র রোদে শুইয়ে রাখত, কখনো তার বুকের ওপর পাথর চাপিয়ে দিত, কখনো-বা পানিতে মাথা চেপে ধরত। তারা বলত, 'মুহাম্মাদকে গালি না দিলে কিংবা তারচেয়ে লাত-উযযাকে শ্রেষ্ঠ না বললে আজ তোর রক্ষা নেই।' অপারগ হয়ে তিনি তাদের কথা মেনে নেন। এরপর কেঁদে কেঁদে নবিজির কাছে এসে তার অক্ষমতার কথা জানান। তখন অবতীর্ণ হয়[১]—

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ... ﴿١٠٦﴾

কোনো ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাকে অস্বীকার করলে এবং কুফরের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে, তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য থাকবে মহাশাস্তি। তবে তার জন্য নয়, যাকে (কুফরের জন্য) বাধ্য করা হয়; কিন্তু তার হৃদয় থাকে ঈমানে অবিচল।[২]

আবু ফাকিহা আফলা ছিলেন বনু আব্দিদ দারের ক্রীতদাস। তারা তার পা রশি দিয়ে বেঁধে মাটিতে টানাহ্যাঁচড়া করত।[৩]

খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উম্মু আনমার বিনতু সিবা আল-খুযাইর ক্রীতদাস। মুশরিকরা তার ওপর কতই না নির্যাতন করেছে! তারা তার চুল ধরে টেনে নিয়ে যেত। ঘাড় টেনে মটকে দিতে চাইত। জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে বুকের ওপর পাথর চাপিয়ে

---

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ১০৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৯-৩২০; *ফিকহুস সিরাহ*, ইমাম গাযালি, পৃষ্ঠা : ৮২; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, শায়খ আব্দুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ৯২

[৩] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭; *মিন ইজাযিত তানযিল* , পৃষ্ঠা : ৬০

দিত। এতে তিনি আর উঠতে পারতেন না।[১]

ততদিনে ক্রীতদাসীদের মধ্যেও বেশ কজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন যুনাইরা, নাহদিয়া, তাদের কন্যারা ও উম্মু উবাইস রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না। তারাও মুশরিকদের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হন। যার কিছু নমুনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বনু আদির অন্তর্গত বনু মুআম্মালের এক দাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ কারণে দাসীকে তিনি ইচ্ছেমতো প্রহার করেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন, ক্লান্ত না হলে আজ তোমাকে ছাড়তাম না।[২]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বিলাল ও আমির ইবনু ফুহাইরার মতো এই দাসীদেরও কিনে আজাদ করে দেন।

মুশরিকরা অনেক সাহাবিকে উট বা গরুর চামড়ায় পেঁচিয়ে উত্তপ্ত বালুর ওপর ফেলে রাখত। আবার অনেককে লৌহবর্ম পরিয়ে নিক্ষেপ করত গরম পাথরের ওপর।[৩]

আল্লাহর দিকে যারা অগ্রসর হয়েছেন, তাদের ওপর চালানো নির্যাতনের ফিরিস্তি অনেক লম্বা, নিদারুণ হৃদয়বিদারক। যে-কারও ইসলামগ্রহণের খবর শুনে তারা দৌড়ে গিয়ে তাকে বাধা দিয়েছে, তার ওপর প্রয়োগ করেছে নির্যাতন-নিপীড়নের অভিনব সব কৌশল।

দারুল আরকাম : মুসলিমদের বৈঠকখানা

এমন জুলুম-নির্যাতনের কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ মুসলিমদের ইসলামগ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখতে বলতেন। পাশাপাশি তিনি নিজেও প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া থেকে বিরত থাকতেন। সে সময় এমনটা করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ জনসম্মুখে নবিজি মুসলিমদের শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির কাজ করতে চাইলে তারা বাধা দিয়ে বসবে। তখন দুই দলের মধ্যে ঝগড়াও লেগে যেতে পারে। নবুয়তের চতুর্থ বছর এমনটি ঘটেও ছিল।

ঘটনাটি হলো, নবিজি এক উপত্যকায় সাহাবিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গোপনে সালাত আদায় করছিলেন। তখন কুরাইশদের কিছু লোক তাদের দেখে গালাগাল শুরু করে। একপর্যায়ে ঝগড়াই বেধে যায়। কথা কাটাকাটির মাঝে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এক

---

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার* : ৬০

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৭; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৯

[৩] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮

ব্যক্তিকে আঘাত করলে সে রক্তাক্ত হয়। ইসলামের পথে এটিই ছিল প্রথম রক্তপাত।[১]

বোঝাই যাচ্ছে, যদি এমন লড়াই একের-পর-এক হতেই থাকত, তাহলে এতে মুসলিমরাই বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে, এমনকি একসময় অস্তিত্ব-সংকটেই পড়ে যাবে হয়তো। তাই সাহাবিরা তাদের যাবতীয় ধর্মকর্ম গোপনেই সম্পন্ন করতেন। অপরদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের সামনেই দাওয়াত ও ইবাদতের কাজ চালিয়ে যেতেন। মুশরিকদের কোনো পদক্ষেপই তাকে এ অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি। তাই ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রেখে সাহাবিদের সঙ্গে তিনি গোপনেই মিলিত হতেন। আরকাম ইবনু আবিল আরকাম আল-মাখযুমির বাড়ি ছিল সাফা পাহাড়ে; কুরাইশ ও তাদের মজলিস থেকে বেশ দূরে। তাই নবুয়তের ৫ম বছর থেকে এই বাড়িটিকে মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র ও মিলনায়তন হিসেবে গ্রহণ করেন।[২]

হাবশায় প্রথম হিজরত

নবুয়তের ৪র্থ বছরের মাঝামাঝি কিংবা শেষদিকে উল্লেখিত নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়। প্রথমদিকে স্বল্প মাত্রার হলেও ধীরে ধীরে এই অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। নবুয়তের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝিতে এসে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। একপর্যায়ে মক্কায় অবস্থান করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অসহনীয় এই নির্যাতন থেকে তারা মুক্তি লাভের চিন্তা শুরু করেন। এমন অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে সুরা কাহফ অবতীর্ণ হয়, যেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেন। এতে ৩টি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার মুমিন বান্দাদের জন্য রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা।

আসহাবে কাহফ তথা গুহাবাসীর ঘটনা থেকে দ্বীন পালনের জন্যে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা হলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাফির ও শত্রুদের ভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র হিজরতের ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৩; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৬০

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৬১

তাদের থেকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের ইবাদত করে, সেগুলো থেকে পৃথক হওয়ার পর তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য অনুগ্রহ বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।[১]

খিজির ও মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে জানা যায়, নদীর স্রোত সবসময় এক রকম থাকে না। মাঝে মাঝেই স্রোতের বাঁক বদলায়। এতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মুসলিমরা এখন নির্যাতনের শিকার। একদিন এগুলো বন্ধ হবে। এই মুশরিক অত্যাচারীরা ইসলাম গ্রহণ না করলে অচিরেই এই দুর্বল ও পরাভূত মুসলিমদের সামনে তারা মাথানত করতে বাধ্য হবে।

জুলকারনাইনের ঘটনা থেকে যে বিষয়গুলো বোঝা যায়—

» সমগ্র পৃথিবীর মালিক এক আল্লাহ। তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেন।

» কুফরি নয় বরং ঈমানের পথে থেকেই কেবল সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

» বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কারও উত্থান ঘটান, যে দুর্বলদের 'ইয়াজুজ-মাজুজের' কবল থেকে উদ্ধার করে।

» আল্লাহর সৎ বান্দারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি হকদার। তারপর সুরা যুমার অবতীর্ণ হয়। এখানে হিজরতের ব্যাপারে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, আল্লাহর জমিন অপ্রশস্ত নয়—

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের বিনা হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হবে।[২]

[১] সুরা কাহফ, আয়াত : ১৬

[২] সুরা যুমার, আয়াত : ১০

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন, হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। তার রাজত্বে কেউ জুলুমের শিকার হয় না। তাই নবিজি মুসলিমদের দ্বীন রক্ষার্থে হাবশায় হিজরত করতে আদেশ দেন।

নবুয়তের ৫ম বছর সাহাবিদের প্রথম দল হাবশায় হিজরত করেন। ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীর সমন্বয়ে এই দলটি গঠিত হয়েছিল, যার জিম্মাদার ছিলেন উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু। সঙ্গে ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা। নবিজি তাদের সম্পর্কে বলেন, 'ইবরাহিম ও লুত আলাইহিমাস সালামের পর তারাই আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী প্রথম পরিবার।'[১]

কুরাইশরা যেন টের না পায়, সেজন্য তারা রাতের বেলায় রওনা করেন। লোহিত সাগরের শুআইবা বন্দরে পৌঁছলে, ভাগ্যক্রমে সেখানে তারা বণিকদের দুটি জাহাজ পেয়ে যান, যা তাদের হাবশায় পৌঁছে দেয়। কুরাইশরা টের পেয়ে তাদের পিছু নেয়; কিন্তু তারা তীরে পৌঁছতে পৌঁছতে সাহাবিরা নিরাপদে বন্দর ত্যাগ করেন। হাবশায় গিয়ে মুসলিমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকেন।[২]

একই বছর রামাদান মাসে নবিজি হারামে প্রবেশ করেন। সেখানে কুরাইশদের গণ্যমান্য, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ নবিজি সুরা নাজম তিলাওয়াত শুরু করেন। এর আগে আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত শোনার ভাগ্য হয়নি এদের। কুরআন-শ্রবণ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে নানা কৌশলের আশ্রয় নিত তারা। নিজেরা তো শুনতই না; অন্যরাও যেন শুনতে না পারে, সেজন্য কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তারা হট্টগোল শুরু করে দিত। কুরআনে তাদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে—

...لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾

তোমরা এই কুরআন শ্রবণ কোরো না এবং তিলাওয়াতকালে হট্টগোল সৃষ্টি করো যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো।[৩]

কিন্তু হঠাৎ এই সুরার তিলাওয়াত শুরু হলে, অসামান্য আকর্ষণীয় ঐশী বাণী তাদের

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৩; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬১

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ২৪; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬১

[৩] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ২৬

কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। যার সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কালামুল্লাহর সৌন্দর্য ভীষণভাবে তাদের আকর্ষণ করে। মুহূর্তেই দখল করে নেয় তাদের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা। সুরার শেষাংশে এসে তারা এতটাই মোহিত হয়ে পড়ে যে, তাদের কাছে মনে হতে থাকে, তাদের দেহে যেন আর প্রাণ নেই, প্রাণপাখি উড়ে চলে গেছে দূর অজানায়। এ সময় নবিজি فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا (তাই তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো)[১]—তিলাওয়াত করে সিজদায় যান। পুরো সুরা এবং বিশেষত এ অংশের সম্মোহন এত বেশি ছিল যে, সিজদা থেকে নিজেকে বিরত রাখার সাধ্য ছিল না তাদের কারও। অবচেতনে সিজদাবনত হয়ে পড়ে তারা সবাই। এই সুরায় বর্ণিত হক ও সত্যের প্রতিধ্বনি অহংকারী ও তাচ্ছিল্যকারীদের অন্তরে থাকা হঠকারিতার দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলার সিজদা থেকে নিজেদের তারা সংবরণ করতে পারেনি।[২]

আল্লাহর কালামের মহত্ত্বের প্রতি তাদের বাধ্যতার বিষয়টি টের পেয়ে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। যে দ্বীন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে, আজ তাদের থেকেই কিনা সেই দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেল! চতুর্দিক থেকে তাদের দিকে নিন্দা ও তিরস্কারের তির আসতে থাকে। যে মুশরিকরা সেই মজলিসে অনুপস্থিত ছিল, কটু বাক্যবাণে তারা তাদের নাস্তানাবুদ করতে থাকে। অপবাদ থেকে বাঁচতে এবার তারা নতুন ফন্দি আঁটে। নবিজির নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়ায় যে, তিনি তাদের প্রতিমার প্রতি নমনীয়তা প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, 'تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلَى، وَ إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى' অর্থাৎ, 'এগুলো সম্মানিত দেবতা, তাদের সুপারিশ কামনা করা যায়।' তারা এমন ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নেয়, যেন নবিজির সঙ্গে তাদের সিজদা করার ব্যাপারে শিথিলতা দেখানো হয়। যে জাতি নির্জলা মিথ্যা সাজাতে পারে, একের পর এক অপবাদ আরোপ করতে পারে, তাদের জন্য এ আর তেমন কী![৩]

হাবশায় অবস্থানকারী মুসলিম মুহাজিরদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যায়; কিন্তু বাস্তবে যা ঘটেছে, খবর পৌঁছে তার উলটো। তারা জানতে পারেন, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে। এ কারণে একই বছর শাওয়াল মাসে তারা মক্কায় ফিরে আসেন। তবে মক্কার কাছাকাছি এলে বাস্তবতা প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে আবার হাবশার পথ ধরেন। আর বাকি সবাই আত্মগোপন করেন কিংবা কুরাইশদের কারও কাছ থেকে

---

[১] সুরা নাজম, আয়াত : ৬২, এই আয়াতটি আরবিতে পাঠ করলে সিজদা দিতে হবে।

[২] ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সূত্রে ইমাম বুখারি সংক্ষিপ্তাকারে সিজদার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। [*সহিহুল বুখারি* : ৪৮৬২; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১৪৮৫; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৫৫৩]

[৩] *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৮

নিরাপত্তা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।[১]

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

এরপর মুসলিমদের ওপর বিশেষ করে হাবশায় হিজরতকারীদের ওপর কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এমনকি পরিবারের অমুসলিম সদস্যরাও মুসলিমদের নানাভাবে অত্যাচার করতে শুরু করে। মুশরিকরা খবর পেয়েছিল—নাজাশি মুসলিমদের সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন। হাবশায় মুসলিমদের কাটানো সুখের দিনগুলোর কথা কুরাইশরা কোনোভাবেই ভুলতে পারছিল না। তাই মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা অতীতের সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। উপায় না দেখে নবিজি সাহাবিদের দ্বিতীয়বার হিজরতের পরামর্শ দেন। এবারের হিজরত আগের বারের চেয়ে অনেক কঠিন ছিল। কারণ কুরাইশরা এবার এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখছিল; কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুসলিমরা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাদের সফর সহজ করে দেন এবং মুশরিকদের হাত থেকে মুক্ত করে নিরাপদে বাদশাহ নাজাশির রাজ্যে পৌঁছার তাওফিক দেন।

হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরতের কাফেলায় ছিলেন ৮৩ জন পুরুষ। এই সংখ্যা প্রযোজ্য হবে আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে থাকলে। কেননা সফরে তার উপস্থিতি নিয়ে সংশয় আছে। আর নারীরা সংখ্যায় ছিলেন ১৮-১৯ জন।[২]

মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের চক্রান্ত

মুহাজিররা নিজেদের প্রাণ ও দ্বীনের জন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে—মুশরিকরা এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। যে করেই হোক, তাদের ক্ষতি করতেই হবে—এই পরিকল্পনায় আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবি রবিআকে তারা নির্বাচন করে। দুজনেই বেশ বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান। এটি তাদের ইসলামগ্রহণের আগের ঘটনা। কুরাইশরা বাদশাহ নাজাশি ও সভাসদবর্গের জন্য নানারকম মূল্যবান উপঢৌকনসহ তাদের দুজনকে পাঠায়। তারা দুজন উপহার নিয়ে প্রথমে সভাসদদের কাছে গিয়ে এমন সব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে, যা মুসলিমদের বিতাড়িত করার জন্য যথেষ্ট। সভাসদরা তাদের কথামতো নাজাশিকে বুঝিয়ে মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রাজি করার পর তারা দুজন নাজাশির দরবারে উপস্থিত হয়। উপহার-

---

[১] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৮; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬৪

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪, *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬১; আল্লামা মুহাম্মাদ সুলাইমান মানসুরপুরি দৃঢ়ভাবে প্রথম মত সমর্থন করেছেন।

উপঢৌকন পেশ-পর্ব শেষ করে মূলকথা আরম্ভ করে। তারা বলে—

'মহামান্য বাদশাহ, কিছু নির্বোধ যুবক স্বজাতির ধর্ম ছেড়ে আপনার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা আপনার ধর্ম তো গ্রহণ করেইনি; বরং নতুন এক ধর্ম নিয়ে এসেছে। আমাদের ও আপনাদের কারোরই সে ধর্মের ব্যাপারে কোনোরকম জ্ঞান নেই। তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, তাদের বাপদাদা, চাচা-মামা ও পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে স্বজাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদের দুজনকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তারা তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল এবং তারাই তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত।'

সভাসদরা বলে, 'মহামান্য বাদশাহ, তারা ঠিকই বলেছে। তাই আপনি তাদের ফিরিয়ে দিন, যেন তারা তাদের নিজ দেশ ও জাতির কাছে নিয়ে যেতে পারে।'

কিন্তু বাদশাহ নাজাশি ভাবলেন, বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা দরকার এবং উভয় পক্ষের কথা শোনা প্রয়োজন। তাই তিনি মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা উপস্থিত হলেন। তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, যা হওয়ার হবে, আমরা সত্য থেকে একচুলও সরব না। নাজাশি তাদের উদ্দেশে বলেন, 'কী এমন ধর্ম তোমরা পেয়ে বসেছ, যে কারণে স্বজাতিকে ত্যাগ করতে হয়েছে? আবার আমার ধর্ম তো নয়ই, পৃথিবীর কোনো ধর্মই নাকি তোমরা গ্রহণ করোনি!

জবাবে মুসলিমদের মুখপাত্র জাফর ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মাননীয় বাদশাহ, আমরা ছিলাম জাহিলি সম্প্রদায়ের লোক। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, নানারকম খারাপ কাজে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতাম। আমাদের সবলেরা দুর্বলদের সম্পদ আত্মসাৎ করত। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের মধ্য থেকে একজনকে আমাদের কাছে রাসুল করে পাঠান। আমরা তার বংশধারা, আমানতদারিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে জানি। তিনি আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগির প্রতি আহ্বান করেন। আমাদের বাপদাদা ও পূর্বপুরুষরা যে পাথর ও প্রতিমার পূজা করত, তা থেকে সরে আসতে বলেন। সত্য বলতে আদেশ করেন। আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে নির্দেশ দেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচার করতে বলেন। অন্যায় কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে বলেন। অশ্লীলতা, মিথ্যা সাক্ষ্য, এতিমের মাল আত্মসাৎ ও সতীসাধ্বী নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। এক আল্লাহর উপাসনা করতে আদেশ করেন। তার সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করতে নিষেধ করেন। সালাত, যাকাত, সাওম ইত্যাদি বিধান পালন করতে বলেন।

তার এসব কথা আমরা সত্যায়ন করেছি। মনেপ্রাণে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আল্লাহর দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত যা কিছু তিনি নিয়ে এসেছেন, সব আমরা মেনে নিয়েছি। এক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করেছি। তাঁর সঙ্গে শিরক করা বন্ধ করে দিয়েছি। যা কিছু

হারাম করা হয়েছে, সব হারাম হিসেবে জেনেছি। আর যা কিছু হালাল করা হয়েছে, সব হালাল হিসেবে গ্রহণ করেছি; কিন্তু আমাদের জাতি এ বিষয়গুলো মেনে নিতে পারেনি। তারা আমাদের প্রতি শত্রুতা শুরু করেছে। আমাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন আরম্ভ করেছে। দ্বীনের ব্যাপারে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে আমাদের—যাতে আমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত ছেড়ে আবার মূর্তিপূজা ধরি। যে নিকৃষ্ট বিষয়াদি আমরা হালাল মনে করতাম, আবারও যেন তা-ই করি।

এরপর তারা যখন আমাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের সর্বোচ্চ মাত্রা প্রয়োগ করেছে, আমাদের ধর্মীয় বিধান পালনে বাধা দিয়েছে, আমরা আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছি। আর কাউকে নয়; কেবল আপনাকেই গ্রহণ করেছি। আপনার সান্নিধ্যের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছি। হে মহামান্য সম্রাট, আমরা আশা রাখি, আপনার দরবারে আমরা মজলুম হব না।'

বাদশাহ তাকে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, এমন কিছু কি তোমাদের কাছে আছে? জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জি। নাজাশি বলেন, তাহলে আমাকে একটু শোনাও। তখন তিনি সুরা মারইয়ামের শুরুর অংশ পাঠ করে শোনান। তাতে বাদশাহ নাজাশি আবেগাপ্লুত হয়ে চোখের পানি ছেড়ে দেন। এমনকি তার দাড়িগুলো ভিজে যায়। শুধু তা-ই নয়, উপস্থিত সভাসদরাও তার তিলাওয়াত শুনে কেঁদে ফেলেন। তাদের হাতে থাকা কিতাবাদি পর্যন্ত ভিজে যায়। এরপর বাদশাহ নাজাশি তাদের উদ্দেশে বলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম যে বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন, এ তো সেই একই দ্বীপাধার থেকে নিঃসরিত। তারপর আমর ইবনুল আস ও তার সঙ্গীকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা চলে যাও! কিছুতেই আমি তোমাদের হাতে তাদের তুলে দিতে পারি না। তাই তারা বেরিয়ে আসেন। আমর ইবনুল আস তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রবিআকে বলেন, আল্লাহর কসম, আগামীকাল আমি এমন কিছু উপস্থাপন করব, তারা বাধ্য হয়ে আমাদের বাগে আসবে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রবিআ তাকে বলেন, এমন কিছু কোরো না। কারণ যদিও তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তবুও তো তারা আমাদেরই আপনজন। কিন্তু আমর ইবনু আস আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

পরদিন তিনি নাজাশিকে বলেন, মহামান্য সম্রাট, তারা ঈসা ইবনু মারইয়ামের ব্যাপারে যে জঘন্য মতাদর্শ লালন করে, তা মুখে আনার মতো নয়। এ কথা শুনে নাজাশি ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস জানতে তাদের ডেকে পাঠান। এতে তারা সামান্য ভয় পেয়ে যান বটে, কিন্তু সত্যের ওপর তো তারা অবিচলই থাকবেন। বাদশাহর দরবারে তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাদের যা বলেছেন, আমরা তা-ই বলব, ঈসা ছিলেন আল্লাহর বান্দা; তাঁর রুহ ও কালিমা—যা তিনি পূতপবিত্র মারইয়ামের দেহে ফুঁকে দিয়েছিলেন।

তখন নাজাশি মাটি থেকে একটি লাঠি হাতে নিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, তুমি যা বলেছ, ঈসা ইবনু মারইয়াম তার থেকে বেশি—এই লাঠির মতোও ছিলেন না। এ কথা শুনে তার সভাসদরা একটু নড়েচড়ে বসেন। তিনি তখন বলেন, কসম সেই আল্লাহর, তোমরা যা-ই ভাবো না কেন, এটাই সত্য।

তারপর তিনি মুসলিমদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা যাও! আমার রাজ্যে নিরাপদে বাস করতে থাকো। এরপর তিনবার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, কেউ তাদের অসম্মান করলে তাকে জরিমানা করা হবে। তিনি আরও বলেন, তাদের একজনকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে আমাকে একপাহাড় স্বর্ণ দেওয়া হলেও তা আমার কাছে পছন্দনীয় হবে না।

সভাসদবর্গের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাদের উপহারগুলো ফিরিয়ে দাও। আমার ওসবের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, তিনি যখন আমাকে আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি আমার থেকে ঘুস গ্রহণ করেননি। তাহলে এখন আমি কীভাবে উৎকোচ গ্রহণ করি! তিনি তো আমার ব্যাপারে মানুষের কথা শোনেননি, তাহলে এখন আল্লাহর আনুগত্যকে প্রাধান্য না দিয়ে মানুষের কথায় কান দিই কী করে?

উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই ঘটনা বর্ণনাকালে বলেন, তারা দুজন সেখান থেকে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বেরিয়ে আসে। তাদের উপহার-উপঢৌকনও ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর আমরা তার কাছে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে বসবাস করতে থাকি।[১]

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখিত বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যরা উল্লেখ করেছেন, নাজাশির রাজ্যে আমর ইবনুল আসের গমন ছিল বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। আবার কেউ কেউ সমন্বয় করেছেন এভাবে, তিনি মোট দুইবার হাবশায় গিয়েছিলেন।[২] কিন্তু তারা আবার দ্বিতীয় সফরেও হুবহু সেই প্রশ্নোত্তরের কথাই উল্লেখ করেছেন, যেটি ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী নাজাশি ও জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাঝে ঘটেছিল বলে মাত্রই উল্লেখ করা হলো। সবশেষে প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম থেকে বোঝা যায়—ঘটনাটি নাজাশির দরবারে তার প্রথম সফরেই ঘটেছিল।

মুশরিকদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। ভেস্তে যায় সকল ষড়যন্ত্র। তারা বুঝতে পারে, তাদের বিদ্বেষ কেবল নিজ দেশের ভেতরেই কার্যকর করা সম্ভব। সব মিলিয়ে তাদের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। চিন্তা করে বের করে—এই মহাপ্রলয়ের মোকাবেলা সম্ভব কেবল দুটি উপায়ে—**এক.** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার দাওয়াতি কাজ থেকে পরিপূর্ণভাবে রুখে দেওয়া; **দুই.** তাকে এই দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আবু তালিবের জিম্মায় থাকাকালে কীভাবে তা সম্ভবপর হতে পারে? সে তো

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৪-৩৩৭

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৯৬-৯৮

তাকে নিরাপত্তার চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। কিছু করতে গেলেই সে দেওয়াল হয়ে দাঁড়াবে। সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই, আগে আবু লাহাবের সাথে আলাপ করতে হবে বলে ঠিক করে তারা।

নবিজির প্রিয় চাচাকে কুরাইশদের হুমকি!

কুরাইশ নেতারা আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলে, হে আবু তালিব, আমাদের মাঝে তোমার যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা আছে। আমরা তোমাকে বলেছিলাম, তোমার ভাতিজাকে থামাও। কিন্তু তুমি তা করোনি। আল্লাহর কসম, আমরা আর সহ্য করব না। আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে আজেবাজে কথা বলা হবে, জ্ঞানীগুণীদের নির্বোধ বলা হবে, উপাস্যদের দোষচর্চা করা হবে—এসব তো আর মেনে নেওয়া যায় না। তুমি তাকে ফেরাও। নয়তো তোমাদের সাথে আমাদের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হবে। হয় তোমরা টিকে থাকবে, আর নয়তো আমরা টিকে থাকব।

এমন হুমকিধমকি শুনে আবু তালিব বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে বলেন, ভাতিজা, তোমার সম্প্রদায় আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে এসব বলে গেল। তাই তুমি আমাকে ও নিজেকে নিয়ে একটু ভাবো। আমার ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা বহনের সাধ্য আমার নেই।

তার কথা শুনে নবিজি ধারণা করলেন, তার চাচাও হয়তো এবার তাকে পরিত্যাগ করছেন, তার সাহায্যের হাতও হয়তো সংকুচিত হয়ে আসছে। তাই তিনি বলেন, চাচা, আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয়, তবু আমি এই দ্বীন ত্যাগ করব না। হয় আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে এদের ওপর বিজয়ী করবেন, আর নয়তো আমি ধ্বংস হয়ে যাব। এরপর নবিজি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অশ্রুভেজা নয়নে উঠে আসেন। ফিরে আসার সময় আবু তালিব ডেকে বলেন, প্রিয় ভাতিজা, তোমার যা ভালো মনে হয়, তাই করো। আমি আছি তোমার সাথে। নিজেকে একা ভেবো না। এরপর তিনি আবৃত্তি করেন—

তোমার মদদ করেই যাব যতদিন বেঁচে আছি,
কুরাইশদের ঘেঁষতে দেব না তোমার কাছাকাছি।
প্রচার করো দ্বীনের বাণী তুমি তোমার মতো,
প্রভুর রহম তোমার 'পরে ঝরুক অবিরত।[১]

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৮

আবু তালিবের সাথে সমঝোতার চেষ্টা

কুরাইশরা যখন দেখল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আপন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন; তখন তারা বুঝে নিল—আবু তালিব নবিজিকে পরিত্যাগ করতে পারবেন না; প্রয়োজনে তিনি তাদের ত্যাগ করবেন, তাদের সঙ্গে শত্রুতায় জড়াবেন। তাই তারা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার পুত্র আম্মারকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বলল—হে আবু তালিব, এই যুবক কুরাইশ বংশে সবচেয়ে সাহসী ও সুদর্শন। তুমি তাকে গ্রহণ করে নাও, তার সবকিছুই তোমার। তাকে তুমি ছেলে হিসেবে গ্রহণ করো এবং তোমার ওই ভাতিজাকে আমাদের হাতে অর্পণ করে দাও, যে তোমার ও তোমার বাপদাদার ধর্মের বিরোধিতা করছে, তোমার গোত্র ও গোষ্ঠীকে পরিত্যাগ করেছে এবং তাদের জ্ঞানীগুণীদের লাঞ্ছিত করেছে। তাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও; আমরা তাকে হত্যা করব। এটা কেবলই ব্যক্তিবদল হিসেবে বিবেচিত হবে। আবু তালিব বলেন, আল্লাহর কসম, বড় নিকৃষ্ট দরদাম করতে এসেছ তোমার আমার কাছে! তোমরা কি তোমাদের পুত্র আমাকে দিতে চাইছ, যাকে আমি পানাহার করিয়ে বড় করব, আর আমার পুত্রকে তোমাদের হাতে তুলে দেব এবং তোমরা যথারীতি তাকে হত্যা করবে! আল্লাহর কসম, তা কিছুতেই হতে পারে না। তখন মুতইম ইবনু আদি ইবনি নাওফাল ইবনু আব্দি মানাফ বলে, হে আবু তালিব, নিঃসন্দেহে তোমার সম্প্রদায় তোমার সাথে ইনসাফই করেছে। তুমি যা অপছন্দ করো, তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে; বরং আমি তো দেখছি, তুমি তাদের কোনো কথাই মানতে চাইছ না! তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা আমার সাথে ইনসাফ করছ না; বরং আমাকে লাঞ্ছিত করতে এবং আমার বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্যের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছ। ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করো গিয়ে।[১]

ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে প্রতিনিধি দল দুটির আগমনের মাঝে সময়ের ব্যবধান আলোচিত হয়নি; কিন্তু বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—ঘটনা-দুটি নবুয়তের সপ্তম বছরের মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছে এবং উভয় দলের আগমনের সময় ছিল কাছাকাছি।

নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনা

দুবার প্রতিনিধি পাঠিয়ে কুরাইশ নেতারা ব্যর্থ হওয়ায় নবিজির প্রতি হিংস্রতা ও কঠোরতার মাত্রা তারা আরও বাড়িয়ে দেয়। এ সময় অত্যাচারী কুরাইশরা তাকে হত্যার ব্যাপারে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে; যদিও তাদের এই চিন্তা এবং হিংস্রতার কারণে মক্কার দুজন মহান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তাতে ইসলামের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৬-২৬৭

পায়। তারা দুজন হলেন হামযা ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।

তাদের সেই হিংস্রতার একটি নমুনা হলো—উতাইবা ইবনু আবি লাহাব একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বলে, আমি 'و النجم إذا هوى' (অর্থাৎ, কসম তারকার, যখন তা অস্তমিত হয়) এবং 'دنا فتدلى' (অর্থাৎ—সে নিকটবর্তী হলো, এরপর আরও নিকটবর্তী হলো) অংশগুলো অস্বীকার করছি। তারপর সে নবিজির ওপর চড়াও হয়। তার জামা ছিঁড়ে ফেলে। চেহারায় থুতু পর্যন্ত নিক্ষেপ করে; যদিও সে থুতু তার গায়ে লাগেনি। এমন সময় নবিজি বদদুআ করে বলেন, হে আল্লাহ, আপনার কোনো কুকুর তার ওপর লেলিয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে তার দুআ কবুল হয়।

উতাইবা একদিন কুরাইশ-কাফেলার সঙ্গে সফরে বের হয়। চলতে চলতে তারা সিরিয়ার যারকা নামক স্থানে অবতরণ করে। সেই রাতেই একটি সিংহ এসে তাদের প্রদক্ষিণ করে যায়। তা দেখে উতাইবা বলতে শুরু করে, ও আমার ভাইয়েরা, নিঃসন্দেহে এটা আমাকে খেয়ে ফেলবে। মুহাম্মাদ আমার জন্য এরকমই এক বদদুআ করেছিল। মক্কায় বসেই সে আমাকে হত্যা করবে, যদিও আমি এখন সিরিয়ায়। পরদিন সিংহটি সবার মধ্য থেকে তার মাথায় আঘাত করে তাকে মেরে ফেলে।[১]

ইতিহাসগ্রন্থে উকবা ইবনু আবি মুইতের ব্যাপারে একটি ঘটনা পাওয়া যায়, একবার নবিজি সিজদায় থাকাকালে সে তার গর্দান মুবারকে এমনভাবে পা দিয়ে চাপ দিতে থাকে যে, নবিজির চোখদুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে।[২]

কুরাইশ অত্যাচারীরা একবার নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনাও করেছিল। ইবনু ইসহাক বর্ণিত বেশ বড় একটি হাদিস থেকে জানা যায়, আবু জাহল বলে, 'শোনো কুরাইশি ভাইয়েরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, মুহাম্মাদ তার কাজ পুরোদমে চালিয়েই যাচ্ছে। সে রীতিমতো আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদের পূর্বসূরিদের নিন্দা করে যাচ্ছে, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতা বলছে এবং আমাদের সকল উপাস্যকে বিভিন্নভাবে হেয় করছে। আল্লাহর কসম, সবচেয়ে বড় যে পাথরটি আমি উঁচু করতে পারি, সেটা হাতে নিয়ে তার অপেক্ষায় থাকব। সে সিজদায় গেলে আমি তার মাথা ভেঙে চুরমার করে দেব। তারপর চাইলে তোমরা আমার পক্ষেও থাকতে পারো, আবার চাইলে বিপক্ষেও যেতে পারো। বনু আব্দি মানাফ এরপর কী করে, সেটাও দেখা যাবে। তারা

---

[১] *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫২২; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৩৫; ইমাম বাইহাকি ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন—রাতে ঘুমানোর সময় তাকে মাঝখানে রেখে সবাই তার চারপাশে ঘুমায়। রাতে সিংহ এসে সবার মাথা থেকে উতাইবা ইবনু আবি লাহাবের মাথা খুঁজে বের করে তার ওপর আক্রমণ করে। [*দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৯; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া]

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১১৩

বলে, আমরা কিছুতেই তোমার বিপক্ষে যাব না, তোমার যা ইচ্ছে করে যাও।'

পরদিন সকাল বেলা আবু জাহল তার কথামতো একটি পাথর নিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় বসে থাকে। নবিজি প্রতিদিনের মতো সকাল সকাল সালাত আদায় করতে যান এবং যথারীতি সালাত আরম্ভ করেন। এরই মধ্যে কুরাইশরা আবু জাহলের কাণ্ড দেখতে তাদের সভায় অপেক্ষা করছে। নবিজি সিজদায় চলে গেলে আবু জাহল পাথর তুলে তার দিকে এগিয়ে যায়। কাছাকাছি যাওয়ামাত্রই সে ভীতসন্ত্রস্ত ও বিবর্ণমুখে ফিরে আসে। পাথরটি ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তার হাতে যেন সেঁটে থাকে। এ অবস্থা দেখে কুরাইশদের অনেকে তার কাছে দৌড়ে যায়। সবিস্ময়ে জানতে চায়, তোমার কী হয়েছে, আবুল হাকাম? সে বলে, গতকাল তোমাদের যা বলেছিলাম, তা করতেই গিয়েছিলাম আমি; কিন্তু তার নিকটবর্তী হলে একটি উট আমার পথ আগলে দাঁড়াল। আল্লাহর কসম, আকার-আকৃতিতে এমন ভয়ংকর উট আমি আগে কখনো দেখিনি। আমাকে কামড়ে দেওয়ার জন্য সেটি আমার দিকে তেড়ে আসছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উটের বেশে ছিলেন মূলত জিবরিল আলাইহিস সালাম। আরেকটু আগে বাড়লেই তিনি তাকে ধরে ফেলতেন।[১]

এরপর নবিজির সঙ্গে আবু জাহল যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। অচিরেই সে ঘটনা বর্ণনা করা হবে।

তবে কুরাইশের অত্যাচারীরা কোনোভাবেই তাদের মন থেকে নবিজিকে হত্যার কুপরিকল্পনা সরাতে পারেনি। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস থেকে বর্ণিত, একবার কুরাইশ নেতারা হাতিমে সমবেত হয়। আমিও সেখানে ছিলাম। তারা নবিজিকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে। বলে, তার ব্যাপারে আমরা অসম্ভব ধৈর্যধারণ করেছি। সাংঘাতিক এক বিষয় আমরা কেবল সহ্যই করে গিয়েছি। কথা চলছিল, এরই মধ্যে কাবাচত্বরে নবিজিকে দেখা যায়। তিনি এসে প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। তারপর তাদের অতিক্রম করে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করেন। প্রথমবার অতিক্রমকালে তারা নবিজিকে কটাক্ষ করে এটা-সেটা বলে। তাতে রাসুলের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার অতিক্রমকালেও একই আচরণের সম্মুখীন হন নবিজি এবং তার চেহারায় সেটার স্পষ্ট প্রভাব ফুটে ওঠে। তৃতীয়বারও এমন করলে তিনি থেমে যান, এরপর বজ্রনিনাদ কণ্ঠে বলতে শুরু করেন, হে কুরাইশের লোকেরা, শোনো, ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের ধ্বংস নিয়ে এসেছি।[২] নবিজির এমন ভয়াবহ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৮-২৯৯; *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, পৃষ্ঠা : ২০৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১১০

[২] 'আমি তোমাদের ধ্বংস নিয়ে এসেছি' অনেকে এই বাক্যটি পাঠ করে চিন্তায় পড়ে যায়—নবিজি

তীব্র বাক্যবাণে সবার অন্তর কেঁপে ওঠে। ভয়ে তাদের কলিজা শুকিয়ে যায়। এত বেশি নীরবতায় ডুবে যায় তারা, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে (সামান্য নড়চড় হলেই পাখিটি উড়ে যাবে)। এমনকি তাদের সবচেয়ে কঠোর মানুষটাও গলে পানি হয়ে যায়। নবিজির সাথে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে তারা। সবাই বলে ওঠে, হে আবুল কাসিম, আপনি চলে যান। আল্লাহর কসম, আপনি তো কখনো এত কঠোর ছিলেন না।

পরদিন আবার তারা সমবেত হয়ে নবিজিকে নিয়ে কথা বলছিল। এমন সময় তিনি কাবাচত্বরে আসেন। তাকে দেখামাত্র তারা সকলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে পরাস্ত করে ফেলে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি একজনকে দেখেছি, সে নবিজির চাদর ধরে টানছে; এমন সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে রক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে যান, আর কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, এই মানুষটা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছেন বলে তোমরা তাকে হত্যা করতে চাইছ? এরপর তারা নবিজিকে ছেড়ে দেয়। ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কুরাইশরা নবিজির ওপর যত আক্রমণ করেছে, সেগুলোর মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর।[১]

উরওয়া ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমর ইবনুল আসের কাছে আমি জানতে চাই, মুশরিকরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে ভয়ংকর নির্যাতন কীভাবে করেছে? তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল একবার হাতিমে কাবায় সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনু আবি মুইত এসে তার গলায় কাপড় পেঁচিয়ে সজোরে টানতে থাকে। তখন আবু বকর এসে তার দুই কাঁধে ধরে টেনে আল্লাহর রাসুলকে মুক্ত করেন এবং বলেন, তোমরা কি এমন একজনকে হত্যা করতে চাইছ, যিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?[২]

আসমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়, এক ব্যক্তি চিৎকার করতে করতে আমাদের ঘরে এসে বলে, হে আবু বকর, আপনার বন্ধুকে

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত কঠোর হলেন কীভাবে? বস্তুত নবিজি এখানে কুরাইশের সকল লোককে হুমকি দেননি; বরং সেখানে উপস্থিত সেই সব নেতৃস্থানীয় লোকের উদ্দেশে বলেছেন, যারা দিন-রাত ইসলামের বিরোধিতা করত, নবিজিকে সীমাহীন কষ্ট দিত আর সাহাবিদের ওপর চালাত অমানুষিক নির্যাতন। তাদের যাবতীয় অমার্জনীয় অপরাধের প্রতিউত্তরে 'আমি তোমাদের ধ্বংস নিয়ে এসেছি' বলাটা খুবই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক। কেননা ইসলাম যেমন আদল-ইনসাফের কথা বলেছে, দয়া-অনুগ্রহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে, তেমনই সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি কঠোরতার কথাও বলেছে এবং তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করার বিধানও রেখেছে। অতএব নবিজির এ বাক্যটি দেখে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই; বরং এমনটি বলাই ছিল যথোচিত।

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮৯-২৯০; *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৬৯; দারুল মাআরিফ, বৈরুত।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬৭৮, ৪৮১৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৯০৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৭৭২৮

যে মেরে ফেলল! সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের থেকে উঠে যান। তার মাথায় তখন ৪টি কেশগুচ্ছ ছিল। তিনি এটা বলতে বলতে বের হন যে, এই মানুষটা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছেন বলে তোমরা তাকে হত্যা করতে চাইছ? তখন তারা নবিজিকে ছেড়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর যখন তিনি ফিরে আসেন, তার কেশগুচ্ছে হাত দেওয়ামাত্রই চুলগুলো উঠে আসতে থাকে।[১]

ইসলামের ছায়াতলে হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব

নির্যাতনের ঘনঘোর অন্ধকারে হঠাৎ আলোকরশ্মির দেখা মেলে। এ আর কিছু নয়, হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের ইসলামগ্রহণের ঘটনা। তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। সময়টি ছিল জিলহজ মাসের কোনো একদিন।

তার ইসলামগ্রহণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়—আবু জাহল একবার সাফা পাহাড়ে নবিজির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় সে তাকে গালিগালাজ করে, কুরুচিপূর্ণ কথাবার্তা বলে। নবিজি কোনোরকম প্রতিবাদ না করে চুপ থাকেন। এরপর সে পাথর দিয়ে নবিজির মাথায় জোরে আঘাত করে। নবিজির মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করে।[২] তাকে আহত করে সে কাবা সংলগ্ন কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে বসে। আব্দুল্লাহ ইবনু জাদআনের এক মুক্ত দাসীর বাসস্থান ছিল সাফায়। সে ছিল পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

অস্ত্রসজ্জিত হামযা শিকার থেকে ফিরছিলেন। এমন সময় ওই দাসীর সাথে তার দেখা হয়ে যায়, সে তাকে আবু জাহলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড খুলে বলে। বিবরণ শুনে হামযা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। কুরাইশ বংশে তিনি ছিলেন সবচেয়ে দাপুটে ও সর্বাধিক জেদি। সাথে সাথে বের হয়ে পড়েন, কারও কোনো কথা না শুনে ছুটতে থাকেন; উদ্দেশ্য—আবু জাহলকে পেলে এবার শেষ করে দেবেন। মাসজিদুল হারামে গিয়ে তিনি তাকে দেখতে পান। মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আরে এই (ভয়ে) বায়ুত্যাগকারী! তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিস। অথচ আমি নিজেও তার ধর্মেরই অনুসারী! এরপর ধনুক দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত করেন। এতে বনু মাখযুম

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১১৩

[২] 'রহমাতুল-লিল-আলামিন' এর লেখক এ ঘটনায় আবু জাহল নবিজির মাথায় আঘাত করা এবং তার মাথা থেকে গলগল করে রক্ত বের হওয়ার কথা বললেও ইবনু হিশাম, ইবনু কাসির বা ইবনু ইসহাক কেউ নবিজিকে আঘাত করার কথা উল্লেখ করেননি। এ ব্যাপারে তাদের উক্তি ছিল 'আবু জাহল নবিজিকে কষ্ট দিয়েছিল এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছিল' যা আবু জাহল নিজেই হামযার প্রতিঘাতের পর স্বীকার করে নেয়। [বিস্তারিত জানতে দেখুন—*রহমাতুল-লিল আলামিন*, পৃষ্ঠা : ৫৮; দারুস সালাম লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযি, রিয়াদ; *সিরাতু ইবনি ইসহাক*, পৃষ্ঠা : ১৭১; *দারুল ফিকর*, বৈরুত; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬০; তাহকিক : তহা আব্দুর রউফ সাদ]

তথা আবু জাহলের গোষ্ঠী এবং বনু হাশিম তথা হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোষ্ঠীর মাঝে হইচই পড়ে যায়। তখন আবু জাহল বলে, তোমরা আবু উমরাকে ছেড়ে দাও। কেননা সত্যিই আমি তার ভাতিজাকে জঘন্য ভাষায় গালি দিয়েছি।[১]

হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের বিষয়টি প্রথমে ছিল একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জাত্যভিমান, যা তার আপনজনের লাঞ্ছনা অগ্রাহ্য করেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা তার বক্ষ উন্মোচিত করে দেন এবং তিনি দৃঢ়ভাবে দ্বীন-ইসলামকে আঁকড়ে ধরেন।[২] তার দ্বারা মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইসলামগ্রহণের এক আশ্চর্য ঘটনা!

হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের বিষয়টি ঘনকালো মেঘে ঢাকা রাতের আঁধারে আলোর ঝলকানির মতো। কিন্তু এর চেয়েও বেশি দীপ্তি নিয়ে আসে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুসলিম হওয়ার ঘটনাটি। তখন নবুয়তের ষষ্ঠ বছর। চলছে পবিত্র জিলহজ মাস। হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর তাওহিদের কালিমা পাঠ করেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু।[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইসলাম-কবুলের ব্যাপারে দুআ করেছিলেন। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ সূত্রে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন এবং ইমাম তাবারানি ইবনু মাসউদ ও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি বলেন—

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

হে আল্লাহ, আবু জাহল কিংবা উমার ইবনুল খাত্তাব—এই দুজনের মাঝে আপনার কাছে যে অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে মজবুত করুন।

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওই দুজনের মাঝে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুই আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি প্রিয় ছিলেন।[৪]

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব আন-নাজদি, খণ্ড : ৬৬, পৃষ্ঠা : ১০১; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৮

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব আন-নাজদি, খণ্ড : ৬৬, পৃষ্ঠা : ১০১

[৩] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ১১

[৪] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৮১; হাদিসটি সহিহ।

তার ইসলামগ্রহণ-সম্পর্কিত সবগুলো বর্ণনা পর্যালোচনা করে বোঝা যায়—তার হৃদয়ে ধাপে ধাপে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে। সেই আলোচনার আগে আমরা উমারের স্বভাব-প্রকৃতি ও অনুভূতির দিকে একটু ইঙ্গিত করতে চাই।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কঠোর স্বভাব ও রূঢ় মেজাজের অধিকারী। একসময় মুসলিমরা তার থেকে নানারকম নির্যাতনেরও শিকার হয়েছে; তবে বাস্তবতা হলো—এ ব্যাপারে সবসময় তার মধ্যে দ্বিমুখী চেতনা ঘুরপাক খেয়েছে। তিনি যেমন পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মাদকদ্রব্য ও খেলাধুলার প্রতি অনুরাগী ছিলেন, তেমনই মুসলিমদের সালাত আদায় ও আকিদা-বিশ্বাস সংরক্ষণের পথে অসীম ধৈর্যধারণের প্রতিও ছিল তার কিছুটা মুগ্ধতা। এরপরও সন্দেহ-সংশয় জাগলে তার বিবেচনায় কখনো কখনো ইসলামের প্রতি আহ্বানই অধিক যুক্তিযুক্ত ও পরিশুদ্ধ মনে হতো। তাই কখনো ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও আবার এক নিমিষেই শান্ত হয়ে যেতেন।[১]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ-সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর সারাংশ দাঁড়ায়—

'এক রাতে তাকে ঘরের বাইরে থাকতে হয়েছিল, তখন তিনি মাসজিদুল হারামে চলে যান। গিয়ে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি সুরা হাক্কাহ তিলাওয়াত আরম্ভ করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মন দিয়ে তার তিলাওয়াত শুনছিলেন। কুরআনুল কারিমের বর্ণনাশৈলী তার বেশ ভালো লাগে। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, এই লোক তো দেখা যায় আসলেই কবি—কুরাইশরা যেমনটা বলে। তিনি বলেন, তখন তিনি তিলাওয়াত করেন—

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

নিশ্চয় তা একজন সম্মানিত দূতের (আনীত) বাণী। এটা কোনো কবির কথা নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস করো।[২]

তিনি বলেন, তারপর বললাম, গণকই হবে তাহলে। তখন তিলাওয়াত করেন—

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

[১] *ফিকহুস সিরাহ*, মুহাম্মাদ আল-গাযালি, পৃষ্ঠা : ৯২-৯৩

[২] সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ৪০-৪১

আর এটা কোনো গণকের কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন করো। এটা মহাবিশ্বের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখান থেকে নিয়ে সুরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। উমার বলেন, এরপরই ইসলাম আমার হৃদয়ে জায়গা করে নেয়।'[২]

এই ঘটনা তার হৃদয়ে ইসলামের বীজ বপন করে দেয় ঠিক, তবে তা থাকে মূর্খতা, কুপ্রথা এবং বাপদাদার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের আবরণে ঢাকা। ইসলামের প্রতি বাস্তবসম্মত যে অনুভূতি তার মনে দোলা দিত, তা সাধারণত ওসবের নিচেই পড়ে থাকত। এজন্য তিনি বরাবরই ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ে গেছেন এবং এই আবরণে ঢাকা অনুভূতির ব্যাপারে বেখবর থেকেছেন।

তার তেজস্বী স্বভাব ও নবিজির প্রতি তীব্র শত্রুতার দরুন একদিন তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে বের হন। উদ্দেশ্য—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একেবারে শেষ করে দেবেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয় নুআইম ইবনু আব্দিল্লাহ আন-নাহহাম আল-আদাবির সাথে;[৩] তিনি ছিলেন বনু যুহরা[৪] বা বনু মাখযুমের[৫]। নুআইম বলেন, কোথায় যাচ্ছ, হে উমার? উমার উত্তরে বলেন, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। নুআইম বলেন, মুহাম্মাদকে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরার হাত থেকে রেহাই পাবে কী করে? উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন, আমার তো মনে হচ্ছে তুমিও বিধর্মী হয়ে গিয়েছ। বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ। নুআইম তখন বলেন, আমাকে নিয়ে পরে ভেব। আগে তোমার বোন আর তার স্বামীর খবর নাও। তারা যে তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে তা কি তুমি জানো?

এ কথা শুনে উমারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি রাগে-ক্ষোভে মারমুখো

---

[১] সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ৪২-৪৩

[২] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ৬; ইবনু ইসহাক আতা ও মুজাহিদ রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন; তা এই বর্ণনার কাছাকাছি। তবে, শেষাংশে কিছুটা বৈপরীত্য রয়েছে। দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৬-৩৬৮; আর জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ইবনুল জাওযির বর্ণনাটি এর কাছাকাছি। সেটির শেষাংশও উল্লেখিত বর্ণনার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। [দেখুন, *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, পৃষ্ঠা : ৯-১০]

[৩] এটি ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে। [দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৪]

[৪] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এমনটি বর্ণনা করেছেন। [দেখুন, *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, পৃষ্ঠা : ১০; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১০৩]

[৫] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। [দেখুন, *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১০২]

হয়ে বোনের বাড়িতে হাজির হন। সেখানে তখন খাব্বাব ইবনু আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। তার সঙ্গো পুস্তিকা আকারে সুরা ত-হা ছিল। মাঝেমধ্যে তিনি এ বাড়িতে এসে দুজনকে কুরআন পড়াতেন। উমার আসছেন—টের পাওয়ামাত্রই খাব্বাব ঘরের কোনো এক স্থানে লুকিয়ে যান। আর উমারের বোন ফাতিমা কুরআনের অংশটুকু আড়াল করে রাখেন। তবে উমার আগেই টের পেয়ে গিয়েছেন, খাব্বাব তাদের কিছু একটা পড়াচ্ছিলেন। ঘরে প্রবেশ করেই তিনি বাঘের মতো হুংকার ছাড়েন, কী করছিলে তোমরা? আমি তোমাদের থেকে কীসের আওয়াজ পেলাম? তারা উত্তর দেন, কই, কিছু না তো। আমরা এমনিই কথাবার্তা বলছিলাম। তিনি বলেন, শুনলাম, তোমরা নাকি ধর্মত্যাগ করেছ! তখন তার ভগ্নীপতি বলে ওঠেন, উমার, তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সঠিক হয়, তাহলে? এ কথা শোনামাত্রই উমার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মারাত্মকভাবে আঘাত করেন। তার বোন স্বামীকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলে তার চেহারায় সজোরে থাপ্পড় মারেন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়।

তিনি তার বোনকে আঘাত করে রক্তাক্ত করেন। তখন বোন রাগান্বিত হয়ে বলেন, উমার, তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম সঠিক হলেও কি তুমি এই আচরণ করবে? শুনে রাখো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।

বোনের এমন সাহসিকতা দেখে উমার কিছুটা হতাশ হয়ে যান। তিনি এটাও লক্ষ করেন, তার বোন রক্তাক্ত, তখন কিছুটা লজ্জিতই হন। বলেন, তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, আমাকে একটু দাও তো—পড়ে দেখি। বোন বলেন, তুমি অপবিত্র। আর পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। তুমি গোসল করে আসো। তিনি গোসল করে আসেন। তারপর কিতাব নিয়ে পাঠ করতে শুরু করেন—বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম—শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু। এইটুকু পড়েই তিনি বলেন, বাহ, কী উত্তম ও পবিত্র নামগুলো। তারপর সুরা ত-হার প্রথম থেকে এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন—

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾

আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো।

পাঠ শেষে বলেন, কতই না চমৎকার ও তাৎপর্যপূর্ণ এই বাণী। আমাকে এক্ষুনি মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা শুনে খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন, উমার, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমার ধারণা, বৃহস্পতিবার রাতে নবিজি যে দুআ করেছিলেন, তা তোমার জন্য কবুল হয়েছে। নবিজি এখন সাফা পাহাড়ের বাড়িতে আছেন।

উমার হাতে খোলা তরবারি নিয়ে সেই বাড়িতে হাজির হন। সদর দরজায় কড়া নাড়েন। কেউ একজন দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালে উন্মুক্ত তরবারি চোখে পড়ে। সে নবিজিকে খবর দিলে সবাই একত্রিত হয়। তখন হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের উদ্দেশে বলেন, কী হয়েছে তোমাদের? তারা বলেন, উমার এসেছে। তিনি বলেন, আরে... উমার? দরজা খোলো। সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকলে আমরাও তার সাথে ভালো আচরণই করব। আর মন্দ নিয়তে এলে তার তরবারিতেই তার প্রাণ যাবে। এ সময় নবিজির ওপর ওহি অবতীর্ণ হচ্ছিল। শেষ হলে তিনি উমারের দিকে এগিয়ে আসেন এবং সাক্ষাৎ করেন। নবিজি তার জামা ও বর্ম সজোরে টান দিয়ে বলেন, 'হে উমার, ওয়ালিদ ইবনু মুগিরাকে আল্লাহ যেভাবে লাঞ্ছিত করেছেন, তেমনটা তোমার সাথে না হওয়া পর্যন্ত কি তুমি থামবে না? হে আল্লাহ, এই যে উমার ইবনুল খাত্তাব, হে আল্লাহ, এর দ্বারা আপনি ইসলামকে মজবুত করুন।' সঙ্গে সঙ্গে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর আপনি আল্লাহর রাসুল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে উপস্থিত জনতা এত জোরে তাকবির ধ্বনি দেয় যে, মাসজিদুল হারাম থেকেও তা শোনা যায়।[১]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। তার ইসলামগ্রহণের কারণে মুশরিকদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়। এটাকে তারা নিজেদের জন্য লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক মনে করে। পক্ষান্তরে তার কালিমাপাঠ মুসলিমদের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে; তাদের মাঝে খুশির বন্যা বয়ে যায়।

মুশরিকদের রোষানলে উমার ইবনুল খাত্তাব

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইসলামগ্রহণের পর আমি মনে মনে বললাম, মক্কায় আল্লাহর রাসুলের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুতা পোষণ করে কে? আমার মনে হলো— আবু জাহল। তাই তার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। সে বেরিয়ে এসে আমাকে স্বাগত জানিয়ে জানতে চাইল, কী খবর তোমার? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি তোমাকে এই সংবাদ দিতে এসেছি, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছি এবং তার আনীত সবকিছু বিশ্বাস করে নিয়েছি।

---

[১] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, পৃষ্ঠা : ৭, ১০, ১১; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, পৃষ্ঠা : ১০২-১০৩; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩-৩৪৬

তিনি বলেন, এ কথা শুনে সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে, আল্লাহ তোমার অমঙ্গাল করুক। তুমি যে বার্তা নিয়ে এসেছ, তারও অমঙ্গাল করুক।[১]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে সময় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে লোকেরা তার পিছু নিয়ে তার সাথে মারামারি শুরু করে দিত; তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করে আমার মামা আস ইবনু হাশিমের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলে তিনি দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে যান। তিনি আরও বলেন, এক কুরাইশ নেতাকে গিয়ে খবর দিলে সে-ও দরজা বন্ধ করে দেয়। সম্ভবত তিনি আবু জাহলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[২]

কুরাইশদের মাঝে ঝড়ের বেগে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ায় পটু ছিল জামিল ইবনু মাআমার নামের এক ব্যক্তি। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিজের ইসলামগ্রহণের কথা জানান। আর সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করে, খাত্তাবের পুত্র ধর্মত্যাগ করেছে। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পেছনে দাঁড়িয়ে বলেন, মিথ্যা; বরং আমি ইসলাম কবুল করেছি। এরপর তারা তার ওপর হামলে পড়ে এবং লড়াই চলতে থাকে। বেলা বেড়ে গেলে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন, আর তারা তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তিনি বলেন, তোমাদের সাধ্যে যা কুলোয়, তা করো গিয়ে। আল্লাহর কসম, সংখ্যায় আমরা ৩০০ হলেই তোমাদের বুঝিয়ে দিতাম! মক্কা হয় তোমাদের হতো আর নয়তো আমাদের।[৩]

পরবর্তী সময়ে মুশরিকরা তাকে হত্যা করার জন্য সদলবলে তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার বাবার ব্যাপারে বলেন, একদিন তিনি নিজ গৃহে ভীত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তখন আবু আমর আস ইবনু ওয়াইল আস-সাহমি তার কাছে আসেন। তার গায়ে নকশি চাদর ও রেশমি জামা। তিনি বনু সাহম গোত্রের লোক। জাহিলি যুগে তারা আমাদের মিত্র ছিল। আস ইবনু ওয়াইল আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কী অবস্থা? আমার বাবা উত্তরে বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আপনার গোত্রের লোকজন অচিরেই আমাকে হত্যা করবে। তা শুনে আস বলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তারা আপনার কিছুই করতে পারবে না। তার কথা শুনে বাবা শঙ্কামুক্ত হন। আস বেরিয়ে দেখতে পান পুরো উপত্যকা লোকে ভরপুর। তিনি তাদের বলেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলে, আমরা উমারের কাছে যাচ্ছি, সে বিধর্মী হয়ে গিয়েছে। আস বলেন, না, তার কাছে তোমরা যেতে পারবে না।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৯-৩৫০

[২] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ৮

[৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৮-৩৪৯

তার কথা শুনে লোকজন ফিরে যায়।[১]

উমারের উদ্যোগে প্রকাশ্যে সালাত আদায়

তার ইসলামগ্রহণের পর এই ছিল মুশরিকদের অবস্থা। অপরদিকে মুসলিমদের অবস্থা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাকে 'ফারুক' নামে নামকরণের কী কারণ? তিনি বলেন, আমি হামযার ৩ দিন পর ইসলাম গ্রহণ করেছি—এভাবে তার ইসলামগ্রহণের পুরো গল্পটি শোনান। শেষে গিয়ে বলেন, ইসলামগ্রহণের সময় আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহর রাসুল, বাঁচি বা মরি, আমরা কি সত্যের ওপর নই? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, অবশ্যই তোমরা সত্যের ওপর আছ; যদিও তোমরা বেঁচে থাকো কিংবা মারা যাও। তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম, তাহলে লুকোছাপা কেন? ওই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন। আমরা অবশ্যই জনসম্মুখে বের হব। এরপর দুটি সারিতে ভাগ হয়ে নবিজিকে নিয়ে বের হই, যার একটিতে ছিল হামযা আর অপরটিতে ছিলাম আমি। আমাদের দৃপ্ত পদাঘাতে সেদিন ধুলো উড়ছিল। এভাবে আমরা মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করি। উমার বলেন, এ সময় কুরাইশরা আমার ও হামযার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারা সেদিন এমন কষ্ট পেয়েছিল, যা আগে কখনো পায়নি। সেদিন আল্লাহর রাসুল আমাকে উপাধি দেন 'ফারুক'।[২]

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, উমারের ইসলামগ্রহণের আগে কাবার কাছে সালাত আদায় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[৩]

সুহাইব ইবনু সিনান রুমি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাওহিদের কালিমা পাঠ করার পর ইসলাম প্রকাশ্যে তার অস্তিত্বের জানান দেয় এবং প্রকাশ্যে দাওয়াতি কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এরপর থেকে আমরা একসাথে বাইতুল্লাহর ছায়ায় বসতে পারি। তাওয়াফ করতে পারি। যারা আমাদের ওপর জুলুম করছিল, তাদের সামনে দাঁড়াতে পারি এবং তাদের কিছু কিছু জুলুম প্রতিরোধও করতে পারি।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইসলামগ্রহণের পর দিনদিন আমাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৬৪; *আল-মুসনাদুল জামি* : ৮১৯৪

[২] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ৬-৭

[৩] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১০৩

[৪] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ১৩

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬৮৪; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৮৮০; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩১৯৭৩;

দ্বীন ছেড়ে দাও! আমরা তোমায় দুনিয়া দেব!

হামযা ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার মতো মহান দুই ব্যক্তির ইসলামগ্রহণের পর কুরাইশদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। তারা এবার মুসলিমদের ওপর চালানো জুলুম-নির্যাতন বন্ধ রেখে সমঝোতার চিন্তা করে। ঠিক করে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল চাওয়া পূরণ করে হলেও যদি তাকে থামানো যায়। কিন্তু এই নির্বোধরা জানত না, মহাবিশ্বে সূর্যের আলো পায়—এমন সবকিছু তার দাওয়াতের সামনে মশার একটি পাখার সমান মূল্যও রাখে না। দিনশেষে কুরাইশদের সকল চেষ্টা বিফলে যায়; সব ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

ইবনু ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল-কুরাজির সূত্রে ইয়াযিদ ইবনু যিয়াদ আমাদের জানান, তিনি বলেন—

উতবা ইবনু রবিআ ছিল নেতৃস্থানীয় লোক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল হারামে অবস্থানকালে সে একদিন কুরাইশদের সভায় বলে, শোনো কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি কি কিছু প্রস্তাব নিয়ে মুহাম্মাদের কাছে যাব? হতে পারে সে আমার কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং আমরা তা আদায় করলে সে আমাদের সাথে একটা মীমাংসায় আসবে।

হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দিনদিন সাহাবিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ঠিক তখনই তার মাথায় এই বুদ্ধিটা আসে। লোকেরা বলে, যাও, আবুল ওয়ালিদ! গিয়ে কথা বলো তার সাথে।

তখন উতবা নবিজির কাছে গিয়ে ধীরে-সুস্থে বসে। তারপর বলে, শোনো ভাতিজা, নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। আর তোমার বংশপরিচয়ও উল্লেখ করার মতো। তুমি এমন এক বিষয় তোমার জাতির কাছে নিয়ে এসেছ, যার দ্বারা তুমি তাদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছ, জ্ঞানীগুণীদের নির্বোধ বানিয়েছ, তাদের উপাস্য ও ধর্মের নিন্দা করেছ, পূর্বপুরুষদের অস্বীকার করেছ। আমি তোমার সামনে কিছু বিষয় তুলে ধরছি। আগে শোনো, তারপর সময় নিয়ে ভালোমতো ভাবো। হতে পারে কিছু বিষয় তোমার মনে ধরবে। নবিজি বলেন, চাচা, আপনি বলে যান, আমি শুনছি।

সে বলে, ভাতিজা, যদি তোমার লক্ষ্য থাকে, তোমার এই মতাদর্শ দিয়ে তুমি বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করবে, তাহলে আমাদের বলো—আমরা তোমার জন্য সম্পদের পাহাড় গড়ে দেব, তুমি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে। তুমি যদি সম্মান চাও, তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের নেতা বানিয়ে নেব। তোমার কথার

আল-মুসনাদুল জামি : ৯৩৭২

বাইরে কিচ্ছু হবে না। তুমি যদি রাজা হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা করে রাখব। আর যদি তোমার মনে হয়—কোনো কিছুর আছর পড়েছে তোমার ওপর, যা তাড়ানো তোমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব, তোমাকে সুস্থ করে তুলতে যত টাকা লাগবে আমরা দেব। তুমি তো জানোই, মাঝে মাঝে জিন মানুষের ওপর আছর করে, তখন জিন থেকে মুক্ত হতে হলে চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোযোগ দিয়ে তার সব কথা শোনেন। এরপর বলেন, চাচা, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বলে, হ্যাঁ, শেষ। নবিজি বলেন, তাহলে এবার আমার কথা শুনুন। সে বলে, ঠিক আছে, বলো। তিনি পাঠ করেন—

حمٓ ① تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ... ⑤

হা-মিম। এই কিতাব নাযিল হয়েছে পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞানী, সুসংবাদ-দাতা ও সতর্ককারী। তবে তাদের অধিকাংশই (এই কিতাব থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই তারা শুনবে না। তারা (কাফিররা) বলে, (হে মুহাম্মাদ) তুমি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করো, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াত আরম্ভ করেন। উতবাও দুহাত পেছনে রেখে তাতে ভর দিয়ে মন দিয়ে শুনতে থাকে। সিজদার আয়াত এলে নবিজি সিজদা করেন। তারপর বলেন, হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি যা শোনার, তা তো শুনলেন। আর এই হলো আপনার প্রলোভন এবং সে ব্যাপারে আমার অবস্থান।

উতবা উঠে তার সাথিদের কাছে ফিরে যায়। তাকে দেখে কেউ কেউ বলে, আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, ফেরার সময় সে চেহারা আর নেই। তার পাশে বসে তারা জানতে চায়, কী ভাবছ, হে আবুল ওয়ালিদ? সে বলে, আমার ভাবনা হলো—তার থেকে আমি এমন কথা শুনে এসেছি, যা এই জীবনে কখনো শুনিনি। কসম আল্লাহর, তা কবিতাও নয়, জাদুমন্ত্রও নয়, ভাগ্যগণনাও নয়। তাই বলছি, তোমরা

---

[১] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১-৫

আমার কথা ভেবে দেখো। আমার দিকে তাকিয়ে হলেও—তাকে তার মতো ছেড়ে দাও। তার সাথে লাগতে যেয়ো না। আল্লাহর কসম, আমি তার থেকে যা শুনেছি, সে হিসেবে অচিরেই বিশাল কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তারপর যদি আরবরা তার ওপর আক্রমণ করে, তাহলে তোমাদের ছাড়াই কাজ হয়ে গেল। আর যদি সে সমগ্র আরবের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তাহলে তার রাজত্ব মানে তো তোমাদেরও রাজত্ব, তার সম্মান মানে তোমাদেরও সম্মান। তখন তোমাদের চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে থাকবে! এসব শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, নিশ্চয় সে তার কথা দিয়ে তোমাকে জাদু করেছে। সে বলে, তার ব্যাপারে এটাই আমার চূড়ান্ত ভাবনা। এখন তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো।[১]

অপর এক বর্ণনায় আছে, উতবা মনোযোগ দিয়ে নবিজির তিলাওয়াত শুনছিল।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾

তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি আদ ও সামুদের আজাবের মতো এক কঠিন আজাবের ব্যাপারে তোমাদের সতর্ক করলাম।[২]

একপর্যায়ে নবিজি সুরা ফুসসিলাতের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নবিজির মুখ চেপে ধরে বলে, আল্লাহর দোহাই লাগে, তুমি চুপ করো! উতবা আসলে এতটাই ভয় পেয়েছিল যে, মনে করছিল, এই বুঝি বিপদ নামল! এরপর সে তার কওমের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বিস্তারিত সব খুলে বলে।[৩]

নবিজির পাশে বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিব

আরবের পরিবেশ এখন আর আগের মতো নেই। নবিজির কথা, কাজ ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে মানুষজন ইসলাম কবুল করে নিচ্ছে। মুসলিমদের সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। পরিস্থিতি অনেকটা পালটে গেলেও আবু তালিব তার প্রিয় ভাতিজাকে নিয়ে এখনো ভীষণ চিন্তিত। মুশরিকরা একের পর এক হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। দলবল নিয়ে তার বাড়িতেও এসেছে কয়েকবার। সেদিন তো এক আজব দাবি করে বসল তারা। আম্মারা ইবনু ওয়ালিদ আজীবন আবু তালিবের গোলাম হয়ে থাকবে। তবে এর বিনিময়ে নবিজিকে তুলে দিতে হবে ওদের হাতে।

শয়তানগুলো কখন কী করে বসে বোঝার কোনো উপায় নেই। উকবা তো একবার

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯৩-২৯৪

[২] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ১৩

[৩] *তাফসিরু ইবনি কাসির,* খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৫৯-১৬১

নবিজির গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে মেরেই ফেলতে যাচ্ছিল। আবু জাহলও মস্ত বড় এক পাথর হাতে নিয়েছিল নবিজিকে হত্যা করবে বলে। উমারকে নাঙা তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে যেতে অনেকেই দেখেছে। উমার নাহয় ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাকিরা তো এখনো মুশরিক। আবু তালিব মোটামুটি নিশ্চিত, ওরা যেকোনো সময় নিরাপত্তা-চুক্তি ভঙ্গ করে বসবে আর সুযোগ পেলেই তার আদরের ভাতিজাকে হত্যা করে ফেলবে। হঠাৎ কেউ যদি তাকে হত্যা করেই বসে, তখন হামযা বা উমার কী কাজে আসবে! অজানা এক শঙ্কায় অন্তর কেঁপে ওঠে আবু তালিবের। নানারকম দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েন তিনি। চারপাশের জগৎটা যেন মুহূর্তের মাঝেই অন্ধকার হয়ে আসে। এমন কঠিনতম সময়ে কী করবেন তিনি, কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।

নবিজির ব্যাপারে আবু তালিবের এই ভয় ও দুশ্চিন্তা সত্যে পরিণত হয়। মুশরিকরা তাকে প্রকাশ্যে হত্যার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের ঐক্যের দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

তারা কি কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? নিশ্চয় আমিই তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।[১]

শেষমেশ আবু তালিবের মাথায় চমৎকার একটি বুদ্ধি এল। নবিজিকে নিয়ে মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের বিষয়টা আঁচ করতে পেরে তিনি তার নিকটাত্মীয়—আব্দু মানাফের দুই পুত্রের বংশধর তথা বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিবের কাছে ছুটে যান। প্রিয় ভাতিজাকে রক্ষা করা এবং তার পক্ষে লড়াই করার আহ্বান জানান তাদের। তার এ আহ্বানে আরব-রীতি অনুসারে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সাড়া দেয়। বাকি ছিল কেবল আবু লাহাব। সে তাদের ছেড়ে কুরাইশদের দলে যোগ দেয়।[২]

---

[১] সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৭৯

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১০৬
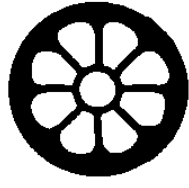
সামাজিক বয়কট

৪ সপ্তাহ বা তারও কম সময়ের মধ্যে মুশরিকরা মারাত্মক ৪টি ঘটনার সম্মুখীন হয়। সেগুলো হলো—হামযা ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার ইসলাম-গ্রহণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তাদের সকল প্রলোভন প্রত্যাখ্যান এবং তাকে রক্ষার ক্ষেত্রে বনুল মুত্তালিব ও বনু হাশিমের মাঝে ঐক্য গঠন। এসব দেখে মুশরিকরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়, দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে, নবিজিকে হত্যা করা হলে মক্কায় রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। এমনকি এ কারণে তারা অস্তিত্বহীন হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে তারা নবিজিকে হত্যা না করে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; তবে এবারের অত্যাচারের ধরন হবে অভূতপূর্ব।

নবিজিকে হত্যার ভিন্ন এক কৌশল

মুহাসসাব উপত্যকায় বনু কিনানার একটি টিলায় কুরাইশ নেতারা সমবেত হয়। সেখানে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়—বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিবের সঙ্গে তারা বিয়েশাদি, বেচাকেনা, ওঠাবসা, মেলামেশা, যাওয়া-আসা, কথাবার্তা থেকে শুরু করে সব ধরনের আদান-প্রদান বন্ধ করবে, সম্পর্ক ছিন্ন করবে। যতদিন না তারা মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য কুরাইশদের হাতে তুলে দিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এই বয়কট চলতেই থাকবে—এই মর্মে একটি চুক্তিপত্রে লেখা হয়, 'বনু হাশিমের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত কোনো সন্ধি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের প্রতি কোনোরকম সহানুভূতি দেখানো যাবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদকে হত্যার জন্য আমাদের নিকট হস্তান্তর করে।'

ইবনুল কাইয়িম বলেন, বলা হয় চুক্তিপত্রটি লিপিবদ্ধ করেছিল মানসুর ইবনু ইকরিমা ইবনি আমির ইবনি হাশিম। নজর ইবনুল হারিস লিখেছিল বলেও কথিত আছে, তবে বিশুদ্ধ মত হলো—সেটা মূলত বাগিজ ইবনু আমিন ইবনি হাশিমের হাতে লেখা। নবিজি

তার জন্য বদদুআ করলে তার হাত অবশ হয়ে যায়।[১]

চুক্তিপত্র লেখা সম্পন্ন হলে তা কাবার অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে আবু লাহাব ছাড়া বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিবের মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলে শিয়াবে আবু তালিবে (আবু তালিবের উপত্যকায়)[২] অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে নবুয়তের ৭ম বছর মুহাররম মাসে।

দুঃখ-দর্দশার ৩টি বছর

কঠোর অবরোধ শুরু হয়। জীবন ধারণের সব রকম উপকরণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়। বাইরে থেকে মক্কায় কোনো খাবার বা পণ্য এলে মুশরিকরা দ্রুত গিয়ে তা কিনে ফেলত। একপর্যায়ে তারা ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হন। বেঁচে থাকার জন্য গাছের পাতা ও পশুর চামড়া খেতে হয় তাদের। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের নারী ও শিশুদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি উপত্যকার বাইরে থেকে শোনা যেত। প্রকাশ্যে কোনো কিছু তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে হয়তো টুকটাক কিছু পাঠানো যেত।

হারাম মাসসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো মাসে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে উপত্যকা থেকে তারা বের হতে পারতেন না। মক্কার বাইরে থেকে আসা বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে তাদের সামান্য লেনদেন ছিল। কিন্তু মক্কার কাফিরেরা সেখানে গিয়ে দরদাম করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিত। এরপর আর সেগুলো কেনার মতো সাধ্য তাদের থাকত না।

হাকিম ইবনু হিযাম ছিলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা। তিনি তার ফুফুর জন্য মাঝেমধ্যে গম নিয়ে যেতেন। একবার আবু জাহল তার পথ আগলে দাঁড়ায় এবং তাকে যেতে বাধা দেয়। এ সময় আবুল বাখতারি এসে তাদের মাঝে হস্তক্ষেপ করলে তিনি গমগুলো নিয়ে তার ফুফুর কাছে যেতে পারেন।

আবু তালিব সবসময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে শঙ্কিত থাকতেন।

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬

[২] মাসজিদুল হারামের কাছাকাছি এবং সাফা-মারওয়ার পেছনে জাবালে আবু কুবাইস ও জাবালে খানদামার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা শিয়াবে আবু তালিব তথা আবু তালিবের উপত্যকা নামে পরিচিত। এই জায়গাটি ছিল বনু হাশিমের মালিকানাধীন। এখানেই নবিজি এবং আলি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের দাওয়াতের শুরুর দিকে মক্কার মুশরিকরা বনু হাশিম গোত্রের ওপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট ঘোষণা করলে তারা এই উপত্যকায় বসবাস শুরু করেন। [*আল-মাআলিমুল আসিরাহ ফিস সুন্নাতি ওয়াস সিরাহ*, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ হাসান শুররাব, পৃষ্ঠা : ১৫০; *লিসানুল আরাব*, ইবনু মানজুর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৯; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৩; *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৬৩]

তাই রাতের বেলায় সবাই শুয়ে পড়লে তিনি তার নিজের বিছানায় নবিজিকে শুতে বলতেন, যাতে কেউ তাকে হত্যা করতে এলে আবু তালিব তাকে চিনতে পারেন। তারপর সবাই ঘুমিয়ে গেলে তিনি তার কোনো ছেলে, ভাই, চাচাতো ভাই কিংবা ভাতিজাকে নবিজির বিছানায় ঘুমাতে বলতেন, আর নবিজিকে বলতেন তাদের কারও বিছানায় চলে যেতে।

মক্কায় জনসমাগমের বিভিন্ন মৌসুমে নবিজি এবং সাধারণ মুসলিমরা উপত্যকা থেকে বাইরে বের হতেন, আগত লোকদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতেন, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন। এ সময়ে আবু লাহাব যা করত, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অমানবিক চুক্তি থেকে অবশেষে মুক্তি

এভাবেই পূর্ণ তিন-তিনটি বছর কেটে যায়। নবুয়তের দশম বছর মুহাররম[১] মাসে উল্লেখিত চুক্তি ছিন্ন করা হয়। কঠিন এ কাজটি কুরাইশদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। বাহ্যত এই চুক্তিপত্রের সাথে একমত পোষণ করলেও অনেকেরই আসলে এতে দ্বিমত ছিল। তাই যাদের দ্বিমত ছিল, তারা এই অমানবিক চুক্তিপত্র ছিন্ন করতে চেষ্টা শুরু করে।

এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বনু আমির ইবনি লুয়াই গোত্রের হিশাম ইবনু আমর। তিনি রাতের বেলায় গোপনে বনু হাশিমের কাছে খাবার পৌঁছে দিতেন। যুহাইর ইবনু আবি উমাইয়া মাখযুমির কাছে তার যাতায়াত ছিল। আর তার মা আতিকা ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা।

হিশাম একদিন যুহাইরকে বলেন, 'ভাই যুহাইর, তুমি তো খুব আরামেই আছ। তোমার মামার বংশধরদের ব্যাপারে কোনো খোঁজ-খবর নিয়েছ?' জবাবে সে আক্ষেপ করে বলে, 'আমি একা আর তাদের জন্য কীই-বা করব? আল্লাহর কসম, যদি আমার সঙ্গে আর কেউ থাকত, তাহলে ওই চুক্তিপত্র ছিন্নভিন্ন করে ফেলতাম।'

'চিন্তা কোরো না। একজনকে পেয়ে যাবে তুমি।' হিশামের মুখে মুচকি হাসি।

'কে সে?' কৌতূহল প্রকাশ করে যুহাইর।

'আমি আছি তোমার সাথে।'

'আচ্ছা, তৃতীয় কাউকে খুঁজে বের করো তাহলে।'

---

[১] এ কথার প্রমাণ হচ্ছে, চুক্তিপত্র ছিন্ন হওয়ার ৬ মাস পর আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। আর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন রজব মাসে। তবে যারা বলেছেন, তিনি রামাদান মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের মতানুসারে তার মৃত্যু হয়েছে চুক্তিপত্র ছিন্ন হওয়ার ৮ মাসেরও কয়েক দিন পর।

তারপর তিনি মুতইম ইবনু আদির কাছে যান। তাকে আব্দু মানাফের দুই পুত্র হাশিম ও মুত্তালিব আর তাদের বংশধরদের মধ্যকার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এমন জুলুম ও অত্যাচারের ওপর সে কুরাইশদের সঙ্গো একমত হয়েছে বলে তাকে ভীষণ ভর্ৎসনা করেন। মুতইমও আক্ষেপ করে বলেন, 'একা একা আমি আর কীই-বা করব?'

'তোমার সঙ্গো আরও একজন আছে।' হিশাম উত্তরে বলেন।

'কে সে?'

'আমি আছি তোমার সাথে।'

'আচ্ছা, তৃতীয় কাউকে খুঁজে বের করো।'

'সে ব্যবস্থাও করেছি আমি।'

'কে সে?'

'যুহাইর ইবনু উমাইয়া।'

'আচ্ছা, তাহলে চতুর্থ কাউকে খুঁজে বের করো।'

হিশাম এবার আবুল বাখতারি ইবনু হিশামের কাছে যান। যুহাইর ও মুতইমের মতো তাকেও তিনি আশ্বস্ত করেন। আবুল বাখতারি পঞ্চম কাউকে খুঁজে বের করতে বলেন।

হিশাম সবার শেষে যান যামআ ইবনুল আসওয়াদ ইবনিল মুত্তালিব ইবনি আসাদের কাছে। তার সঙ্গো কথাবার্তা বলেন, অবরোধবাসীদের সঙ্গো তার আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং তাদের অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি জানতে চেয়ে বলেন, 'তুমি কি এ ব্যাপারে কাউকে আহ্বান করেছ?' তিনি হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়ে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেন। এরপর তারা মক্কার একটি উঁচু অঞ্চল হাজুনে গিয়ে একত্রিত হন এবং এই অমানবিক চুক্তিপত্র ছিন্নকরণের ওপর প্রতিজ্ঞা করেন। এ সময় যুহাইর বলেন, 'কাজটার শুরু আমি করব। আমিই এ ব্যাপারে প্রথমে কথা বলব।'

পরদিন সকালে তারা সবাই মজলিসে উপস্থিত হন। যুহাইর একদম পরিপাটি হয়ে এসেছেন। ৭ বার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এরপর উপস্থিত লোকদের কাছে গিয়ে বলেন, 'ওহে মক্কাবাসী, আমরা সবাই পেটভরে খাবার খাব, জামাকাপড় পরব আর বনু হাশিমের লোকেরা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, তাদের সঙ্গো কোনো বেচাকেনা-লেনদেন হবে না, তা কী করে হয়? আল্লাহর কসম, আমি এই অমানবিক, সম্পর্ক ছিন্নকারী চুক্তিপত্র ছিঁড়ে কুটিকুটি করে তবেই ক্ষান্ত হব।'

আবু জাহল তখন মসজিদের একপাশে ছিল। সে বলে ওঠে, 'তুই মিথ্যা বলছিস। ওটা ছিঁড়তে যাবি না।' যামআ ইবনুল আসওয়াদ বলেন, 'আল্লাহর কসম, তুই-ই বড় মিথ্যাবাদী। লেখার সময় থেকেই এটার প্রতি আমাদের অসম্মতি ছিল।' আবুল বাখতারি বলেন, 'ঠিক বলেছ যামআ। এটাতে যা লেখা আছে, তার ওপর আমরা রাজি নই। ওসব ব্যাপারে আমাদের স্বীকৃতি নেই।'

মুতইম ইবনু আদি বলেন, 'তোমরা দুজন সত্য বলেছ। তোমাদের সঙ্গে দ্বিমতকারীদের কথা মিথ্যা। আমরা ওই পত্র থেকে এবং পত্রে যা লেখা হয়েছে, তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'

তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিশাম ইবনু আমরও একই কথা বলেন।

আবু জাহল বলে, 'বুঝেছি, এ বিষয়ে তোমরা রাতেই পরামর্শ করে ফেলেছ। আর সেই পরামর্শ এখানে নয়, অন্য কোথাও হয়েছে।'

আবু তালিবও তখন মসজিদের একপাশে ছিলেন। তিনি এখানে এসেছেন বিশেষ একটি কারণে। তার চেহারায় চিন্তার ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছে। গতকাল নবিজি তাকে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিছু উইপোকা পাঠিয়েছেন, যেগুলো চুক্তিপত্রের 'আল্লাহ' নামটুকু ছাড়া বাকি সব খেয়ে ফেলেছে। আবু তালিব কুরাইশদের কাছে এ কথাগুলো বললেন। সাথে এটাও জানালেন, 'মুহাম্মাদ যদি মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তাকে আমরা তোমাদের হাতে ছেড়ে দেব। আর যদি সত্য বলে, তাহলে তোমরা আমাদের ওপর চলমান অবরোধ ও অত্যাচার সব বন্ধ করবে।' তারা তখন বলে, 'আপনি তো ইনসাফের কথাই বলেছেন।'

আবু জাহল ও অন্যদের মাঝে কথাবার্তা চলছিল। এরই মধ্যে মুতইম চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য এগিয়ে যান। তিনি গিয়ে দেখতে পান, উইপোকা 'بِاسْمِكَ اللّهم' তথা 'হে আল্লাহ, আপনার নামে শুরু করছি'—অংশটুকু ছাড়া সব খেয়ে ফেলেছে।

এরপর চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলা হয়। নবিজি ও তার সঙ্গীরা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আসেন। মুশরিকরা তখন নবুয়তের অন্যতম মহান নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে তো আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন—

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ۝٢

আর তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো ধারাবাহিক জাদু।[১]

[১] সূরা কমার, আয়াত : ২

তারা এই নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং দিনদিন কুফরির আরও তলানিতে যেতে থাকে।[১]

আবু তালিবের সাথে কুরাইশদের শেষ বোঝাপড়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালিবের উপত্যকা থেকে বেরিয়ে নিজ গতিতে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যান। কুরাইশরা অবরোধ উঠিয়ে নিলেও মুসলিমদের ওপর তাদের নির্যাতন এবং আল্লাহর পথে বাধাপ্রদান আগের মতোই চলছিল। ওদিকে আবু তালিব ভাতিজাকে রক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তিনি তখন ৮০ বছরের বৃদ্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ, তখন আর কীই-বা করার থাকে। শেষ কয়েক বছর তাকে অসংখ্য ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে; বিশেষত উপত্যকার ৩ বছর তো তার ওপর দিয়ে তুফান বয়ে গেছে। তাতে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া উপত্যকা থেকে বের হওয়ার কয়েক মাসের মাথায় তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই কুরাইশরা এই আশঙ্কা করে—তার অবর্তমানে তার ভাতিজার কোনো ক্ষতি করা হলে হয়তো মানুষের কথা শুনতে হবে। তাই তাদের মাঝে আরও একবার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আবু তালিবের সামনে নবিজির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হবে; এর আগে তারা ছাড় দিতে সম্মত ছিল না, প্রয়োজনে এবার কিছু বিষয়ে ছাড়ও দেওয়া হবে। এই ভেবে তারা আরও একবার প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, যা ছিল আবু তালিবের কাছে পাঠানো সর্বশেষ প্রতিনিধিদল।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবু তালিবের অসুস্থতার খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে তারা পরস্পর বলাবলি করে, হামযা ও উমার ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত সকল গোত্রে মুহাম্মাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আবু তালিবের কাছে চলো। তার ভাতিজার ব্যাপারে একটা সুরাহা করি। আমাদের পক্ষ থেকে যা দেওয়ার দিই। আল্লাহর কসম, আমাদের ওপর তার প্রভাব বিস্তার থেকে আমরা মোটেও নিরাপদ নই। ভিন্ন শব্দে এরকম বর্ণিত আছে—আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, এই বয়োবৃদ্ধ লোকটি মারা গেলে যদি তার কিছু হয়, তাহলে সমগ্র আরবজাতি আমাদের তিরস্কার করবে। তারা বলবে, এতদিন তারা কিছু বলেনি। আর এখন তার চাচা মারা যাওয়ায় তার ওপর চড়াও হয়েছে।

সম্ভ্রান্ত বেশ কয়েকজন আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হয়। তাদের মাঝে ছিল উতবা

---

[১] বিস্তারিত দেখুন—*সহিহুল বুখারি* : ১৫৯০, ৩৮৮২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫০-৩৭৭; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৬৮-৭৩, ১০৬-১১০। বর্ণনাগুলোতে কিছুটা বৈপরীত্য রয়েছে। বিচার-বিশ্লেষণের পর আমাদের কাছে যেটি অগ্রগণ্য মনে হয়েছে, সেটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনু রবিআ, শাইবা ইবনু রবিআ, আবু জাহল ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফ, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব এবং আরও অনেকে। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ জন। তারা আবু তালিবকে বলে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের মাঝে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আপনার বর্তমানে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে এসেছে, সে ব্যাপারে আপনি ভালো করেই জানেন। আমরা আপনাকে নিয়ে খুব শঙ্কিত। আমাদের ও আপনার ভাতিজার মাঝে যা কিছু ঘটছে, তা আমরা ভুলে যেতে চাই। তাই বলছি কি, তাকে ডাকুন এখানে। আমরাও তাকে কিছু বিষয়ে ছাড় দিই, সেও আমাদের কিছু কথা মেনে নিক—যেন সে আর আমাদের পেছনে লেগে না থাকে, আমরাও তার ব্যাপারে বিরত থাকতে পারি। সেও আমাদের ধর্ম নিয়ে কোনো কথা বলবে না, আর আমরাও তার ধর্মের ব্যাপারে চুপ থাকব।

এসব শোনার পর আবু তালিব নবিজিকে ডেকে পাঠান। তিনি এলে তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ভাতিজা, এখানে তোমার সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন। তোমার সাথে কথা বলতে চাইছেন। তারা কিছু বিষয়ে তোমাকে ছাড় দিতে চান এবং তোমার থেকে কিছু বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতে চান। এই বলে তিনি নিরপেক্ষভাবে তাদের যাবতীয় প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রস্তাব শুনে নবিজি তাদেরকে বলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কি জানেন, যদি আমার একটিমাত্র কালিমা আপনারা গ্রহণ করেন, তাহলে সমগ্র আরবের ওপর আপনাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, অনারবরাও আপনাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে।'

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি আবু তালিবকে সম্বোধন করে বলেন, 'চাচাজান, আমি চাই তারা মাত্র একটি কালিমা গ্রহণ করুক। আর তাতেই পুরো আরবজাতি তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেবে আর অনারবরাও হবে তাদের অনুগত।'

আরও এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, 'চাচাজান, আপনি কি তাদেরকে উত্তম কিছুর দিকে আহ্বান করবেন না?' আবু তালিব বলেন, 'তাদের তুমি কীসের প্রতি আহ্বান করতে চাচ্ছ?' নবিজি বলেন, 'আমি তাদের এমন এক কালিমা পাঠের আহ্বান করছি, যার প্রভাবে আরবরা তাদের অনুগত হবে এবং অনারবদের ওপরও তারা রাজত্ব করতে পারবে।'

ইবনু ইসহাকের এক বর্ণনায় আছে, 'একটিমাত্র কালিমা গ্রহণ করে নিলে তোমরা হবে আরবদের রাজা, অনারবদের শাসনকর্তা।'

এটা শোনার পর তারা সবাই চুপ হয়ে যায়। দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে তাদের মুখমণ্ডলে। তারা চিন্তায় ডুবে গেছে, একটিমাত্র কল্যাণকর কালিমা গ্রহণ করার বিনিময়ে যদি এমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করা যায়, তবে তা ফিরিয়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নীরবতা ভেঙে আবু জাহল জানতে চাইল, কী সেই কালিমা? তোমার বাবার কসম খেয়ে বলছি, তেমন ১০টি কালিমাতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। নবিজি তখন বলেন, 'আপনারা বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) এবং তিনি ছাড়া অন্য সকল উপাস্য ত্যাগ করুন।' এ কথা শুনে তারা হাততালি দিয়ে বলে,

আমরা মাত্র এক উপাস্যের উপাসনা করব—এটাই তুমি বলছ? মুহাম্মাদ, তোমার কথাবার্তা দেখছি আসলেই বিস্ময়কর!

এরপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করে, তোমরা যা চাও, তার একটিও সে গ্রহণ করবে না। তোমরা বরং চলে যাও। বাপদাদার ধর্মের ওপর অবিচল থাকো। আল্লাহ তোমাদের ও তার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়—

صٓ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝٢ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ۝٣ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧

স-দ। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের; বরং যারা কাফির, তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, এরপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে; কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। তারা বিস্ময়বোধ করে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে বলে। আর কাফিররা বলে, এ তো এক মিথ্যাবাদী, জাদুকর। সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের কথা বলে? নিশ্চয় এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এ কথা বলে স্থান ত্যাগ করে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের ওপর অবিচল থাকো। নিশ্চয় এ বক্তব্য বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমরা পূর্বের ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।[১][২]

---

[১] সুরা স-দ, আয়াত : ১-৭

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৭-৪১৯; *তাফহিমুল কুরআন,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১৬-৩১৯; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ৯১

দুঃখে ভরা বছর

প্রিয় চাচা আবু তালিবের চিরনিদ্রা

আবু তালিবের অসুস্থতা দিনকে দিন বেড়েই চলল। একদিন দুনিয়ার সকল মায়া ত্যাগ করে তাকে পাড়ি জমাতে হলো না-ফেরার দেশে। নবুয়তের দশম বছর উপত্যকা থেকে বের হওয়ার ৬ মাসের মাথায় রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন আবু তালিব।[১] তবে অন্য বর্ণনায় এসেছে, খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুর ৩ দিন আগে রামাদানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন।[২]

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বর্ণনা করেন, আবু তালিবের মুমূর্ষু ভাব দেখা দিলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে উপস্থিত হন। তখন সেখানে আবু জাহলও ছিল। নবিজি তাকে বলেন, চাচাজান, আপনি কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন। এটি এমন এক কালিমা, যার কারণে আমি আপনার জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারব। তখন আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আবু তালিব, আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাইছেন? তারা দুজন তার সঙ্গে পীড়াপীড়ি করতেই থাকে। একপর্যায়ে তাদের প্ররোচনায় আবু তালিবের মুখ

---

[১] *তারিখে ইসলাম*, শাহ আকবর খান নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২০; আবু তালিব ঠিক কোন মাসে মৃত্যুবরণ করেছেন তা নিয়ে উৎসগ্রন্থগুলোতেই মতভেদ রয়েছে। আমরা এই মতটিকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ অধিকাংশ গ্রন্থপ্রণেতা আবু তালিবের উপত্যকা থেকে মুক্তির ৬ মাস পর আবু তালিবের মৃত্যুর ব্যাপারে একমত হয়েছেন। আর অবরোধ ছিল মোট ৩ বছর। যার সূচনা হয়েছিল নবুয়তের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে। এই হিসেবে তিনি মারা যান নবুয়তের দশম বছর রজব মাসে।

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১১১

থেকে শেষ যে কথা উচ্চারিত হয় তা হলো—আলা মিল্লাতি আব্দিল মুত্তালিব। অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর...। তখন নবিজি বলেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকব। তখন কুরআনুল কারিমের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

নবি ও মুমিনদের উচিত নয়, মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হয়—এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামি।[১]

নবিজিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ... ﴿٥٦﴾

আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না।[২][৩]

আবু তালিব যেভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ছিলেন এমন এক দুর্গ, যেখানে ইসলামের শৈশবকাল নিন্দুকের নিন্দা আর উপহাসকারীদের উপহাস থেকে নিরাপদ থেকেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তিনি তার বাপদাদার ধর্মের ওপরই শেষ পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। ফলে পরকালের পূর্ণাঙ্গ সফলতা তার অধরাই রয়ে গেল। বিশুদ্ধ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, চাচা আবু তালিব কি আপনার সুপারিশে নাজাত পাবেন? তিনি তো আপনাকে বিপদাপদে রক্ষা করতেন, আপনার দিকে তেড়ে আসা বিপদ এবং শত্রুর তিরের সামনে নিজের বুক পেতে দিতেন। নবিজি বলেন, তিনি জাহান্নামের উপরিভাগে আছেন। আমি না থাকলে তিনি একদম তলানিতে থাকতেন।[৪]

আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুলকে তার চাচার

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১১৩

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ৫৬

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৮৪

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৮৩

ব্যাপারে বলতে শুনেছেন, হতে পারে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার কাজে আসবে। ফলে তাকে জাহান্নামের অগভীর স্থানে রাখা হবে, যা তার পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছাবে।[১]

উম্মুল মুমিনিন খাদিজার চিরবিদায়

আবু তালিবের মৃত্যুর ২-৩ মাস পর খাদিজাতুল কুবরা রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন। তখন নবুয়তের দশম বছর। পবিত্র রামাদান মাস। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর আর নবিজির বয়স তখন ৫০ বছর।[২]

নবিজির জন্য খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। তার সাথে নবিজি দীর্ঘ ২৫ বছর সংসার করেছেন। সুদীর্ঘ এ সময়ে তিনি তার বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, চলমান দুর্দশায় সঙ্গী হয়েছেন; এমনকি নিজের জানমাল দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

آمَنَتْ بِيْ حِيْنَ كفَرَ بِيَ النَّاسُ ، وَصَدَّقَتْنِيْ حِيْنَ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ ، وَأَشْرَكَتْنِيْ فِيْ مَالِهَا حِيْنَ حَرَّمَنِيَ النَّاسُ ، وَرَزَقَنِيَ اللهُ وَلَدَهَا ، وَحَرَمَ وَلَدَ غَيْرِهَا

সবাই যখন আমাকে অবিশ্বাস করেছে, তখন তিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন। স্বজনরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তখন তিনি আমাকে সত্যায়ন করেছেন। সবাই যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন তিনি আমাকে তার সম্পদের অংশীদার করেছেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সন্তান দান করেছেন। অন্য কারও মাধ্যমে তা করেননি।[৩]

আবু হুরাইরা বলেন, আল্লাহর রাসুলের কাছে জিবরিল আমিন এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই তো খাদিজা আপনার জন্য বাটিতে করে খাবার নিয়ে আসছেন। আপনি তাকে তার রবের পক্ষ থেকে সালাম জানান। আর তাকে মোতির তৈরি এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ থাকবে না।[৪]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৮৫

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৯৬

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৮৬৪; *কানযুল উম্মাল* : ৩৪৩৪৮; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৭৪৯৭

একের পর এক মহাপরীক্ষা

অল্প কদিনের ব্যবধানে যাতনাদায়ক দুটি ঘটনা ঘটে। এতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে ভীষণ কষ্ট পান। এরপর আবার স্বজাতিদের পক্ষ থেকে শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন আর সীমাহীন নিপীড়ন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর তারা নতুন উদ্যমে অত্যাচার আরম্ভ করে। অন্যায় ও জুলুম সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন করতে দেখে নবিজি তাদের থেকে নিরাশ হয়ে যান। বুকভরা আশা নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তায়েফবাসী নিশ্চয়ই তার আহ্বানে সাড়া দেবে কিংবা আশ্রয় দিয়ে স্বজাতির বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। কিন্তু সেখানে তিনি এমন কাউকে পাননি, যে আশ্রয় দেবে বা সাহায্য করবে; বরং তাকে তারা স্বজাতির চেয়েও বহুগুণ বেশি কষ্ট দিয়েছে।

মক্কাবাসীর নির্যাতন-নিপীড়নের জাঁতাকল যেমন নবিজিকে পিষ্ট করছিল, তেমনই তার প্রিয় সাহাবিরা দিনের পর দিন অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করছিলেন। তাই একসময় আবু বকরও মক্কা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। হাবশার উদ্দেশে রওনা হয়ে তিনি বারকুল গিমাদ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন ইবনুদ দুগুন্না তাকে নিরাপত্তা দিয়ে ফিরিয়ে আনে।[১]

কুরাইশরা আবু তালিবের মৃত্যুর পর নবিজির ওপর যেভাবে নির্যাতন শুরু করে, তার জীবদ্দশায় তারা তা ভাবতেও পারত না। একদিন এক নির্বোধ কুরাইশ তার মাথায় মাটি ছিটিয়ে দেয়। মাথায় মাটি নিয়েই নবিজি নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। নবিজির কোনো এক কন্যা উঠে এসে তার মাথা ধুয়ে দেন। এ সময় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। নবিজি তাকে বলেন, 'আদরের মেয়ে আমার, কেঁদো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার বাবাকে হিফাজত করবেন।' নবিজি আরও বলেন, 'চাচা আবু তালিবের মৃত্যু পর্যন্ত কুরাইশরা আমার সাথে এমন কিছু করেনি, যা আমার খুব বেশি খারাপ লেগেছে।'[২]

এই বছর লাগাতার বিপদাপদ আসতে থাকায় নবিজি এর নাম দিয়েছেন 'আমুল-হুযন' বা 'দুঃখ-দুর্দশার বছর।' পরে এ নামেই সময়টি ইতিহাসের পাতায় পরিচিতি পেয়ে যায়।

সাওদার সাথে শুভ-পরিণয়

একই বছর তথা নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১] শাহ আকবার নাজিবাবাদি স্পষ্ট করেছেন, এই ঘটনাটি একই বছর ঘটেছে। [দেখুন, *তারিখে ইসলাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২০; বিস্তারিত জানতে দেখুন—*সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭২-৩৭৩; *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৫]

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৬

সাল্লাম সাওদা বিনতু যামআকে বিয়ে করেন। তিনি আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার যারা হাবশায় হিজরতের উদ্দেশ্যে গিয়েছেন, তিনি তাদের একজন। তার প্রথম স্বামী সাকরান ইবনু আমরও ইসলাম গ্রহণ করে তার সঙ্গে হিজরত করেছেন। এরপর হাবশায় কিংবা মক্কায় ফেরার পর তার মৃত্যু হয়। ইদ্দত শেষ হলে নবিজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদিজার মৃত্যুর পর তিনিই ছিলেন তার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। কয়েক বছর পর তিনি তার জন্য নির্ধারিত রাতটি আয়িশাকে দিয়ে দেন।[১][২]

মুসলিম জাতির মূল চাবিকাঠি

ঠিক এখানে এসে চরম ধৈর্যশীলরাও অস্থির হয়ে পড়েন, জ্ঞানীরা একে অপরকে প্রশ্ন করেন, কী সেই চালিকাশক্তি, যার দ্বারা মুসলিমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন? কী সেই উপাদান, যার সাহায্যে তারা দৃঢ়তা ও অবিচলতার এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন? কীভাবে তারা এমন যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতনেও ধৈর্যধারণ করেছেন? যে নির্যাতনের বর্ণনা শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, অন্তরাত্মা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়গুলো সত্যি সবাইকে অভিভূত করে। এখানে অল্প কয়েকটি চালিকাশক্তি ও কার্যকারণ নিয়ে আলোচনা করব, যাতে সেদিকে কিছুটা ইঙ্গিত থাকবে।

[এক] প্রধান, প্রথম ও মৌলিক চালিকাশক্তি ছিল আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদের প্রতি ঈমান এবং তাঁর যথাযথ পরিচয় লাভ। কারণ সুদৃঢ় ঈমান পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেও অবিচল থাকে। এমন মজবুত ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী ব্যক্তির কাছে তার ঈমানের বিবেচনায় পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য—তা যত বেশিই হোক না কেন—তীব্র স্রোতের ওপর ভাসমান জমাটবন্ধ শ্যাওলার মতো, যা কোনো দুর্ভেদ্য দুর্গ বা সুরক্ষিত কেল্লা ভাঙতে চায়। বৈষয়িক উপভোগ্য সবকিছুর প্রতি তারা থাকে ভ্রূক্ষেপহীন। কারণ ঈমানের যে স্বাদ এবং বিশ্বাসের যে আত্মতৃপ্তি তারা পেয়েছে, তার সামনে এসব তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর। এ যেন আল্লাহ তাআলার কালামের প্রতিচ্ছবি—

...فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ... ﴿١٧﴾

---

[১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের মাঝে রাত বণ্টন করে দিয়েছিলেন। যখন যার পালা আসত, নবিজি তার ঘরে রাত্রিযাপন করতেন। বিয়ের কয়েক বছর পর সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার জন্য নির্ধারিত রাতটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার জন্য ছেড়ে দেন। [*সুনানু আবি দাউদ* : ২১৩৪; *জামিউস সগির* : ৭১০৯; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫১]

[২] *রহমাতুল-লিল-আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৫; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ১০

ফেনা তো শুকিয়ে শেষ হয়ে যায়। আর যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিনে থেকে যায়।[১]

এই একটিমাত্র কার্যকারণ থেকে আরও কয়েকটি উপাদান উৎসারিত হয়, যা এই দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

দুই. আকর্ষণীয় ও সম্মোহনী নেতৃত্ব। হ্যাঁ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মুসলিম জাতির জন্য সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। শুধু মুসলিম জাতিরই নন; বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যই তিনি নেতা হিসেবে অতুলনীয়। তার মাঝে দৈহিক সৌন্দর্য, মানবিক উৎকর্ষ, চারিত্রিক পবিত্রতা, স্বভাব-প্রকৃতির অনন্যতা-সহ অসংখ্য উৎকৃষ্ট গুণের সমাহার ঘটেছে। এসব কারণে মানুষ নিমিষেই তাকে ভালোবেসে ফেলত, তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যেত। ভালোবাসার এমন কিছু উপাদান তার মাঝে ছিল, যা পৃথিবীর আর কাউকে দেওয়া হয়নি। তিনি ছিলেন সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতার বিবেচনায় সবার শীর্ষে। শ্রেষ্ঠত্বের সকল শাখায় তার এত বেশি পদচারণা ছিল, কাছের মানুষেরা তো বটেই, শত্রুরাও সেসব নিয়ে সংশয় করতে পারত না। তার পবিত্র জবান থেকে নিঃসৃত কথামালা সবাই বিশ্বাস করে নিত।

একবার তিন কুরাইশ নেতা মিলিত হয়। তাদের প্রত্যেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনত। তাদের মাঝে আবু জাহলও ছিল। হঠাৎ বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে তাদের একজন আবু জাহলকে প্রশ্ন করে, মুহাম্মাদকে যা পাঠ করতে শুনেছ, সে ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কী? জবাবে সে বলে, কী আর শুনেছি! আমাদের ও বনু আব্দি মানাফের মাঝে মান-মর্যাদা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তারা মানুষকে খাওয়ালে আমরাও খাইয়েছি। তারা সাহায্য করলে, আমরাও সাহায্য করেছি। তারা দান করলে, আমরাও দান করেছি। আমরা সবসময় প্রতিযোগিতায় রত দুটি ঘোড়ার মতো থেকেছি। হঠাৎ তারা দাবি করে বসল, আমাদের মাঝে একজন নবি আছে, যার কাছে আসমান থেকে ওহি আসে। এখন এটার নমুনা আমরা কোথায় পাব? আল্লাহর কসম, আমরা কিছুতেই তার প্রতি ঈমান আনব না, তাকে সত্য বলে মেনে নেব না।[২]

আবু জাহল নবিজিকে আরও বলত, মুহাম্মাদ, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না। তবে তুমি যা নিয়ে এসেছ, তা মিথ্যা মনে করি। তখন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন—

---

[১] সুরা রাদ, আয়াত : ১৭

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৬

...فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং এই জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।[১][২]

একদিন কাফিররা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরপর ৩ বার আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলে। তৃতীয় বারে তিনি বলেন, ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের ধ্বংস নিয়ে এসেছি। এ কথাটি তাদের বেশ ধাক্কা দেয়। এমনকি তাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটিও তখন সদাচার করতে শুরু করে।

নবিজি সালাতে সিজদায় থাকাকালে তারা একবার তার ওপর উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। এ সময় তিনি বদদুআ করলে তাদের হাসি বন্ধ হয়ে যায়। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে—তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

উতাইবা ইবনু আবি লাহাবের জন্যও নবিজি বদদুআ করেছিলেন। উতাইবা যে এরপর বিপদে পড়বে, সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। পরবর্তী সময়ে তার ঘাতক সিংহকে দেখে সে বলে ওঠে, মুহাম্মাদ মক্কায় বসে আমাকে হত্যা করছে।

উবাই ইবনু খালফ নবিজিকে হত্যা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। তখন নবিজি বলেন, আল্লাহ চাইলে আমিই তোমাকে হত্যা করব। উহুদ যুদ্ধের সময় নবিজি উবাইকে সামান্য একটু আঘাত করেন। এতেই উবাই চিৎকার করে বলতে থাকে, সে মক্কায় থাকাকালেই আমাকে হত্যা করবে বলেছিল। আল্লাহর কসম, সে আমার ওপর থুতু নিক্ষেপ করলেও আমি মরে যেতাম।[৩] বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

সাদ ইবনু মুআজ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি উমাইয়া ইবনু খালফকে বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় মুসলিমরা তোমাকে হত্যা করবে। এ কথা শুনে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। মক্কার বাইরে বের না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। বদর[৪] যুদ্ধের সময় আবু জাহল তাকে বের হতে পীড়াপীড়ি করলে সে মক্কার সবচেয়ে ভালো দুটি উট কিনে নেয় যাতে সময়মতো পালাতে পারে।

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৩৩

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩০৬৪; *আল মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১২৬৫৮; এর সনদ দুর্বল।

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৪

[৪] বদর হচ্ছে মদিনা প্রদেশের একটি শহর। মদিনা থেকে ১৩০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

এরপর যখন তার স্ত্রী তাকে বলে, 'হে আবু সাফওয়ান, তোমার ইয়াসরিবি[১] ভাই যা বলেছিল, তা কি তুমি ভুলে গেছ?' সে বলে, 'না না, আমি তো তাদের সাথে অল্প কিছুদূর যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি।'[২]

এই ছিল নবিজির শত্রুদের অবস্থা। অন্যদিকে তার সাহাবিরা তাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তার প্রতি তাদের সত্য ভালোবাসার বেগ ছিল নিম্নভূমিতে নেমে আসা স্রোতের মতো; হৃদয়ের আসক্তি ছিল চুম্বকের প্রতি লোহার আকর্ষণের মতো।

তার চেহারার নেই উপমা, সবার মাথার তাজ
সব মানবের হৃদয়মাঝে তিনিই করেন রাজ।

এমন পাগলপারা ভালোবাসার কারণে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে সামান্য একটা ফুলের টোকার বদলে তারা সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের গর্দান পেশ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একদিন নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। উতবা ইবনু রবিআ দুই জুতা একত্র করে তাকে আঘাত করে। চেহারায় আঘাত করতে করতে সে তার জুতাই ছিঁড়ে ফেলে। পেটের ওপর উপর্যুপরি লাথি মারতে থাকে। একপর্যায়ে তার নাক কোনটা, মুখ কোনটা—চেনার উপায় থাকে না। বনু তামিমের লোকেরা তাকে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে তার বাড়িতে দিয়ে আসে। তার মৃত্যুর ব্যাপারে সকলে প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। সেই অবস্থায়ও যে কথাটি প্রথম তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলো—'নবিজি এখন কেমন আছেন?' এটা শুনে উপস্থিত লোকজন মুখ-ভেংচি কাটে, তাকে তিরস্কার করে। এরপর তার মা উম্মুল খাইরকে বলে, দেখুন, তাকে কিছু খাওয়ানো যায় কি না। এই বলে তারা চলে গেলে তিনি তার মায়ের কাছে পীড়াপীড়ি করে নবিজির অবস্থা জানতে চান। তিনি জানান, তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে আমার কিচ্ছু জানা নেই। তিনি বলেন, আপনি উম্মু জামিল বিনতু খাত্তাবের কাছে গিয়ে তার ব্যাপারে খোঁজ নিন। তিনি উম্মু জামিলের কাছে জানতে চান, আবু বকর তোমার কাছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, আমি আবু বকর, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ—কারও ব্যাপারেই কিচ্ছু জানি না; তবে আপনি চাইলে আমি আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের কাছে যেতে পারি। সম্মত হলে তিনি তার সঙ্গে যান এবং গিয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দেখতে পান।

---

[১] ইয়াসরিব ছিল মদিনার পূর্বনাম। নবিজি আগমনের পর নাম পরিবর্তন করে মদিনা রাখেন। উমাইয়ার স্ত্রী 'ইয়াসরিবি ভাই' বলে সাদ ইবনু মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু তার বাড়ি ছিল মদিনায়।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬৩২; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৭৯৪; *আল মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৫৩৫০

কাছে গিয়ে উম্মু জামিল উচ্চকণ্ঠে বলেন, যারা আপনার এই অবস্থা করেছে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির, ফাসিক। আমি আশাবাদী, আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে তাদের এই অপকর্মের বদলা নেবেন। আবু বকর বলেন, আল্লাহর রাসুল এখন কেমন আছেন? উম্মু জামিল ইঙ্গিতে বলেন, আপনার মা তো শুনে ফেলবেন। আবু বকর উত্তর দেন, এতে কোনো সমস্যা নেই, আপনি বলুন। তিনি বলেন, নবিজি এখন সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আবু বকর বলেন, কোথায় তিনি এখন? উম্মু জামিল জানান, আরকামের বাড়িতে। আবু বকর বলেন, আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আমি দানাপানি ছুঁয়েও দেখব না। এরপর তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যা নেমে আসে। কোলাহল থেমে যায়। লোকেরা যার যার ঘরে চলে যায়। এরপর তাদের দুজনের কাঁধে ভর করে তিনি নবিজির কাছে উপস্থিত হন।[১]

খুব শীঘ্রই আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনুপম দৃষ্টান্ত তুলে ধরব; উহুদ যুদ্ধের ঘটনা এবং খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা তো উল্লেখ করবই।

[তিন] দায়িত্ববোধ। মানুষের ওপর যে দায়দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সাহাবিদের সকলেই সেগুলো খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতেন। তারা বুঝতেন, এসব ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যেতে চাইলে এমন কষ্ট ও যাতনার মুখোমুখি হতে হবে, যার তুলনায় এই নির্যাতন কিছুই না। তাছাড়া এতে সমগ্র মানবজাতি যে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তা কি আর এসব জুলুম-নির্যাতনের সঙ্গে তুলনাযোগ্য!

[চার] আখিরাতের প্রতি ঈমান। এটি মূলত তাদের দায়িত্ববোধকেই শক্তিশালী করেছে। তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন—অবশ্যই তাদের সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। ছোটবড় সকল কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। এরপর হয় অনেক সুখ-শান্তি কিংবা ভীষণ কষ্ট ও শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাদের অবস্থান ছিল আশা ও আশঙ্কার মাঝামাঝি। তারা একদিকে যেমন তাদের প্রতিপালকের রহমত প্রত্যাশা করতেন, অপরদিকে তাঁর শাস্তিকেও ভয় করতেন। কুরআনের ভাষায়—

...يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এই বিশ্বাসে তারা দান করে; ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।[২]

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০

[২] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৬০

তারা জানতেন, দুনিয়ার যাবতীয় আরাম-আয়েশ আখিরাতের বিবেচনায় একটি মশার পাখার সমানও নয়। এসব ভাবনা থেকেই মূলত পার্থিব কষ্ট ও যন্ত্রণা তারা তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। এমনকি ওসব নিয়ে তারা কোনোরকম চিন্তাভাবনাও করেননি।

[পাঁচ] কুরআনুল কারিম। সেরকম নাজুক ও ভয়ানক মুহূর্তে একের পর এক কুরআনুল কারিমের আয়াত অবতীর্ণ হতো। এসব আয়াতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়াদি; তথা দাওয়াতি কার্যক্রমের মূল ভিত্তি দলিলপ্রমাণ-সহকারে শিক্ষা দেওয়া হতো। আর মুসলিম জাতিকে এই নির্দেশনা দেওয়া হতো—সমগ্র মানবজাতির মাঝে মুসলিম সমাজ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে বলে আল্লাহ তাআলা ঠিক করেছেন। পাশাপাশি তাদের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া হতো। সেজন্য নানান উপমা এবং এর যৌক্তিকতাও স্পষ্ট করা হতো। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

তোমরা কি ভেবেছ, শুধু ঈমান আনার কারণেই তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে চলে যাবে? তোমাদের পূর্ববর্তীরা যেসব অভাব-অনটন, দুঃখ-দুর্দশা ও ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে, তোমরা সেগুলো চোখেও দেখবে না? তা হবে না। তোমাদেরও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তাদের ওপর বিপদের ঘনঘটা এতটাই বেশি ছিল যে, একপর্যায়ে রাসুল ও তার সঙ্গী মুমিনরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য আর কতদূর? শোনো, আল্লাহর সাহায্য খুবই সন্নিকটে।[১]

الم ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

আলিফ-লাম-মিম। মানুষ কি ধরেই নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি'—এটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে; কোনোরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে না তাদের? এদের পূর্বে যারা ছিল, আমি তাদেরকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন কারা সত্যবাদী; আর কারা মিথ্যুক।[২]

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৪

[২] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ১-৩

এ সকল আয়াতে কাফির ও অবাধ্যদের সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে। কোনোরকম ছলচাতুরীর সুযোগ রাখা হয়নি। একদিকে তাদের সতর্ক করা হয়েছে—যদি তারা অবাধ্যতা ও হঠকারিতার ওপর অবিচল থাকে, তার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা থেকে পূর্ববর্তী সীমালঙ্ঘনকারীদের সঙ্গে আল্লাহর আচরণ কেমন ছিল, তা স্পষ্ট জানা যায়। আরেক দিকে তাদের প্রতি কঠোরতা পরিহার করে নম্রতার সাথে যথাযথভাবে বুঝিয়ে বলা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন তারা তাদের স্পষ্ট ভ্রান্তি থেকে ফিরে আসে।

সর্বোপরি কুরআনুল কারিম মুসলিমদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে গিয়েছে। তাদের দেখিয়েছে—বিশ্বজাহানের নানান দৃশ্য, প্রতিপালনের সৌন্দর্য, প্রভুত্বের উৎকর্ষ, দয়া ও অনুগ্রহের চিহ্ন এবং সন্তুষ্টির ঝলক, যা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নিলে আর কোনো ভয় নেই।

এই আয়াতগুলোতে মুসলিমদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা যে রহমত, সন্তুষ্টি ও অগণিত নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতপ্রাপ্ত হবে, সেই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের সামনে কাফির, অবাধ্য ও জালিমদের শাস্তি কেমন হবে, কীভাবে তাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে—সে চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

[ছয়] সফলতার সুসংবাদ। এই সবকিছু সত্ত্বেও মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার হওয়ার প্রথম দিন থেকেই জানত, ইসলামগ্রহণ মানে নিজের কাঁধে শুধু বিপদ টেনে আনাই নয়; বরং জাহিলিয়াত দূর করা, জাহিলি যুগের অসভ্য রীতিনীতি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। দ্বীনি দাওয়াতের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো—সারা পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবজায় আনা যেন সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহর সন্তুষ্টিমতে পরিচালনা করা যায়, মানুষের দাসত্ব থেকে বের করে ইসলামমুখী করা যায়।

সে সময় অবতীর্ণ হওয়া কুরআনুল কারিমের আয়াতগুলোতে এই সুসংবাদই থাকত—কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো অস্পষ্টভাবে। মুসলিমদের ওপর নেমে আসা ভয়ংকর সময়ে যখন পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের প্রাণবায়ু হয়েছিল ওষ্ঠাগত, ঠিক তখনই কুরআনুল কারিমের ওই সকল আয়াত অবতীর্ণ হতে থাকে, যাতে পূর্ববর্তী নবি-রাসুল ও তাদের উম্মতের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়। দেখানো হয়—কীভাবে তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে কুফরি করা হয়েছে। ওই সকল আয়াতে এমন এমন ঘটনা উল্লেখিত হতো, যা মক্কার মুসলিম ও কাফিরদের সঙ্গে একদম মিলে যেত। তাতে কাফির ও জালিমদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভের কথাও আলোচিত হতো। এ সকল ঘটনা স্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিত বহন করত—ভবিষ্যতে

মক্কাবাসী পরাজিত হবে এবং মুসলিম জাতি ও ইসলামি দাওয়াত বিজয় লাভ করবে।

ওই সময়গুলোতে মুমিনদের বিজয় লাভের সুসংবাদ নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হতো। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

আমার প্রেরিত বান্দাদের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে—অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। অতএব আপনি কিছুকালের জন্য তাদের উপেক্ষা করুন এবং তাদের দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখতে পাবে। আমার আজাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? এরপর যখন তাদের আঙিনায় আজাব নাযিল হবে, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছিল; তাদের দিবসের প্রথম ভাগটি হবে খুবই মন্দ।[১]

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

এ দল তো অচিরেই পরাজিত হয়ে পিছু হটবে।[২]

جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে; যা পরাজিত হবে।[৩]

হাবশায় হিজরতকারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়—

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

---

[১] সুরা সফফাত, আয়াত : ১৭১-১৭৭

[২] সুরা কমার, আয়াত : ৪৫

[৩] সুরা স-দ, আয়াত : ১১

যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্য হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদের দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; যদি তারা জানত![১]

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে অবতীর্ণ হয়—

لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ﴿٧﴾

অবশ্য ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।[২]

অর্থাৎ, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যেভাবে বিফল হয়েছে এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, মক্কাবাসীর পরিণতিও ঠিক তেমনই হবে।

রাসুলদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

কাফিররা রাসুলদের বলেছিল, আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহি প্রেরণ করেন যে, আমি অবশ্যই জালিমদের ধ্বংস করে দেব। তাদের পর তোমাদের জমিনের অধিকারী করব। এটা ওই ব্যক্তির জন্য, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আজাবের ওয়াদাকে ভয় করে।[৩]

পারসিক ও রোমানদের মাঝে যুদ্ধ চলাকালে কাফিররা চাইত—যেন পারসিকরা জয়লাভ করে; কারণ তারা মুশরিক ছিল। অপরদিকে মুসলিমরা চাইত—যেন রোমানরা বিজয়ী হয়; কারণ তারা আল্লাহ, রাসুল, ওহি, আসমানি গ্রন্থসমূহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ৪১

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৭

[৩] সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ১৩-১৪

রাখত। যুদ্ধে তখন পারসিকরা বিজয়ী হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবে, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন। এতে কেবল একটা সুসংবাদই নয়; বরং আরও একটি সুসংবাদ ছিল। আর তা হলো, মুমিনদের বিজয় লাভ। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ ﴿٥﴾

সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে, আল্লাহর সাহায্যে।[১]

স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিভিন্ন সময়ে এই সুসংবাদগুলো দিয়েছেন। বিভিন্ন মৌসুমে উকাজ, মাজান্না, জুল-মাজায ইত্যাদি বাজার ও মেলায় গিয়ে মানুষের কাছে রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার সময় নবিজি কেবল জান্নাতের সুসংবাদই দিতেন না; বরং স্পষ্টভাবে তাদের বলতেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُوْلُوْا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا ، وَتَمْلِكُوْا بِهَا الْعَرَبَ ، وَتَدِيْنَ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ ، فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوْكًا فِيْ الْجَنَّةِ

হে লোকসকল, তোমরা বলো—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে, সমগ্র আরবের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, অনারবরা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করবে, মৃত্যুর পর জান্নাতেও তোমরা রাজত্ব পেয়ে যাবে।[২]

উতবা ইবনু রবিআ যখন পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন দেখিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দরকষাকষি করছিল এবং বুঝতে পেরেছিল—অচিরেই তার আনীত দ্বীন প্রসার লাভ করবে, তখন তিনি তাকে কী জবাব দিয়েছিলেন, তা আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

আরও উল্লেখ করেছি, আবু তালিবের কাছে আসা সর্বশেষ প্রতিনিধিদলকে নবিজি কী জবাব দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, তিনি তাদের থেকে কেবল একটি কালিমার স্বীকৃতি চান। আর তারা যদি এই কালিমা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে সমগ্র আরবজাতি তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে এবং অনারবরাও তাদের আনুগত্য করবে।

---

[১] সুরা রুম, আয়াত : ৪-৫

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৯

খাব্বাব ইবনু আরাত বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রাসুলের কাছে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তার চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবা শরিফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন না? তিনি বলেন—

كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ

তোমাদের আগে লোকদের অবস্থা ছিল এমন—তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো এবং ওই গর্তে পুঁতে রেখে করাত এনে তা দিয়ে তাদের মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এই অবস্থাও তাদের দ্বীন থেকে টলাতে পারত না। লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের হাড়-মাংস ও শিরা-উপশিরা ছিন্নভিন্ন করে দিত। এটাও তাদের দ্বীন থেকে সরাতে পারত না। আল্লাহ অবশ্যই এ দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উটের আরোহী সানআ থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। অপর বর্ণনায় আছে, অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের ভয়ও করবে না।[১] কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।[২]

এই সুসংবাদগুলো অপ্রকাশ্যে বা গোপনে ছিল না; বরং মুসলিমদের মতো কাফিররাও জানত। তাই তো আসওয়াদ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ও তার সঙ্গীরা সাহাবিদের দেখলে উপহাস করে বলত, এই তো, তোমাদের সামনে এখন সমগ্র পৃথিবীর শাসনকর্তারা উপস্থিত; যারা অচিরেই পারস্য ও রোম জয় করবে। এসব বলে বলে তারা শিস বাজাত আর হাততালি দিত।[৩]

ভবিষ্যৎ-পৃথিবী সম্পর্কে তারা যে সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং জান্নাত লাভের মাধ্যমে যে চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সফলতার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন; তার সামনে সেই চতুর্মুখী বালা-মুসিবত ও বেষ্টিত বিপদাপদকে তারা গ্রীষ্মের মেঘের মতো মনে করতেন—যা এক নিমিষেই কেটে যায়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬১২, ৬৯৪৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৪৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১০৫৭

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ৮৪

এরপরও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের বিস্ময়কর বিষয়াবলি দ্বারা তাদের আত্মার খোরাক জুগিয়েছেন, হিকমত ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের আত্মশুদ্ধি করেছেন, সূক্ষ্মভাবে ও গভীরতার মাধ্যমে দীক্ষিত করে তুলেছেন। তাদের আত্মিক উৎকর্ষ, অন্তরস্থ উৎকৃষ্টতা, চারিত্রিক পবিত্রতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। বস্তুতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হয়ে আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালকের প্রিয়পাত্র হওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তাদের হৃদয়গুলো যেন আগুনে পুড়িয়ে পরিশুদ্ধ করেছেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছেন, বিপদ ও মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দীক্ষা দিয়েছেন।

এভাবে একপর্যায়ে তাদের মাঝে দ্বীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা, কামনাবাসনা থেকে পবিত্রতা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাতের আশায় নিজেকে উৎসর্গ করার গুণাবলি বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে জান্নাতের প্রতি ব্যাকুলতা, ইলমের প্রতি আগ্রহ, দ্বীনি বিষয়ের বুঝ, আত্মসমালোচনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ, আবেগের ওপর বিবেকের প্রাধান্য দেওয়া, ক্রোধ ও উত্তেজনা বশীকরণ এবং সহিষ্নুতা, স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের গুণে নিজেকে গুণান্বিত করার বিষয়গুলোও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেছে।

তৃতীয় পর্যায় : মক্কার বাইরে ইসলামের বাণী

তায়েফের বুকে দ্বীনের দাওয়াত

নবুয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে—৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের শেষ বা এপ্রিল মাসের শুরুর দিকে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ-গমন করেন। মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। রাত জেগে, পায়ে হেঁটে এ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। সঙ্গে ছিলেন আজাদকৃত গোলাম যাইদ ইবনুল হারিসা। যাত্রাপথে সাক্ষাৎ হয়েছে—এমন সকল গোত্রের কাছেই নবিজি ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরেন; দ্বীনের পথে আহ্বান করেন। কিন্তু একটি গোত্রও তার সেই আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

তায়েফ পৌঁছার পর সাকিফ গোত্রের নেতৃবৃন্দ—আমর ইবনু উমাইর সাকাফির তিন পুত্র—আব্দু ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে মনস্থ করেন এবং একসঙ্গে বসে তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, ইসলামের সহযোগী হতে বলেন। জবাবে তাদের একজন বলে, কাবার গিলাফ ফেড়ে দেখাও তো, যদি তোমাকে আল্লাহ রাসুল করেই থাকেন। আরেকজন বলে, আল্লাহ বুঝি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি! তৃতীয়জন বলে, আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না। কারণ তুমি রাসুল হলে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করা তো ভয়ংকর ব্যাপার। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যে বলে থাকো, তাহলে তোমার সাথে কথা বাড়ানোটাই অযৌক্তিক। এই বলে তারা নবিজির কাছ থেকে উঠে যায়। তখন তিনি তাদের বলেন, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না-ই করো, তাহলে আমার বিষয়টি অন্তত গোপন রেখো।

নবিজি ১০ দিন তায়েফে অবস্থান করেন। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য এমন একজন ব্যক্তিও ছিল না, যার কাছে গিয়ে নবিজি দ্বীনের কথা বলেননি। প্রত্যুত্তরে তারা কেবল তাড়িয়েই দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়; নবিজির পেছনে তাদের অবুঝ ও নির্বোধ

মানুষগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে। এরপর যখন তিনি ফিরে আসতে চেয়েছেন, তাদের নির্বোধ বালক ও গোলামরা তার পিছু নিয়েছে, তাকে গালাগাল করেছে, তাকে নিয়ে হইচই বাধিয়েছে। এরপর অনেক লোক সমবেত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নবিজির গায়ে পাথর নিক্ষেপ করেছে। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেছে। এমনভাবে পাথর দিয়ে আঘাত করেছে যে, তার জুতোজোড়া পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। যাইদ ইবনুল হারিসা ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়ে নবিজিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। ফলে তিনিও একসময় মাথায় আঘাত পেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন।

এই উচ্ছৃঙ্খল বালকেরা তায়েফ থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত উতবা ও শাইবার বাগান পর্যন্ত নবিজির পেছন পেছন আসে। বাগানে আশ্রয় নিলে তারা ফিরে যায়। নবিজি একটি আঙুর গাছের নিচে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়েন; একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তখন তিনি সেই প্রসিদ্ধ দুআটি করেন, যা থেকে বোঝা যায়, এই সফর তার হৃদয়কে দুঃখ, কষ্ট আর আফসোসে ভরে দিয়েছিল। কারণ তাদের একজনও তার প্রতি ঈমান আনেনি, ইসলামের দাওয়াত কবুল করেনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ ، يا أَرحَمَ الراحِمِينَ ، أنت رَبُّ المستضعَفِينَ ، وأنت ربِّي ، إلى مَن تَكِلُني ؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي ، أَوْ إِلَى عَدوٍّ مَلَّكتَهُ أَمْرِي ، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيَّ غَضْبَانًا فَلَا أُبَالِي ، غيرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي ، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ ، أَوْ تُحِلَّ عَلَيَّ سُخْطَكَ ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমি আমার দুর্বলতা, দুরবস্থা এবং মানুষের কাছে আমার গুরুত্বহীনতার অভিযোগ জানাচ্ছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়, আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক, আপনিই তো আমার রব। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে কাদের মাঝে ন্যস্ত করেছেন? আপনি কি আমাকে এমন লোকদের মাঝে ছেড়ে রাখবেন, যারা আমাকে দাবিয়ে রাখতে চায় কিংবা এমন শত্রুদের মাঝে যারা আমার ওপরে ক্ষমতার ছড়ি ঘোরায়? আমার ওপর আপনার ক্রোধ না থাকলে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না; তবে আপনি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করলে, তা আমার জন্য সহজ হবে। আমি আপনার সত্তাগত নুরের অসিলায় পানাহ চাইছি, যে নুরে দূরীভূত হয়ে যায় সকল আঁধার, সমাধা হয় দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়-আশয়—আমার প্রতি যেন আপনার অসন্তুষ্টি কিংবা ক্রোধ না জন্মায়। আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত আমি সে চেষ্টা করে যাব। কেননা আপনি ছাড়া

আমার আর কোনো ভরসা নেই, নেই কোনো শক্তি ও সক্ষমতা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অবস্থা দেখে রবিআর দুই পুত্র—উতবা ও শাইবার হৃদয়ে দয়ামায়া জাগ্রত হয়; আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়টি তাদের মনে ভীষণ পীড়া দেয়। আদ্দাস নামে তাদের এক খ্রিস্টান গোলাম ছিল। তারা তাকে বলে, এখান থেকে একথোকা আঙুর নিয়ে ওই লোকটিকে দিয়ে এসো। আঙুর নিয়ে নবিজির সামনে রাখলে তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত বাড়িয়ে দেন। এরপর খেতে শুরু করেন।

আদ্দাস বলে, এখানকার লোকেরা তো এ কথাটি বলে না। নবিজি বলেন, তুমি কোত্থেকে এসেছ? তোমার ধর্ম কী? সে বলে, আমি একজন খ্রিস্টান। নিনাওয়ার অধিবাসী। নবিজি বলেন, তুমি তাহলে সৎ ব্যক্তি ইউনুস ইবনু মাত্তার গ্রামের লোক। সে বলে, ইউনুস ইবনু মাত্তা কেমন ছিলেন, তা আপনি কী করে জানলেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি আমার ভাই। তিনি নবি ছিলেন, আমিও নবি। এ কথা শুনে আদ্দাস নবিজির মাথা ও হাত-পায়ে চুমু খেতে আরম্ভ করে।

এসব দেখে রবিআর পুত্ররা একে অপরকে বলে, তোমার গোলাম তো সর্বনাশ ডেকে আনবে। আদ্দাস তাদের কাছে এলে তারা জিজ্ঞেস করে, এ কী করলে তুমি? সে বলে, জনাব! এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। তিনি আমাকে এমন কিছু বলেছেন, যা কেবল নবিরাই জানেন। তারা বলে, হায়রে আদ্দাস! সে যেন তোমাকে ধর্মান্তরিত না করে। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।

ভগ্নহৃদয় ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নবিজি মক্কার পথ ধরেন। 'করনুল মানাযিল' নামক স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ তাআলা তার কাছে জিবরিলকে পাঠান। তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে ফেলে মক্কাবাসীকে[১] পিষে ফেলার ব্যাপারে পরামর্শ চান।

---

[১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাহাড়ের ফেরেশতা বলেছিলেন, 'আপনি অনুমতি দিলে আখশাবাইন পাহাড় তাদের ওপর চাপিয়ে দেব!' এখানে 'তাদের ওপর' দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? মক্কাবাসী না তায়েফবাসী? এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। হাদিসের বর্ণনামতে—যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছিল নবিজি তায়েফের বনু সাকিফ গোত্রের সর্দার আব্দু ইয়ালিল ইবনি আব্দি কুলাল-সহ তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে ফেরার পথে কারনুস সাআলিব বা করনুল মানাযিল নামক স্থানে; যা নাজদবাসীর মিকাত, তাই অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ ঘটনা তায়েফবাসীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

আবার হাদিসে উল্লেখিত 'আখশাবাইন' পাহাড় দুটি হলো, আবু কুবাইস ও এর বিপরীতে অবস্থিত কুওয়াইকিআন পাহাড়। এ পাহাড় দুটি যেহেতু মক্কায় অবস্থিত, তাই কেউ কেউ মনে করেন—পাহাড়ের ফেরেশতা মক্কাবাসীর ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছিলেন। লেখক এখানে দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। [বিস্তারিত জানতে দেখুন—*উমদাতুল কারি*, বদরুদ্দিন আইনি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৪২; দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত। *মিরকাতুল মাফাতিহ*, মোল্লা আলি কারি, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩২৮৮; দারুল ফিকর, বৈরুত।]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, উহুদের যুদ্ধ ছাড়া ভয়ংকর আর কোনো দিবসের সম্মুখীন কি আপনি হয়েছিলেন? তিনি বলেন—

لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الأَخْشَبَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

আমি তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অনেক বিপদের মুখোমুখি হয়েছি। তাদের থেকে সবচেয়ে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি আকাবার দিন, যেদিন আমি নিজেকে ইবনু আব্দি ইয়ালিল ইবনি আব্দি কুলালের কাছে পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, তার জবাব সে দেয়নি। তখন এমন বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে আমি ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। এরপর হঠাৎ মাথার ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। পরে সেখানে আমি জিবরিল আমিনকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে এবং তারা যে উত্তর দিয়েছে, তার সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতা পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারে আপনি তাকে ইচ্ছামতো আদেশ করতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, হে মুহাম্মাদ, এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি চাইলে আমি তাদের ওপর 'আখশাবাইন[১]' চাপিয়ে দেব। উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি বরং আশা করি, আল্লাহ তাদের বংশে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে এক আল্লাহর ইবাদত করবে; তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।[২]

---

[১] আখশাবাইন হলো মক্কার দুটি প্রসিদ্ধ পাহাড়।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩১; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ৭৬৫৯

উল্লেখিত জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম ব্যক্তিত্ব এবং এমন সুমহান চরিত্র ফুটে উঠেছে, যা তিনি ছাড়া আর কারও মাঝে নেই।

নবিজি স্বস্তি ফিরে পান, কিছুটা আশ্বস্ত হন। কারণ আল্লাহ তাআলা ৭ আসমানের ওপর থেকে তার জন্য এই গায়েবি সাহায্য পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি মক্কার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। নাখলা উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। নাখলায় পানি ও গাছপালা আছে—এমন দুটি জায়গা অবস্থান-উপযোগী। তবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক কোথায় অবস্থান করেছিলেন, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

সেখানে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা তার কাছে একদল জিন পাঠান। কুরআনুল কারিমের দুটি স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের আলোচনা করেন। সুরা আহকাফে—

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾

একদল জিনকে আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন (তিলাওয়াত) শুনছিল। তারা যখন সেখানে উপস্থিত হলো, তখন পরস্পর বলল, চুপ করে শোনো। এরপর যখন (তিলাওয়াত) সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মুসার পর অবতীর্ণ হয়েছে, যা পূর্ববর্তী সব কিতাব প্রত্যয়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে তোমাদের মুক্ত রাখবেন।[১]

এবং সুরা জিনে—

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى

[১] সুরা আহকাফ, আয়াত : ২৯-৩১

الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

আপনি বলুন, আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ করা হয়েছে, জিনদের একটি দল (কুরআন) শ্রবণ করেছে। এরপর তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেয়, ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরিক করব না।[১]

এই আয়াতগুলোর পূর্বাপর এবং এই ঘটনার ব্যাখ্যাসংবলিত হাদিসসমূহের পূর্বাপর থেকে স্পষ্ট হয়—জিনদলের উপস্থিতি সম্পর্কে নবিজি আগে থেকে অবগত ছিলেন না। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে অবগত করার পরই তিনি এ বিষয়ে জেনেছেন। আর এটি ছিল তাদের প্রথম উপস্থিতি। বর্ণনার পূর্বাপর থেকে বোঝা যায়, এরপর তারা আরও অনেকবার উপস্থিত হয়েছে।

এটাও মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক সাহায্য। আল্লাহ এখানে তার এমন এক গোপন বাহিনী পাঠিয়েছেন, যাদের খবর তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তারপর কথা হলো, এই ঘটনা প্রসঙ্গে কুরআনুল কারিমের যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে এই সুসংবাদ রয়েছে—নবিজির দাওয়াতি কার্যক্রম সফলতা লাভ করবে; পৃথিবীর কোনো অপশক্তি তার সফলতা রুখে দিতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তারা তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[২]

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾

আমরা বুঝতে পেরেছি, পৃথিবীতে আমরা কিছুতেই আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না; এমনকি পালানোর চেষ্টা করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।[৩]

[১] সুরা জিন, আয়াত : ১-৩

[২] সুরা আহকাফ, আয়াত : ৩২

[৩] সুরা জিন, আয়াত : ১২

তায়েফ থেকে রিক্তহস্তে ও বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসার কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে যে যাতনা, হতাশা ও নিরাশা দানা বেঁধেছিল, এই সকল সুসংবাদ ও সাহায্যের কারণে তা এক নিমিষেই দূর হয়ে যায়। এমনকি তিনি মক্কায় ফিরে আবার নতুন উদ্যমে ইসলামপ্রচার এবং আল্লাহর অবিনশ্বর রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেন।

এ সময় যাইদ ইবনুল হারিসা তাকে বলেন, আপনি কীভাবে তাদের কাছে যাবেন? তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে। তিনি বলেন—

يَا زَيْدُ إِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لِّمَا تَرَى فَرَجًا وَمَخْرَجًا ، وَإِنَّ اللهَ نَاصِرُ دِيْنِهِ وَمُظْهِرُ نَبِيِّهِ

হে যাইদ, তুমি যে সংকট দেখতে পাচ্ছ, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তা থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী হবেন, তাঁর নবিকে বিজয়ী করবেন।

নবিজি এগিয়ে চলেন। মক্কার কাছাকাছি এসে হেরা গুহায় অবস্থান নেন। খুযাআ গোত্রের এক লোকের মাধ্যমে আখনাস ইবনু শারিকের কাছে নিরাপত্তা চান। সে বলে, আমরা কুরাইশের মিত্র। আর মিত্রের শত্রুকে তো আমরা নিরাপত্তা দিতে পারি না। পরে নবিজি সুহাইল ইবনু আমরের কাছে লোক পাঠান। সুহাইল বলে, বনু আমির বনু কাবের বিপক্ষে নিরাপত্তা দিতে পারি না।[১] সবশেষে পাঠান মুতইম ইবনু আদির কাছে। মুতইম রাজি হন। তিনি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তার পুত্র ও স্বজাতির উদ্দেশে ঘোষণা করেন, তোমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বাইতুল্লাহয় অবস্থান নাও; কারণ আমি মুহাম্মাদকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এরপর নবিজিকে মক্কায় প্রবেশের আবেদন জানিয়ে লোক পাঠান। নবিজি যাইদ ইবনুল হারিসাকে সঙ্গে করে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এ সময় মুতইম ইবনু আদি আরোহী অবস্থায় ঘোষণা করেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি মুহাম্মাদকে নিরাপত্তা দিয়েছি। তাই কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। নবিজি হাজরে আসওয়াদের কাছে যান। এরপর পাথর চুম্বন করে দু-রাকাত সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে তিনি নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। এ সময় ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত মুতইম ইবনু আদি ও তার ছেলে তাকে সশস্ত্র নিরাপত্তা প্রদান করেন।

---

[১] বনু আমির ও বনু কাব উভয়ই কুরাইশের শাখা গোত্র। বনু কাব আবার বনু আমিরের শাখা গোত্র। সুহাইল ইবনু আমর বনু আমির গোত্রের সর্দার আর আবু জাহল বনু কাবের সর্দার। সুহাইল ইবনু আমর আবু জাহলের বিরুদ্ধে যেতে চায়নি বলে এ কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য, সুহাইল ইবনু আমর মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত দুই সাহাবি আবু জানদাল ও আব্দুল্লাহর পিতা। [*আল-ইসাবা ফি তামইযিস সাহাবা*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৭; দারুল কুতুব ইলমিইয়া, বৈরুত]

বলা হয়, আবু জাহল মুতইমকে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি কেবল নিরাপত্তাদাতাই? নাকি মুসলিমও? সে বলে, নিরাপত্তাদাতা। আবু জাহল বলে, তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতইম ইবনু আদির এই উপকারের কথা স্মরণে রেখেছেন। তাই তো বদরের যুদ্ধে বন্দিদের প্রসঙ্গে বলেন—

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى ، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

যদি মুতইম ইবনু আদি জীবিত থাকতেন আর আমার কাছে এসব নোংরা লোকের জন্য সুপারিশ করতেন, তবে আমি তার সম্মানার্থে এদের মুক্ত করে দিতাম।[২]

[১] তায়েফসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৯-৪২২; *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬-৪৭; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৪১-১৪৩; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭১-৭৩; *তারিখে ইসলাম,* নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৩-১২৪

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩১৩৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৭৩৩; *শারহুস সুন্নাহ,* বাগাবি : ২৭১৩

বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তি সমীপে ইসলামের দাওয়াত

নবুয়তের দশম বছর। জিলকদ মাস। ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের জুনের শেষ অথবা জুলাইয়ের প্রথমদিকের কথা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। তায়েফের দুঃখজনক ঘটনায় দমে যাননি তিনি; পুনরায় নবোদ্যমে ও বুকভরা আশা নিয়ে পথহারা মানুষের দ্বারে দ্বারে যান। দ্বীন-প্রচারে নিয়োজিত হন। তখন ছিল হজের মৌসুম। মানুষেরা দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে, উট-খচ্চর বা ঘোড়ায় চড়ে হজ পালনের জন্য মক্কায় আসতে শুরু করেছিল। সবার একই উদ্দেশ্য—আল্লাহকে মন ভরে স্মরণ করা এবং হজের অসিলায় ইহকাল-পরকালের কল্যাণ অর্জন করা। নবিজি লোকসমাগমের এই সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। নবুয়তের চতুর্থ বছর থেকে যেভাবে তিনি দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন, সেভাবেই এক-একজন করে সবার কাছে যান; তারপর জন-মজলিসে ইসলামের সুমহান বাণী উপস্থাপন করেন।

যেসব গোত্র ইসলামের দাওয়াত পেয়েছে

ইমাম যুহরি বলেন, যে গোত্রগুলোকে স্বয়ং নবিজি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বনু আমির ইবনি সাসাআ, মুহারিব ইবনু খাসাফা, ফাযারা, গাসসান, মুররা, হানিফা, সালিম, আবাস, বনু নাসর, বনু বাক্কা, কিনদা, কালব, হারিস ইবনু কাব, উযরা, হাদারিমা। এদের কেউই নবিজির শান্তির আহ্বান গ্রহণ করেনি।[১]

ইমাম যুহরি এখানে যে গোত্রগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বছরে একবার অথবা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে দুই-একবার দাওয়াত দিয়েছেন—ব্যাপারটা এমন নয়। বরং নবুয়তের চতুর্থ বছরে তিনি যখন

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৪৯

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রচারের নির্দেশপ্রাপ্ত হন, তখন থেকে হিজরতপূর্ব হজ মৌসুম পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যান তাদেরকে। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি তাদের থেকে। তবে এটা ঠিক যে, তিনি কবে কখন কোন গোত্রে কতবার দাওয়াত নিয়ে গেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার দিনক্ষণ বলা মুশকিলই বটে। তারপরও আল্লামা মানসুরপুরি কিছু গোত্রের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে এ মতামত দিয়েছেন, এদের কাছে নবুয়তের দশম বছর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো হয়।[১] ইবনু ইসহাক একটি বর্ণনায় নবিজির এই দাওয়াতি কার্যক্রমের চরিত্র ও দাওয়াতপ্রাপ্ত গোত্রের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন এভাবে—

» ১. নবিজি বনু কালবের একটি শাখাগোত্র, বনু আব্দিল্লাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান। অনেক কোমলভাবে তাদের আল্লাহর পথে ডাকেন; এভাবেও বলেন, 'বনু আব্দিল্লাহ, আল্লাহ তোমাদের পিতার কত সুন্দর নাম দিয়েছেন। এই নামের মর্যাদাটা অন্তত রাখো, রাখার চেষ্টা করো।' তবু তারা ইসলামের মহান আহ্বান থেকে অবজ্ঞার সাথে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

» ২. বনু হানিফা গোত্রের বসতিতে আল্লাহর রাসুল সশরীরে উপস্থিত হন। তাদেরও ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দেন। কিন্তু এতটাই উগ্রভাবে তারা সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে যে, আরবের আর কোনো গোত্রই এমনটা করেনি।

» ৩. বনু আমির গোত্রকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। বুহাইরা ইবনু ফিরাস নামে তাদের গোত্রের এক লোক, এই দাওয়াতের ব্যাপারে বলে—'এই যুবকের কথা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে গোটা আরব আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।' শুধু তা-ই নয়, সে আল্লাহর রাসুলকে বলে, 'এ ব্যাপারে তোমার অবস্থান স্পষ্ট করো। ধরো আমরা তোমার হাতে বাইআত নিলাম, এরপর তুমি তোমার বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হলে, তখন কি আমরাও নেতৃত্বের ভাগ পাব?' তার এ কথা শুনে আল্লাহর রাসুল বলেন, 'নেতৃত্ব আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকেই নেতৃত্ব দান করে থাকেন।' তখন সে বলে ওঠে, 'তোমার জন্য আমরা পুরো আরবকে নিজেদের শত্রু বানাব। তুমি ক্ষমতা পেলে আমাদের দেবে না, অন্যরা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব চালাবে, আর আমরা অন্যের অধীন থাকব; এটা হতে পারে না। তোমার এই নতুন আহ্বানের পথে আমরা চলছি না, আমাদের প্রয়োজন নেই।' তারাও শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি।

---

[১] *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৪; আকবর শাহ নাজিবাবাদি এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। দেখুন, *তারিখে ইসলাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৫।

হজ শেষে বনু আমির নিজেদের ভূমিতে ফিরে আসে। তাদের সর্বজনমান্য একজন বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, যিনি শারীরিক দুর্বলতার কারণে হজে আসতে পারেননি; তাকে আল্লাহর নবির দাওয়াতের ব্যাপারে জানানো হয়, 'বনু আব্দিল মুত্তালিবের এক কুরাইশি যুবক আমাদের কাছে আসে। তার দাবি সে নাকি নবি; আল্লাহর ওহিপ্রাপ্ত। সে আমাদের বলে তার কথা মেনে নিতে, তার পাশে দাঁড়াতে এবং তাকে আশ্রয় দিতে।' এ কথা শুনে সেই বৃদ্ধ মাথায় হাত রেখে জানতে চান, 'তার কি কোনো দোষ তোমরা পেয়েছ? সে তো মুত্তালিবের প্রতিচ্ছবি। তাকে হারালে তোমরা তার মতো এরকম কাউকে আর খুঁজে পাবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামের কসম করে বলছি, এই পর্যন্ত ইসমাইলের বংশে এরকম কেউ কোনো দাবি করেনি। সে যা বলেছে, সত্যই বলেছে। তোমরা কেন তার কথা গ্রহণ না করে ফিরে এলে?'[১]

ইসলামগ্রহণের কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিনিধি দল ছাড়াও, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন, যাদের অনেকের থেকে ভালো প্রতিক্রিয়াও পাওয়া গিয়েছিল। হজ-মৌসুমের পর এমন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের কয়েকজনের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো—

[এক] সুওয়াদ ইবনু সামিত। ইয়াসরিবের অধিবাসী। একজন কবি ও দার্শনিক। গাত্রবর্ণ, কবিতা, আভিজাত্য ও বংশপরিচয়ের কারণে নিজ সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। কাবাঘর তাওয়াফের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি নবিজির কথা শুনে বলেন, 'হয়তো তোমার কাছে যা আছে, আমার কাছেও একই জিনিস আছে।' নবিজি জানতে চান, 'তোমার কাছে কী আছে, শুনি?' সে জানায়, 'আমার কাছে লুকমানের প্রজ্ঞা আছে।' নবিজি বলেন, 'শোনাও তো আমাকে!' সে কথাগুলো শুনে তিনি বলেন, 'তোমার এ কথাগুলো ভালো বটে, তবে আল্লাহ আমার কাছে যে কথা নাযিল করেছেন, তা এর থেকেও উত্তম। আল্লাহ আমার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এই কুরআনে আছে আলো ও পথনির্দেশ।' এ কথা বলে তাকে কুরআনের কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। কুরআন শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'নিশ্চয় এ কথাগুলো অনেক বেশি চমৎকার।' এ কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। মদিনায় ফেরার পর বুআস[২] যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন নবুয়তের একাদশ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৪-৪২৫

[২] বুআস মদিনার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। নবিজি মদিনায় হিজরতের ৫ বছর আগে থেকেই আউস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে এ যুদ্ধ চলমান ছিল। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৫-৪২৭; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৪]

বছরের শুরুর দিকের একজন মুসলিম।[১]

[দুই] ইয়াস ইবনু মুআজ। মদিনার অধিবাসী এবং আউস গোত্রের লোক। নবুয়তের একাদশ বছর বুআস যুদ্ধের আগে খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশের সমর্থন লাভ এবং মিত্রসন্ধি করার উদ্দেশ্যে আউসের যে প্রতিনিধি-দল মক্কায় এসেছিল, তিনি ছিলেন তাদেরই একজন; বয়সে তরুণ। আউসরা ছিল লোকবলে খাযরাজের তুলনায় দুর্বল। তাই কুরাইশের সাহায্য ও সমর্থন তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আসার সংবাদ পেয়ে তাদের কাছে যান। তাদের পাশে বসে বলেন, 'তোমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ, তার চেয়েও অনেক বেশি কল্যাণকর কিছু জানতে চাও?' তারা উত্তর দিল, 'জি, জানতে চাই।' নবিজি তখন বলতে শুরু করেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল ও বান্দা। তিনি আমাকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার দায়িত্ব তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া এবং তার সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। তিনি আমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন।' এরপর তিনি তাদের কুরআন পাঠ করে শোনান এবং ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেন। তখন ইয়াস ইবনু মুআজ বলেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, তার চেয়ে এ কথাগুলো অনেক অনেক উত্তম।' তখন বাতহার নামে তাদের এক লোক মাটি হাতে নিয়ে ইয়াসের মুখে ছুড়ে মারে এবং কটমট করতে করতে বলে, 'আরে রাখো তোমার কথা, জীবনের কসম করে বলছি, আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য এসব না। আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু।' তার কথা শুনে ইয়াস নীরব হয়ে যায়।

সেবার আউস মক্কায় এসে কুরাইশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয়। ইয়াসরিবে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরই ইয়াস মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুর সময় আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে করতে মারা যান। তাই সন্দেহ নেই, তিনি মুসলিম হয়েই দুনিয়াত্যাগ করেন।[২]

[তিন] আবু যর গিফারি। ইয়াসরিবের উপকণ্ঠে তার বসবাস। একবার মদিনায় এসে ইয়াস ও সুওয়াদ—এই দুজনের কাছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা জানতে পারেন। এটুকু জানাশোনাই ছিল তার ইসলামগ্রহণের মূল প্রেরণা।[৩]

আবু যর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি গিফার গোত্রের মানুষ। একদিন মক্কার এক লোকের কথা শুনতে পাই, যিনি নিজেকে নবি দাবি করেছেন। তখন আমার ভাইকে বলি, 'যাও, মক্কায় গিয়ে তার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখো। সুযোগ পেলে তার

---

[১] *তারিখে ইসলাম*, নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৫

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৭-৪২৮; *তারিখে ইসলাম*, নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৬

[৩] *তারিখে ইসলাম*, নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৮

সাথে কথা বলবে কিন্তু।' সে মক্কায় গিয়ে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'কেমন মনে হলো তাকে?' সে বলে, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন একজন মানুষের সঙ্গে দেখা করে এসেছি, যিনি সৎকাজের আদেশ দেন আর অসৎকাজে বাধা দেন।'

আমি তাকে বলি, 'এটুকু জেনে আমার মন ভরবে না।' এরপর নিজেই মশক আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি মক্কার উদ্দেশে। কিন্তু মক্কায় গিয়ে মনে হলো আমি এক গোলকধাঁধায় এসে পড়লাম। সেখানকার কিছুই তো আমি চিনি না। আবার তার ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞেস করতেও মন সায় দিচ্ছিল না। আমার দিনগুলো কেটে যাচ্ছে যমযমের পানি খেয়ে, মসজিদে বসে বসে। একদিন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানতে চাইলেন, 'মনে হচ্ছে আপনি একজন মুসাফির?' আমি জবাবে বললাম, 'জি, আমি মুসাফির।' তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, 'চলুন, আজ রাতটা আমার বাড়িতে থাকবেন।' আমি তার সঙ্গে বাড়িতে গেলাম।

আমি মক্কায় কেন এসেছি, কার কাছে এসেছি, এ বিষয়ে তিনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করেননি। আর আমিও তার কাছে কিছু জানতে চাইনি। সকাল হলেই আমি মসজিদে চলে আসি। উদ্দেশ্য—নবিজির ব্যাপারে কারও কাছ থেকে তথ্য নেব। সারাদিনে বহু মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু কেউ আমাকে তেমন কিছু জানাতে পারল না। হঠাৎ আলির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল আমার। তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনি কি এখনো বাড়ি খুঁজে পাননি?' আমি বললাম, 'না, এখনো পাইনি।' তিনি তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আবার অনুরোধ করলেন। আমি হ্যাঁ বা না কিছু বলছি না দেখে তিনি এবার জিজ্ঞেসই করে বসলেন, 'আপনি মক্কায় কেন এসেছেন, জানতে পারি কি?' আমি উত্তরে বললাম, 'আপনি আমার কথাগুলো গোপন রাখলে আপনাকে জানাতে পারি।' তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, 'জি, বলুন। আপনার কথাগুলো আমার কাছে আমানত হিসেবে থাকবে।' আমি তখন বলতে লাগলাম, 'আমি আসলে এখানে এসেছি সেই লোকটির সাথে দেখা করতে, যিনি নিজেকে 'আল্লাহর নবি' বলে দাবি করেন। কিছুদিন আগে আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করে কথা বলার জন্য। কিন্তু তার কাছ থেকে যতটুকু তথ্য পেয়েছি, তাতে আমার মন ভরেনি। তাই আমি নিজেই দেখা করতে চলে এলাম।'

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি ঠিক জায়গায়ই এসেছেন। আমিও তার কাছেই যাচ্ছি। আমি যেখানে প্রবেশ করব, আপনিও আমার পেছন পেছন সেখানে চলে আসবেন। যদি কারও ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয় যে, সে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারে, তখন আমি জুতা ঠিক করার ভান করে কোনো দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াব। এই সুযোগে আপনি সামনে চলে যাবেন।' এ কথা বলার পর তিনি হাঁটতে শুরু করেন, আমিও চলতে থাকি তার সাথে। অবশেষে তিনি আল্লাহর রাসুলের

সঙ্গো সাক্ষাৎ করেন, আমারও সাক্ষাৎ হয়। আমি আল্লাহর রাসুলের কাছে জানতে চাইলাম, 'আমাকে একটু বলুন, ইসলাম আসলে কী।' তিনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে সবকিছু জানালেন। আমি সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি। এরপর আল্লাহর রাসুল আমাকে বলেন, 'আবু যর, তোমার ইসলামগ্রহণের বিষয়টা গোপন রেখে তুমি দেশে ফিরে যাও। যেদিন আমাদের বিজয়ের খবর শুনবে, সেদিন চলে এসো।' তখন আমি বলি, 'যিনি আপনাকে সত্যের বাণী দিয়ে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, আমি প্রকাশ্যেই সবার সামনে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেব।' এরপর আমি মসজিদে চলে যাই। কাবাচত্বরে কুরাইশের অনেক লোকজন বসে আছে। তাদের ডেকে বলি, 'শোনো কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।' আমার এ কথা শুনে তারা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, 'ধর এই বেদ্বীনটাকে, হতভাগার আজ নিস্তার নেই।' এরপর তারা আমাকে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করে। আমার মনে হচ্ছিল, আমি আজ মরেই যাব। হঠাৎ আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর গলা শুনতে পেলাম। তিনি এসে আমার ওপর পিঠ বিছিয়ে দিয়েছেন। এরপর তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমাদের তো সাহস কম না! তোমরা গিফারের লোকের ওপর হাত ওঠাচ্ছ! ব্যবসার যাত্রা তো ওদের পাশ দিয়েই করতে হবে।' এ কথা শুনে তারা দমে যায়। সে যাত্রায় আমি প্রাণে বেঁচে ফিরি।

কিন্তু আমি তখন ঈমানি শক্তিতে প্রবল উজ্জীবিত, আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসায় সীমাহীন উচ্ছ্বসিত। তাই পরদিন সকালে আবারও সেখানে গিয়ে প্রকাশ্যে কালিমা পাঠ করতে শুরু করি। গতকালের মতো এবারও সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের উপর্যুপরি আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি আমি। সেদিনও আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে কুরাইশদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।[১]

[চার] তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাউসি। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশের লোক। তিনি ছিলেন গোত্র-প্রধান, পাশাপাশি একজন কবিও। ইয়েমেনের ক্ষুদ্র স্বশাসিত আমিরতন্ত্রের মতোই ছিল তাদের গোত্রের শাসনব্যবস্থা। নবুয়তের একাদশ বছর তিনিও মক্কায় আসেন। মক্কাবাসী তাকে যথাযথ সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক স্বাগত জানায়। তারপর নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে করতে জানায়, 'তুফাইল, তুমি আমাদের কাছে এমন একসময়ে এসেছ, যখন একটি মাত্র লোকের কারণে মক্কার ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব আর অশান্তি বিরাজ করছে। সেই লোকটা ভীষণ জাদুময়ী কথা জানে। সেগুলো বলে বাবার সঙ্গো ছেলের, স্বামীর সঙ্গো স্ত্রীর, ভাইয়ের সঙ্গো ভাইয়ের বিশাল দ্বন্দ্ব-হাঙ্গামা বাধিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ভয় হয়, আমাদের মতো আবার তোমাদের গোত্রেও এসব ছড়িয়ে না যায়! তাই ভুলেও তার সঙ্গো কথা বলবে না। সতর্ক থাকবে, তার কথা যেন

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫২২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৪৫৮৪

তোমার কানে না আসে।'

তুফাইল বলেন, আল্লাহর কসম, তারা আমাকে এক প্রকার সংকল্প করতে বাধ্য করে, আমি যেন তার সাথে কথা না বলি এবং তার কোনো কথাও না শুনি।

সকালবেলা যখন মসজিদে যাই, এই সতর্কতায় কানে ছিপি আঁটি—কোনোভাবেই যেন তার কথা শোনা না যায়। মাসজিদুল হারামে গিয়ে দেখি তিনি সালাতে মগ্ন। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, এটা হয়তো আল্লাহরই পরিকল্পনা ছিল—আমার কানে তার কিছু কথা প্রবেশ করুক। হঠাৎ মনে হলো, কথাগুলো তো বেশ চমৎকার! মনে মনে ভাবি, আমি নির্বোধ নাকি? আমি তো একজন কবি, একজন প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী মানুষ। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ—সে তফাত আমি জানি। এই লোকটার কিছু কথা শুনলে দোষ কোথায়? যদি ভালো বলে, তাহলে নিতে তো আমার কোনো সমস্যা নেই, আর খারাপ কিছু বললে, আমি সেগুলো না নিলেই তো হলো।

আমি তার সালাত শেষের অপেক্ষা করছিলাম, হয়তো এরপর বাড়ির পথ ধরবেন তিনি। সালাত শেষে যখন তিনি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, আমি তার পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করি। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমার এখানে আসার কারণ তাকে জানাই।

মানুষ যে আমাকে তার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছে, আমিও কানে ছিপি এঁটে মসজিদে এসেছিলাম, তারপর তার কিছু কথা শুনে আমার ভালো লাগে ইত্যাদি সবিস্তারে তাকে জানাই। পাশাপাশি এ আবেদনও করি, তিনি যেন আমার সামনে ইসলাম ধর্ম তুলে ধরেন। আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান এবং ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে কিছু বলেন। তার কথা শুনে মনে হয়—এর চেয়ে সুন্দর কথা, এর চেয়ে ইনসাফের কথা আমি বোধহয় জীবনেও শুনিনি। তাই তখনই ইসলাম গ্রহণ করে নিই এবং নবিজির কাছে একটা আবেদন জানাই—'আমি আমার গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি, আমার কথা সবাই মেনে চলে। যেহেতু এখন ফিরে যাচ্ছি, তাই তাদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে চাই। তবে আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন—তিনি যেন আমাকে ইসলাম-প্রচারের সহায়তার জন্য একটি নিদর্শন দান করেন।

গোত্রে ফিরে যাবার আগেই আল্লাহ তাআলা নিদর্শনস্বরূপ তার চেহারাকে প্রদীপের মতো আলোকিত করে দেন। মানুষ যেন তাকে অসুস্থ মনে না করে, তাই আল্লাহর কাছে পুনরায় আর্জি জানান—আল্লাহ যেন তার এই আলোকে অন্য কোথাও স্থাপন করে দেন। তার আর্জি কবুল হয়, আল্লাহ তাআলা সেই আলোটিকে তার হাতের চাবুকের মধ্যে স্থাপন করে দেন। তার দাওয়াতে তার বাবা ও তার স্ত্রী ইসলামগ্রহণে ধন্য হয়, যদিও তার সম্প্রদায় ইসলাম কবুলে কিছুটা বিলম্ব করছিল, কিন্তু তার জোরদার মেহনতে খন্দক যুদ্ধের পর প্রায় ৭০-৮০টি পরিবার ইসলামের ছায়াতলে

আসে। তিনি তাদের নিয়ে মদিনায় হিজরতও করেন।[১] ইসলামের জন্য বিরাট এক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এই সাহাবি তুফাইল ইবনু আমর। সবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত-বরণ করেন।[২] রাযিয়াল্লাহু আনহু।

[পাঁচ] দমাদ আল-আযদি, জন্ম ইয়েমেনের আযদের শানুয়া গোত্রে। তিনি রুকইয়া অর্থাৎ ঝাড়ফুঁক করতেন। মক্কায় এসে মানুষের কাছে শোনেন মুহাম্মাদের কথা। লোকেরা বলাবলি করছিল, মুহাম্মাদ একজন পাগল। কিন্তু তিনি ভাবেন, এই লোকটির সঙ্গে দেখা করা দরকার, হয়তো আল্লাহ আমার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে দেবেন। তারপর নবিজির সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'মুহাম্মাদ, আমি ঝাড়ফুঁকে অভিজ্ঞ। তোমার কি কোনো চিকিৎসা লাগবে?' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বলেন—

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، أَمَّا بَعْدُ

সকল প্রশংসা আল্লাহর, আমরা সবাই তাঁর গুণগান করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। তিনি যাকে হিদায়াত দেন, কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না এবং যাকে বিভ্রান্ত করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো অংশীদারও নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তিনি নবিজিকে এ কথাগুলো আবারও বলতে অনুরোধ করেন। নবিজি এ কথাগুলো তাকে ৩ বার শোনান। দমাদ আল-আযদি মনোযোগ দিয়ে শোনার পর মন্তব্য করেন, 'আমি এই জীবনে অনেক গণকের কথা, জাদুকরের কথা ও কবির কথা শুনেছি। কিন্তু এ কথাগুলোর মতো কোনো কথাই আমি এখন পর্যন্ত শুনিনি। এ কথাগুলো মানব-অভিধানের উর্ধ্বে, তা শুনে আমি খুবই মুগ্ধ।' তারপর নবিজিকে অনুরোধ করেন, 'আপনার হাত এগিয়ে দিন, আমি ইসলামের বাইআত নেব।' তারপর তিনি বাইআত গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যান।[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮৫

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮২-৩৮৫; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮১-৮২; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল,* মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৪৪; *তারিখে ইসলাম,* নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৭

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৮৬৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮৬০

ইসলামের ছায়াতলে মদিনার ৬ যুবক

নবুয়তের একাদশ বছর। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাস। চলছে হজের মৌসুম। এই সময়টায় ইসলাম বেশ ভালো ও তাজা কিছু ‘বীজের’ সন্ধান লাভ করে, যা অল্প সময়ের ভেতর আকাশছোঁয়া সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট বটবৃক্ষে পরিণত হয়, যার ঘনসবুজ ছায়ায় মুসলিমরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জুলুম-অত্যাচারের তাণ্ডব থেকে দলে দলে আশ্রয়গ্রহণ করেছিল।

মক্কার মানুষ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবসময় মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। তার দাওয়াতি কাজে যেকোনো মূল্যে বাধা দিত তারা। ফলে তিনি এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেন, বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাতের সময়কে বেছে নেন—যেন মক্কার কেউ তার এই প্রচারকাজে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।[১]

এক রাতের কথা। নবিজি দাওয়াতের কাজে বের হয়েছেন। সাথে আবু বকর ও আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। তারা যাহল ও শাইবান ইবনু সালাবার তাঁবুতে যান। সেখানকার মানুষদের দ্বীনের দাওয়াত দেন। এ সময় আবু বকরের সঙ্গেও তাদের বেশ বন্ধুসুলভ কথাবার্তা হয়। তাদের নানারকম কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দেন নবিজি। তবে ইসলাম সম্পর্কে বেশ আগ্রহ দেখালেও শেষমেশ তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।[২]

তারপর নবিজি মিনার আকাবায় যান। সেখানে কিছু মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।[৩] নবিজি তাদের সঙ্গে দেখা করেন। তারা ইয়াসরিবের (মদিনার) খাযরাজ গোত্রের লোক। তাদের নাম—

» আসআদ ইবনু যুরারা (বনু নাজ্জার)

» আউফ ইবনুল হারিস ইবনি রিফাআ ইবনি আফরা (বনু নাজ্জার)

» রাফি ইবনু মালিক ইবনিল-আজলান (বনু যুরাইক)

» কুতবা ইবনু আমির ইবনি হাদিদা (বনু সালাম)

» উকবা ইবনু আমির ইবনি নাবি (হারাম ইবনু কাব)

» জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি রিআব (বনু উবাইদ ইবনি গানাম)

মদিনাবাসীদের ইসলামের দিকে সহজে এগিয়ে আসার অন্যতম কারণ তাদের বসবাস

---

[১] *তারিখে ইসলাম*, নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৯

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২

[৩] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৪

ছিল ইহুদিদের সঙ্গে। আর ইহুদিদের প্রায়ই বলতে শোনা যেত, 'এই সময়ে একজন নবি আসবেন, তিনি এলে আমরা তার অনুসারী হব, তখন আমরা আদ ও ইরাম জাতির মতো তোদেরও ধ্বংস করে দেব।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরিচয় জানতে চেয়ে বলেন, 'তোমরা কারা?' তারা জানায়, 'আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক।' তিনি পুনরায় জানতে চান, 'তোমরা কি ইহুদিদের মিত্র?' তারা বলে, 'হ্যাঁ, আমরা তাদের মিত্রপক্ষ।' তখন তিনি অনুরোধ করেন, 'আসো, আমরা বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলি।' তারা বেশ আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে নবিজির কাছে গিয়ে বসে। তিনি এই সুযোগে তাদের কাছে ইসলামের মৌলিক কথাগুলো তুলে ধরেন। তাদেরকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে শোনান। তারা নবিজির বক্তব্য শুনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে, 'এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ইহুদিরা যে নবির অপেক্ষায় আছে এবং যাকে নিয়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার হুমকি দেয়, ইনিই সেই নবি। তাই সাবধান! ওরা আমাদের আগে যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পারে।' এই ভেবে তারা তখনই নবিজির দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়।

মদিনার জ্ঞানী লোক এরাই, যারা গৃহযুদ্ধের কারণে সর্বস্ব হারিয়ে এখন নিঃস্ব। তখনো মদিনায় জ্বলছে যুদ্ধের আগুন। তাদের প্রত্যাশা—এই দাওয়াতের কারণে হয়তো-বা চলমান যুদ্ধ থেমে যাবে। নবিজিকেও তারা এটাই জানায়, 'আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকে। আমাদের গোত্রের মানুষের মধ্যে যতটা শত্রুতা ও হিংস্রতা আছে, সেটা বোধ হয় অন্য কোথাও কারও মধ্যে নেই। আল্লাহ হয়তো আপনার মাধ্যমে আমাদের আবার একত্র করবেন, আমাদের মধ্যে আগের সেই ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে দেবেন। আপনার এই বার্তা ও দ্বীনের দাওয়াত আমরা তাদের কাছে পৌঁছে দেব। যদি আপনার কারণে আমাদের এই ভাঙন ও অনৈক্য দূর হয়, তাহলে আপনি আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষে পরিণত হবেন।'

এই লোকগুলোই মদিনায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান, মদিনার মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। তাদের পরিশ্রম-মেহনতের বদৌলতে মদিনার প্রতিটি ঘরে নবিজির আলোচনা শুরু হয়।[২]

নবিজির সংসারে উম্মুল মুমিনিন আয়িশার আগমন

নবুয়তের একাদশ বছরের শাওয়াল মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৯-৫৪১

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৮-৪৩০

সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তার বয়স ছিল ৬ বছর। মদিনায় যাওয়ার পর প্রথম হিজরিতে তিনি নবিজির ঘরে আসেন এবং সংসারজীবন শুরু করেন। তখন তার বয়স ৯ বছর।[১]

আল্লাহ তাআলার সাথে নবিজির সাক্ষাৎ

ইসলামের দাওয়াত তখন খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছিল, কোথাও কোনো আশার আলো নেই। সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার পাল্লাই যেন বেশি ভারী। দূর আকাশে মিটিমিটি জ্বলছে আগাম বিজয়ের নক্ষত্র, খালি চোখে যা দেখা যায় না। এমনই এক গুমোট নিরাশার সময় ইসরা ও মিরাজের অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ইসরার সময়কাল নিয়ে বিভিন্ন মতামত দেখা যায়—

» ইমাম তাবারির কাছে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, যে বছর নবিজি নবুয়ত লাভ করেন, সেই বছরই ইসরা সংঘটিত হয়।

» ইমাম নববি ও কুরতুবি মনে করেন—নবুয়তের ৫ বছর পর ইসরার ঘটনা ঘটে।

» আল্লামা মানসুরপুরির মত হচ্ছে—নবুয়তের দশম বছরে, রজব মাসের ২৭ তারিখে এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

» কেউ বলেন, হিজরতের ১৬ মাস আগে, নবুয়তের দ্বাদশ বছরের রামাদানের ঘটনা এটি।

» কারও বক্তব্য—হিজরতের ১৪ মাস আগে, নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে মুহাররম মাসে এই ইসরা সংঘটিত হয়।

» আবার কারও মত—হিজরতের ১ বছর আগে, নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর রবিউল আউয়ালই ছিল ইসরা সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময়।

প্রথম ৩টি মত সঠিক হওয়ার সম্ভবনা নেই। কারণ খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়েছিল নবুয়তের দশম বছরে। রামাদান মাসে। তার মৃত্যুর সময় ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ ছিল না। অপরদিকে, এ ব্যাপারে সবাই একমত—মিরাজের রাতেই ৫ ওয়াক্ত সালাত মুসলিমদের ওপর ফরজ করা হয়। তাই এটা নিশ্চিত বলা যায়, নবুয়তের দশম

---

[১] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ১০; *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৯৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৪২২; *সুনানুন নাসায়ি* : ৫৩৪৫; *সহিহ মুসলিমের* বর্ণনায় ৬ বছরের স্থানে ৭ বছরের কথা এসেছে। ইমাম নববি বলেন, 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বয়স-সম্পর্কিত বর্ণনার এই ভিন্নতা মূলত আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়েছে। কারণ বিবাহের সময় তার বয়স ছিল ৬ বছর কয়েক মাস। অর্থাৎ তিনি ৭ বছরে পা দিয়েছেন।' [*শারহু মুসলিম*, ইমাম নববি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২০৭; দারু ইহইয়াইত তুরাস আল-আরাবি, বৈরুত]

বছরের রামাদানের আগে ইসরা সংঘটিত হয়নি।[১] আর শেষ ৩টি মতের কোনটি বেশি সঠিক, সেটি নির্ধারণ করার মতো সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই। তবে এই মতগুলোই বেশি গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া সুরা ইসরা নাযিলের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইসরা নবিজির মাক্কিজীবনের একবারে শেষদিকের ঘটনা।

মুহাদ্দিসগণ এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে আলোচনা করেছেন, আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করব—

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বিশুদ্ধ হাদিস মোতাবেক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের সঙ্গে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মাসজিদুল হারাম থেকে বাইতুল মাকদিসের উদ্দেশে বোরাকে চড়ে নৈশযাত্রা করেন। মাসজিদুল আকসা ছিল তার প্রথম অবতরণ-স্থল। মসজিদের ফটকের আংটার সঙ্গে বোরাক বেঁধেছিলেন তিনি। সেখানে সমবেত নবি-রাসুলদের সালাতের ইমামতিও করেছিলেন সে রাতে।

তারপর মিরাজের মাধ্যমে তাকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত ওঠানো হয়। জিবরিল আলাইহিস সালাম দরজা খোলার নির্দেশ দেন। দরজা খুলে দেওয়া হয়। তিনি সেখানে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামকে দেখতে পান। তাকে শ্রদ্ধাজড়িত সালাম নিবেদন করেন। আদম আলাইহিস সালাম আবেগ-আপ্লুত হয়ে সালামের উত্তর দেন এবং আল্লাহর রাসুলের নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আদম আলাইহিস সালামের ডান পাশে থাকা শহিদদের আত্মা এবং বামপাশে থাকা দুর্ভাগাদের আত্মার অবস্থা দেখান।

তারপর তিনি পৌঁছে যান দ্বিতীয় আসমানে। জিবরিল আমিন দরজা খোলার আবেদন করলে তা খুলে দেওয়া হয়। তিনি সেখানে ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া ও ঈসা ইবনু মারইয়ামকে দেখতে পান। তাদের সঙ্গেও সালাম বিনিময় হয়। তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিবাদন জানান এবং তার নবুয়তের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারপর যান তৃতীয় আসমানে। সেখানে তার দেখা হয় ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে। সালাম বিনিময়ের পর তিনিও মুবারকবাদ জানান এবং আল্লাহর রাসুলের নবুয়তের স্বীকারোক্তি দেন।

তারপর আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে যাওয়া হয় চতুর্থ আসমানে। সেখানে ছিলেন ইদরিস আলাইহিস সালাম। তার সঙ্গেও মোলাকাত হয়, তিনিও তাকে মুবারকবাদ জানান এবং

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৬; *তারিখে ইসলাম*, নাজিবাবাদি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৪

তার নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। তারপর পঞ্চম আসমান, সেখানে সাক্ষাৎ হয় হারুন ইবনু ইমরান আলাইহিস সালামের সঙ্গে। তিনিও তাকে মুবারকবাদ জানান এবং নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করেন।

তারপর ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছেন, সেখানে মুসা ইবনু ইমরানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তিনিও তাকে মুবারকবাদ জানান এবং নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করেন। সাক্ষাৎ শেষে বিদায় নেওয়ার সময় মুসা আলাইহিস সালামের চোখে পানি এসে যায়। আল্লাহর রাসুল তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেলে, তিনি বলেন, 'আমি কাঁদছি এ কারণে, আমার পরে এক যুবক নবুয়ত লাভ করবে, জান্নাতে তার উম্মতের লোকজন আমার উম্মতের চেয়েও বেশি হবে।' তারপর পৌঁছান সপ্তম আসমানে, সেখানে ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সালাম পেশ করেন। তিনিও স্নেহের সাথে তা গ্রহণ করেন। শেষে মুবারকবাদ জানিয়ে তার নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করেন।

তারপর নবিজিকে নিয়ে যাওয়া হয় সিদরাতুল মুনতাহায়[১]। সেখান থেকে যান বাইতুল মামুরে[২]। সর্বশেষ রব্বুল ইযযাহ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার দরবারে যথাযথ সম্মান এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে হাজির হন। সেদিন আল্লাহ ও তার দূরত্ব ছিল মাত্র দুই ধনুকের পরিমাণ বা তারও কম।

আল্লাহ তাআলা তাকে একান্তে প্রত্যাদেশ করেন এবং ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। তিনি যখন এই গুরু অধ্যাদেশ নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি জানতে চান, আপনাকে কী নির্দেশ করা হয়েছে? আল্লাহর রাসুল বলেন, '৫০ ওয়াক্ত সালাত।' নবি মুসা বলেন, 'আপনার উম্মত এত বেশি সালাত আদায় করতে পারবে না। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে সালাতের সংখ্যা কমানোর আবেদন করুন।' নবিজি জিবরিল আমিনের দিকে তাকান। অর্থাৎ তার কাছে তিনি পরামর্শ চাইছেন। জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে ইশারা করলেন, 'চলুন।'

---

[১] সিদরাহ অর্থ বরইগাছ আর মুনতাহা অর্থ শেষ প্রান্ত। সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ—শেষ প্রান্তের বরইগাছ।

শরিয়তের পরিভাষায়, সিদরাতুল মুনতাহা হচ্ছে একটি বিশাল বরইগাছ, যেটি সপ্তম (কারও কারও মতে ষষ্ঠ) আসমানের শেষ সীমানায় অবস্থিত। কোনো মানুষ, জিন, এমনকি ফেরেশতাও এই সীমানা অতিক্রম করতে পারে না। ফেরেশতাগণ আল্লাহর বিধিবিধান এখান থেকেই গ্রহণ করেন। [*তাফসিরুত তাবারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৭; *তাফসিরুস সাদি*, পৃষ্ঠা : ৮১৮; *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩১]

[২] বাইতুল মামুরের শাব্দিক অর্থ—জনবহুল ঘর বা আবাদকৃত ঘর। পরিভাষায় বাইতুল মামুর দ্বারা সপ্তম আকাশের একটি ঘর (মসজিদ) উদ্দেশ্য, যেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। যারা এখানে একবার সালাত আদায় করেন, দ্বিতীয়বার আর এখানে তাদের সালাত আদায়ের সুযোগ হয় না। [*সহিহুল বুখারি* : ৩২০৭; *সহিহ মুসলিম* : ৩০০]

তিনি আবার আল্লাহ তাআলার কাছে নবিজিকে নিয়ে যান। তিনি তখনো সেখানে ছিলেন।[১] আল্লাহ ১০ ওয়াক্ত সালাত কমিয়ে দেন। ৪০ ওয়াক্ত সালাত নিয়ে আবার মুসা আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আরও ১০ ওয়াক্ত কমিয়ে নেওয়ার কথা বলেন, 'আপনি রবের কাছে গিয়ে আবার সালাত কমানোর আর্জি পেশ করুন।' এভাবে নবিজি মুসা আলাইহিস সালামের পরামর্শে বেশ কয়েকবার আল্লাহ তাআলার কাছে সালাতের ওয়াক্ত কমাতে আবেদন করেন এবং সে আবেদনের প্রেক্ষিতে কমাতে কমাতে সর্বশেষ ৫ ওয়াক্ত সালাত পর্যন্ত এসে ঠেকে। তখনো মুসা আলাইহিস সালাম পুনরায় আবেদনের পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর কাছে এবার যেতে আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে। ৫ ওয়াক্ত সালাত আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলাম।'

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিধান নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর শুনতে পেলেন—

'আমি বান্দাদের ওপর আবশ্যক সালাতের গুরুদায়িত্ব লাঘব করে দিলাম এবং আজ থেকে তাদের ওপর ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দিলাম।'[২]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ *যাদুল মাআদ* গ্রন্থে মিরাজের রাতে সালাত ফরজ হওয়ার আলোচনা করার পর একটি মতবিরোধ তুলে ধরেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করেছেন? ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর মতে, মিরাজের রাতে আল্লাহকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করেননি। কোনো সাহাবির কাছ থেকেও এ ব্যাপারে কোনো মতামত পাওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে দুটি বক্তব্য পাওয়া গিয়েছে—**এক.** অবলোকন। **দুই.** অন্তর্দৃষ্টি যোগে অবলোকন। প্রথম বক্তব্যে নির্দিষ্ট কোনো অবলোকনের কথা বলেননি। আর দ্বিতীয় বক্তব্যে যেহেতু স্পষ্ট করে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অবলোকনের কথা বলেছেন, তাই বোঝাই যাচ্ছে, তিনি দ্বিতীয়টির পক্ষে রয়েছেন।

ইবনুল কাইয়িম আরও বলেন, কুরআনুল কারিমে রয়েছে, 'তারপর তিনি নিকটবর্তী হলেন এবং আরও নিকটে এলেন।'[৩]

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট এবং অন্যান্য আয়াতের দিকে লক্ষ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে মিরাজের রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটে আসার কথা বলা হয়নি; বরং জিবরিল আমিনের সঙ্গে নবিজির সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে। ইবনু মাসউদ এবং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহুমারও এটাই অভিমত। সুরা নাজমে 'নিকটবর্তী হওয়া এবং

---

[১] *বুখারির* বিভিন্ন সনদে বর্ণনাটি এভাবেই এসেছে।

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

[৩] সুরা নাজম, আয়াত : ৮

সাক্ষাতের' যে আলোচনা, তা জিবরিল আমিনের সঙ্গো নবিজির সাক্ষাতের বিবরণ। নবিজি তাকে নিজ আকৃতিতে দুইবার দেখেছেন—একবার পৃথিবীতে, আরেকবার ঊর্ধ্বলোকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। অবশ্য মিরাজের রাতে নবিজি আল্লাহর সঙ্গ লাভ করেছেন, এই বিষয়টিও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে সুরা নাজমের ঘটনা শুধু জিবরিল আমিনের সঙ্গোই সম্পৃক্ত।[১]

মিরাজের ঊর্ধ্বজাগতিক এই ভ্রমণকালে নবিজির আরও একবার বক্ষবিদারণ হয়। তিনি এই অলৌকিক সফরে অনেক অদ্ভুত ও অপার্থিব বিষয় অবলোকন করেন। এ সময় তার পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির পরীক্ষা নেওয়া হয়। তার সামনে আনা হয় একই ধরনের দুটি পাত্র, একটি দুধের আর অন্যটিতে ছিল মদ। তিনি দুধের পাত্রটি হাতে নেন। তখন তাকে বলা হয়, 'আপনি সত্য প্রকৃতি ও স্বভাবের ওপর রয়েছেন। দুধের পাত্রটি না নিয়ে যদি মদের পাত্রটি হাতে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।'

তিনি জান্নাতে চারটি নদী দেখতে পান—দুটির উৎস বাইরে, আর অপরদুটির ভেতরে। বাইরের দুটি হচ্ছে নীল নদ ও ফুরাত। জান্নাতে পৃথিবীর এই দুটি নদী দেখার তাৎপর্য হচ্ছে, এই দুটি নদীর ধারের সবুজ ও শ্যামল অববাহিকায় ইসলামের বার্তা পৌঁছে যাবে এবং এখানকার অধিবাসীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইসলামচর্চা করবে। জান্নাতে এই দুটি নদী দেখার অর্থ এটা নয় যে, নীলনদ ও ফুরাত নদীর উৎপত্তিস্থল জান্নাত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

জাহান্নাম দেখার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে নিযুক্ত প্রহরীকে দেখতে পান। তার মুখে কোনো হাসি নেই। বেশ দুঃখভারাক্রান্ত ও বিষাদগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। নবিজি জান্নাত ও জাহান্নাম—দুটোই দেখেন। এ সময় এতিমের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের ভয়াবহ অবস্থা দেখতে পেলেন তিনি। তাদের ঠোঁট দেখতে উটের ঠোঁটের মতো ছিল, পাথরের মতো আগুনের অঙ্গার তাদের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে পায়ুপথ দিয়ে বের করা হচ্ছিল। সুদখোরদের শাস্তি তো আরও ভয়ানক, প্রকাণ্ড আকৃতির পেটসমেত তারা মাটিতে পড়েছিল, পেটের ভারে নড়াচড়া করতে পারছে না তারা, ফিরাউনের পরিবার ও অনুচরদের যখন আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তারা এদের এলোপাথাড়ি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। ব্যভিচারীদের শাস্তিও তাকে দেখানো হয়, তাদের সামনে এক পাত্রে ভালো ও তাজা গোশত, অন্য পাত্রে দুর্গন্ধযুক্ত পচা গোশত। তারা ভালো গোশত রেখে বমি-উদ্রেককারী পচা গোশত খাচ্ছিল। যে নারীরা স্বামীদের অগোচরে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গো মেলামেশা করে, অবৈধ সন্তান প্রসব করে, তাদের অশুভ পরিণতি তিনি সেখানে দেখতে পান; তাদের স্তনে আংটা লাগিয়ে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮; *সহিহুল বুখারি* : ৩২৩৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১০৮২; *জামিউত তিরমিযি* : ৩০৬৮

শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

ইসরার রাতে যাত্রাপথে এক আরব বণিকদলের সঙ্গো নবিজির সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের একটি উট হারিয়ে গেছে। নবিজি সেই উটের সন্ধান বলে দেন। তাদের একটি ঢাকা পাত্র থেকে তিনি পানি পান করে তা আবার ঢেকে রাখেন। এ সময় বণিকদলের সবাই ঘুমাচ্ছিল। পরদিন সকালে সাক্ষাতের এই ঘটনা ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে তার দাবিকে মক্কাবাসীর কাছে সত্য প্রমাণ করে।[১]

সকালবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের রাতের ঘটনা সবাইকে জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ তাকে জান্নাত-জাহান্নাম দেখিয়েছেন। ফেরেশতাদের জগৎও তিনি দেখে এসেছেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে। মিরাজের এই ঘটনা শোনার পর মক্কার কাফিররা ব্যঙ্গা-বিদ্রুপ করতে শুরু করে। নবিজির দাবি সঠিক কি না—যাচাইয়ের জন্য বাইতুল মাকদিসের বিবরণ শুনতে চাইল তারা। আল্লাহ তাআলা তখন নবিজির চোখের সামনে পুরো বাইতুল মাকদিস তুলে ধরেন। তিনি মক্কায় বসে বাইতুল মাকদিস দেখে দেখে তাদের কাছে নিখুঁত বর্ণনা দিতে থাকেন। আরবের যে বণিকদল সিরিয়া থেকে ফিরছিল, তাদের কথাও জানাতে ভোলেন না। তারা কখন পৌঁছাবে, তাদের কোন উটটি হারিয়ে গিয়েছিল ইত্যাদি সবকিছুই জানান। নবিজি তাদের যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনটিই ঘটে। এবার তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। কোনো কিছুরই আর সদুত্তর তারা দিতে পারে না। তাদের মিথ্যাচার, বিদ্রুপ, কটাক্ষ ও নির্যাতন এই ঘটনার পর আরও বেড়ে যায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মক্কার কাফিররা নবিজিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করতে শুরু করে—কখনো মিথ্যুক, আবার কখনো পাগল বলে গালিগালাজ করতে থাকে।[২] এমন সময় সমাজ ও পরিবেশকে তোয়াক্কা না করে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মিরাজের এই সত্য ঘটনাকে প্রকাশ্যে সত্য বলে স্বীকার করে নেন। ইসলামের ইতিহাসে এজন্যই তিনি 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত হন—যার অর্থ নিঃসংকোচে সত্যায়নকারী।[৩]

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে খুব সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন—কেন তিনি তাঁর প্রিয় মানুষটিকে অলৌকিক উর্ধ্বজাগতিক অভিযাত্রায় ৭ আসমান ভ্রমণ করিয়েছিলেন—

...لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا...۝١

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৭-৪০৬

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮; *সহিহুল বুখারি* : ৩৮৮৬, ৪৭১০; *সহিহ মুসলিম* : ১৭০; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০২-৪০৩

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৯

তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য।[১]

আল্লাহ তাআলা প্রায় প্রত্যেক নবিকেই এই ঊর্ধ্বজাগতিক নিদর্শন দেখিয়েছেন,[২] নবিদের ক্ষেত্রে এটাই তাঁর সুন্নাহ। তিনি বলেন, 'এইভাবে আমি ইবরাহিমকে দেখিয়েছিলাম মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম রাজত্ব, যাতে তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।'[৩]

মুসা আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে আমার আরও বড় নিদর্শন দেখাব।'[৪]

নবি-রাসুলদের ঈমান সুদৃঢ় করতেই আল্লাহ তাআলার এই বিশেষ সুন্নাহ, তিনি তাদেরকে ঊর্ধ্বজাগতিক কিছু অলৌকিক নিদর্শন সরাসরি দেখান। সাধারণত একটি জিনিস শোনা ও দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা নবিদের ঐশী জ্ঞান প্রদান করে, এর বাস্তবতাও তাদের সামনে তুলে ধরেন। ফলে তাদের ঈমান-বিশ্বাস হয়ে যায় আকাশস্পর্শী। দুনিয়ার সব পরাশক্তি তাদের কাছে একটা মশার ডানার চেয়েও তুচ্ছ মনে হয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ বিসর্জন দিতে তারা বিন্দু পরিমাণও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

মিরাজের সফরের মূল তাৎপর্য ও রহস্য এবং সেইসঙ্গে এই সফরের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়; তবুও ছোট ছোট কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরব, যা একান্তই অনিবার্য এবং যেসব কারণে আরও ফুলেল ও সুরভিত হয়ে উঠেছে নবিজির জীবনকানন—

সুরা ইসরার[৫] আয়াতের ক্রমধারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়—ইসরার ঘটনা

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১

[২] 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবিকেই এই ঊর্ধ্বজাগতিক নিদর্শন দেখিয়েছেন' তার মানে সকল নবিই কি তাহলে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সাত আসমান জান্নাত-জাহান্নাম, আরশ ও কুরসি ইত্যাদি ভ্রমণ করেছেন? মোটেও নয়; নবিজির সাথে অন্য নবিদের শুধু দেখা ও জানার মধ্যে মিল আছে। তবে দেখার ধরণ ও অবস্থানের ক্ষেত্রে নবিজি সবার থেকে আলাদা। সকল নবিকে আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁর ঊর্ধ্বজাগতিক নিদর্শন দেখিয়েছেন। ইবরাহিম নাখয়ি বলেন, 'এমনকি তাদের সামনে আল্লাহ আরশ পর্যন্ত পর্দা উন্মোচন করে দিতেন।' একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আরশের মেহমান করেছেন। ধন্য করেছেন স্বচক্ষে তাঁর দর্শন দিয়ে। [*তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪; দারুল কুতুবিল মিসরিয়া]

[৩] সুরা আনআম, আয়াত : ৭৫

[৪] সুরা ত-হা, আয়াত : ২৩

[৫] সুরা বনি ইসরাইলের অপর নাম 'সুরা ইসরা'।

আল্লাহ তাআলা একটিমাত্র আয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আর পরবর্তী আয়াতগুলোতে তিনি ইহুদিদের জঘন্য, অমার্জনীয় ও বীভৎস অপরাধের কথা বলেছেন এবং এর পরের আয়াতে তিনি উল্লেখ করেছেন—কুরআন হচ্ছে সঠিক পথের দিশারি। এই আয়াতগুলোর ভেতরে আলোচনার বিষয়বস্তু আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হওয়ার কারণে অনেকে বলতে চান—আয়াতগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই আয়াতগুলো একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত এবং প্রাসঙ্গিক।

আলোচনায় এমন শৈলী ও উপস্থাপনভঙ্গি গ্রহণের কারণ হচ্ছে—বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের দিকে ইঙ্গিত দেওয়া। আল্লাহ তাআলা মিরাজের এই ঘটনার সূচনা করেন বাইতুল মাকদিসের ভূমি থেকে। তিনি এর মাধ্যমে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘন এবং অপরাধের কারণে অচিরেই বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব থেকে ইহুদিদের সরিয়ে দেওয়া হবে। কারণ তারা এই পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ তাআলা এই পদটির জন্য মনোনীত করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে। তাই তাদেরকে ইবরাহিমের দাওয়াতের দুটি কেন্দ্র, বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মাকদিস—একত্রে দান করেছেন।

কুরআনুল কারিমে ইসরা এবং ইহুদিদের অপরাধ ও সীমালঙ্ঘন—এই দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বিশ্ববাসীকে জানান—এখন নেতৃত্ব পরিবর্তনের সময় এসেছে, বিশ্বাসঘাতকতা ও সীমালঙ্ঘনের ইতিহাসে এক অযোগ্য জাতি থেকে কল্যাণ, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ আরেক জাতির কাঁধে বিশ্বনেতৃত্বের গুরুভার অর্পিত হবে; যাদের মাঝে এখনো এমন একজন রাসুল উপস্থিত, যিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সবচেয়ে সরল ও সঠিক আসমানি বাণী ওহি লাভ করেন।

এখন স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে—নবিজি তো তখনো নিজ সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত। তিনি পাহাড়-পর্বতে তার দ্বীন প্রচারের জন্য দিনরাত ছুটছেন, যদি নেতৃত্ব পেয়েই থাকতেন, তাহলে এভাবে অসহায় থাকার তো কথা না!

আসল কথা হচ্ছে, মক্কায় ইসলামি দাওয়াতের যে যুগ চলছিল, সেটি ছিল শেষের দিকে। সে সময়টা ছিল এমন—দ্বীনের দাওয়াত তখন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছিল। কুরআনুল কারিমের আয়াতে কাফির-মুশরিকদের স্পষ্টভাষায় সতর্ক এবং হুমকি দেওয়া হচ্ছিল—

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

যখন আমি মনস্থ করি, কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দেব, তখন ওদের অবস্থাসম্পন্ন লোকেদের কাছে নির্দেশ পাঠাই, কিন্তু তারা পরোয়া না করে

আরও পাপাচারে মেতে ওঠে, তখন সেই জনগোষ্ঠীর ওপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। এরপর তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিই।[১]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

নুহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।[২]

এই আয়াতগুলোর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন আয়াত অবতীর্ণ হয়, যেখানে মুসলিমরা নতুন ইসলামি সভ্যতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলনীতি ও ভিত্তি কেমন হবে—সেই সম্পর্কে ইঙ্গিত পান। তারা ধরেই নেন, খুব শীঘ্রই তাদের নতুন ভূমি হবে, যেখানে সবকিছুই থাকবে তাদের নিয়ন্ত্রণে, তারা তখন মুক্ত, স্বাধীন, এক ও অভিন্ন—যেন পুরো সমাজই তাদের ইশারায়ই চলবে।

মিরাজের ঘটনায় এদিকেও কিছুটা ইঙ্গিত ছিল যে, অচিরেই মুসলিমরা একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলের দেখা পাবে। সেখানে তারা নতুন করে নিজেদের গুছিয়ে নেবে, সেখান থেকে সমগ্র বিশ্বে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেবে। মিরাজের ঘটনায় এছাড়াও আরও অনেক রহস্য-তাৎপর্য ও হিকমত লুকিয়ে আছে। আলিমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন, তবে আমাদের গ্রন্থে আমরা ততটুকুই এনেছি, যা পরবর্তী আলোচনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ভবিষ্যতের দিকে এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের কারণে এটা বলা যায়, ইসরা-মিরাজের অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছে আকাবার প্রথম বাইআতের অল্প কিছুদিন আগে অথবা আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইআতের মাঝামাঝি সময়ে।

আকাবার প্রথম বাইআত

নবুয়তের একাদশ বছর হজের মৌসুমে ইয়াসরিবের ৬ জন লোকের সঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হয়, তারা তখন সেখানেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বিদায়ের আগে তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল—ইয়াসরিবের সাধারণ মানুষের মধ্যেও তারা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবেন। তাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলাফল দেখা যায় পরবর্তী বছরের হজের মৌসুমে। অর্থাৎ ৬২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে নবুয়তের দ্বাদশ বছর আরও ১২ জন ব্যক্তি নবিজির সাক্ষাতে মক্কায় আসেন। এদের মধ্যে গতবারের ৬ জনের ৫ জন ছিল। অনুপস্থিত ছিলেন কেবল জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৬

[২] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৭

ইবনি রিআব। আগত বাকি ৭ জন নতুন, তারা ইয়াসরিবেই ইসলামের দাওয়াত পান। তারা হলেন—

১. মুআজ ইবনুল হারিস[১] (খাযরাজের শাখাগোত্র বনু নাজ্জারের)

২. যাকওয়ান ইবনু আব্দিল কাইস (খাযরাজের শাখাগোত্র বনু যুরাইকের)

৩. উবাদা ইবনুস সামিত (খাযরাজের শাখাগোত্র বনু গানামের)

৪. ইয়াযিদ ইবনু সায়ালাব (খাযরাজের শাখাগোত্র বনু গানামের মিত্র গোত্রের)

৫. আব্বাস ইবনু উবাদা ইবনি নাদালা (খাযরাজের শাখাগোত্র বনু সালিমের)

৬. আবুল হাইসাম ইবনু তিহান (আউসের শাখাগোত্র বনু আব্দিল আশহালের)

৭. উইয়াম ইবনু সাইদা (আউসের শাখাগোত্র আমর ইবনু আউফের)[২]

তারা মিনার কাছে আকাবায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত হন। মক্কাবিজয়ের সময় নারীদের কাছ থেকে নবিজি যে বাইআত নিয়েছিলেন, তাদের বিষয়বস্তুও প্রায় একই রকম ছিল।

উবাদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বাইআতের কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

‘তোমরা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দাও—আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজ সন্তান হত্যা করবে না, না জেনে কারও ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং কল্যাণকর কোনো কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এই ওয়াদা রক্ষা করতে পারবে, আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর কেউ যদি এর মধ্যে থেকে কোনো একটা ভঙ্গ করে এবং তাকে দুনিয়াতেই এর নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হয়, তবে সেটাই তার প্রায়শ্চিত্ত। আর যদি আল্লাহ কারও এমন আচরণ লোকচক্ষুর আড়ালে রাখেন, তবে তার বিচারভার আল্লাহর হাতে। তিনি চাইলে এর বিচার করবেন, আবার চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।’ তারপর উবাদা ইবনুস সামিত বলেন, আমরা এ কথাগুলোর ওপর নবিজির হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম।[৩]

---

[১] মুআজ ইবনু আফরা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু জাহলের হত্যাকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩১-৪৩৩

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ১৮, ৩৮৯২, ৬৮০১, ৭২১৩, ৭৩৬৮

মদিনায় তালিম ও দ্বীনপ্রচার

এভাবে বাইআতের কাজ সম্পন্ন হয়। হজের মৌসুমও শেষ হয়ে আসে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওমুসলিমদের জ্ঞানচর্চার কথা ভাবেন। তাই তাদের সঙ্গে ইয়াসরিবে (মদিনায়) একজন জ্যেষ্ঠ সাহাবি পাঠান, যার কাজ ছিল—**প্রথমত** ইয়াসরিবের মুসলিমদের দ্বীনের তালিম দেওয়া। **দ্বিতীয়ত**, যারা এখনো মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলামের পথে আসতে পারেনি, তাদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটানো। এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য নবিজি নির্বাচন করেন মুসআব ইবনু উমাইর আবদারিকে। তিনি ছিলেন একজন অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত যুবক; প্রথম সারির মুসলিমদের একজন।

দাওয়াতি কাজে কল্পনাতীত সাফল্য

মুসআব ইবনু উমাইর মদিনায় এসে আসআদ ইবনু যুরারার মেহমান হন। পূর্ণ উদ্যম ও আবেগ নিয়ে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন ইয়াসরিবের মাটিতে। ইয়াসরিবের পাড়া-মহল্লায় সবাই তাকে কারি সাহেব বলে ডাকতে শুরু করে।

মুসআব ইবনু উমাইর ইয়াসরিবে দাওয়াতি কাজে অসাধারণ সাফল্য পান। একদিন আসআদ ইবনু যুরারা তাকে নিয়ে বনু আব্দিল আশহাল ও বনু জাফরের মহল্লায় যান। বনু জাফরের এক বাগানে মারাক নামের একটি কূপ ছিল। তারা সেখানে গিয়ে বসেন। তাদের বসতে দেখে ইয়াসরিবের মুসলিমরাও তাদের পাশে জড়ো হয়। বনু আব্দিল আশহালের দুই নেতা সাদ ইবনু মুআজ ও উসাইদ ইবনু হুদাইর তাদের আসার কথা জানতে পারেন। তারা তখনো মুসলিম হননি। সাদ ইবনু মুআজ উসাইদকে বলেন, 'তুমি একটু যাও তো, ওদেরকে ইচ্ছেমতো কথা শুনিয়ে আসো। ওরা আসছে অসহায় গর্দভগুলোকে বোকা বানাতে। আসআদ ইবনু যুরারা তো আমার খালাতো ভাই। ও যদি আমার ভাই না হতো, তাহলে আমি নিজেই গিয়ে ওদের শায়েস্তা করে আসতাম।'

কিছুক্ষণ পর আসআদ দেখলেন উসাইদ বর্শা উঁচিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। তাকে দেখিয়ে তিনি মুসআবকে বললেন, 'ইনি এই গোত্রের বড় নেতা। আল্লাহর দরবারে তার হিদায়াতের জন্য একটু দুআ করুন।' মুসআব বললেন, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, যদি তিনি একটু শান্ত হয়ে বসেন, তাহলেই আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব।' কিন্তু উসাইদ এসেই চিৎকার করা শুরু করেন, 'তোরা এখানে কেন এসেছিস? গর্দভগুলোকে বোকা বানানোর জন্য? যদি জানের মায়া থাকে, তাহলে এই জায়গা ছেড়ে চলে যা।'

মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো শান্ত। তিনি শান্তভাবে বিনয়ের সাথে বলেন, 'যদি একটু বসে আমাদের কথা শুনতেন! আমাদের কথা আপনার ভালো লাগলে, তবেই গ্রহণ করবেন। ভালো না লাগলে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই; আমরা আপনাকে

কোনোরকম জোর করব না।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তুমি বড় ইনসাফের কথা বলেছ।' হাতের বর্শা মাটিতে গেঁথে তিনি বসলেন। মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন।

কুরআন ও ইসলাম বিষয়ের জানার পর তার মুখাবয়বে অন্যরকম এক দীপ্তি খেলা করছিল, দেখে বোঝাই যাচ্ছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। মুসআবের বক্তব্য শেষ হলে তিনি বলে উঠলেন, 'বেশ তো! কত সুন্দর এই ধর্ম। এ ধর্মে প্রবেশ করার জন্য কি কোনো আচার বা রীতিনীতি আছে?' তারা জানালেন, গোসল করে পবিত্র কাপড় পরতে হবে। তারপর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ২ রাকাত সালাত আদায় করতে হবে। ব্যস, এতটুকুই। তিনি তখনই গোসল করে পবিত্র পোশাক পরেন, কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ২ রাকাত সালাতও আদায় করে নেন। তারপর বলেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তিকে রেখে এসেছি, তিনি যদি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তাহলে তার পুরো গোত্র তার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে নেবে। আমি এক্ষুনিই তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি বর্শা হাতে সাদ ইবনু মুআজের কাছে যান।

সাদ তখন তার গোত্রের সভাকক্ষে। তার সামনে তখন বহু লোক উপস্থিত। তাকে আসতে দেখে সাদ বললেন, 'আল্লাহর কসম, ও যে চেহারা নিয়ে সকালে বের হয়েছিল এখন আর সেই চেহারা নেই।' সাদ জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার! কী করলে?' তিনি বললেন, 'আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। মনে হলো তারা কোনো ঝামেলা করবে না। তবু তাদের নিষেধ করে দিয়েছি যেন এখানে আর না আসে। তারা জানিয়েছে, আমরা যা চাই, তা-ই হবে।'

সাদ যেন নিজে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, এজন্য উসাইদ তাকে একটা উত্তেজক-সংবাদ শোনান, 'শুনলাম, বনু হারিসার লোকজন আসআদ ইবনু যুরারাকে হত্যা করার জন্য গিয়েছিল। আসআদ তো তোমার খালাতো ভাই, কাজেই তারা চাইছে, এই সুযোগে তোমার সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করতে।'

উসাইদের কথা শেষ হতে না হতেই সাদ বর্শা উঁচিয়ে তাদের দিকে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, তারা নিশ্চিন্তে বসে আছে, যেন কারও অপেক্ষায়। সাদের আর বুঝতে বাকি রইল না, উসাইদ-ই এই ঘটনা সাজিয়েছে; যেন তাদের সাথে তারও কথাবার্তা হয়। সাদ ইবনু মুআজকে তখন খুব কঠোর দেখাচ্ছিল। তিনি আসআদকে লক্ষ করে বললেন, 'আল্লাহর কসম, যদি আমি তোমার আত্মীয় না হতাম, তাহলে কখনোই তোমার এসব করার দুঃসাহস হতো না। আর আমাদের মহল্লায় আমরা এসব পছন্দ করি না।'

মুসআবকে তো উসাইদ বলেই রেখেছিলেন, 'তোমার কাছে এক অবিসংবাদিত নেতা আসছেন, যাকে তার সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষ মান্য করে। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে তার পুরো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে নেবে।' এ কথাগুলো মাথায় রেখে

মুসআব খুব কোমল স্বরে অনুরোধ করেন, 'একটু বসুন না! আমাদের কথা একটু শুনুন, ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন, নয়তো আমরা আপনার অপছন্দনীয় কথা আপনাকে আর শোনাব না।' সাদও উসাইদের মতো বললেন, 'এটা তো খুবই ইনসাফের কথা।' এরপর উসাইদের মতো তিনিও হাতের বর্শা মাটিতে গেঁথে শান্ত হয়ে বসলেন।

সাহাবি মুসআব ইবনু উমাইর তাকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বললেন। কুরআনুল কারিম থেকেও কিছু আয়াত পড়ে শোনালেন তাকে। মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু পরে জানিয়েছিলেন, ইসলাম সম্পর্কে জানানোর পরপর তার চেহারার বিশেষ দীপ্তি আমাদের চোখে পড়েছিল। তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করবেন, সেটা যেন আবছা আবছা বুঝতে পারছিলাম আমরা। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, 'ইসলাম গ্রহণ করার কি কোনো নির্দিষ্ট রীতিনীতি বা নিয়ম আছে?' মুসআব জানালেন, 'গোসল করে পাকসাফ কাপড় পরে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে হয়। এরপর ২ রাকাত সালাত আদায় করলেই কাজ শেষ।' তিনি তখনই সবকিছু করে নিজেকে ধন্য করেন।

তারপর বর্শা নিয়ে সভাকক্ষের দিকে রওনা হন। তাকে আসতে দেখে তার গোত্রের লোকেরাও বলাবলি করছিল, 'আল্লাহর কসম, তিনি গিয়েছিলেন এক চেহারা নিয়ে, ফিরলেন আরেক চেহারায়!' এরই মধ্যে তিনি সভায় এসে পৌঁছেন। সভাসদদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'বনু আব্দিল আশহাল, তোমরা আমাকে ব্যক্তি হিসেবে কেমন জানো?' তারা বলে, 'আপনি আমাদের নেতা, আমাদের গোত্রের শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তি। আপনি বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী।' সাদ বলেন, 'তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমাদের গোত্রের নারী-পুরুষ কারও সঙ্গেই আমি কথা বলব না।'

সন্ধ্যা হতে না হতেই বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে উসাইরিম নামে এক ব্যক্তি বাকি ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শত্রুর আঘাতে সেদিন শহিদ হন। আল্লাহর দরবারে একটিবারের জন্যও সিজদা দেওয়ার সুযোগ হয়নি তার। আল্লাহর রাসুল তার ব্যাপারে বলেন, 'সামান্য আমল করেই সে অনেক সাওয়াবের মালিক হয়ে গেছে!'

মুসআব ইবনু উমাইর আসআদ ইবনু যুরারার বাড়িতে অবস্থান করে দাওয়াতের কাজ চালাতে থাকেন। ইয়াসরিবের ঘরে ঘরে কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূর করে ইসলামের প্রদীপ জ্বালাতে থাকেন তিনি। বনু উমাইয়া, খাতামা ও ওয়ায়িল গোত্র ছাড়া প্রায় সবাই মুসলিম হয়ে যায় তার দাওয়াতে। তাদের মধ্যে কাইস ইবনু আসলাত নামে মান্যবর এক কবি ছিল। সেই কবির অপপ্রচারের কারণেই তাদের ইসলামগ্রহণ বেশ কয়েক বছর বিলম্বিত হয়। পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের বছর তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নেন।

নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর, হজের মৌসুম আসার আগেই মুসআব ইবনু উমাইর মক্কায়

ফিরে যান। নবিজিকে শোনান সফলতার সুসংবাদ। তিনি নবিজিকে ইয়াসরিবের মানুষের ইসলামগ্রহণের গল্প, তাদের সমরদক্ষতা, রণকৌশল ও আন্তরিকতার কথা জানান। এ-ও বলেন, ইয়াসরিব হতে পারে ইসলামের উর্বর ভূমি, যেখান থেকে দাওয়াতের কাজ নির্বিঘ্নে করা যাবে; কোথাও কোনো অসুবিধা হবে না।[১]

আকাবার দ্বিতীয় বাইআত

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের কথা। নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর। এবারের হজ-মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে ৭০ জনেরও বেশি মুসলিম মক্কায় আসেন। তাদের সফর ছিল ইয়াসরিবের মুশরিক-কাফেলার সাথেই। তাদের ভেতর অনেকেই বলছিলেন, আর কত দিন আল্লাহর রাসুল মক্কার পাহাড়ে এভাবে অসহায় দিন কাটাবেন? আমরা কত দিন তাকে এভাবে ফেলে রাখব?

মক্কায় পৌঁছলে নবিজির সঙ্গে তারা গোপনে যোগাযোগ করে। তখন স্থির হয়—আইয়ামে তাশরিকের[২] মাঝের দিন অর্থাৎ ১২ তারিখ মধ্যরাতে মিনার জামরাতুল উলার নিকটবর্তী উপত্যকায় নবিজির সঙ্গে তারা মিলিত হবেন। মদিনার আনসার সাহাবিদের একজন নেতার মুখ থেকেই আমরা এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ সম্পর্কে জানব, যা আক্ষরিক অর্থেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যকার চলমান সংঘাতের ইতিহাস পালটে দিয়েছিল। কাব ইবনু মালিক আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

‘আমরা হজের উদ্দেশ্যে ইয়াসরিব থেকে মক্কায় আসি। আল্লাহর রাসুলকে আমরা কথা দিই আইয়ামে তাশরিকের দ্বিতীয় দিন মধ্যরাতে আকাবায় আমাদের দেখা হবে। সেই রাতে আমাদের সঙ্গে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনি হারাম, তিনি ইয়াসরিবের একজন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কাফেলায় যারা তখনো মুশরিক ছিল, তাদের থেকে লুকিয়েই আমরা সবকিছু করছিলাম। তাকে একটু সরিয়ে নিয়ে আসি। তার সঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলাপ করি—‘আবু জাবির, আপনি আমাদের নেতা, আমাদের প্রিয়ভাজন ও সম্ভ্রান্ত মানুষ! আমরা চাই না কাল কিয়ামতে আপনি জাহান্নামের লাকড়িতে পরিণত হন।’ এভাবে আমরা তাকে ইসলামের দাওয়াত দিই। তাকে জানিয়ে রাখি—আল্লাহর রাসুল আমাদের সঙ্গে আকাবায় দেখা করার ওয়াদা করেছেন। আমাদের দাওয়াতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইআতের সময়ও আকাবায় আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এমনকি সেখানে তিনিই ছিলেন আমাদের মুখপাত্র।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৫-৪৩৭; খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১

[২] জিলহজ মাসের এগারো, বারো ও তেরো তারিখকে ‘আইয়ামে তাশরিক’ বলা হয়। [*তাউযিহুল আহকাম*, আব্দুল্লাহ আল-বাসসাম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৪৬]

কাব বলেন, সেদিন রাতেও আমরা গোত্রের লোকদের সঙ্গে নিজ নিজ তাঁবুতে ঘুমাই। রাতের এক-তৃতীয়াংশ কেটে গেলে, আমরা বিড়ালের মতো নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়ি। আকাবার পথ ধরি। চলতে চলতে আমরা আকাবার নিকটবর্তী একটি উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছি। আমরা ছিলাম ৭৩ জন পুরুষ আর ২ জন নারী। নারীদের একজন ছিলেন বনু মাযিন ইবনু নাজ্জার গোত্রের নাসিবা বিনতু কাব, যার উপনাম উম্মু আম্মারা। অপরজন বনু সালামা গোত্রের আসমা বিনতু আমর, তার উপনাম উম্মু মানি।

আমরা সেখানে পৌঁছে নবিজির জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। একটু পরেই তিনি সেখানে উপস্থিত হন। সঙ্গে ছিলেন তার চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব, তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু ভাতিজার নিরাপত্তাবিধান এবং ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তার জন্য এসেছিলেন এবং তিনিই প্রথমে কথা বলেন।'[১]

নবিজির সাথে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠক

সবার উপস্থিতিতে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার বিষয় ধর্মীয় ও সামরিক সাহায্য-সহযোগিতা। নবিজির চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব কথা শুরু করেন। এই চুক্তির কারণে যে গুরুদায়িত্ব চেপে বসবে সবার কাঁধে, সেইসাথে যে সংকট ও ঝুঁকি তৈরি হবে, সবকিছু তিনি বুঝিয়ে বলেন তাদেরকে। তার ভাষায়—

'খাযরাজ[২] সম্প্রদায়, মুহাম্মাদ আমাদের কতটা আপন, সেটা তো তোমরা জানো। আমাদের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য ও বিশ্বাসগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাকে তাদের হাত থেকে অনবরত রক্ষা করে এসেছি। তিনি আমাদের কাছে সম্মান, মর্যাদা এবং প্রতিরক্ষার মধ্যেই আছেন। তবুও তিনি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন। এখন তোমরা যদি তার ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে থাকো এবং তার বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে তাকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও, তবে শোনো—ধর্ম প্রচারের কারণে যে বিপদ ও সংকটের মুখোমুখি তোমরা হবে, তা যদি তোমরা হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারো, তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমরা তাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। তবে মক্কা ছাড়ার পর যদি তাকে আবার ফিরিয়ে দাও, তার পাশে না দাঁড়াও, তাহলে তাকে আর নিতে এসো না। সে নিজের দেশে এবং নিজ গোত্রের মানুষের কাছে সম্মান, মর্যাদা এবং নিরাপত্তার ভেতরেই আছে। তাকে তার মতো থাকতে দাও।

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য শেষ হলে আমরা বলি, আপনার কথা শুনেছি, হে ইবনু মুত্তালিব। আর আল্লাহর রাসুলকে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার নিজের

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪০-৪৪১

[২] আরবরা আউস ও খাযরাজ গোত্রকে একত্রে খাযরাজ বলে ডাকত।

এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেমন ইচ্ছা আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিতে পারেন (আমাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমরা তা রক্ষা করব)।'[১]

তাদের এই উত্তরই প্রমাণ করে—এই বিশাল দায়িত্বগ্রহণের জন্য এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিজেদেরকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তারা কতটা সংকল্পবদ্ধ, উদ্যমী, সাহসী ও আন্তরিক। তাদের উত্তর শোনার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বক্তব্য পেশ করেন এবং উপস্থিত সবার থেকে বাইআত নেন।

সাহাবিরা যেসব বিষয়ে নবিজির সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আকাবার দ্বিতীয় বাইআতে উল্লেখিত ধারা ও শর্ত সম্পর্কে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিস্তারিত একটি হাদিস বর্ণনা করেন। জাবির বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুলকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কোন বিষয়ের ওপর আমরা আপনার হাতে বাইআত নিচ্ছি? তিনি বলেন—

» অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মানবে।

» অভাব বা সচ্ছলতা, যে অবস্থায়ই থাকো না কেন, সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দানে কখনোই কৃপণতা করা যাবে না।

» ভালো কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করবে।

» আল্লাহর জন্য যেকোনো কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে—এক্ষেত্রে কারও পরোয়া করা যাবে না।

» তোমাদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে ও সর্বাত্মক নিরাপত্তা দেবে—যেভাবে নিজের পরিবার ও স্ত্রী-সন্তানকে সাহায্য করো ও নিরাপত্তা দাও। বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের জান্নাত দেবেন।[২]

তবে ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ কাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে এ বিষয়ক যে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সেখানে কেবল এখানকার শেষ ধারাটি আছে। সেই হাদিসটির বিবরণ হচ্ছে—কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যের পর যখন

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪১-৪৪২

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৪৫৬; এই বর্ণনাটির সনদ হাসান। *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪২৫১; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১৪০৫; ইমাম হাকিম ও ইবনু হিব্বান হাদিসটিকে সহিহ আখ্যা দিয়েছেন। *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, পৃষ্ঠা : ১৫৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫৪

আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাই, তখন আল্লাহর রাসুল কথা বলা শুরু করেন। প্রথমে তিনি কুরআনুল কারিম থেকে তিলাওয়াত করেন, আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের অনুরাগী করে তোলেন। তারপর বলেন, 'তোমরা যেভাবে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের রক্ষা করো, সেভাবে আমাকেও রক্ষা করবে। এর ওপরই আমি তোমাদের থেকে বাইআত গ্রহণ করছি।'

বারা ইবনু মারুর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে বলেন, 'ওই সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে নবি করে পাঠিয়েছেন, আপনাকে আমরা ঠিক সেভাবেই রক্ষা করব, যেভাবে আমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করি। হে আল্লাহর রাসুল, মেহেরবানি করে আপনি আমাদের বাইআত নিন। আমরা অকুতোভয় যোদ্ধা জাতি, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমরশাস্ত্রে ও রণকৌশলে আমরা পারদর্শিতা দেখিয়ে আসছি।'

বারার কথার মাঝখানে আবু হাইসাম ইবনু তিহান বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, মদিনার ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের কিছু চুক্তি আছে, আমরা সেই চুক্তিগুলো এখন ভেঙে ফেলছি। পরবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তাআলা আপনাকে বিজয় দান করবেন, আপনি আমাদের ফেলে রেখে আবার নিজের গোত্রের কাছে ফিরে যাবেন না তো?' নবিজি তার কথা শুনে মৃদু হেসে বলেন, 'আমৃত্যু আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব, তোমরা আমার, আমি তোমাদের। তোমরা যার বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে, আমিও সন্ধি করব তাদের সঙ্গে।'[১]

বাইআতের ঝুঁকি এবং সাহাবিদের গুরুত্ব

বাইআতের শর্ত ও ধারা নিয়ে আলোচনা শেষ হলে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি শুরু হয়। এ সময় নবুয়তের একাদশ ও দ্বাদশ বছরের হজ-মৌসুমে যারা নবিজির হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্য থেকে দুজন মুসলিম দাঁড়িয়ে যান। এই চুক্তির কারণে ভবিষ্যতে আরও কী কী সংকট তৈরি হতে পারে, সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেন যাতে উপস্থিত সবাই নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নিতে যাওয়া দায়িত্বের গুরুভার উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেজন্য ভবিষ্যতে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া লাগতে পারে, তার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারেন। এসব দিক বিবেচনায় না নিয়ে, এটাকে সাধারণ কোনো চুক্তি মনে করলে, পরে আক্ষেপ করা লাগতে পারে, তারা দুজনেই বেশ জোর দিয়ে বিষয়টি সবাইকে বুঝিয়ে বলেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, লোকেরা বাইআতের জন্য সমবেত হলে আব্বাস ইবনু উবাদা ইবনি নাদালা সবাইকে ডেকে বলেন, 'তোমরা কি জানো, এই বাইআতের পরিণতি

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪২

কী হবে? তোমরা কিন্তু জেনে-বুঝেই পুরো আরবজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছ। তোমাদের মধ্যে যদি এই ভয় থাকে—তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠিত হবে, তোমাদের অভিজাত মানুষেরা বিপন্ন হবে; এমনকি তোমরা নিজেদের ভূমি থেকে উচ্ছেদও হতে পারো, তাহলে তোমরা বাইআতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ো না। এমনটা করলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত—দুটোই হারাবে। আর যদি জানমালের পরোয়া না করে তোমরা এই নতুন বার্তার গুরুভার নিতে পারো, তবে আল্লাহ কসম করে বলছি—এই বাইআত তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সফলতা নিয়ে আসবে।'

আব্বাস ইবনু উবাদার কথা শেষ হলে উপস্থিত লোকেরা বলেন, 'আমরা জানি আমাদের সম্পদ নষ্ট হবে, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তির জীবনও বিপন্ন হতে পারে, তবু আমরা জেনেশুনেই এই বাইআত গ্রহণ করছি। আমরা যদি এই ওয়াদা বাস্তবায়ন করি, তাহলে আমরা এর বিনিময়ে কী পাব?' নবিজি বলেন, 'জান্নাত।' তারা এই উত্তর শুনে নবিজিকে হাত বাড়াতে অনুরোধ করেন। তারপর তার হাতে হাত রেখে সবাই বাইআত গ্রহণ করেন।[১]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসুলের হাতে বাইআত নিতে যাচ্ছি, এমন সময় আসআদ ইবনু যুরারা, যিনি ছিলেন আগত ৭০ জন মানুষের ভেতর সর্বকনিষ্ঠ, আল্লাহর রাসুলের হাত ধরে ইয়াসরিববাসীকে বলতে থাকেন—হে ইয়াসরিববাসী, এখনো সময় আছে, একটু ভেবেচিন্তে অগ্রসর হও। আমরা এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি; কারণ আমরা হৃদয়ের গভীর থেকে বিশ্বাস করি—তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আমাদের সঙ্গে তার মদিনায় যাওয়ার অর্থই হচ্ছে—পুরো আরবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিজেদের জীবন, সম্পদ ও আবাসভূমি নিয়ে বিপদে পড়া। তোমরা যদি এসব কিছু মেনে নিতে পারো, তাহলে আল্লাহর রাসুলকে তোমাদের সঙ্গে নাও। অবশ্যই এর প্রতিদান তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে পাবে। আর যদি নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে ভয়ে থাকো, তাহলে এখনই ভিন্ন সিদ্ধান্ত নাও। মদিনায় গিয়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে এখনই এটার সুরাহা হয়ে যাওয়া ভালো। এতে পরকালে আল্লাহর কাছে খোঁড়া একটা অজুহাত অন্তত দাঁড় করাতে পারবে।'[২]

নবিজির হাতে যারা বাইআত হলেন

বাইআতের শর্ত এবং সেগুলোর সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে বিস্তর আলাপ-আলোচনার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফার মাধ্যমে বাইআত নিতে শুরু করেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৬

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬৫৩; হাদিসটি সহিহ।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আসআদ ইবনু যুরারার সতর্কীকরণ-বক্তব্যের পর তাকে উদ্দেশ্য করে লোকজন বলে, 'এবার তুমি হাত সরাও, আমাদের বাইআত নিতে দাও। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা এই বাইআত ছাড়ব না, আল্লাহর রাসুলের হাতে আমরা অঙ্গীকার করবই করব।'[১]

আসআদ বুঝতে পারলেন, এরা ভেবেচিন্তেই আল্লাহর রাসুলের হাতে হাত রাখছে এবং মানসিকভাবেও যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। ইয়াসরিবের লোকজন কি বাস্তবিক অর্থেই বাইআত নিচ্ছে নাকি খানিকটা জোশ ও আবেগের ঝোঁকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে—সে ব্যাপারে তার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। মূলত তার সহযোগিতায়ই ইয়াসরিবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটে। মুসআব ইবনু উমাইর তার বাড়িতেই মেহমান ছিলেন, তার ঘরে অবস্থান করেই দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করতেন তিনি। আজকে যারা নবিজির হাতে হাত রেখে বাইআত নিচ্ছে, তাদের বড় পথপ্রদর্শক তিনি। এ যাত্রায় তিনিই সবার আগে বাইআত নেন।

দ্বিতীয় বাইআতে সবার আগে নবিজির হাতে হাত রাখেন আবু উমামা আসআদ ইবনু যুরারা।[২] তারপর অন্যদের বাইআত শুরু হয়। আমরা একে একে দাঁড়াই। নবিজি আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেন।[৩]

এই কাফেলায় দুই জন নারীও ছিলেন। নবিজি তাদের কাছ থেকে কেবল মৌখিক বাইআত গ্রহণ করেন। তিনি তাদের সঙ্গে কোনো রকমের মুসাফা করেননি। শুধু তা-ই নয়, নবিজি কখনোই কোনো পরনারীর সঙ্গে হাত মেলাননি।[৪]

১২ জন আমির নির্বাচন

বাইআত প্রদান শেষ হলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিতদের মধ্য থেকে ১২ জন ব্যক্তি নির্বাচন করেন, যারা নিজ সম্প্রদায়ে বাইআতের এই দফাগুলো বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন। দ্বীনপ্রচারের ক্ষেত্রে সব ধরনের বাধা-বিপত্তি দূর করবেন এবং মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাজ করে যাবেন। সেই মজলিসেই ১২ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়, যাদের ৯ জন খাযরাজের, আর ৩ জন আউসের। তারা হলেন—

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৭

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৬৫৩; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ১৮৬৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৭৫

খাযরাজদের আমির

১. আসআদ ইবনু যুরারা

২. সাদ ইবনু রবি ইবনি আমর

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা ইবনি সালাবা

৪. রাফি ইবনু মালিক ইবনি আজলান

৫. বারা ইবনু মারুর ইবনি সাখার

৬. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনি হারাম

৭. উবাদা ইবনুস সামিত ইবনি কাইস

৮. সাদ ইবনু উবাদা ইবনি দুলাইম

৯. মুনজির ইবনু আমর ইবনি খুনাইস

আউসদের আমির

১০. উসাইদ ইবনু হুদাইর ইবনি সাম্মাক

১১. সাদ ইবনু খাইসামা ইবনি হারিস

১২. রিফাআ ইবনু আব্দিল মুনজির ইবনি যুবাইর

এদের নির্বাচন করার পর নবিজি জিম্মাদার হিসেবে এদের থেকে আলাদা একটি প্রতিশ্রুতি নেন। তিনি বলেন, 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের সঙ্গীরা যেমন জিম্মাদার ছিলেন, তোমরাও তেমনই আমার পক্ষ থেকে ইয়াসরিবের জিম্মাদার। আর আমি গোটা উম্মতের জিম্মাদার।'

তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমরা জিম্মাদারি বুঝে নিলাম।'[১]

শয়তান সবকিছু ফাঁস করে দিল!

আকাবার গিরিপথের গোপন বৈঠক তখন শেষের দিকে। সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যাবে, এমন সময় এক শয়তান টের পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে—এত কম সময়ে কুরাইশ-নেতাদের ঘুম থেকে তুলে এনে এখানকার সবাইকে হত্যা করা অসম্ভব। তাই একটি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সে গগনবিদারী চিৎকার জুড়ে দেয়—'যারা ঘরে শুয়ে আছ,

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৩-৪৪৬

শোনো, তোমরা কি মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গী বেদ্বীনদের খবর জানতে চাও? ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে।'

নবিজি চিৎকার শুনেই শয়তানটাকে চিনে ফেলেন। সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এ হচ্ছে আকাবার শয়তান। তারপর শয়তানকে সম্বোধন করে বলেন, 'শোন আল্লাহর শত্রু, তোকে আমি দেখে নেব!' এরপর তিনি সবাইকে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করে যার যার জায়গায় চলে যেতে বলেন।[১]

জিহাদের জন্য মানসিক প্রস্তুতি

শয়তানের ঘোষণা শোনার পর আব্বাস ইবনু উবাদা ইবনি নাদালা নবিজিকে প্রস্তাব দেন—'আপনাকে যিনি সত্য-সহ পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি যদি আমাদের হুকুম দেন, তাহলে আগামীকালই আমরা কুরাইশদের এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব।' জবাবে নবিজি বলেন, 'এরকম কোনো নির্দেশ আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। তাই এই হুকুম আমি তোমাদের দিতে পারি না। তোমরা নিজেদের অবস্থান-স্থলে চলে যাও।' নির্দেশ অনুসারে তারা নিজ নিজ তাঁবুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভাঙলে দেখেন, অপূর্ব সুন্দর এক সকাল তাদের স্বাগত জানাচ্ছে।[২]

দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলে

সে রাতেই কুরাইশদের কাছে এই গোপন বৈঠকের খবর পৌঁছে যায়। শুনে রাগে-ক্ষোভে তারা ফেটে পড়ছিল। দুঃখে চৈতন্য হারিয়ে ফেলার উপক্রম তাদের। এই বাইআতের কারণে ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদের ওপর কীরকম প্রভাব পড়তে পারে—তার হিসেব করতে সময় লাগে না কারও। সকাল হতে না হতেই তাই কুরাইশ নেতারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যায় ইয়াসরিবের দায়িত্বশীলদের তাঁবুর দিকে। উদ্দেশ্য—তারা যে চুক্তি করেছে, সে ব্যাপারে তাদের কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা। গন্তব্যে পৌঁছেই শুরু হয় তাদের ভূমিকাহীন হুংকার—

'হে খাযরাজবাসী, আমরা জানতে পেরেছি, কোনো এক গোপন বৈঠকে তোমরা মুহাম্মাদের সাথে মিলিত হয়েছ। তোমরা কি আমাদের সামনে দিয়ে তাকে তোমাদের সঙ্গো নিয়ে যাবে? তোমরা নাকি তার কাছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছ? আমরা কোনোভাবেই চাই না—তোমাদের সঙ্গো আমাদের কোনো যুদ্ধ হোক।'[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৮

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৮

আকাবার বৈঠক যেহেতু গোপনে রাতের অন্ধকারে হয়েছে, তাই কাফেলার খাযরাজি মুশরিকরাও এই ব্যাপারে কিছুই জানত না। ফলে কুরাইশদের অভিযোগ শোনামাত্রই তারা আল্লাহর কসম করে তাদের দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, এমন কিছু আমরা জানি না। আপনাদের বোধ হয় কোথাও ভুল হচ্ছে।'

কুরাইশরা এবার বিষয়টি নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলের কাছে যায়। সে বলে, 'এটা ভুল কথা। এমনটা হওয়ার কথাই না; আমার সম্প্রদায় এমন কিছু করতেই পারে না। যদি কিছু করতই, তবে অবশ্যই আমার সাথে পরামর্শ করত, সেটা না হলেও ঘটনাটা অন্তত জানতে পারতাম।'

এভাবে যখন জেরা চলছিল, তখন এ ব্যাপারে কিছুই জানে না—এমন একটা ভাব ছিল খাযরাজি মুসলিমদের চেহারায়। একটুখানি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকেন। হ্যাঁ বা না—কিছুই বলে না তারা। মক্কায় আগত খাযরাজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলার পর কুরাইশ-নেতারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়—এমন কোনো কিছুই আসলে ঘটেনি। ফলে ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় তারা।

অবশেষে সবাই নিরাপদ

প্রথম দফায় সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলেও কুরাইশদের দ্বিধা কাটছিল না—গতরাতের সংবাদটি সত্য নাকি মিথ্যা—নিশ্চিত হতে পারছিল না তারা। তাই জনে জনে তদন্ত করছিল, পুরো মক্কা শহরে নেমে পড়েছিল অনুসন্ধানী দল। অবশেষে নিশ্চিত হওয়া গেল—সংবাদ সত্যিই, মিনার কাছে আকাবায় সেই বৈঠক হয়। সেখানে ইয়াসরিবের কিছু লোক থেকেও মুহাম্মাদ বাইআত নেয়। কিন্তু ততক্ষণে বহু দেরি হয়ে গেছে। হাজিরা বেরিয়ে পড়েছে নিজেদের গন্তব্যে। তাই কালবিলম্ব না করে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে ইয়াসরিবের লোকেদের পিছু নিতে শুরু করে।

দূরদিগন্তে শেষপর্যন্ত সাদ ইবনু উবাদা এবং মুনজির ইবনু আমরকে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের ধরার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে কুরাইশের লোকজন। মুনজির পালাতে সক্ষম হলেও ধরা পড়ে যান সাদ। তার নিজের বাহনের রশি দিয়ে তাকে বেঁধে মক্কায় নিয়ে আসা হয়। তারা তাকে অমানুষিক নির্যাতন করে এবং টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসে। মক্কার দুই ব্যবসায়ী মুতইম ইবনু আদি ও হারিস ইবনু হারাম ইবনি উমাইয়ার ব্যবসায়ী কাফেলাকে সাদ মদিনার পথে সুরক্ষা দিত। তাই তারা এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেন।

এদিকে ইয়াসরিবে পৌঁছে আনসাররা শলাপরামর্শ শুরু করেন—কীভাবে তাদের ছাড়িয়ে আনা যায়। এরই মাঝে দেখা গেল সাদ ফিরে আসছেন। তার ফিরে আসার মধ্য দিয়ে

মদিনার সকল হজযাত্রী নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে।[১]

এই দ্বিতীয় বাইআতটি ইতিহাসে আল-আকাবাতুল কুবরা (বড় বাইআত) নামে পরিচিত। ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার আবেগঘন একটি পরিবেশে ঐতিহাসিক আকাবার বাইআত সংঘটিত হয়। মক্কার দুর্বল মুসলিমদের করুণ অবস্থা দেখে তারা মানসিকভাবে বেশ আঘাত পায়। এই দ্বীনি ভাইদের প্রতি তাদের ভালোবাসা দ্বিগুণ হতে থাকে। তাদের ওপর অবর্ণনীয় জুলুমের চিত্র দেখে মদিনায় এসে তারা তাদের জন্য কিছু করার চিন্তা শুরু করে। কেবল মহান আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর রাসুলের ভালোবাসার কারণে তাদের প্রতি নিঃস্বার্থ একটা প্রীতি জায়গা করে নেয় তাদের মনে।

তাদের এই প্রীতি-ভালোবাসা নিছক ক্ষণস্থায়ী কোনো মনের আকর্ষণ থেকে ছিল না, যা কালের স্রোতে ঘটনার পালাবর্তনে হারিয়ে যাবে। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অনড় বিশ্বাস ও ঈমানই ছিল এই ভালোবাসার মূল উৎস ও ঝরনামুখ। এই ঈমান এমনই শক্তিশালী, যা পৃথিবীর কোনো পরাশক্তি বা অত্যাচারী—কাউকেই পরোয়া করে না। এই ঈমানের ঝড় যখন বইতে শুরু করে, তখন অত্যাচারীর মসনদ নিমিষেই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। এই ঈমানের বল ও শক্তিতেই যুগের পাতায় মুসলিমরা নিজেদের অমর করে রেখেছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসে এমন অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা এর আগে কোনো জাতির পক্ষে সম্ভব হয়নি; এমনকি ভবিষ্যতেও কোনোদিন সম্ভব হবে না।

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৮-৪৫০

হিজরতের সূচনা

দ্বিতীয় আকাবা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আর এরই মধ্য দিয়ে সূচনা হয় নতুন এক রাষ্ট্রের, কুফর-শিরকের বিশাল এই মরুভূমির এক টুকরো জমিতে গড়ে উঠবে শিরকমুক্ত সমাজ, যা আল্লাহর ইবাদত করার জন্য হবে সবচেয়ে উপযুক্ত ভূমি। ইসলামের দাওয়াতের সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অর্জন এটিই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভূমির উদ্দেশে হিজরত করার জন্য মুসলিমদের নির্দেশ প্রদান করেন।

হিজরত এক অবর্ণনীয় বিসর্জনের নাম। প্রাণ, সম্পদ ও ভবিষ্যৎকে কুরবানি করার নাম হিজরত। যারা হিজরত করছিলেন, তারা নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্পদ তো বিসর্জন দিচ্ছিলেনই; অন্যদিকে ইয়াসরিবে যাওয়ার পথে যেকোনো সময় কাফিরদের হাতে ছিল প্রাণনাশের ভয়। দুরুদুরু বক্ষে এক অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন তারা। মক্কা ছাড়ার পর অনবরত শঙ্কার মধ্যে দিয়েই রাতের গভীরে পরিবার-সহ পাড়ি দিতে হবে এক বিশাল মরুপথ।

সবকিছু জেনেই মুসলিমরা নবিজির নির্দেশে হিজরত করেন। মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ইয়াসরিবের উদ্দেশে। মুশরিকরা সম্ভাব্য বিপদ-চিন্তায় তাদের যাত্রাপথে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে শুরু করে। কিছু ঘটনা পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরা হলো—

[এক] আবু সালামা ছিলেন প্রথম হিজরতকারীদের একজন। ইবনু ইসহাক বলেন, আকাবার দ্বিতীয় বাইআতের এক বছর আগে তিনি ইয়াসরিবে হিজরত করেন। তাকে তার স্ত্রী ও সন্তান মক্কায় রেখে একাকীই চলে যেতে হয়েছিল। তিনি ইয়াসরিবের উদ্দেশে যখন রওনা হবেন, তখন তার স্ত্রীপক্ষের আত্মীয়স্বজন বলল, ‘তুমি স্বাধীন মানুষ, তোমার ওপর আমাদের কোনো অধিকার নেই; তবে আমাদের মেয়েকে তোমার

সঙ্গো ওই দূরদেশে যেতে দেব না।'

এই অজুহাত দেখিয়ে তার স্ত্রীকে তার সঙ্গো যেতে না দিয়ে মক্কায় আটকে রাখা হয়। তাদের কর্মকাণ্ডে আবু সালামার আত্মীয়স্বজনরাও বেশ চটে যায়, তারাও বলে ওঠে, 'তোমরা আবু সালামার স্ত্রীকে রেখে দিয়েছ! আমরাও তার সন্তান তোমাদের দেব না।' দু-পক্ষের ধস্তাধস্তি ও টানাটানি করতে করতে তাদের থেকে ছেলের হাত ছুটে যায় এবং আবু সালামার আত্মীয়রা ছেলেকে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আবু সালামা একাই রওনা হয়ে যান।

স্বামী ও সন্তান হারিয়ে উম্মু সালামা তখন দিশেহারা। প্রতিদিনই তিনি আবতাহে গিয়ে সারা সকাল কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যায় ফিরতেন। এভাবে ১ বছর চলে যায়। তার অবস্থা দেখে এক আত্মীয়ের মায়া হয়। তিনি গোত্রের লোকদের বলতে শুরু করেন, 'এর জন্য কী তোমাদের একটুও দয়া হয় না? ছেলেসন্তান হারিয়ে কান্না করতে করতে ও তো মরেই যাবে। ওকে ছেড়ে দাও।' তারা তাকে ছেড়ে দেয়।

আবু সালামার আত্মীয়রাও তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়। ছেলেকে সাথে নিয়ে উম্মু সালামা মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব ৫০০ কিলোমিটার। ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে তিনি একাই বের হয়ে পড়েন। পথে তানইম নামক স্থানে দেখা হয় উসমান ইবনু তালহা ইবনি আবি তালহার সঙ্গো। তার অবস্থা জানতে পেরে তিনি তাকে মদিনায় পৌঁছে দেন। কুবার বসতি চোখে পড়লে তিনি তাকে বলেন, 'তোমরা স্বামী এখানেই আছেন। আল্লাহর নাম নিয়ে যাও, আল্লাহ তোমার সহায় হোন।' তিনি তাকে পৌঁছে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন।[১]

[দুই] সুহাইব হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাকে দেখে কুরাইশেরা বলল, 'যখন তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে, তুমি ছিলে নিঃস্ব। তোমার কোনো সম্পদ ছিল না, এখানে ব্যবসা করে অর্থসম্পদ কামিয়ে এখন সবকিছু নিয়ে চলে যাবে? আল্লাহর কসম এত সহজে তুমি যেতে পারবে না।'

তখন সুহাইব তাদের কাছে একটি প্রস্তাব দেন—'আমি যদি আমার ধনসম্পদ তোমাদের দিয়ে দিই, তাহলে কি আমাকে যেতে দেবে?'

তারা এই প্রস্তাব মেনে নেয়। তিনি তার সমস্ত সম্পদ তাদের দিয়ে মদিনার দিকে রওনা হন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনা জানতে পেরে বলেন, 'সুহাইব এই লেনদেনে লাভবান হয়েছে। এমন লাভজনক চুক্তি খুব কম মানুষই করতে পারে।'[২]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৬৮-৪৭০

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৭

[তিন] মদিনায় হিজরতের উদ্দেশে উমার ইবনুল খাত্তাব, আইয়াশ ইবনু আবি রবিআ ও হিশাম ইবনুল আস ইবনি ওয়ায়িল একত্রে একটি স্থান নির্বাচন করেন। ভোরবেলা সেখান থেকেই মদিনার উদ্দেশে রওনা করার পরিকল্পনা করেন তারা। উমার ও আইয়াশ যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারলেও হিশাম এসে পৌঁছতে পারেননি। তিনি পথিমধ্যে কুরাইশদের হাতে ধরা পড়ে যান। উমার ও আইয়াশ রওনা করেন। মদিনায় প্রবেশের আগে তারা যখন কুবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন আবু জাহল ও তার আপন ভাই হারিস তাদের কাছে আসে। তারা দুই সহোদর ও আইয়াশ ছিলেন বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন পিতার ঔরসে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন।

আইয়াশ ছিলেন খুবই মা-ভক্ত। আর এই সুযোগটাই নেয় আবু জাহল আর হারিস। তারা তাকে বলল, 'তোমার মা কসম করেছেন, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি আর কখনো চুল আঁচড়াবেন না। এমনকি রোদে পুড়বেন, তবু কোনোদিন ছায়াতে যাবেন না।' তখন আইয়াশের মন হু-হু করে কেঁদে ওঠে। উমার তার অবস্থা দেখে বললেন, 'আইয়াশ, এরা তোমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এখানে এসেছে। তোমাকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেওয়াই ওদের মূল লক্ষ্য। তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও। শোনো ভাই, তোমার মায়ের মাথায় যদি উকুন বেড়ে যায়, তাহলে তিনি এমনিতেই চুল আঁচড়াবেন। আর মক্কার এই প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে না পেরে একটা সময় ঠিকই ছায়াতে যেতে বাধ্য হবেন। তাই এসব নিয়ে অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই ভাই।'

কিন্তু আইয়াশ উমারের কথা কানে নিল না। সে মায়ের কসম ভাঙানোর জন্য তখনই রওনা হয়ে গেল। উমার তার অবস্থা দেখে বললেন, 'তুমি যেহেতু যেতেই চাচ্ছ, তবে আমি আর বাধা দিচ্ছি না। তুমি আমার উটনীটা নিয়ে যাও। এটা খুবই ভালো জাতের এবং বেশ বাধ্যও বটে। ওদের আচার-আচরণ যদি সন্দেহজনক মনে হয়, তাহলে দ্রুত সরে আসবে।'

আইয়াশ উটনীটি নিয়ে তাদের সঙ্গে রওনা করেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আবু জাহল তাকে বলে, 'ভাই, আমার উটের ওপর বেশি চাপ পড়ে গেছে। তুমি কি তোমার পেছনে আমাকে ওঠাবে?'

আইয়াশ তাকে নেওয়ার জন্য উটনীকে বসায়। তারা দুই সহোদরও নিজেদের উট থামিয়ে দেয়। আইয়াশের উটনী একটু নিচু হতেই তারা দুজন মিলে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে শুরু করে এবং নাজেহাল করে ছাড়ে একেবারে। তারপর শক্ত করে বাঁধে। পরদিন ভোরবেলা বাঁধা অবস্থায় তাকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। এরপর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে—'আমরা আমাদের এই নির্বোধগুলোর সঙ্গে যেমন আচরণ করেছি, তোমরাও একই আচরণ করো তোমাদের নির্বোধগুলোর সঙ্গে।'[১]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৪-৪৭৬; *মুসনাদুল বাযযার,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৫৮

মুশরিকেরা কারও হিজরতের কথা শুনতে পারলে কী কাণ্ড ঘটাত, তা বোঝার জন্য আমরা ৩টি নমুনা ওপরে তুলে ধরলাম। উদাহরণ হিসেবে যাদের কথা এখানে এনেছি, তাদের সবাই ছিলেন বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর। তবুও তারা কেউই তাদের নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি।

এত কিছুর পরও তারা মুসলিমদের হিজরতের ঢল থামাতে পারেনি, নিশ্চিত বিপদের কথা জেনেও মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে ইয়াসরিবের পথ ধরেছে। শুধু নবিজি, আবু বকর ও আলি—এই ৩ জন ছাড়া আকাবার বড় বাইআতের দুই-আড়াই মাস পর মক্কায় আর কোনো মুসলিম ছিল না। অবশ্য তারা ছাড়াও আরও কয়েকজন মুসলিম ছিলেন, যাদেরকে মুশরিকরা বন্দি করে রেখেছে। এদিকে নবিজিও হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন আল্লাহর নির্দেশের। আর আবু বকর প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অপেক্ষায় ছিলেন নবিজির নির্দেশের।[১]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, 'আমি তোমাদের হিজরতের স্থান দেখতে পেয়েছি, দুটি পাহাড়ের মাঝে খেজুরবৃক্ষ-সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। তোমরা মদিনায় হিজরত করো।' যারা হাবশার ভূমিতে হিজরত করেছিল, তারাও সেখান থেকে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। নবিজির নির্দেশ শুনে আবু বকরও হিজরতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। নবিজি তাকে বলেন, 'একটু অপেক্ষা করো। আল্লাহ আমাকেও নির্দেশ দেবেন মক্কা ছাড়ার।' নবিজির কথা শুনে আবু বকর বলেন, 'আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক। আপনি কি চান আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব?' নবিজি বলেন, 'হ্যাঁ।' আবু বকর নবিজির সঙ্গে যাওয়ার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকেন। প্রস্তুতি হিসেবে কিনেছেন দুটি উট, দীর্ঘ ৪ মাস ধরে সেগুলোর পরিচর্যাও করতে থাকেন তিনি।[২]

কুরাইশ নেতাদের এক গোপন বৈঠক!

মুসলিমরা একে একে মক্কা ছেড়ে মদিনার দিকে রওনা হয়। সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল, সঙ্গে করে অভুক্ত পরিবার ও সন্তান নিয়ে তারা আউস ও খাযরাজের মুসলিমদের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের পরিকল্পনামাফিক দেশত্যাগ এবং নতুন আবাসে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া দেখে মক্কার মুশরিকরা বিচলিত হয়ে পড়ে। তারা তাদের ভবিষ্যৎ-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখতে পায়। যেকোনো সময় তাদের পৌত্তলিক ধর্মাচার এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ভিত্তি ধসে যেতে পারে—এসব ভেবে ভেবে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা শুরু হয়।

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৫; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ২৬৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৬২৬

তারা ভালোভাবেই জানে, মুহাম্মাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে, সেইসঙ্গে তার দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বগুণ তো আছেই। অন্যদিকে তার অনুসারীদের মাঝে পাহাড়সম দৃঢ়সংকল্প, অবিচলতা ও আত্মত্যাগ, এখন যুক্ত হলো আউস ও খাযরাজ গোত্রের সমরশক্তি ও রণকৌশল; যার সামনে তারা টিকে থাকতে পারবে না। আউস ও খাযরাজের মধ্যে দীর্ঘদিনের চলমান গৃহযুদ্ধও শেষ হয়ে গেছে। তাদের মাঝে এখন ভাই-ভাই সম্পর্ক। যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ ছুড়ে ফেলে সন্ধি ও সম্প্রীতির বন্ধন আবারও দৃঢ় ও মজবুত হয়েছে।

তাদের আরেকটা চিন্তার বিষয় হলো—কৌশলগত দিক থেকে মদিনার ভৌগোলিক অবস্থান, লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে যে বাণিজ্যিক রাস্তাটি ইয়েমেন ও শামকে[১] একসুতোয় বেঁধে রেখেছে, তা মদিনা-সংলগ্ন। মক্কার ব্যবসায়ীরা এতদিন এই রাস্তা দিয়েই শামের সাথে বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার লেনদেন করে আসছিল। এটা শুধু মক্কার ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক হিসেব। এছাড়াও তায়েফবাসী ও অন্যান্য স্থানের লোকেরাও একই রাস্তায় ব্যাবসায়িক কাজ-কারবার পরিচালনা করত। এই পথের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপরই নির্ভর করছে মক্কার কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য। তাই সব মিলিয়ে মদিনায় ইসলামের দাওয়াতকেন্দ্র হয়ে ওঠা তাদের জন্য অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

তারা ভবিষ্যৎ এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম খুঁজতে থাকে। এই বিপদের একমাত্র উৎস ইসলামি দাওয়াতের ঝান্ডাবাহক মুহাম্মাদ। তাকে শেষ করে দিতে পারলেই কেল্লাফতে। তাই, চিরতরে তাকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করে তারা।

নবুয়তের চতুর্দশ বছরের কথা। ২৬ সফর অনুসারে ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর[২] রোজ বৃহস্পতিবার আকাবার বড় বাইআতের প্রায় আড়াই মাস পরের ঘটনা। সেদিন সকালে মক্কার দারুন নাদওয়ায় একটি জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। আরবের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ অধিবেশন। কুরাইশের প্রতিটি গোত্রের প্রতিনিধি অংশ নেয় এতে। তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল—ইসলামি দাওয়াতের প্রধান ব্যক্তি মুহাম্মাদকে কীভাবে সহজে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় এবং কীভাবে তার আনীত ধর্মের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়। কুরাইশের যে নেতারা এই অধিবেশনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছিল, তাদের বিশিষ্ট জনদের নাম এখানে তুলে ধরা হলো—

---

[১] বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ফিলিস্তিন প্রাচীন শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। [*আল-মাআলিমুল আসিরাহ ফিস সুন্নাহ ওয়াস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ১৪৭]

[২] এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে *রহমাতুল-লিল আলামিন* গ্রন্থে উল্লেখিত গবেষণাগুলো যাচাইয়ের মাধ্যমে। [দেখুন, *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৫-১০২; খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭১]

১. আবু জাহল ইবনু হিশাম (বনু মাখযুম)

২. যুবাইর ইবনু মুতইম, তুআইমা ইবনু আদি, হারিস ইবনু আমির (বনু নাওফাল ইবনু আব্দি মানাফ)

৩. রবিআর দুই ছেলে শাইবা ও উতবা, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব (বনু আব্দি শামস ইবনি আব্দি মানাফ)

৪. নজর ইবনুল হারিস। এই সেই লোক, যে আল্লাহর রাসুলের ওপর সালাতরত অবস্থায় উটের নাড়িভুঁড়ি ছুড়ে মেরেছিল (বনু আব্দিদ দার)।

৫. আবুল বাখতারি ইবনু হিশাম, যামআ ইবনুল আসওয়াদ ও হাকিম ইবনু হিযাম (বনু আসাদ ইবনি আব্দিল উযযা)

৬. হাজ্জাজের দুই পুত্র নাবিহ এবং মুনাব্বি (বনু সাহম)

৭. উমাইয়া ইবনু খালফ (বনু জুমাহ)

অধিবেশনের নির্ধারিত সময়ে সবাই উপস্থিত হয়। ইবলিসও সেখানে হাজির হয় একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের আকৃতি নিয়ে। তার পরনে ছিল আরবীয় জুব্বা। সে সভাকক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চায়। উপস্থিত কেউ তাকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন, ‘জনাব, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?’ সে বলে, ‘আমি নাজদের একজন বৃদ্ধ মানুষ। তোমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আমি অবগত, এখানে এসেছি তোমাদের পরামর্শ সভায় যোগ দিতে। হতে পারে, আমার কোনো অভিমত ও অভিজ্ঞতা তোমাদের কাজে আসবে।’ তার বক্তব্য শুনে উপস্থিতরা বলে, ‘আপনি চাইলে ভেতরে আসতে পারেন।’

নবিজিকে হত্যার পরিকল্পনা

সভা শুরু হয়। আগামী দিনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিপত্তির সংকট থেকে উত্তরণের পথ নিয়ে সবাই যার যার মতামত পেশ করতে থাকে। আলোচনা গড়াতে গড়াতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। আবুল আসওয়াদ মতামত দেন, তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিই, কোথাও গিয়ে মরল না বাঁচল; সেটার কোনো পরোয়া না করলেই হয়। সে এখানে থাকলে দিনদিন সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকবে। আর নির্বাসনে গেলে মক্কার অবস্থা আগের মতো হয়ে উঠবে।

তখন নাজদের ছদ্মবেশী ইবলিস বলে ওঠে, ‘এটা কোনো ভালো কাজ হবে না। আরে তোমরা কি তার কথার মাধুর্য, অমায়িক ব্যবহার এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে গেছ? তাকে যদি এভাবে ছেড়ে দাও, তাহলে সে যেখানেই যাবে, সেখানেই তার দল ভারী করবে। তারপর তার নতুন সহচরদের নিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের দেশের

মাটিতেই পিষে ফেলবে, নেবে এত দিনের প্রতিশোধ।'

আবুল বাখতারি বললেন, 'তাকে একটা লোহার খাঁচায় আবন্ধ করে রাখা যায়। মৃত্যুর আগে সে এই বন্দিদশা থেকে কোনোভাবেই যেন মুক্তি না পায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

ইবলিস এবারও আপত্তি জানায়, 'এই প্রস্তাবও তেমন একটা কার্যকরী মনে হচ্ছে না। তাকে যদি কারারুন্ধ করা হয়, তাহলে তার অনুসারীরা দিনদিন বাড়তে থাকবে। তারপর তারা একসময় আমাদের ওপর হামলা করে তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তখন তার নেতৃত্বে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কারও কাছে কি এটা ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাব আছে?'

এই দুটি মত যখন প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন অন্তর-কাঁপানো জঘন্য এক প্রস্তাব পেশ করে আবু জাহল, কিন্তু সভাসদদের সবাই সেটা এক বাক্যে মেনে নেয়। সে ভূমিকা টেনে বলতে শুরু করে, 'আল্লাহর কসম, আমার মাথায় এমন একটি পরিকল্পনা এসেছে, যেটা তোমাদের কারও মাথায়ই আসেনি। আমি বলি কি, মক্কার প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে তাগড়া যুবক নিয়ে একটা দল গঠন করব; সবার হাতে থাকবে ধারালো তলোয়ার। তারপর সবাই একসঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করবে, একযোগে তার ওপর হামলা চালিয়ে মেরে ফেলবে তাকে। এমনটি করার কারণ হচ্ছে, এই হত্যার দায় তখন মক্কার প্রতিটি গোত্রের কাঁধে সমানভাবে পড়বে। তারপর তার গোত্র বনু আব্দি মানাফ চাইলেই সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পারবে না। তাই তারা রক্তপণ চাইতে বাধ্য হবে। আমরা সবাই মিলে রক্তপণ দিয়ে দেব।'

আবু জাহলের প্রস্তাব শুনে নাজদের সেই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ওরফে ইবলিস বলে ওঠে, 'এটাই সবচেয়ে উত্তম প্রস্তাব। এর চেয়ে ভালো মত আর হতে পারে না।'

দারুন নাদওয়ার সবাই আবু জাহলের এই অন্যায় মতটি নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। তাৎক্ষণিকভাবে তারা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্যোগ নেয় এবং অধিবেশন সমাপ্ত হয়।[১]

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮০-৪৮২

আল্লাহর আদেশে মদিনায় হিজরত

এদিকে আল্লাহ তাআলা জিবরিল আলাইহিস সালামকে ওহি দিয়ে পাঠান। তিনি এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান, 'কুরাইশরা আপনাকে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আল্লাহ আপনাকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ও বাতলে দেওয়া হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে। আজ রাতে কোনোভাবেই আপনি আপনার বিছানায় ঘুমাবেন না।'[১]

নবিজি দুপুরের দিকে আবু বকরের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে মদিনা-গমনের ব্যাপারে পরিকল্পনা করেন। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন ঠিক দুপুর। আমরা সবাই ঘরে বসে আছি। এমন সময় কেউ একজন এসে বললেন, আল্লাহর রাসুল মুখ ঢেকে আপনাদের ঘরের দিকেই আসছেন। তিনি সাধারণত এমন সময় আসেন না। আমার বাবা আবু বকর তাকে বললেন, আমার পিতামাতা তার জন্য কুরবান হোক, তিনি এমন সময় কখনো আসেন না, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

আয়িশা বলেন, আল্লাহর রাসুল এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর ভেতরে ঢুকে প্রথমেই বললেন, আবু বকর, ঘরে যারা আছে, তাদেরকে অন্য ঘরে যেতে বলুন। আবু বকর জানালেন, হে আল্লাহর রাসুল, এ তো আপনারই পরিবার। তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে হিজরতের নির্দেশ দিয়েছেন। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আপনার সহযাত্রী হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।[২]

হিজরতের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নবিজি নিজ ঘরে ফিরে আসেন। এরপর সেখানেই

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৫; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ২৬৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৬২৬

রাত্রি নেমে আসার অপেক্ষায় থাকেন তিনি।

শত্রুরা যখন ঘরের চারপাশে

সকালবেলা দারুন নাদওয়ায় যে জঘন্য ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা হয়, সেটা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য ১১ জন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা হয়। তারা হলো—**এক.** আবু জাহল ইবনু হিশাম। **দুই.** হাকাম ইবনু আবিল আস। **তিন.** উকবা ইবনু আবি মুইত। **চার.** নজর ইবনুল হারিস। **পাঁচ.** উমাইয়া ইবনু খালফ। **ছয়.** যামআ ইবনুল আসওয়াদ। **সাত.** তুওয়াইমা ইবনু আদি। **আট.** আবু লাহাব। **নয়.** উবাই ইবনু খালফ। **দশ.** নাবিহ ইবনু হাজ্জাজ। **এগারো.** মুনাব্বি ইবনু হাজ্জাজ।[১]

রাত গভীর হলে তারা নবিজির ঘরের দরজায় এবং তার চারপাশে এসে অবস্থান নেয়—যেন তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তার ওপর খুব সহজেই আক্রমণ করতে পারে।[২]

মক্কার কাফিররা একপ্রকার নিশ্চিত ছিল—তাদের এই ষড়যন্ত্র শতভাগ সফল হবে। একে ভেস্তে দেওয়ার কেউ নেই। আবু জাহল গর্ব ও অহংকারে তখন বেশ হম্বিতম্বি করছিল। তাচ্ছিল্য করে সবাইকে বলছিল, 'মুহাম্মাদ নাকি দাবি করত, তোমরা যদি তাকে অনুসরণ করো, তাহলে আরব-আজমের সর্দার হয়ে যাবে! আবার মৃত্যুর পর নাকি যখন তোমাদের পুনরুত্থান হবে, তখন তোমাদের জর্ডানের বাগানগুলোর মতো অনিন্দ্য সুন্দর বাগান দেওয়া হবে! আর যদি তাকে না মানো, তাহলে তোমাদের হত্যা করা হবে, মৃত্যুর পর নাকি আবার তোমাদের চিরজীবনের জন্য আগুনে জ্বলতে হবে!'[৩]

তাদের পরিকল্পনা ছিল মধ্যরাতের পরেই তারা এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করবে। সেই অপেক্ষায় জেগে থাকে নবিজির ঘর ঘেরাও করে। কিন্তু মহান আল্লাহর পরিকল্পনা কি ওরা জানে? যার হাতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আসমান ও জমিনের রাজত্ব, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই ঘটাতে পারেন। কেউ এতে বাধা দিতে পারে না। যাকে ইচ্ছা তাকে আশ্রয়ও দেন তিনিই। কেউ বাগড়া দিতে পারে না তাঁর কাজে। মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে তাঁর রাসুলকে সেদিনের হত্যা-পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেন এভাবে—

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮২

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৩

মনে রাখুন, কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আপনাকে বন্দি করার জন্য, হত্যা কিংবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে; (জবাবে) আল্লাহও পালটা কৌশল অবলম্বন করেন। আল্লাহই সেরা কৌশলী।[১]

শত্রুদের সামনে দিয়ে নবিজির প্রস্থান

কুরাইশরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার পরেও তাদের সমগ্র পরিকল্পনা একটি দুমড়ানো-মোচড়ানো কাগজের মতো ভেস্তে যায়। জীবন-মরণের এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'তুমি আমার বিছানায় আজ রাতে এই হাজরামি সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে। আল্লাহ চাইলে কোনো ধরনের অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।' নবিজি সাধারণত এই চাদরটি গায়ে দিয়েই ঘুমাতেন।[২]

তিনি আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রেখে বের হয়ে যান। ঘরের বাইরে ওত পেতে থাকা কাফিরদের ভেতর দিয়েই তিনি বের হন। আল্লাহ তাআলা শত্রুর দৃষ্টি থেকে তাকে আড়াল করে রাখেন। নবিজির হাতে বাতহার মাটি। তিনি সেই মাটি তাদের মাথার ওপর ছিটিয়ে দিতে থাকেন এবং কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকেন—

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর এবং পেছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি; এরপর তাদের (চোখ) করেছি পর্দাবৃত। ফলে তারা (এখন আর আপনাকে) দেখতেপাচ্ছেনা।[৩]

সেখানে যারা ছিল, সবার মাথা লক্ষ্য করে নবিজি মাটি নিক্ষেপ করেন এবং সেখান থেকে সোজা আবু বকরের বাড়ি গিয়ে ওঠেন। এরপর বাড়ির গোপন দরজা দিয়ে রাতের আঁধারে বেরিয়ে যান তারা। ইয়েমেনগামী পথের পাশে সাওর গুহায় তারা আত্মগোপন করেন।[৪]

ওদিকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঘেরাওকারীরা নবিজির ঘরের সামনে অপেক্ষা করতে থাকে। এক

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৩০

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮২-৪৮৩

[৩] সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৯

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৩; *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫২

পথচারী সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় সবাইকে নির্বিকার দেখে ধমকে ওঠে, 'কী ব্যাপার! কার জন্য অপেক্ষা করছ তোমরা? তোমরা যার অপেক্ষা করছ, সে তো তোমাদের মাথায় মাটি ছিটিয়ে তোমাদের সামনে দিয়েই চলে গেছে।' তারা নিজেদেরকে সামলে নিয়ে বলে, 'আমরা তো তাকে দেখিনি।' এরপর তারা মাথা থেকে মাটি ঝাড়তে শুরু করে। লোকটার কথা সত্য কি না যাচাইয়ের জন্য তারা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়। তারা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে মনে করে, নবিজি শুয়ে আছেন। তারপর তারা সেখানে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দরজা দিয়ে বের হলে, তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করতে শুরু করে, 'মুহাম্মাদ কোথায়?' তিনি নিরুত্তর থাকেন তাদের প্রশ্নের জবাবে।[১]

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে

নবুয়তের চতুর্দশ বছর ২৭ সফর তথা ৬২২ খ্রিস্টাব্দে ১২ অথবা ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর ত্যাগ করেন।[২] তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু আবু বকরের বাড়িতে যান প্রথমে। বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই তারা মক্কা থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়েন।

নবিজি জানতেন কুরাইশরা তন্নতন্ন করে খুঁজবে তাকে। মদিনার দিকে চলে যাওয়া উত্তরমুখী প্রধান সড়কের উদ্দেশে তারা আগে বের হবে তালাশের জন্য। তাই তিনি সম্পূর্ণ উলটো দিকে ইয়েমেনগামী দক্ষিণমুখী পথ ধরে এগিয়ে চলেন। এই পথে মক্কা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সাওর পাহাড় তার প্রথম গন্তব্য। পাহাড়টি বেশ দুর্গম, সহজে ওঠা যায় না, পাথরও ছিল প্রচুর। পায়ের ছাপ যেন মাটিতে না পড়ে, এজন্য নবিজি পায়ের আঙুলের ওপর ভর করে চলতে শুরু করেন। ফলে তার পা জখম হয়ে যায়। পাহাড়ে ওঠার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সাহায্য করেন। বহু কষ্টে দুজনে এই দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। ইতিহাসের পাতায় এটি সাওর গুহা নামে পরিচিত।[৩]

গুহার ভেতরে অলৌকিক ঘটনা

গুহায় পৌঁছে আবু বকর বলেন, 'আমি আগে ভেতরে প্রবেশ করি, তারপর আপনি আসুন। গুহায় ক্ষতিকর কিছু থেকে থাকলে, যা হওয়ার আমার হবে।' তিনি ভেতরে ঢুকে গুহাটি পরিষ্কার করেন। এক পাশে কিছু ছিদ্র ছিল, তিনি সেগুলো নিজের জামা ছিঁড়ে বন্ধ

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৫

[৩] প্রাগুক্ত; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৬৭

করে দেন। আর কোনো কাপড় না থাকায় দুইটি ছিদ্র তিনি নিজের পা দিয়ে ঢেকে রাখেন। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভেতরে আসতে বলেন।

নবিজি ভেতরে গিয়ে আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আবু বকর যে পা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন, সেই পায়ে সাপ অথবা বিচ্ছু দংশন করে। তারপরও তিনি বিন্দুমাত্র নড়াচড়া না করে স্থির হয়ে বসে থাকেন—যেন নবিজির ঘুমের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। বিষের অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরতে শুরু করে। গাল বেয়ে সে অশ্রু নবিজির মুখমণ্ডলে পড়লে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেন, আবু বকর কাঁদছেন। জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে, আবু বকর? তুমি কাঁদছ কেন?' তিনি দংশনের কথা বলেন। নবিজি তার ক্ষতস্থানে একটু থুতু লাগিয়ে দেন, অমনি তার ব্যথা সেরে যায়।[১]

সাওর গুহায় তারা তিন রাত ছিলেন। শুক্র, শনি এবং রোববার রাত।[২] আবু বকরের ছেলে আব্দুল্লাহ রাতে এসে তাদের সঙ্গে থাকতেন। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'আব্দুল্লাহ বেশ বুদ্ধিমান আর চালাক-চতুর একটি ছেলে। শেষরাতে গুহা থেকে চলে আসত। আর সারাদিন লোকালয়ে থাকত। মানুষের গতিবিধি ও শলাপরামর্শ জেনে, বেলা ডোবার পর গুহায় গিয়ে সব তাদেরকে জানাত। প্রতিদিন আবু বকরের দাস আমির ইবনু ফুহাইরা ছাগলের দুধ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখত। রোদে উত্তপ্ত পাথরে গরম করা দুধ পান করে রাত কাটাতেন তারা। আর আব্দুল্লাহ ভোরের আলো ফোটার আগেই মক্কায় চলে আসত।[৩] তার পায়ের ছাপ মুছে ফেলার জন্য আমির পেছনে পেছনে ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এভাবে লাগাতার ৩ রাত তারা আসা-যাওয়া করে।'[৪]

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র আপাতত ব্যর্থ। নবিজি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে রাতের বেলায়

---

[১] *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৬০৩৪; ইতিহাস ও সিরাতের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ হলেও বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। ইমাম যাহাবি বলেন, ঘটনাটি (মূর্খ) সুফিদের বানোয়াট হাদিসের সাথে সাদৃশ্য রাখে। ইমাম ইবনু হাজারও তার এই কথা সমর্থন করেছেন। [*মিযানুল ইতিদাল*, ইমাম যাহাবি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪৫, জীবনী নং : ৪৮০৪, দারুল মারিফা, বৈরুত; *লিসানুল মিযান*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০২, জীবনী নং : ১৫৮৮, মুআসসাসাতুল আলামি, বৈরুত]

শাইখ আলি ইবনু ইবরাহিম হাশিশ এই বর্ণনার বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে বলেন, কাহিনিটি বানোয়াট। [*তাহযিরুদ দায়িয়া মিনাল কিসাসিল ওয়াহিয়া*, আলি ইবনু ইবরাহিম হাশিশ, পৃষ্ঠা : ৭-৯, দারুল আকিদা, কায়রো, মিশর] শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহও তার কথা সমর্থন করেছেন। [*আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম*, মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১০৪, আদ-দারুল আলামিইয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর।]

[২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৩৬

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৫, ৪০৯৩, ৫৮০৭; *মুসনাদুল বাযযার* : ১৭৬

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৬

বেরিয়ে পড়েছেন। রাগে-ক্ষোভে উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করে তারা। প্রথমে আলিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আলি বরাবরই নীরব থাকেন। তাদের কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেন না তিনি। এজন্য তারা তাকে বেদম প্রহার করে। প্রহার করতে করতে কাবার কাছে নিয়ে যায় তাকে। সেখানে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখে, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি।[১]

আলির কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে তারা যায় আবু বকরের ঘরে। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকে তার দরজায়। দরজা খুলে আসমা বিনতু আবি বকর বের হন। তারা সমস্ত রাগ ঝেড়ে জিজ্ঞেস করে, 'এই তোর বাপ কোথায়?' আসমা জবাব দেন, 'আমি জানি না।' আবু জাহল অসভ্য ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির মানুষ। সে আসমার গালে এত জোরে চড় বসিয়ে দেয় যে, তার কানের দুল ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।[২]

কুরাইশরা তাৎক্ষণিক বৈঠক ডাকে। বৈঠকে তাদের পাকড়াও করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মক্কা থেকে যতগুলো বের হওয়ার পথ ছিল, সবগুলোতে সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়। সঙ্গো সঙ্গো এই ঘোষণাও দেওয়া হয়, কেউ যদি তাদের দুজনের একজনকেও মক্কায় জীবিত বা মৃত নিয়ে আসতে পারে, সে পুরস্কারস্বরূপ ১০০টি উট পাবে।[৩] এই ঘোষণার সঙ্গো সঙ্গো ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে মানুষ তাদের খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ে। মক্কার যত উপত্যকা, অধিত্যকা, পাহাড়, গিরিপথ ও নিম্নভূমি আছে, সব জায়গায় চলে তাদের চিরুনি অভিযান। কিন্তু এত কিছু করেও তারা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

একটা দল অবশ্য খুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখ পর্যন্ত চলে যায়, কিন্তু গুহার ভেতরে প্রবেশ করা প্রয়োজন মনে করেনি কেউ।

আবু বকর বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গো গুহায় ছিলাম। মাথা উঁচু করে তাকাতেই তাদের কয়েকজনের পা দেখতে পাই। কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে আল্লাহর রাসুলকে বলি, 'এদের কেউ যদি মাথা নিচু করে পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে তো রক্ষা নেই। নির্ঘাত দেখে ফেলবে আমাদের।' আল্লাহর রাসুল অভয় দিয়ে বলেন, 'এমন দুজনের ব্যাপারে তোমার ধারণা কী, যাদের তৃতীয় জন আল্লাহ?'[৪] এ ছিল আল্লাহর নবির মুজিযা, মাত্র কয়েক কদম দূরত্বে থেকেও শত্রুরা তাদের খুঁজে বের করতে পারেনি।

---

[১] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৭

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৬

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯২২, ৪৬৬৩; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা : ১৬৮

মদিনার পথে দুই মুসাফির

৩ দিন পর কুরাইশের অনুসন্ধান-স্পৃহায় খানিকটা ভাটা পড়ে। কিছুটা হতাশাও দেখা দেয় তাদের মধ্যে। টহল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাদের জোয়ান ও উৎসাহী বৃদ্ধরা। এই সুযোগে নবিজি ও আবু বকর মদিনা-সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হন। তারা আগেই আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত লাইসিকে ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি একজন দক্ষ পথপ্রদর্শক। আরবের পথঘাট সব তার কাছে হাতের রেখার মতো পরিষ্কার। ধর্মে সে পৌত্তলিক হলেও, মানুষ হিসেবে যথেষ্ট বিশ্বস্ত। তাই নবিজি তাকে বিশ্বাস করেছিলেন। গুহায় প্রবেশের আগে তার কাছে দুটো উট রেখে এসেছিলেন এবং এই মর্মে তার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, ৩ দিন পর সে বাহন-দুটো নিয়ে সাওর গুহায় উপস্থিত হবে।

প্রথম হিজরির পহেলা রবিউল আউয়াল তথা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত লাইসি বাহনদুটি নিয়ে সাওর গুহায় উপস্থিত হয়। আবু বকর ভালো বাহনটি নবিজির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনার পছন্দমতো যেকোনো একটা বেছে নিন।' নবিজি বলেন, 'হাদিয়া হিসেবে নয়, কিনে নিলাম।'

আসমা তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসেন। কিন্তু আসার সময় তিনি খাবারের থলের মুখ বেঁধে আনতে ভুলে যান। সফরের প্রাক্কালে খাবার গুছিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন, খাবারের থলে বেঁধে আনা হয়নি। অন্য কোনো উপায় না দেখে তিনি তার কোমরবন্ধনী খুলে দুই টুকরো করেন। এরপর এক টুকরো দিয়ে খাবার বাঁধেন, আরেক টুকরো বাঁধেন কোমড়ে। এই ঘটনার পর তার নাম পড়ে যায় 'যাতুন নিতাকাইন' বা 'দুই ফিতার মালকিন'।[১]

প্রস্তুতি শেষ হলে তারা মদিনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এই ক্ষুদ্র কাফেলায় ছিলেন নবিজি, আবু বকর, তার গোলাম আমির ইবনু ফুহাইরা এবং পথনির্দেশক আব্দুল্লাহ ইবনু উরাইকিত লাইসি। তারা লোহিত সাগরের উপকূলের পথ ধরে এগুতে থাকেন। গুহা থেকে বের হয়ে প্রথমে ইয়েমেনমুখী হয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে থাকেন, তারপর পশ্চিমে উপকূলীয় পথের দিকে অগ্রসর হন। চলতে চলতে তারা কিছুটা অপরিচিত এবং তুলনামূলক কম ব্যবহৃত পথের ওপর দিয়ে যেতে থাকেন। সেখান থেকে লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল দিয়ে উত্তরের দিকে অগ্রসর হন।

তাদের যেতে হয় অতিরিক্ত বহু পথ পাড়ি দিয়ে। স্বাভাবিক পথে হাঁটলে যেদিক দিয়ে কখনোই যেতে হতো না—এমন গ্রাম, বসতি ও এলাকাও অতিক্রম করতে হয় তাদের। শেষমেশ দীর্ঘ সফরের ইতি টেনে তারা কুবায় পৌঁছতে সক্ষম হন।[২] তবে এই যাত্রাপথে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৯৭৯, ৩৯০৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৬

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯১-৪৯২

বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, আমরা তার যৎসামান্য তুলে ধরছি এখানে—

[এক] আবু বকর থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এই কষ্টকর যাত্রার কথা উঠে এসেছে এভাবে—

'আমরা সারারাত পথ চলতে থাকি, পরদিন দুপুর অবধি আমরা বিকল্প পথ ধরেই চলছিলাম। রোদ তীব্র হতে থাকলে রাস্তার মানুষজন কমতে শুরু করে। হঠাৎ পথের পাশে একটা বিরাট পাথরের নিচে ছায়া দেখতে পাই আমরা। সেখানের জমিন সমান করে, ময়লা সরিয়ে চাদর বিছিয়ে দিই আল্লাহর রাসুলের বিশ্রামের জন্য। তিনি সেখানে শুয়ে পড়েন। আমি খাবারের তালাশে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকি।

এমন সময় ছায়ার খোঁজে এক রাখালকে আমাদের দিকে আসতে দেখা যায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তোমার মনিব কে? সে মক্কা বা মদিনার কারও নাম বলে। তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, তার বকরির ওলানে দুধ আছে কি না? সে বলে, হ্যাঁ, আছে। আমি বলি, আমরা কি একটু দুধ পেতে পারি? সে তখন দোহন করার জন্য একটি বকরি ধরে। আমি আগে ওলান পরিষ্কার করে নিতে বলি।

আমার কথামতো সে একটি পাত্রে দুধ দোহন করে দেয়। আমি আল্লাহর রাসুলের জন্য চামড়ার একটি মশক নিয়ে এসেছিলাম। পানি পান ও ওজুর কাজে ব্যবহার করতেন তিনি সেটি। সেই মশক থেকে সামান্য পানি ঢেলে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিলাম, যাতে পান করার সময় শীতল একটা পরশ পাওয়া যায়।

আল্লাহর রাসুল তখনো ঘুমিয়ে ছিলেন। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে মন সায় দেয়নি আমার। ঘুম থেকে উঠলে তাকে দুধটুকু পান করতে দিই। তিনি পান করলে আমি একটু স্বস্তি পাই। এরপর আল্লাহর রাসুল একটু স্থির হয়ে বলেন, চলো তাহলে, সফর শুরু করা যাক। আমিও বলি, ঠিক আছে, চলুন বেরিয়ে পড়ি। এরপর আমরা আবার মদিনার উদ্দেশে পথ চলতে শুরু করি।'[১]

[দুই] সাধারণত উটে চড়লে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু পেছনে বসতেন, আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসতেন সামনে। আবু বকরের চেহারায় কিছুটা বার্ধক্যের ছাপ এসে পড়েছিল। সে তুলনায় নবিজিকে দেখতে তার চেয়ে কমবয়সি মনে হতো। ব্যবসার খাতিরে তাকে বহু মানুষই চিনত। 'আবু বকর, তোমার সামনের লোকটি কে?' যাত্রাপথে দূরের কোনো গোত্রের কেউ এমন প্রশ্ন করলে, আবু বকর জবাব দিতেন, 'তিনি আমার পথপ্রদর্শক।' এমন উত্তর শুনে মানুষজন ভেবে নিত, মরুভূমির

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬১৫, ৩৯১৭

পথপ্রদর্শক। আসলে আবু বকর এ কথাটি বলে 'দ্বীনের পথপ্রদর্শক' বোঝাতেন।[১]

[তিন] মদিনার যাত্রাপথে তারা সুরাকা ইবনু মালিকের (তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) পশ্চান্ধাবনের শিকার হন। ঘটনাটি সুরাকা নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে—

'বনু মুদলাজের একটা বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। নানা বিষয়ে আলাপচারিতা করছিলাম। এ সময় হন্তদন্ত হয়ে এক লোক সে বৈঠকে উপস্থিত হয়। সে এসেই বলতে শুরু করে, 'সুরাকা, উপকূল ধরে কয়েকটি ছায়ামূর্তি ছুটতে দেখলাম বলে মনে হলো। খুব সম্ভব ছায়াগুলো মুহাম্মাদ ও তার সহচরদের হবে।' সুরাকা বলেন, তার কথা শুনে আমি নিশ্চিত হই, মুহাম্মাদের কাফেলাই ওই পথ দিয়ে মদিনায় যাচ্ছে। কিন্তু পুরস্কারের আশায় আমি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্য বলি, 'আরে, এরা মুহাম্মাদের লোক হতেই পারে না। কিছুক্ষণ আগেই তো অমুক অমুককে ওই পথ ধরে যেতে দেখলাম। এরা ওরাই হবে, মুহাম্মাদ ওখানে নেই।'

আমি আরও কিছুক্ষণ মজলিসে বসে গল্পসল্প করি। এরপর চুপিসারে কেটে পড়ি সেখান থেকে। বাড়িতে ঢুকেই দাসীকে বলি, টিলার ওপাশ থেকে ঘোড়াটা নিয়ে এসো। আমি বর্শা হাতে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যাই। বর্শার মাথা নিচু করে মাটিতে দাগ টেনে টেনে ঘোড়াটির কাছে পৌঁছাই। তারপর ঘোড়ায় চড়ে তাদের উদ্দেশে ছুটতে থাকি।

দূরে থেকেই তাদের দেখতে পাই। তাদের কাছে যেতে না যেতেই অদ্ভুতভাবে ঘোড়া থেকে পড়ে যাই আমি। তূণীর থেকে ভাগ্যনির্ধারক তির বের করে আনি, তাদের ক্ষতি করব কি করব না—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু ভাগ্য খুব প্রসন্ন মনে হয় না। পছন্দসই তিরটি ওঠে না আমার হাতে। ক্ষতি না করার দিকটাই প্রাধান্য পায়। তবু আমি তিরের কথা না শুনে তাদেরকে ধরার জন্য পুনরায় ঘোড়া হাঁকাই।

কাছে যেতে যেতে এতটাই কাছে চলে যাই যে, আমি আল্লাহর রাসুলের তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি একমনে তিলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন, আর আবু বকর উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এবার আমার ঘোড়াটি ভয়াবহ রকমের হোঁচট খায়। তার সামনের পা-দুটো হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ডেবে যায়। আমি আবার পড়ে গেলাম। দ্রুত ওঠার জন্য আমি ঘোড়াটাকে আঘাত করি। অনেক কষ্টে পা-দুটো বের করে কোনোমতে দাঁড়ায় ঘোড়াটি, তখন তার পা থেকে আকাশ অবধি একটি ধোঁয়ার রেখা দেখতে পাই। এতে ভয় পেয়ে যাই আমি। আবার ভাগ্যনির্ধারক তির দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করি। তবে এবারও আমাকে আগে বাড়তে নিষেধ করা হয়। তাই এবার আমি নিজের নিরাপত্তা চেয়ে তাদের ডাকতে থাকি। আমার চিৎকার শুনে তারা থেমে যায়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯১১

আমি ঘোড়ায় চড়ে তাদের কাছে আসি। আমি যখন বারবার হোঁচট খাচ্ছিলাম, তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, আল্লাহর রাসুলই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন। তাই বিনয়ের সাথে তাকে বলি, 'আপনার গোত্র তো আপনার মাথার দাম হাঁকিয়েছে।' এরপর আমি তাদের কাছে মক্কার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরি। মক্কার লোকজন যে তাদের হন্যে হয়ে খুঁজছে, সে কথাও বলি। আমি তাকে ঘোড়া এবং আমার কাছে আরও যা কিছু ছিল, সেগুলো দিয়ে দিতে চাইলে, তিনি ফিরিয়ে দেন। তিনি শুধু আমাকে বলেন, 'আমার কিছুই লাগবে না। তুমি শুধু আমাদের কথা গোপন রেখো।'

আকস্মিক এই ঘটনায় আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়ি, তাই আমার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তার কাছে লিখিত চাই। তিনি আমির ইবনু ফুহাইরাকে লিখে দিতে বলেন। তিনি একটি চামড়ার ওপরে নিরাপত্তাপত্র লিখে আমার হাতে দেন। এরপর আল্লাহর রাসুল আবার যাত্রা শুরু করেন।[১]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এ বিষয়ে একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন— 'আমরা মদিনার উদ্দেশে বের হলে, ওরা আমাদের খুঁজতে শুরু করে। সুরাকা ইবনু মালিক ইবনি জুশুম ছাড়া কেউই আমাদের খোঁজ পায়নি। আমি তাকে দেখে স্বগতোক্তির মতো করে বলি, এবার আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব। আল্লাহর রাসুল তখন বলেন, চিন্তা কোরো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।'[২][৩]

সুরাকা এলাকায় গিয়ে দেখতে পান, মানুষজন এখনো খোঁজাখুঁজির মধ্যেই আছে। তাদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য সে বলে, 'আমি এদিকটায় তোমাদের হয়ে দেখে এসেছি, এদিকে আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই।'

সুবহানাল্লাহ! যে মানুষটা সকালবেলাও নবিজি আর আবু বকরকে ধরার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, সেই মানুষটাই সন্ধ্যাবেলা তাদের নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে এল।[৪]

[চার] চলতি পথে উম্মু মাবাদ খুযাইর সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তিনি তাঁবুর আঙিনায় হাঁটু গেড়ে বসে ছিলেন। কোনো পথচারী মুসাফির তার তাঁবুর পাশ দিয়ে গেলে তিনি সাধারণত মেহমানদারি করতেন। নবিজি ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় তার কাছে খাবার চান।

সে বছর ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। খাদ্যশস্য ও তৃণলতার বেশ সংকট তখন। তিনি বলেন,

---

[১] *তারিখু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫৪; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬১৬

[৪] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩

'আপনাদেরকে দেওয়ার মতো আমার ঘরে এখন কিছুই নেই। বকরিগুলোও দূর মাঠে চড়ছে।' এ সময় নবিজি দেখেন তাঁবুর এক কোণে একটা বকরি বসে আছে। তিনি তা দেখিয়ে জানতে চান, 'এই বকরিটি কেমন? এতে দুধ হবে?' তিনি বলেন, 'এটা তো এতই দুর্বল যে, বকরি পালের সঙ্গেই চলতে পারে না, দুধ তো পরের কথা।' নবিজি তার কাছে বকরিটির দুধ দোহনের অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, 'যদি দুধ আসে, তো চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

অনুমতি পেয়ে নবিজি বিসমিল্লাহ ও দুআ পড়ে বকরিটির ওলানে হাত বোলান। তার হাতের স্পর্শ লাগতেই ওলান দুধে ভরে ওঠে। তিনি দুধ রাখার জন্য একটি বড় পাত্র নিয়ে আসতে বলেন। দুধ দোহন করে পাত্রে ঢালার পর পাত্রটি সম্পূর্ণ ভরে উপচে পড়ে, পাত্রের ওপর ফেনা ভাসতে থাকে। নবিজি উম্মু মাবাদকেই প্রথমে দুধ পান করতে অনুরোধ করেন। তারপর সফরসঙ্গীদের পান করতে দেন। সবশেষে নিজে পান করেন।

সবাই পান করে তৃপ্ত হওয়ার পর নবিজি আবারও দুধ দোহন করে উম্মু মাবাদের কাছে রেখে আসেন। তারপর সবাইকে নিয়ে চলতে থাকেন মদিনার পথে। তাদের যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আবু মাবাদ আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন ক্ষুধার্ত বকরির পাল। ক্ষুধার জ্বালায় সেগুলো হাঁটতেই পারছিল না। ঘরে ঢুকে দুধ দেখে অবাকই হন তিনি। উম্মু মাবাদকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার, দুধ পেলে কোথায়? বাড়িতে তো দুধ দেওয়ার মতো কোনো বকরি ছিল না!' তিনি নবিজির বিস্তারিত বিবরণ দেন, তার বরকতের কথা তাকে খুলে বলেন। আবু মাবাদ তার কথা শুনে বলেন, 'এই লোকটাকেই মনে হয় কুরাইশরা খুঁজছে। আরেকটু বিস্তারিত বিবরণ দাও তার।' তখন উম্মু মাবাদ খুব চমৎকারভাবে তার বিবরণ দেন। আবু মাবাদ স্ত্রীর বিবরণ শুনে বলেন, 'আমি নিশ্চিত, তিনি কুরাইশের সেই মহান ব্যক্তি, যাকে তারা খুঁজছে। আমার খুব ইচ্ছে করছে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। আমি একদিন অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করব।'

এদিকে মক্কায় কিছু কবিতা জনমুখে ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই কবিতাগুলো শুনতে পায়। তবে কে এই কবিতাগুলো রচনা করছে তা কেউ বলতে পারে না—

উম্মু মাবাদের তাঁবুতে আসা সে দু-বন্ধুর হয় যেন কল্যাণ,
কল্যাণের সাথেই হয়েছে তাদের আগমন ও প্রস্থান।
মুহাম্মাদের বন্ধু যেজন; তার তো জীবন মঙ্গলময়,
কুসাই, তোমার বংশ থেকে হলো সকল গরিমা লয়।
বনু কাবে তাদের মেয়েরা যেন থাকে সদা পরিপাটি,
ঠাঁই দেওয়া সেই নারীর কুটির হোক মুমিনের ঘাঁটি।

আজব সে বকরি ও পাত্রের কথা যদি সত্যি জানতে চাও,
বকরিই সব বলে দেবে তোমাদের; যদি সত্যি শুনতে চাও।

আসমা বিনতু আবি বকর বলেন, আমরা তখনো জানতাম না; আল্লাহর রাসুল গুহা থেকে বের হয়ে ঠিক কোথায় আছেন। এমন সময় মক্কার নিম্নভূমিতে এক জিন আত্মপ্রকাশ করে। সে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করতে থাকে। মানুষ এই আওয়াজ শুনতে পায় ঠিক, কিন্তু কে আবৃত্তি করছে; তাকে দেখতে পায় না। কবিতার এই অজ্ঞাত কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে মক্কার উঁচু ভূমির দিকে মিলিয়ে যায়। আমরা যখন কবিতাটি শুনতে পাই, তখন জানতে পারি—আল্লাহর রাসুল এখন মদিনার দিকে রওনা দিয়েছেন।[১]

[পাঁচ] যাত্রাপথে আবু বুরাইদার সঙ্গো নবিজির সাক্ষাৎ হয়। কুরাইশদের বিরাট পুরস্কারের লোভে সে তার গোত্রের লোকজন নিয়ে নবিজির তালাশে বের হয়েছিল। কিন্তু নবিজির সঙ্গো সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর তার মনোভাব পালটে যায়। তার প্রতি ভক্তিতে ভরে ওঠে তার মন। সঙ্গো সঙ্গো তার ৭০ জন সঙ্গীসহ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মাথার পাগড়ি খুলে বর্শার সঙ্গো বেঁধে নেন। এই ঝান্ডা দিয়ে তিনি সবাইকে এটাই বোঝান, শান্তি ও নিরাপত্তার বাদশাহ ইনসাফ কায়েম করতে দুনিয়ায় আগমন করেছেন।[২]

[ছয়] পথিমধ্যে যুবাইরের সঙ্গোও নবিজির দেখা হয়। মুসলিমদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে তিনি শাম থেকে ফিরছিলেন। নবিজি ও আবু বকরকে পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশি হন। একজোড়া করে নতুন সাদা জামা পরিয়ে দেন তাদের দুজনকে।[৩]

কুবায় এলেন নবিজি

নবুয়তের চতুর্দশ বছর, ৮ রবিউল আউয়াল প্রথম হিজরি তথা ২৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নবিজি কুবায় অবতরণ করেন।[৪] উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, মদিনার মুসলিমরা জানতে পারে, নবিজি হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছেন। তার অপেক্ষায় প্রতিদিন তারা মদিনার উপকণ্ঠ হাররায় জমায়েত হতো। রোজ সকাল থেকে শুরু হতো এই অপেক্ষা। দুপুরের সময় রোদ তাতিয়ে উঠলে, প্রচণ্ড রোদে অপেক্ষা করা আর সম্ভব হতো না, তখন তারা ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যেত। এভাবেই চলছিল দীর্ঘ দিন ধরে। এরই মধ্যে একদিন দুপুরের সময় এক ইহুদি কোনো এক কাজে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৩-৫৪

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০১

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৬

[৪] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০২

একটি টিলায় উঠেছিল, হঠাৎ দূর-দিগন্তে ৩টি চলন্ত মানবছায়া তার চোখে পড়ে। তিনজনই সাদা কাপড় পরিহিত, আসছেন মদিনার দিকে। ইহুদি লোকটি তাদের দেখে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, টিলার ওপর থেকেই চিৎকার জুড়ে দিল, 'হে আরববাসী, তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। যার প্রতীক্ষায় তোমরা প্রহর গুনছ, তিনি এসে পড়েছেন।' তার ঘোষণা শুনে মদিনার মুসলিমরা অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নবিজিকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে পড়েন।[১]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রাসুল যখন মদিনার উপকণ্ঠে প্রবেশ করেন, তখন বনু আমর ইবনি আউফ গোত্রের লোকজন আনন্দের আতিশয্যে তাকবির দিতে শুরু করে। পুরো মদিনা যেন ভেঙে পড়ে তাকে স্বাগত জানাতে। উৎসুক জনতা তাকে ঘিরে রাখে চারদিক থেকে। তার মুখাবয়ব আচ্ছাদিত করে রাখে এক অপার্থিব সৌন্দর্য, প্রশান্তি ও স্থিরতা। আল্লাহ তাআলা তার ওপর তখন ওহি নাযিল করতে থাকেন—

...فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

আল্লাহ তার বন্ধু, জিবরিল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণও। তাছাড়া আরও অনেক ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী।[২][৩]

উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন, মদিনার সাধারণ জনতা আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে দেখা করে। তিনি তাদের ডান পাশ ধরে পথ চলতে থাকেন। বনু আমর ইবনি আউফে অবস্থান করেন। তিনি যেদিন মদিনায় প্রবেশ করেন, সেদিন ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। আবু বকর দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন ও সাক্ষাৎ করেন। পুরো সময় ধরে তিনি নীরবে বসে ছিলেন। অনেকে, যারা তখনো আল্লাহর রাসুলকে দেখেনি, তারা প্রথম এসে আবু বকরকে আল্লাহর রাসুল মনে করে অভিবাদন জানায়। কিছুক্ষণ পর যখন সূর্য মাথার ওপরে এসে দাঁড়ায়, আল্লাহর রাসুলের গায়ে রোদ পড়ে এবং আবু বকর নিজের চাদর দিয়ে রাসুলকে ছায়া দেন, তখন মানুষের ভুল ভাঙে, কে আল্লাহর রাসুল তারা বুঝতে পারে।[৪]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৬

[২] সুরা তাহরিম, আয়াত : ৪

[৩] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৬

পুরো মদিনা সেদিন যেন আল্লাহর রাসুলকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এসেছিল। মদিনার ইতিহাসে এমন আড়ম্বরপূর্ণ ও আনন্দঘন দিন এর আগে কখনো দেখা যায়নি। ইহুদিরা সেদিন হাবকুক নবির ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা নিজ চোখে দেখতে পায়, 'মহান আল্লাহ দক্ষিণ দিক থেকে তার আবির্ভাব ঘটাবেন; তিনি আসবেন পবিত্র ফারান পাহাড় থেকে।'[১]

নবিজি কুবায় পৌঁছে কুলসুম ইবনু হাদামের বাড়িতে মেহমান হন। তবে অন্য একটি মতে সাদ ইবনু খুসাইমার বাড়ির কথাও এসেছে। তবে, প্রথম মতটি বিশুদ্ধ।

নবিজি মক্কা ত্যাগ করার পর আলি ইবনু আবি তালিব মক্কায় ৩ দিন অবস্থান করেন। নবিজির কাছে যাদের আমানত ছিল, তিনি তাদের তা বুঝিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে মদিনার দিকে রওনা হন। তিনি তাদের সঙ্গে কুবায় এসে সাক্ষাৎ করেন এবং কুলসুম ইবনু হাদামের বাড়িতে মেহমান হন।[২]

নবিজি কুবায় কেবল ৪ দিন অবস্থান করেন—সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার।[৩] আর এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মাসজিদে কুবা নির্মাণ করেন এবং সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। নবুয়তের পর এটিই প্রথম মসজিদ; যার ভিত্তি ছিল নিখাদ তাকওয়ার ওপর। এরপর পঞ্চম দিন অর্থাৎ শুক্রবার তিনি আল্লাহর নির্দেশে আবু বকরকে নিয়ে বাহনে ওঠেন। নবিজির নানার বংশ বনু নাজ্জার গোত্রের কাছে আগেই বার্তা পাঠানো হয়, যেন তারা নবিজির সঙ্গে রওনা দেন। তারা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাকে ঘিরে রাখে। এভাবে সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি মদিনার দিকে রওনা হন। মদিনায় পৌঁছতে পৌঁছতে জুমআর সালাতের সময় হয়ে আসে। তারপর বনু সালিম ইবনি আউফ গোত্রে ১০০ জন লোকসমেত জুমআর সালাত আদায় করেন নবিজি।[৪]

অবশেষে মদিনায় নবিজির আগমন

জুমআর সালাত আদায়ের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় প্রবেশ করেন। তখন মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব। নবিজির আগমনকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে

---

[১] সহিফাতু হাবকুক, অধ্যায় : ৩; শ্লোক : ৩; উল্লেখ্য, হাবকুক হলেন বনি ইসরাইলের একজন নবি।

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯৩; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০২

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯৪; ইবনু ইসহাক এমনটাই বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মানসুরপুরি এই মতটি গ্রহণ করেছেন। দেখুন, *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০২; *সহিহুল বুখারিতে* এসেছে, নবিজি কুবায় ১০ রাতের বেশি অবস্থান করেছেন। দেখুন হাদিস : ৩৯০৬; কোনো কোনো বর্ণনায় ১৪ বা তারও বেশি রাতের কথাও এসেছে।

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০২

সেদিন থেকেই ইয়াসরিবের নাম পালটে রাখা হয় মাদিনাতুর রাসুল বা রাসুলের শহর। সংক্ষেপে যাকে মদিনা নামে ডাকা হয়। নবিজির বদৌলতে মদিনার মূল শহরে প্রবেশের দিনটি ছিল খুবই উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত। সেদিন ঘরে ঘরে, পথে-ঘাটে, মাঠে-বাজারে কেবলই আল্লাহর প্রশংসা আর পবিত্রতার সুমধুর ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিল। মদিনার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে ছিল স্বাগত গান। সুরে সুরে তারা গাইছিল[১]—

أَشْرَقَ[২] الْبَدْرُ عَلَيْنَا ...مِنْ ثَنِيَّاتِ الوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ...مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ
أَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا ...جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে ওই সানিয়া পাহাড়ে
শোকর করো আল্লাহ তাআলার, আনলেন যিনি তাহারে।
আলোর দিকে ভালোর দিকে ডাকেন তিনি নিত্য
রাসুল এলেন সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

অধিকাংশ আনসার সাহাবি তেমন সম্পদশালী নন, তবুও সবার মনেরই আকাঙ্ক্ষা—নবিজি যেন তারই ঘরে মেহমান হন। নবিজির উট যে বাড়ির পাশ দিয়েই অতিক্রম করছে, সে বাড়ির লোকেরাই উটের লাগাম ধরে তাকে তার মেহমান হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। লোকদের এই মধুর পীড়াপীড়ি দেখে তিনি বলেন, এই উট আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত, তাকে যেখানে আদেশ করা হয়েছে, সেখানেই গিয়েই সে থামবে।

উট চলতে থাকে। চলতে চলতে বর্তমান মাসজিদে নববি যেখানে, সেখানে গিয়ে বসে পড়ে। নবিজি তখনো উটের পিঠেই। কিছুক্ষণ পর উটটি আবার বসা থেকে দাঁড়িয়ে যায়। সামনে কিছুদূর এগিয়ে এদিক-ওদিক তাকানোর পর আবার আগের জায়গায় এসে বসে পড়ে। এবার তিনি উট থেকে মাটিতে নামেন। মাসজিদে নববির স্থানটি ছিল নবিজির

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০

[২] ইমাম বাইহাকি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনায় أشرق বা (আশরকা) শব্দের স্থানে طَلَعَ (তলাআ) শব্দ উল্লেখ করেছেন। আয়িশা বলেন, আল্লাহর রাসুল মদিনায় প্রবেশকালে নারী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গাইছিল—

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ

[*দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০৭; দারুল কুতুবিল ইলমিয়া; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৭০; ঈসা আল-বাবি আল-হালবি, কায়রো।]

নানার বংশ বনু নাজ্জার গোত্রে। মূলত এটা ছিল আল্লাহর পরিকল্পনারই অংশ। তাই নবিজির উটটি সেখানে গিয়েই থামে। নবিজিও নানার বংশে অবস্থান করে তাদেরকে সম্মানিত করতে চেয়েছেন।

তিনি সেখানে নামার পর তার নানাবাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সবাই নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে আবু আইয়ুব আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু উট থেকে হাওদা[১] ও জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যান। নবিজি তাকে এমনটা করতে দেখে এই প্রবাদটি বলেন, 'হাওদা যেখানে, মানুষও সেখানে।' এরই মধ্যে আসআদ ইবনু যুরারা এসে নবিজির উটের লাগাম টেনে ধরেন। ফলে উটটি তার কাছেই থেকে যায়।[২]

তারপর নবিজি জানতে চান, 'কার বাড়ি এই জায়গা থেকে সবচেয়ে কাছে?' তখন আবু আইয়ুব বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার বাড়ি সবচেয়ে কাছে, এই আমার দরজা।' নবিজি বলেন, 'চলুন তাহলে, আপনার বাড়িতেই যাওয়া যাক। আপনার ঘরে আমার ঘুমানোর ব্যবস্থা করুন।'[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কয়েকদিন পর উম্মুল মুমিনিন সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা, নবিজির দুই কন্যা—ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম, উসামা ইবনু যাইদ ও উম্মু আইমান মদিনায় এসে পৌঁছান। তাদের সঙ্গে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আব্দুল্লাহও সপরিবারে আসেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও ছিলেন এ কাফেলায়। নবিজির কন্যাদের মধ্যে কেবল যাইনাব রয়ে যান মক্কায়। তার স্বামী আবুল আস তাকে আসতে দেয়নি। তবে বদর যুদ্ধের পর তিনি মক্কা ছাড়তে সক্ষম হন।[৪]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসুল মদিনায় আসার পর আমার বাবা আবু বকর ও বিলাল অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড জ্বরে শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলে আবু বকর এই কবিতাগুলো পাঠ করতেন—

জীবন খুবই সুখের, থাকলে স্বজন পাশে
মরণ কিন্তু লেপ্টে আছে জীবনের চারপাশে।

---

[১] এমন আসন যা উট বা হাতির পিঠে স্থাপন করা হয়। দেখতে অনেকটা পালকির মতো। উটের পিঠের হাওদা সাধারণত নারীদের জন্য আর হাতির পিঠের হাওদা রাজা-বাদশাহদের জন্য ব্যবহৃত হত। [*মুজামুল লুগাতিল আরাবিইয়াতুল মাআসারা*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৩৩২]

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯১১

[৪] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৫

এদিকে বিলালও কিছুটা সুস্থবোধ করলে আবৃত্তি করতেন—

হায় যদি জানতাম
কাটাতে পারতাম
মক্কায় এক রাত,
চারপাশে থাকত সেখানে
ঘিরে ঘিরে আমাকে
ইজখির, জালিল ঘাস।
হায় যদি জানতাম
নামতে পারতাম
মাজিন্না ঝরনায় আহা রে!
যদি আহা পারতাম
ঘুরে ঘুরে বেড়াতে
সামা আর তুফাইল পাহাড়ে।[১]

আয়িশা বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে তাদের অবস্থার কথা জানাই। তিনি তাদের জন্য একটি সুন্দর দুআ করেন—

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وفِي مُدِّنَا ، وصَحِّحْهَا لَنَا ، وانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ

আল্ল-হুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল মাদীনাতা কাহুব্বিনা- মাক্কাতা আও আশাদ্দা। আল্ল-হুম্মা বা-রিক লানা- ফী স্ব-'ইনা- ওয়াফী মুদ্দিনা-। ওয়া স্বহ্হিহ্‌হা- লানা-। ওয়াংকুল্ হুম্মা-হা- ইলাল জুহ্‌ফাত।

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি মদিনাকে আমাদের কাছে মক্কার মতো অথবা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন। মদিনার আকাশ, মাটি ও পরিবেশকে আরও স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দিন। তাদের পাত্র ও পাল্লা-পরিমাপিত জিনিসে বারাকাহ দান করুন। মদিনা থেকে অসুখবিসুখ জুহফায় সরিয়ে রাখুন।

এই পর্যায়ে এসে নবিজির জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় শেষ হয়। পূর্ণতা পায় ইসলামি দাওয়াতের প্রথম যুগ, ইতিহাসে যাকে বলা হয় মাক্কিজীবন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৮৯, ৩৯২৬, ৫৬৫৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৭৬

মদিনার বুকে নবজাগরণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদানি জীবনকে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

প্রথম পর্যায় : হিজরতের প্রথম দিন থেকে ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত। এ সময়টা বেশ অস্থির ও গোলযোগপূর্ণ। এ সময়ে মুসলিমদের মদিনার ভেতর থেকে যেমন নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তেমনই বাহির থেকেও বিভিন্ন রকমের চাপ আসতে থাকে। তাদেরকে সমূলে বিনাশ করতে ভেতর ও বাহির—উভয় দিক থেকে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে শত্রুরা। এমনকি তাদের জোটবদ্ধ আক্রমণের শিকারও হয় মুসলিমরা।

দ্বিতীয় পর্যায় : হুদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকে মক্কাবিজয় পর্যন্ত। অষ্টম হিজরির রামাদান মাসে মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। তারপর থেকে মক্কার বাইরের রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠানো হয়।

তৃতীয় পর্যায় : এই সময়কালে মানুষ নদীর স্রোতের মতো দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে শুরু করে। মদিনায় বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ নবিজির মৃত্যুর পর এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হিজরতের সময় মদিনার অধিবাসীদের অবস্থান
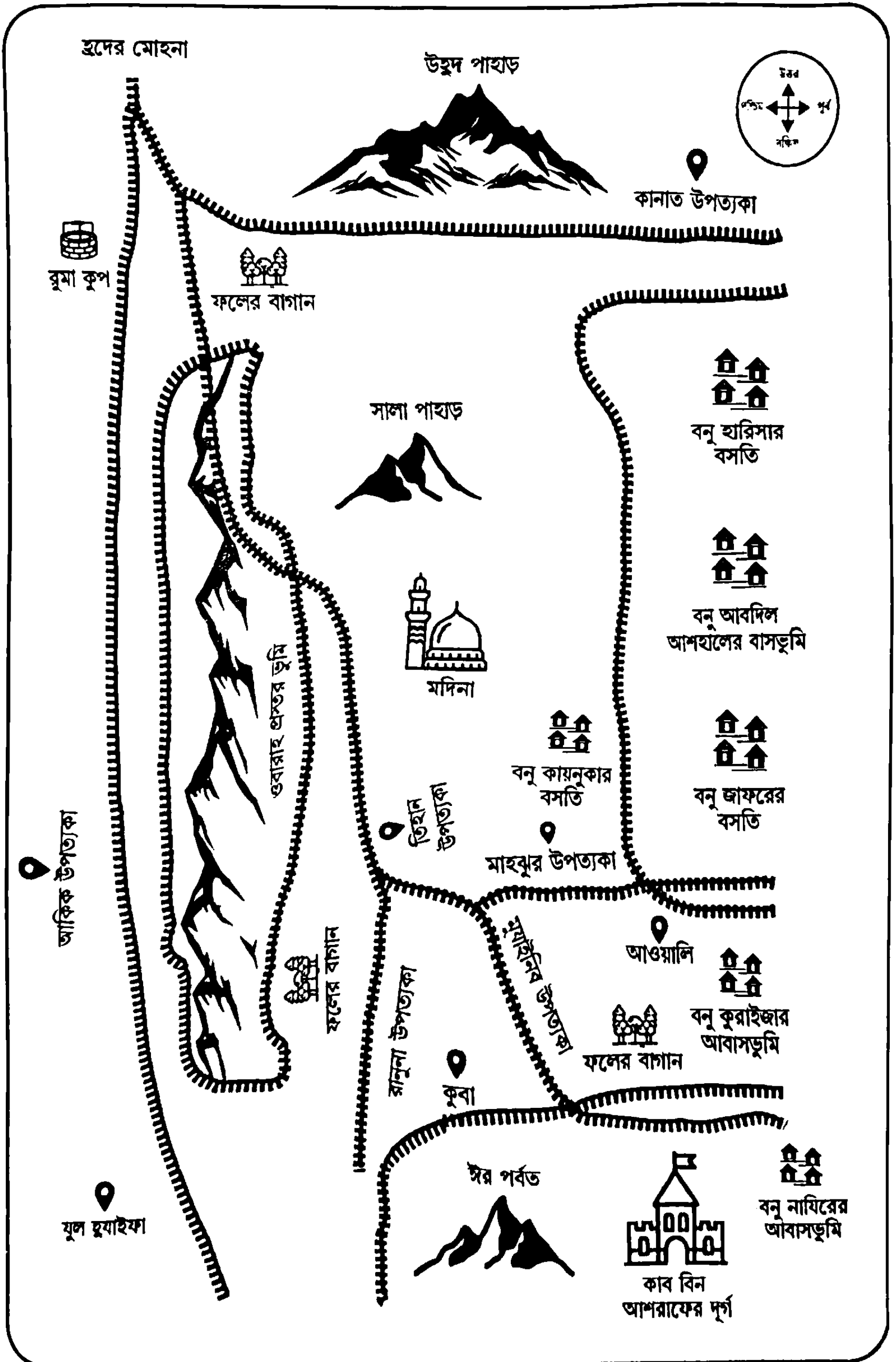
প্রথম পর্যায় : মদিনার তৎকালীন অবস্থা

মুসলিমরা শুধু জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতেই হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছে, ব্যাপারটি এমন নয়। হিজরতের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল—একটি নিরাপদ ভূমিতে নতুন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাই প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য ছিল—এই নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণে, প্রতিরক্ষায় ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখায় অংশগ্রহণ করা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন এই উদীয়মান সমাজের প্রধান। তিনি তাদের কান্ডারি ও পথপ্রদর্শক। তার নিয়ন্ত্রণেই গোটা বিষয়-আশয় পরিচালিত হতো। তবে মদিনায় বসবাসরত গোষ্ঠীগুলো ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। সেজন্য তাকে ৩ শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে ৩ ধরনের প্রতিক্রিয়া ও আচরণের সম্মুখীন হতে হতো। যথা—**এক.** নবিজির সম্মানিত সাহাবিগণ। **দুই.** মদিনার মুশরিক সম্প্রদায়, যারা তখনো ঈমান আনেনি। **তিন.** অভিবাসী ইহুদি।

[এক] মক্কার মুসলিমরা মদিনায় এসে তাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত এক রূপ দেখতে পায়। মক্কায় থাকাকালে তারা একই দ্বীনের অনুসারী এবং একই লক্ষ্যের অভিমুখী হলেও, ছিল এক ধরনের বন্দিজীবনে। তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না। তারা অসহায়, দুর্বল ও লাঞ্ছিতের মতো দিনযাপন করত। তাদের জীবন পরিচালিত হতো একরকম মক্কার কাফিরদের নির্দেশে। সে সময় মক্কায় নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ ইসলামিক সমাজ কায়েম করার সামর্থ্য তাদের মোটেও ছিল না। তাই মক্কার সময়কালে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে শুধু ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোই অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু বিধান আরোপ করেছেন, যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে পালন করতে তারা সক্ষম ছিলেন। যেমন : ভালো ও কল্যাণকর কাজের প্রতি দাওয়াত, সুন্দর ও মানবিক আচরণ, খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি।

কিন্তু মদিনায় মুসলিমদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার মুসলিমরা প্রথম দিন থেকে স্বাধীন; স্বায়ত্তশাসিত। কারও কাছে কোনো ধরনের জবাবদিহিতায় বাধ্য নয় তারা। বন্দিত্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। মক্কার মুসলিমরা এখানে এসে ভিন্ন সভ্যতা, আবাসনব্যবস্থা, জীবনপদ্ধতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবকাঠামো, আন্তঃরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তিসন্ধির মতো নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সে কারণে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে বৈধ-অবৈধ, ইবাদত-শিষ্টাচার ও লেনদেনের সামগ্রিক একটি রূপরেখার।

এক কথায়, মদিনায় জাহিলি সমাজব্যবস্থার বিপরীতে পূর্ণাঙ্গ একটি ইসলামি সমাজব্যবস্থা গঠনের দরকার হয়ে পড়ে, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করবে, যে সমাজব্যবস্থা পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্য সব সমাজের তুলনায় অধিক মানবিক হবে, হবে আল্লাহ-বিশ্বাসী ও কল্যাণকামী। এরকম একটি সমাজ বিনির্মাণের আশা বুকে নিয়েই তো তারা দীর্ঘ ১০ বছরেরও অধিক সময় ধরে কাফিরদের অকথ্য নির্যাতন সয়ে এসেছেন।

আর এরকম একটি সমাজব্যবস্থা একদিনে গড়ে তোলা যায় না। বরং এজন্য দরকার পড়ে দীর্ঘ সময়ের। যে সময়ে মানুষকে একটু একটু করে নতুন জীবনব্যবস্থা ও শরিয়তের বিধিবিধানের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হয়, তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হয় এবং বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়। সেভাবেই মহান আল্লাহ নতুন ইসলামি সমাজব্যবস্থার জন্য ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিধান অবতীর্ণ করেন। নবিজি মুসলিমদের সেসব শিক্ষা দেন। নতুন বিধান অনুসারে তাদের গড়ে তোলেন। সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

তিনিই নিরক্ষরদের কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ। এর আগে তারা নিমজ্জিত ছিল স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।[১]

সাহাবিরাও সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর প্রতিটি বিধান নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করেন। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন—

---

[১] সুরা জুমুআ, আয়াত : ২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

মুমিন তো তারাই, যাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে আল্লাহর স্মরণে; যাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হলে, সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা ভরসা রাখে কেবলই তাদের প্রতিপালকের ওপর।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যায়ক্রমে ঠিক কীভাবে আল্লাহর বিধান ইসলামি সমাজে বাস্তবায়িত করেন, সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। আমরা কেবল যতটুকু অনিবার্য, আলোচনার স্বার্থে তা-ই মাঝেমধ্যে তুলে ধরব।

ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েম করা এবং তাতে মুসলিমদের অভিযোজন ঘটানোই ছিল সে সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ; কিন্তু মক্কার জীবনে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সুযোগ বা পরিসর—কোনোটিই ছিল না মুসলিমদের হাতে। বৃহত্তর পরিসরে ইসলামি দাওয়াত ও নবিজির পয়গামের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে—এমন এক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা, যে সমাজে নির্বিঘ্নে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা যায়। যদিও এটি একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তবে এই সময়ের মধ্যে এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন মুসলিমদের হতে হয়েছে, যার তাৎক্ষণিক সুরাহা ছিল অনিবার্য।

মদিনায় তখন কার্যত তিন শ্রেণির লোকের বসবাস থাকলেও মুসলিমদের মধ্যে ভাগ ছিল দুটি। প্রথম ভাগে ছিলেন আনসার সাহাবিগণ, যারা মদিনার স্থানীয় ও মুহাজিরদের আশ্রয়দাতা; তাদের ভিটেমাটি ও ব্যবসা-বাণিজ্য—সবকিছুই যথারীতি বহাল ছিল। তাদের জীবনজীবিকা নিয়ে বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন মুহাজির সাহাবিরা, যারা কেবল দ্বীনের চেতনা বুকে ধারণ করে ভিটেমাটি ও সর্বস্ব ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছেন সুদূর মদিনায়। তাদের এখানে না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, আর না আছে কোনো অর্থসম্পদ বা রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা। তারা আক্ষরিক অর্থেই উদ্বাস্তু ও অভিবাসী। এই শ্রেণির সংখ্যা নেহাত কম ছিল না; বরং দিনকে দিন বেড়েই চলছিল। কারণ সে সময় যারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করত, তাদের জন্য মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করা অত্যাবশ্যক ছিল।

সে সময় মদিনাও তেমন সমৃদ্ধ কোনো শহর নয়। তাছাড়া নতুন শরণার্থীদের বরণ করে নেওয়ার মতো অবস্থা না থাকায়, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন অনেকটাই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। অপরদিকে মদিনার মুসলিমদের সঙ্গে ইসলামবিরোধী শক্তির অর্থনৈতিক

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ২

বয়কট চলতে থাকে। ফলে আরও নাজুক হয়ে পড়ে দেশের পরিস্থিতি।

[দুই] দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে মদিনার মুশরিকেরা, মুসলিমদের ওপর যাদের কোনো কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব নেই। তাদের অনেকের মনে ইসলামগ্রহণের সুপ্ত ইচ্ছা থাকলেও বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামগ্রহণের সৎসাহস ছিল না। এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করত না। তাদের এই নিরপেক্ষ অবস্থান একসময় তাদেরকে ইসলামের দিকে টানে এবং তাদের অনেকেই খাঁটি মুমিন বান্দায় পরিণত হন।

তবে এদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা ভেতরে ভেতরে নবিজি ও মুসলিমদের চরম ঘৃণা করত। অবশ্য পরিস্থিতির চাপে অন্তরের বিদ্বেষ বাইরে প্রকাশ পেতে দিত না। মুসলিমদের প্রতি সম্প্রীতি দেখিয়ে চলত। তাদের প্রধান ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই। বুআস যুদ্ধের পর আউস ও খাযরাজ তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। যদিও এ দুটি গোত্র আগে কখনো কাউকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেনি। তাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করার দিনক্ষণ ঠিক হচ্ছিল—এমন সময় নবিজি মদিনায় আসেন। সমগ্র মদিনা তাকে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়। তখন থেকেই আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মনে করত, 'মুহাম্মাদের কারণে মদিনার নেতৃত্ব তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে!' তাই সে নবিজিকে মনে মনে প্রচণ্ড ঘৃণা করত।

কিছুদিন পর বুঝতে পারে, পরিস্থিতি আর আগের মতো নেই, মুশরিক হয়ে থাকলে তাকে পার্থিব ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। তাই বদর যুদ্ধের পর সেও প্রকাশ্যে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেয়। মুসলিমদের ক্ষতি করা যায়—এমন কোনো সুযোগ সে কখনো হাতছাড়া করত না। যারা আশায় ছিল, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই নেতৃত্বে এলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ তারা লাভ করবে, তারাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে শুরু করে। তাদের জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে কখনো কখনো দুর্বলমনা মুসলিমদেরও নিজেদের দালাল হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করে তারা।

[তিন] তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে অভিবাসী ইহুদি, যারা রোমান ও অশুরীয়দের নিপীড়নের শিকার হয়ে আরব-ভূখণ্ডে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। জাতিগতভাবে তারা যদিও হিব্রু জনগোষ্ঠীর, কিন্তু আরবে আসার পর আরবীয় পোশাক, ভাষা ও সভ্যতা তারা গ্রহণ করে নেয়। এমনকি গোত্র ও ব্যক্তির নামও তারা আরবিতে রাখতে শুরু করে। আরবদের সঙ্গে তাদের আন্তঃধর্মীয় বিবাহও সংঘটিত হয়। তবুও তারা জাতিগত অহংবোধ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা ধরে রেখেছিল। নিজেদেরকে ইসরাইলি ইহুদি বলতে গর্ববোধ করত, বিপরীতে আরবদেরকে অশিক্ষিত, অচ্ছুত এবং নিম্নশ্রেণি বলে আখ্যায়িত করত। আরবদের সম্পদ তারা নিজেদের জন্য হালাল মনে করত। মহান আল্লাহ তাদের চিন্তাভাবনাকে ছোট্ট একটি আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন এভাবে—

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝٣

মানুষ কি মনে করে, আমি তার হাড়গুলোকে একত্র করতে পারব না?[১]

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٧٥

কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক আছে, যার কাছে আপনি বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও সে আপনাকে ফেরত দেবে। আবার এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দিনারও যদি আমানত রাখেন, তবে তার পেছনে লেগে না থাকলে, সে আপনাকে তা ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, মূর্খদের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে।[২]

নিজেদের ধর্ম প্রচারের কোনো মানসিকতা তাদের ছিল না। তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ কয়েকটি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—কর্মহীন নিছক প্রত্যাশা, জাদুবিদ্যা, ঝাড়ফুঁক এবং এছাড়াও বিভিন্ন কুসংস্কার। এসব ঠুনকো অধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে গর্বে মাটিতে পা পড়ত না তাদের। নিজেদেরকে তারা আসমানি কিতাব সম্পর্কে জ্ঞানী, জাতিতে শ্রেষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানে বিশ্বের একমাত্র যোগ্য জাতি বলে মনে করত।

তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে তখন বেশ এগিয়ে। মদিনার শস্য, খেজুর, মদ এবং কাপড়ের ব্যবসা তাদের হাতের মুঠোয়। কাপড়, শস্য ও মদ বাহির থেকে আমদানি করত তারা। মদিনা থেকে রপ্তানি করত খেজুর। আরবদের কাছে তারা চড়ামূল্যে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি আরও একটি কাজে তারা বেশ সিদ্ধহস্ত। আর তা হলো সুদি কারবার। আরব নেতাদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিত তারা। অদূরদর্শী আরবরা নিজেদের নাম-যশ-খ্যাতির জন্য কবিদেরকে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সম্পদ দিত, সাধারণ মানুষের মধ্যেও অকাতরে দান-সাদাকা করত। তারপর যখন অর্থসম্পদ হারিয়ে দেউলিয়ার মতন অবস্থা, তখন তাদের ঋণ আর পরিশোধ করতে পারত না। এই সুযোগে ইহুদিরা আরবদের জমিজমা, বাড়িঘর ও খেতখামার বন্ধকি

[১] সুরা কিয়ামা, আয়াত : ৩

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৭৫

হিসেবে হাতিয়ে নিত। কেউ ঋণ প্রদানে অক্ষম হলেই তারা হয়ে যেত তার সকল সম্পদের মালিক।

অবৈধ ব্যবসার পাশাপাশি আরবের গোত্রে গোত্রে বা মানুষ মানুষে ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ লাগানোয় তারা ছিল ভীষণ ওস্তাদ। এতটাই সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বুনত যে, কেউই আঁচ করতে পারত না। এই বিবাদগুলো ধীরে ধীরে রূপ নিত এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে। যখনই যুদ্ধের আগুন নিভে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছত, পুনরায় সেখানে ফুঁ দিয়ে তারা সেই আগুনকে আরও বাড়িয়ে দিত। আর যুদ্ধের সময় তারা ঘরে গিয়ে চুপটি মেরে বসে থাকত। যখনই অস্ত্র, খাদ্য বা অর্থের প্রয়োজন হতো, তখনই তারা হাজির হয়ে যেত। সুযোগ বুঝে তাদের মাথার ওপর চাপিয়ে দিত ঋণের বোঝা। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লাগিয়ে তাদের প্রধান দুইটি ফায়দা হতো। প্রথমত নিজেদের ইহুদি জাতিসত্তাকে ধরে রাখা। দ্বিতীয়ত, সুদের কারবার সচল রাখা।

ইয়াসরিবে তিনটি ইহুদি গোত্র ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ—**এক.** বনু কাইনুকা, যারা খাযরাজের মিত্রপক্ষ এবং এদের বসবাস মদিনার অভ্যন্তরে। **দুই.** বনু নাজির। **তিন.** বনু কুরাইজা।

শেষের দুই গোত্র—বনু নাজির ও বনু কুরাইজা ছিল আউস গোত্রের সহযোগী ও মিত্রপক্ষ। মদিনার উপকণ্ঠে তাদের অবস্থান। এই গোত্রগুলোর কারণে সবসময় আউস এবং খাযরাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ লেগেই থাকত। বুআস যুদ্ধে তারাও নিজ নিজ মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

আরবদের সাথে সহাবস্থান ছিল বলেই যে তারা ইসলামকে ভালো চোখে দেখবে, এমনটা মনে করা ভুল। কারণ নবিজি জাতিগতভাবে আরব ছিলেন। আর তারা নিজেদের গোত্র ও সম্প্রদায়ের বাইরে কাউকেই গ্রহণ করতে পারত না। তাদের চিন্তাচেতনা জুড়ে থাকত কেবলই ইহুদি জাতীয়তাবাদ। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে একটি জিনিস শুধু ভালো বা কল্যাণকর হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং ইহুদি জাতীয়তাবাদের মানদণ্ডে উন্নীত হওয়াও জরুরি ছিল।

অন্যদিকে ইসলাম হলো এক কল্যাণময় ও প্রায়োগিক ধর্ম, যা মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি এনে দেয়। পারস্পরিক কলহ-বিবাদ দূর করে সবার মধ্যে জাগ্রত করে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ। সমাজের প্রত্যেককে আমানত, বিশ্বস্ততা, বৈধ উপার্জন এবং সততায় উদ্বুদ্ধ করে একটি কল্যাণ-সমাজ গড়ে তোলে। যার ফলে আরব গোত্রগুলো যুদ্ধবিগ্রহ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে আসে; হালাল উপার্জনে মনোনিবেশ করে এবং সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড় করায়। এর ফলশ্রুতিতে ইহুদিরা মারাত্মক অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়ে। কারণ তাদের অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই সুদনির্ভর। ইসলাম এসে সুদ হারাম করে দিলে তাদের সে ভিত্তি ধসে পড়ে। তারা দিব্যি বুঝতে পারে, শিগগিরই তাদের সুদভিত্তিক অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে। ঋণের

অর্থ দিতে না পেরে যারা জমিজমা, বাগান ও বাড়িঘর তাদের কাছে বন্ধক রেখেছিল, তারা অচিরেই হয়তো তা ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

মদিনায় যখন দ্বীনের দাওয়াতের প্রচার শুরু হয়, তখন থেকেই তারা তাদের পরিণতির ব্যাপারে সজাগ হয়ে ওঠে। ইসলাম ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে। যদিও প্রথমদিকে তারা সরাসরি বিরোধিতায় যেত না। কিন্তু দিন যতই গড়াতে থাকে, ততই তাদের মুখোশ সরে যেতে থাকে। উম্মুল মুমিনিন সাফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাব রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন—

'আমার বাবা ও চাচা দুজনেই আমার ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাকে ভালোবাসতেন। আমার অন্য ভাইবোন কাছে থাকলেও সবাইকে রেখে আমাকেই আদর করতেন তারা। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল মদিনায় এসে প্রথম যখন কুবায় অবস্থান করেন, তখন আমার বাবা ও চাচা ভোর রাতে তাকে দেখতে যান। তারা যখন ফিরে আসেন, তখন সন্ধ্যা বেলা। ক্লান্ত-শ্রান্ত-বিপর্যস্ত হয়ে তারা বাড়ি ফেরেন। এতটাই মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন যে, দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি মাটিতে পড়ে যাবেন। তাদের দেখে প্রফুল্ল মনে সামনে এগিয়ে যাই। কিন্তু তারা তখন দুশ্চিন্তায় এতটাই আচ্ছন্ন, আমি যে সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। এ সময় চাচা আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেন, 'যাকে দেখে এলাম তিনিই কি সেই ব্যক্তি?' বাবা বলেন, 'হ্যাঁ, তিনিই সেই ব্যক্তি।' পুনরায় চাচা জানতে চান, 'তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?' বাবা তখন বলেন, 'যতদিন বেঁচে আছি, তার সঙ্গে শত্রুতাই করে যাব, দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।'[১]

মদিনায় ইসলাম প্রবেশের সময় এই ইহুদিদের অবস্থান কেমন ছিল, তা আরও স্পষ্ট করে তোলে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান ইহুদি আলিম। বনু নাজ্জারে নবিজির আগমনের খবর শুনে তিনি দ্রুত তার সাক্ষাতে যান। তিনি আসলেই সত্য নবি কি না—সেটা যাচাই করতে তিনি এমন কিছু প্রশ্ন করেন, যা নবি ছাড়া সাধারণ কোনো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে নবিজি যে উত্তর দেন, তা শুনে সেখানেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নবিজিকে বলেন, 'ইহুদিরা এমন এক জাতি, মিথ্যা অপবাদ দেওয়ায় যাদের কোনো জুড়ি নেই। আমার ইসলামগ্রহণের খবর যদি তারা যদি জানতে পারে, তবে নির্ঘাত তারা আমার নামে আপনার কাছে মিথ্যে বলবে।'

তার কথা যাচাই করার জন্য নবিজি তখনই ইহুদিদের ডেকে পাঠান। তারা আসার আগেই আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ঘরের ভেতরে গিয়ে বসেন। নবিজি তাদের জিজ্ঞেস

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫১৮-৫১৯

করেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম লোক হিসেবে কেমন?' তারা উত্তরে বলে, 'তিনি আমাদের একজন প্রখ্যাত আলিম। তার বাবাও একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি নিজে শ্রেষ্ঠ, তার পিতাও ছিলেন শ্রেষ্ঠ।' নবিজি তখন বলেন, 'এখন সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী হবে?' এ কথা শুনে তারা ৩ বার আল্লাহর পানাহ চায়। অমনি আব্দুল্লাহ ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান, আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু। অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল।'

তার শাহাদাহ পাঠ শেষ হতে না হতেই তারা সমস্বরে বলে ওঠে, 'ও একটা নিকৃষ্ট! জন্মেছেও একটা নিকৃষ্ট মানুষের ঘরে!' আরও কিছু অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তারা সেখান থেকে বিদায় নেয়।

তারা চলে যাওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ঘর থেকে বের হয়ে বলেন, 'ও আমার ইহুদি ভাইয়েরা, আল্লাহকে ভয় করো। সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তোমরা নিশ্চিতভাবেই জানো, তিনি আল্লাহর রাসুল। তিনি সত্যধর্ম-সহ মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন।' কিন্তু উপস্থিত ইহুদিরা সঙ্গো সঙ্গো অস্বীকার করে বলে, 'তুমি মিথ্যে বলছ।'[১]

মদিনায় প্রবেশের পর ইহুদিদের ব্যাপারে এটা ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম অভিজ্ঞতা। এ পর্যন্ত যাদের নিয়ে আলোচনা হলো; হোক তারা শত্রু বা মিত্র—সবাই মদিনার মানুষ। মদিনার বাইরে ইসলামের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরোধী শক্তি ছিল কুরাইশ। মুসলিমরা তাদের হাতে দীর্ঘ ১০ বছর নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার হয়। তারা বয়কট, অবরোধ, ভীতিপ্রদর্শন-সহ নিপীড়নের এমন কোনো উপায় বাকি রাখেনি, যা মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করেনি। মুসলিমদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে তারা প্রায় ১ যুগ অঘোষিত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে।

মদিনায় হিজরতের পর তাদের ঘরবাড়ি, সহায়সম্পত্তি—সবকিছুই রেখেছিল কুক্ষিগত করে। তাদের স্ত্রী-সন্তানকে আটকে রেখেছিল, বহু মানুষকে তারা করেছিল বন্দি ও লাঞ্ছিত। এসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডেই তারা সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং আল্লাহর প্রেরিত রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার মতো জঘন্য ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল তারা।

এরপর যখন মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে ৫০০ কিলোমিটার দূরে মদিনায় চলে আসে, তখনো

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩২৯, ৩৯৩৮, ৪৪৮০

রাজনৈতিকভাবে তাদের কোণঠাসা করতে শুরু করে নতুন ষড়যন্ত্র। বাইতুল্লাহর সেবক ও রক্ষক হওয়ার কারণে কুরাইশদের প্রতি আরব মুশরিকদের যে নিঃশর্ত আনুগত্য ছিল, যে ধর্মীয় ও পার্থিব নেতৃত্ব তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রের ওপর লাভ করেছিল, তা পুঁজি করে পুরো আরবজাতিকে উত্তেজিত করতে চায় তারা। সবাইকে ব্যবহার করতে চায় মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে। ফলে মদিনা অর্থনৈতিক বয়কটের শিকার হয় এবং লক্ষণীয়ভাবে তাদের আমদানি কমতে শুরু করে।

এদিকে দিনদিন মক্কাবাসী মুসলিম শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে মদিনায়। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে নতুন ভূমিতে যাওয়ার পরও মক্কার কাফির-মুশরিকরা একটা যুদ্ধ-মতন অবস্থা তৈরি করে রেখেছিল। অনেক অমুসলিম গবেষক নির্বুদ্ধিতাবশত এই শত্রুতার দায় মুসলিমদের ওপর আরোপ করে। কিন্তু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই অনুধাবন করতে পারবে, কারা এই শত্রুতা জিইয়ে রেখেছিল।

ওরা যেমন মুসলিমদের অর্থসম্পদ এবং জমিজমা বাজেয়াপ্ত করেছিল, মুসলিমদেরও অধিকার আছে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার। তাদের ওপর যে পরিমাণ নির্যাতন ওরা চালিয়েছিল, মুসলিমদেরও সে পরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আছে। তাদের জীবনকে যে পরিমাণ দুর্বিষহ করে তুলেছিল, সে অনুযায়ী অধিকার আছে—তাদের জীবনকেও বিষিয়ে তোলার, অধিকার আছে সমানে সমান তাদের শায়েস্তা করার, যেন দুর্বল ভেবে মুসলিমদের ওপর পুনরায় গণহত্যা চালানোর সাহস করতে না পারে তারা।

নবিজি মদিনায় আগমনের পর একজন রাষ্ট্রপ্রধান এবং আল্লাহর প্রেরিত নবি হিসেবে সামাজিক, গোত্রীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন। তিনি মদিনায় একই সঙ্গে একজন শাসক ও শরিয়তপ্রণেতা, যদিও নবিজি দয়া ও ভালোবাসার দিকটাকে প্রাধান্য দিতেন বেশি; কিন্তু একজন শাসক হিসেবে মদিনার বিদ্যমান বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নম্রতার পাশাপাশি অনেক সময় কঠোরতাও অবলম্বন করতে হতো তাকে। তারপর ধীরে ধীরে গোটা মদিনা এবং আরব জনগোষ্ঠী ইসলামের দিকে আসতে শুরু করে। সম্মানিত পাঠক, সামনের অধ্যায়গুলোতে আরও স্পষ্টভাবে এ বিষয়গুলো আপনি জানতে পারবেন।

আলোকিত সমাজের শুভসূচনা

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা জেনে এসেছি, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিনে মদিনায় বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করেন। সেদিন ছিল প্রথম হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল তথা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর। তিনি আবু আইয়ুব আনসারির বাড়ির সামনে একটি খালি জমিতে উট থেকে নামেন এবং সেখানেই ঘোষণা দেন—ইনশাআল্লাহ, এখানেই হবে আমাদের কেন্দ্রস্থল। তারপর তিনি সাময়িকভাবে আবু আইয়ুবের বাড়িতে অবস্থান করেন।

মাসজিদে নববির ভিত্তিস্থাপন

মদিনায় প্রবেশের পর নবিজি প্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তা মাসজিদে নববি নির্মাণ করা। যে স্থানে উটটি প্রথমে এসে বসেছিল, সেখানেই মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। দুজন ইয়াতিম এই জমিটির মালিক। তারা জমিটি নবিজিকে হাদিয়া দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি সেটি কিনে নেন। মসজিদ নির্মাণের কাজে নবিজি নিজে অংশগ্রহণ করেন। সবার সঙ্গে ইট-পাথরও বহন করেন। কাজ করার সময় তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে—

এই দুনিয়া তুচ্ছ অতি, আখিরাতই সার।
তোমার ক্ষমা পায় যেন মুহাজির-আনসার।

আরও একটি কবিতা সেদিন তার মুখে শোনা গিয়েছে—

আজকের এই বোঝা খাইবারের বোঝা নয়;
আল্লাহর কাছে এই কাজ পবিত্র ও পুণ্যময়।

নির্মাণকাজে নবিজির স্বয়ং অংশগ্রহণ ও কবিতাপাঠ, সাহাবিদের কাজে আরও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আবেগের জোশে তাদের একজন এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে শুরু করে—

আমরা যদি বসে থাকি, নবি করেন কাজ
কেমন করে মুখ দেখাব, রাখব কোথায় লাজ?

যে স্থানটিতে মাসজিদে নববির কাজ শুরু হয়, সেখানে মুশরিকদের প্রাচীন কিছু কবর, উঁচুনিচু ভূমি এবং খেজুর ও গারকাদগাছ ছিল। কবরগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়, খেজুর গাছ ও গারকাদ গাছ কেটে কিবলার দিকে সারিবন্ধ করে রাখা হয়, সেইসাথে সমতল করা হয় পুরো ভূমি। তখন কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিসের দিকে। দরজার দুই পাশ পাথরের তৈরি। কাঁচা ইট দিয়ে নির্মিত মসজিদের দেওয়াল। ছাদ বানানো হয় খেজুর গাছের বাকল ও ডালপালা দিয়ে। খুঁটি নির্মাণে কাজে লাগে খেজুর গাছের গুঁড়ি। মসজিদের মেঝে বালু এবং নুড়ি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে। মসজিদে ৩টি প্রবেশপথ রাখা হয়। কিবলার দিক থেকে পেছন দিক পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ হাত। প্রস্থও প্রায় এমনই। মসজিদের ভিত ছিল ৩ হাত গভীরে। নবিজির স্ত্রীদের থাকার জন্য মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে কাঁচা ইট দিয়ে কয়েকটি ঘর বানানো হয়, যার ছাদ তৈরি হয়েছে খেজুর গাছের ডালপালা আর বাকল দিয়ে। মসজিদ ও ঘর নির্মাণের পর নবিজি আবু আইয়ুবের

ঘর থেকে চলে আসেন।[১]

মাসজিদে নববি শুধু সালাত আদায় এবং ইবাদত-বন্দেগির স্থান হিসেবে নির্ধারিত ছিল না; বরং এই মসজিদ থেকে শিক্ষাদীক্ষা, তালিম-তাযকিয়া এবং জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হতো। মসজিদ মূলত মুসলিমদের সম্মেলনকক্ষ। এখানে সহযোগিতা, সমবেদনা এবং সহমর্মিতার বাণী প্রচারিত হতো। জাহিলি যুগের গোত্রে গোত্রে হিংসা-বিদ্বেষ এবং গৃহযুদ্ধ ভুলে তারা এই মসজিদের ছাদের নিচে একে অপরের সঙ্গে ভাই-ভাই হয়ে বসত। এই মসজিদ থেকেই যুদ্ধ, শান্তি, সন্ধির ঘোষণা উচ্চারিত হতো এবং এখানেই অনুষ্ঠিত হতো শলাপরামর্শের বৈঠকসভা। পরিচালিত হতো বিচারিক কার্যক্রম। মক্কা থেকে আগত অসংখ্য নিঃস্ব শরণার্থী, যাদের স্বজন, সন্তান বা সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না, রাতের বেলা এখানেই হতো তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই।

প্রথম হিজরির শুরুর দিকে আজান প্রবর্তন করা হয়। এই জান্নাতি আওয়াজ মসজিদ থেকে পাঁচ বেলা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হতো, যার সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যেত মিথ্যা ধর্ম এবং কুসংস্কারের দম্ভ। মদিনার আলো-বাতাস উজ্জীবিত হয়ে উঠত তাওহিদের প্রদীপ্ত ঘোষণায়। আজানের শব্দগুলো কীভাবে নির্ধারিত হয়, আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনি আব্দি রাব্বিহির স্বপ্নের মাধ্যমে সেই ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ। যা বিস্তারিত *জামিউত তিরমিযি, সুনানু আবি দাউদ, মুসনাদু আহমাদ* ও *সহিহু ইবনি খুযাইমার* বর্ণনায় উঠে এসেছে।[২]

নজিরবিহীন ভ্রাতৃত্ববন্ধন

মদিনায় আসার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ নির্মাণের মতোই আরও একটি মহৎ ও অনন্য কাজ করেন, বিশ্ব-ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই। তিনি শরণার্থী মুহাজির মুসলিম এবং মদিনার আনসার মুসলিমদের মধ্যে ঐতিহাসিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। ইবনুল কাইয়িম বলেন, আনাস ইবনু মালিকের বাড়িতে প্রায় ৯০ জন আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে তিনি সম্প্রীতি গড়ে তোলেন। ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন তাদের মাঝে, যারা সুখেদুখে একে অপরের পাশে দাঁড়াবে এবং মৃত্যুর পর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মতো একে অপরের সম্পদের ওয়ারিসও হবে। বদর যুদ্ধ পর্যন্ত উত্তরাধিকারের এই বিধান বলবৎ ছিল। মহান আল্লাহ তাআলা যখন এই আয়াত নাযিল করেন—

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪২৮, ১৮৬৮, ৩৯৩২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৪৭৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৯; *জামিউত তিরমিযি* : ১৮৭; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৩৭০; *বুলুগুল মারাম*, ইবনু হাজার আসকালানি, পৃষ্ঠা : ১৫

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধানমতে তারা পরস্পরের বেশি হকদার। নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত।[১]

এই আয়াত নাযিলের পর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের এই উত্তরাধিকার আইন বাতিল হয়ে যায়।

কারও কারও মতে, নবিজি মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভিন্ন একটি বন্ধন রচনা করেন। তবে এই মতটি সঠিক নয়। এর কারণ তারা একই গোত্রের মানুষ এবং একে অন্যের আত্মীয় হওয়ার সুবাদে তাদের ভেতর আগে থেকেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন মজবুত ছিল। এ কারণে তাদের মাঝে নতুন করে আর বন্ধন তৈরি করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। অপরদিকে আনসারদের সঙ্গে মুহাজিরদের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। তাই নবিজি এই দুই জাতির মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করে এক অনন্য নজর সৃষ্টি করেন।[২]

মুহাম্মাদ আল-গাযালি মদিনার এই ভ্রাতৃত্বের অসাধারণ একটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই ভ্রাতৃত্বের মূল অর্থই হচ্ছে জাহিলি যুগের অন্যায় গোত্রপ্রীতি এবং জাতীয়তাবাদের অবসান ঘটানো। মানুষের একমাত্র পরিচয় ইসলাম; যাতে বংশ, বর্ণ, দেশ ও ভূমি-পরিচয়ের কোনো স্থান নেই। কে উত্তম আর কে অধম, নির্ধারিত হবে মানুষের তাকওয়া ও আল্লাহভীতির মাপকাঠিতে।

এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কেবল গালভরা কোনো বুলি নয়। নবিজি একটি বাস্তব রূপ দিয়েছেন এখানে। এই ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে জুড়ে ছিল রক্ত-মাংসের সম্পর্ক, শুধু কুশল বিনিময় এবং খোঁজখবরের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ভ্রাতৃত্বের মধ্যে নিঃস্বার্থ সমবেদনা, সহানুভূতি এবং অন্যের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষা সর্বদা জাগ্রত ছিল। মদিনার নতুন সমাজ এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ওপরেই টিকে থাকে বছরের পর বছর।[৩]

মুহাজিররা মদিনায় আসার পর নবিজি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এবং সাদ ইবনু রবিআর মধ্যে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাই আব্দুর রহমানকে সাদ প্রস্তাব দেন, 'আমি আনসারদের মধ্যে বেশি সম্পদশালী মানুষ। আমার যা সম্পদ আছে, দুই ভাগে ভাগ করব। আমার দুজন স্ত্রী আছে, আপনার যাকে পছন্দ; আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। ইদ্দত শেষ হলে আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন।' আব্দুর রহমান ইবনু

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৭৫

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৬

[৩] *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ১৪০-১৪১

আউফ বলেন, 'আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদে বারাকাহ দান করুন।' এরপর তিনি এখানকার বাজার কোথায়, তা জানতে চাইলেন। তারা তাকে বনু কাইনুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। বাজার থেকে ঘরে ফেরার সময় তিনি কিছু পনির ও ঘি সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রতিদিন সকাল বেলা বাজারে যেতে লাগলেন। কয়েকদিন পর তিনি নবিজির মজলিসে আসেন, তার গায়ে তখন হলুদ রং লেগে ছিল। নবিজি জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার?' তিনি বলেন, 'বিয়ে করেছি।' নবিজি জিজ্ঞেস করেন, 'মোহর কত দিয়েছ?' তিনি বলেন, 'খেজুর দানার সমপরিমাণ স্বর্ণ।'[১]

আবু হুরাইরা বলেন, আনসার সাহাবিরা একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বলেন, 'আমাদের ভাই এবং আমাদের মধ্যে খেজুর-বাগান ভাগ করে দিন।' আল্লাহর রাসুল অসম্মতি প্রকাশ করেন। তারা মুহাজিরদেরকে তখন এই প্রস্তাব দেন, 'তোমরা তাহলে বাগানে পরিশ্রম করো। আমরা তোমাদেরকে ফসলে অংশীদার বানাব।' মুহাজির সাহাবিরা আনন্দচিত্তে তা মেনে নেন।[২]

এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি, আনসার সাহাবিরা মুহাজির সাহাবিদের কতটা ভালোবেসে কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য তারা কতটা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মুহাজির সাহাবিদের মাঝেও ঠিক ততটুকু সততা ও আমানতদারিতা দেখা গিয়েছিল। তাদের এই উদারতাকে তারা সুযোগ কিংবা দুর্বলতা হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং প্রয়োজন ছাড়া তাদের কোনো ধরনের সাহায্যও গ্রহণ করেননি।

নবিজির এই ভ্রাতৃত্ব রচনার কারণে অসংখ্য সমস্যার সমাধান হয়েছিল। হিজরত-পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছিলেন তিনি, যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছিল মুহাজির সাহাবিদের আগমনের প্রেক্ষিতে।

ঐতিহাসিক মদিনার সনদ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন যেমন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সঙ্গে তিনি আরব মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যেও স্থাপন করেছিলেন সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক। জাহিলি যুগ থেকে চলে আসা গোত্রীয় বিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে তিনি কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এমন সতর্কতার সঙ্গে তিনি এটি তৈরি করেন যাতে কোনো ধরনের জাহিলি রীতিনীতি এই সনদে প্রবেশ করতে না পারে এবং তিনি যে নতুন সমাজ বিনির্মাণ করতে চাইছেন, তাতে এসবের অনুপ্রবেশ না ঘটে। আমরা এখানে সেই সনদের মৌলিক কিছু ধারা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২০৪৮, ২০৪৯, ৩৭৮০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৩২৫, ২৭১৯

তুলে ধরতে চেষ্টা করব—

‘মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়; অসীম দয়ালু। এই সনদ আল্লাহর প্রেরিত রাসুল মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রণীত, মুহাজির ও আনসার-সহ এই ভূমিতে আরও যারা বসবাস করছে এবং তাদের সঙ্গে যারা একত্রে যুদ্ধ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদের উদ্দেশে—

» তারা সবাই একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিবেচিত, অন্য জাতির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

» মুহাজিররা সবাই মিলে রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং নিজেরাই নিজেদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনবে। আনসাররাও একত্রে আগের মতো নিজেদের গোত্রভিত্তিক রক্তপণ আদায় করবে এবং নিজেদের বন্দিদের মুক্তিপণ গোত্র অনুযায়ী পরিশোধ করবে।

» কোনো দরিদ্র-অসহায় ব্যক্তির মুক্তিপণ বা রক্তপণ আদায় করার ক্ষেত্রে কোনো মুমিন অবহেলা বা অনীহা প্রকাশ করবে না।

» যে বিদ্রোহ করবে, বিদ্রোহের উসকানি দেবে অথবা নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে, তার বিরুদ্ধে সকল মুসলিম একজোট হয়ে অবস্থান নেবে, সে তার নিকটাত্মীয় বা সন্তান, যে-ই হোক না কেন।

» একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে কোনো কাফিরের বদলায় হত্যা করতে পারবে না।

» মুসলিমদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কাফিরকে সমর্থন বা সাহায্য করতে পারবে না।

» কোনো কাফিরের কারণে একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে হত্যা করতে পারবে না।

» একজন সাধারণ মুসলিমও যদি কোনো অমুসলিমকে নিরাপত্তা প্রদান করে, তাহলে সেটা রক্ষা করা অপরাপর মুসলিমদের জন্যও অত্যাবশ্যক।

» মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বিধর্মীদেরও সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের ওপর কোনো ধরনের জুলুম-নির্যাতন করা যাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্যও করা যাবে না।

» যুদ্ধ চলাকালীন শান্তি বা সন্ধিচুক্তি একত্রে সম্পাদন করতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে শান্তিচুক্তি করা যাবে না। চুক্তি হতে হবে সমতা ও ন্যায়ের সঙ্গে।

» আল্লাহর পথে পরিচালিত যুদ্ধের লাভ-ক্ষতিতে সকল মুমিন সমান ভাগীদার হবে।

» কোনো মুশরিক কোনো কুরাইশ কাফিরের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে পারবে না; এমনকি কোনো কুরাইশ কাফিরকে রক্ষা করার জন্য কোনো মুমিনের সামনে বাধা হয়েও দাঁড়াতে পারবে না।

» কেউ যদি কোনো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত হয়, তাহলে হত্যার বদলে ওই হত্যাকারীকেও প্রাণ দিতে হবে, যদি না নিহতের অভিভাবক হত্যার বিনিময় গ্রহণ করে।

» সকল মুসলিম এই সনদ বাস্তবায়নে একমত ও বাধ্য। এর বিরোধিতা করার সুযোগ কারও নেই।

» কোনো মুসলিম কোনো বিদ্রোহীকে সাহায্য বা আশ্রয় দিতে পারবে না। যে ব্যক্তি তাকে সহায়তা করবে বা আশ্রয় দেবে, তার ওপর কিয়ামতের দিন আল্লাহর লানত ও অভিসম্পাত বর্ষিত হবে; সেদিন কোনো ধরনের অর্থবিনিময়ের মাধ্যমেও শেষ রক্ষা হবে না তার।

» যখনই কোনো ক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য বা মতভেদ সৃষ্টি হবে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে এর সমাধান তালাশ করবে।'[১]

নবগঠিত সমাজে সনদের প্রভাব

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অসীম প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে এক নবসমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন। সাহাবিরা নবিজির সংস্পর্শে এসে যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা লাভ করেছিলেন, তা-ই প্রতিবিম্বিত হয় এই নতুন সমাজের দর্পণে। নবিজি তাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐশী শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করে তুলেছেন। তাদের হৃদয় থেকে নির্মূল করেছেন ঘৃণা-হিংসা ও বিদ্বেষের বিষবৃক্ষ। নববি পাঠশালায় ইবাদত, আখলাক, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের নতুন সবক ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মাঝে।

কোনো এক মজলিসে একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ?' তিনি বলেন, 'ক্ষুধার্তের মুখে খাবার তুলে দেওয়া এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।'[২]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০২-৫০৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১২; *সহিহ মুসলিম* : ৩৯

আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, আল্লাহর রাসুল মদিনায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তাকে দেখার পরেই আমার মনে হয়, কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা কখনো এমন হতে পারে না। তার জবান থেকে প্রথম যে কথাটি শুনতে পাই, 'বেশি বেশি সালাম দাও। ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাত আদায় করো এবং নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করো।'[১]

তাকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত—

» যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২]

» প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।[৩]

» তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য তুমি যা পছন্দ করো, তোমার ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করো।[৪]

» সকল মুসলিম একটি দেহের মতো, যার চোখে যন্ত্রণা হলে, পুরো শরীর যন্ত্রণা করে। মাথা ব্যথা করলে, সারা গায়ে সে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

» একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের জন্য ভবনের মতো, একটি ভবনের এক অংশ অন্য অংশকে যেভাবে মজবুত করে রাখে। (তেমনই তারাও একে অপরকে মজবুত করে রাখে)।[৬]

» তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না, হিংসা কোরো না, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না। তোমরা ভাই-ভাই হিসেবে আল্লাহর বান্দা-পরিচয়ে চলো। ৩ দিনের বেশি কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ না রাখে।[৭]

» এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই, তার ওপর সে জুলুম করবে না, তাকে কোনো

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৩৪; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭৫৭৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ৪৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮৫৪; *সহিহুল আদাবিল মুফরাদ*, পৃষ্ঠা : ৭০

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ১০; *সহিহ মুসলিম* : ৪১

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ১৩; *জামিউত তিরমিযি* : ২৫১৫

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৮৬; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪৯৫৪

[৬] *সহিহুল বুখারি* : ৪৮১; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৮৫

[৭] *সহিহুল বুখারি* : ৬০৬৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৫৮

অত্যাচারীর হাতে তুলে দেবে না। কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তাআলাও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইকে কোনো মুসিবত থেকে উদ্ধার করে, আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের দিন তাকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করবেন। কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের কোনো দোষত্রুটি মানুষ থেকে গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলাও কিয়ামতের দিন তার গুনাহ গোপন রাখবেন।[১]

» তোমরা যদি জমিনবাসীর ওপর দয়া করো, আসমানে যিনি আছেন, তিনিও তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন।[২]

» যে মুসলিম পেট ভরে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে, সে মুসলিম নয়।[৩]

» কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া জঘন্য অপরাধ এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করা কুফরি।[৪]

এছাড়াও তিনি রাস্তা থেকে ময়লা-আবর্জনা ও কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে রাখাকে সাদাকা ও ঈমানের অন্যতম অংশ বলে ঘোষণা করেছেন।[৫] মুসলিমদের দান করতে উৎসাহিত করেছেন। তাদের সামনে তিনি দানের মহত্ত্ব ও ফজিলত এমনভাবে তুলে ধরতেন যে, সবার হৃদয় গলে যেত। দানের ব্যাপারে তিনি বলতেন, 'পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, তেমনই দানও মানুষের গুনাহের আগুনকে নিভিয়ে দেয়।'[৬]

তিনি আরও বলতেন, 'কোনো মুসলিম যদি তার বস্ত্রহীন ভাইকে কাপড় পরায়, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তাকে সবুজ পোশাক পরাবেন। কোনো মুসলিম যদি তার ক্ষুধার্ত মুসলিম ভাইকে আহার করায়, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। এমনিভাবে কোনো মুসলিম যদি অপর কোনো মুসলিম ভাইয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মোহরাঙ্কিত পবিত্র শরাব পান করাবেন।'[৭]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৪৪২; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৮০

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ১৯২৪; *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ১০৫৩৭; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সহিহুল জামি* : ৫৩৭৯; *সহিহুল আদাবিল মুফরাদ*, পৃষ্ঠা : ৬৭; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪৯৯১; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *জামিউত তিরমিযি* : ২৬৩৫; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১৩২৩৫; হাদিসটি সহিহ।

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ২৯৮৯; *সহিহ মুসলিম* : ৩৫

[৬] *জামিউত তিরমিযি* : ৬১৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪২১০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫২৮৪; হাদিসটি সহিহ।

[৭] *জামিউত তিরমিযি* : ২৪৪৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬৮২; হাদিসের সনদ দুর্বল।

'অর্ধেক খেজুর দান করে হলেও নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'[১]

তিনি যেমন মুসলিমদের দান করার জন্য উৎসাহ দিতেন, তেমনই মানুষের কাছে হাত পাততে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি ধৈর্যধারণ করতে এবং অল্পে তুষ্ট হতে বলতেন। ভিক্ষাবৃত্তি বা মানুষের কাছে হাত পাতলে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির চেহারায় জখম, আঁচড় ও কামড়ের চিহ্ন থাকবে।[২] তবে বাস্তবেই কারও যদি মানুষের কাছে হাত পাতা ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় না থাকে, তাহলে তার ব্যাপার ভিন্ন।

নবিজি সাহাবিদের এই মানবিক চেতনাগুলো উজ্জীবিত রাখার জন্য এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের ফজিলত, গুরুত্ব, সাওয়াব ও প্রতিদান নিয়ে আলোচনা করতেন। আসমান থেকে অবতীর্ণ ওহির সঙ্গো সাহাবিদের সম্পর্ক তিনি দৃঢ় ও মজবুতভাবে বেঁধেছিলেন। তিনি তাদের তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিজেও শুনতেন তাদের থেকে। এই পাঠদান ও শিক্ষা-পদ্ধতির কারণে তাদের এমনিতেই উপলব্ধি হতো, ইসলামের দাওয়াত এবং সম্প্রচার কতটা গুরুত্বপূর্ণ! তাদের ওপর কতটা দায়িত্ব রয়েছে এই দ্বীনকে পুরো বিশ্বে পৌঁছে দেওয়ার।

নবিজি নিজে সক্রিয় থেকে তাদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ তৈরি করেছেন, তাদের প্রতিভাকে শানিত করেছেন, তাদের মধ্যে সঠিক মানসিকতা গড়ে তুলেছেন এবং তাদেরকে বানিয়েছেন নীতি-নৈতিকতা ও সততার এমন এক আদর্শ—যার উপমা নবি-রাসুল ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কেউ নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, 'কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলে কোনো মৃত ব্যক্তিকেই গ্রহণ করা উচিত। কারণ জীবিত কোনো মানুষই ফিতনা থেকে নিরাপদ নয়। তবে আল্লাহর রাসুলের সাহাবিরা ছিলেন অনন্য মানুষ। তাদের হৃদয় গুনাহ থেকে মুক্ত। তাদের জ্ঞান সাগরের মতো সুগভীর ও বিস্তৃত। তাদের মধ্যে ছিল না কোনো লোকদেখানো স্বভাব।

আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে বাছাই করেছেন নবিজির সাহচর্য লাভ এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করো এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। আর যথাসাধ্য তাদের চরিত্র ও জীবনী নিজেদের মধ্যে ধারণ করো। কারণ তারাই ছিলেন হিদায়াতের সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র দল।'[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন বিশ্বের সবচেয়ে মহান নেতা। তার মধ্যে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৪১৩; *সহিহ মুসলিম* : ১০১৬

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ২৩৮৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৮৪০; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ১৯৩; *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি : ১০৫; *আশ-শারিয়াহ*, আজুররি : ১১৬১

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনন্য গুণাবলির সমাহার ঘটেছিল। তিনি চরিত্র, সততা, চিন্তা, প্রতিভা এবং কর্মে এতটাই উচ্চে অবস্থান করতেন, যেখানে পৌঁছানো কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তার অলৌকিক ও অতি মানবীয় গুণ দেখে মানুষ আমৃত্যু এক মুগ্ধতা ও সম্মোহনের ভেতরে আবিষ্ট ছিল। নবিজি কোনো নির্দেশ দিলে, এক মুহূর্তের জন্যও কেউ বিলম্ব করত না। কোনো উপদেশ বা নসিহত করলে, তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালনের জন্য উঠে পড়ে লাগত।

অলৌকিক মানবিক এই গুণাবলি ও ঐশী দীক্ষার মাধ্যমে তিনি মদিনায় একটি অনন্য, অসাধারণ ও অভূতপূর্ব সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। যে সমস্যার সমাধানে সমগ্র মানবজাতিকে শত বছর চেষ্টা করতে হতো, তবুও তারা কোনো সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছতে পারত না, তিনি তা সামান্য সময়ের ভেতর করে দেখিয়েছেন। তিনি যে গুণাবলি ও শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন মানবিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যুগের ঝড় ও তাণ্ডবের বিরুদ্ধে তা সটান দাঁড়িয়ে ছিল বুক উঁচু করে, ঘুরিয়ে দিয়েছিল কুফর ও শিরকের ইতিহাসের মোড়।

ইহুদিদের সঙ্গে নতুন এক চুক্তি

মদিনায় হিজরতের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং শাসনব্যবস্থায় ঐক্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনা-রাষ্ট্রের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও তিনি রক্ষা করেন একটি সুন্দর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। রাষ্ট্রে যেন সবসময় স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে—এই লক্ষ্যেই তিনি সবাইকে নিয়ে আসেন একই ছাদের নিচে। সাম্প্রদায়িকতা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর অন্যায় ও বৈষম্যপূর্ণ পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ও উদারতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

মদিনায় মুসলিমদের সঙ্গে ইহুদি সম্প্রদায় সহাবস্থান করত। তারা মনে মনে প্রচণ্ড বিদ্বেষ-শত্রুতা পোষণ করলেও কখনো প্রকাশ্যে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করত না। নবিজি তাদের সঙ্গে এমন চুক্তি করেন, যেখানে তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা দেওয়া হয়। তিনি তাদের ওপর অন্যান্য বিজিত রাষ্ট্রপ্রধানের মতো পর্যায়ক্রমিক বিতাড়ন বা নির্বাসননীতি প্রয়োগ করেননি।

অল্প কিছু আগে আমরা যে মদিনা-সনদের কথা উল্লেখ করেছি, সেখানেও ইহুদিদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তিবিষয়ক কিছু মূলনীতি স্থান পেয়েছে; তবু আমরা এখানে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ধারাগুলো আলাদা করে তুলে ধরছি—

» বনু আউফের ইহুদিরা মুসলিমদের সঙ্গে বসবাসকারী একটি জাতি। তারা তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীন এবং মুসলিমরাও তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীন। তাদের দাসদাসীর বিধান তাদের ধর্ম অনুযায়ী হবে। বনু আউফ ব্যতীত অন্য ইহুদিদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

» ইহুদিরা নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করবে, মুসলিমরাও নিজেদের ব্যয় নিজেরা বহন করবে।

» এই সনদ-স্বাক্ষরকারীদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করবে, তাদের বিরুদ্ধে তারা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

» তারা একে অপরের কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হবে। ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে, গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকবে।

» একজনের ভুলের কারণে আরেকজন দোষী হবে না।

» মজলুম যে-ই হোক না কেন, তাকে সাহায্য করতে হবে।

» যতক্ষণ যুদ্ধ চলবে, মুসলিমদের সঙ্গে তারা যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে।

» এই সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মদিনার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা হলে বিদ্রোহ বলে গণ্য হবে।

» এই সনদধারী কারও পক্ষ থেকে কোনো ধরনের বিরোধিতা বা বিদ্রোহ প্রকাশ পেলে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল এর বিচার করবেন।

» কুরাইশের কাউকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং তাদের মিত্রপক্ষকেও না।

» যারাই মদিনায় আক্রমণ চালাবে, তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সাধ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

» এই সনদের দোহাই দিয়ে কোনো পাপী বা অন্যায়কারীকে সহায়তা করা যাবে না।[১]

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মদিনা ও মদিনার উপকণ্ঠ একটি যৌথরাষ্ট্রের অধীনে পরিচালিত হতে শুরু করে। এই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদিনা এবং রাজনৈতিক পরিভাষা যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন রাষ্ট্রপতি। এখানে মুসলিমদের রায়, বিচার এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের অধীনেই এই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। নবিজির নেতৃত্বে মদিনা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শান্তি ও নিরাপত্তার পরিধি আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে নবিজি মদিনার পার্শ্ববর্তী অনেক গোত্রের সঙ্গেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একই ধারার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০৩-৫০৪

কুরাইশদের ষড়যন্ত্র, মুনাফিকদের যোগসাজশ

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি—মক্কার কাফিররা মুসলিমদের ওপর কতটা নির্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়েছে এবং হিজরতের সময়ে মদিনায় আসার পথে মুসলিমরা কত রকমের প্রতিবন্ধকতা ও হেনস্থার শিকার হয়েছেন। এজন্য এখন ইনসাফ ও সময়ের দাবিই হচ্ছে—তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করা। কিন্তু উলটো তারাই মক্কা থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবরকম ষড়যন্ত্রের চাল চালতে থাকে। মুসলিমদের নিরাপদ আবাসস্থল এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা সহ্য করতে পারে না তারা। নিজেদের অপরাধের কথাও দিব্যি ভুলে যায়। উলটো ক্রোধের আগুনে জ্বলতে শুরু করে।

একদিন তারা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের কাছে চিঠি পাঠায়। নবিজি মদিনায় আসার আগে আউস ও খাযরাজ—বিবদমান উভয় গোত্রই তাকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে একমত হয়। কিন্তু নবিজির মদিনায় আগমন সবকিছু পালটে দেয়। তার নেতা হওয়ার স্বপ্ন যেন কর্পূরের মতো উবে যায়। এদিকে তার কাছে কুরাইশরা হুঁশিয়ারিপত্র প্রেরণ করে—

তোমরা আমাদের দুশমন মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছ। আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা হয় তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে আর নয়তো তাকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করবে। যদি তা না করো, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হব। তোমাদের যোদ্ধাদের জবাই করব এবং তোমাদের নারী ও শিশুদের বানাব দাসী।[১]

কুরাইশদের এই পত্র পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তৎপর হয়ে ওঠে। নেতৃত্ব হারানোর কারণে আগ থেকেই নবিজির প্রতি তার মনে প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। এবার তাদের এই পত্র তাকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। আব্দুর রহমান ইবনু কাব বলেন, 'এই পত্র আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের কাছে পৌঁছলে, সে তার অনুসারীদের নিয়ে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করে। নবিজিও তাদের এ ব্যাপারটা জানতে পারেন। তিনি তখন নিজেই গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'শুনেছি কুরাইশরা নাকি কঠিন হুমকিধমকি দিয়ে তোমাদের কাছে পত্র পাঠিয়েছে, যা তোমাদের আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত করেছে। মনে রেখো, তোমরা এই যুদ্ধের কারণে নিজেদের যতটা ক্ষতির মুখে ফেলবে, তার চেয়ে কুরাইশরা তোমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কত নির্বোধ! নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং নিজেদের ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যাচ্ছ!' নবিজির এসব কথায় তাদের মধ্যে ফাটল ধরে যায়। তাদের অধিকাংশই তখন যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার মতো বোকামি করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০০৪; এর সনদ সহিহ।

[২] প্রাগুক্ত

পরিস্থিতি দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই যুদ্ধের চিন্তা থেকে সরে আসে। তবে সে কুরাইশের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ চালু রাখে। মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে বিবাদ তৈরির সামান্য সুযোগও সে হাতছাড়া করত না। অন্য ইহুদিদেরকেও সে এই কাজে নিজের সঙ্গে নেয়। নবিজি একের পর এক তাদের বিবাদ ও হাঙ্গামা দমন করতে থাকেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর কোনো অবস্থান গ্রহণ করেননি। এটা ছিল নবিজির প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত।[১]

মাসজিদুল হারামে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

সাদ ইবনু মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহু উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কায় প্রবেশের পর উমাইয়া ইবনু খালফের কাছে আশ্রয় নেন তিনি। উমাইয়াকে বলে রাখেন, 'কাবাচত্বর নির্জন থাকলে আমাকে নিয়ে যেয়ো, আমি তাওয়াফ করব।'

ঠিক দুপুরের সময়, যখন চারিদিকে উত্তপ্ত লু হাওয়া, ঠিক তখন তিনি তার সঙ্গে বের হন। পথে ঘটনাক্রমে আবু জাহলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। উমাইয়ার সঙ্গে অপরিচিত একজনকে দেখে সে জানতে চায়, 'আবু সাফওয়ান, তোমার সঙ্গে কে এসেছে?' উমাইয়া সাদের পরিচয় দিলে আবু জাহল সাদকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দিয়ে ভালোই তো এখানে তাওয়াফ করে বেড়াচ্ছ! শুনেছি তোমরা নাকি তাদের সাহায্য করতেও সদাপ্রস্তুত! আজ যদি তুমি আবু সাফওয়ানের (উমাইয়ার) সঙ্গে না থাকতে, তাহলে অক্ষত অবস্থায় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারতে না।'

তার ধমক শুনে তিনিও কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'সাহস থাকে তো আমার গায়ে হাত তুলে দেখো একবার! মনে রেখো, আমাকে বাধা দিলে তুমি ধারণার চাইতেও বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে। আমি তোমাদের মদিনার পাশ দিয়ে বাণিজ্য-কাফেলার যাতায়াত চিরতরে বন্ধ করে দেব।'[২]

মক্কা থেকে কুরাইশদের হুমকি

কুরাইশের কাফিররা মক্কা থেকে মুসলিমদের উদ্দেশে পত্র প্রেরণ করে—

তোমরা মনে কোরো না, ইয়াসরিবে পালিয়ে বেঁচে গেছ। আমরা অচিরেই আসব তোমাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে, তোমাদের ভূমিতেই আমরা তোমাদের কচুকাটা করব।[৩]

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, *সহিহুল বুখারি* : ৪৫৬৬, ৪৯০৪

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯৫০

[৩] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬

এই হুমকিধমকি ও হুঁশিয়ারি বার্তা নিছক কথার কথা ছিল না; তাদের থেকে যে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র করা হতে পারে, নবিজি সেটা আগে থেকেই জানতেন। তাই শুরু থেকেই তিনি ছিলেন সতর্ক। নির্ঘুম রাত কাটাতেন তিনি। সবসময় থাকতেন সাহাবিদের নিশ্ছিদ্র পাহারার ভেতর।

আয়িশা বলেন, আল্লাহর রাসুল মদিনায় যেদিন আগমন করেন, সেদিন থেকেই তিনি নির্ঘুম রাত কাটাতেন। অবশেষে একদিন তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আমার সাহাবিদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই, যে কিনা আমাদের পাহারা দেবে?' এরই মধ্যে আমরা অস্ত্রের রিনঝিন শব্দ শুনতে পাই। আল্লাহর রাসুল জিজ্ঞেস করেন, 'কে বাইরে?' উত্তর আসে, 'আমি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস।' আল্লাহর রাসুল তাকে দেখে একটু অবাক হন। জানতে চান, 'কী মনে করে তুমি পাহারা দিতে এলে?' তিনি বলেন, 'আমার কেন যেন ভয় হচ্ছে, আপনার কোনো ক্ষতি হতে পারে। আর তাই আমি অস্ত্র নিয়ে চলে এলাম।' তখন আল্লাহর রাসুল খুশি হয়ে তার জন্য দুআ করেন।[১]

মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে মদিনার এই প্রহরা-ব্যবস্থা কয়েক রাতের জন্যই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এই টহল চলছিল অনবরত। আয়িশা বলেন, এক রাতে আল্লাহর রাসুলকে কয়েকজন সাহাবি পাহারা দিচ্ছিলেন, এমন সময় আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন, 'আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।'[২][৩]

আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি ঘর থেকে মাথা বের করে পাহারাদারদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি আমার আল্লাহর হিফাজতে আছি। এখন থেকে আর পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা চলে যেতে পারো।'

মুশরিকদের থেকে হামলার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়টি শুধু নবিজির সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল না; বরং গোটা মুসলিম উম্মাহ যেকোনো মুহূর্তে হামলার শিকার হতে পারে—এমন আশঙ্কাজনক অবস্থা বিরাজ করছিল মদিনার সবার মাঝে। এ ব্যাপারে উবাই ইবনু কাবের একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন, নবিজিকে মদিনার আনসাররা আশ্রয় দিলে পুরো পৌত্তলিক আরব তাদের শত্রুতে পরিণত হয়। এজন্য তারা অস্ত্র ছাড়া এক মুহূর্তও নিরাপদ বোধ করতেন না। ঘুমানোর সময়ও পাশে অস্ত্র রেখে ঘুমাতেন আর দিনের বেলায় চলতেন ভারী অস্ত্রশস্ত্র সাথে নিয়ে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৮৮৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৪১০; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৮১৬; হাদিসের উল্লেখিত ভাষ্যটি *সহিহ মুসলিমের*।

[২] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৩০৪৬; হাদিসটির সনদ হাসান।

আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি

এমন একটি সংকটপূর্ণ অবস্থায় উদীয়মান মুসলিম উম্মাহ নিজেদের অস্তিত্ব-সংকটের মুখোমুখি হয়। কুরাইশরা তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। দিনদিন তারা হচ্ছিল আরও উদ্ধত ও দুর্বিনীত। এমন সময় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দেন। এই অনুমতি শুধু বৈধতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যুদ্ধ তাদের ওপর আবশ্যক করে দেওয়া হয়নি তখনো। মহান আল্লাহ বলেন—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

যারা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হলো যুদ্ধ করার। কারণ তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম, যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে—শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ যদি একদল মানুষ দিয়ে আরেকদল মানুষকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত আশ্রম, গির্জা, উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ—যেখানে অহর্নিশ স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম। যারা আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ ভীষণ শক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।[১]

যুদ্ধের এই অনুমতির মূল লক্ষ্য ছিল বাতিল অপসারণ করে সেখানে আল্লাহর নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

তারা এমন যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিলে, তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ করবে, সেইসাথে নিষেধ করবে অসৎকাজ থেকে। সবকিছুর পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে।[২]

[১] সুরা হজ, আয়াত : ৩৯-৪০

[২] সুরা হজ, আয়াত : ৪১

যুদ্ধের অনুমতি-দানের আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছে, এ ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে—হিজরতের পর মদিনায় এটি অবতীর্ণ হয়। স্থান নির্ধারিত হলেও হিজরতের কতদিন পর, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। মদিনায় হিজরতের পর পরিস্থিতি আবারও অস্থিতিশীল এবং ঘোলাটে করার পেছনে একমাত্র দায়ী মক্কার কুরাইশ মুশরিকেরা। তাই সে সময় সবচেয়ে দূরদর্শী কাজটি ছিল মক্কা থেকে শামগামী কুরাইশের যে বাণিজ্যিক রুট আছে, তার নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতে নেওয়া—যাতে কুরাইশদের অপতৎপরতা কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়। সেই লক্ষ্যে নবিজি দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন—

[এক] এই পথের পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহ তো বটেই, মদিনা এবং এ পথের মধ্যবর্তী এলাকায় যারা বসবাস করত তাদের সঙ্গেও নবিজি শান্তি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ সময় মদিনা থেকে ৪০-৫০ মাইলের দূরত্বে বসবাসরত জুহাইনা গোত্র-সহ আরও কয়েকটি গোত্র ও গোষ্ঠীর সঙ্গে নবিজি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার বিবরণ আমরা সামনের অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরব।

[দুই] এই পথে টহল দেওয়ার উদ্দেশ্যে একের পর এক সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করেন।

বদর যুদ্ধের আগে ছোট ছোট অভিযান

উল্লেখিত পদক্ষেপদুটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুসলিমরা যথারীতি সামরিক তৎপরতা শুরু করে দেয়। উপরিউক্ত পথের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা যাচাই এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত গোত্র ও জনগোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মুসলিমবাহিনী সেখানে যাতায়াত শুরু করে।

তাদের এই ব্যাপক তৎপরতার পেছনে আরও একটি উদ্দেশ্য কাজ করছিল, সেটি হলো—মদিনার মুশরিক সম্প্রদায়, ইহুদি ধর্মাবলম্বী এবং আশপাশের বেদুইন আরবদের এই বার্তা দেওয়া যে, মুসলিমরা সামরিকভাবেও এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। সেইসাথে কুরাইশদের কানেও এটা পৌঁছানো—মুসলিমরা এখন আর আগের মতো দুর্বল নেই; তাদেরকে এখনো দুর্বল ভেবে থাকলে তারা ভুলের মধ্যে আছে। তাদের এই ভুল যদি না ভাঙে, তাহলে তারা অচিরেই অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হবে, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনের গতিকে ব্যাহত করে তুলবে।

তাই উচিত হবে—সংঘাতের পথে না গিয়ে সন্ধির হাত বাড়ানো; মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকা, বাইতুল্লাহয় যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি না করা এবং মক্কায় অবস্থানরত দুর্বল মুসলিমদের ওপর জুলুম বন্ধ করা। এমনটা হলে পুরো আরবে মুসলিমরা নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে এক আল্লাহর তাওহিদের বাণী প্রচার করতে পারবে।

নিচে আমরা সংক্ষেপে বদর যুদ্ধ পূর্ববর্তী সারিয়া ও গাযওয়ার (অভিযান ও যুদ্ধের)

আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব—

সিফুল বাহর অভিযান

প্রথম হিজরির রামাদান মাস। মার্চ, ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ৩০ জন মুহাজির সাহাবির ছোট্ট সেনাদল প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য শাম থেকে আগত কুরাইশ বাণিজ্য-কাফেলা আটকানো—যে কাফেলার প্রধান ছিল আবু জাহল ইবনু হিশাম, সদস্যসংখ্যা ৩০। তারা ইস অঞ্চলের প্রান্তবর্তী সিফুল বাহর বা সমুদ্র-উপকূলে পৌঁছলে মুসলিম সেনাদলের মুখে পড়ে। যুদ্ধের জন্য সৈন্যসমাবেশ রচনা করে দাঁড়িয়ে যায় উভয় পক্ষ। এমন সময় মুজদি ইবনু আমর জুহানি, যার দুই পক্ষের সঙ্গেই মিত্রতা ছিল, তিনি এসে এই যুদ্ধ থামিয়ে দেন।

হামযা যে পতাকা ধারণ করেছিলেন, সেটাই মুসলিমদের যুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম পতাকা, যা নবিজি নিজ হাতে বেঁধে দেন। পতাকার রং ছিল সাদা এবং সেটা বহনের সৌভাগ্য অর্জন করেন আবু মারসাদ কুনায ইবনু হুসাইন গানাবি।

রাবিগ অভিযান

প্রথম হিজরির শাওয়াল তথা ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের কথা। নবিজি ৬০ জন মুহাজির আরোহীর আরও একটি দল তৈরি করেন। এ দলের প্রধান নিযুক্ত করা হয় উবাইদা ইবনু হারিস ইবনি মুত্তালিবকে। তারা ধাওয়া করেন আবু সুফিয়ানের একটি কাফেলাকে। সেই কাফেলার সদস্য প্রায় ২০০ জন। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল তিরযুদ্ধ হয়, তবে সরাসরি তরবারির লড়াই সংঘটিত হয়নি। এই সারিয়ায় মক্কার যুদ্ধরত সেনাদের থেকে দুজন ব্যক্তি মুসলিমদের সঙ্গে যুক্ত হন। তারা হচ্ছেন মিকদাদ ইবনু আমর বাহরানি এবং উতবা ইবনু গাযওয়ান মাযিনি। তারা ছিলেন মুসলিম। মুশরিকদের সঙ্গে বের হয়েছিলেন, যেন সহজেই মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। আবু উবাইদার পতাকার রংও ছিল সাদা। এটি বহন করেন মিসতাহ ইবনু আসাসা ইবনি মুত্তালিব ইবনি আব্দি মানাফ।

খাররার অভিযান

তখন প্রথম হিজরির জিলকদ মাস। সে অনুযায়ী ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের কোনো একদিনের কথা। নবিজি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে ২০ সদস্যের সেনাদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তারা কুরাইশের আরেকটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে ধাওয়া করার জন্য রওনা হন। নবিজির নির্দেশ ছিল—যেন তারা খাররার অঞ্চল অতিক্রম না করেন। পায়ে হেঁটে তারা রওনা হন। দিনের বেলায় আড়ালে থেকে রাতের অন্ধকারে পথ চলতেন

তারা। তারপর বৃহস্পতিবার সকালে খাররারে পৌঁছান। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা যায়, কুরাইশের সেই কাফেলা গতকাল এদিক দিয়ে চলে গেছে। সাদ বাহিনীর পতাকার রংও ছিল সাদা। পতাকা বহন করছিলেন মিকদাদ ইবনু আমর।

আবওয়া বা ওয়াদ্দান অভিযান

দ্বিতীয় হিজরির সফর মাস তথা ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাস। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ অভিযানে বের হন। মদিনায় তার স্থানে সাদ ইবনু উবাদাকে নিযুক্ত করে যান। এই গাযওয়ায় ৭০ জন মুহাজির সাহাবি অংশগ্রহণ করেন। তারা কুরাইশের একটি কাফেলাকে পাকড়াও করার জন্য বের হন। চলতে চলতে ওয়াদ্দান নামক স্থানে পৌঁছান, কিন্তু এবারও কাফেলা হাতছাড়া হয়ে যায়।

এ যাত্রায় তিনি আমর ইবনু মাখশি জামরির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। লিখিত এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'এই চুক্তিপত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বনু দামরার উদ্দেশে। তিনি তাদের সম্পদ এবং প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে কেউ যদি হামলা করে, তাহলে তারা মুসলিমদের পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করবে। তবে তারা যদি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। নবিজি যদি তাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকেন, তাদের সেই ডাকে সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।'[১]

নবিজির যুদ্ধযাত্রা এই অভিযানের মাধ্যমেই সূচিত হয়। এই প্রথম তিনি নিজে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হন। অভিযানের সময়সীমা ছিল ১৫ দিন। পতাকার রং সাদা। এবার পতাকা বহন করেন হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব।

বুওয়াত অভিযান

তখন দ্বিতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাস। সে অনুযায়ী ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০০ জন সাহাবি নিয়ে কুরাইশের এক বিশাল বাণিজ্য-কাফেলার উদ্দেশে বের হন। কাফেলার সর্দার উমাইয়া ইবনু খালফ জুমাহি। তাদের সদস্যসংখ্যা ১০০ জনের মতো। সাথে আছে আড়াই হাজার মালবাহী উট। রদওয়া নামক এলাকা দিয়ে তারা বুওয়াত-অঞ্চলে পৌঁছায়। এবারের সফরেও কুরাইশ-কাফেলা পালিয়ে যায়। নবিজি এবার মদিনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন সাদ ইবনু মুআজকে। এই অভিযানের পতাকার রং-ও ছিল সাদা, বহন করেছিলেন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস।

---

[১] *আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭৫ (যিরিকলির ব্যাখ্যাসহ)

সাফওয়ান অভিযান

দ্বিতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাস তথা ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের দিকের ঘটনা। কুরয ইবনু জাবির ফিহরি মুশরিকদের ছোট একটি বাহিনী নিয়ে মদিনার চারণভূমিতে হামলা চালায় এবং কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। তাদের ধাওয়া করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০ জনের একটি দল নিয়ে বের হন। তারপর শত্রুদের হাঁকাতে হাঁকাতে অবশেষে বদরের নিকটবর্তী সাফওয়ান উপত্যকায় এসে থামেন। এবারও মুশরিক-বাহিনী পালাতে সক্ষম হয়। এই অভিযানেও কোনো সংঘর্ষ হয়নি। একে বলা হয় প্রথম বদর যুদ্ধ। এবার মদিনার দায়িত্ব দেওয়া হয় যাইদ ইবনুল হারিসার কাঁধে। পতাকার রং ছিল সাদা। বহন করেছিলেন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু।

যুল উশাইরা অভিযান

সময়টা দ্বিতীয় হিজরির জুমাদাল উলা ও উখরা। সে অনুযায়ী ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫০ জন, অনেকের মতে ২০০ জন মুহাজির যোদ্ধা নিয়ে বের হন। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছিল স্বেচ্ছাধীন। কারও ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ৩০টি উট নিয়ে তারা বের হন; সাহাবিরা পালাক্রমে উটে চড়েন। তাদের লক্ষ্য মক্কা থেকে শামের উদ্দেশে যাত্রা করা মুশরিক-কাফেলা। এ কাফেলায় কুরাইশদের ব্যবসায়ী পুঁজি ছিল বেশ।

নবিজি সাহাবিদের নিয়ে জুল উশাইরাতে পৌঁছেন। সেখানে যাওয়ার পর জানতে পারেন, কাফেলা কয়েকদিন আগেই চলে গেছে। পরে এই কাফেলাই যখন শাম থেকে মক্কায় ফেরত আসে, তখন একে কেন্দ্র করেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইবনু ইসহাকের মতে, নবিজি জুমাদাল উলার শেষের দিকে এই যুদ্ধে বের হন এবং জুমাদাল আখিরার শুরু দিকে ফিরে আসেন। এই অভিযানে বের হয়ে তিনি বনু মুদলাজ এবং বনু দমরার মিত্র পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী চুক্তি সম্পাদনা করেন। মদিনায় আবু সালাম ইবনু আব্দিল আসাদ মাখযুমিকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান এ যাত্রায়। এই গাযওয়ার পতাকাও সাদা এবং বহন করেছিলেন হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব।

নাখলা অভিযান

দ্বিতীয় হিজরির রজব তথা ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস। নবিজি আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ আসাদির নেতৃত্বে ১২ জন মুহাজিরের একটি দল নাখলায় প্রেরণ করেন। তাদের সাথে ছিল ৬টি উট। প্রতি দুজন সাহাবি একটি উটে পালাক্রমে চড়েন। নবিজি ইবনু জাহশের হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলে দেন, দুদিন পরে যেন সে এই চিঠিটি খুলে দেখে। তিনি তার নির্দেশ মেনে চিঠিটি দুদিন পর খোলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলায় গিয়ে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার অপেক্ষা করবে এবং তাদের

খবরাখবর নিয়ে আসবে।'

ইবনু জাহাশ সেই চিঠি সঙ্গীদের পড়ে শোনান এবং জানিয়ে দেন—তিনি কাউকে এই অভিযানের জন্য বাধ্য করবেন না। যে শাহাদাত কামনা করে, সে যেন তার সঙ্গী হয়। আর যদি কেউ মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তবে সে চলে যেতে পারে। এ কথা জানিয়ে তিনি নাখলার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। কেউই এই অভিযান থেকে পিছু হটেননি; সবাই তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়েন। তবে পথিমধ্যে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং উতবা ইবনু গাযওয়ান তাদের উটটি হারিয়ে ফেলেন। উট খুঁজতে গিয়ে তারা পেছনে পড়ে যান। আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ চলতে চলতে নাখলায় গিয়ে কাফেলার জন্য ওত পেতে থাকেন। এই কাফেলায় আছে কিশমিশ, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং হরেক রকমের ব্যবসায়ী পণ্য। সাথে কুরাইশের বড় মাপের কয়েকজন নেতা—আমর ইবনু হাজরামি, আব্দুল্লাহ ইবনু মুগিরার দুই ছেলে উসমান ও নাওফাল এবং হাকাম ইবনু কাইসান মাওলা ইবনি মুগিরা।

তখন রজব প্রায় শেষের দিকে; তাই মুসলিমরা হামলার ব্যাপারে বৈঠকে বসেন—'আমরা পবিত্র মাস রজবের শেষ দিনে অবস্থান করছি। যদি তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি, তাহলে এই মাসের পবিত্রতা আমাদের হাতে নষ্ট হবে। আর যদি এই রাতটা অপেক্ষা করি, তখন তারা হারামের ভেতর ঢুকে যাবে।'

বৈঠক শেষে হামলার সিদ্ধান্ত হয়। এই হামলায় আমর ইবনু হাজরামি তিরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়, উসমান ও হাকাম বন্দি হয় এবং নাওফাল পালিয়ে যায়। তারা কাফেলার উট, পণ্য ও দুজন বন্দি নিয়ে মদিনায় পৌঁছেন। গনিমত থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ আলাদা করে বাকি চার ভাগ মুজাহিদদের দিয়ে দেওয়া হয়। এটা ইসলামের ইতিহাসে মুসলিমদের প্রথম গনিমত, তাদের হাতে নিহত প্রথম মুশরিক ও দুজন বন্দি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম পবিত্র মাসে হামলার সিদ্ধান্তের কারণে তাদের তিরস্কার করেন এবং বন্দিদের বিষয়টি মওকুফ রাখেন; কিন্তু এই ঘটনার কারণে কুরাইশের মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করার সুযোগ পেয়ে যায়। পবিত্র মাসের অবমাননার কারণে তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগে জর্জরিত করে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ওহি পাঠিয়ে তাদের এ বিষয়ে সতর্ক করেন। কারণ মুসলিমরা যা করেছে, তাদের তুলনায় ওরা যা করেছে এবং করে যাচ্ছে, সেটা অনেক বেশি গর্হিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.... ﴿٢١٧﴾

সম্মানিত মাস সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? আপনি বলে দিন, এতে যুদ্ধ করা অনেক বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরি করা, মাসজিদুল হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।[১]

আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন—মুসলিম যোদ্ধাদের নৈতিকতা নিয়ে তোমরা যে প্রশ্ন তুলছ, সে প্রশ্ন তোলার যোগ্যতাই তোমাদের নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তোমরা শুরু করেছ এবং মুসলিমদের ওপর যে নিপীড়ন চালিয়েছ, এতে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন এবং পবিত্র ভূমির অবমাননা ক্রমাগত হয়েই চলেছে। মুসলিমরা তো পবিত্র ভূমিতে শান্তিতেই বাস করছিল। কিন্তু তোমরা যখন তাদের সম্পদ ও প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করলে, এমনকি পবিত্র ভূমিতে হারামের ভেতর তাদের নবিকে পর্যন্ত হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে, তখন কি এই ভূমির পবিত্রতার অবমাননা করা হয়নি? তোমরা কি সেই পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলে? মুশরিকরা পবিত্র মাসের সম্মান নষ্ট করার ধোঁয়া তুলে পুরো আরবে মুসলিমদেরকে হীন করার এই অপচেষ্টা নিরেট নির্লজ্জতা ছাড়া কিছুই নয়।

কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবিজি আশ্বস্ত হন, দুই বন্দিকে মুক্ত করে দেন এবং এই অভিযানে নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে রক্তপণের অর্থ পাঠান।[২]

বদর যুদ্ধের আগে ঘটে যাওয়া কোনো গাযওয়া বা সারিয়ায় কারও সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া বা প্রাণহানির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে কুরয ইবনু জাবির ফিহরি যখন মদিনায় লুটতরাজ চালায়, তারপরেই এই ঘটনা ঘটে। সুতরাং মুশরিকদের পক্ষ থেকে প্রথম আগ্রাসনের শিকার হয় মুসলিমরা। এবারই প্রথম নয়; এর আগেও তাদের অসৎ চিন্তা ও বদ চরিত্রের কারণে মুসলিমরা বহুবার তাদের আগ্রাসনমূলক আচরণের শিকার হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়ার ঘটনার পর মুশরিকদের ভয় ও আতঙ্ক বাড়তে থাকে। ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে তারা এতদিন যে আশঙ্কা করে আসছিল, তা যেন

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৭

[২] সারিয়া ও গাযওয়া সংক্রান্ত উপরিউক্ত সকল আলোচনার রেফারেন্স—*যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৩-৮৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৬১-৬০৫; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৫-২১৬; ৪৬৮-৪৭০

সত্যি হতে চলেছে। তাদের বুঝতে আর বাকি রইল না—মুসলিমরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছে এবং তাদের প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ করছে। ৩০০ কিলোমিটার দূরে থেকেও যারা আমাদের ঘরের কাছে হামলা করে, আমাদের লোকজনকে মেরে ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিরাপদে নিজেদের এলাকায় চলে যেতে পারে, তাদের দ্বারা আর কীই-বা অসম্ভব! তাই শামের বাণিজ্যপথ অনিরাপদ মনে হতে থাকে তাদের কাছে।

তবুও তারা এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয় না, যেখানে তাদের উচিত ছিল জুহাইনা এবং বনু দামরার মতো মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি ও শান্তি চুক্তিতে আবন্ধ হওয়া; সেখানে তারা বরং এর উলটো প্রতিক্রিয়া দেখায়। কুরাইশ নেতারা মুসলিমদের চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার যে ভয় দেখিয়ে আসছিল, তা বাস্তবায়ন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে এবার। এই গোঁয়ার্তুমি ও অবিবেচক মনোভাবের কারণেই বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

এদিকে মহান আল্লাহ দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সারিয়ার পর মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরজ করে দেন। এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেন—

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর তাদের হত্যা করো যেখানে পাও, সেখানেই। তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে, যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে মাসজিদুল হারামের নিকটে লড়াই কোরো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করো। এই হলো কাফিরদের শাস্তি। আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না

ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারও প্রতি কোনো জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের বিষয়টি ভিন্ন)।[১]

জিহাদ ফরজ করার পাশাপাশি যুদ্ধের বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়েও আয়াত অবতীর্ণ হয়। সেখানে দেখানো হয়, আঘাত কীভাবে করতে হবে এবং কোথায় করতে হবে—

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

এরপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মারো। অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করো, তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলো। তারপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, নাহয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কিছু লোককে অপর লোকদের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহিদ হয়, আল্লাহ কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন। তারপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে করবেন দৃঢ়পদ।[২]

যাদের জিহাদের কথা শুনলে প্রাণ কেঁপে ওঠে, ভয়ে আত্মার পানি শুকিয়ে যায়, তাদের নিন্দা করেও মহান আল্লাহ কিছু আয়াত নাযিল করেন—

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯০-১৯৩

[২] সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৪-৭

الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ۝٢٠

যারা মুমিন, তারা বলে, একটি সুরা নাযিল হয় না কেন? তারপর যখন কোনো দ্ব্যর্থহীন সুরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদের মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মতো আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য।[১]

তখনকার সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির দাবিই ছিল সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা। তারপর প্রশিক্ষণ নেওয়া এবং নিজেদেরকে সর্বদা জিহাদের জন্য উজ্জীবিত রাখা। একজন চৌকস ও দূরদর্শী সেনাপ্রধান এ ধরনের পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে তার বাহিনীকে প্রস্তুত রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা কি সর্বজ্ঞ নন? তিনি কি মুসলিমদের এমন সময়ও জিহাদের দিকনির্দেশনা দেবেন না? মক্কা ও মদিনার মধ্যে এখন টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে—যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে তুমুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের নেতৃত্বে পরিচালিত হামলায় মুশরিকদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, বেশ কঠিন আঘাত পেয়েছে তারা। এই যন্ত্রণায় তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে—উত্তপ্ত অঙ্গারের ওপর ছটফট করে যেন নির্ঘুম রাত কাটছে তাদের।

জিহাদের নির্দেশসূচক আয়াতের অবতরণ এ দিকে স্পষ্টত ইঙ্গিত দেয়—সামনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিন আসছে, যে যুদ্ধে মুসলিমরাই জয় লাভ করবে। কুরআনে মহান আল্লাহর নির্দেশের ধরন থেকে সেটা সহজেই আঁচ করা যায়—মুশরিকেরা যেভাবে তোমাদের বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেভাবেই ওদের বহিষ্কার করো। এছাড়াও আল্লাহ বন্দিদের ব্যাপারে বিশেষ আচরণবিধি দিয়েছেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগপর্যন্ত ময়দানে কাফিরদের যেভাবে আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেছেন, এতে মুসলিমদের বিজয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ইঙ্গিত সূক্ষ্ম হলেও যে-কারও চোখেই ধরা পড়বে। তাছাড়া আল্লাহ বিষয়টি একেবারে খুলে বলেননি যাতে সবাই যুদ্ধের সময় নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে লড়াই করতে পারে।

দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাস। তখন ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ। আল্লাহ তাআলা বাইতুল মাকদিস থেকে মক্কা অভিমুখে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। পরিবর্তনের অজুহাতে ছদ্মবেশী মুসলিম, যারা মুসলিমদের মধ্যে গোলযোগ ও হাঙ্গামা তৈরি করার জন্য ইসলামগ্রহণের অভিনয় করেছিল, তারা মুসলিমদের দল থেকে সরে গিয়ে আবার ইহুদিদের সঙ্গে যুক্ত

[১] সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২০

হয়েছে। কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ভেতর থেকে বিশ্বাসঘাতক ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে বের করে নিয়ে আসেন।

সালাতে কিবলা-পরিবর্তন নিছক কোনো পরিবর্তন নয়; বরং এখানে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত ছিল—নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে। মুসলিমরা অচিরেই বাইতুল্লাহ পুনরুদ্ধার করবে এবং সেখানে ইবরাহিমের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে।

কুরআনের আয়াতে জিহাদের নির্দেশ ও নির্দেশনা লাভ করার পর মুসলিমদের যুদ্ধের চেতনা ও আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। কাফিরদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোবাসনা দিনদিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

বদর যুদ্ধ

মুসলিমদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ!

উশাইরার যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করেছি—মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখী কুরাইশ-কাফেলাটি অল্পের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতছাড়া হয়ে যায়। কিন্তু কাফেলা প্রত্যাবর্তনের সময় হলে নবিজি তাদের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ এবং সাইদ ইবনু যাইদকে পাঠিয়ে দেন। তারা 'হাওরা' অঞ্চলে গিয়ে অবস্থান নেন। ইতোমধ্যে আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যায়। তারা দ্রুত মদিনায় ছুটে আসেন এবং নবিজিকে বিষয়টি জানান।

মক্কাবাসীর বিপুল সম্পদে কাফেলাটি সমৃদ্ধ। ধনসম্পদ-বোঝাই ১ হাজার উট, যার মূল্য কম করে হলেও ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রার সমতুল্য। তবে এত বিশাল সম্পদের প্রহরায় ছিল মাত্র ৪০ জন লোক।

মদিনার রণঘাঁটির জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। যদি মদিনা এই বিশাল সম্পদ অধিকার করতে পারে, তাহলে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে মুশরিকদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। তাই নবিজি মুসলিমদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলা আসছে। সেখানে তাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে। তাই তোমরা বেরিয়ে পড়ো। আল্লাহ তাআলা হয়তো-বা গনিমত হিসেবে তা তোমাদের হাতে অর্পণ করবেন!

এ যাত্রায়ও নবিজি যুদ্ধ-যাত্রার জন্য কারও ওপর চাপ প্রয়োগ করেননি; বরং বিষয়টি সকলের ইচ্ছাধীন ছেড়ে দেন। বাণিজ্যিক কাফেলার পরিবর্তে রণসজ্জায় সজ্জিত মক্কাবাহিনীর সাথে বদর প্রান্তরে সংঘর্ষে জড়াতে হবে—ঘোষণার সময় তো এর কোনো কল্পনাই ছিল না! তাই অনেক সাহাবি মদিনায় থেকে যান। তাদের ধারণা ছিল—এই

অভিযানটি পূর্বের ছোট ছোট অভিযানগুলোর মতোই সাধারণ কোনো অভিযান। তাই নবিজিও যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকার কারণে কাউকে তিরস্কার করেননি।

সৈন্যসমাবেশ এবং নেতৃত্ব বণ্টন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত। সঙ্গে আছেন ৩১৩ জন যোদ্ধা। কোনো কোনো বর্ণনায় ৩১৪, আবার কোথাও ৩১৭ জনের কথাও আছে। ৮২, ৮৩ কিংবা ৮৬ জন মুহাজির সাহাবি। আনসারদের মধ্যে আউস গোত্র থেকে ৬১ জন এবং ১৭০ জন আছেন খাযরাজ গোত্রের। এই অভিযানের জন্য তারা ব্যাপক কোনো প্রচারণাও চালাননি। যথাযথ প্রস্তুতিও গ্রহণ করেননি। তাদের অশ্বারোহী মাত্র দুজন। একজন যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আরেকজন মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ কিন্দি। আর উট ছিল সর্বমোট ৭০টি। দুইজন বা তিনজনের ভাগে পড়ে একটি করে উট। তাতে তারা পালাক্রমে আরোহণ করেন। নবিজি, আলি এবং মারসাদ ইবনু আবি মারসাদ গানাবি—এই তিনজনের ভাগে পড়ে মাত্র একটি উট।

নবিজি মদিনার পরিচালনা এবং সালাতের দায়িত্ব দিয়ে যান সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমের হাতে। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি রাওহা নামক স্থানে উপনীত হন, তখন আবু লুবাবা ইবনু আব্দিল মুনজিরকে মদিনার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠিয়ে দেন।

সর্বাধিনায়কের পতাকা তুলে দেন মুসআব ইবনু উমাইর কুরাশি আবদারির হাতে। পতাকাটির রং ছিল সাদা। তিনি তার বাহিনীকে দু-ভাগ করে নেন। এক ভাগে থাকে মুহাজির সাহাবিরা। তাদের পতাকা তুলে দেওয়া হয় আলি ইবনু আবি তালিবের হাতে। অপর ভাগে রয়েছে আনসার সাহাবিরা। তাদের পতাকা বহন করেন সাদ ইবনু মুআজ।

ডান পাশের নেতৃত্ব দেন যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে। আর মিকদাদ ইবনু আমর বাম পাশের সেনাপতি। পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী তারাই ছিলেন এই বাহিনীর দুজন অশ্বারোহী। বাহিনীর পেছনের অংশের দায়িত্ব পড়ে কাইস ইবনু আবি সা'সাআর ওপর। পুরো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বদর পানে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

অপ্রস্তুত একটি বাহিনী নিয়ে নবিজি যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। মদিনা থেকে বের হয়ে এগোতে থাকেন মক্কাভিমুখী প্রধান সড়ক ধরে। রাওহা নামক স্থানের একটি কূপের কাছে বিশ্রাম নেন সবাই। সেখান থেকে যাত্রা করার সময় মক্কাগামী পথ বাম দিকে রেখে বদরের উদ্দেশে বাম দিকে নাজিয়ার পথে মোড় নেন। চলতে চলতে নাজিয়া ও সাফরার গিরিপথের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা রাহকানে এসে উপনীত হন। এই

উপত্যকা অতিক্রম করে তাঁবু ফেলেন সাফরার নিকটবর্তী একটা জায়গায়। সেখান থেকে কাফেলার খবরাখবর নিয়ে আসার জন্য বাসবাস ইবনু আমর জুহানি এবং আদি ইবনু আবিয যাগবা আল-জুহানিকে পাঠিয়ে দেন বদরের দিকে।

মক্কার বুকে সতর্কবাণী

কুরাইশের এ বাণিজ্যিক কাফেলার সর্দার ছিল আবু সুফিয়ান। খুবই বিচক্ষণ ও চৌকস ব্যক্তি সে। মক্কার পথ যে খুবই বিপৎসংকুল, এ কথা তার অজানা ছিল না। তাই পথে কোনো আরোহীর সাক্ষাৎ পেলেই তার কাছে পথের পরিস্থিতি জেনে নিত। কাফেলার পথ রোধ করার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাহিনীকে সমবেত করেছে—এ খবর কোনোভাবে আবু সুফিয়ানের কানে আসে। অমনি সে যমযম ইবনু আমির গিফারিকে ভাড়া করে। তার কাজ হলো মক্কায় গিয়ে লোকজনকে কাফেলার বিপদ সম্পর্কে অবগত করা; নবিজি ও তার বাহিনীর হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করা। যমযম ক্ষিপ্র গতিতে মক্কার দিকে ছুটে চলে। মক্কা পৌঁছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে সে তার উটের নাক কেটে দেয়। হাওদা উলটিয়ে রাখে। নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। তারপর সেই উটের পিঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, শোনো কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো। তোমাদের সমস্ত মালামাল মুহাম্মাদ ও তার বাহিনী দখল করে নিতে যাচ্ছে! আমি জানি না, তোমরা গিয়ে তার নাগাল পাবে কি না! সাহায্য করো তাদের, সাহায্য করো...

মুসলিমদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীর প্রস্তুতি

যমযমের সতর্কবার্তা শুনে কুরাইশরা তো ভীষণ উত্তেজিত—'মুহাম্মাদ ও তার সাথিরা কি আমাদেরকে ইবনু হাযরামির কাফেলার মতো পঙ্গু মনে করে? মোটেও না। আল্লাহর কসম, অবশ্যই তারা এবার ব্যতিক্রম কিছুর সাক্ষী হবে।' এরপর সকলেই যুদ্ধযাত্রার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদেরকে দুটি এখতিয়ার দেওয়া হয়—**এক.** সশরীরে অংশ নেওয়া। **দুই.** অন্যথায় নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে পাঠানো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয় সবাই। কুরাইশ নেতাদের মধ্য থেকে শুধু আবু লাহাব সশরীরে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। সে তার স্থলে তার এক দেনাদারকে পাঠিয়ে দেয়। কুরাইশরা আরবের অন্যান্য গোত্র থেকেও লোকবল সংগ্রহ করে। কুরাইশের শাখাসমূহ থেকে শুধু বনু আদি এই অভিযানে যোগ দেয়নি; তাদের একজনও যুদ্ধে যায়নি এই দলের সাথে।

মক্কাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এবং যুদ্ধসরঞ্জাম

যাত্রার শুরুতে মক্কাবাহিনীর যোদ্ধাসংখ্যা ছিল ১৩০০। ১০০ জন অশ্বারোহী, ৬০০ জন

লৌহবর্মধারী এবং উটে আরোহী বিপুল পরিমাণ সৈন্য; তাদের সঠিক সংখ্যাটি জানা যায়নি। বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আবু জাহল ইবনু হিশাম। বাহিনীর খাদ্যের জোগান দেয় কুরাইশের ৯ জন সর্দার। তারা একদিন ৯টি আরেকদিন ১০টি করে উট জবাই করত।

বনু বকরকে নিয়ে যত সমস্যা

মক্কাবাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় বনু বকর গোত্রের সাথে তাদের শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহের কথা তাদের মনে পড়ে। তাই তাদের আশঙ্কা হয়—বনু বকর তাদেরকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। এই আশঙ্কা সত্য হলে, তারা পড়ে যাবে উভয় সংকটে। এ কথা ভেবে তারা যখন যাত্রা অব্যাহতির সিদ্ধান্ত নিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বনু কিনানার সর্দার সুরাকা ইবনু মালিক ইবনি জুশুম মুদলিজির বেশ ধরে তাদের কাছে হাজির হয় ইবলিস। সে বলে, 'কিনানা গোত্র পেছন দিক থেকে আপনাদের অপছন্দনীয় কোনো কাজ করবে না, আমি এর দায়িত্ব নিলাম।'

মক্কাবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

ইবলিসের কথায় আশ্বস্ত হয়ে মক্কাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'গর্বভরে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা বের হয়েছে। তারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করত।'[১] তাদের যুদ্ধযাত্রার বিবরণ দিতে গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তারা তাদের যাবতীয় শক্তি নিয়ে আগমন করেছে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে।' আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'তারা বের হয়েছে সকাল সকাল সজোরে দম্ভভরে।'[২] তারা বের হয়েছে নবিজি ও তার সাহাবিদের প্রতি তুমুল ক্রোধ, বিদ্বেষ ও জিঘাংসা নিয়ে; তাদের কাফেলার ওপর আক্রমণ করার দুঃসাহস দেখানোর প্রতিশোধ নিতে।

মক্কাবাহিনী উত্তর দিক থেকে বদর অভিমুখে ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে। প্রথমে আসফান উপত্যকা, তারপর কাদিদ ও জাহফা অতিক্রম করে। সেখানে তারা আবু সুফিয়ানের নতুন একটি বার্তা পায়। আবু সুফিয়ান তাদের লক্ষ্য করে বলে, 'তোমরা তোমাদের কাফেলা, আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছ। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাদের রক্ষা করেছেন। তাই তোমরা এখন ফিরে যাও।'[৩]

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৭

[২] সুরা কলাম, আয়াত : ২৫

[৩] *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৪; মুআসসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

বিপদমুক্ত মক্কার বাণিজ্য-কাফেলা

আবু সুফিয়ানের ঘটনাটি অনেকটা এমন—মক্কার মূল পথ ধরেই সে এগোচ্ছে। তবুও তার মন-মস্তিষ্ক পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। সতর্ক অনুসন্ধানী কার্যক্রমও বাড়িয়ে দিয়েছিল সে। বদরের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে তার কাফেলা অতিক্রম করার সময় মাজদি ইবনু আমরের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে মাজদিকে মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। মাজদি বলে, 'আমি অপরিচিত কাউকে দেখিনি। তবে ওই টিলার কাছে অবস্থানরত দুজন আরোহী দেখেছিলাম। তারা তাদের দুটি পাত্রে পানি ভরে নিয়ে চলে গেছে।'

খবর পেয়েই আবু সুফিয়ান দ্রুত সেই দুই আরোহীর অবস্থানস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে তাদের উটের মল এদিকে-ওদিকে পড়ে থাকতে দেখে। সেখান থেকে একটি মল হাতে নিয়ে তা ভেঙে দেখে ভেতরে খেজুরের বিচি। তখন সে বলে, 'এগুলো মদিনার উটের খাবার।'

আবু সুফিয়ান সঙ্গে সঙ্গে তার কাফেলায় ফিরে আসে। এরপর বাম দিকের বদরমুখী মূল রাস্তা ছেড়ে পশ্চিমে সাগরের তীর ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। এই বুদ্ধিদীপ্ত কাজের কারণেই মুসলিমদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যায় তার কাফেলা। শুধু তা-ই নয়, সে মক্কাবাহিনীর কাছেও এই খুশির খবরটি পাঠিয়ে দেয়। মক্কাবাহিনীর কাফিররা জুহফায় এসে এটা জানতে পারে।

মক্কাবাহিনীর সৈন্যরা কি মক্কায় ফিরে যাবে?

মক্কাবাহিনী আবু সুফিয়ানের বার্তা পেয়ে মক্কায় ফেরার কথা ভাবছিল। কিন্তু কুরাইশের স্বেচ্ছাচারী আবু জাহল তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অহমিকা ও জিঘাংসাভরা কণ্ঠে সে বলে, 'আমরা বদরপ্রান্তরে উপনীত হব, সেখানে ৩ দিন অবস্থান করব, উট জবাইয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হবে দারুণ এক ভোজসভা। শরাব পান ও নর্তকীদের নাচগানের আয়োজন করে গোটা আরবকে জানিয়ে দিতে হবে আমাদের আগমন ও সমাবেশের কথা। এতে তারা চিরদিনের জন্য আমাদের প্রতি ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে। আল্লাহর কসম, এসব না করে আমরা মক্কায় ফিরছি না।

তবে আবু জাহলের জোরালো তাগিদ উপেক্ষা করেই আখনাস ইবনু শুরাইক ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে কারও সঙ্গ পায়নি। তাই বাধ্য হয়ে সে একাই বনু জাহরাকে নিয়ে ফিরে আসে। সে মূলত বনু জাহরার মিত্র এবং এই বাহিনীতে তাদের সর্দার। তাই বনু জাহরার একজনও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। যুদ্ধ-পরবর্তী ফলাফল দেখে বনু জাহরা, আখনাস ইবনু শুরাইকের অভিমতের মূল্য উপলব্ধি করে। তাই আখনাস সারাজীবন তাদের মাঝে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন হিসেবে গণ্য ছিলেন।

বনু হাশিম ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আবু জাহল তাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সে বলে, 'আমাদের প্রত্যাবর্তনের আগে অন্য কেউ এই বাহিনী ত্যাগ করতে পারবে না।'

বনু জাহরা ফিরে গেছে। এখন মক্কাবাহিনীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজারে। তারা যাত্রা অব্যাহত রাখে। বদর উপত্যকার সীমানার এক প্রান্তে একটি বালুর টিলার পেছনে তারা অবতরণ করে।

রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের আশঙ্কা!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো জাফরান উপত্যকায় অবস্থান করছেন। এখানে তার কাছে কুরাইশের কাফেলা ও মক্কাবাহিনীর বিস্তারিত সংবাদ এসে পৌঁছল। আগত সংবাদ ও তথ্য পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন—সামনে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অপরিহার্য; এটা পরিহার করার কোনো পথ খোলা নেই। এখন বীরত্ব, সাহসিকতা, বাহাদুরি ও অবিচলতা নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হতেই হবে। বস্তুত মক্কাবাহিনীকে যদি সে অঞ্চলে বিচরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই—এটা কুরাইশের সামরিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রতাপ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য এটি হবে লাঞ্ছনা ও লজ্জার বিষয়। এমনকি ইসলামি বিপ্লব তখন পরিণত হবে একটি নিষ্প্রাণ দেহে। ফলে এ অঞ্চলে যারাই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা লালন করে, সবাই মুসলিমদের অনিষ্ট করতে লালায়িত হয়ে উঠবে।

লজ্জা ও লাঞ্ছনার কথা নাহয় বাদই দিলাম। মক্কাবাহিনী যে এখন মদিনার দিকে যাত্রা করবে না, এরও তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তখন তো যুদ্ধ করতে হবে একেবারে মদিনার অভ্যন্তরে। তারা মুসলিমদের নিজ ঘরে গিয়ে হত্যা করে আসবে! না না, যদি মদিনার বাহিনী থেকে এতটুকু পশ্চাদপসরণ পাওয়া যায়, তাহলে মুসলিমদের গাম্ভীর্য এবং সুনামে অনেক মন্দ প্রভাব পড়বে। আর এমনটি কস্মিনকালেও হতে দেওয়া যাবে না!

সাহাবিদের সাথে জরুরি বৈঠক

আকস্মিক এমন বিপৎসংকুল পরিস্থিতি দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উচ্চসামরিক মজলিসের আহ্বান করেন। তাদের সামনে তুলে ধরেন বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ। নেতৃস্থানীয় থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে কিছু মানুষের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায় তারা। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ۝٥

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞

(সম্মুখ সমর তাদের কাছে তেমন অপছন্দনীয়) যেমন যৌক্তিক কারণ থাকার পরও মুমিনদের একটি দল অভিযানে বের হওয়া অপছন্দ করেছিল। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা এমনভাবে আপনার সাথে তর্ক করেছে—যেন তাদেরকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হচ্ছে এবং তারা তা নির্বিকার তাকিয়ে দেখছে।[১]

অপরদিকে বাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের মনোবল ছিল তুঙ্গে। আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন এবং সম্মতিমূলক কথা বললেন। তারপর দাঁড়ালেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার কণ্ঠ ছিল তেজোদীপ্ত। দাঁড়ালেন মিকদাদ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ যে আদেশ দিয়েছেন, আপনি তা পালন করুন। আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে আছি। বনি ইসরাইল মুসা আলাইহিস সালামকে যেমন বলেছিল, 'তুমি আর তোমরা রব গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসলাম'—আল্লাহর কসম, আমরা এমন কথা বলব না; বরং আমরা বলব, আপনি এবং আপনার রব যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হোন, আমরাও আপনাদের সাথে আছি। যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর শপথ; যদি আপনি আমাদের নিয়ে বারকুল গিমাদ পর্যন্ত যেতে চান, আমরা আপনার সাথে লড়াই করতে করতে সেখানে পৌঁছে যাব।'

মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দীপ্ত ভাষণ শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

উপরিউক্ত ৩ জন তো মুহাজির সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। একইসাথে তারা ছিলেন বাহিনীর সংখ্যালঘু অংশ। তাই নবিজি সংখ্যাগরিষ্ঠ আনসার সাহাবিদের মতামত জানার আগ্রহ পেশ করলেন। যেহেতু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই যুদ্ধের মূল চাপ তাদেরই সামলাতে হবে। উপরন্তু আকাবার চুক্তিতে দেশের বাইরে গিয়ে যুদ্ধের কথার উল্লেখ ছিল না। তাই মুহাজির সাহাবিদের কথা শুনে আনসারদের লক্ষ্য করে নবিজি বলেন, 'এবার তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' আনসার নেতা এবং তাদের পতাকাবাহী সাদ ইবনু মুআজ বিষয়টি উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আমাদের মতামত জানতে চাইছেন?'

নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।'

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৫-৬

সাদ বললেন, 'আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি—আপনি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তা সত্য। আপনার আনুগত্য ও বাধ্যতার ওপর আমরা প্রতিশ্রুতিবন্ধ। তাই আপনি যা ইচ্ছা করুন। ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমরাও অবশ্যই আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখি হতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা যুদ্ধে ধৈর্যধারণ করব। যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা নির্ভীক। আশা করি, আল্লাহ আমাদের দিয়ে এমন কিছু আপনাকে দেখাবেন, যা আপনার চক্ষু শীতল করে দেবে। আর তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে আপনি আমাদের নিয়ে অগ্রসর হন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সাদ ইবনু মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, 'আপনার হয়তো আশঙ্কা যে, আনসাররা শুধু তাদের দেশে আপনাকে সহযোগিতা করাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে। আমি আনসারদের পক্ষ থেকে বলছি, তাদের পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছি, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান; যার রশি ইচ্ছা জোড়া লাগান, যারটি ইচ্ছা কেটে দিন। আমাদের সম্পদ থেকে যা খুশি নিয়ে নিন, যা খুশি আমাদের দিন। আপনি আমাদের থেকে যা নেবেন, তা আমাদের কাছে ছেড়ে দেওয়া জিনিস থেকে বেশি পছন্দনীয়। যেকোনো বিষয়ে আপনি যে আদেশ দেবেন, আমাদের কথা আপনার আদেশের অনুগামী হবে। আল্লাহর কসম, যদি আপনি চলতে চলতে গামদানের আগ্নেয়গিরিতে পৌঁছে যান, তাহলে আমরাও আপনার সাথে সেখানে চলে যাব। আল্লাহর কসম, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন, তাহলে আমরাও অবশ্যই আপনার সাথে ঝাঁপ দেব।'

সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর এমন ঈমানদীপ্ত কথা শুনে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারপরনাই খুশি হলেন। তারপর বললেন, তোমরা এগিয়ে যেতে থাকো আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তাআলা আমাকে দুই দলের একটির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১] আল্লাহর কসম, আমি যেন এখনই তাদের বধ্যভূমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

আনসার সাহাবিদের মতামত নিয়ে নবিজি জাফরান থেকে যাত্রা করলেন। আসাফির নামক সরু পথ বেয়ে চলতে চলতে অবতরণ করলেন দিয়াত অঞ্চলে। ডানদিকে হিনান নামক ঘন বালুর স্তূপ রেখে বদরের উপকণ্ঠে এসে তাঁবু ফেললেন।

---

[১] দুই দল বলতে নবিজি এখানে আবু সুফিয়ান এবং আবু জাহলের দলকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধের পূর্বেই এই দুই দলের যেকোনো এক দলের গনিমত লাভের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ঘটেছেও তেমনটিই। আবু সুফিয়ানের দল হাতছাড়া হলেও বদর বিজয়ের মাধ্যমে আবু জাহলের সৈন্যদলের মালামাল গনিমত হিসেবে ঠিকই মুসলিমদের হাতে আসে। [*তাফসিরুত তাবারি*, ইবনু জারির তাবারি, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৯৮; *তাফসিরু ইবনু কাসির*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭]

তথ্য জানতে নবিজির বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল

নবিজি তার একান্ত বন্ধু আবু বকর সিদ্দিককে নিয়ে মক্কাবাহিনীর খবরাখবর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। আরবের এক বৃদ্ধের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো। নবিজি তার কাছে কুরাইশ এবং মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ও অন্যান্য তথ্য জানতে চাইলেন। উভয় বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যেন তাদের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বলল, 'তোমরা তোমাদের পরিচয় না দিলে আমি এ সংবাদ তোমাদের দেব না।' নবিজি বললেন, 'আগে আপনি বলুন, তাহলে আমরাও আমাদের পরিচয় দেব।' বৃদ্ধ বলল, 'আচ্ছা! তাহলে একটার পরিবর্তে আরেকটা?' নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ বলল, 'আমি সংবাদ পেয়েছি মুহাম্মাদ তার বাহিনী নিয়ে অমুক দিন বের হয়েছে। যদি সংবাদদাতা সত্য বলে থাকে, তাহলে তারা এখন অমুক স্থানে অবস্থান করছে।' বৃদ্ধ মুসলিম বাহিনীর বর্তমান স্থানের কথাই বলল। 'আমি এ-ও শুনেছি—কুরাইশ তাদের বাহিনীসমেত অমুক দিন বের হয়েছিল। যদি আমার শ্রুতি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তারা আজ অমুক স্থানে আছে।' বৃদ্ধ আশ্চর্যজনকভাবে মক্কাবাহিনীর বর্তমান অবস্থানের কথাই বলে দিল।

কথা শেষ করে বৃদ্ধ বলল, 'এখন বলো, তোমরা কোত্থেকে এসেছ?' নবিজি তাকে বললেন, 'আমরা পানি থেকে এসেছি।' এ কথা বলেই নবিজি পথ চলা শুরু করলেন। বৃদ্ধ নবিজির কথার মর্ম বুঝতে না পেরে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'কোন পানি থেকে? ইরাকের পানি নাকি?'

গোলামের মুখে গোপন খবর

ওই দিন সন্ধ্যায় নবিজি শত্রুবাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগতির জন্য নতুন করে একদল গুপ্তচর পাঠালেন। তারা ছিলেন তিনজন মুহাজির সাহাবি—আলি ইবনু আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তারা বদর কূপের কাছে গিয়ে মক্কাবাহিনীর পানির দায়িত্বে নিযুক্ত দুজন গোলামকে দেখতে পেলেন। সাথে সাথে তাদের বন্দি করে নবিজির কাছে নিয়ে এলেন। নবিজি তখন সালাত আদায় করছিলেন। এই ফাঁকে সকলে মিলে তাদের দুজনকে জেরা করলে তারা বলল, 'আমরা কুরাইশের গোলাম। তারা আমাদের পানি নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে।' সাহাবিদের আশা ছিল, তারা আবু সুফিয়ানের গোলাম হবে। তাই গোলামদ্বয়ের উত্তর তাদের মনঃপূত হলো না। কেননা সাহাবিদের অন্তরে এখনো বাণিজ্যিক কাফেলার পথ রোধ করার ক্ষীণ আশা জ্বলজ্বল করছে। তাই তারা তাদেরকে বেদম প্রহার করলেন। প্রহারের চোটে গোলামদ্বয় বলতে বাধ্য হলো—তারা আবু সুফিয়ানের গোলাম। এটা শোনার পর সাহাবিরা থামলেন।

এদিকে নবিজি সালাত শেষ করে সাহাবিদেরকে নিন্দার সুরে বললেন, 'তারা যখন তোমাদের সত্য বলল, তখন তোমরা তাদের প্রহার করলে। আর যখন মিথ্যা বলল, তোমরা তাদের ছেড়ে দিলে! তারা অবশ্যই সত্য বলেছে যে, তারা কুরাইশের দায়িত্বে নিয়োজিত গোলাম।'

তারপর নবিজি গোলামদ্বয়কে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমাকে কুরাইশের সংবাদ দাও।' তারা বলল, 'তারা বদরের শেষ প্রান্তে টিলার পেছনে অবস্থান গ্রহণ করেছে।' নবিজি জানতে চাইলেন, 'তাদের সংখ্যা কেমন?' তারা বলল, 'অনেক বেশি।' পুনরায় জানতে চাইলেন, 'তাদের প্রস্তুতি কেমন?' তারা বলল, 'জানি না।' নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রতিদিন তারা কয়টি করে উট জবাই করে?' তারা বলল, 'একদিন ৯টি আরেকদিন ১০টি।' নবিজি আন্দাজ করে বললেন, 'তাহলে তারা ৯০০ থেকে ১ হাজারের মতো হবে।'

নবিজি তারপর তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তাদের মধ্যে কুরাইশের সর্দার কে কে আছে? তারা বলল, রবিআর দুই ছেলে উতবা ও শাইবা, আবুল বাখতারি ইবনু হিশাম, হাকিম ইবনু হিযাম, নাওফাল ইবনু খুওয়াইলিদ, হারিস ইবনু আমির, তুমাইয়া ইবনু আদি, নজর ইবনুল হারিস, যামআ ইবনুল আসওয়াদ, আবু জাহল ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফ-সহ আরও অনেকে।

নবিজি তাদের নাম শুনে সাহাবিদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'এই দেখো, মক্কা তার শ্রেষ্ঠ বীরসেনাগুলোকে তোমাদের সামনে ছেড়ে দিয়েছে।'

রহমতের বৃষ্টিধারা, আনন্দের ফল্গুধারা

আল্লাহ তাআলা সেই রাতে মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। মুশরিকদের জন্য এটা এক প্রবল সমস্যার সৃষ্টি করে। তাদের অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে মুসলিমদের জন্য এটা কেবল রহমতের বারিধারা নয়; বরং আনন্দের এক অবিরাম ফল্গুধারা। আল্লাহ তাআলা এই বৃষ্টিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের পরিচ্ছন্ন করলেন। তাদের অন্তর থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, বৃষ্টির কারণে মুসলিমদের ভূমি মসৃণ হয়ে গেল। শক্ত হলো বালুরাশি। মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল অনেক বেশি। সাথে তাদের অন্তরও প্রশান্ত হলো।

যুদ্ধ মানেই বুদ্ধির খেলা!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের আগে বদরের কূপ দখল করা এবং তাদের মাঝে ও কূপের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য তার বাহিনী নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন। চলতে চলতে রাতের বেলা বদরের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপের

কাছে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন তারা। তখন হুবাব ইবনু মুনজির রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এই স্থানটি কি আল্লাহ তাআলার আদেশে নির্বাচন করেছেন যে, তা পরিহার করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই? নাকি এটি আপনার ব্যক্তিগত মতামত ও যুদ্ধকৌশল?

নবিজি বললেন, 'এটি আল্লাহ তাআলার আদেশ নয়; বরং আমার মতামত ও যুদ্ধকৌশল মাত্র।'

হুবাব বললেন, 'তাহলে আমি বলব, এই স্থানটি আমাদের জন্য সুবিধাজনক নয়। তাই সকলকে নিয়ে চলুন আমরা কুরাইশের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপের কাছ গিয়ে সেখানে ঘাঁটি গাড়ি এবং অন্যান্য কূপ নষ্ট করে দিয়ে নিজেদের জন্য একটি হাউজ তৈরি করে তাতে পানি সংরক্ষণ করি। এতে যুদ্ধের সময় আমাদের কাছে পান করার পানি থাকবে, কুরাইশরা পানি পাবে না।'

নবিজি বললেন, 'মাশাআল্লাহ, তুমি একটা কাজের কথা বলেছ!'

সাথে সাথে নবিজি বাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং শত্রুপক্ষের সবচেয়ে নিকটবর্তী কূপের পাশে গিয়ে অবতরণ করলেন। মাঝরাতে তারা সেখানে নিজেদের জন্য কয়েকটি হাউজ তৈরি করে সেগুলোতে পানি সংরক্ষণ করলেন; বাকি কূপগুলো নষ্ট করে দিলেন।

নবিজির জন্য শামিয়ানা তৈরি

মুসলিম বাহিনী বদরের কূপে অবতরণ করেছে। এখন জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি এবং জয়ের পূর্বে পরাজয়ের কল্পনা করে মুসলিমদের জন্য একটি কেন্দ্র বানানো দরকার। সাদ ইবনু মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহু এই পরামর্শ নিয়েই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার জন্য একটি শামিয়ানা তৈরি করে তার পাশে আপনার বাহন প্রস্তুত রাখতে চাই। তারপর যাব শত্রুদের মুখোমুখি হতে। যদি আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেন এবং আমাদেরকে শত্রুর ওপর বিজয় দান করেন, তাহলে তো এটা আমাদের মনস্কামনা। আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তাহলে আপনি সাথে সাথে আপনার বাহনে চড়ে বসবেন এবং আমাদের বাকি লোকদের সাথে মিলিত হবেন। হে আল্লাহর রাসুল, আসলে মদিনায় এমন অনেক লোক রয়ে গেছে, যারা আপনাকে আমাদের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তারা যদি জানত, আপনি এখানে যুদ্ধ করবেন, তাহলে কস্মিনকালেও পিছিয়ে থাকত না। আপনি তাদের কাছে চলে গেলে আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে আপনাকে হিফাজত করবেন। তারা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে এবং আপনার সাথে জিহাদ করবে।

নবিজি সাদের কথা শুনে দিলখোলা প্রশংসা করলেন। তার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন। মুসলিমরা রণাঙ্গানের উত্তর-পূর্ব দিকের একটি উঁচু স্থানে শামিয়ানা তৈরি করল, যেখান থেকে পুরো যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করা যায়।

তারপর সাদ ইবনু মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি যুবকদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হলো। তাদের দায়িত্ব হলো, নবিজির তাঁবু পাহারা দেওয়া।

চমৎকার সেনাবিন্যাস এবং প্রশান্তির নিদ্রাযাপন

শামিয়ানার ব্যবস্থাপনা শেষ হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার বাহিনী বিন্যস্ত করলেন।[১] এরপর চলে গেলেন রণাঙ্গানে। হাত দিয়ে এদিক-ওদিক ইঙ্গিত করে বলতে লাগলেন, আগামীকাল এটি হবে অমুক কাফিরের বধ্যভূমি, ওটি হবে তমুক কাফিরের, ইনশাআল্লাহ।[২] তারপর তিনি সেখানের একটি গাছের নিচে সালাত আদায় করে সারারাত কাটিয়ে দিলেন। মুসলিমরাও রাত কাটিয়ে দিলেন প্রশান্ত হৃদয়ে, আশান্বিত প্রাণে। তাদের অন্তর বিশ্বাসে আচ্ছাদিত। নিশ্চিন্ত মনে তারা তলিয়ে গেছেন ঘুমের অতলে। প্রভাত-কিরণে তারা তাদের রবের সুসংবাদ-বার্তার কামনায় বিভোর। তাদের অবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

স্মরণ করুন, যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন; সেইসাথে তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করার জন্য, তোমাদের অন্তর শক্ত করার জন্য এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করার জন্য আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন।[৩]

এ রাতটি ছিল জুমআর রাত। দ্বিতীয় হিজরির রামাদান মাসের ১৭ তারিখ। নবিজি এ মাসেরই ৮ কিংবা ১২ তারিখে বের হয়েছিলেন।

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ১৬৭৭; এর সনদ দুর্বল।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৭৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৮১

[৩] সুরা আনফাল, আয়াত : ১১

মক্কাবাহিনীর ভেতর দ্বন্দ্বকলহ

কুরাইশ বাহিনী রাত কাটিয়ে দিল তাদের ঘাঁটিতে, উদওয়াতুল কুসওয়ায়। সকালবেলা তারা বিন্যস্ত হয়ে টিলা থেকে বদর উপত্যকায় নেমে এল। তাদের কয়েকজন মানুষ পানি পান করার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজে এলে তিনি সাহাবিদের বললেন, 'তাদের বাধা দিয়ো না; পানি পান করতে দাও।' সেদিন যারা সেখান থেকে পানি পান করেছিল, তাদের মধ্যে হাকিম ইবনু হিযাম ছাড়া বাকি সবাই নিহত হয়েছিল। হাকিম ইবনু হিযাম পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আজীবন দ্বীনের ওপর অবিচল থাকেন। তাই তিনি যখনই কোনো কঠিন পণ করতেন, তখন এভাবে বলতেন, 'ওই সত্তার কসম, যিনি আমাদের বদরের দিন বাঁচিয়েছেন।'

মুসলিম বাহিনীর অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর কুরাইশরা মুসলিম বাহিনীর সৈন্য ও যুদ্ধপ্রস্তুতি পরখ করার জন্য পাঠিয়ে দিল উমাইর ইবনু ওয়াহাব জুমাহিকে। উমাইর তার ঘোড়া নিয়ে মুসলিম ঘাঁটির চারদিক প্রদক্ষিণ করে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা আনুমানিক ৩০০ হবে। এছাড়া তাদের কোনো সহযোগী বাহিনী কিংবা ফাঁদ আছে কি না—তা জানতে হলে আমাকে আরও একটু সময় দিতে হবে।

উমাইর সময় নিয়ে পুরো উপত্যকা ঘুরে কোনো বাহিনী দেখতে পেল না। কুরাইশদের কাছে ফিরে এসে সে বলল, এছাড়া তাদের আর কোনো বাহিনী আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি দেখে এসেছি মৃত্যুমুখী ভীষণ বিপদ। ইয়াসরিবের উটগুলো মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করছে। তারা এমন এক দল, তরবারি ব্যতীত তাদের কোনো অস্ত্র নেই, তরবারিই তাদের একমাত্র অবলম্বন। আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে, তাদের একজন লোক যদি নিহত হয়, তাহলে তোমাদেরও একজনকে হত্যা করে ছাড়বে। যদি তোমাদের বিশিষ্ট লোকদের তারা হত্যা করেই ফেলে, তাহলে এর পরে আর বেঁচে থেকে কী লাভ! তাই আবার ভেবে দেখা সমীচীন।'

আবু জাহল তখনো যুদ্ধের জন্য অনড়। উমাইরের কথা শুনে যুদ্ধ ছেড়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার গুঞ্জন উঠল আবার। এজন্য হাকিম ইবনু হিযাম দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল সবার আগে। উতবা ইবনু রবিআর কাছে এসে বলল, হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি কুরাইশের নেতা, সর্দার ও মান্যবর একজন মানুষ। আপনি কি এমন একটি ভালো কাজ করবেন, যার কারণে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন?

সে বলল, হাকিম, সেটা কী?

হাকিম বলল, আপনি সকলকে নিয়ে ফিরে যাবেন এবং নাখলার যুদ্ধে নিহত আপনার মিত্র আমর ইবনু হাজরামির বিষয়টি নিজে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

উতবা বলল, ঠিক আছে, আমি এমনটিই করব। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। সে আমার মিত্র। তার মৃত্যুপণ এবং তার নষ্ট হওয়া মালের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে নিয়ে নিচ্ছি।

উতবা এরপর হাকিমকে বলল, তুমি এখন হানজালিয়ার পুত্রের কাছে যাও (হানজালিয়া আবু জাহলের মায়ের নাম)। আমি আশঙ্কা করছি—এ ব্যাপারে সে ছাড়া অন্য কেউ বিরোধিতা করবে না।

তারপর উতবা ইবনু রবিআ সকলকে ডেকে বলল, 'শোনো কুরাইশ সম্প্রদায়, মুহাম্মাদ ও তার সাথিদের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের কী লাভ? যদি তোমরা লড়াই করতে যাও, তাহলে তোমাদের একেকজনের দৃষ্টি পড়বে এমন একেকজনের চেহারার ওপর, যাকে বিপক্ষের দলে দেখতে তোমাদের ভালো লাগবে না। এই যুদ্ধে চাচাতো ভাই কিংবা মামাতো ভাই অথবা বংশীয় কারও সাথেই যুদ্ধ করতে হবে। তাই ভালো হয়, তোমরা সবাই ফিরে চলো। মুহাম্মাদকে ছেড়ে দাও অন্য সমস্ত আরবের হাতে। যদি তারা মুহাম্মাদকে আক্রান্ত করতে পারে, তাহলে তো তোমাদের মনস্কামনাই পূর্ণ হলো। আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তাহলে মুহাম্মাদ ভাববে, তোমরা তার ক্ষতি করতে চেয়েও করোনি।'

এদিকে উতবার কথামতো হাকিম ইবনু হিযাম চলে গেল আবু জাহলের কাছে। সে তখন বর্ম প্রস্তুত করছিল। হাকিমের কাছ থেকে উতবার কথাগুলো শুনে আবু জাহল বলল, আমি নিশ্চিত, মুহাম্মাদ ও তার সাথিদের দেখে সে ভয়ে চুপসে গেছে। আল্লাহ আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত আমরা কোথাও যাচ্ছি না। তাই উতবার কথায় ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদ ও তার লোকদের প্রচুর পরিমাণে গোশত খেতে দেখেছে। আর এ কারণেই সে এখন তাদের দৈহিক শক্তিকে ভয় পাচ্ছে। তাছাড়া তার ছেলেও তো মুহাম্মাদের দলে। সে আমাদের হাতে নিহত হোক, এটা তো উতবা কখনোই চাইবে না।

এখানে বলে রাখা ভালো, উতবার ছেলের নাম আবু হুজাইফা। তিনি অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবিজির সাথে হিজরতও করেছেন।

ওদিকে আবু জাহলের মন্তব্য শুনে উতবা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। রাগে গজরাতে গজরাতে বলল, সেই বায়ুত্যাগকারীকে বলে দিয়ো, কে ভয়ে চুপসে গেছে তা সবাই খুব শীঘ্রই জানতে পারবে।

নিজেদের ভেতর এই বিরোধ যেন প্রকট আকার ধারণ করতে না পারে, তাই আবু জাহল কার্যকরী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করল। কথোপকথন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সে লোক পাঠাল আমির ইবনু হাজরামির কাছে। আমির হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের অভিযানে নিহত আমর ইবনু হাজরামির ভাই। তাকে বলা হলো—তোমাদের মিত্র উতবা

বদর যুদ্ধের মানচিত্র
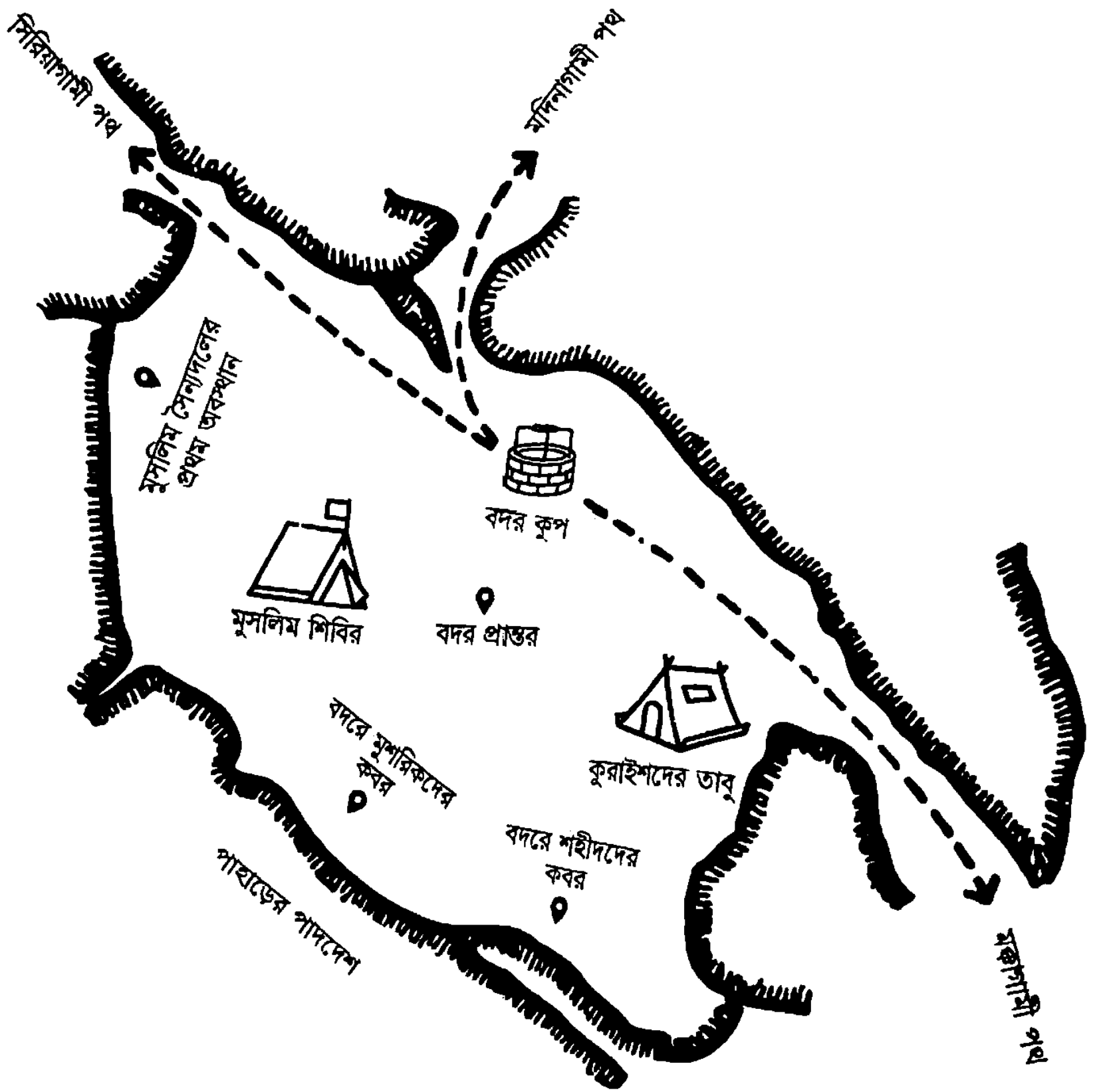
এখন সবাইকে নিয়ে ফিরে যেতে চায়। আমি তোমার চোখে প্রতিশোধের আগুন দেখতে পাচ্ছি। তাই ওঠো, তোমার ভাই হত্যা এবং তোমার নিপীড়নের কথা সকলের সামনে ব্যক্ত করো।

আমির উঠে দাঁড়াল। শরীরের কাপড় ছিঁড়ে (ভাইয়ের কথা স্মরণে) চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হায় আমর! হায় আমর!' আমিরের চিৎকার শুনে তখন সকলে গর্জে উঠল। যে অনিষ্টের জন্য তারা এসেছে, তার ওপর সকলে একমত হয়ে গেল। উতবার আহ্বানের কথা সবাই ছুড়ে ফেলল। এভাবেই বিবেক পরাজিত হয় আবেগের সামনে। যুদ্ধে বিরোধিতার যে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল তা মাঠেই মারা যায়।

দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান

মুশরিকরা রণাঙ্গনে বেড়িয়ে পড়ল। উভয় বাহিনী দূর থেকে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, ওই যে কুরাইশ বাহিনী সদম্ভে তাদের অশ্ববাহিনী নিয়ে এসেছে। তারা আপনার বিরোধিতা করে এবং নবিজিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। হে আল্লাহ, আমাকে যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ, আজ আপনি তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিন।'

নবিজি দূর থেকে উতবা ইবনু আবি রবিআকে দেখলেন একটি লাল উটের ওপর আরোহিত। তখন তিনি বললেন, যদি তাদের কারও মাঝে কল্যাণ থেকে থাকে, তাহলে তা লাল উট-আরোহীর কাছে আছে। তারা তার অনুসরণ করলে সুমতি পাবে।

এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি করে দিলেন। যখন তিনি বাহিনী বিন্যস্ত করছিলেন, তখন ঘটে গেল আশ্চর্য এক ঘটনা। নবিজির হাতে ছিল একটি তির। তিনি তার সাহায্যে সারিবিন্যাস করছিলেন। এদিকে সাওয়াদ ইবনু গাজিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু কাতার ভেঙে এগিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নবিজি তির দ্বারা তার পেটে হালকা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'সাওয়াদ, সোজা হয়ে দাঁড়াও।'

সাওয়াদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। এখন আমাকে এর প্রতিশোধ নিতে দিন।' তখন নবিজি তার পেট থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, প্রতিশোধ নাও।' সাওয়াদ নবিজিকে জড়িয়ে ধরে তার পেটে চুমু খেলেন। নবিজি জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন এমন করলে, সাওয়াদ?' তিনি বললেন, 'নবিজি, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমরা জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। তাই আমি চাইছিলাম জীবনের শেষ সাক্ষাতে আপনার একটু পরশ নিয়ে যাই।' তার ব্যাখ্যা শুনে নবিজি তার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন।

কাতার বিন্যাসের কাজ শেষ। নবিজি সবাইকে সতর্ক করে বললেন, তার চূড়ান্ত আদেশ পাওয়ার আগে যেন কেউ যুদ্ধ শুরু না করে। তারপর তাদেরকে যুদ্ধবিষয়ক বিশেষ

কিছু নির্দেশনা দিলেন। বললেন, শত্রুপক্ষ যখন একযোগে তোমাদের দিকে আসবে, তখন তোমরা তির ব্যবহার করবে। তোমরা তোমাদের তিরগুলো বাঁচানোর চেষ্টা করবে।[১] তারা তোমাদের ঘিরে ফেলার আগপর্যন্ত তোমরা কেউ তরবারি কোষমুক্ত করবে না।[২] এরপর তিনি তার একান্ত সঙ্গী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে তাঁবুতে চলে গেলেন। সাদ ইবনু মুআজের নেতৃত্বে একদল চৌকস সাহাবি ছিলেন সেই তাঁবুর পাহারাদার হিসেবে।

অপরদিকে মুশরিকদের নেতা আবু জাহল মীমাংসা ও বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যে অধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যে আমাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছে, তুমি তাকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ, আমাদের মাঝে যে আপনার কাছে বেশি প্রিয় ও পছন্দনীয়, তাকে আজ বিজয় দান করো।' এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নিচের আয়াতটি নাযিল করেন—

إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

(হে কাফির সম্প্রদায়!) তোমরা যদি মীমাংসাই চেয়ে থাকো, তবে মীমাংসা তোমাদের দোরগোড়ায়! তাই এখন যদি (অন্যায় কাজ থেকে) বিরত থাকো, তবে সেটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু তোমরা যদি পুনরায় (সেই একই কাজ) করো, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেব (তোমাদের)। তখন তোমাদের দল সংখ্যায় বেশি হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। জেনে রেখো, আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গে আছেন।[৩]

যুদ্ধের ময়দানে প্রথম ইন্ধন

আসওয়াদ ইবনু আব্দিল আসাদ মাখজুমি প্রচণ্ড ঝগড়াটে এবং দুশ্চরিত্রের অধিকারী এক লোক। সেই যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন দেয়। এই বলে সে বেরিয়ে আসে, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, হয় তাদের কূপ থেকে পান করব কিংবা তা বিনষ্ট করে দেব অথবা সেখানে গিয়ে মারা যাব।'

তারপর যখন সে কূপের কাছে এল, এদিক থেকে হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব বেরিয়ে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯৮৪

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৬৪; হাদিসের সনদ দুর্বল।

[৩] সুরা আনফাল, আয়াত : ১৯

এলেন। উভয়েই মুখোমুখি হয়ে যখন কূপের কাছাকাছি, তখনই হামযা তাকে আঘাত করলেন এবং তার পা শরীর থেকে আলাদা করে দিলেন। মক্কাবাহিনী দেখল—তার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তবুও সে নিজের পণ রক্ষা করার জন্য হামাগুড়ি দিয়ে কূপের দিকে যাচ্ছিল। তখন হামযা তাকে পুনরায় একটি আঘাত করলেন। এতে সে হাউজের ভেতরেই মারা গেল।

মল্লযুদ্ধের আহ্বান

আসওয়াদ নিহত হওয়ায় যুদ্ধের আগুন আরও তীব্র হয়ে উঠল। সাথে সাথেই কুরাইশ শিবির থেকে একই পরিবারের তিন যোদ্ধা সামনে এগিয়ে এল। উতবা, তার ভাই শাইবা এবং তার ছেলে ওয়ালিদ। তারা মক্কাবাহিনীর কাতার থেকে বের হয়ে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আনসারি তিন যুবক সাহাবি বের হয়ে এলেন মুসলিম বাহিনী থেকে। তারা হলেন আউফ ও মুয়াওয়াজ—তাদের বাবার নাম হারিস আর মায়ের নাম আফরা। তৃতীয় জন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।

কুরাইশ সেনারা তাদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কারা?'

তারা বললেন, 'আনসার সদস্য।'

কুরাইশরা বলল, 'তোমরা যোগ্য প্রতিপক্ষ; কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী নই। আমরা আমাদের বংশের লোকদের চাই। তারপর তাদের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল, হে মুহাম্মাদ, আমাদের গোত্রের সমকক্ষ লোকদের পাঠিয়ে দাও।'

নবিজি তখন নাম ধরে বলতে লাগলেন, উবাইদা ইবনু হারিস, হামযা ও আলি—তোমরা তাদের মোকাবেলা করো।

তারা ৩ জন নবিজির আদেশ অনুযায়ী এগিয়ে গেলেন। কুরাইশদের নিকটবর্তী হলে পুনরায় তারা জানতে চাইল, 'তোমরা কারা?'

মুসলিমরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। তারপর আগত কুরাইশরা বলল, 'তোমরা হলে আমাদের সমকক্ষ যোদ্ধা।'

মল্লযুদ্ধ শুরু হলো। উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এদের মাঝে সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি। তিনি মোকাবেলা করলেন উতবা ইবনু রবিআর। হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু শাইবার মুখোমুখি হলেন। ওয়ালিদের সামনে দাঁড়ালেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

হামযা ও আলি প্রতিপক্ষকে একটুও সময় দিলেন না। মুহূর্তেই ধরাশায়ী করে ফেলেন

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৬৫; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৩৯৫৭; এর সনদ সহিহ।

তাদের। অন্যদিকে উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার প্রতিপক্ষের মাঝে চলছে তুমুল লড়াই। ঘাত-প্রতিঘাতের এক পর্যায়ে এক অপরকে মারাত্মক জখম করে ফেলেন তারা। আলি ও হামযা তখন ঝাঁপিয়ে পড়েন উতবার ওপর এবং মুহূর্তেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন তাকে। এরপর উবাইদাকে কাঁধে করে নিয়ে ফিরে এলেন তারা। তার পা মারাত্মকভাবে জখম হয়। এরপর থেকে বাকরুদ্ধ ছিলেন তিনি। বদর যুদ্ধের ৪ দিন কিংবা ৫ দিন পর মদিনায় ফেরার পথে সাফরা অঞ্চলে শাহাদাত-বরণ করেন।

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত জোর গলায় বলতেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি তাদের ব্যাপারেই নাযিল করেছেন—

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ... ﴿١٩﴾

এরা বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী দুই প্রতিপক্ষ। তারা তাদের রবের ব্যাপারে পরস্পরে বিতর্ক করে।[১]

সর্বাত্মক আক্রমণ

মল্লযুদ্ধের পরিণতি মুশরিকদের জন্য ছিল মন্দ সূচনা। মুহূর্তের ব্যবধানে তারা তাদের শ্রেষ্ঠ ৩ জন বীরকে হারায়। তাই প্রচণ্ড ক্রোধে হামলে পড়ে মুসলিমদের ওপর।

অপরদিকে মুসলিম বাহিনী তাদের রবের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করছিল। একনিষ্ঠ অনুনয়-বিনয়ের সাথে দুআ শেষে মুশরিকদের ধারাবাহিক আক্রমণের মুখোমুখি হয় তারা। প্রথমদিকে নিজেদের অবস্থানে থেকেই প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করে যাচ্ছিল। তাদের মুখে ছিল তাওহিদের 'আহাদ আহাদ' ধ্বনি। অন্যদিকে মুশরিকরা ছিল চরম ক্ষয়ক্ষতির শিকার।

রবের কাছে নবিজির বুকভরা আকুতি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীর বিন্যাস শেষে জায়নামাজে বসলেন। অব্যাহতভাবে রবের কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের আকুতি জানাতে লাগলেন—

اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ

আল্ল-হুম্মা আংজিয্ লী মা- ও'আত্তানী, আল্ল-হুম্মা ইন্নী উংশিদুকা 'আহ্‌দাকা ওয়া ওয়া'দাকা।

---

[১] সুরা হজ, আয়াত : ১৯

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনি যে প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছেন, তা পূরণ করুন! হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কামনা করছি!

ক্রমশ যখন রণাঙ্গান উত্তপ্ত হতে লাগল, তীব্র ধাওয়া পালটা-ধাওয়া শুরু হলো, প্রচণ্ড যুদ্ধে রণাঙ্গানের চিত্র যখন খুবই ভয়াবহ, তখনো নবিজি দুআ করছিলেন, 'হে আল্লাহ, যদি আজ এই দলটি পরাজিত হয়, আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ, আপনি কি চান, আজকের পর আর কখনোই আপনার ইবাদত না করা হোক?' এত প্রবলভাবে মিনতি জানাচ্ছিলেন যে, তার কাঁধ থেকে চাদর খুলে পড়ে গেল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির এই অবস্থা দেখে সহ্য করতে না পেরে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি আপনার রবের কাছে চেয়েছেন। এমন চাওয়া কখনো ব্যর্থ হবে না।'

নবিজির এই আকুতিতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন, 'আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। মুমিনদের অবস্থান দৃঢ় করে রাখো; অতি শীঘ্রই আমি কাফিরদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেব।'[১] এরপর তিনি নবিজির কাছে ওহি পাঠান, 'আমি ক্রমাগত হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সহযোগিতা করছি।'[২]

অর্থাৎ ১ হাজার ফেরেশতা একই সময়ে আসবে না, ক্রমান্বয়ে আসবে।

ফেরেশতাদের আগমন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো আবু বকর, এই তো জিবরিল আসছেন, তার পথে ধুলো উড়ছে।'

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় কথাটি এসেছে এভাবে—নবিজি বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো আবু বকর, আল্লাহর সাহায্য চলে এসেছে। এই তো জিবরিল তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধূলিঝড়ের মাঝখান দিয়ে ধেয়ে আসছেন।'

তারপর নবিজি বর্ম পরিধান করে তাঁবু থেকে বের হয়ে এই আয়াত পাঠ করলেন—

এই দল অতি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিছু হটবে।[৩]

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ১২

[২] সুরা আনফাল, আয়াত : ৯

[৩] সুরা কমার, আয়াত : ৪৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৯০১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৩৯৮

এরপর তিনি একমুষ্টি নুড়িপাথর হাতে নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, 'তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাক।' বদর প্রান্তরে যত কাফির উপস্থিত ছিল, সকলেরই চোখে, নাকে এবং মুখে এই নুড়িপাথর আঘাত হানল। এই নিক্ষেপণের কথা আল্লাহ তাআলা ব্যক্ত করেছেন এভাবে—'আপনি যখন নিক্ষেপ করেছেন, বস্তুত আপনি নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ নিজেই নিক্ষেপ করেছেন।'[১]

তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো কাফিরদের ওপর

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন মুসলিম বাহিনীকে পালটা আক্রমণের আদেশ দিলেন। বললেন, 'তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো।' সাহাবিদের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন এই বলে, 'ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আজ যে ব্যক্তিই তাদের সাথে লড়াই করবে, পিছু না হটে প্রতিদানের প্রত্যাশায় সামনে এগিয়ে যাবে—তাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' আরও বললেন, 'ওই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, আসমান-জমিনের সমান যার সীমানা।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে উমাইর ইবনুল হুমাম বললেন, 'বাহ! বাহ!' নবিজি জানতে চান, 'তুমি এভাবে কেন বললে?' ইবনুল হুমাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম, আমি এই জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার জন্যই এমন করে বলেছি।' এরপর নবিজি বললেন, 'তুমি সেখানকার অধিবাসী।'

উমাইর তার ব্যাগ থেকে কিছু খেজুর বের করে খাচ্ছিলেন। নবিজির আহ্বান শুনে বললেন, যদি এই খেজুরগুলো শেষ করার জন্য বসে থাকি, তাহলে তো আমার জান্নাতে যেতে দেরি হয়ে যাবে! সাথে সাথে হাতের সব খেজুর ফেলে দিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন রণক্ষেত্রে এবং যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে জান্নাতি হলেন তিনি।[২]

আউফ ইবনু হারিস নবিজির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, বান্দার কোন কাজে আল্লাহ তাআলা বেশি খুশি হন?' নবিজি বললেন, 'যখন বান্দা নগ্ন বুকে শত্রুদের মাঝে ঢুকে যায়।' আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু সাথে সাথে তার গায়ে থাকা বর্মটি খুলে ফেলেন। তরবারি হাতে ঢুকে গেলেন কাফিরদের অভ্যন্তরে। যুদ্ধ করতে করতে তিনিও শহিদ হয়ে গেলেন।

নবিজির পালটা আক্রমণের আদেশ দেওয়ার আগেই শত্রুপক্ষের আক্রমণের তীব্রতা অনেকটা কমে গেছে, তাদের সাহসিকতায়ও ভাটা পড়েছে খানিকটা। এমন মুহূর্তে আক্রমণের আদেশ দেওয়াটা ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ। মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালীকরণে যা বিরাট

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ১৭

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৯০১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৩৯৮

এক ভূমিকা পালন করেছে। কেননা তাদের যখন আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে সামরিক উদ্যম কাজ করছিল। আদেশ পেয়ে তারা শক্তিশালী ও ভয়ংকর এক আক্রমণ করলেন। শত্রু-সারি ভেদ করে তাদের কচুকাটা করতে লাগলেন। উপরন্তু তারা যখন দেখলেন, নবিজি বর্ম পরিধান করে সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, 'এই বাহিনী অতি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিছু হটবে', তখন তাদের উদ্যম ও তেজ যেন চূড়ান্তে পৌঁছে গেল। সাহাবিদের মাঝে সঞ্চারিত হলো দ্বিগুণ উদ্দীপনা। ফলে তাদের আক্রমণ ছিল কঠিন তেজস্বী। এমন সময় ফেরেশতারাও তাদের সহযোগিতা করলেন। ইকরিমা থেকে ইবনু সাদের একটি বর্ণনায় তিনি বলেন, ওইদিন অনেকের মাথাই ছিন্ন হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কার আঘাতে পড়ছিল তা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। অনেকের হাত কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু আঘাতকারীরা অদৃশ্য।

ইবনু আব্বাস বলেন, একজন মুসলিম সেনা তার সামনে থাকা এক কাফিরকে ধাওয়া করছিলেন। হঠাৎ তার মাথার ওপর চাবুকের আঘাত শুনতে পান। আরেকজন অশ্বারোহী বলছেন, 'হাইজুম, সামনে এগিয়ে যাও।' তখন ওই সাহাবি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুশরিক চিত হয়ে পড়ে আছে। তিনি তা আল্লাহর রাসুলকে জানালে তিনি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' এ ছিল তৃতীয় আসমানের ফেরেশতাদের কাজ।[১]

আবু দাউদ মাযিনি বলেন, আমি এক মুশরিককে আঘাত করার জন্য তরবারি চালাচ্ছিলাম। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমার তরবারি তাকে স্পর্শ করার আগেই হঠাৎ তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি তাকে হত্যা করিনি, অন্য কেউ করেছে।

এক আনসারি সাহাবি আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবকে বন্দি করে নিয়ে এলেন।[২] তখন আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম, এই লোক আমাকে বন্দি করেনি; বরং আমাকে বন্দি করেছে ডোরাকাটা ঘোড়ার ওপর আরোহী কেশবিহীন সুদর্শন এক ব্যক্তি। তাকে এই লোকগুলোর মাঝে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তখন আনসারি সাহাবি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি তাকে বন্দি করেছি।' নবিজি বললেন, 'থামো। আল্লাহ তাআলা তোমাকে একজন সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে সহায়তা করেছেন।'

রণক্ষেত্র থেকে শয়তান লেজ গুটিয়ে পালায়

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, ইবলিস মক্কাবাহিনীর সাথে এসেছিল সুরাকা ইবনু মালিক ইবনি জুশুমের বেশ ধরে। সে এতক্ষণ তাদের দলেই ছিল। কিন্তু যখন যুদ্ধের ময়দানে

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৬৩; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮৭৪

[২] নবিজির চাচা আব্বাস তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি।

ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ লক্ষ করল, তখন চোরের মতো পালিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ হারিস ইবনু হিশাম তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সুরাকা ওরফে ইবলিস তার বুকে প্রচণ্ড এক ঘুসি দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর আবার পালাতে শুরু করে সে। মুশরিকরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'সুরাকা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি তো বলেছিলে, তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদের একা ফেলে তুমি কখনো যাবে না।' ইবলিস বলল, 'আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।' এরপর সে পালিয়ে যায় এবং সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দেয়।'

শোচনীয় পরাজয়

মুশরিকদের সারিতে বিশৃঙ্খলা ও হতাশা তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে মুসলিম বাহিনীর তুমুল আক্রমণের মুখে তাদের অবস্থা ক্রমশ বিধ্বস্ত হতে থাকে। যুদ্ধ তখন চূড়ান্ত ফলাফলের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মুশরিকরা ছত্রভঙ্গ। দিগ্‌বিদিক ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল তারা। বিপরীতে মুসলিমরা তাদের ধাওয়া করছিল, কাউকে করছিল হত্যা তো কেউ হচ্ছিল তাদের হাতে বন্দি। এভাবেই মুসলিমরা বিজয়ী হয় আর মুশরিকদের ওপর নেমে আসে শোচনীয় এক পরাজয়।

যুদ্ধের ময়দানে অসহায় আবু জাহল

পাপিষ্ঠ আবু জাহল যখন তার বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখতে পেল, তখন চেষ্টা করল এই উত্তাল ঢেউয়ের সামনে শক্ত দেওয়াল হয়ে দাঁড়াতে। সে তার সেনাদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। অহমিকা ও রূঢ়তার সাথে বলতে লাগল, 'সুরাকার পশ্চাদপসরণ যেন তোমাদের পরাজিত না করে। সে নিশ্চয় মুসলিমদের সাথে আঁতাত করেছে। উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদের মৃত্যুও যেন তোমাদের মনোবল ভেঙে না দেয়। আসলে ওরা খুব তাড়াহুড়ো করেছিল। শুনে রেখো, লাত ও উযযার কসম, আমরা তাদের সবাইকে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলার আগে ঘরে ফিরে যাব না। শোনো, তোমরা কেউ তাদেরকে হত্যা করবে না; বরং তাদের সবাইকে বন্দি করবে। তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিদান তাদেরকে পেতেই হবে।

কিন্তু খুব অল্প সময়েই তার এই অহমিকা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তার সামনে স্পষ্ট হয়ে এল প্রকৃত বাস্তবতা। মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিম-আক্রমণের স্রোতে তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে ভেসে যেতে লাগল। অবশ্য তার সাথে কিছু মুশরিক তখনো অবশিষ্ট ছিল। তারা তাকে ঘিরে তরবারির একটি প্রাচীর ও বর্মের একটি দেওয়াল দাঁড় করে রেখেছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সেই প্রাচীর ও দেওয়ালকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উৎপাটিত করে দিল। তখন এই দুরাত্মা আবু জাহল এল দৃষ্টিসীমার মধ্যে। মুসলিমরা দেখলেন, সে ঘোড়া নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এদিকে দুটি কিশোর তার জন্য অধীর অপেক্ষা করছিল।

দুই কিশোরের হাতে আবু জাহলের মৃত্যু

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ বলেন, আমি বদরের দিন কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ডানে-বামে তাকিয়ে দেখলাম দুজন কিশোর আমার পাশে। তাদের দেখে তো আমি অবাক। এমন সময় তাদেরই একজন অন্যজন থেকে লুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'চাচা, আবু জাহল লোকটাকে একটু দেখিয়ে দিন।' আমি বললাম, 'ভাতিজা, তার সাথে তোমার কীসের লেনদেন?' সে বলল, 'শুনেছি সে আল্লাহর রাসুলকে গালমন্দ করে। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি তার থেকে পৃথক হব না, যতক্ষণ না আমাদের মাঝে কেউ মৃত্যুবরণ করবে!'

আব্দুর রহমান বলেন, আমি তার কথা শুনে বিস্মিত হলাম বৈ কি। তখন অন্যজন আমাকে খোঁচা দিয়ে আগের জনের মতোই আবু জাহলের কথা জানতে চাইল এবং তার মতোই উত্তর দিল। কাকতালীয়ভাবে তখনই আমি আবু জাহলকে দেখি, ময়দানে ঘোড়া নিয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের দেখিয়ে বললাম, 'ওই যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে, সে-ই আবু জাহল।' আব্দুর রহমান বলেন, এরপর তারা দুজন বাজপাখির মতো তরবারি হাতে তার দিকে ছুটে গেল এবং তার ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেই ছাড়ল।

তারপর নবিজির কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আবু জাহলকে হত্যা করেছ?' দুজনেই বলল, 'আমি হত্যা করেছি।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ?' তারা বলল, 'না, এখনো মুছিনি।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তরবারি দেখে বললেন, ' হ্যাঁ, তোমরা দুজনে মিলেই তাকে হত্যা করেছ।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জাহল থেকে প্রাপ্ত সম্পদ মুআজ ইবনু আমর ইবনি জামুহকে দিয়ে দেন। ওই কিশোরদের নাম মুআজ ইবনু আমর ইবনি জামুহ এবং মুয়াওয়াজ ইবনু আফরা।[১]

যুদ্ধ শেষে নবিজি বললেন, আবু জাহলের খোঁজ নাও। সবাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সবার আগে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে দেখতে পান। তখন সে মৃত্যুর একেবারে দ্বারপ্রান্তে। ইবনু মাসউদ তার গর্দানে পা রেখে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে তার দাড়ি ধরে বললেন, 'হে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ কি তোকে লাঞ্ছিত করেননি?' আবু জাহল বলল, 'কীভাবে আমাকে লাঞ্ছিত করল! তোমরা যাকে হত্যা করেছ, তার সমকক্ষ বা তার চেয়ে সম্ভ্রান্ত কেউ আছে?' আবু জাহল আফসোস করে আরও বলতে লাগল, 'হায়, যদি কৃষক ছাড়া অন্য কেউ আমাকে হত্যা করত!'

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩১৪১; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৫২

ইবনু মাসউদের পা তখনো আবু জাহলের ঘাড়ে। আবু জাহল জানতে চাইল, 'আজকের বিজয়ী কারা?' ইবনু মাসউদ বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল।' আবু জাহল রেগে গিয়ে বলল, 'ওরে তুচ্ছ রাখাল, তুই অনেক বাড় বেড়েছিস।' উল্লেখ্য যে, ইবনু মাসউদ মক্কায় থাকাকালীন মেষ চরাতেন।

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার মস্তক শরীর থেকে ছিন্ন করে ফেলেন। তারপর তা নিয়ে নবিজির কাছে এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শত্রু আবু জাহলের মস্তক নিয়ে এসেছি।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎফুল্ল চিত্তে বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।' এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তারপর বলেন, 'আল্লাহু আকবার, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার, যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই পুরো দলকে পরাস্ত করেছেন। চলো, আমরা আবু জাহলের লাশটা দেখে আসি!'

আমরা সবাই মিলে তার লাশের কাছে যাই। নবিজি তাকে দেখে বলেন, 'সে ছিল এই উম্মাতের ফিরাউন।'

বদর যুদ্ধে ঈমানের দীপ্তি

পূর্বে উমাইর ইবনু হাম্মাম এবং আউফ ইবনু হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা আমরা উল্লেখ করেছি। এছাড়াও বদর যুদ্ধে আরও অনেক ঈমানদীপ্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আকিদা-বিশ্বাসের শক্তি এবং আদর্শের ওপর নিখাদ অবিচলতার এমন নজির মেলা ভার। এই যুদ্ধ ছিল পিতা-পুত্রের মাঝে, ভাই-ভাইয়ের মাঝে। লড়াই হয়েছিল কেবল আদর্শের ভিন্নতার কারণে। সেই ভিন্নতার নিষ্পত্তি হয়েছে তরবারির ভাষায়। নিপীড়ক জালিমদের মুখোমুখি হয়েছিল মুসলিমরা। তারপর প্রতিশোধ নিয়ে নিজেদের ক্রোধ শান্ত করেছে। এমনই কিছু ঘটনা নিচে তুলে ধরছি—

একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের বললেন, 'আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশিম-সহ কয়েকটি গোত্রের লোকেরা বাধ্য হয়ে এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার তাদের কোনো আগ্রহ নেই। তাই তোমরা বনু হাশিমের কারও মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। আবুল বাখতারি ইবনু হিশামের মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। এদেরকে জোরপূর্বক নিয়ে আসা হয়েছে।

তখন আবু হুজাইফা ইবনু উতবা বললেন, 'তাহলে আমরা নিজেদের আত্মীয়স্বজনের সাথে যুদ্ধ করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? আল্লাহর কসম, যদি আব্বাসকে আমি পাই, তাহলে তরবারি দিয়ে কচুকাটা করে ছাড়ব।'

তার এ কথা নবিজির কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বললেন, 'হে আবু হাফসা, আল্লাহর রাসুলের চাচার চেহারায় কি তরবারি দিয়ে আঘাত করা হবে!'

উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে আবু হুজাইফার মাথা আলাদা করে ফেলি। আল্লাহর কসম, সে মুনাফিক হয়ে গেছে।'

আবু হুজাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তী জীবনে বলতেন, সেদিনের কথার জন্য আমি এখনো নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি না। আমি এখনো ভয় পেয়ে যাই মাঝে মাঝে। তবে শাহাদাত-বরণ করতে পারলে হয়তো তার প্রায়শ্চিত্ত হবে। পরে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত-বরণ করেন।

আবুল বাখতারিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। মক্কায় থাকাকালীন তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সবচেয়ে সহনশীল ছিলেন। তিনি কাউকে কষ্ট দিতেন না। নবিজির জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে—এমন কাজও তিনি করেননি কোনোদিন। তাছাড়া বনু হাশিম ও বনুল মুত্তালিবের বয়কটের চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলার পেছনে তারও হাত ছিল।

কিন্তু আবুল বাখতারি এ যুদ্ধে নিহত হন। এর পেছনে অবশ্য কারণ রয়েছে। সাহাবি মুজাযযার ইবনু যিয়াদ বালাবি রাযিয়াল্লাহু আনহু রণাঙ্গনে তার মুখোমুখি হন। তখন আবুল বাখতারির সাথে তার একজন বন্ধুও ছিল। উভয়ে একত্রে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মুজাযযার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, 'আবুল বাখতারি, আল্লাহর রাসুল আপনাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' আবুল বাখতারি বললেন, 'আমার সাথিকেও ছেড়ে দেবে?' মুজাযযার বললেন, 'কক্ষনো না, আমরা আপনার সঙ্গীকে ছাড়ব না।' আবুল বাখতারি বললেন, 'তাহলে তার সাথে আমিও মারা যাব।' তখন মুজাযযার তাকে হত্যা করতে বাধ্য হন।

ইসলামপূর্ব যুগে সাহাবি আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এবং কাফির সর্দার উমাইয়া ইবনু খালফের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বদরের দিন আব্দুর রহমান শত্রুপক্ষ থেকে অর্জিত কিছু বর্ম নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এদিকে উমাইয়া তার ছেলে আলির হাত ধরে পথেই দাঁড়িয়েছিল। সে আব্দুর রহমানকে দেখে বলল, 'আব্দুর রহমান, আমাকে কি তোমার প্রয়োজন আছে? তোমার হাতে থাকা বর্মগুলোর চেয়ে আমি বেশি মূল্যবান। আজকের মতো ভয়ানক দিন আমি এর আগে দেখিনি। তোমার কি দুধের প্রয়োজন আছে?' (অর্থাৎ যে আমাকে বন্দি করবে, আমি তাকে একটি দুধেল উটনী দেব) আব্দুর রহমান বর্মগুলো ফেলে দিয়ে বাপ-বেটাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলেন।

তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ও তার ছেলের মাঝখানে হাঁটছিলাম। তখন উমাইয়া আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মাঝে উটপাখির পালক বুকে নিয়ে আগত ওই

ব্যক্তিটা কে?' আমি বললাম, 'হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব।' সে বলল, 'এই লোকই আজ আমাদের সাথে এই তাণ্ডব ঘটিয়েছে।'

আব্দুর রহমান আরও বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিলাল তাদেরকে আমার সাথে দেখে ফেলল। উমাইয়া মক্কায় থাকাকালীন বিলালকে অনেক নিপীড়ন করেছিল। বিলাল বলল, 'কাফিরদের সর্দার উমাইয়া ইবনু খালফ! হয় সে বাঁচবে নাহয় আমি বাঁচব।' আমি বললাম, 'বিলাল, সে আমার বন্দি।' বিলাল বলল, 'আজ আমাদের শেষ বোঝাপড়া হবেই হবে।' আমি বললাম, 'এই হাবশির ছেলে, আমি কি বলেছি তুমি শুনতে পাওনি?' বিলাল বলল, 'আজ হয় সে বাঁচবে নাহয় আমি বাঁচব।' তারপর চিৎকার দিয়ে বলল, 'হে আল্লাহর আনসারগণ, কাফিরদের সর্দার উমাইয়া ইবনু খালফ। আজ হয় সে বাঁচবে নাহয় আমি।'

আব্দুর রহমান বলেন, 'সকলে আমাদের ঘিরে নিল এবং বলয়ের মতো বানিয়ে ফেলল। আমি তার প্রতিরক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। তিনি বলেন, তখন এক লোক পেছন দিক থেকে তার ছেলেকে আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে যায়। উমাইয়া তখন এমন জোরে আর্তনাদ করে ওঠে, যা আমি আগে কখনো শুনিনি। তখন আমি তাকে বললাম, 'নিজেকে রক্ষা করো। তোমাকে উদ্ধার করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না।' আব্দুর রহমান বলেন, সকলে তাকে তরবারি দিয়ে কচুকাটা করেই ছাড়ল। আল্লাহ বিলালকে রহম করুন, আমার বর্মগুলোও গেল, আবার আমার বন্দির কারণে আমাকেই সে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল।

যাদুল মাআদের বর্ণনায় আছে, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ উমাইয়াকে বললেন, বসে যাও। সে বসে গেল। আব্দুর রহমান তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু তারা নিচের দিক থেকে তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে হত্যা করল। উল্লেখ্য যে, তরবারির কয়েকটি আঘাত আব্দুর রহমান ইবনু আউফের পায়েও লেগেছিল।[১]

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন তার মামা আস ইবনু হিশাম ইবনি মুগিরাকে হত্যা করেন।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আব্দুর রহমান সেদিন মুশরিকদের সারিতে ছিল। আবু বকর তাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'এই পাপিষ্ঠ, আমার সম্পদ কোথায়?' আব্দুর রহমান বলে, 'কিছুই বাকি নেই। শুধু যুদ্ধাস্ত্র, দুঃসাহসী ঘোড়া আর বৃদ্ধকালের ভীমরতি দূরকারী তরবারিটাই আছে।'

সাহাবিরা মুশরিকদের বন্দি করছিলেন। তখন নবিজি ছিলেন তার তাঁবুতে, যেই তাঁবু

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৯

সাদ ইবনু মুআজের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী পাহারা দিচ্ছিলেন তখনো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন—সাহাবিদের কর্মকাণ্ডের কারণে সাদ ইবনু মুআজের চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। নবিজি তাকে বললেন, 'সাদ, ওরা যা করছে, তুমি মনে হয় তা অপছন্দ করছ?' সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, মুশরিকদের সাথে আল্লাহ তাআলা প্রথম যুদ্ধ ঘটিয়েছেন। আমার কাছে মুশরিকদের বন্দি করে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে তাদের হত্যা করাই অধিক পছন্দনীয়।'

সেদিন যুদ্ধ চলাকালীন উক্কাশা ইবনু মুহসিন আসাদির তরবারি ভেঙে যায়। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলে নবিজি তাকে কাঠের একটি লাকড়ি দিয়ে বলেন, 'উক্কাশা, এটি দিয়ে যুদ্ধ করো।' উক্কাশা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কাছ থেকে সেটি নিয়ে একটি ঝাঁকি দেন। সাথে সাথে সেটা দীর্ঘ শক্ত তীক্ষ্ণ শুভ্র তরবারিতে রূপান্তরিত হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন। এই তরবারির নাম 'আউন'। যুদ্ধের পরে এটি তার কাছেই ছিল। তিনি সবসময় এটি দিয়ে যুদ্ধ করতেন। সর্বশেষ রিদ্দার যুদ্ধে তিনি যখন শহিদ হন, তখনো আউন তার হাতেই ছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুসআব ইবনু উমাইর আবদারি রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাই আবু আজিজ ইবনু উমাইরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আবু আজিজ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিল। তখন একজন আনসারি সাহাবি তার হাত বাঁধছিলেন। মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু আনসারি সাহাবিকে বললেন, তার হাত শক্ত করে বেঁধো। তার মা অনেক ধনী। তার মুক্তিপণ হিসেবে অনেক সম্পদ পাবে। আবু আজিজ আশ্চর্য হয়ে তার ভাই মুসআবকে বলল, ভাই হয়ে ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা বলতে পারলি? মুসআব রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই আনসারি সাহাবি আমার বন্ধু; তুমি নও।

যুদ্ধ শেষে মুশরিকদের লাশগুলো একটি কূপে ফেলে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। উতবা ইবনু রবিআর মরদেহ কূপের দিকে টেনে আনা হচ্ছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছেলে আবু হুজাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে তাকালেন। তাকে বিষণ্ণ ও বিবর্ণ দেখাচ্ছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু হুজাইফা, বাবার এমন পরিণতি দেখে তুমি কষ্ট পাচ্ছ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, না হে আল্লাহর রাসুল, আমার বাবা এবং তার পরিণতি নিয়ে আমার কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু আমি আমার বাবাকে মনে করতাম বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান এবং চৌকস ব্যক্তি। তাই আমি কামনা করতাম, তিনি হয়তো ইসলামে দীক্ষিত হবেন। কিন্তু যখন তার পরিণতি দেখলাম এবং কুফরের ওপর মৃত্যুবরণের ফলাফল আপনার মুখে শুনলাম, তখন আমি কিছুটা কষ্ট পেলাম।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুজাইফার জন্য কল্যাণের দুআ করলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিলেন।

মুসলিম ও কাফিরদের নিহতের সংখ্যা

বদর যুদ্ধে মুশরিকরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। মুসলিমরা অর্জন করেছে পরম এক বিজয়। মুসলিমদের মধ্য থেকে এই যুদ্ধে ১৪ জন শাহাদাত-বরণ করেছেন; নিহতদের ৬ জন মুহাজির সাহাবি, আর আনসারি সাহাবি ৮ জন।

অন্যদিকে মুশরিকদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল চরম পর্যায়ের। তাদের নিহতের সংখ্যা ৭০ জন। বন্দিও হয়েছিল ৭০ জন, এদের অধিকাংশই নেতৃস্থানীয় ও ক্ষমতাশালী।

যুদ্ধ শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক নিহতদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তোমরা তোমাদের নবির নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, অথচ অন্যরা আমাকে সত্যায়ন করেছে। তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করেছ, কিন্তু অন্যরা আমাকে সহায়তা করেছে। তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।' এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কূপে ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন। তার আদেশ অনুসারে তাদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হয়।

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিন ২৪ জন নেতৃস্থানীয় কুরাইশের মরদেহ বদরের একটি পরিত্যক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কূপে নিক্ষেপ করার আদেশ দেন। তার আদেশ যথাযথভাবে পালিত হয়। তৎকালীন আরবদের নিয়ম ছিল, কেউ কোনো বিজয় অর্জন করলে রণাঙ্গনেই ৩ দিন অবস্থান করত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেখানে ৩ দিন অবস্থান করেন। তৃতীয় দিন তিনি যাত্রা করার আদেশ দেন। যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তিনি পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করেন। সাহাবিগণ তার পেছনে পেছনে চলতে থাকেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই কূপের পাড়ে দাঁড়িয়ে কুরাইশ নেতাদের বাপদাদার নাম ধরে ডেকে ডেকে বলেন, 'হে অমুকের ছেলে অমুক, হে তমুকের ছেলে তমুক, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করাটাই কি তোমাদের জন্য কল্যাণকর ছিল না? আমাদের রব যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তা যথার্থরূপে পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের রবের প্রতিশ্রুতি ঠিকঠাক পেয়েছ?'

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, প্রাণহীন দেহের সাথে আপনি কী কথা বলছেন?' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি যা বলছি, তা তোমাদের চেয়ে তারাই ভালোভাবে শুনছে।' অন্য বর্ণনায় আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তারা খুব ভালোভাবেই আমার কথা শুনতে পাচ্ছে। তবে তারা উত্তর দিতে পারছে না।'[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯৭৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৩৫৯; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৩৯৬৭

মক্কায় পৌঁছে গেল পরাজয়ের দুঃসংবাদ

মুশরিকরা বদর প্রান্ত থেকে পালিয়ে গেছে বিশৃঙ্খলভাবে। বিভিন্ন উপত্যকা ও গিরিগুহায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা। কেউ কেউ মক্কার দিকে ছুটেছে শঙ্কিত হয়ে। লজ্জা ও অপমান নিয়ে তারা কীভাবে প্রবেশ করবে মক্কায়, তাদের জানা ছিল না তখন।

কুরাইশের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে সর্বপ্রথম যে মক্কায় আসে, সে হলো হাইসামান ইবনু আব্দিল্লাহ আল-খুযাই। মক্কাবাসী জিজ্ঞেস করে, 'বাহিনীর কী খবর?' সে জানায়, 'উতবা ইবনু রবিআ, শাইবা ইবনু রবিআ, আবুল হাকাম ইবনু হিশাম, উমাইয়া ইবনু খালফ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয়েছে।' যখন সে কুরাইশ নেতাদের নাম গণনা করা শুরু করে, তখন সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া একটি পাথরের ওপর বসে ছিল। অবিশ্বাস্য এমন বকবক শুনে সে বলে, 'দেখো তো, ওর মাথা ঠিক আছে কি না? তাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো।' লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া কী করছে?' সে বলে, 'ওই যে সে পাথরের ওপর বসে আছে। আল্লাহর কসম, আমি তার বাবা ও ভাইকে নিহত হতে দেখেছি।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত গোলাম আবু রাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আব্বাসের গোলাম ছিলাম। ইসলাম আমাদের পরিবারে প্রবেশ করেছিল। আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, উম্মুল ফজল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আমিও মুসলিম হয়েছিলাম। কিন্তু আব্বাস তার ইসলামগ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। এদিকে আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বিধায় মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। যখন পরাজয়ের সংবাদ এল, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করলেন। আমরা অন্তরে শক্তি ও সম্মান অনুভব করলাম। আমি ছিলাম একজন রোগাশোকা মানুষ। যমযম কূপের ঘরে বসে তির বানাতাম। আল্লাহর কসম, আমি তখন সেখানে বসে আমার কাজ করছিলাম, আমার পাশে উম্মুল ফজলও ছিলেন। পরাজয়ের সংবাদে আমরা মনে মনে ভীষণ আনন্দিত। ঠিক তখনই আবু লাহাব হন্তদন্ত হয়ে আমাদের দিকে এল। এরপর সে যমযমের কামরার পাশে গিয়ে বসল। একবারে আমার পিঠাপিঠি!

আবু লাহাব বসে আছে, এমন সময় লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ওই তো আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস ইবনি আব্দিল মুত্তালিব[১] এসেছে যুদ্ধের ময়দান থেকে। আবু লাহাব তাকে বলল, 'আমার কাছে আসো, তুমিই জানো আসল ঘটনা।' আবু রাফি

---

[১] মক্কার প্রসিদ্ধ কাফির আবু সুফিয়ান ইবনু হারব এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবনি আব্দিল মুত্তালিব—একই ব্যক্তি নন। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস হচ্ছেন নবিজির আপন চাচাতো ভাই এবং দুধভাই। কারণ হালিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাদের দুজনকেই দুধ পান করিয়েছেন। আবু সুফিয়ান ইবনু হারব এবং আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস দুজনেই মক্কাবিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। [*সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ইমাম যাহাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৩; মুআসসাসাতুর রিসালাহ]

রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সে আবু লাহাবের কাছে এসে বসল। লোকেরা সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবু লাহাব বলল, 'ভাতিজা, কী ঘটনা ঘটল আমাদের একটু শোনাও তো।' সে বলল, 'আমরা এমন এক দলের মুখোমুখি হয়েছিলাম, যাদের সামনে আমরা নিজেদের গর্দান পেতে দিয়েছি, তারা যেভাবে ইচ্ছা আমাদের হত্যা করেছে, যাকে ইচ্ছা বন্দি করেছে। আল্লাহর কসম, সেজন্য আমরা আমাদের সেনাদের তিরস্কার করব না। কেননা আমরা তো এমন কিছু লোকের নাগালে পড়ে গিয়েছিলাম, যারা ছিল শুভ্র সুদর্শন, ডোরাকাটা ঘোড়ার ওপর আরোহী, আসমান ও জমিনের মতো বিশাল। আল্লাহর কসম, তারা কোনো কিছুই ছাড়ছিল না, আবার কেউ তাদের মোকাবেলাও করতে পারছিল না।'

আবু রাফি বলেন, আমি কামরার পর্দা সরিয়ে বললাম, তারা অবশ্যই ফেরেশতা। তখন আবু লাহাব তার হাত উঠিয়ে আমার চেহারায় খুব জোরে একটা আঘাত করল। আমিও উত্তেজিত হয়ে গেলাম। সে আমাকে শূন্যে উঠিয়ে মাটিতে আছাড় দিল। তারপর আমার ওপর চড়ে বসে আমাকে অনবরত মারতে লাগল। আমি ছিলাম হালকা গড়নের মানুষ। তখন উম্মুল ফজল কামরা থেকে একটি খুঁটি নিয়ে এসে তাকে সজোরে আঘাত করলেন। এতে তার মাথায় মারাত্মক জখম হলো। উম্মুল ফজল বললেন, 'তার মালিক সামনে নেই বলে তাকে দুর্বল পেয়ে বসেছ?' আবু লাহাব লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। আল্লাহর কসম, তার ৭ দিন পরই আল্লাহ তাআলা তাকে আদাসা রোগে আক্রান্ত করেন, যা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। আদাসা হলো গুটি বসন্ত রোগ, যেটাকে আরবরা ছোঁয়াচে মনে করত। তাই আবু লাহাবের ছেলেরা তাকে একাকী ফেলে চলে যায়। মৃত্যুর ৩ দিন পরেও কেউ তার খোঁজ নেয়নি; দাফনও করেনি। খালিঘরে সে মরে পড়ে থাকে। দাফন তো দূরের কথা, ৩ দিন পর্যন্ত কেউ কোনো খোঁজই নেয়নি তার। লোকলজ্জার ভয়ে তার ছেলেরা বাধ্য হয়ে একটি গর্ত খোঁড়ে। এরপর লাঠি দিয়ে ঠেলে সেখানে বাবার লাশ ফেলে দেয়। সবশেষে দূর থেকে পাথর ছুড়ে গর্তটি ঢেকে দেয় তারা।

এভাবেই মক্কাবাসী বদর যুদ্ধের পরাজয়-সংবাদ হজম করে। তারা সবাইকে মৃতদের জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করে দেয়—যেন মুসলিমরা তাদের দুর্দশা দেখে আনন্দিত হতে না পারে।

এত কিছুর মাঝে ঘটে আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা। আসওয়াদ ইবনু মুত্তালিব বদরের দিন তার ৩ ছেলেকে হারায়। সে তাদের জন্য বিলাপ করতে চাইছিল। কিন্তু সে ছিল অন্ধ। এক রাতে এক নারীর বিলাপের আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে। সাথে সাথে সে তার গোলামকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, 'দেখো, বিলাপের অনুমতি দেওয়া হলো কি না? কুরাইশ কি তাদের নিহতদেরর জন্য বিলাপ করছে? আমি আমার সন্তান আবু হাকিমার জন্য বিলাপ করতে চাই। আমার ভেতরটা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।'

গোলাম ফিরে এসে জানায়, 'এক নারী তার হারিয়ে যাওয়া উটের জন্য কান্না করছে।' আসওয়াদ তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। সে বলতে থাকে—

তার এ হা-হুতাশ কি উট হারানোর জন্য?
উটের জন্যই হারাম হয়েছে তার নিদ?
উটের জন্য নয়; তাকে দাও বদরের
বীরদের জন্য কান্নার তাগিদ।
হুসাইন, মাখজুম আর আবু ওয়ালিদের গোত্র
যেখানে হারিয়েছে মক্কার বীরদের
আকিলের জন্য হারিসের জন্য কাঁদো
এই শোক তো প্রাপ্য আসলে তাদের।
বীরদের জন্য কাঁদো, নিয়ো না সকলের নাম
আবু হাকিমার মতো কেউ নেই শক্তিমান
আজকে যেসব নগণ্য বেশ ধরেছে নেতার
সেই নেতারা থাকলে বেঁচে, এরা কি পেত স্থান?

মদিনার রাজপথে বিজয়ের সংবাদ

মুসলিমদের বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনাবাসীর নিকট দুজনকে সুসংবাদ দিয়ে পাঠান, যেন তারা দ্রুত সংবাদ জানতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে পাঠান মদিনার উচ্চভূমির লোকদের কাছে। নিম্নভূমির লোকদের কাছে পাঠান যাইদ ইবনুল হারিসাকে।

এদিকে ইহুদি ও মুনাফিকেরা মিলে মদিনায় বিভিন্ন মিথ্যা খবর প্রচার করছিল। এমনকি তারা নবিজির নিহত হওয়ার গুজবও রটিয়ে দিয়েছিল। এখন এক মুনাফিক যখন দেখল যাইদ ইবনুল হারিসা নবিজির উটনী কাসওয়ায় আরোহণ করে আসছে, অমনি সে চিৎকার করে উঠল, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই যে তার উটনী, আমরা এটাকে খুব ভালো করেই চিনি। আতঙ্কগ্রস্ত যাইদ আর কী বলবে। সে তো কিছুই জানে না। সে নিজেই হয়তো পালিয়ে এসেছে।

দূতদ্বয় এলে মুসলিমরা তাদের ঘিরে ধরেন; যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। বিজয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হলে, আনন্দের বন্যা বয়ে যায় তাদের মধ্যে। সারাদিন মদিনাজুড়ে তাদের তাকবির ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে থাকে। মদিনাস্থ মুসলিমদের

নেতৃস্থানীয় লোকজন বদরের দিকে রওনা হয়ে যান, এই নিরঙ্কুশ বিজয়ের জন্য নবিজিকে অভিনন্দন জানাতে।

উসামা ইবনু যাইদ বলেন, উসমানের স্ত্রী, নবিজির কন্যা রুকাইয়ার দাফন কাজ শেষ করার সময় আমাদের কাছে বিজয়ের সংবাদ পৌঁছে। নবিজি উসমানের সাথে আমাকেও তার দায়িত্বে রেখে গিয়েছিলেন।

মদিনার বুকে ফিরে এল মুসলিম বাহিনী

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণাঙ্গনে ৩ দিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে যাত্রাকালে সেনাদের মাঝে গনিমত নিয়ে একটি গন্ডগোল সৃষ্টি হয়। যখন তা চরম আকার ধারণ করে, নবিজি সবাইকে সবকিছু ফেরত দেওয়ার আদেশ করেন। আদেশ মেনে সকলে সবকিছু ফেরত দেন। তারপর এই সমস্যার সমাধানে ওহি নাযিল হয়।

উবাদা ইবনুস সামিত বলেন, আমরা নবিজির সাথে বদরের উদ্দেশে বের হলাম। বদর প্রান্তে উপনীত হয়ে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করলাম। আল্লাহ তাআলা শত্রুদের পরাজিত করলেন। একদল তাদের ধাওয়া করতে তাদের পেছন পেছন ছুটে গেল। তারা অনেককে হত্যাও করল। অপর এক দল গনিমত-সংগ্রহ এবং তা জমাকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরেকদল ছিল নবিজির পাহারায় নিয়োজিত যেন শত্রু অতর্কিতে তার ওপর আক্রমণ করতে না পারে।

রাত হলে সেনারা সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এল। তখন গনিমত উদ্ধারকারীরা বলল, 'আমরা এগুলো জমা করেছি; তাই এখানে অন্য কারও কোনো অধিকার নেই।'

শত্রুদের ধাওয়া করতে যারা বেরিয়েছিল, তারা বলল, 'তোমরা আমাদের চেয়ে এগুলোর বেশি হকদার নও। আমরা শত্রুদেরকে এগুলো থেকে দূরে সরিয়ে পরাজিত করেছি।'

আর যারা নবিজির নিরাপত্তায় ছিল, তারা বলল, 'আমরা আশঙ্কা করছিলাম, শত্রু তার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালাবে, তাই আমরা ছিলাম তার নিরাপত্তারক্ষী। এসবের ব্যাপারে আমরাই অধিক হকদার।' তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন—

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝١

তারা আপনাকে গনিমতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, গনিমত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের

পরিশোধন করো। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বাধ্য হও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।[১]

এরপর নবিজি এসব গনিমত মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[২]

উল্লেখ্য, বদর প্রান্তরে ৩ দিন অবস্থান করার পর নবিজি বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে রওনা করেন। তার সাথে ছিল মুশরিক বন্দি এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত গনিমতের সম্পদ। আব্দুল্লাহ ইবনু কাবকে এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। বাহিনী সাফরার গিরিপথ অতিক্রম করে গিরিপথ ও নাজিয়ার মাঝামাঝি একটি টিলায় অবতরণ করে। সেখানে গনিমতের ৫ ভাগের ১ ভাগ রেখে বাকিটুকু সকলের মাঝে সমান হারে বণ্টন করা হয়।

সাফরায় পৌঁছে নবিজি নজর ইবনুল হারিসকে হত্যার আদেশ দেন। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকা তারই হাতে ছিল। কুরাইশের অন্যতম অপরাধী, চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং নবিজিকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে সে। আলি ইবনু আবি তালিব এক কোপে তার গর্দান উড়িয়ে দেন।

তারপর ইরকে জাবয়ায় পৌঁছে উকবা ইবনু আবি মুইতকে হত্যা করার আদেশ দেন। সে নবিজিকে কী পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, তার কিছু বিবরণ পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এই সেই লোক, যে সালাতরত অবস্থায় নবিজির মাথায় উটের পচা নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছিল। এই সেই লোক, যে তার চাদর দিয়ে নবিজির গলা চেপে ধরেছিল। আবু বকর যদি সেদিন তাকে বাধা প্রদান না করতেন, তাহলে সে হয়তো নবিজিকে মেরেই ফেলত। নবিজি তাকে হত্যার আদেশ দিলে সে বলে ওঠে, 'হে মুহাম্মাদ, আমার সন্তানদের কী হবে?' নবিজি উত্তর দেন, 'আগুন।'[৩] আসিম ইবনু সাবিত আনসারি মতান্তরে আলি ইবনু আবি তালিব তাকে হত্যা করেন।

এই দুই দুরাত্মাকে হত্যা করা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল অপরিহার্য। কেননা তারা শুধু সাধারণ বন্দি ছিল না; বরং বর্তমান পরিভাষা অনুযায়ী ছিল ভয়ংকর যুদ্ধাপরাধী।

অভিনন্দন তোমাদের, হে বিজয়ী দল

মদিনার মুসলিমগণ দূত মারফত বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর নেতৃস্থানীয় লোকেরা অভিবাদন ও স্বাগত জানানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। তারা যখন রাওহায় পৌঁছল, তখন তাদের সাথে যুদ্ধফেরত সকলের সাক্ষাৎ হলো। প্রত্যেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ১

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৭৬২; *মাজমাউয যাওয়াইদ* : ১১০২৪; এর সনদ হাসান লিগাইরিহি।

[৩] বিস্তারিত দেখুন, *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৪; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ৪৫১৪

আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানালেন। তখন সালামা ইবনু সুলামা তাদেরকে বললেন, 'কীসের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছ? আল্লাহর কসম, আমরা তো এমন কিছু লোকের সাথে লড়াই করেছি, যারা বৃদ্ধ; উটের মতো যাদের মাথা নুয়ে পড়েছে।' নবিজি তার কথা শুনে হেসে দিয়ে বললেন, 'ভাতিজা, তারাই ছিল সর্দার।'

উসাইদ ইবনু হুজাইর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ তাআলার, যিনি আপনাকে সফলতা দান করেছেন এবং চক্ষু শীতল করেছেন। তবে আল্লাহর কসম, আপনি শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন—এই ভয়ে আমি বদর যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যাইনি; বরং আমি তো মনে করেছিলাম সাধারণ একটি ব্যবসায়ী কাফেলা মাত্র। যদি জানতাম, তারা সশস্ত্র বাহিনী, তাহলে কস্মিনকালেও আমি পিছিয়ে থাকতাম না।' নবিজি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

তারপর নবিজি মদিনায় প্রবেশ করেন বিজয়ী ও বীরের বেশে। মদিনায় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল শত্রুর অন্তরে তার ভয় ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয়ে মদিনাবাসীদেরও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাঙ্গোপাঙ্গারাও তখন প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে নেয়, যদিও তা কেবল লোকদেখানো।

নবিজি মদিনায় পৌঁছার একদিন পর বন্দিরা মদিনায় এসে পৌঁছে। তিনি সাহাবিদের মাঝে তাদের বণ্টন করে দেন এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণের আদেশ দেন। ফলে সাহাবিরা তার আদেশ অনুযায়ী নিজেরা খেজুর খেতেন আর বন্দিদের খাওয়াতেন রুটি!

উমারের সমর্থনে কুরআনের আয়াত

নবিজি মদিনায় পৌঁছে তার সাহাবিদের সাথে বন্দিদের বিষয়ে পরামর্শ করেন। আবু বকর বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তারা আমাদেরই ভাই, আত্মীয় ও গোত্রীয় লোক। আমি মনে করি আপনি তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে নেন। তাহলে মুক্তিপণের সম্পদ কাফিরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারব। আর যদি পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত দান করেন, তাহলে তারাও আমাদের জন্য সহযোগী হয়ে যাবে।'

নবিজি তখন উমারের দিকে তাকান, বলেন, 'উমার, এ ব্যাপারে তোমার কী মতামত?' তিনি বলেন, 'আবু বকরের সাথে আমি একমত হতে পারলাম না। আমার মত হলো, অমুককে (উমারের এক আত্মীয়) আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে হত্যা করব। আলির হাতে দিয়ে দিন তার ভাই আকিলকে, সে তাকে হত্যা করুক। হামযার হাতে তার এক আত্মীয়কে অর্পণ করুন, তিনি তাকে হত্যা করুন। তাহলে আল্লাহর শত্রুরা জানতে পারবে—আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোনো সমবেদনা নেই। আর এরা তো তাদেরই সর্দার, গুরু ও সেনাপতি।'

উমার বলেন, আবু বকরের মতটি নবিজির মনঃপূত হয়েছিল, আমার মত তার পছন্দ হয়নি। তাই তিনি তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেন।

উমার পরদিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, পরদিন আমি আল্লাহর রাসুল ও আবু বকরের কাছে যাই। দেখি দুজনেই কাঁদছেন। আমি আরজ করি, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ও আপনার বন্ধু কেন কাঁদছেন আমাকে বলুন। যদি আমারও কান্না পায়, তাহলে আমিও কান্না করব। আর যদি কান্না না পায়, তাহলে আপনাদের সাথে কান্নার ভান করব। তখন আল্লাহর রাসুল বলেন, মুক্তিপণ নেওয়ার দায়ে তোমার সাথিদের যে আজাব আমার কাছে পেশ করা হয়েছে, তার জন্য কাঁদছি। আমার কাছে তাদের আজাব এই গাছের চেয়েও নিকটবর্তী করে পেশ করা হয়েছে। এ সময় নবিজি নিকটবর্তী একটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করেন।[১]

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

জমিনে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাজিত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা কোনো নবির জন্য উচিত নয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ; অথচ আল্লাহ তাআলা আখিরাত কামনা করেন। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তোমাদের গ্রহণকৃত জিনিসের কারণে তোমাদের অবশ্যই কঠিন শাস্তি হতো।[২]

আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত হলো আল্লাহ তাআলার এই বাণী—

...فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً... ﴿٤﴾

এরপর তোমরা চাইলে মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারো নতুবা এমনিতেও ছেড়ে দিতে পারো।[৩]

---

[১] *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ৩৬

[২] সুরা আনফাল, আয়াত : ৬৭-৬৮

[৩] সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৪

উক্ত আয়াতে যেহেতু বন্দিদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই তাদের ওপর আজাব আপতিত হয়নি। পূর্বের আয়াতে নিন্দা অবতরণের কারণ তারা কাফিরদেরকে যুদ্ধের ময়দানে হত্যা না করে বন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তারা শুধু যুদ্ধবন্দিই নয়; বরং তারা বড় মাপের যুদ্ধাপরাধী। আধুনিক সমরনীতিতে তাদের ওপর মামলা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াত, যাদের মামলার রায় সাধারণত ফাঁসি কিংবা আজীবন কারাদণ্ড হয়ে থাকে।

যা-ই হোক, আবু বকর সিদ্দিকের মতের ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাফিরদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হয়। ব্যক্তিভেদে মুক্তিপণ ছিল ৪ হাজার দিরহাম, ৩ হাজার দিরহাম এবং ১ হাজার দিরহাম। মক্কার অনেকেই লিখতে পারত। কিন্তু মদিনায় তেমন কেউ লেখাপড়া জানত না। তাই যার মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ্য নেই, সে মদিনার ১০ জন শিশুকে পড়ালেখা শেখাবে। শিশুরা পারদর্শী হয়ে উঠলে এটিই হবে তার মুক্তিপণ।

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে কয়েকজনকে নবিজি অনুগ্রহ করে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিয়ে দেন। যেমন : মুত্তালিব ইবনু হানতাব, সাইফি ইবনু আবি রিফাআ, আবু ইজ্জা জুমাহি প্রমুখ। আবু ইজ্জা জুমাহি উহুদ যুদ্ধে বন্দি অবস্থায় নিহত হয়। এর ঘটনা সামনে আসবে।

নবিজির জামাতা আবুল আসকেও তিনি অনুগ্রহ করে ছেড়ে দেন। তবে শর্ত দেন যে, তার মেয়ে যাইনাবকে নিরাপদে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে হবে। এদিকে যাইনাব স্বামীর মুক্তিপণের জন্য তার একটি হার পাঠিয়েছিলেন, যা মূলত ছিল তার মা খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার। বিয়ের সময় এটি তাকে দেওয়া হয়েছিল। নবিজি তা দেখে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং তার সাহাবিদের কাছে বিনাপণে আবুল আসকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানান। বিনাবাক্যে সকলেই তা মেনে নেন। তখন নবিজি আবুল আসের ওপর এই শর্ত আরোপ করেন যে, যাইনাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দিতে হবে।

আবুল আস মক্কায় পৌঁছে যাইনাবকে পাঠিয়ে দেয়। তিনি হিজরত করেন। নবিজি তাকে আনতে যাইদ ইবনুল হারিসা ও একজন আনসারি সাহাবিকে পাঠান। তাদেরকে তিনি বলে দেন, 'তোমরা ইয়াজাজায় চলে যাবে। যাইনাব সেখানে এলে তোমরা তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে।' তারা গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। যাইনাবের হিজরতের ঘটনাটি বেশ দীর্ঘ আর বেদনাদায়ক।

বন্দিদের মধ্যে একজন ছিল সুহাইল ইবনু আমর। সে ভীষণ অনলবর্ষী বক্তা এবং চরম বাক্‌পটু। উমার বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, সুহাইল ইবনু আমরের সামনের দুটি দাঁত তুলে ফেলুন, তখন তার জিহ্বা বের হয়ে পড়বে এবং সে কোথাও আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে পারবে না।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই আবেদন বাতিল করে দেন। যেহেতু মুসলা তথা অঙ্গবিকৃতি করা একটি জঘন্য অপরাধ আর এমন গর্হিত কাজের জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন, তাই

উমারের প্রস্তাবটি নাকচ করেন তিনি।

সাদ ইবনু নুমান উমরা করার জন্য মক্কায় যান। আবু সুফিয়ান তাকে বন্দি করে ফেলে। আবু সুফিয়ানের ছেলে আমর ছিল মদিনার বন্দিদের একজন। তাকে আবু সুফিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলে সেও সাদকে মুক্ত করে দেয়।

কুরআনের পাতায় বদরের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতেই সুরা আনফাল নাযিল হয়। এ যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যুদ্ধপরবর্তী বক্তব্য। তবে সাধারণ বাদশাহ ও সেনাপতিরা যুদ্ধের পর যে মন্তব্য পেশ করে থাকে, এই সুরার আলোচনা সেসব থেকে একদমই ভিন্ন।

প্রথমত এই সুরায় আল্লাহ মুসলিমদের মাঝে নিহিত ও তাদের থেকে প্রকাশিত নৈতিক বিচ্যুতি ও ত্রুটির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন তারা নিজেদের আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয় এবং যাবতীয় ত্রুটি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেয় নিজেদের।

দ্বিতীয়ত এই বিজয়ের পেছনে আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার কথা আলোকপাত করেছেন, মুসলিমরা যেন নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চিত না হয় এবং তাদের অন্তরে অহমিকা ও দম্ভ ডানা মেলতে না পারে, তাই এসবের উল্লেখ করেছেন। মুসলিমদের শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা আল্লাহনির্ভর হয়, তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর রাসুলের কথা মেনে চলে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রক্তক্ষয়ী ভয়ংকর যুদ্ধে কেন অংশগ্রহণ করলেন, এর পেছনের মহৎ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলো বর্ণনা করেছেন তৃতীয় পর্যায়ে। এই পর্যায়ে যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের অপরিহার্য কিছু বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের কথাও ব্যক্ত করেছেন তাদের সামনে।

এরপর মুশরিক, মুনাফিক, ইহুদি এবং যুদ্ধবন্দিদের সম্বোধন করে তাদেরকে চমৎকার উপদেশ দিয়েছেন এবং সত্যের প্রতি সমর্পণ ও তা আঁকড়ে ধরতে জোর নির্দেশ দিয়েছেন।

তারপর মুসলিমদের লক্ষ্য করে গনিমত বিষয়ে কথা বলেছেন এবং কিছু নিয়মনীতি ও ধারা প্রণয়ন করে দিয়েছেন।

ইসলামি বিপ্লব বর্তমান স্তরে পৌঁছার পর প্রয়োজনীয় সমর ও শান্তির আইন তৈরি করে দিয়েছেন, যেন মুসলিমদের যুদ্ধ এবং অমুসলিম জাহিলদের যুদ্ধের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় হয়, নীতি-নৈতিকতা, মানবিকতা ও আদর্শে যেন মুসলিমরা তাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হয় এবং দুনিয়ার সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কেবল একটি দর্শনের নাম নয়; বরং সে তার স্বীয় মূলনীতি ও আইন-কানুনের অনুসারীদের বাস্তবিকভাবেও সভ্য করে গড়ে তুলে।

তারপর ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য আইনের কিছু ধারা তৈরি করে দিয়েছেন। সেখানে নিশ্চিত করেছেন ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানাভুক্ত মুসলিম এবং সীমানাবহির্ভূত মুসলিমদের পার্থক্য-বিধান।

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রামাদানে সিয়াম ফরজ হয়, ফিতরার পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং অন্যান্য সম্পদের যাকাতও আইনভুক্ত হয়। সম্পদের যাকাত ফরজ করার একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল এই—বহুসংখ্যক মুহাজির সাহাবি ছিলেন গরিব, দুনিয়ায় চলার মতো কোনো সম্বল তাদের ছিল না। তাদের এই বিপন্ন অবস্থাকে একটু সহজ করা।

চমৎকার ব্যাপার হলো, মুসলিমরা বদর যুদ্ধের এই স্মরণীয় বিজয় অর্জনের পরপরই দ্বিতীয় হিজরিতে সর্বপ্রথম ঈদ উদযাপন করেন। কত সুখকর ছিল সেই শুভ ঈদ, যা আল্লাহ তাদের দান করেছিলেন বিজয় এবং সম্মানের মুকুট পরানোর পর। ওই সালাতের দৃশ্য কত হৃদয়গ্রাহী ছিল, যখন মুসলিমরা তাদের ঘর থেকে বের হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ধ্বনি দিয়ে। তাদের অন্তর ছিল আল্লাহর ভালোবাসায় তরঙ্গায়িত, তাঁর দেওয়া বিজয়ে ও অন্যান্য নিয়ামতে সন্তুষ্ট এবং তাঁর রহমতের প্রতি সদা আকৃষ্ট। এমন বিগলিত হৃদয় নিয়ে যখন মুসলিমরা সালাত আদায় করেছিল, তখন কত উৎসবমুখর ছিল সেই সালাত! মুসলিমদের সেই দিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

স্মরণ করুন, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প, জমিনে বিপন্ন; মানুষ তোমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে এই আশঙ্কায় শঙ্কিত, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদের দান করেছেন হালাল অনেক নিয়ামত; যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।[১]

শত্রুদের বুকে যখন প্রতিশোধের আগুন

বদর যুদ্ধ ছিল মুসলিম এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কুফর এবং ঈমানের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যায়। পুরো আরবের ওপর এর দারুণ প্রভাব পড়ে। মক্কার মুশরিকদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শুধু তা-ই

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ২৬

নয়, মক্কার বাইরের যেসকল ইহুদি মুসলিমদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধিকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করত, তারাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরোক্ষভাবে। তাই এই যুদ্ধের পরে ইহুদি ও মুশরিকদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন আগের চেয়েও বেশি মাত্রায় জ্বলতে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

আপনি অবশ্যই লক্ষ করবেন, লোকদের মধ্যে ইহুদি ও মুশরিকরাই মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় সবচেয়ে কঠোর এবং আপনি এটাও উপলব্ধি করতে পারবেন, (তাদের মধ্যে) যারা নিজেদের খ্রিষ্টান বলে দাবি করে, তারা বন্ধুত্বে মুমিনদের সবচেয়ে কাছের। এর কারণ হলো, তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক আলিম ও সংসার-ত্যাগী সাধক। তাছাড়া তারা অহংকারও করে না।[১]

এই দুই দল থেকেই কিছু গুপ্তচর তথ্যপাচার ও গোলযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সঙ্গীরা ছিল এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তবে এদের মুসলিম বিদ্বেষ প্রথম দুই শ্রেণির তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল। এই তিন শ্রেণির বাইরে আরও একটি দল মুসলিমদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল, তারা হলো মদিনার আশপাশের বেদুইন সম্প্রদায়—তাদের কাছে ধর্ম-অধর্ম ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এদের মূল ভাবনার বিষয় ছিল, মুসলিমদের এই যুদ্ধ-জয়ের কারণে হয়তো তাদের ডাকাতি ও রাহাজানির সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসবে। এই আশঙ্কা থেকেই তারা মদিনার মুসলিমদের শত্রু গণ্য করতে শুরু করে।

বদর যুদ্ধের পর মুসলিমরা বিভিন্ন দিক থেকে আশঙ্কা ও বিপদের সম্মুখীন হতে থাকে। উল্লেখিত ৪টি দল মুসলিমদের বিরোধিতায় ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। যে পথে সহজে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারবে, সেই পথ ধরে এগুতে থাকে তারা। মদিনার ভেতরে মুনাফিকরা ইসলামের লেবাস পরে চক্রান্তের জাল বুনতে শুরু করে। অন্যদিকে ইহুদিদের যে গোষ্ঠীর সঙ্গে মদিনা সনদে পারস্পরিক শান্তির সন্ধি করা হয়েছিল, তারা সনদের ধারাগুলো এক এক করে ভাঙতে শুরু করে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলিম-বিরোধিতায় নেমে পড়ে।

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৮২

ওদিকে মক্কার মুশরিকরাও বসে নেই। যুদ্ধে হেরে গিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আবারও এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে নিজেদের ভেতর। তাদের সামর্থ্য থাকলে এখনই বুঝি তারা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালানো শুরু করে দেয়। তাদের এই প্রতিশোধস্পৃহা থেকেই উহুদ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে, যে যুদ্ধে মুসলিমদের সুনাম ও প্রভাব অনেকটাই নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

তবে মুসলিমরা এই বিপদগুলো দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাটিয়ে ওঠে। নবিজির সুদক্ষ নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী পদক্ষেপে তারা শত্রুদের চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। আল্লাহ সতর্ক করার সঙ্গে সঙ্গে নবিজি তাদের অবস্থা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা হাতে নেন। আমরা সংক্ষেপে সামনে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

বনু সুলাইমের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোয়েন্দা মারফত জানতে পারেন—গাতফানের শাখাগোত্র বনি সুলাইম মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নবিজি তাদের দমনের জন্য কালবিলম্ব না করে ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে তাদেরই এলাকায় গিয়ে উপস্থিত হন। কুদর নামক স্থানে সরাসরি তাদের বসতিতে হানা দেন। সংবাদ পেয়ে তারা আগেই নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। উপত্যকায় প্রায় ৫০০ উট ফেলে যায় তারা। বিনা যুদ্ধে সেগুলো মুসলিমদের হাতে চলে আসে। নবিজি এক-পঞ্চমাংশ রেখে বাকি উট যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। প্রত্যেকে দুটি করে উট পায়। এর বাইরে মুসলিমরা ইয়াসার নামে একটি ক্রীতদাসও লাভ করে এই অভিযানে। পরে নবিজি তাকে আজাদ করে দেন।

এরপর নবিজি ৩ দিন কুদরে বনি সুলাইমের এলাকায় অপেক্ষা করে মদিনার পথে যাত্রা করেন। এই অভিযানটি দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধের ৭ দিন পর অনুষ্ঠিত হয়। অনুপস্থিতির এই সময়টায় নবিজি সিবাআ ইবনু উরফুতা অথবা আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমের ওপর সাময়িকভাবে মদিনার দায়িত্বভার অর্পণ করেন।[১]

নবিজিকে হত্যার চেষ্টা, অবশেষে ইসলামগ্রহণ

বদরের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে মুশরিকেরা ভেঙে পড়ে। তারা কোনোভাবেই এই পরাজয় মেনে নিতে পারছিল না। তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। হাজরে আসওয়াদের সামনে দুই মুশরিক যোদ্ধা ভীষণ চিন্তিত—কীভাবে এই

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৪; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৩৬

পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাদের মাথায় কেবল একটি বিষয়ই ঘুরপাক খাচ্ছে—এই অবস্থা থেকে সহজে উত্তরণের উপায় হচ্ছে মুহাম্মাদকে হত্যা করা।

যুদ্ধের কয়েক দিন পরের ঘটনা। উমাইর ইবনু ওয়াহাব আল-জুমাহি এবং সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া বসে আছে হাজরে আসওয়াদের পাশে। তাদের চেহারায় বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি এখনো স্পষ্ট। মক্কায় মুসলিমদের জীবনযাপন এই উমাইরের কারণে ছিল ভীষণ দুর্বিষহ। সে আল্লাহর রাসুল ও তার সাহাবিদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাত। বদর যুদ্ধে তার ছেলে ওয়াহাব ইবনু উমাইর মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে কয়েকদিন হলেও বদরের কূপে পড়ে থাকা লাশ এবং আহতদের স্মৃতি এখনো তাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সাফওয়ান উমাইরকে বলে, 'ওদের বিয়োগের পর আমার জীবনটা বিস্বাদে ভরে গেছে।'

উমাইর তার কথা শুনে বলে, 'একদম সত্য কথা বলেছ। আল্লাহর কসম, আমার ঘাড়ে যদি ঋণের বোঝা না থাকত, আমার অবর্তমানে আমার পরিবার যদি অসুবিধায় না পড়ত, তাহলে এক্ষুনি আমি মদিনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম। আমার ছেলে তাদের হাতে বন্দি—এই অজুহাতে তাদের কাছে সহজেই যেতে পারতাম।'

সাফওয়ান এই সুযোগটি কাজে লাগায়[১], তাকে মদিনায় যাওয়ার জন্য এই বলে প্ররোচিত করে—'তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। আমি তোমার পরিবারের দায়িত্বও গ্রহণ করলাম। যতদিন তারা বেঁচে থাকবে, আমি তাদের দেখভাল করব। তুমি কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না।'

উমাইর বলে, 'এ কথা তোমার-আমার মাঝেই থাকল, কেউ যেন না জানে।'

সাফওয়ান বলে, 'ঠিক আছে।'

উমাইর নিজের তলোয়ারটি ভালো করে ধার করে নেয়। ঘোড়া হাঁকিয়ে তখনই রওনা হয়ে যায় মদিনার উদ্দেশে। মসজিদের সামনে এসে যখন ঘোড়া থেকে সে নামে, তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু দূরে সাহাবিদের সঙ্গে বদরে আল্লাহ তাআলার অবিশ্বাস্য সাহায্যের গল্প করছিলেন। তাকে দেখেই উমার বলে ওঠেন, 'আল্লাহর দুশমন এই কুকুরটা নিশ্চয় কোনো কুমতলবেই এখানে এসেছে।' উমার সঙ্গে সঙ্গে নবিজিকে তার আগমনের কথা জানিয়ে দেন। নবিজি তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দেন। উমার তলোয়ার নিয়ে তার সাথে সাথে আসেন। আনসার সাহাবিদের তিনি নবিজিকে ঘিরে

---

[১] পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে উমাইরের ঋণ ও পরিবারের দায়িত্ব সাফওয়ান নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল। কারণ তার পিতা উমাইয়া ইবনু খালফ বদর যুদ্ধে তারই একসময়কার ক্রীতদাস বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে নিহত হয়। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৯; শারিকাতুত তিবাআ আল-ফান্নিইয়াতিল মুত্তাহিদা]

বসার নির্দেশ দেন এবং সতর্ক থাকতে বলেন, যাতে সে কোনো ধরনের আক্রমণ করার সুযোগ না পায়।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে নবিজির মজলিসে উপস্থিত হন। উমাইরের গলায় ঝোলানো তরবারি তিনি কষে ধরে আছেন। নবিজি এটা দেখে বলেন, 'উমার, ওকে ছেড়ে দাও। উমাইর, তুমি আমার কাছে এসে বসো।' নবিজিকে দেখে সে মুশরিকদের নীতিতে অভিবাদন জানায়, 'শুভ সকাল!' নবিজি তখন মন্তব্য করেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের এর চেয়েও সুন্দর অভিবাদনরীতি শিখিয়েছেন। সেটা জান্নাতের অভিবাদন।' তারপর জানতে চান, 'তা কী মনে করে এখানে আসা?' উমাইর উত্তর দেয়, 'এলাম, আপনাদের হাতে আমার ছেলেটা বন্দি হয়ে আছে। ওর সঙ্গে দয়া করে একটু ভালো ব্যবহার করবেন।' নবিজি ফের জিজ্ঞেস করেন, 'তা নাহয় বুঝলাম কিন্তু গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে এসেছ কেন?' উমাইর বলে, 'এই তলোয়ারের কি দুই পয়সার দাম আছে? যুদ্ধে তো এটা আমাদের কোনো কাজেই আসেনি।'

নবিজি এবার জোর গলায় বলেন, 'সত্যি করে বলো উমাইর, তুমি এখানে কেন এসেছ?' সে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে একই কথা বারবার বলতে থাকে। নবিজি তখন উমাইরের চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিয়ে বলেন, 'তুমি আর সাফওয়ান হাজরে আসওয়াদের সামনে বসে বদরের নিহত নেতাদের স্মৃতিচারণ করছিলে। তারপর তুমি ওকে বলেছ, যদি আমার কাঁধে ঋণের বোঝা আর পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব না থাকত, তাহলে আমি এখনই মদিনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম। এ কথা শুনে সাফওয়ান তোমার ঋণ পরিশোধ এবং পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে—যেন তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো। আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছেন।'

উমাইর তো হতবাক! সে নবিজির সামনে কালিমা পাঠ করতে শুরু করে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল। আমরা একসময় আপনাকে মিথ্যুক মনে করতাম, আপনি আসমানের খবর আমাদের শোনাতেন বলে। আজ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আপনাকে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা যখন এই আলাপ করি, তখন আমাদের আশপাশে কেউই ছিল না। এই আলোচনা আর কারও পক্ষে জানার কথা না।'

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পেরে সে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে। বারবার শাহাদাত পাঠ করতে থাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের নির্দেশ দেন, তাকে দ্বীনের মৌলিক বিধিনিষেধ এবং কুরআনের পাঠ শিখিয়ে দিতে। আর তার ছেলেকেও মুক্ত করে দিতে বলেন।

এদিকে সাফওয়ান মহাখুশি। সে সবার কাছে প্রচার করতে থাকে, 'সামনে সুসংবাদ আসছে। এমন সুসংবাদ শোনার পর বদরের পরাজয়ের কথা তোমরা ভুলে যাবে।'

মদিনা থেকে মক্কায় আসা প্রতিটি যাত্রীকে সে উমাইরের কথা জিজ্ঞেস করত। একদিন এক ব্যক্তি তাকে জানায়, উমাইর তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে সাফওয়ান মারাত্মক আঘাত পায়। সে কসম করে, জীবনে সে আর কখনো উমাইরের সঙ্গে কথা বলবে না এবং তাকে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতাও করবে না। উমাইর মক্কায় ফিরে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করে। তার হাতে অগণিত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।'[১]

বনু কাইনুকার যুদ্ধ

এর আগে আমরা ইহুদিদের সঙ্গে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই চুক্তিতে যতগুলো ধারা ছিল, মুসলিমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত, সামান্যও হেরফের করত না তারা। কিন্তু ইহুদিরা তাদের পুরোনো স্বভাব থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাদের ইতিহাসজুড়ে আছে বিশ্বাসঘাতকতা, চুক্তিভঙ্গ, শঠতা ও বেইমানি। তাদের পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তারা শান্তিচুক্তির পরও একের পর এক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা বাধিয়েই রাখত। সেসবের সামান্য কিছু আমরা এখানে তুলে ধরছি—

ইবনু ইসহাক বলেন, শাস ইবনু কাইস নামে এক বৃদ্ধ ইহুদি ছিল। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই লোকটি মুসলিমদের প্রচণ্ড ঘৃণা করত। সাহাবিদের দেখলে তার পিত্ত জ্বলে উঠত হিংসায়।

একবার কোথাও যাওয়ার পথে সে দেখতে পায়, আউস ও খাযরাজের লোকজন একটা মজলিসে বসে আছে। সুখ-দুঃখের কথা বলছে। তাদের বেশ হাসিখুশি ও প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে। এই চিত্র ইহুদি বুড়োটাকে বেশ ভাবিয়ে তোলে। ইসলামগ্রহণের পর এই দুটো গোত্র আবার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সেটা সে মেনে নিতে পারে না। একসময় এদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ লেগে থাকত, আর ইহুদিরা এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফায়দা লুটত এবং এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত। সেদিন কি আর আসবে না! সে দেরি না করে এক যুবককে তাদের কাছে পাঠায়। পাঠানোর আগে তাকে বলে দেয়, সে যেন তাদের মজলিসে গিয়ে বসে। এরপর বুআস যুদ্ধের কথা তাদের মনে করিয়ে দেয়। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত যে কবিতাগুলো পাঠ করে তারা একসময় একে অপরকে ঘায়েল করত, সেগুলো যেন সে তাদের আবৃত্তি করে শোনায়। যুবকটি গিয়ে বুড়োর কথামতো কাজ করে। সেই পুরোনো দিনের কবিতাগুলো শুনে জাহিলি যুগের বিদ্বেষ ও যুদ্ধের কথা তাদের মনে পড়ে যায়। কবিতায় কবিতায় যুদ্ধ, নিজের গোত্রের গর্বভরা বীরত্বের ইতিহাস একজন আরেকজনকে উচ্চকণ্ঠে শোনাতে থাকে। সেখান থেকে শুরু হয় বাগ্‌বিতণ্ডা। এরপর বিবাদে রূপ নেয় সেই মজলিস। অল্প সময়ের মধ্যেই সংঘর্ষ

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৬১-৬৬৩

বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। দুই গোত্র হাররা নামক স্থানে চলে যায় বুআস যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

নবিজির কাছে এই খবর পৌঁছামাত্র তিনি মুহাজির সাহাবিদের নিয়ে হাররায় উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তাদের শান্ত করেন এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'শোনো মুসলিম সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় করো। আবার সেই জাহিলি চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তোমাদের মধ্যে! অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যেই অবস্থান করছি। আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলাম ধর্মের জন্য কবুল করে সম্মানিত করেছেন। তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের চিন্তা-চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করেছেন এবং তোমাদেরকে মুক্ত করেছেন কুফর ও শিরকের মতো চিন্তা থেকে। তবুও তোমরা সেই আগের মূর্খতার দিকে ধাবিত হচ্ছ?'

নবিজির বক্তব্য শুনে তাদের হুঁশ ফিরে আসে। প্রত্যেকে বুঝতে পারে, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা এক বিরাট অন্যায় করে ফেলেছে। আউস এবং খাযরাজ একে অপরকে বুকে টেনে নেয়, আর অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করে। আবার ভাই-ভাই হয়ে কাঁধে হাত রেখে নবিজির পেছনে হাঁটতে হাঁটতে মদিনায় ফিরে যায়। এভাবে আল্লাহ তাআলা শাস ইবনু কাইসের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দেন।[১]

ইহুদিরা মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য সর্বদা কোনো না-কোনোভাবে চেষ্টা-তৎপরতা চালাতেই থাকত। ইসলামি দাওয়াতের পথে তারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখত। তারা এজন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করত। ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে মিথ্যাচার করত। সকালে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে, সন্ধ্যায় ধর্মত্যাগ করে আবার ইহুদি হয়ে যেত। দুর্বল মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এই কৌশলটি অবলম্বন করত। যদি কোনো ইহুদির সঙ্গে কোনো দরিদ্র মুসলিমের আর্থিক সম্পর্ক থাকত, তাকে অর্থসংকটে ফেলত। ইহুদিরা যদি কাউকে ঋণ দিত, সেই ঋণের অর্থ তোলার জন্য তারা সকাল-সন্ধ্যা দরিদ্র মুসলিমদের জ্বালাতন করত। আর যদি কোনো মুসলিম তাদেরকে ঋণ দিত, সেই অর্থ আর তারা ফেরত দিত না তাকে। গড়িমসি করত শুধু। তাকে এই বলে দিনের পর দিন ঘোরাত যে, 'আমি যখন তোমার কাছ থেকে ঋণ নিই, তখন তুমি তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম পালন করতে। এখন আর তুমি আগের ধর্মে নেই, এই জন্য তুমি আর সেই টাকা পাবে না।'[২]

তারা বদরের আগ থেকেই মুসলিমদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে আসছিল। নবিজি এবং সাহাবিরা সবকিছু দেখার পরেও শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য ধৈর্যধারণ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৬; শারিকাতুত তিবাআ আল-ফান্নিইয়াতিল মুত্তাহিদা।

[২] তাফসিরবিদগণ সুরা আলি-ইমরানের বিভিন্ন স্থানে তাদের আরও নানারকম ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরেছেন।

করছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন—হয়তো তাদের মধ্যে পরিবর্তন আসবে; ভালো হয়ে যাবে তারা। কিন্তু ভালো হওয়া তাদের কপালে ছিল না।

বনু কাইনুকার বিশ্বাসঘাতকতা

বদর যুদ্ধে মুসলিম সেনারা অকল্পনীয়ভাবে বিজয় লাভ করেছে। এ কারণে কাছে-দূরের আরব গোত্রগুলো তাদের সমীহের চোখে দেখতে শুরু করে। আর এসব দেখে ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে যায় এবং প্রকাশ্যেই মুসলিমদের সাথে শত্রুতা ও দুশমনি শুরু করে দেয়। এতদিন যা ছিল গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে, তা এখন দিনে-দুপুরেই করতে থাকে। সবচেয়ে বেশি দুশমনি ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ দেখায় কাব ইবনু আশরাফ এবং বনু কাইনুকা[১]। তাদের বসবাস তখন মদিনার প্রাণকেন্দ্রে। পেশাগতভাবে তারা ছিল কামার। লোহা-পিতলের থালাবাসান এবং তৈজসপত্র বানাত। পেশার বদৌলতে তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের মজুদ ছিল। তাছাড়া তাদের মধ্যে যোদ্ধার সংখ্যা ৭ শতাধিক। মদিনার ইহুদিদের মধ্যে তারা সবচেয়ে সাহসী গোত্র হিসেবে পরিচিত। তারাই সবার আগে চুক্তি ভঙ্গ করে।

বদর যুদ্ধের পর তাদের বিরোধিতা আরও বেড়ে যায়। তারা জায়গায় জায়গায় দ্বন্দ্ব-হাঙ্গামা-বিরোধ বাধাতে শুরু করে। তাদের এলাকা বা বাজার দিয়ে কোনো মুসলিম গেলেই তাকে হেনস্তা করতে শুরু করে। এমনকি তাদের হাত থেকে মুসলিম নারীরাও রেহাই পেত না।

তাদের বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা দিনদিন বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, নবিজি একদিন তাদের একত্র করে নসিহত করেন। তাদের আরও সুযোগ দেন এবং সতর্ক করেন—এই অবাধ্যতা এবং বিরুদ্ধাচরণের ফলাফল প্রচণ্ড ভয়াবহ হবে। কিন্তু এতেও কোনো কাজ হয়নি, তারা আগের মতোই অশান্তি এবং নৈরাজ্য চালিয়ে যেতে থাকে।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর নবিজি মদিনায় এসে ইহুদিদেরকে বনু কাইনুকার বাজারে একত্র করে বলেন, 'শোনো ইহুদি সম্প্রদায়, কুরাইশের যে অবস্থা হয়েছে, তোমাদের জন্য একই অবস্থা অপেক্ষা করছে, তাই সময় থাকতে তোমরা আত্মসমর্পণ করে নাও।' নবিজির এই উন্মুক্ত আহ্বান তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। তারা উত্তরে জানায়, 'মুহাম্মাদ, কুরাইশের কিছু চুনোপুঁটিকে হত্যা করে নিজেকে বিশাল কিছু ভেবো না। কুরাইশরা তো জানেই না যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়। আমাদের মুখোমুখি হলে বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল!' মহান

---

[১] ইহুদি গোত্রের অন্যতম একটি গোত্র। নবিজির হিজরতের সময় তারা মদিনায় বসবাস করত। মুসলিম এবং তাদের মাঝে শান্তিচুক্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে তাদেরকে মদিনার সীমানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আল্লাহ তাদের এমন উদ্ধত কথার উত্তরে আয়াত নাযিল করেন[১]—

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

যারা কুফরি করে, তাদের বলে দিন, শীঘ্রই তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে দলে দলে; আর জাহান্নাম খুবই নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (বদর যুদ্ধে) দুটি দলের পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। একটি দল যুদ্ধ করছিল আল্লাহর পথে; আরেকটি দল ছিল কাফির। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা প্রথম দলটিকে দেখছিল নিজেদের দ্বিগুণ। আল্লাহ যাকে চান, নিজের সাহায্য দ্বারা শক্তি জোগান। নিশ্চয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষার উপকরণ।[২]

বনু কাইনুকা ইঙ্গিতে সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণাই প্রদান করে। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ সংবরণ করে নেন এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে তারা দিনদিন বাড়তেই থাকে।

আবু আউন থেকে ইবনু হিশাম বর্ণনা করেন, এক আরব নারী দুধ বিক্রি করে এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে যান। দোকানের আশপাশের ইহুদিরা তাকে মুখ থেকে কাপড় সরানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু তিনি মুখ থেকে কাপড় সরান না। এক ফাঁকে স্বর্ণকার তার কাপড়ের আঁচল তার পিঠের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধে দেয়, তিনি টেরই পান না। কাজ শেষে যখন তিনি উঠতে যাবেন, অমনি কাপড়ে টান লেগে তিনি বিবস্ত্র হয়ে যান। দুর্বৃত্তরা তখন তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে। সেই নারী সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন। এক মুসলিম গিয়ে স্বর্ণকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়। ইহুদিরাও তখন তাকে হত্যা করে ফেলে। ঘটনা দেখে আশপাশের মুসলিমরা অন্যান্য মুসলিমকে ডাক দেয়। তখনই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়।[৩]

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন

এসব দেখে নবিজির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি মদিনার দায়িত্ব দিয়ে দেন আবু লুবাবা

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০০১; হাদিসটির সনদ দুর্বল; *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৫২

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১২-১৩

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৮

ইবনু আব্দিল মুনজিরের হাতে। এরপর হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের হাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা দিয়ে বের হয়ে পড়েন বনু কাইনুকার উদ্দেশে। বনু কাইনুকার লোকজন নবিজিকে দেখেই তাদের কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। নবিজি তখন তাদের ওপর কঠোর অবরোধ আরোপ করেন। দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে শনিবার এই অবরোধ কার্যক্রম শুরু হয়। জিলকদ মাস পর্যন্ত ১৫ দিন অবরোধ চলমান থাকে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে লাঞ্ছিত এবং অপদস্থ করতে চান, তখন তাদের মনে এক ধরনের ভীতি সৃষ্টি করে দেন। বনু কাইনুকার অন্তরেও তিনি সেই ভয় ঢেলে দেন। তারা নিজেদের জীবন, সম্পদ, নারী ও শিশুদের ব্যাপারে নবিজির আদেশ মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। নবিজি তাদের সবাইকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার কপট আচরণ শুরু করে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য নবিজিকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। সে বলে, ‘মুহাম্মাদ, আপনি আমার মিত্রদের সাথে উত্তম ব্যবহার করুন।’ উল্লেখ্য, বনু কাইনুকা খাযরাজ গোত্রের মিত্র ছিল। নবিজি তার কথায় কান দেননি। ইবনু উবাই বারবার তার কথা অনবরত বলতেই থাকে। নবিজি প্রতিবারই তাকে এড়িয়ে যান। তখন সে নবিজির বর্মের আস্তিনে নিজ হাত ঢুকিয়ে দেয়। নবিজি তাকে বলেন, ‘আমাকে ছেড়ে দাও।’ নবিজি তখন এত রাগান্বিত হন যে, তার চেহারা রক্তিম হয়ে ওঠে। তিনি নিজেকে সামলে রাগ নিবারণ করে পুনরায় বলেন, ‘তোমার জন্য আফসোস, আমাকে ছাড়ো বলছি।’ কিন্তু মুনাফিক তার পীড়াপীড়িতে অবিচল থাকে। সে বলে, ‘আল্লাহর কসম, আপনি আমার মিত্রদের ছেড়ে দেওয়ার আগপর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ব না। ৪০০ জন বর্মবিহীন এবং ৩০০ জন বর্মধারী লোক আমাকে সুখে-দুঃখে সঙ্গ দিয়েছে, আর আপনি একদিনেই তাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলতে চাইছেন? আল্লাহর কসম, আমি কালের আবর্তনকে ভয় করি।’

এই বর্ণচোরা মুনাফিকের ইসলাম গ্রহণ করার মেয়াদ তখন ১ মাসও হয়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য নমনীয় আচরণ করেন। তাদের ছেড়ে দেন। তবে একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, ‘তারা মদিনা বা তার আশেপাশে থাকতে পারবে না। দূরে কোথাও চলে যাবে।’ এই নির্দেশ মেনে তারা শামের দিকে চলে যায়। ঘটনাক্রমে সেখানে পৌঁছার কদিন বাদেই তাদের প্রায় সবাই মরে সাফ হয়ে যায়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। ৩টি কামান, ২টি বর্ম, ৩টি তরবারি, ৩টি বর্শা উদ্ধার করেন। গনিমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আলাদা করেন। এ যাত্রায় গনিমত জমা করার দায়িত্ব পালন করেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু।[1]

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭১, ৯১; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭-৪৯

সাওয়িকের যুদ্ধ

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইহুদি সম্প্রদায় এবং মুনাফিকরা তাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা সাজাতে ব্যস্ত। এদিকে আবু সুফিয়ান কম খরচে অধিক লাভের একটি দুরভিসন্ধির চিন্তা করতে থাকে। নিজ গোত্রের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তাকে দ্রুতই তা করতে হবে। অন্যদিকে সে শপথ করে নিয়েছিল, 'মুহাম্মাদের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না।' তাই তার সামর্থ্য অনুযায়ী ২০০ অশ্বারোহী নিয়ে তার শপথ রক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ে। মদিনা থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরে কানাত উপত্যকার 'নাইব' নামক স্থানে একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু বিন্যস্ত করে সে। কিন্তু সরাসরি মদিনায় আক্রমণ করার দুঃসাহস হয় না তার। তাই লুণ্ঠনে নেমে পড়ে।

আবু সুফিয়ান রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে মদিনার উপকূলে হুয়াই ইবনু আখতাবের বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নাড়ে। হুয়াই তার অসৎ উদ্দেশ্য টের পেয়ে দরজা খুলবে না বলে জানিয়ে দেয়। হতাশ হয়ে আবু সুফিয়ান বনু নাজিরের সর্দার সাল্লাম ইবনু মিশকামের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সাল্লাম ছিল বনু নাজিরের তৎকালীন কোষাধ্যক্ষ। সে আবু সুফিয়ানের জন্য দরজা খুলে দেয়, মেহমানদারি করে, মদ পান করায়। আবু সুফিয়ান তার থেকেই মদিনার মানুষের গোপন খবরাদি জেনে নেয়। এরপর রাতের আঁধার থাকতে থাকতে ফিরে যায় বাহিনীর কাছে।

তারপর মদিনার এক পার্শ্বে আরিজ নামক একটি মহল্লায় আক্রমণ করার জন্য একটি দল পাঠিয়ে দেয় সে। আগত বাহিনী লুণ্ঠন শেষে খেজুরগাছ দিয়ে তৈরি কিছু প্রাচীর জ্বালিয়ে দেয়। পাশাপাশি একটি চাষভূমিতে এক আনসারি ও তার মিত্রকে পেয়ে উভয়কে সেখানেই হত্যা করে ফেলে। এ সমস্ত কাজ শেষ করে আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়।

নবিজির কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাৎক্ষণিক আবু সুফিয়ান ও তার দলকে তাড়া করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ততক্ষণে তারা চলে গেছে অনেক দূর। অবশ্য নিজেদের ভার কমানোর জন্য তারা রাস্তায় তাদের রসদসামগ্রী থেকে প্রচুর ছাতু ফেলে দেয়। এরপর সহজেই পালিয়ে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কারকারাতুল কাদার' পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখেন, তারপর ফিরে আসেন মদিনায়। মুসলিমরা কাফিরদের ফেলে যাওয়া ছাতু সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। ছাতুর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তারা এই অভিযানের নামকরণ করেন 'গাযওয়া সাওয়িক' তথা ছাতুর যুদ্ধ। বদর যুদ্ধের দুই মাস পর দ্বিতীয় হিজরির জিলহজ মাসে উক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও নবিজি মদিনার দায়িত্ব দিয়ে যান আবু লুবাবা ইবনু আব্দিল মুনজির রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।[১]

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০-৯১; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪-৪৫

যু-আমরের যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধের আগে নবিজির নেতৃত্বে এটিই সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। তৃতীয় হিজরির মুহাররম মাসে তা সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

মদিনার গোয়েন্দা বাহিনী নবিজির কাছে এই তথ্য পাঠায়—বনু সালাবা ও মুহারিব মদিনার বিভিন্ন মহল্লায় আক্রমণ করার লক্ষ্যে সমবেত হয়েছে। নবিজি সাথে সাথে মুসলিমদের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন। ৪৫০ জন পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনার সমন্বয়ে একটি বাহিনী রওনা হয়। এবারে মদিনার দায়িত্বে ছিলেন উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু।

পথিমধ্যে বনু সালাবার জাব্বার নামের এক লোক মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। তাকে নবিজির কাছে আনা হয়। ইসলামের দাওয়াত দিলে সে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তখন নবিজি তাকে বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে জুড়ে দেন। সে শত্রুভূমির দিকে মুসলিম বাহিনীর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদিকে নবিজি তাদের সমবেত হওয়ার স্থানে হাজির হন। সেখানে যু-আমর নামে একটি কূপ ছিল। সেদিকে লক্ষ রেখেই এই যুদ্ধের নামকরণ করা হয় যু-আমরের যুদ্ধ। বেদুইনদের অন্তরে মুসলিমদের শক্তির অনুভূতি ঢুকিয়ে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নবিজি তৃতীয় হিজরির সফর মাস প্রায় পুরোটাই সেখানে অবস্থান করেন। তারপর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

ইসলামের শত্রু কাব ইবনু আশরাফকে হত্যা

ইহুদিদের মধ্যে যারা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা পোষণ করত, তাদের মধ্যে কাব ইবনু আশরাফ অন্যতম। সে প্রকাশ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিত। তাঈ গোত্রের মানুষ সে। আর তার মা ছিল বনু নাজির গোত্রের। ধনসম্পদ ও অর্থবিত্তের কোনো অভাব নেই তার। কবি হিসেবেও তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল আরবে। তার দুর্গের অবস্থান বনু নাজির অঞ্চলের শেষের দিকে, মদিনার পশ্চিম-দক্ষিণে।

বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় এবং মুশরিকদের পরাজয়ের সংবাদ শোনার পর কাব বিশ্বাসই করতে পারছিল না—মুশরিকরা এই যুদ্ধে হেরে গেছে। তাই সে বলতে শুরু করে, 'আরবের এই শ্রেষ্ঠ গোত্রের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো যদি হেরে যায় মুহাম্মাদের হাতে,

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১

তাহলে এই জীবনে বেঁচে থেকে লাভ কী?' খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হলে সে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এরপর থেকে সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে। অপরদিকে মুশরিকদের জন্য গাইতে থাকে স্তুতি। কিন্তু এসবেও তার মন ভরে না। সে এবার সোজা মক্কায় চলে যায়, আল-মুত্তালিব ইবনু আবি ওয়াদাআ আস-সাহমির বাড়িতে গিয়ে ওঠে। সে একের পর এক কবিতা পাঠ করে যায় এবং এই যুদ্ধে মুশরিকদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তাদের নিয়ে শোককাব্য আবৃত্তি করতে থাকে। নবিজির বিরুদ্ধে তার যত বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ছিল, তার সবটুকু সে উগড়ে দেয় তার কবিতার পঙ্‌ক্তিতে। এভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উসকে দেয় তাদের।

মক্কায় অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান তাকে প্রশ্ন করে, 'বলো তো, আমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ নাকি মুহাম্মাদের ধর্ম?' সে উত্তর দেয়, 'তোমাদের ধর্ম ওর ধর্ম থেকে হাজার গুণে উত্তম।' আল্লাহ তাআলা তখন এই আয়াতগুলো নাযিল করেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

যাদেরকে কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল, আপনি কি দেখেননি, তারা (কীভাবে) মূর্তি ও দেবতায় বিশ্বাস করে এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলে, মুমিনদের চেয়ে এরাই আছে অধিকতর সরল পথে?[১]

মদিনায় ফেরার পর তার ব্যঙ্গাত্মক ছড়া-কবিতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এমনকি সে সাহাবিদের স্ত্রীদের নিয়েও অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কবিতা লিখতে শুরু করে। ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙে যায়, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের বলেন, 'কেউ কি আছো, যে তাকে থামাবে? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিচ্ছে।' তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, আব্বাদ ইবনু বিশর, আবু নাইলা (তার প্রকৃত নাম সালাকান ইবনু সালাম। তিনি কাব ইবনু আশরাফের দুধভাই), হারিস ইবনু আউস এবং আবু আবস ইবনু হাবর দায়িত্ব নেন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য। এই দলের প্রধান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, নবিজি যখন কাবের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বলে ওঠেন, 'আমি কি ওকে শেষ করে দেব?' নবিজি তাকে অনুমতি দিলে তিনি কাবকে হত্যার পরিকল্পনা তুলে ধরেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা ওর কাছে আপনার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাই। এতে ও আমাদের আপন

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৫১

ভাবতে শুরু করবে। আর তখন ওকে হত্যা করাটাও খুব সহজ হয়ে যাবে।'

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা কাবের কাছে গিয়ে বলতে শুরু করেন, 'এই লোকটা যে কী শুরু করল! এখন আবার সাদাকা চাওয়া শুরু করেছে। আমাদের বেশ ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।'

উত্তরে কাব বলে ওঠে, 'তোমাদের কপালে আরও বিপদ আছে।'

'কিন্তু আমরা তো তাকে এখন মেনে নিয়েছি। তাই তার কথা মেনে নিতে আমরা সবাই বাধ্য। এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায়ও নেই। যাক সেসব কথা, তুমি কি আমাদেরকে ১/২ ওসাক[১] শস্য ধার দিতে পারবে?'

'তা দিতে পারব। কিন্তু এর জন্য আমার কাছে তোমাদের কিছু বন্ধক রাখতে হবে।'

'কী বন্ধক রাখব, বলো।'

'কেন, তোমাদের নারীদেরকে বন্ধক রাখো!'

'তা কী করে হয়? তুমি পুরো আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ। তোমার কাছে আমরা নারীদের বন্ধক রাখলে লোকে কী বলবে!'

'তাহলে তোমার ছেলেদেরকে বন্ধক রাখো।'

'লোকে তখন আরও বেশি কথা শোনাবে। সামান্য কটা খাবারের জন্য ছেলেদের বন্ধক রেখেছি, এটা শুনলে মানুষজন ছি ছি করবে! তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে অস্ত্র বন্ধক রাখি?'

এরপর উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে অস্ত্র নিয়ে আসার দিন-তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা সেখান থেকে চলে এলে, আবু নাইলা গিয়ে কাবের সঙ্গে গালগপ্পো শুরু করেন। একপর্যায়ে তাকে বলেন, 'আমি তোমাকে কিছু কথা বলব, ওয়াদা করো, কাউকে বলবে না।' কাব ওয়াদা দেয়।

আবু নাইলা বলতে শুরু করে, 'এই লোকটা এখন আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের

---

[১] ওসাক হলো—শস্য পরিমাপের পাত্র, যা ইসলামপূর্ব আরবে ব্যবহৃত হতো। ইসলামি শরিয়তেও শস্যের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হতো ওসাকের ভিত্তিতে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার কাছে পাঁচ ওসাকের কম খেজুর রয়েছে তার ওপর শস্যের যাকাত ফরজ নয়। [*সহিহুল বুখারি*, ১৪৫৯] এক ওসাক সমান ৬০ সা' যা বর্তমান ওজন হিসেবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ১৯৫ কেজি এবং বাকি তিন মাযহাব অনুযায়ী ১২২.৪ কেজি। [*আত-তারিফাতুল ফিকহিইয়া*, মুফতি আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদি, পৃষ্ঠা : ২৩৭; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত। *আল-কামুসুল মুহিত*, আল ফাইরুযাবাদি, পৃষ্ঠা : ১৭৫৩; দারুল হাদিস, কায়রো।]

জন্য, পুরো আরব এখন আমাদের শত্রু, আমরা একঘরে হয়ে গেছি। সবাই আমাদের বয়কট করেছে। খাবারের অভাবে পরিবার মরতে বসেছে।' মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার মতোই একই ধাঁচে সে কথা চালিয়ে যায়। কথার ফাঁকে আবু নাইলা বলে, 'আমার কিছু বন্ধুবান্ধবও বিরক্ত হয়ে গেছে মুহাম্মাদের কার্যকলাপে, তোমার কাছে একবার নিয়ে আসব নে। ওদেরও একটু সাহায্য কোরো।'

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা এবং আবু নাইলা কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে নেন। এই ঘটনার পর কাব অস্ত্র বা লোকজন দেখে স্বাভাবিকভাবেই আর কোনো সন্দেহ করবে না।

৩য় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ পূর্ণিমার রাতে এই ছোট্ট দলটি নবিজির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাদেরকে বাকিউল গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দেন। তাদের বিদায় দেওয়ার সময় এই দুআ করেন, 'আল্লাহর নামে যাও। হে আল্লাহ, আপনি এদের সাহায্য করুন।' তারপর তিনি ঘরে ফিরে সালাত ও দুআয় মশগুল হয়ে যান।

এদিকে দলটি পৌঁছে গেল কাব ইবনু আশরাফের ডেরায়। আবু নাইলা কাবকে ডাক দিল। সে ঘর থেকে বের হতে যাবে এমন সময় তার নবপরিণীতা স্ত্রী বলে উঠল, কোথায় যাচ্ছেন? আমি এই কণ্ঠস্বর থেকে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। কাব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আরে, এ তো আমার ভাই মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা আর দুধভাই আবু নাইলা। অপরিচিত কেউ তো নয়। সম্ভ্রান্ত মানুষকে রাতের বেলা আঘাত করার জন্য ডাকা হলেও তার যাওয়া উচিত। এই বলে সে ঘর থেকে বের হলো। তার মাথায় তখন সুগন্ধি মাখা। চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে ঘ্রাণ।

এদিকে আবু নাইলা তার সঙ্গীদের বলে রেখেছিলেন, যখন কাব আসবে, তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা দেখবে, আমি খুব শক্তভাবে তার মাথা আঁকড়ে ধরেছি, তখন তরবারি দিয়ে তার ওপর আঘাত করবে।

কাব এসে তাদের সঙ্গে দেখা করল। কিছুক্ষণ আলাপও হলো। এরপর আবু নাইলা কাবকে বলল, কেমন হয় যদি আমরা শিআবুল আজুযের[1] দিকে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি? কাব এতে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায়। সবাই হাঁটতে শুরু করল। একপর্যায়ে আবু নাইলা বললেন, সত্যি বলতে আজকের মতো এত চমৎকার ঘ্রাণ আমি আর কখনো পাইনি। এ কথা শুনে কাব খুশিতে গদগদ হয়ে বলল, আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সুগন্ধি ব্যবহারকারী নারী আছে। আবু নাইলা বলে উঠলেন, আমি কি তোমার মাথাটা একটু শুঁকে দেখতে পারি? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। এরপর

---

[১] শিআবুল আজুয—বুতহান উপত্যকা থেকে বয়ে আসা একটি শাখা ঝরনা। তার কাছেই মদিনার দক্ষিণ-পূর্বে ছিল কাব ইবনু আশরাফের দুর্গ। সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়। [*মুজামুল বুলদান*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৭]

তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং তার সাথিদেরও শুঁকালেন।

কিছুদূর চলার পর আবার তিনি বললেন, আমি কি আরেকবার শুঁকতে পারি? সে বলল, হ্যাঁ, পারো। এবারও তিনি তার মাথা শুঁকলেন। সাথিরাও শুঁকে দেখল। এর কিছুক্ষণ পর আরও একবার তিনি এমনটা করলেন। কিন্তু এবার তিনি তার মাথা ভালো করে ধরলেন। পুরোপুরি কাবু করে ধরে সাথিদের বললেন, আল্লাহর এই দুশমনের ধড় থেকে মস্তক আলাদা করে দাও! সবাই এলোপাথাড়ি তরবারি চালাল। কিন্তু তাতে ঠিকমতো কাজ হলো না। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা একটি ধারালো কুড়াল তার বুকের মাঝ বরাবর বসিয়ে দিলেন। চাপ দিয়ে সেটাকে তলপেট পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এতে আল্লাহর এই দুশমনটা মারা পড়ল। কিন্তু তার চিৎকারে আশপাশের মানুষ ঘাবড়ে গেল। সবাই আগুন জ্বালিয়ে চারপাশটা আলোকিত করে ফেলল। সাহাবিরা খুব দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়লেন।

এদিকে কাবকে আঘাত করার সময় সাথিদের মধ্যে দুর্ঘটনাবশত হারিস ইবনু আউসও আহত হন এবং তার রক্তক্ষরণ চলতে থাকে। সবাই আরিজ প্রান্তরে পৌঁছে দেখলেন, হারিস পেছনে পড়ে গেছেন। কিছুক্ষণ সবাই অপেক্ষা করেন। তিনি পৌঁছার পর তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসেন। যখন তারা বাকিউল গারকাদে পৌঁছলেন, সমস্বরে সবাই তাকবির দেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের তাকবিরধ্বনি শুনতে পান। তাকবির শুনে তিনি বুঝতে পারেন, কাব-হত্যার মিশন সফল হয়েছে। তিনিও তাকবির দিলেন।

সবাই নবিজির কাছে এলে তিনি তাদের বললেন, এই চেহারাগুলো বিজয়ীদের। জবাবে তারাও বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনিও বিজয়ী। এরপর তারা কাবের মস্তক নবিজির সামনে পেশ করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। আহত হারিসের ক্ষতস্থানে নবিজি থুতু দিলে তিনি ব্যথামুক্ত হয়ে যান এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।[১]

কাব ইবনু আশরাফের হত্যার ঘটনা ইহুদিদের কানে গেলে তারা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তাদের বুঝতে বাকি রইল না, নবিজি সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম নমনীয় আচরণ ও দাওয়াতের পাশাপাশি প্রয়োজনবশত কৌশলে শক্তিও প্রয়োগ করতে পারেন। তাই তারা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি পালনে আরও বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। কাব-হত্যার প্রতিশোধের চিন্তা তাদের মাথা থেকে পুরোপুরি উবে গেল।

এবার নবিজি মদিনার বহিরাগত শত্রুদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। মুসলিমরাও ভেতরগত শত্রুদের থেকে চিন্তামুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন।

---

[১] ঘটনাটির বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে এই সূত্রগুলো থেকে—*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১-৫৭; *সহিহুল বুখারি* : ৪০৩৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০০০; ব্যাখ্যগ্রন্থ *আউনুল মাবুদের* ব্যাখ্যাসহ; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১।

বাহরান অভিযান

এটা মোটামুটি বড় একটি অভিযান। সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০০। তৃতীয় হিজরির রবিউল আখির মাসে বাহরান নামক এলাকায় নবিজির নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। সেখানে তারা ২ মাস অবস্থান করেন। এরপর মদিনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে কোনো সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।[১]

যাইদ ইবনুল হারিসার অভিযান

উহুদ যুদ্ধের আগে এটাই ছিল সর্বশেষ ও সফল অভিযান। তৃতীয় হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানটির বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো—

বদর যুদ্ধের পর কুরাইশরা দুঃখ-দৈন্যদশার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে। এদিকে গ্রীষ্মকাল শুরু হয়ে যাওয়ায় তাদের শামকেন্দ্রিক ব্যবসার সময়ও ঘনিয়ে আসে। এ নিয়ে তারা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াকে সে বছর কুরাইশের ব্যাবসায়িক দলের নেতা মনোনীত করা হয়। সে সবাইকে বলল, মুহাম্মাদ আর তার সঙ্গীরা তো খুবই তৎপর হয়ে আছে। এখন আমরা কী করি? এদিকে সমুদ্রবর্তী এলাকাও তাদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার লোকেরা তাদের হয়ে কাজ করছে। কেউ কেউ তো তাদের দলে নামও লিখিয়েছে। কোনো উপায় বের করতে পারছি না। এভাবে বসেও থাকা যাচ্ছে না। ব্যবসার মূলধন ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবিকা তো শামের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা আর হাবশার শীতকালীন ব্যবসার ওপরই নির্ভরশীল।[২]

এ নিয়ে কুরাইশরা দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে। একপর্যায়ে আসওয়াদ ইবনু আব্দিল

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০; *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১

[২] বাইতুল্লাহর অধিবাসী ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ায় আল্লাহ তাআলা তাদের এই নিরাপত্তা দান করেন। ইমাম কুরতুবি বলেন, নবিজির পিতামহ আমর ইবনু আব্দি মানাফ, যিনি হাশিম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, কুরাইশের সকল গোত্রকে বছরে দুটি ব্যাবসায়িক সফর করতে সম্মত করেন। একটি গ্রীষ্মকালে শামে, অপরটি শীতকালে ইয়েমেনে। সুরা কুরাইশে এ দুটি সফরের কথাই বলা হয়েছে। إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ অর্থাৎ কুরাইশরা শীত ও গ্রীষ্মে নিরাপদে (ব্যাবসায়িক) সফর করত। ইবনু জারির তাবারি মা'মারের সূত্রে কালবি থেকে একই কথা বর্ণনা করেন।

সে সময় ইয়েমেন ছিল হাবশার নিয়ন্ত্রণাধীন। মক্কায় আক্রমণকারী হস্তীবাহিনীর সেনাপতি আবরাহাও ছিল ইয়েমেনে নিযুক্ত হাবশার গভর্নর। কুরাইশদের ব্যাবসায়িক প্রধান সফর দুটি শাম ও ইয়েমেনে হলেও মক্কার কেউ কেউ শীতকালীন একই সফরে ইয়েমেন ও হাবশা উভয় স্থানে গমন করত। লেখক হয়তো এ কারণেই কুরাইশদের শীতকালীন সফর হাবশায় হতো বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন। [*তাফসিরুত তাবারি,* খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৬২৩; *তাফসিরুল কুরতুবি,* খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২০৫।]

মুত্তালিব সাফওয়ানকে বলল, সমুদ্রবর্তী এলাকা বাদ দিয়ে এবার আমরা ইরাকের পথটা বেছে নিতে পারি। এই পথটা বেশ দীর্ঘ। নাজদ হয়ে শামে পৌঁছানো যাবে। মদিনা থেকেও রাস্তাটা অনেক দূরে। তাই বলা যায় নিরাপদ। কিন্তু সমস্যা হলো, কুরাইশদের কেউই এই পথটা চেনে না। আসওয়াদ ইবনু আব্দিল মুত্তালিব সাফওয়ানকে পরামর্শ দিল, বকর ইবনু ওয়ায়িল গোত্রের ফুরাত ইবনু হাইয়ানকে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিতে পারো। কারণ সে এই পথটা চেনে।

অবশেষে সাফওয়ানের নেতৃত্বে এই ব্যবসায়ী কাফেলা শামের উদ্দেশে যাত্রা করে। কিন্তু এই সংবাদ মদিনায় পৌঁছে যায়। সংবাদটা দিয়েছেন সালিত ইবনুন নুমান, যিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কুরাইশের মদের আসরে গিয়ে নুআইম ইবনু মাসউদ আল-আশজায়ির কাছ থেকে এই তথ্য উদ্ধার করেন। উল্লেখ্য, তখনো ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়নি। মদ্যপ অবস্থায় নুআইম তাকে ব্যবসায়ী কাফেলার সব বিবরণ খুলে বলে। আর তখনই সালিত এসে নবিজির কাছে সংবাদটা পৌঁছে দেন।

নবিজি যাইদ ইবনুল হারিসার নেতৃত্বে ১০০ সৈন্যের একটি দলকে খুব দ্রুত অভিযানে পাঠিয়ে দেন। যাইদও অত্যন্ত দ্রুতবেগে পথ চলেন এবং কাফেলার নাগাল পেয়ে যান। তিনি তাদের পরাস্ত করেন। সাফওয়ান ও তার সাথিদের জন্য পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এ সময় মুসলিমরা ফুরাত ইবনু হাইয়ানকে বন্দি করে ফেলে। কারও কারও মতে, তার সাথে আরও দুজনকেও বন্দি করা হয়। এই অভিযান থেকে বিপুল পরিমাণ গনিমত মুসলিমদের হাতে চলে আসে। যার মূল্য ছিল প্রায় ১ লক্ষ দিনার। নবিজি সেখান থেকে খুমুস তথা ইসলামের নির্ধারিত অংশ রেখে বাকিটা সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন। আর ফুরাত ইবনু হাইয়ান নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

এই অভিযানের ফলে কুরাইশরা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে যায়। একদিকে বদর যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি, অন্যদিকে জীবনধারণের একমাত্র সম্বল হাতছাড়া হয়ে গেল। সব মিলিয়ে তারা পড়ে যায় চরম দুর্বিপাকে। এখন তাদের সামনে দুটি পথ খোলা— হয় মুসলিমদের সাথে সমঝোতা করা, নয়তো তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে নিজেদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা। আর এই পরিস্থিতিই তাদেরকে পরবর্তী (উহুদ) যুদ্ধে উৎসাহিত করে তোলে। তাওহিদি শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে মরণ কামড় বসাতে তারা হয়ে ওঠে মরিয়া।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০-৫১; *ফিকহুস সিরাহ*, পৃষ্ঠা : ১৯০; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৯

উহুদ যুদ্ধ

কুরাইশদের প্রাণপণ যুদ্ধপ্রস্তুতি

মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে দিনকে দিন। বদর যুদ্ধের দগদগে ক্ষত এখনো তাদের গায়ে। এ যুদ্ধে তাদের বড় বড় নেতা নিহত হয়েছে; বন্দিও হয়েছে বেশ কজন। তার চেয়েও বেদনার কথা হলো, এ যুদ্ধে তাদের বিজয়-ঐতিহ্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। তাদের ভাগ্যে নেমে এসেছে পরাজয়ের মহাগ্লানি। সামান্য কজন মুসলিমের হাতে এত বড় পরাজয়! কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না তারা। ভুলে থাকতে পারছে না সেই দুঃসহ স্মৃতি। তাই শোক ও প্রতিহিংসার অনলে জ্বলছিল সবাই।

কুরাইশ নেতৃবর্গ চাইছিল, এ শোক যেন শক্তিতে পরিণত হয়; অদম্য প্রতিশোধস্পৃহা হয়ে ঝলকে ওঠে যুদ্ধের ময়দানে। সেজন্য তারা নিহতদের শোকে বিলাপ করতে বারণ করে দেয় সবাইকে। মুক্তিপণ দিয়ে যুদ্ধবন্দিদের ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কারণ তারা জানে, শোক ও গ্লানি অশ্রুবানে ভেসে গেলে আক্রোশ কমে আসে, দমে যায় প্রতিশোধস্পৃহাও। তাছাড়া প্রতিপক্ষের সামনে নিজেদের দুর্বলতা এবং শোকাতুর হৃদয়ের যাতনা প্রকাশ করাও বীরোচিত কাজ নয়।

বদর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কুরাইশদের আত্মপ্রত্যয় গুঁড়িয়ে দেয়। এতে তাদের সমর-দক্ষতা ও রণকৌশলও প্রশ্নের মুখে পড়ে। অবস্থার উন্নতিকল্পে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠনের মধ্য দিয়ে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে। তবেই তাদের হাত থেকে বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। সেইসাথে মুছে যাবে পরাজয়ের গ্লানি এবং শোকার্ত হৃদয়ে বয়ে যাবে শান্তির শীতল ফল্গুধারা।

সে অনুযায়ী তারা বিপুল সমারোহে উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এ প্রস্তুতিপর্বে যারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয় এবং সংগঠকের ভূমিকা পালন করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ইকরিমা ইবনু আবি জাহল, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, আব্দুল্লাহ ইবনু আবি রবিআ-সহ আরও অনেকে।

প্রস্তুতির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা যুদ্ধের জন্য তহবিল গঠনে উদ্যোগী হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়—আবু সুফিয়ানের তত্ত্বাবধানে ব্যবসা-পণ্যের যে চালান তারা সদ্য হাতে পেয়েছে এবং যাকে কেন্দ্র করে বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, তার সমস্ত মালামাল বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই তহবিলে দান করবে। সে লক্ষ্যে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের ডেকে বলে, প্রিয় কুরাইশ! মুহাম্মাদ তোমাদের ওপর জুলুম করেছে; নির্বিচারে হত্যা করেছে তোমাদের নেতাদেরকে! তাই এসব পণ্যসামগ্রী দিয়ে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করো। আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে তবেই ক্ষান্ত হব।

উপস্থিত ব্যবসায়ীরা তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। সমস্ত পণ্য বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিক্রিত পণ্যের মূল্যমান দাঁড়ায় ১ হাজার উট এবং ৫০ হাজার দিনার। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

কাফিররা আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদানে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। এভাবে তারা ব্যয় করতেই থাকবে। পরবর্তী সময়ে এটাই তাদের আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা হবে পরাজিত। আর কাফিরদেরকে একত্রিত করা হবে জাহান্নামে।[১]

এরপর তারা জনসাধারণকে স্বেচ্ছাদানের আহ্বান জানায়। আগ্রহীদেরকে যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। নিমরাজি, গররাজি ও দ্বিধাগ্রস্তদের সঞ্চিত অর্থের প্রলোভন দেখায়। এভাবে তারা মিত্রশক্তিদের তো বটেই, কিনানা ও তিহামার অধিবাসীদেরকেও নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া নিজেকে আরও এককাঠি সরেস প্রমাণ করে। সে আরব গোত্রগুলোকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলার কাজে কবি আবু ইযযাকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। কিন্তু সে নবিজির সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কারণে এতে রাজি হচ্ছিল না।[২] উপায় না দেখে সাফওয়ান তখন শেষ টোপটি

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ৩৬

[২] আবু ইযযা বদর যুদ্ধে বন্দি হয়েছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি দয়ার আচরণ

ফেলে। বলে, 'তুমি যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারো, তবে আমি তোমাকে এত বেশি সম্পদ দেব যে, তুমি সারাজীবন বসে বসে খেতে পারবে। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হও, তবে তোমার স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ-সহ যাবতীয় দায়দায়িত্ব আমার।

আবু ইযযা টোপটি গিলে ফেলে। নবিজির অনুগ্রহের কথা বেমালুম ভুলে যায় সে। তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং কবিতার মাধ্যমে বিদ্বেষ ছড়িয়ে আরব গোত্রগুলোকে উত্তেজিত করে তুলতে থাকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। এই কাজের জন্য তারা আরও একজন কবিকে মনোনীত করে। তার নাম মুসাফি ইবনু আব্দি মানাফ জুমাহি।

এভাবে অল্পকদিনেই কুরাইশের সর্বমহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় প্রতিশোধযুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি। এরই মধ্যে আবু সুফিয়ানের মাথায় নেতৃত্ব লাভের ভূত চাপে। সে ভাবে, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ রেখে নেতৃত্বের শূন্য আসন দখলে নেওয়ার এটাই সুযোগ। সেই ভাবনা থেকেই সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাওয়িক যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু ভাগ্য তাকে এবারও আশাহত করে। বিপুল পরিমাণ সম্পদ গচ্চা দিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয় মক্কায়। এ কারণে মুসলিম-বিদ্বেষ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সে ছিল সবার থেকে এগিয়ে।

সাওয়িক যুদ্ধের পর যাইদ ইবনুল হারিসার অভিযানে কুরাইশদের বাণিজ্যিক-কাফেলা মুসলিমদের দখলে চলে আসে। এর ফলে কুরাইশরা বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ভেঙে পড়ে তাদের অর্থনীতিও। সেহেতু মনস্তাপ ও প্রতিশোধস্পৃহাও বেড়ে যায় বহুগুণ। ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাদের সারা দেহে। গোটা সম্প্রদায় জ্বলে ওঠে সে আগুনে। কোমর বেঁধে নেমে পড়ে সবাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি-অভিযানে।

কুরাইশ সেনাবাহিনীর সার্বিক অবস্থা

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মক্কার লোকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। কুরাইশ, তাদের মিত্রশক্তি ও জোটভুক্ত সম্প্রদায় থেকে মোট ৩ হাজার প্রশিক্ষিত যোদ্ধা যোগ দেয় এবারের বাহিনীতে। কুরাইশের লক্ষ্য এবার বদরের সমুচিত জবাব এবং নিশ্চিত বিজয়। এজন্য তাদের দৃষ্টি এখন শুধু সামরিক শক্তিতে নিবদ্ধ নয়; বরং সৈন্যদের মনোবল ও মানসিক শক্তির উন্নয়নেও সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। তারা জানে, নারীরা পাশে থাকলে পুরুষের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। শুধু তা-ই নয়, পুরুষরা তাদের বীরত্ব ও পৌরুষের সর্বোচ্চটা দেখাতে পারলে আত্মগৌরব বোধ করে নারীদের সামনে। শত্রুর চাপে কখনো খেই

করেছিলেন। কোনোরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে শর্ত দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে যেন সে আর কখনো মুসলিমদের বিরোধিতা না করে।

হারালেও, রমণীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে অন্তত মরণপণ লড়াই করে। এজন্য কুরাইশ নেতৃবর্গ নারীদেরকেও এবারের অভিযানে সঙ্গে নেবে বলে স্থির করে। তাদের সঙ্গে এমন প্রেরণাদায়ী নারীর সংখ্যা ১৫ জন।

কুরাইশদের এই বিশাল বাহিনীতে আছে ৩ হাজার উট, ২০০ ঘোড়া[১] এবং ৭০০ লৌহবর্ম। এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান ইবনু হারব। অশ্বারোহীদের পরিচালনার দায়িত্ব খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাঁধে। তার সহযোগী হিসেবে আছে ইকরিমা ইবনু আবি জাহল। আর যুদ্ধের পতাকা বনু আব্দিদ-দারের হাতে।

কুরাইশ সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রা

পূর্ণপ্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর কুরাইশ বাহিনী মদিনা অভিমুখে রওনা করে। তাদের চোখে রক্তের নেশা। মনে প্রতিশোধস্পৃহা। বুকে চেপে রাখা স্বজন হারানোর বেদনা। তারা যতই অগ্রসর হচ্ছে, অতীতের একেকটা দুঃসহ স্মৃতি তাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে আরও বেশি প্রত্যয়ী করে তুলছে। ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে তাদের চোয়াল। হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। কোষবদ্ধ তরবারি আর তির-তূণীরের দিকে চোখ ফিরে যাচ্ছে বারবার। আসন্ন যুদ্ধটি সফল হলেই উপশম ঘটবে তাদের এই বহুবিধ দুঃখ-শোক ও প্রতিহিংসার।

নবিজির কাছে শত্রুদের গোপন খবর

আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব শুরু থেকেই কুরাইশদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সামরিক প্রস্তুতি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কুরাইশরা যুদ্ধযাত্রা করামাত্রই তিনি নবিজির কাছে দূতের মাধ্যমে পত্র পাঠিয়েছেন। সেখানে শত্রুবাহিনী ও তাদের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। দূত কালবিলম্ব না করে মদিনার উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকায়। সংক্ষিপ্ত পথে সর্বোচ্চ গতিতে অবিশ্রান্ত ছুটে চলে। এভাবে মাত্র ৩ দিনে ৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় পৌঁছে যায় নবিজির কাছে। তিনি তখন কুবা মসজিদে অবস্থান করছিলেন। দূত সেখানেই তার কাছে পত্রটি হস্তান্তর করে। উবাই ইবনু কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে পত্রটি পড়ে শোনান। তিনি পত্রের বিষয়টি গোপন রাখার নির্দেশ দিয়ে তখনই মদিনায় ফিরে আসেন। শীর্ষ আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের জরুরি তলব করেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির বিষয়ে মতবিনিময় করেন তাদের সাথে।

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৯২, এটিই প্রসিদ্ধ মত। তবে *ফাতহুল বারিতে* ১০০টি ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭ পৃষ্ঠা : ৩৪৬]

উল্লেখ্য, ঘোড়াগুলোর স্বাস্থ্য ও শক্তি ধরে রাখার জন্য তারা সেগুলোকে চাপমুক্ত রেখেছে। দীর্ঘপথ সেগুলোর লাগাম ধরে হেঁটে গেছে। একটি বারের জন্য আরোহণ করেনি সেগুলোর পিঠে।

মুসলিমদের সার্বক্ষণিক সতর্কতা

মদিনার আকাশে বিপদের ঘনঘটা। খেজুর-বীথিকা ও আঙুর-বাগানে মানুষের আনাগোনা অনেক কম। হাট-বাজারেও নেই তেমন প্রাণচাঞ্চল্য। রাখালদেরকেও দেখা যায় না মেষপাল নিয়ে বের হতে। সারাদিনের কাজকর্ম সেরে সাঁঝের আগেই ঘরে ফেরে সবাই। জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে শহরময়। যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে সর্বত্র। পুরুষ-যুবাদেরকে বলা হয়েছে, যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তারা যেন সদাপ্রস্তুত থাকে। পরিণত সবার হাতেই এখন অস্ত্র। মুহূর্তের জন্যও কেউ অস্ত্রবিহীন থাকছে না। এমনকি সালাতের সময়ও না।

সবাই এখন সতর্ক। যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। তবে যুদ্ধের এই নাজুক সময়ে দলনেতাদের নিরাপত্তা-ঝুঁকি থাকে সবচেয়ে বেশি। সেজন্য তাদের প্রয়োজন হয় বাড়তি নিরাপত্তার। এদিকে লক্ষ্য করে আনসারদের ক্ষুদ্র একটি দল নবিজির সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিযুক্ত হয়। রাতেও তারা সশস্ত্র প্রহরা দেয় নবিজির গৃহদরজায় দাঁড়িয়ে। এই রক্ষীবাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সাদ ইবনু মুআজ, উসাইদ ইবনু হুযাইর ও সাদ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

যুদ্ধ মানেই কৌশল আর বুদ্ধির খেলা। ক্ষণিকের অসতর্কতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রতিপক্ষের হাতে এনে দিতে পারে অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ। সেজন্য সাহাবিদের ক্ষুদ্র কয়েকটি দল মদিনার বিভিন্ন প্রবেশপথ ও অরক্ষিত এলাকায় প্রহরীর কাজে নিয়োজিত। শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে পর্যবেক্ষণ-চৌকি। এছাড়া যেসব দিক দিয়ে শত্রুর অনুপ্রবেশ ও অতর্কিত আক্রমণ হতে পারে বলে আশঙ্কা হয়, সেখানেও রয়েছে টহলের ব্যবস্থা।

মদিনার উপকণ্ঠে কুরাইশ বাহিনী

কুরাইশ বাহিনী তাদের চিরচেনা পথ ধরে মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে; উজান থেকে নেমে আসা উন্মত্ত জলস্রোতের মতো। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আজ প্রত্যয়দীপ্ত। চোখে-মুখে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ছাপ সুস্পষ্ট। আবওয়া[১] নামক স্থানে পৌঁছে তারা যাত্রাবিরতি করে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তখন হাওদা থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। অদূরেই জীর্ণ একটি কবর দেখে তার টনক নড়ে। সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেনাপতিদের ডেকে বলে, 'এটা মুহাম্মাদের মায়ের কবর। তাই কবর খুঁড়ে তার মৃতদেহ তুলে আনো। এরপর চূড়ান্ত অপদস্থ করে ছুড়ে ফেলে দাও দূরে কোথাও।'

কিন্তু সেনাপ্রধান ও শীর্ষ নেতৃবর্গ তার এই ঘৃণ্য প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। সেইসাথে

---

[১] মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী একটি হিজাযি গ্রাম যা সৌদি আরবের পশ্চিম উপকূলের রাবিগ অঞ্চলে অবস্থিত।

এই বলে সতর্ক করে দেয়, এমন জঘন্য কাজের ফলাফল কখনোই ভালো হতে পারে না। তাছাড়া যার হাতে এমন কাজের সূচনা হবে, ইতিহাস কোনোদিনও তাকে ক্ষমা করবে না। মানবসভ্যতায় এমন একটি কালো অধ্যায় যুক্ত করার অভিশাপ তাকে বয়ে বেড়াতে হবে অনন্তকাল।

কয়েক দিনের অব্যাহত যাত্রায় কুরাইশ বাহিনী মদিনার কাছাকাছি এসে পৌঁছে। তারা প্রথমে আকিক উপত্যকায়[১] অবস্থান নেয়। এরপর সেখান থেকে কিছুটা ডান দিকে সরে এসে উহুদ পাহাড়ের প্রান্তবর্তী আইনাইন নামক স্থানে ছাউনি ফেলে। এ জায়গাটি মদিনার উত্তরে কানাত উপত্যকার বিরান প্রান্তরে অবস্থিত। সেদিন ছিল শুক্রবার, তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের ৬ তারিখ।

প্রতিরক্ষা বাস্তবায়নে জরুরি সভা

গোয়েন্দাদের সুবাদে শুরু থেকেই নবিজির কাছে কুরাইশ বাহিনীর প্রতি মুহূর্তের সংবাদ পৌঁছে যাচ্ছিল। সর্বশেষ তিনি যখন জানতে পারেন, শত্রুপক্ষ মদিনার অদূরেই শিবির স্থাপন করেছে, তখন উচ্চ সামরিক পরামর্শসভা গঠন করেন এবং সেখানে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। সভার শুরুতেই তিনি সদ্য-দেখা একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বোধ করি, ভালো স্বপ্নই দেখেছি—কতগুলো গাভি জবাই করা হচ্ছে; আমার তরবারির অগ্রভাগ কিছুটা থেঁতলে গেছে এবং আমি হাত প্রবেশ করাচ্ছি একটি সুরক্ষিত বর্মে।'

এরপর নিজেই সে-স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন এভাবে—গাভি জবাই করার অর্থ হচ্ছে, এ যুদ্ধে আমার বেশ কয়েকজন সাহাবি শাহাদাত-বরণ করবে। তরবারি থেঁতলে যাওয়ার মানে আহলে বাইতের গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্য শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেবে। আর সুরক্ষিত বর্মে হাত প্রবেশ করানোর অর্থ মদিনা শহরে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

স্বপ্ন ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পর তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। বলেন, মদিনার ভেতরেই থাকতে হবে; প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং প্রয়োজনে শহরের ভেতরে থেকেই রক্ষণাত্মক যুদ্ধ করতে হবে। কোনোক্রমেই বের হওয়া যাবে না শহর থেকে। শত্রুপক্ষ যদি তাদের শিবিরেই অবস্থান করে, তবে করুক। আমাদের অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে একসময় শূন্য হাতেই ফিরে যাবে ঘরে। কারণ বাহিনী যত বড় হয় রসদের প্রয়োজনও তত বেশি পড়ে।

আর যদি তারা শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে চায়, তবে মুসলিম যোদ্ধারা বিভিন্ন

---

[১] মদিনার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ একটি উপত্যকা। এটাকে বরকতময় উপত্যকাও বলা হয়। মদিনার ইতিহাসের সাথে এই অঞ্চল বিশেষভাবে জড়িত। উপত্যকাটি মদিনা থেকে প্রায় ১০০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত।

গলিপথের মুখে তাদেরকে প্রতিহত করবে। সরু রাস্তায় বিশাল বহর নিয়ে একযোগে তারা ঢুকতে পারবে না। তখন খুব সহজেই তাদেরকে কচুকাটা করা যাবে। তাছাড়া ছাদ থেকে তির ও পাথর ছুড়ে মুসলিম নারীরাও শায়েস্তা করতে পারবে তাদেরকে।

মূলত এটিই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। মুনাফিক-সর্দার[১] আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলও একাত্মতা প্রকাশ করেছিল এ সিদ্ধান্তের সাথে। তবে সেটা এ কারণে নয় যে, সমরজ্ঞান ও রণ-অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্তটি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল তার কাছে। বরং সে চাইছিল, এমন একটি পথ বেছে নিতে, যাতে 'সাপও মরে, আবার লাঠিও না ভাঙে।' অর্থাৎ যাতে সে খুব সহজে যুদ্ধটা এড়াতে পারে; সেইসাথে তার যুদ্ধভীতিটাও থাকে সবার অগোচরে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি চাইছিলেন, প্রথমবারের মতো তার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গাদের মুখোশ খুলে দেবেন। তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। ইসলামের নামে তারা যে কুফর ও নিফাকের চাষাবাদ করছে, তা প্রকাশ করে দেবেন সবার সামনে যাতে মুসলিমরা জানতে পারে, চরম বিপদের সময়ও তাদের আস্তিনে লুকিয়ে থাকে অজস্র বিষধর সাপ, যেগুলো দংশনের জন্য ফণা তুলে উদ্যত থাকে সবসময়।

অপরদিকে, যেসকল সাহাবি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা নবিজিকে মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেয়। অনেকটা পীড়াপীড়িও করে তাকে এ মতে রাজি করতে। একজন তো বলেই ফেলে, হে আল্লাহর রাসুল, এমন একটা দিনের অপেক্ষায় আছি আমরা বহুদিন ধরে। এজন্য চোখের জল ফেলে প্রতিনিয়ত দুআও করেছি আল্লাহর কাছে। অবশেষে সেই দিনটি আজ আমাদের সামনে হাতছানি দিচ্ছে। স্বপ্নপূরণের উপলক্ষ্য তৈরি হয়েছে। তাই আপনি শত্রু-অভিমুখে যাত্রা করুন, আমাদের সৌভাগ্যের অভিসারে যেতে দিন। তারা যেন কোনোভাবেই ভাবতে না পারে—আমরা কাপুরুষ, ভীরুর দল।

নবিজির চাচা হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের মতও এমনই ছিল। বরং তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে সবার আগে। তার এই উৎসাহের কারণ বদর-প্রান্তরে কাফিরদের তাজা রক্তে হাত রঞ্জিত করার অভিজ্ঞতা। তাই তিনি নবিজিকে বলেন, 'যে আল্লাহ আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তাঁর শপথ করে বলছি, মদিনার বাইরে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি খাবার ছুঁয়েও দেখব না।'[২]

সাহাবিদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে নবিজি তার মত থেকে সরে আসেন। উৎসাহী সাহাবিদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের মতকে প্রাধান্য দেন এবং সে অনুযায়ী মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

---

[১] সে এ সভায় উপস্থিত হয়েছিল খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে।

[২] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪

মুসলিম বাহিনীর সেনাবিন্যাস ও যুদ্ধযাত্রা

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমআর দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি সবাইকে নিয়ে জুমআর সালাত আদায় করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উপদেশ দেন। সবশেষে যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'বিজয় ও সুখ-সৌভাগ্যের পূর্বশর্ত হচ্ছে ধৈর্য ও অবিচলতা। তাই কোনো পরিস্থিতিতেই অধৈর্য বা অস্থির হওয়া যাবে না। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে শত্রুর সামনে। তবেই বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে।' নবিজির বক্তব্যে সবাই উদ্দীপ্ত হয়। সেইসাথে বিজয়ের প্রত্যয় ও শাহাদাতের তামান্না জেগে ওঠে তাদের হৃদয়-গহীনে।

এরই মধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। নবিজি সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়। দূরবর্তী এলাকা থেকেও হাজির হয় বহু মানুষ। সালাত শেষে নবিজি তার ঘরে প্রবেশ করেন, তার সঙ্গে প্রবেশ করেন আবু বকর এবং উমারও। তারা দুজন তাকে শিরস্ত্রাণ ও যুদ্ধের পোশাক পরতে সাহায্য করেন। তিনি দুটি লৌহবর্ম পরিধান করেন। সম্পূর্ণ সামরিক সাজে সজ্জিত হন এবং কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে জনসম্মুখে আসেন।

লোকজন এতক্ষণ তারই বহির্গমনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সাদ ইবনু মুআজ ও উসাইদ ইবনু হুযাইর এ যুদ্ধে নবিজির চিন্তাগত অবস্থান পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। তারা এটাও নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, কেবল কয়েকজন উৎসাহী সাহাবির মনরক্ষার্থে তিনি নিজের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন। তাই তারা যথেষ্ট ক্ষোভ নিয়ে উপস্থিত লোকদের বলেন, 'তোমরা কিন্তু মদিনার বাইরে যুদ্ধযাত্রা করতে একরকম বাধ্যই করছ নবিজিকে! এটা ঠিক হচ্ছে না। কারণ তোমাদের সমস্ত মতামত মানবীয় আবেগতাড়িত। অপরদিকে তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতা ও ঐশীগুণের আলোকে পরিচালিত। তাই তিনি বাইরে এলে, বিষয়টি তার ওপরই ছেড়ে দিয়ো। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত।'

তাদের কথায় সবাই সংবিৎ ফিরে পায়। আবেগের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসে। অনুতপ্ত হয় নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য। নবিজি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বাইরে আসামাত্রই তারা দুঃখপ্রকাশ করে বলে, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনার বিরোধিতা করা উচিত হয়নি আমাদের। আপনার যা ভালো মনে হয়, তা-ই করুন। আপনি মদিনায় থাকা ভালো মনে করলে, তা-ই হোক।' উত্তরে তিনি বলেন, 'কোনো নবির জন্যও কখনোই এটা উচিত নয়, একবার অস্ত্রধারণ করার পর জয়-পরাজয় নিশ্চিত না করেই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন।'[১] এ কথা বলে নবিজি সেনাবিন্যাসে মনোযোগী হন এবং বাহিনীকে তিনটি

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৭৮৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ৭৬৪৭; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ২৫৮৮; বর্ণনাটি সহিহ।

ভাগে বিভক্ত করেন—এক. মুহাজির বাহিনী। এ বাহিনীর পতাকা তুলে দেন মুসআব ইবনু উমাইর আবদারির হাতে। দুই. আউস গোত্রের আনসার বাহিনী। এ বাহিনীর পতাকা বহন করেন উসাইদ ইবনু হুযাইর। তিন. খাযরাজ গোত্রের আনসার বাহিনী। এদের পতাকা তুলে দেওয়া হয় হুবাব ইবনু মুনজিরের হাতে।

মূল বাহিনীতে মোট সৈন্য ছিল ১ হাজার। তাদের মধ্যে ১০০ বর্মধারী, ৫০ অশ্বারোহী,[১] আর বাকি সবাই পদাতিক। সেনাবিন্যাসের পর আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়। এরপর নির্দেশ দেওয়া হয় যুদ্ধযাত্রার। মুসলিম বাহিনী মদিনাকে পেছনে ফেলে উত্তর দিকে চলতে শুরু করে। বর্মপরিহিত দুই সাহাবি—সাদ ইবনু মুআজ ও সাদ ইবনু উবাদা সুরক্ষা-বলয় তৈরি করে নবিজির সামনে সামনে চলতে থাকেন।

সানিইয়াতুল বিদা[২] অতিক্রম করার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ করেন, উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত আরও একটি দল তাদের সমান তালে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের সম্পর্কে জানতে চাইলে, সাহাবিরা বলেন, 'এরা ইহুদি—খাযরাজের মিত্র। এরাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী।' নবিজি জিজ্ঞেস করেন, এরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছে? সাহাবিরা উত্তর দেন, 'না।' নবিজি বলেন, 'তবে আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য নেওয়ার দরকার নেই।'[৩]

যোগ্যতার নিরিখে বাছাই-প্রক্রিয়া

শাইখান নামক স্থানে পৌঁছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীতে যোগ দেওয়া সৈন্যদের একবার পরখ করে নেন। এ সময় বয়সে ছোট ও যুদ্ধে অসমর্থ কিশোরেরা বাদ পড়েন। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনিল খাত্তাব, উসামা ইবনু যাইদ, উসাইদ ইবনু যুহাইর, যাইদ ইবনু সাবিত, যাইদ ইবনু আরকাম, আরাবা ইবনু আউস, আমর ইবনু হাযম, আবু সাইদ আল-খুদরি, যাইদ ইবনুল হারিসা আল-আনসারি এবং সাদ ইবনু হাব্বা রাযিয়াল্লাহু আনহুম। অনেকে বারা ইবনু আযিবের নামও এদের সাথে উল্লেখ করেছেন। তবে *সহিহুল বুখারির* একটি হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, সেদিনের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

---

[১] *হুদা,* ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯২; ইবনু হাজার বলেন, এটা সুস্পষ্ট ভুল। মুসা ইবনু উকবা এ কথার ওপর জোর দিয়ে বলেন, তাদের সাথে কোনো ঘোড়া ছিল না। ওয়াকিদি বর্ণনা করেন, তাদের সাথে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। একটি নবিজির। অপরটি আবু বুরদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর। [*ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৫০]

[২] মদিনা শহরের প্রবেশদ্বার। সালা পর্বত সংলগ্ন উত্তর দিকে অবস্থিত।

[৩] ঘটনাটি উল্লেখ করে ইবনু সাদ বলেন, তারা ছিল বনু কাইনুকার ইহুদি। [*তবাকাতু ইবনি সাদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪]; তবে এই অভিমত সঠিক নয়। কারণ এটা স্বীকৃত যে, বদর যুদ্ধের পরপর তাদের দেশান্তর করা হয়।

ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু রাফি ইবনু খাদিজ ও সামুরা ইবনু জুনদুব। এরা ছোট হওয়া সত্ত্বেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সশরীরে যুদ্ধ করার অনুমতি দেন। রাফি তির চালনায় খুবই দক্ষ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সুনামও ছিল তার। তাই খুব সহজেই তিনি অনুমতি পেয়ে যান। তার অনুমতির খবর শুনে সামুরা বলেন, আমি রাফির চেয়েও শক্ত-সমর্থ। কুস্তিতে ওকে হারানো আমার জন্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই তাকে অনুমতি দেওয়া হলে, আমাকে নয় কেন? কথাটা নবিজির কানে গেলে তিনি তাদের দুজনকে সবার সামনে কুস্তি লড়তে বলেন। সামুরা ঠিকই রাফিকে ধরাশায়ী করে ফেলেন মুহূর্তের মধ্যে। ফলে তিনিও অনুমতি পেয়ে যান যুদ্ধে যাওয়ার।

রাতের আঁধারে বিশেষ নিরাপত্তা

বাহিনী উহুদ ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছলে সন্ধ্যা নামে। নবিজি যাত্রাবিরতি ঘোষণা করেন। রাত্রিযাপনের জন্য সেখানেই তাঁবু খাটাতে বলেন সবাইকে। মাগরিব ও ইশার সালাত সময়মতো পড়ে নেন। বিশ্রামে যাওয়ার আগে শিবিরের সুরক্ষার জন্য ৫০ জনের একটি টহল দল গঠন করেন। এ দলের নেতৃত্ব দেন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা আল-আনসারি। এ মহান সাহাবি কাব ইবনু আশরাফ হত্যায়ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীরত্ব ও বিচক্ষণতার সাথে। এছাড়া যাকওয়ান ইবনু আব্দি কাইসকে নিযুক্ত করা হয় নবিজির বিশেষ রক্ষী হিসেবে।

মুনাফিকদের বিদ্রোহ এবং সদলবলে বাহিনীত্যাগ

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথচলা শুরু করেন। ফজর সালাত আদায় করেন শাওত নামক স্থানে এসে। এখান থেকে শত্রুর অবস্থান খুব বেশি দূরে নয়। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে তাকালেই একদল আরেকদলকে দেখতে পাবে এতটুকু দূরত্ব। ঠিক এ সময়ে মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বেঁকে বসে। তার কথা, 'যেখানে আমার মতামত আমলেই নেওয়া হচ্ছে না; বরং অন্যদের কথামতো মদিনার বাইরে এসে আত্মঘাতী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া হচ্ছে, সেখানে আমি কোন যুক্তিতে প্রাণ দিতে যাব?' এভাবে ক্ষোভ ঝাড়ার পর সে প্রায় ৩ ভাগের ১ ভাগ সৈন্য নিয়ে মদিনায় ফিরে যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সে নিছক তার মতামত গৃহীত না হওয়ায় বাহিনী ত্যাগ করেনি। এটাই যদি দলত্যাগের একমাত্র কারণ হতো, তবে সে মদিনায় থাকতেই আপত্তি জানাতে পারত। এতদূর আসার কোনো অর্থই ছিল না। কিন্তু তা না করে শত্রুর তির-তরবারির একেবারে নাগালে এসে সাড়ম্বরে সরে পড়ার পেছনে নিশ্চয়ই গুরুতর কোনো দুরভিসন্ধি আছে। আর সেটা হচ্ছে, চরম সংকট তৈরি করে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে মুসলিমদেরকে পরাজিত করা। এতে সৈনিকদের মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তি

সৃষ্টি হবে। অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে যুদ্ধ থেকে। এরপরও যারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে, তাদেরও মনোবল ভেঙে যাবে খানিকটা। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর এই অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা দেখে শত্রুপক্ষের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। পাশবিক উন্মত্ততায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুসলিমদের ওপর। একনিমিষে নবিজি ও তার সহযোদ্ধাদের প্রাণ সংহার করবে। ফলে নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক হবে তার নেতৃত্বের পথ।

অনেকটা সফলও হয় সে তার এই চেষ্টায়। তার প্ররোচনায় সম্পূর্ণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে মুসলিমদের দুটি দল—একটি আউসের বনু হারিসা, অপরটি খাযরাজের বনু সালামা। মুনাফিকদের চটকদার কথায় প্রভাবিত হয়ে এরাও মদিনায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবে। পরক্ষণে অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেন। তারা ঘুরে দাঁড়ায় এবং অবিচল থাকে যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্তে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

হঠাৎ তোমাদের দুটি দল পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ আল্লাহ ছিলেন তাদের উভয়ের অভিভাবক। বস্তুত আল্লাহরই ওপর ভরসা করতে হয় মুমিনদের।[১]

এই নাজুক পরিস্থিতিতে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম ভাবেন, শত্রুর মুখে এসে দলত্যাগের এই সিদ্ধান্ত মুসলিমদের জন্য বিব্রতকর, অন্যদিকে মুনাফিকদের জন্যও আত্মঘাতী। কারণ মুসলিমরা মরে গেলেও বেঁচে যাবে। কিন্তু এরা বেঁচে গেলেও হেরে যাবে। এ চিন্তা থেকেই তিনি ছুটে যান ফিরে-চলা মুনাফিকদের কাছে। নানাভাবে বোঝান তাদেরকে। যুদ্ধে অংশ নিতে উৎসাহিত করেন এবং দরদের সাথে বলেন, 'ফিরে এসো ভাইয়েরা! আল্লাহর পথে জিহাদ করো। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলো শত্রুর বিরুদ্ধে।' কিন্তু তারা নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয়, 'এটা সমতাপূর্ণ যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই তাতে অংশ নিতাম। এভাবে ফিরে যেতাম না তোমাদের রেখে।' বাধ্য হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম তখন এই বলে ফিরে আসেন, 'হে আল্লাহর দুশমনেরা! আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুন। তোমাদের আর দরকার হবে না। আল্লাহই তাঁর নবির জন্য যথেষ্ট।' এসব মুনাফিকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১২২

لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার দিন তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, সেটা ছিল আল্লাহরই নির্দেশে। (আর আল্লাহ তা করেছিলেন) মুমিনদের যাচাই করার পাশাপাশি মুনাফিকদেরও শনাক্ত করার জন্য। তাদেরকে বলা হয়েছিল, এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো কিংবা (অন্তত) প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, এটা সমতাপূর্ণ যুদ্ধ হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গ দিতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরের বেশি কাছে ছিল। তাদের অন্তরে যা নেই, তা-ই তারা মুখে বলে। তারা যা গোপন করে, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।[১]

এক অন্ধ মুনাফিকের চরম ধৃষ্টতা

মুনাফিকরা দলত্যাগের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশিষ্ট ৭০০ সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। উহুদের সিংহভাগ এলাকাজুড়ে শত্রুসেনাদের উপস্থিতি থাকায় তিনি সাহাবিদের বলেন, এ পথে অগ্রসর হলে টহলরত শত্রুদের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। তারা দেখে ফেলবে খুব সহজেই। আর এটা মোটেও সমীচীন হবে না এই মুহূর্তে। তাই তোমরা কি আমাকে এমন পথের সন্ধান দিতে পারো, যে পথ ধরে আমরা নিরাপদে পৌঁছে যাব উহুদের নিষ্কণ্টক পাদদেশে? আবু খায়সামা নামের এক সাহাবি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি পারব। নবিজি বলেন, তবে আর দেরি কেন? চলো এক্ষুনি!

অনুমতি পেয়ে আবু খায়সামা বনু হারিসার বাগান ও শস্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে এগিয়ে যান। এ পথটি শত্রুদলকে পশ্চিমে ফেলে সোজা গিয়ে মিলিত হয়েছে উহুদ পাহাড়ের সাথে। পথিমধ্যে মিরবা ইবনু কাইযির বাগান তাদের সামনে পড়ে। মিরবা ছিল এক অন্ধ মুনাফিক। সে মুসলিম বাহিনীর আগমন টের পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাদের চোখেমুখে ধুলোবালি নিক্ষেপ করতে শুরু করে এবং বলতে থাকে, 'তুমি আল্লাহর রাসুল হয়ে থাকলে, আমার এ বাগান অতিক্রম করার অনুমতি নেই তোমার।' তার এই ধৃষ্টতা সহ্য হয় না সাহাবিদের। তারা তাকে হত্যা করতে তরবারি কোষমুক্ত করে। কিন্তু নবিজি তাদের বাধা দিয়ে বলেন, 'থাক, ছেড়ে দাও। সে শুধু অন্ধই নয় বরং নির্বোধও।'

এ কথা বলে নবিজি সামনে অগ্রসর হন। উহুদের পাদদেশবর্তী উপত্যকার শেষ প্রান্তে গিয়ে অবস্থান নেন। উহুদের সানুদেশ পেছনে রেখে মদিনার দিকে মুখ করে শিবির

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৬৬-১৬৭

স্থাপন করেন। শিবিরের এই কৌশলগত অবস্থানের কল্যাণে শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনী এবং মদিনার সাধারণ মুসলিমদের মাঝখানে পড়ে যায়।

পাহাড়-চূড়ায় নবিজির অভিনব যুদ্ধকৌশল

শিবির স্থাপনের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাবিন্যাসে মনোযোগী হন। তাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করেন। অরক্ষিত ও ঝুঁকিপ্রবণ জায়গাগুলোতে সৈন্যসমাবেশ তৈরি করে সদাপ্রস্তুত থাকতে বলেন তাদেরকে। এর বাইরে বাছাই করা ৫০ জন দক্ষ তিরন্দাজের একটি বাহিনী গঠন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর ইবনি নুমান আল-আনসারিকে বানান তাদের দলনেতা। এ বাহিনীটিকে তিনি কানাত উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত একটি পাহাড়ে শক্তভাবে অবস্থান নিতে বলেন। মুসলিম বাহিনীর মূল শিবির থেকে এ পাহাড়ের দূরত্ব ছিল প্রায় ১৫০ মিটার। এ পাহাড়টি বর্তমানে জাবালু রুমাত নামে পরিচিত।

নবিজি পাহাড়-চূড়ায় তিরন্দাজ বাহিনী মোতায়েনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তাদের সেনাপতিকে বলেন, 'পেছন দিকের ওই গিরিপথের ভেতর দিয়ে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। তাই ওদিক থেকে তারা যেন কিছুতেই আমাদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। তিরবর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করবে। আর একটা কথা, আমাদের জয় হোক কিংবা পরাজয়—তোমরা একচুলও নড়বে না তোমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে।'[১]

এরপর তিনি তিরন্দাজ সেনাদের বলেন, 'আমাদের পেছন দিক তোমরা সামলাবে। তোমরা যদি দেখো, আমাদের হত্যা করা হচ্ছে, তবু আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। এমনকি আমাদেরকে গনিমত সংগ্রহ করতে দেখলেও তাতে অংশ নেবে না।'[২] এই বিষয়টি *সহিহুল বুখারিতে* স্থান পেয়েছে এভাবে—

'যদি দেখো, পাখি আমাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তবু তোমরা তোমাদের অবস্থান থেকে একচুলও নড়বে না—যতক্ষণ না আমি তোমাদের ডেকে পাঠাই। অথবা যদি দেখো, আমরা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেছি এবং ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি তাদের দম্ভ, তবু তোমরা এখান থেকে এক কদমও সরবে না। কেবল আমি যখন তোমাদের আসতে বলব তখনই তোমরা আসবে।'[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৫,৬৬

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬০৯; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১০৭৩১; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৩১৬৩; এর সনদ হাসান। আরও দেখুন, *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৫০; ইবনু আব্বাস থেকে ইমাম আহমাদ, তাবারানি এবং হাকিম এটি বর্ণনা করেছেন।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩০৩৯; *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি : ২৭০৫

পাহাড়ের যে চোরাপথ দিয়ে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহীদের আক্রমণের আশঙ্কা করা যাচ্ছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নির্দেশনার মধ্য দিয়ে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। এতে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় এবং তারা পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করার অবসর পায় সামনের শত্রুদের দিকে।

তিরন্দাজ বাহিনীকে পাহাড়-চূড়ায় মোতায়েন করার পর নবিজি অবশিষ্ট সৈনিকদের শ্রেণিবিন্যাসে মনোযোগী হন। ডান ও বামবাহুর প্রধান করা হয় যথাক্রমে মুনজির ইবনু আমর ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে। তাদের সহযোগী হিসেবে থাকেন মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ। আর সম্মুখ সারিতে অবস্থান নেন অভিজ্ঞ ও বীর মুজাহিদরা। যাদের একেক জন শক্তি ও বুদ্ধিতে হাজার জনের সমান।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সেনা-বিন্যাস ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও কৌশলপূর্ণ। এই একটিমাত্র যুদ্ধই তার সমরজ্ঞান ও সামরিক অভিজ্ঞতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। পৃথিবীর কোনো কমান্ডারের পক্ষে এর চেয়ে সূক্ষ্ম ও কৌশলপূর্ণ প্রতিরক্ষা-পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনীর পরে উপস্থিত হয়েও তার বাহিনীর জন্য সামরিক বিবেচনায় সবচেয়ে সেরা জায়গাটি নির্বাচন করেন। কারণ তার অবস্থানক্ষেত্রের পেছনে ও ডানে রয়েছে সুউচ্চ উহুদ পাহাড়। পেছন-দিক-সংলগ্ন বামেও একই অবস্থা। তবে এ পাশে একটি গিরিপথ চোখে পড়ে। তিরন্দাজদের দিয়ে সেটা বন্ধ করে পুরো বাহিনীটাকেই নিয়ে এসেছিলেন একটি সুরক্ষা-বলয়ে।

এছাড়াও শিবির স্থাপনের জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা নির্বাচন করেন যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয় ঘটলেও সৈনিকরা পালিয়ে না গিয়ে সানুদেশে এসে আশ্রয় নিতে পারে। সেক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ ঢাল বেয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে অথবা শিবির দখল করতে এলে যেন ওপর থেকে তির-বর্শা নিক্ষেপ করে তাদের দফারফা করে দিতে পারেন।

মুসলিম বাহিনীর এই কৌশলগত অবস্থানের কারণে শত্রুপক্ষ বাধ্য হয়েই নিচু জায়গায় শিবির স্থাপন করে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সামরিক বিবেচনায় এ অবস্থানটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ তারা বিজয়ী হলেও খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না। ঢালু বেয়ে ওপরে উঠে মুসলিমদের সমূলে বিনাশ করা অথবা গনিমত সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না তাদের পক্ষে। এটা করতে গেলে যুদ্ধের হিসেব পালটে যেতে পারে। আবার পরাজিত হলেও তাদের রক্ষা থাকবে না। কারণ মুসলিম বাহিনী উঁচু থেকে জলের মতো গড়িয়ে এসে তাদের ওপর আছড়ে পড়বে। এভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যাবে তাদের অস্তিত্ব।

এক কথায়, নবিজি তার সমরকুশলতা এবং সহযোদ্ধাদের সাহস ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সৈন্যস্বল্পতা পুষিয়ে নেন। এভাবে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে নবিজির সেনাবিন্যাস সম্পন্ন হয়।

শেষ মুহূর্তের অনুপ্রেরণা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি লৌহবর্ম পরিধান করে মুজাহিদদের সামনে আসেন। তাদেরকে সতর্ক করে বলেন, আমার অনুমতি ছাড়া কেউ যুদ্ধ শুরু করবে না। এরপর শেষবারের মতো সবাইকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করেন। শত্রুর মোকাবেলায় অবিচল থাকার প্রেরণা জোগান এবং কোষমুক্ত ধারালো একটি তরবারি উঁচিয়ে ধরে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, কে এই তরবারির হক আদায় করতে পারবে? ঘোষণামাত্রই বেশ কজন সাহাবি সামনে এগিয়ে আসেন। তাদের পুরোভাগে ছিলেন আলি ইবনু আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তাদের পরে আসেন আবু দুজানা সিমাক ইবনু খারশা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল, এর হক বলতে কী বোঝানো হচ্ছে? তিনি উত্তর দেন, এর দ্বারা শত্রুর ওপর এমনভাবে আঘাত হানবে, যেন এর ধারালো অংশে চির ধরে এবং বেঁকে যায় আঘাতের চোটে। তখন আবু দুজানা দৃঢ়কণ্ঠে বলে ওঠেন, ইনশাআল্লাহ আমি পারব এর হক আদায় করতে। তার আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে নবিজি তার হাতেই তুলে দেন তরবারিটি।

আবু দুজানা একজন বীরযোদ্ধা। যেমন সাহস, তেমনই তার ক্ষুরধার সমর-অভিজ্ঞতা। যুদ্ধক্ষেত্রে তার প্রতিটি পদক্ষেপ ত্রাসের সৃষ্টি করত শত্রুশিবিরে। আজ তার মাথায় একটি লাল পাগড়ি। ওটা মাথায় বাঁধলে কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিজয় নিশ্চিত না হলে আমৃত্যু লড়াই করে যাবেন তিনি।

সরাসরি প্রিয় নবির হাত থেকে তরবারি পেয়ে তিনি আজ ভীষণ খুশি! আমৃত্যু লড়াই করে যাওয়ার প্রত্যয় তার চোখেমুখে দৃশ্যমান। তিনি মাথার পাগড়িটা শক্ত করে বেঁধে শত্রুর দিকে ছুটে যান দৃপ্ত পায়ে। মুখোমুখি দুই সৈন্যসমাবেশের মাঝ দিয়ে দম্ভভরে হেঁটে চলেন তিনি। তার এই দম্ভ ও দৃঢ় পদচারণা দেখে নবিজি মন্তব্য করেন, 'একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও এমন সদম্ভ পদচারণা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না।'[১]

আবু সুফিয়ানের কূটনৈতিক চাল

মুশরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান সাখর ইবনু হারব। সংগত কারণেই তার অবস্থান সৈন্যসারির একেবারে মাঝখানে। এছাড়া ডানবাহুর প্রধান করা হয়েছে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে, বামবাহুর দায়িত্বে রয়েছে ইকরিমা ইবনু আবি জাহল, পদাতিক বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে আছে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, তিরন্দাজ বাহিনীর প্রধান আব্দুল্লাহ ইবনু আবি রবিআ এবং তাদের পতাকা বনু আব্দিদ-দারের ছোট্ট একটি দলের হাতে। এটা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গোত্রীয় মর্যাদা। কুসাই ইবনু কিলাবের

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২

উত্তরাধিকারী বনু আব্দি মানাফ তাদের উত্তরাধিকার বন্টনকালে এ পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পতাকা নিয়ে বিবাদ করার অনুমতি নেই কারও। কারণ পূর্বপুরুষদের সময়কাল থেকে বনু আব্দিদ-দারের জন্য এ অধিকার সংরক্ষিত। প্রজন্ম পরম্পরায় তারা পেয়েও আসছে এটা। এরপরও আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে ঘটে যাওয়া বিষাদময় পরাজয়ের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এদিকেও ইঙ্গিত করে যে, বদরের দিন যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তার অনেকটা দায় একা বনু আব্দিদ-দারের। কারণ সেদিন যুদ্ধের পতাকা ছিল তাদেরই প্রতিনিধি নজর ইবনুল হারিসের হাতে। সে মুসলিমদের হাতে বন্দি হওয়ায় চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে।

আবু সুফিয়ান তাদের মধ্যে ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও জাত্যভিমান উসকে দিতে বলে, 'হে বনু আব্দিদ-দার, বদরের দিন আমাদের পতাকা তোমাদেরই হাতে ছিল। সেদিন তোমাদের কারণে আমাদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, নিশ্চয়ই তোমরা তা ভুলে যাওনি। এরপরও তোমাদের ঐতিহ্যগত মর্যাদা রক্ষার্থে আমরা আবারও তোমাদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছি। তাই এবার যেন ভুল না হয়। তোমাদেরকে যুদ্ধের বাস্তবতা মেনে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, যার হাতে পতাকা থাকে, তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় শত্রুর নিশানা ও আক্রমণ। কারণ এক-পতাকাধারীর পতন ঘটলে গোটা বাহিনীর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তোমরা এই বাস্তবতা মেনে পতাকা নিতে চাইলে, নিতে পারো। অন্যথায় এর দায়িত্ব ছেড়ে দাও আমাদের হাতে। আমরা আমৃত্যু নিয়োজিত থাকব এর মর্যাদা রক্ষায়।'

আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্য সফল হয়। তার কথায় বনু আব্দিদ-দার ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং এই প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে যে, পতাকার মর্যাদা রক্ষায় তারা আমৃত্যু লড়াই করবে। প্রয়োজনে জীবন দেবে। তাদের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও পতাকা উড্ডীন রাখবে বুকের ওপর। এমনই ইস্পাত-কঠিন প্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা আবু সুফিয়ানকে বলে, কী করে ভাবলে আমরা আমাদের বংশীয় মর্যাদা তোমাদের হাতে সঁপে দেব? রাত পোহালেই দেখতে পাবে, পতাকার মর্যাদা রক্ষায় শত্রুর সাথে আমরা কী আচরণ করি!

তারা তাদের কথা রেখেছে। যুদ্ধের চরমতম সময়েও তাদের হাতে পতাকা দেখা যাচ্ছিল। একটু আঁচড়ও লাগতে দেয়নি পতাকার গায়ে। এজন্য অবশ্য তাদের প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে একে একে সবাইকে।

মুসলিম শিবিরে বিভেদের অপচেষ্টা

যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তেও কুরাইশরা মুসলিম শিবিরে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। আবু সুফিয়ান এই বলে আনসারদের কাছে লোক পাঠায়, 'তোমরা

নিরপরাধ। নির্বিরোধী। তোমাদের সাথে আমাদের কোনো বিবাদ নেই। আমরা তোমাদের রক্ত ঝরাতে চাই না। তাই তোমরা সরে দাঁড়াও আমাদের ও আমাদের বংশের লোকদের মাঝখান থেকে।' কিন্তু আনসারদের পর্বত-প্রমাণ ঈমানের সামনে তাদের এই অপচেস্টা ব্যর্থ হয়। তারা আবু সুফিয়ানের এই প্রস্তাব অবজ্ঞার সাথে ফিরিয়ে দেয় এবং দূতকে এমন জবাব দিয়ে ফেরত পাঠায়, যা ছিল তার জন্য খুবই অপমানজনক ও বিব্রতকর।

যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে আসে। উভয় দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। কুরাইশরা তখন তাদের শেষ চালটি চালে। আবু আমির নামের এক কুচক্রীকে আনসারদের কাছে পাঠায়। তার প্রকৃত নাম আব্দু আমর ইবনু সাইফি। ইসলাম পূর্বযুগে তাকে 'রাহিব' বা সন্ন্যাসী নামে ডাকা হতো। কিন্তু নবিজি তার নাম দিয়েছিলেন 'ফাসিক' বা পাপাত্মা। জাহিলি যুগে সে আউসের গোত্র প্রধান ছিল। ইসলামের আবির্ভাব তার গলায় কাঁটা হয়ে বিঁধে। সে প্রকাশ্যে নবিজির শত্রুতায় নামে। হিংসায় জ্বলেপুড়ে মদিনা ছেড়ে মক্কায় পাড়ি জমায়। কুরাইশদের কাছে গিয়ে নবিজির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে এবং কাফিরদেরকে প্ররোচিত করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে। সে কুরাইশদের এই আশ্বাসও দেয় যে, তার গোত্রের লোকেরা তাকে দেখামাত্রই তার দলে ভিড়বে। তাকে সঙ্গ দেবে কিংবা অন্তত বিরত থাকবে তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে।

কুরাইশদেরকে দেওয়া এই আশ্বাস বাস্তবায়নের সময় হয়েছে। তাই সে কয়েকজন হাবশি গোলাম ও মক্কার স্থানীয় সৈন্য নিয়ে কুরাইশদের প্রতিনিধি দল হিসেবে মুসলিম শিবিরের দিকে এগিয়ে আসে। এরপর স্বগোত্রের সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরে, 'প্রিয় আউস! আমি আবু আমির। তোমাদের প্রিয়ভাজন। তোমরা আমার দলে চলে আসো। পরিত্যাগ করো মুসলিমদের।' প্রতিউত্তরে তারা বলে, 'তুমি পাপিষ্ঠ! আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন। তুমি যেন দুচোখে ভালো কিছু দেখতে না পাও কোনোদিন।'

নিজের লোকদের থেকে এমন উত্তর কেউই আশা করে না কখনো। তাই ভীষণ হতাশ হয়ে যায় সে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। উপায় না দেখে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসে মুশরিক বাহিনীর কাছে। এ সময় সে মন্তব্য করে, 'আমার অবর্তমানে মতিভ্রম ঘটেছে আমার সম্প্রদায়ের।' পরে যুদ্ধ শুরু হলে সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ ঝাড়ে। তাদের ওপর পাথরবৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

এভাবে কুরাইশদের শেষ কূটচালটিও মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হয়। তাদের এসব অপচেস্টা ও কূটকৌশল থেকে বোঝা যায় যায়, বিপুল সৈন্য ও পর্যাপ্ত রসদ থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের ভয় তাদেরকে ভেতর থেকে খুবলে খাচ্ছিল।

কুরাইশদের মনোবল বৃদ্ধিতে নারীদের ভূমিকা

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবার নেতৃত্বে কুরাইশ নারীরাও তাদের দায়িত্ব

পালন করে যাচ্ছিল। তারা সৈন্যসারির ভেতরে ঘুরে ঘুরে দফ বাজাচ্ছিল। কবিতার ছন্দে সৈনিকদের উত্তেজিত করে তুলছিল। গানও ধরছিল তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করতে। এতে যুবকদের যুদ্ধস্পৃহা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তেমনি জেগে উঠছিল তাদের আত্মমর্যাদা ও গোত্রপ্রীতি। তারা একবার তাদের পতাকাধারীদের সম্বোধন করে বলছিল—

পশ্চাৎভাগের দায়িত্বরত হে বনু আব্দিদ-দার,
প্রচণ্ড বিক্রমে করো শত্রুদের শিবির চুরমার।

আবার নিজ গোত্রের লোকদের উত্তেজিত করার লক্ষ্যে বলছিল—

সামনে আগালে জড়াব বুকে, পেতে রাখব বিছানা;
পিছু হটলে হারাবে মোদের, কখনো ফিরে পাবে না।

দ্বৈরথ যুদ্ধ

উভয় দল এখন পরস্পরের মুখোমুখি। সংঘাতের চরম মুহূর্তটি সমুপস্থিত। দ্বৈরথ যুদ্ধে কে আগে অবতীর্ণ হবে, সেটাই ভাবছে উভয় শিবির। এমন সময় মুশরিকদের পক্ষ থেকে এগিয়ে আসে তালহা ইবনু আবি তালহা আবদারি। তার একহাতে পতাকা, আরেক হাতে উন্মুক্ত তরবারি। সে কুরাইশের বিখ্যাত এক বীরযোদ্ধা। অশ্ব ও তরবারি চালনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু মুসলিমরা তাকে 'রামছাগল' বলে ডাকে। সে উটে সওয়ার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে এবং বীরদর্পে সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান জানায় মুসলিমদেরকে। তার উন্মত্ততা দেখে মুসলিম বাহিনী মুহূর্তের জন্য ভাবনায় পড়ে যায়।[১] কিন্তু পরমুহূর্তেই যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন তার ওপর। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন এবং এক আঘাতেই শরীর থেকে তার মাথা আলাদা করে ফেলল।

---

[১] তালহা ইবনু আবি তালহার হুংকারে সেদিন কোনো সাহাবি ভীতসন্ত্রস্ত হয়নি; বরং মুসলিম শিবির থেকে বীরদর্পে বেড়িয়ে আসেন আলি ইবনু আবি তালিব। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। আঘাত প্রতিহত করে পালটা আঘাতেই নরাধমটাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।

ইবনু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, তালহা ইবনু আবি তালহাকে হত্যা করেছিলেন আলি ইবনু আবি তালিব। কেউ কেউ আবার বলেছেন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের কথা। *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া* গ্রন্থেও আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তালহা ইবনু আবি তালহার আগে মুশরিকদের আরেকজন সৈন্য মুসলিম সেনাদের মল্লযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে যান যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং হত্যা করেন। লেখক হয়তো তার কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৭]

নবিজি এই প্রশান্তিদায়ক দৃশ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন। সমুচ্চস্বরে তাকবির বলে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শিবিরেও গর্জে ওঠে তাকবির ধ্বনি। নবিজি যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তার সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যেক নবিরই একজন সহচর থাকে। আমার সেই সহচর হচ্ছে যুবাইর।'[১]

পতাকা-বাহকদের নির্মম মৃত্যু

দ্বৈরথ যুদ্ধের পর সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষের সৈন্যশিবিরে। মুশরিকদের পতাকা ঘিরে শুরু হয় রীতিমতো মহাপ্রলয়। সেই প্রলয়ে বনু আব্দিদ-দারের সেনাপতি ও পতাকাবাহক তালহা ইবনু আবি তালহা নিহত হয়। তার পরে পতাকা বহনের ভার দেওয়া হয় উসমান ইবনু আবি তালহাকে। সে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়—

হয় পতাকা ছিঁড়ে যাবে, নয় হবে রক্তে ভিজে একাকার
তবু পতাকাবাহী সম্মান অটুট রাখবে সেই পতাকার।

হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব কালবিলম্ব না করে নবাগত পতাকাধারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সজোরে আঘাত হানেন তার কাঁধ বরাবর। এতে তার কাঁধসহ গোটা হাত আলাদা হয়ে যায়। তরবারি পৌঁছে যায় হাড়-পাঁজর চিরে একেবারে নাভি পর্যন্ত। ফুসফুস ও নাড়িভুঁড়িও বেরিয়ে যায় সেই আঘাতে।

এরপর পতাকা তুলে নেয় তার ভাই আবু সাদ ইবনু আবি তালহা। মুহূর্তেই সে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের তিরের নিশানায় পরিণত হয়। তির গিয়ে বিঁধে তার কণ্ঠনালীতে। ফলে জিহ্বা সামনের দিকে বেরিয়ে আসে এবং সেখানেই ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, আবু সাদ ময়দানে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে আসেন। উভয়ে একে অপরের ওপর তরবারির আঘাত হানে। আলির তরবারির আঘাতে আবু সাদ নিহত হয়। এরপর পতাকা তুলে নেয় মুসাফি ইবনু তালহা ইবনি আবি তালহা। কিন্তু সেও বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। আসিম ইবনু সাবিত ইবনি আবি আকলার নিক্ষিপ্ত তিরে সে নিহত হয়।[২]

তারপর পতাকা যায় তার ভাই কিলাব ইবনু তালহা ইবনি আবি তালহার হাতে। অমনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তাকে পাঠিয়ে দেন জাহান্নামে।

---

[১] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮

[২] কোনো কোনো বর্ণনায় আফলাহ উল্লেখ করা হয়েছে। [*মুসনাদুল বাযযার* : ৭০৯০]

তারপর পতাকা তুলে নেয় জিলাস ইবনু তালহা ইবনি আবি তালহা। তালহা ইবনু উবাইদিল্লার বর্শার আঘাতে সে ঘটনাস্থলেই মারা পড়ে। কারও কারও মতে, সে নিহত হয় আসিম ইবনু সাবিত ইবনি আবি আকলার তিরের আঘাতে।

নিহত এই ৬ জনের প্রত্যেকেই আবু তালহা আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনি আব্দিদ-দার পরিবারের সদস্য। সবাই নিহত হয় মুশরিক বাহিনীর পতাকা সমুন্নত রাখতে গিয়ে। তারা সকলে নিহত হলে পতাকা তুলে নেয় বনু আব্দিদ-দারের আরতাত ইবনু শুরাহবিল। আলি ইবনু আবি তালিব, মতান্তরে হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব তাকে হত্যা করেন। সে মারা গেলে শুরাই ইবনু কারিয এসে পতাকা তুলে নেয়। কুযমান নামের এক লোক এগিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে। কুযমান মূলত একজন মুনাফিক। সে ইসলামের টানে লড়াই করতে আসেনি; এসেছিল বংশীয় মর্যাদা রক্ষার্থে।

শুরাইর পর আবু যাইদ আমর ইবনু আব্দি মানাফ আবদারি পতাকা আগলে ধরে। কুযমান তাকেও হত্যা করে ফেলে। তারপর শুরাহবিল ইবনু হাশিম আব্দিদ-দার এক পুত্র পতাকা তুলে নেয়। সেও নিহত হয় কুযমানেরই হাতে।

মুশরিক বাহিনীর পতাকা বহন করতে গিয়ে এভাবেই একে একে বনু আব্দিদ-দারের ১০ জন সদস্য নিহত হয়। তাদের পরে পতাকা বহনের মতো যোগ্য কেউ বিদ্যমান ছিল না সে গোত্রে। উপায় না দেখে তাদের এক হাবশি গোলাম এসে পতাকা তুলে ধরে। তার নাম ছিল সাওয়াব। সে জাতে গোলাম হলেও বীরত্ব ও রণকুশলতায় তার মনিবদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ করতে করতে তার উভয় হাত দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারপর সে হাঁটু গেড়ে বসে। থুতনি ও বুকের আলতো চাপে পতাকা উঁচু করে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয়। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে বলেছিল, 'হে আল্লাহ, আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। এখন আর কিছুই করার নেই আমার।'

সাওয়াব নিহত হওয়ার পর পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তুলে ধরার মতো কেউই আর বাকি থাকে না।

আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এক মুসলিম সৈনিক

মুশরিকদের পতাকা ঘিরে চরমতম সংঘাতের যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে, তার লাভা ছড়িয়ে পড়ে গোটা রণাঙ্গনজুড়েই। মুসলিমরা বরাবরই ঈমানের বলে বলীয়ান। ফলে মুশরিকদের ওপর তাদের আক্রমণ বলতে গেলে মরুঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো, যার সামনে কোনো বাঁধই একমুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না। সেই জলোচ্ছ্বাস থেকে গমগম করে যে শব্দটি বেরুচ্ছিল তা হচ্ছে, আমিত, আমিত।[১] উহুদ যুদ্ধে এটিই ছিল

[১] ধরো এবং মারো।

মুসলিমদের সাংকেতিক ভাষা।

আবু দুজানা লাল পাগড়ি পরে ময়দানে আসেন। তার হাতে নবিজির দেওয়া তরবারি। তিনি এর মর্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর; ইস্পাত কঠিন মনোবল তার। মুহুর্মুহু শব্দে তরবারি চালিয়ে তিনি ঢুকে যান মুশরিকদের সারির ভেতর। যেদিকে অগ্রসর হন, সেদিক থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় শত্রুসেনারা। দুপাশে পড়ে থাকে লাশের সারি। তার তরবারির আঘাতে লন্ডভন্ড হয়ে যায় মুশরিকদের নিরাপত্তা-বেষ্টনী।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেন, 'নবিজি যখন তরবারিটি হাতে নিয়ে উপযুক্ত প্রার্থী খুঁজছিলেন তখন আমিও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে না দিয়ে আবু দুজানাকে দেন। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু খারাপ লাগে। মনে মনে বলি, আমি একে তো তার ফুফাতো ভাই, দ্বিতীয়ত কুরাইশ বংশের, তৃতীয়ত আবু দুজানার আগেই আমি আগ্রহ ব্যক্ত করেছি। তাই সার্বিক বিচারে আবু দুজানার চেয়ে আমিই ছিলাম বেশি হকদার। কিন্তু তিনি আমাকে না দিয়ে তাকে দিলেন। এর পেছনে কী এমন কারণ থাকতে পারে? আল্লাহর কসম! এ তরবারির মর্যাদা সে কীভাবে রক্ষা করে আমি তা দেখে ছাড়ব—এ ভাবনা থেকেই আমি তার পিছু নিই। দেখি, সে তার লাল পাগড়িটা বের করে মাথায় বাঁধছে। আনসাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, আবু দুজানা শাহাদাতের পাগড়ি বের করেছে। আবু দুজানার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সে পাগড়ি পরে নিচের পঙ্‌ক্তিদুটি আবৃত্তি করতে করতে সামনে অগ্রসর হয়—

বন্ধুর হাতে হাত রেখে
ওয়াদা করেছি খেজুর বাগে
যুদ্ধক্ষেত্রে পিছিয়ে নয়;
থাকব সবার আগে আগে।

এরপর সে যাকেই সামনে পেয়েছে, মৃত্যুর ঘাট পার করে দিয়েছে। মুশরিকদের মধ্যেও তার মতো এক যোদ্ধা ছিল। সে আমাদের কোনো আহতকে পেলেই হত্যা করে ফেলত। এভাবে লাশের সারির মধ্য দিয়ে তারা একে অন্যের কাছাকাছি চলে যাচ্ছিল। আমিও চাইছিলাম, তারা দুজন যেন পরস্পরের মুখোমুখি হয়। আল্লাহর কী মর্জি! কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে লড়াই বেধে যায়। মুশরিক যোদ্ধা সজোরে আঘাত হানে আবু দুজানার ওপর। কিন্তু তার তরবারি আবু দুজানার ঢালে আটকে যায়। এবার আবু দুজানা তাকে পালটা আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।[১]

আবু দুজানার আত্মবিশ্বাস ও মনোবল আরও বেড়ে যায়। তিনি শত্রুবাহিনীর নিরাপত্তা-

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯

ব্যূহ ভেদ করে তাদের মূলকেন্দ্রে পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন, এক লোক খুব জোশের সাথে মুশরিক বাহিনীকে উত্তেজিত করছে; যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছে তাদের মধ্যে। আবু দুজানা বলেন, সংগত কারণেই সেখানে গিয়ে আমি প্রথমে তাকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করি। আপন নিশানার মধ্যে নিয়ে নিই। তরবারি উঁচিয়ে তার দিকে ধেয়ে যাই। অমনি সে চেঁচিয়ে ওঠে। তখন বুঝতে পারি, সে একজন নারী। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত গুটিয়ে নিই। কারণ আমি চাইনি নবিজির দেওয়া তরবারিটি কোনো নারীর রক্তে কলুষিত হোক।

মহিলাটি ছিল হিন্দা বিনতু উতবা। যুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেন, আবু দুজানাকে দেখলাম, তিনি হিন্দা বিনতু উতবার মাথার সিঁথি বরাবর তরবারি উঁচু করে ধরে আছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কী ভেবে যেন সরিয়ে নিচ্ছেন। এসব দেখে মনে মনে বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবকিছু ভালো বোঝেন।'[১]

এদিকে হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব উন্মত্ত সিংহের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। মুহূর্তেই শত্রু-ব্যূহ ভেদ করে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় অংশে। তরবারির উপর্যুপরি আঘাতে ঝড়ের মতো ময়দান পরিষ্কার করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মুশরিকদের পতাকা বহনকারীদের নিশানা বানানোর পাশাপাশি শত্রুপক্ষের বীরযোদ্ধাদেরও বিনাশ করতে থাকেন সমান তালে। শহিদ হওয়ার আগপর্যন্ত একইভাবে লড়ে গেছেন সামনের কাতারে থেকে। মুহূর্তের জন্যও ছেদ পড়েনি তার চলার ছন্দে।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের একমাত্র লক্ষ্য থাকে বিজয় অথবা সম্মুখ যুদ্ধে তারই মতো আরেক বীরের হাতে মৃত্যু। হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু আফসোস! তার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। শত্রুরা তাকে সম্মুখ যুদ্ধে কাবু করতে না পেরে, পেছন থেকে আঘাত করে এবং সে আঘাতেই তার মৃত্যু হয়।

ইসলামের বীরসৈনিক হামযার শাহাদাতবরণ

ওয়াহশি ইবনু হারব তার গুপ্তহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি ছিলাম যুবাইর ইবনু মুতইমের গোলাম। তার চাচা তুআইমা ইবনু আদি বদর যুদ্ধে নিহত হয়। সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতেই আমার মনিবের গোত্র উহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়। কৃতজ্ঞ গোলাম হিসেবে আমারও একবার ইচ্ছে করে তাদের সঙ্গে যেতে। এমন সময় যুবাইর ইবনু মুতইম আমাকে কাছে ডেকে বলেন, 'তুমি যদি আমার চাচার বদলে মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পারো, তবে তুমি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত।'

স্বাধীন জীবনের হাতছানি আমাকে ঘরে বসে থাকতে দেয় না। কুরাইশ বাহিনীর সাথে

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯

আমিও চলে আসি উহুদের ময়দানে। আমি জাতে হাবশি গোলাম। আমরা ছিলাম স্বভাবতই বর্শা চালনায় সিদ্ধহস্ত। আমাদের নিক্ষিপ্ত বর্শা খুব কমই লক্ষ্যচ্যুত হতো। সেদিন আমার হাতেও ছিল একটি বর্শা।

যুদ্ধ শুরু হলে আমি স্রোতের বাইরে থেকে হামযাকে খুঁজতে থাকি। সহসা ভিড়ের ভেতর আমার চোখদুটো তাকে খুঁজে পায়। তাকে তখন রীতিমতো উন্মত্ত উটের মতো দেখাচ্ছিল। ভয়ে কেউ তার সামনে যাওয়ার সাহস করছিল না। সে সবাইকে বিনাশ করে অদম্য গতিতে সামনে এগুচ্ছিল। একমুহূর্তও তার সামনে কেউ টিকতে পারছিল না। কিন্তু সেসবে আমার কোনো বিকার ছিল না। কারণ সম্মুখ সমরে তাকে ঘায়েল করার চিন্তা আমার কখনোই ছিল না। আমি ছিলাম সুযোগের সন্ধানে। কোনো একটা গাছ বা পাথরের আড়ালে। সে এক-একজনকে হত্যা করে ধীরে ধীরে আমার নিশানার ভেতর চলে আসছিল। এমন সময় হুট করে কোত্থেকে যেন সিবা ইবনু আব্দিল উযযা তার দিকে ধেয়ে আসে। সে তাকে দেখামাত্রই হুংকার ছেড়ে বলে, 'এই খতনাকারিণীর ছেলে,[১] এদিকে আয়!' এরপর সে সামনে এগুতেই তরবারির এক আঘাতে হামযা তার কল্লা উড়িয়ে দেয়।

আমি এ সময়টাকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে নিই। তার দিকে বর্শা তাক করে অপেক্ষা করতে থাকি। সে কাছাকাছি এলে তীব্র বেগে ছুড়ে মারি। সেই আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে, চোখের পলকে বর্শাটির মাথা তার পেটের একপাশ দিয়ে ঢুকে অপরপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় আঘাতও তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু দেহ তাকে সঙ্গ দিতে নারাজ। সেখানেই সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে তার দেহ।

সে মারা গেলে আমি বর্শাটা নিয়ে সোজা শিবিরে ফিরে আসি। এর বাইরে তার সাথে আমি আর কিছুই করিনি। এমনকি অন্য কারও সাথে যুদ্ধও করিনি। অবশ্য সে প্রয়োজনও ছিল না। কারণ আমাকে বলা হয়েছিল, তাকে হত্যা করতে পারলেই আমি স্বাধীন। তাই যুদ্ধশেষে মক্কায় ফিরে এলে মনিব তার কথা অনুযায়ী আমাকে মুক্ত করে দেয়।[২]

---

[১] তার মা ছিল মেয়েদের খতনাকারিণী। পরিবেশ ও খাদ্যাভ্যাসের কারণে আরবীয় মেয়েদের যোনিমুখ (Vagina) সাধারণত পুরু সতীপর্দায় ঢাকা থাকে। তাই সে সময় আরবের মেয়েদের খতনা (circumcision) করানো হতো। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২২]

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭২; *সহিহুল বুখারি* : ৪০৭২; ওয়াহশি রাযিয়াল্লাহু আনহু তায়েফ যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামাকে সেই বর্শা দিয়েই হত্যা করেন। এবং রোমকদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুক যুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শাহাদাত-বরণ করেন।

যুদ্ধক্ষেত্র যখন মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে

হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের মৃত্যুসংবাদ ছিল মুসলিমদের জন্য বিরাট এক ধাক্কা। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে সে ধাক্কা তারা সামলে ওঠে এবং যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে সক্ষম হয়। আবু বকর, উমার ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনু আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, মুসআব ইবনু উমাইর, তালহা ইবনু উবাইদিল্লা, আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ, সাদ ইবনু মুআজ, সাদ ইবনু উবাদা, সাদ ইবনুর রবি, আনাস ইবনুন নজর এবং অন্যান্য সাহাবি অসামান্য বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করে যান শেষ পর্যন্ত। তাদের এই অবিচলতা মুশরিকদের মনোবল ভেঙে দেয়। তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। নির্লিপ্ত একটা ভাব জেঁকে বসে সবার চেহারায়।

ফুলশয্যা থেকে সোজা জিহাদের ময়দানে

উহুদ যুদ্ধের সাহসী সৈনিকদের মধ্যে একজন ছিলেন হানযালা আল-গাসিল। তার পুরো নাম হানযালা ইবনু আবি আমির। তার পিতা আবু আমির হচ্ছে সেই খ্রিস্টান পাদরি, যে মুসলিমদের কাছে 'ফাসিক' নামে পরিচিত।

উহুদ যুদ্ধের দামামা যখন বেজে ওঠে, হানযালা তখন বাসরঘরের ফুলশয্যায় শায়িত। পাশে তার প্রিয়তমা স্ত্রী। যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা শোনামাত্রই তিনি স্ত্রীর আলিঙ্গান থেকে বের হয়ে আসেন। গোসল করারও সুযোগ হয়নি তার। বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়েন জিহাদের ময়দানে। মুহূর্তের মাঝে মুশরিক বাহিনীর সৈন্যসমাবেশ ছিন্নভিন্ন করে পৌঁছে যান দলনেতা আবু সুফিয়ানের কাছে। দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে তাকে আঘাত করতে যাবেন, আর ঠিক তখনই শাদ্দাদ ইবনু আউস আকস্মিক তরবারি চালিয়ে দেয় হানযালার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। ইসলামের জন্য এভাবেই নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন এই বীর সৈনিক।

তিরন্দাজ বাহিনীর দুর্দান্ত ভূমিকা

এ যুদ্ধে রুমাত পাহাড়ে[১] নিয়োজিত তিরন্দাজ বাহিনীর ভূমিকাও ছিল অবিস্মরণীয়। তারা যুদ্ধের পাল্লা মুসলিমদের অনুকূলে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। আবু আমির ফাসিকের সহযোগিতায় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সে পর্বতের গিরিপথ ধরে তিন-তিনবার আক্রমণের চেষ্টা করে। তাদের এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের বামবাহু ভেঙে

---

[১] রুমাত (رُمَاة) শব্দটি রামি (رَامِي)-এর বহুবচন। অর্থ—তির নিক্ষেপকারী। উহুদ যুদ্ধে নবিজি এই পাহাড়ে ৫০ জন তিরন্দাজ নিযুক্ত করেন। এ কারণেই এই পাহাড়কে 'জাবালু রুমাত' বা তির-নিক্ষেপকারীদের পাহাড় বলা হয়। [*আল-মাসাজিদু ওয়াল আমাকিনুল আসারিয়া,* আব্দুল্লাহিল ইউসুফ, পৃষ্ঠা : ২১; দারুল মুআররিখিল আরাবি, ১৪১৬ হিজরি, লেবানন]

দিয়ে পেছন দিক থেকে মূল বাহিনীর ওপর আঘাত হানা এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে বিশৃঙ্খল একটি অবস্থা তৈরি করা। এ লক্ষ্যে তারা উপর্যুপরি আক্রমণও করে তিরন্দাজ বাহিনীর ওপর। কিন্তু নবিজির বাছাই করা দক্ষ তিরন্দাজরা প্রতিবারই তিরের নিশানা বানিয়ে ফেরত পাঠায় তাদের।[১]

প্রাণভয়ে পালাচ্ছে মুশরিক সৈন্যদল

যুদ্ধের চাকা অনবরত ঘুরছে। একবার মুসলিমদের পাল্লা ভারী তো আরেকবার মুশরিকদের। নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে স্থির নয়। তবে সার্বিক বিচারে যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ এখন মুসলিম বাহিনীর হাতে। তাদের তির-তরবারি ও বর্শার উপর্যুপরি আঘাতে মুশরিক যোদ্ধারা একদম দিশেহারা। মুশরিকদের সাজানো-গোছানো সৈন্যসারিগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, ৭০০ নয়; বরং ২৭ হাজার মুসলিম যোদ্ধা হামলে পড়ছে তাদের ওপর। তাই ইঁদুরের মতো পড়িমরি করে তারা ছুটে পালাচ্ছে রণাঙ্গন থেকে। অথচ বাস্তবে সেদিন তাদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজারেরও বেশি। অপরদিকে মুসলিমরা সংখ্যায় মাত্র ৭০০ জন। সাথে তেমন কোনো যুদ্ধ-সরঞ্জামও নেই। কিন্তু আল্লাহর প্রতি এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের অটুট বিশ্বাস ও নিশ্চল নির্ভরতা শত্রুর দৃষ্টিতে তাদের সেই সংখ্যা চিত্রিত করেছিল হাজারে হাজারে।

কুরাইশরা সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামা সত্ত্বেও তেমন সুবিধা করতে পারেনি। মুসলিমদের পরাজয় নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, নিজেদের পিঠ সামলাতেই তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। তারা হারে হারে টের পায়, এবারও মুসলিমদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। অস্ত্রের যুদ্ধে তো বটেই, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেও তারা পিছিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে যুদ্ধস্পৃহা নিঃশেষ হয়ে আসে তাদের সৈন্যদের। সেইসাথে নিষ্প্রভ হতে থাকে যুদ্ধজয়ের মিটিমিটি আশটুকুও।

ফলে দেখা যায়, তাদের পতাকা-বাহক সাওয়াব নিহত হওয়ার পর তার হাতের পতাকাটি মাটিতেই পড়ে থাকে। কেউ আর তুলে নেওয়ার সাহস করে না। যে পতাকা ঘিরে যুদ্ধ হবে, তা-ই এখন ভূলুণ্ঠিত। কুরাইশরা স্পষ্টতই বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া শুধু বিপজ্জনকই নয়, অনেকটা আত্মঘাতীও। তাই দ্রুত তল্পিতল্পা গুছিয়ে পালানোর পথ খোঁজে তারা। মুহূর্তেই দপ করে নিভে যায় তাদের অন্তরে পুষে রাখা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার আগুন। ফিকে হয়ে আসে তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন ও প্রত্যয়।

ইবনু ইসহাক বলেন, 'উহুদ-প্রান্তরে আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করেছেন। তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। মুসলিম সৈনিকরা তরবারির আঘাতে আঘাতে মুশরিকদের

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৬

জাহান্নামে পাঠিয়েছে। বাকিরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। নিঃসন্দেহে এটা ছিল তাদের চরম পরাজয়।’

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ‘আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি, হিন্দা বিনতু উতবা ও তার বান্ধবীরা কাপড় উঁচু করে ছুটে পালাচ্ছে। পালানোর সময় তাদের অবস্থা এতটাই বেগতিক ছিল যে, তাদের পায়ের গোছা দেখা যাচ্ছিল। আমরা তখন চাইলেই তাদের বন্দি করতে পারতাম।’[১]

বারা ইবনু আযিব বলেন, ‘যুদ্ধের একপর্যায়ে মুশরিকদের মধ্যে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়। নারীরা পর্যন্ত পায়ের কাপড় গুটিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে পাহাড়ের দিকে। তাদের পায়ের মল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল তখন।’[২]

মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করে। হাতের নাগালে যাকেই পাচ্ছে, নিমেষের ভেতর পরপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ এত বেশি ছিল যে, মক্কা থেকে বয়ে আনা সমস্ত রসদ ফেলে যায় তারা। কেবল জানটা ছাড়া সঙ্গে করে আর কিছুই নিতে পারে না। মুসলিমরা তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ সংগ্রহের কাজে।

তিরন্দাজ বাহিনীর সর্বনাশা ভুল

আমরা আগেই বলেছি, এই যুদ্ধে তিরন্দাজ বাহিনীর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। তারা বারবার তির ছুড়ে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছেন গিরিমুখ থেকে। যুদ্ধের শুরু থেকে চরম মুহূর্ত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন তাদের দায়িত্ব। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মূল বাহিনীর আশাতীত বিজয়ে তারা কর্তব্য-বিস্মৃত হয়ে পড়েন; ভূলে যান পাহাড়ে অবস্থানের ব্যাপারে নবিজির কঠোর নির্দেশের কথা। অল্প কয়েকজন ছাড়া বাকিরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে আসেন গনিমত কুড়াতে। তাদের এই ভুলের কারণে মুহূর্তেই যুদ্ধের চিত্র পালটে যায়। মুসলিম বাহিনী অপূরণীয় এক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। স্বয়ং নবিজিও শহিদ হতে হতে বেঁচে যান কোনোরকমে! বদর যুদ্ধ মুশরিকদের হৃদয়ে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল, সেটাও কেটে যায় অনেকখানি।

মূলত তিরন্দাজ বাহিনী পাহাড় থেকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, রণাঙ্গনে তাদের সহযোদ্ধারা বিজয় নিশ্চিত করে ফেলেছেন। সবাই গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত। এ অবস্থা দেখে তাদের কয়েকজন বলে ওঠেন, ‘চলো আমরাও যাই। আমরা তো যুদ্ধে জিতেই গিয়েছি। তাই এখানে আর কীসের অপেক্ষা?’ সেনানায়ক আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৪৩

তাদের থামানোর চেষ্টা করেন এবং বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের কথা কি ভুলে গেছ তোমরা? তার সতর্কবাণীগুলো কি মনে নেই তোমাদের?' কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সৈনিকদের বড় একটি অংশ তার কথা বিন্দুমাত্র আমলে নেয় না। তারা উত্তর দেয়, 'বিজয় নিশ্চিত জেনেও এখানে বসে থাকার কী মানে? সবাই এখন গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত। আমরা কেন এমনি এমনি বসে থাকব?'[১]

এ কথা বলে ৪০ জন তিরন্দাজ পাহাড় ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসেন। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর মাত্র ৯ জন সৈন্য নিয়ে থেকে যান পাহাড়-চূড়ায়। অটল থাকেন তার দায়িত্ব পালনে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, নবিজির পক্ষ থেকে ঘোষণা না আসা পর্যন্ত এখানেই তিনি অবস্থান করবেন। এতে যদি তার প্রাণ চলে যায় যাক। তবু এ জায়গা থেকে একচুলও নড়বেন না।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সুযোগসন্ধানী দৃষ্টি

সবাই গনিমত সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত। পাহাড়ে কী হচ্ছে—সেদিকে নজর নেই কারও। জয়ের আনন্দে নির্ভার সবাই। মাত্র ১০ জন সেনা অবস্থান করছেন এখন পাহাড়ে। সৈন্যবিহীন পাহাড়চূড়া দৃষ্টি এড়ায় না খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের। সে এই সুবর্ণ সুযোগটি লুফে নেয়। অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসে তিরন্দাজ বাহিনীর দিকে। তাদের আকস্মিক হামলায় দিশেহারা হয়ে পড়েন আব্দুল্লাহ ইবনু জুবাইর ও তার সহযোদ্ধারা। মুহূর্তেই নিজেদেরকে সামলে নিয়ে প্রাণপণে লড়ে যান তাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ১০ জন সৈন্য আর কীই-বা করতে পারে? একে একে তারা সবাই শহিদ হয়ে যান।

পাহাড়চূড়া দখলে নিয়ে খালিদ সন্তর্পণে নেমে আসে যুদ্ধক্ষেত্রে। পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে মুসলিম বাহিনীর ওপর। খালিদের সহযোদ্ধারা চিৎকার করে তাদের উপস্থিতি জানান দেয়। মুহূর্তেই সে আওয়াজ বাতাসের গতিতে পৌঁছে যায় পরাজিত মুশরিকদের কানে। সবাই তখন নতুন উদ্যমে ফিরে আসে যুদ্ধের ময়দানে। মুসলিমরা কিছু বোঝার আগেই তাদের ওপর মুহুর্মুহু আক্রমণ শুরু হয়ে যায় চতুর্দিক থেকে। এরই মধ্যে আমরা বিনতু আলকামা নামের এক কুরাইশ নারী মাটিতে পড়ে থাকা পতাকাটি তুলে ধরে। অমনি পতাকাকে কেন্দ্র করে জমা হতে শুরু করে বিক্ষিপ্ত মুশরিক যোদ্ধারা। পলায়নরত সৈন্যরাও এসে যোগ দেয় তাদের সাথে। চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে অপ্রস্তুত মুসলিমদেরকে। মুসলিমরা পড়ে যায় মহাবিপাকে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩০৩৯; বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা।

শত্রু সেনাদের মাঝে নবিজির অসীম সাহসিকতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ৯ সদস্যের ক্ষুদ্র একটি দল[১] নিয়ে মুসলিম বাহিনীর পেছনে অবস্থান করছিলেন।[২] তার দৃষ্টি ছিল পলায়নরত মুশরিক বাহিনী এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম সেনাদের দিকে। ঠিক এমন সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে অশ্বারোহীদের আক্রমণে উলটে যায় পাশার দান।

নবিজির সামনে এখন দুটি পথ খোলা। হয় শত্রু-পরিবেষ্টিত সৈন্যদেরকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে পড়বেন। আর নয়তো নিজের সমূহ বিপদ জেনেও সহযোদ্ধাদের ডেকে জড়ো করবেন, তাদের নিয়ে নতুন করে প্রতিরক্ষা-বাহিনী গঠন করবেন এবং অবরুদ্ধ সৈন্যদের মুক্ত করে উহুদ পাহাড়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।

এই চরম সংকটের মধ্যেও নবিজি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন। তৎক্ষণাৎ করণীয় স্থির করে ফেলেন। উদাত্ত কণ্ঠে মুসলিম যোদ্ধাদের আহ্বান করেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা! আমার কাছে চলে আসো। নতুন করে আবার প্রতিরোধ গড়ে তোলো।' তিনি জানতেন, তার এই আহ্বান মুসলিমদের আগে মুশরিকদের কানে যাবে এবং মুহূর্তেই তিনি পরিণত হবেন শত্রুদের নিশানায়। হলোও ঠিক তা-ই। মুশরিকরা তার আওয়াজ অনুসরণ করে উন্মত্ত হাতির মতো ছুটে আসে এবং নবিজিকে নিয়ে আসে তাদের নিশানার ভেতর।

খালিদের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর একাংশ রীতিমতো দিকশূন্য হয়ে পড়ে। জানটা হাতে নিয়ে কোনোরকমে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে বাঁচে। তারা এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে যে, পেছনে কী ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে—সেদিকে দৃষ্টি ফেরানোরও অবসর পায় না। এদের অনেকে একছুটে চলে আসে মদিনায়। আরেকাংশ আশ্রয় নেয় পাহাড়-চূড়ায়। যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে যায় কেবল এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এবং শত্রু-পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধা। কিন্তু নবিজির আহ্বানে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে তাদের অনেকেই মুশরিকদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। পরিস্থিতির চাপে মুসলিমরা নিজেদেরকেও চিনতে পারে না। এতে খুবই ভয়াবহ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মিত্রকে শত্রু মনে করে নিজেদের হাতেই নিজেরা নিহত হতে থাকে। আবার শত্রুকে মিত্র মনে করায় তরবারির অগ্রভাগ থেকে তারা রেহাই পেয়ে

---

[১] সে সময় নবিজির সাথে আনসারদের মধ্য থেকে ৭ জন আর মুহাজিরদের মধ্য থেকে ২ জন সাহাবি ছিলেন। [*সহিহ মুসলিম* : ১৭৮৯]

[২] 'নবি তোমাদের পেছন থেকে ডাকছিলেন।' (সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৫৩)—এই আয়াত উপরিউক্ত কথাটির সত্যায়ন করে।

যায় অনায়াসে।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে মুশরিকরা চরমভাবে পরাস্ত হয়। ইবলিস তখন মানুষের রূপ ধরে তাদের ডেকে বলে, 'হে আল্লাহর বান্দারা! পেছনে ফিরে দেখো। ঘুরে দাঁড়াও।' অমনি সামনের সারির লোকেরা পেছনে ফিরে আসে। এদিকে পেছনের সারির লোকেরাও সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এতে মুসলিমরা পড়ে যায় দুর্বিপাকে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে সবাই। তখন হুজাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু দেখেন, তার বাবা ইয়ামান তারই সহযোদ্ধাদের তরবারির নিচে। তিনি সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার করে ওঠেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা! থামো থামো! উনি আমার বাবা। তোমাদের সহযোদ্ধা।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! মুহূর্তেই তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। আসলে পরিস্থিতি অনেক সময় মানুষকে শান্ত-সমাহিত থাকতে দেয় না। তখনকার পরিস্থিতিও ঠিক সেরকমই ছিল। হুজাইফা বলেন, 'যাক, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।' উরওয়া বলেন, 'আল্লাহর কসম! হুজাইফা আমৃত্যু কল্যাণের মধ্যেই ছিলেন।'[১]

মোটকথা, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তখন চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অনেকেই ভেবে পাচ্ছিলেন না—কী করবেন, কোন দিকে যাবেন। এরই মধ্যে দূর থেকে ভেসে আসে—মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে যেটুকু হুঁশজ্ঞান বাকি ছিল, এ সংবাদে তাও উবে যায়। মনোবল ও দৈহিক শক্তি হারিয়ে তারা নিথর হয়ে পড়েন। হাতের অস্ত্র ছুড়ে ফেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে থাকেন অনেকে। উঠে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছেন তারা। কেউ কেউ তো মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মধ্যস্থতায় আবু সুফিয়ানের কাছে নিরাপত্তা চাওয়ার কথাও ভাবেন।

এমন সময় আনাস ইবনুন নজর তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন, তারা সবাই হাত-পা ছেড়ে নির্বিকার বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কীসের অপেক্ষায় বসে আছ? তারা উত্তর দেয়, 'নবিজি নিহত হয়েছেন। এখন আর যুদ্ধ করে কী হবে?' তিনি বলেন, 'নবিজির মৃত্যুর পর বেঁচে থেকে আর কী করবে? ওঠো, রুখে দাঁড়াও! নবিজি যে কাজে প্রাণ দিয়েছেন, তোমরাও তাতে উৎসর্গ করো তোমাদের প্রাণ। তবেই না তোমরা তার যোগ্য অনুসারী।' এ কথা বলে তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং স্বগতোক্তির মতো করে বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ, আমি এই নির্বিকার মুসলিমদের থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। সেইসাথে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি মুশরিকদের কর্মকাণ্ড থেকেও।'

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৯০, ৩৮২৪, ৪০৬৫, ৬৮৯০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৫১, ৩৬২ ও ৩৬৩; ইমাম বুখারি ছাড়া অন্যান্য শাইখ বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাবার রক্তপণ দিতে চেয়েছিলেন। হুজাইফা তখন বলেছিলেন, আমি তার রক্তপণ মুসলিমদের জন্য সাদাকা করে দিলাম। এর দ্বারা নবিজির কাছে হুজাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। [*মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৪৬]

কিছুদূর অগ্রসর হলে, সাদ ইবনু মুআজের সাথে তার দেখা হয়। সাদ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু উমার! কোথায় যাচ্ছ?' তিনি উত্তর দেন, 'সাদ! আমি উহুদের ওপার থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। সেখানেই যাচ্ছি।' এটুকু বলেই তিনি মুশরিক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে একসময় ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। যুদ্ধ শেষে কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। আর চিনবেই বা কীভাবে! তার ছোট্ট একটি শরীরে তির-তরবারি ও বর্শা মিলিয়ে আশিটিরও বেশি আঘাত করা হয়েছিল। অবশেষে তার আঙুলের অগ্রভাগ দেখে তার বোন তাকে শনাক্ত করেন।[১]

সাবিত ইবনুদ দাহদা নামের এক সাহাবিও একইভাবে তার গোত্রের লোকদের হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন, 'ও আমার আনসার ভাইয়েরা, আল্লাহর রাসুল নিহত হলেই-বা সমস্যা কোথায়? আল্লাহ তো আছেন! তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর তো আর মৃত্যু নেই। তাই তোমরা তোমাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাও। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন, সাফল্য এনে দেবেন।' তার কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের বেশ কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়। আল্লাহর নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর। বেঁধে যায় তুমুল লড়াই। একসময় খালিদের বর্শার আঘাতে তিনি নিহত হন। তারপর এক-এক করে বাকি সঙ্গীরাও চুমুক দেয় শাহাদাতের পেয়ালায়।[২]

এক মুহাজির সাহাবি রক্তাক্ত এক আনসার সাহাবির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করেন, 'ও আল্লাহর বান্দা, নবিজি কি সত্যিই নিহত হয়েছেন?' উত্তরে আনসার সাহাবি বলেন, 'তিনি নিহত হলেই-বা কী? তিনি তো তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। এখন এই দ্বীন রক্ষা করার দায়িত্ব তোমাদের। তাই তোমরা তোমাদের দ্বীন রক্ষায় যুদ্ধ করো।'[৩]

সহযোদ্ধাদের এমন উদ্দীপনামূলক ও সাহস-জাগানিয়া বক্তব্যে মুসলিম সৈনিকদের চৈতন্য ফিরে আসে। তাদের মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সেইসাথে দূর হয়ে যায় তাদের আত্মসমর্পণের চিন্তা। কেটে যায় মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মধ্যস্থতায় নিরাপত্তা লাভের ভাবনাও। তারা পুনরায় অস্ত্রধারণ করে। মুশরিকদের বেষ্টনী ভাঙার অভিপ্রায়ে শক্ত হাতে সবাই হামলা করে। আপাতত তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, শত্রুর বেষ্টনী ভেঙে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব-কেন্দ্রে পৌঁছার পথ তৈরি করা। এরই মধ্যে তারা জানতে পারে, নবিজি নিহত হননি। তার মৃত্যুর খবর ছিল শত্রুর ছড়ানো গুজব। এই সংবাদে মুসলিম সৈনিকদের শক্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সবার মধ্যে নতুন উদ্যম ও অদম্য

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৩ ও ৯৬; *সহিহুল বুখারি* : ২৮০৫, ৪০৪৮

[২] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২

[৩] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৬

মনোবল ফিরে আসে। খানিক বাদেই তারা শত্রুব্যূহ ভেদ করে মূলকেন্দ্রে একত্র হয়।

মুসলিম বাহিনীর আরেকটি দল ছিল নবিজির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। যুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তার কাছে চলে আসেন। তাকে ঘিরে তৈরি করেন শক্ত এক নিরাপত্তা-বলয়। তাদের পুরোভাগে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক, উমার ইবনুল খাত্তাব এবং আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুম-সহ আরও অনেকে। তারা আক্রমণাত্মক যুদ্ধে যেমন সবার আগে ছিলেন, তেমনি নবিজির নিরাপত্তা রক্ষায়ও ছিলেন অগ্রগামী।

নবিজিকে বাঁচাতে সাহাবিদের প্রাণপণ লড়াই

মুসলিম বাহিনী যখন মুশরিকদের দুই দলের জাঁতায় পিষ্ট, তখন নবিজিকে ঘিরেও চলছে তুমুল লড়াই। এরই মধ্যে তিনি মুসলিম সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেন, 'এসো আমার দিকে! আমিই আল্লাহর রাসুল।' কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! মুসলিমদের আগেই তার এ ঘোষণা পৌঁছে যায় মুশরিকদের কানে। তারা সে আওয়াজের উৎস সন্ধান করে নবিজির অবস্থানও শনাক্ত করে ফেলে মুহূর্তেই। এরপর তাকে নিশানা করে শুরু হয় তাদের মুহুর্মুহু আক্রমণ। নবিজির পাশে থাকা ৯ জন সাহাবি তখন বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান তার চারপাশে। মুশরিকদের সাথে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যান তারা। নবিজির প্রতি ভালোবাসা, আত্মোৎসর্গের প্রেরণা এবং অমিত তেজের বীরত্ব অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাদের তরবারির ছন্দে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'উহুদ যুদ্ধে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একপর্যায়ে ৯ জন সাহাবি নিয়ে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের ৭ জন ছিলেন আনসার এবং ২ জন ছিলেন মুহাজির। আক্রমণকারীরা তার একেবারে নিকটে পৌঁছে গেলে তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারলে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। অথবা তিনি বলেন, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।' তার ঘোষণা শেষ হতে না হতেই এক আনসার সাহাবি এগিয়ে আসেন। প্রাণপণে শত্রুদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। এতে তাদের গতি কমে আসে ঠিকই, তবে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শত্রুরা তখন আগের চেয়েও বেশি আক্রোশ নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। নবিজি আবারও আগের মতো পুরস্কার ঘোষণা করেন। এবারও এক সাহাবি প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাত-বরণ করেন। এভাবে একে একে ৭ জন আনসারই শহিদ হয়ে যান। এ দৃশ্য দেখে নবিজি অবশিষ্ট দুই মুহাজির সাহাবিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে ইনসাফ করিনি।'[১][২]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৫৯৭; *মুসনাদুল বাযযার* : ৭৪২২

[২] প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসটি مَا أَنْصَفْنَا অর্থাৎ আমরা ইনসাফ করিনি—শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তখন

এই ৭ জন সাহাবির মধ্যে সবার শেষে শহিদ হন উমারা ইবনু ইয়াযিদ ইবনি সাকান রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শত্রুদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তার ক্ষতবিক্ষত দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।[১]

শত্রুর আঘাতে মারাত্মক আহত নবিজি!

ইবনু সাকান মাটিতে লুটিয়ে পরার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ২ জন মুহাজির সাহাবি। আবু উসমান থেকে বর্ণিত, 'যুদ্ধের চরমতম সময়ে বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে যে, নবিজির সাথে তালহা ইবনু উবাইদিল্লা ও সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ছাড়া আর কেউই ছিলেন না।'[২] বলার অপেক্ষা রাখে না, এটাই ছিল নবি-জীবনের সবচেয়ে সংকটাপন্ন সময়; সেইসাথে মুশরিকদের সুবর্ণ সুযোগও। তারাও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করে না। একাধিকবার তার ওপর আক্রমণ করে। ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিতে চেস্টা করে তার নাম-নিশানা।

তারই অংশ হিসেবে উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস নবিজিকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারে। পাথরের আঘাতে প্রিয় নবিজি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। নিচের মাড়ির ডানদিকের রুবাঈ দাঁতটি[৩] ভেঙে যায়। কেটে যায় তার নিচের ঠোঁট। রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে তার মুখগহ্বর। এ সুযোগটি কাজে লাগায় অন্যান্য মুশরিক সৈন্যরাও। আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরি এগিয়ে এসে নবিজির কপাল বরাবর আঘাত করে।

আরেক নরাধম আব্দুল্লাহ ইবনু কামিয়া তরবারি চালায় তার কাঁধ বরাবর। এতে প্রচণ্ড আঘাত পান তিনি। সে আঘাতের ব্যথা বয়ে বেড়ান এক মাসেরও বেশি সময় ধরে। তবে গায়ে লৌহবর্ম থাকায় প্রাণে বেঁচে যান তিনি। শত্রুর তরবারি তার বর্ম ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এতেও দুর্বৃত্ত ইবনু কামিয়ার জিঘাংসা মেটে না। সে দ্বিতীয়বার তার

ইনসাফ না করার অর্থ হলো—দুই কুরাইশ মুহাজির সাহাবি আনসার সাহাবিদের সাথে ইনসাফ করেননি। এখন প্রশ্ন হতে পারে, নবিজিও কি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যারা ইনসাফ করেনি! কারণ তিনি নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আমরা ইনসাফ করিনি।' ইমাম নববি বলেন, নবিজি এখানে 'আমরা' বলে কুরাইশদের বুঝিয়েছেন। কারণ নবিজির প্রতিরক্ষায় মুহাজির সাহাবিদের চেয়ে আনসার সাহাবিরা ছিলেন সবার আগে এবং সকলেই শহিদ হন। [*শারহু মুসলিম*, ইমাম নববি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৪৭; দারু ইহইয়াইত তুরাস আল-আরাবিয়া, বৈরুত]

[১] কিছুক্ষণ পর সাহাবিদের একটি দল নবিজির কাছে এসে পৌঁছায়। উমারাকে তারা কাফিরদের হাত থেকে ছিনিয়ে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের পায়ের সাথে হেলান দিয়ে বসান। এর কিছুক্ষণ পরেই নবিজির পবিত্র কদমে চেহারা রেখে তিনি রবের ডাকে সাড়া দেন। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮১]

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৭২২, ৪০৬০

[৩] ছেদন দাঁতের পাশে অবস্থিত কর্তন দাঁত। অর্থাৎ নবিজির নিচের চোয়ালের চোখা দাঁতটির বাম পাশের দাঁত।

গণ্ডদেশে সজোরে আঘাত করে। এবার শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ভেঙে তার গালে বিঁধে যায়। বদমাশটা তখন বলে ওঠে, 'এই নাও তোমার উপহার! আর মনে রেখো, আমিই ইবনু কামিয়া।' নবিজি তার চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, 'আল্লাহ তোকে টুকরো টুকরো করুন।'[১]

উহুদের ময়দানে নবিজির রুবাঈ দাঁত ভেঙে যায়; মাথায়ও আঘাত লাগে। সে সময় তিনি চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, 'এমন জাতি কীভাবে সফল হতে পারে, যাদেরকে আল্লাহর রাসুল কল্যাণের দিকে আহ্বান করেন, কিন্তু তারা সেই আহ্বানে সাড়া তো দেয়ই না উলটো তার মুখমণ্ডলে আঘাত করে তার রুবাঈ দাঁতটি ভেঙে ফেলে!' নবিজির এমন কথা শুনে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

এ ব্যাপারে আপনার কোনো করণীয় নেই। হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আজাব দেবেন। কারণ তারা জালিম।[২]

তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'ওই জাতির ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসুক, যারা তাদের নবির মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে।' কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বলেন, 'হে আল্লাহ, আমার কওমকে ক্ষমা করুন। তারা বড্ড অবুঝ!'[৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবিজি বলেছিলেন, 'হে আমার রব, আমার গোত্রকে ক্ষমা করে দিন। তারা মোটেও বোঝে না!'[৪]

কাজি ইয়াজের বর্ণনামতে, সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমার কওমকে

---

[১] আল্লাহ তাঁর রাসুলের দুআ কবুল করেছেন। ইবনু আইয থেকে বর্ণিত, ইবনু কামিয়া যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফেরার পর হারিয়ে যাওয়া বকরি খুঁজতে বের হয়। বকরিগুলোকে পর্বতচূড়ায় দেখতে পেয়ে সেখানে উঠে যায় সে। এরই মধ্যে এক পাহাড়ি বকরি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিং দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে তাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। এতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭৩] তাবারানির বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর পাহাড়ি ছাগল চাপিয়ে দেন। যা শিং দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬৬]

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১২৮; *সহিহুল বুখারির* ৪০৬৯ নং হাদিসের ভূমিকা, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৯৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯১

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭৩

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯২৯; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯২

হিদায়াত দিন। তারা বড্ড অবুঝ!'[১]

সন্দেহ নেই, মুশরিকরা সেদিন নবিজিকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তবে দুই মুহাজির সাহাবি—সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ও তালহা ইবনু উবাইদিল্লা তাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ, অসাধারণ বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতার দ্বারা শত্রুদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তারা দুজনই ছিলেন আরবের সুদক্ষ তিরন্দাজ। তির ছুড়ে তারা শত্রুদেরকে নবিজির থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের অব্যর্থ নিশানায় মুগ্ধ হয়ে নবিজি তাকে নিজের তূণীর থেকে তির বের করে দেন এবং বলেন, তির ছুড়তে থাকো, তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক।'[২] সাদের নৈপুণ্য উপলব্ধি করার জন্য এই তথ্যটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি ছাড়া আর কারও ব্যাপারে নবিজি এমন কথা বলেননি।[৩]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে তালহা ইবনু উবাইদিল্লার বীরত্বের কথাও বর্ণিত হয়েছে *সুনানুন নাসায়ির* একটি হাদিসে। সে হাদিসে তিনি নবিজির ওপর কাফিরদের ওই সময়ের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন, যখন তার পাশে ছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন সাহাবি। জাবির বলেন, মুশরিকরা আল্লাহর রাসুলকে ঘেরাও করে ফেললে তিনি বলেন, 'এদেরকে প্রতিহত করার মতো কেউ কি আছ?' তখন তালহা বলেন, আমি আছি। তারপর জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর প্রতিরোধে আনসারদের অগ্রসর হওয়া এবং তাদের একের পর এক শহিদ হওয়ার কথা সবিস্তারে তুলে ধরেন—যেমনটি আমরা *সহিহ মুসলিমের* বরাতে বর্ণনা করে এসেছি।

জাবির বলেন, ৭ জন আনসারের সবাই শহিদ হয়ে গেলে তালহা প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসেন। তিনি একাই ১১ জনের সমান বীরত্ব দেখাতে শুরু করেন। একপর্যায়ে তার হাতে প্রতিপক্ষের তরবারির আঘাত লাগে। এতে তার কয়েকটি আঙুল কেটে যায়। ব্যথায় তিনি 'উফ' বলে ওঠেন। নবিজি তার আর্তনাদ শুনে মন্তব্য করেন, 'তুমি বিসমিল্লাহ বললে ফেরেশতারা তোমাকে মাথায় তুলে নিত। আর মানুষ তা নিজের চোখে দেখত।' জাবির বলেন, তারপর আল্লাহ মুশরিকদেরকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন।[৪]

ইমাম হাকিম রচিত ইকলিল গ্রন্থে এসেছে, উহুদের দিন তালহার শরীরে ৩৯টি মতান্তরে ৩৫টি আঘাত লাগে এবং তার শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল একেবারে অকেজো হয়ে যায়।[৫]

---

[১] *কিতাবুশ শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তফা,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮১

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৯০৫, ৪০৫৫, ৪০৫৯, ৬০৮৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৪১১, ২৪১২

[৩] প্রাগুক্ত

[৪] *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪৩৪২, ১০৩৮০; হাদিসটি হাসান।

[৫] প্রাগুক্ত

ইমাম বুখারি কাইস ইবনু আবি হাযিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি তালহার হাত অবশ হতে দেখেছি। উহুদ যুদ্ধে এ হাত দিয়েই তিনি নবিজিকে মুশরিকদের থেকে রক্ষা করেছেন।'[১]

ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের সেই সংকটময় মুহূর্তে নবিজি তালহার ব্যাপারে বলেন, 'কেউ যদি জীবন্ত কোনো শহিদ দেখতে চায়, তবে যেন সে তালহা ইবনু উবাইদিল্লাকে দেখে।'[২]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ এলেই আমার বাবা বলে উঠতেন, এ যুদ্ধে নবিজিকে নিরাপত্তা দেওয়ার একক কর্তৃত্ব ছিল তালহার।'[৩] তালহার নাম উল্লেখ করে বাবা আরও বলতেন, 'তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত। সেখানে থাকবে আয়তলোচনা হুর।'[৪]

এছাড়া সেই সংকটকালে আল্লাহ তাআলাও সাহায্য পাঠান। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদ যুদ্ধে আমি নবিজির পাশে সাদা পোশাক পরিহিত দুই যোদ্ধাকে দেখেছি। তারা নবিজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মুশরিকদের সাথে লড়াই করছিল। সেদিনের আগে ও পরে আর কখনোই আমি তাদের দেখিনি। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তারা দুজন ছিলেন জিবরিল ও মিকাইল।[৫]

নবিজির চারপাশে সাহাবিদের সুরক্ষা-বলয়

এই দুঃসহ ও দুঃখজনক ঘটনাগুলো চোখের পলকেই ঘটে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাছাই করা যেসকল সাহাবি শুরু থেকেই সম্মুখ সারিতে যুদ্ধ করছিলেন, যুদ্ধের চিত্র পরিবর্তন ও নবিজির আহ্বান শোনামাত্রই তারা দ্রুত ছুটে আসেন তার কাছে। কিন্তু অঘটনগুলো এত দ্রুত ঘটে যায় যে, তারা আসার আগেই নবিজি মারাত্মকভাবে আহত হন। ৬ জন আনসার সাহাবি শহিদ হন। সপ্তম জন আহত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তখনো। সাদ ও তালহা বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন। শত্রুদের প্রতিহত করছেন। নবাগতরা যুক্ত হন তাদের সাথে। যূথবদ্ধ সুরক্ষা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যান নবিজির চারপাশে। সবাই মিলে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। বুখে দাঁড়ান

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৭২৪, ৪০৬৩

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৭৩৯, *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৬১২২; হাদিসটি সহিহ; আরও দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬।

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬১

[৪] *মুখতাসারু তারিখি দিমাশক*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮২; *শারহু শুযুরিয যাহাবের* টীকা দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা : ১১৪

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৫৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৩০৬

তাদের বিরুদ্ধে। এ সময় সবার আগে নবিজির কাছে ছুটে আসেন আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সবাই গনিমত কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নবিজি তখন অল্প কয়েকজন সাহাবিকে সাথে নিয়ে পেছনে অবস্থান করছিলেন। এরই মধ্যে খালিদের বাহিনী পেছন থেকে আক্রমণ করে। পলায়নরত মুশরিকরা সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়ায়। এতে অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনী তাদের বেষ্টনীতে আটকা পড়ে যায়। সেই ঘেরাও ভেদ করে আমিই সবার আগে তার কাছে ফিরে আসি। এসে দেখি, এক লোক আল্লাহর রাসুলকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছে। মনে মনে বলতে থাকি, 'তুমি তালহাই হবে। তোমার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক!' সামান্য অগ্রসর হলে, আবু উবাইদা ইবনুল জাররা আমার কাছে এসে পৌঁছে। সে এমনভাবে দৌড়াচ্ছিল যেন পাখি উড়ছে। আমরা দুজন নবিজির কাছে ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, তালহা মাটিতে পড়ে আছে। নবিজি আমাদেরকে বলেন, তোমাদের ভাইয়ের যত্ন নাও। সে ইতোমধ্যেই নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।

আবু বকর আরও বলেন, নবিজির দিকে তাকিয়ে দেখি তার চেহারা ক্ষতবিক্ষত। শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে আছে তার গালে। আমি কড়া দুটি বের করতে গেলে আবু উবাইদা বাধা দেয়। বলে, 'আল্লাহর দোহাই, এটা আমাকে বের করতে দিন।' আমি তাকে সুযোগ দিই। সে সামনে এগিয়ে আসে। একটি কড়ায় কামড় দিয়ে ধীরে-সুস্থে টেনে তোলার চেষ্টা করে। নবিজির যেন কষ্ট না হয় সেদিকেও থাকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত সে কড়াটি বের করে আনে। কিন্তু তার নিচের একটি দাঁত ভেঙে যায়। দ্বিতীয় কড়াটি আমি বের করতে চাইলে, সে এবারও বাদ সাধে। বলে, 'আবু বকর! আল্লাহর দোহাই, এটাও আমাকেই বের করতে দিন।' সে এটিও ধীরে-সুস্থে টেনে বের করে। এবারও তার নিচের পাটির আরেকটি দাঁত ভেঙে যায়। কড়া বের করা শেষ হলে, আল্লাহর রাসুল বলেন, 'তোমাদের ভাই তালহার সেবা করো। সে ইতোমধ্যেই নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।' আবু বকর বলেন, 'আমরা তালহার সেবা শুরু করলে, দেখতে পাই, তার দেহে ১০টিরও বেশি তরবারির আঘাত।'[১]

তালহা সেদিন নবিজিকে রক্ষায় কতটা বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, আঘাতের এই পরিসংখ্যান থেকে তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়।

ততক্ষণে সাহাবিদের আরও একটি দল নবিজির কাছে এসে পৌঁছে। তারা হলেন আবু দুজানা, আবু মুসআব ইবনু উমাইর, আলি ইবনু আবি তালিব, সাহল ইবনু হুনাইফ, মালিক

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৫

ইবনু সিনান, উম্মু আম্মারা নাসিবা বিনতু কাব আল-মাযানিয়া, কাতাদা ইবনু নুমান, উমার ইবনুল খাত্তাব, হাতিব ইবনু আবি বালতাআ এবং আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

মুশরিকদের চাপ সৃষ্টি

যুদ্ধক্ষেত্রে মুশরিকদের সংখ্যাও ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেইসাথে বাড়তে থাকে তাদের আক্রমণের তীব্রতাও। বদরের প্রতিশোধ-স্পৃহা জেগে ওঠে সবার মধ্যে। মুসলিমদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এক পর্যায়ে নবিজি গর্তে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে ব্যথা পান। মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের জন্য আবু আমির আল-ফাসিক বেশ কয়েকটি গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল উহুদের প্রান্তরজুড়ে। এ গর্তটি সেসবেরই একটি। নবিজি পড়ে গেলে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু তার হাত ধরেন। তালহা ইবনু উবাইদিল্লা বুকে জড়িয়ে তাকে ওপরে তোলেন। তাদের সাহায্যে নবিজি সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হন।

নাফি ইবনু যুবাইর বলেন, আমি একজন মুহাজিরকে বলতে শুনেছি, 'উহুদ যুদ্ধে আমি কাফিরদের পক্ষে ছিলাম। সেদিন দেখেছি, চতুর্দিক থেকে নবিজির ওপর তির নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তিনি সেই তিরবৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন সাহাবি পরিবেষ্টিত হয়ে। সাহাবিরা ছাতা হয়ে প্রতিহত করছেন সেই তিরবৃষ্টি। আরও দেখেছি, আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব যুহরি হাঁক দিচ্ছে, 'মুহাম্মাদ কোথায়? বলো, মুহাম্মাদ কোথায়! আজ হয় সে বাঁচবে, নয় আমি বাঁচব।' নবিজি তখন তার পাশেই ছিলেন। সম্পূর্ণ একা। কিন্তু সে দেখতে না পেয়ে তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। তখন সাফওয়ান তাকে তিরস্কার করে বলে, 'তুমি কি অন্ধ? মুহাম্মাদ তো তোমার পাশেই ছিল!' প্রতিউত্তরে সে বলে, 'কই, আমি তো দেখলাম না! আল্লাহর কসম! তাকে আমাদের থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে।' এরপর আমরা ৪ জন নবিজিকে হত্যার প্রতিজ্ঞা করে তার তালাশে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু আমরা তার কাছে ঘেঁষতেও ব্যর্থ হই।'[১]

যুদ্ধের ময়দানে সাহাবিদের অসীম বীরত্ব

উহুদ যুদ্ধের সেই নিদারুণ সংকটকালে মুসলিম সৈনিকগণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, ইতিহাসে যার জুড়ি মেলা ভার। সেদিন আবু তালহা নবিজির সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। তার ভালোবাসায় বুক পেতে দেন শত্রুর তিরের সামনে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সাধারণ সৈনিকরা যখন পরাজিত হয়, নবিজি তখন মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন। শত্রুর নিশানায় আবদ্ধ। এমন সময় আবু তালহা একটি ঢাল নিয়ে রক্ষাপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যান তার সামনে। তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ এক তিরন্দাজ। খুব কমই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো তার নিক্ষিপ্ত তির। সেদিন তার

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৭

হাতে ২-৩টি ধনুক ভাঙে। নবিজি তার পাশ দিয়ে কাউকে ধনুক নিয়ে যেতে দেখলে বলতেন, 'এটা তুমি আবু তালহাকে দিয়ে দাও।'

বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি মাঝেমধ্যে তিরবৃষ্টির ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতেন। আবু তালহা তখন বলতেন, 'আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক, দয়া করে এভাবে উঁকি দেবেন না; শত্রুর তির এসে আপনাকে আহত করতে পারে। আমার এ বুক আপনার সুরক্ষায় সদাপ্রস্তুত।'[১]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে, 'আবু তালহা একটি মাত্র ঢাল দিয়ে তার ও নবিজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিপুণ তিরন্দাজ। তিনি তির নিক্ষেপ করলে, নবিজি উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতেন, তিরটি কোথায় বিদ্ধ হচ্ছে!'[২]

এরই মধ্যে আবু দুজানা সেখানে এসে পৌঁছেন। তিনি নবিজির দিকে মুখ করে পিঠটাকে ঢাল হিসেবে পেতে দেন শত্রুর তিরের সামনে। একের পর এক তির এসে বিঁধতে থাকে তার পিঠে। তিনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকেন। একচুলও নড়েন না তার জায়গা থেকে।

এদিকে হাতিব ইবনু আবি বালতাআ উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাসের পিছু ধাওয়া করেন। তাকে বিশেষভাবে নিশানা করার কারণ এই হতভাগাটাই পাথরের আঘাতে নবিজির পবিত্র রুবাঈ দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। তাকে বাগে আনতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না হাতিবের। এক আঘাতেই তিনি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন তার মাথা। এরপর তার ঘোড়া ও তরবারি দখলে নেন। উতবা ছিল সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের আপন ভাই। সাদ চাইছিলেন নিজ হাতে তার ভাইকে হত্যা করবেন। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয়নি। কৃতিত্ব চলে যায় হাতিব ইবনু আবি বালতাআর ভাগে।

সাহল ইবনু হুনাইফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সাহসী যোদ্ধা। সুদক্ষ তিরন্দাজ। তিনি নবিজির হাতে হাত রেখে শাহাদাতের বাইআত নেন এবং অসীম বীরত্বের সাথে মুশরিকদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তির নিক্ষেপ করে শত্রুদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। কাতাদা ইবনু নুমান থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন নবিজি এত বেশি তির নিক্ষেপ করেন যে, তার ধনুকের এক কোনা ভেঙে যায়। যুদ্ধশেষে ওই ধনুকটি কাতাদা ইবনু নুমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়ে নেন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত ধনুকটি তার কাছেই ছিল। সেদিন কাতাদা চোখে আঘাত পান। আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, তার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসে। নবিজি তখন নিজ হাতে সেটি আগের জায়গায়

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮১১, ৪০৬৪

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৯০২; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৩৮৬৫

প্রতিস্থাপন করেন। এতে তার ওই চোখের সৌন্দর্য ও দৃষ্টিশক্তি অপর চোখের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যায়।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুও বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। শত্রুর একটি আঘাত এসে লাগে তার চেহারায়। এতে তার সামনের দাঁত ভেঙে যায়। এছাড়াও গোটা দেহে আঘাত পান বিশটিরও বেশি। পায়েও লাগে মারাত্মক আঘাত। বাকি জীবন তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়।

নবিজি চেহারায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে আবু সাইদ খুদরির পিতা মালিক ইবনু সিনান ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে পরিষ্কার করেন। এতে নবিজি কিছুটা সুস্থবোধ করেন। মালিক ইবনু সিনানকে বলেন, 'থু করে মুখের রক্ত ফেলে দাও।' তিনি উত্তর দেন, 'আল্লাহর কসম! আমি থুতু ফেলব না।' এ কথা বলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। নবিজি তখন মন্তব্য করেন, 'কেউ কোনো জান্নাতিকে দেখতে চাইলে, সে যেন মালিক ইবনু সিনানকে দেখে নেয়।' এই যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত-বরণ করেন।

উহুদের যুদ্ধে নারী সাহাবিদের ভূমিকাও ছিল অবিস্মরণীয়। উম্মু আম্মারা তাদেরই একজন। মুসলিম বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করে যান তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে। এ সময় দুর্ধর্ষ শত্রু ইবনু কামিয়া তার পথ আগলে দাঁড়ায়। সহসা তরবারি উঁচিয়ে সজোরে আঘাত হানে তার কাঁধ বরাবর। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তবে আঘাতের টাল সামলে রুখে দাঁড়াতে সময় লাগে না তার। তিনি তরবারি দিয়ে উপর্যুপরি প্রতিঘাত করেন ইবনু কামিয়ার ওপর। কিন্তু তার গায়ে একাধিক লোহবর্ম থাকায় সে যাত্রায় বেঁচে যায় সে। সেদিন উম্মু আম্মারার দেহে কম করে হলেও ১২টি আঘাত লেগেছিল।

মুসআব ইবনু উমাইর সেদিন বীরত্ব ও সাহসিকতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নবিজির ওপর ইবনু কামিয়া ও অন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেন তিনি। মুসলিম বাহিনীর পতাকাও সেদিন তারই হাতে ছিল। শত্রুরা তার ডান হাতে এমন আঘাত করে যে, মুহূর্তেই হাতটি দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁ হাতে পতাকাটি উঁচু করে ধরেন। কিন্তু নরাধমগুলো তার বাঁ হাতটিও কেটে দেয়। তখনো তিনি পতাকাটি আগলে রাখেন থুতনি ও বুকের সাহায্যে। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এভাবেই তিনি পতাকার মান রক্ষা করেন বুকে আগলে রেখে। ইবনু কামিয়া তাকে হত্যা করে। নবিজির সাথে মুসআব ইবনু উমাইরের চেহারার কিছুটা মিল থাকায় ইবনু কামিয়া ধারণা করে, সে নবিজিকেই হত্যা করেছে। তাই সে জয়ধ্বনি করতে করতে তার বাহিনীর কাছে ফিরে যায়, 'হুবলের জয় হোক। মুহাম্মাদ আমার হাতে নিহত হয়েছে।'[১]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৩ ও ৮০-৮৩; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৭

নবিজির মৃত্যুসংবাদে মুশরিকদের উল্লাস

ইবনু কামিয়ার এই জয়ধ্বনিতে মুহূর্তেই মুসলিম ও অমুসলিম শিবিরে নবিজির মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তখন মুসলিমদের অবস্থা এমনিতেই সংকটাপন্ন। তার ওপর এই সংবাদ তাদের সংকট আরও ঘনীভূত করে। যারা নবিজির কাছে ছিল তারা এর অসত্যতা ধরতে পারলেও যারা দূরে ছিল, তারা একেবারে মুষড়ে পড়ে। তাদের মনোবল ভেঙে যায়। অনেকেই হাতের অস্ত্র ফেলে দেয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে কেউ কেউ। ফলে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় মুসলিম সেনাদের মাঝে। চারদিকে ভীষণ হট্টগোল শুরু হয়ে যায়।

এই হট্টগোলে অবশ্য মুসলিমদের লাভই হয়। মুশরিকরা নবি-হত্যার মিশনে সফল হয়েছে ভেবে উল্লাসে মেতে ওঠে। এতে মুসলিমদের ওপর তাদের আক্রমণের তীব্রতা কমে আসে। কারণ যখন মুহাম্মাদই বেঁচে নেই, তখন যুদ্ধ করে আর কী হবে—এই ভাবনায় তারা হাতের অস্ত্র ফেলে নেমে পড়ে মুসলিম শহিদদের লাশ বিকৃত করার মতো ঘৃণ্য কাজে।

মুসলিম বাহিনীর কৌশলগত প্রত্যাবর্তন

মুসআব ইবনু উমাইরের শাহাদাতের পর নবিজি মুসলিম সৈনিকদের পতাকা তুলে দেন আলির হাতে। তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। উপস্থিত সাহাবিরাও তাকে যথোচিত সঙ্গ দেন। কেউ প্রতিরোধ যুদ্ধ করেন, আবার কেউ পালটা আক্রমণ করেন শত্রুবাহিনীর ওপর। তাদের এই বীরোচিত প্রতিরোধ ও প্রতিঘাতের ফলে নবিজি অবরুদ্ধ সাহাবিদের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা দেখতে পান। তিনি এই সুযোগ লুফে নেন। সহযোদ্ধাদের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় শত্রু-বেষ্টনীর ভেতর থেকে সর্বপ্রথম কাব ইবনু মালিক তাকে দেখতে পান। অমনি তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন, 'ও আমার মুসলিম ভাইয়েরা! সুখবর শোনো। এই তো আমি নবিজিকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।'

নবিজি ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলেন, যাতে মুশরিকরা তার অবস্থান টের না পায়। তবে মুসলিমদের কানে কাবের এই ঘোষণা ঠিকই পৌঁছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে আসতে থাকেন নবিজির আশ্রয়ে। মুহূর্তেই তার চারপাশে জড়ো হন ৩০ জন সাহাবি। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সাহাবি একত্রিত হলে নবিজি তাদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপিত মূল শিবিরের দিকে যেতে শুরু করেন। আক্রমণরত মুশরিকরা তার পথ আগলে দাঁড়ায়। তিনি সেসব উপেক্ষা করে সামনে এগুতে থাকেন। মুশরিকরা তখন আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দেয়। কারণ তারা জানে, অপরপক্ষ যদি নিরাপদে শিবিরে ফিরে যেতে পারে, তবে সেই যুদ্ধ জয়-পরাজয় ছাপিয়ে কৌশলগত প্রত্যাবর্তন হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু ইসলামের মরু-শার্দূলদের সামনে তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

যুদ্ধের হিসেবটাও তাই পালটে যায় ভিন্ন আঙ্গিকে।

নবিজির প্রত্যাগমন রোধে উসমান ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি মুগিরা নামের দুর্ধর্ষ এক অশ্বারোহী এগিয়ে আসে। সে এই বলে গজরাতে থাকে, 'আজ হয় আমি থাকব নয়তো মুহাম্মাদ থাকবে।' তার এ কথা নবিজির কানে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু তার কাছে আসার আগেই উসমান ইবনু আব্দিল্লাহর ঘোড়াটি গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। তখন হারিস ইবনু সিম্মাহ এগিয়ে গিয়ে সজোরে আঘাত হানেন তার পায়ে। এক আঘাতেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর হারিস এক কোপে তার দেহকে দু-ভাগ করে ফেলেন। তির-তরবারি ও রসদ নিয়ে তিনি মিলিত হন নবিজির সাথে।

এরই মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির নামের অপর এক মুশরিক ঘোড়সওয়ার কোত্থেকে যেন উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হারিস ইবনু সিম্মাহর ওপর। হারিস কিছু বুঝে ওঠার আগেই সজোরে আঘাত হানে তার কাঁধ বরাবর। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। মুসলিমরা তাকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। হঠাৎ লাল পাগড়ি পরা আবু দুজানা বাজপাখির মতো এসে আব্দুল্লাহ ইবনু জাবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এক আঘাতেই তার গর্দান উড়িয়ে দেন।

এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংকটাপন্ন সময়েও আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের ওপর দয়ার চাদর বিছিয়ে দেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও তার স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের চোখে তন্দ্রা ঢেলে দেন। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ। আবু তালহা সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'উহুদের ময়দানে যারা তন্দ্রায় ডুবে গিয়েছিল, আমিও তাদের একজন। সেদিন আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, একটু পরপর আমার হাত থেকে তরবারি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল আর আমি সেটা বারবার তুলে নিচ্ছিলাম।'[১]

মোটকথা, মুশরিকদের সব বাধা অতিক্রম করে নবিজি তার কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে স্থাপিত মূল শিবিরে পৌঁছে যান। এতে বাকি মুসলিম সৈন্যরাও তাদের করণীয় বুঝতে পারেন। প্রত্যেকে নবিজির দেখানো পথে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যান। এভাবেই তার রণকুশলতা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কৌশলকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

উবাই ইবনু খালফের করুণ মৃত্যু

ইবনু ইসহাক বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছলে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৬৮

উহুদ যুদ্ধের মানচিত্র

[১] যে পথ ধরে মুসলিম সৈন্যদল নবিজির নিকট ফিরে যায়।

[২] মুসলিম বাহিনি ছত্রভঙ্গ হয়ে যে পথে উহুদ পাহাড়ে পৌঁছায়।

[৩] যুদ্ধের প্রথমদিকে পরাজিত কুরাইশ বাহিনী যে পথ দিয়ে মদিনার দিকে পালিয়ে যায়।

উবাই ইবনু খালফ গজরাতে গজরাতে সামনে এগিয়ে আসে, মুহাম্মাদ কোথায়? আজ তার একদিন কি আমার একদিন! সাহাবিরা নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তার ওপর আক্রমণ করব?' উত্তরে নবিজি বলেন, 'তাকে আসতে দাও।' সে কাছাকাছি চলে এলে নবিজি হারিস ইবনু সিম্মাহর কাছ থেকে ছোট্ট একটি বর্শা হাতে তুলে নেন। বর্শাটি হাতে নিয়ে একটু নাড়া দিতেই আশপাশের শত্রুসেনারা এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ে—ঠিক যেভাবে উট গা-ঝাড়া দিলে, এক ঝটকায় মশা-মাছি সব উড়ে যায়।

নবিজি মনস্থির করলেন, তিনি নিজেই এই হতভাগার মোকাবেলা করবেন। তাই সাহাবিদের থামিয়ে কয়েক পা সামনে এগিয়ে যান। নবিজি দেখতে পান, উবাইয়ের শিরস্ত্রাণ ও বর্মের ঠিক মাঝখানে (অর্থাৎ গলার দিকে) একটু জায়গা আবরণমুক্ত। সেদিকে লক্ষ্য করেই তিনি বর্শা নিক্ষেপ করেন। বর্শার আঘাত খুব একটা তীব্রও ছিল না। তবু সেই আঘাতে নরাধমটা ঘোড়া থেকে উলটে পড়ে যায়। কোনোরকম নিজেকে সামলে নিয়ে পড়িমরি করে ছুটে আসে কুরাইশদের কাছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সামান্য আঘাতে তার তেমন কিছুই হওয়ার কথা ছিল না। মামুলি একটু দাগ বসেছে কেবল তার গলায়। কোনো রক্তপাতও হয়নি। তারপরও এই সামান্য আঘাতেই সে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। সহযোদ্ধাদের বলতে থাকে, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলেছে!' তারা উপহাস করে বলে, 'তোমার মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু লোপ পেয়েছে। তোমার গায়ে তো আঘাতের তেমন কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। এই তুচ্ছ ঘটনায় ঘাবড়ে যাওয়া কখনো বীরযোদ্ধার বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।' এসব শুনে সে উত্তর দেয়, 'মুহাম্মাদ মক্কায় থাকতেই আমাকে বলেছিল, আমিই তোমাকে হত্যা করব।[১] আল্লাহর কসম! সে আমার গায়ে সামান্য থুতু দিলেও আমি মরে যেতাম।' আল্লাহর এই দুশমন মক্কায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে নিহত হয়।[২]

উরওয়ার সূত্রে আবুল আসওয়াদ জানিয়েছেন, মৃত্যুর সময় উবাই ছাগলের মতো চিৎকার করে বারবার বলছিল, 'ওই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ—যে কষ্ট আমি এখন পাচ্ছি, তা যদি যুল মাজাযের[৩] মানুষগুলোর মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়,

---

[১] মক্কায় নবিজির সাথে উবাইয়ের সাক্ষাৎ হলে সে বলত, মুহাম্মাদ! আমার কাছে আউদ নামের একটি ঘোড়া আছে। প্রতিদিন আমি একে ৩ সা (প্রায় ১০ কেজি) শস্য খেতে দিই। এর ওপরে চড়েই আমি তোমাকে হত্যা করব। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলতেন, ইনশাআল্লাহ! আমিই তোমাকে হত্যা করব।

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৪; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭

[৩] যুল মাজায প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের একটি উল্লেখযোগ্য বাজার। মক্কা মুকাররমা থেকে ২১ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত।

তবে তারা সবাই মারা যাবে।'[১]

নবিজির প্রতি তালহার সীমাহীন ভালোবাসা

পাহাড়ের ঘাঁটিতে ফেরার পথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বিশাল একটি পাথর দেখা যায়। পাথরটি ডিঙিয়ে ওপাশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আহত শরীরের সাথে পেরে ওঠেন না তিনি। তাছাড়া দুটি লৌহবর্মের অতিরিক্ত ওজনও তাকে দমিয়ে রাখে খানিকটা। তখন তালহা ইবনু উবাইদিল্লা দৌড়ে এসে পাথরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। নবিজি তার কাঁধে পা রেখে উঠে দাঁড়ান। তালহা আস্তে আস্তে উঁচু হন। নবিজি তখন পাথর ডিঙিয়ে খুব সহজেই ওপাশে চলে যান। এরপর তিনি ঘোষণা করেন, 'তালহার জন্য জান্নাত অবধারিত।'[২]

সাদের হাতে এক বরকতময় তির!

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে আশ্রয় নিলে মুশরিকরা মুসলিমদেরকে পরাভূত করার সর্বশেষ চেষ্টা চালায়। ইবনু ইসহাক বলেন, 'আল্লাহর রাসুল শিবিরে ফিরে যাওয়ার পর আবু সুফিয়ান ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুশরিকদের একটি দল পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করে। নবিজি তখন আল্লাহর কাছে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, ওরা যেন ওপরে উঠতে না পারে।' নবিজির দুআ শেষ হতেই উমার ইবনুল খাত্তাব কয়েকজন মুহাজির সাহাবিকে নিয়ে শত্রুদের দিকে ছুটে যান এবং তাদেরকে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে হটিয়ে দেন।'[৩]

ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ আল-উমাবি রচিত *মাগাযি* গ্রন্থে এসেছে, মুশরিক যোদ্ধারা পাহাড়ে আরোহণ করলে, নবিজি সাদকে লক্ষ্য করে বলেন, 'ওদের হটিয়ে দাও।' সাদ বলেন, 'আমার একার পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব?' কিন্তু আল্লাহর রাসুল পরপর তিনবার শত্রু-হটানোর কথা বললে সাদ তূণীর থেকে একটি তির বের করে এক শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করেন। এতে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হয়। এভাবে তিনি পরপর তিনবার তির নিক্ষেপ করে তিনজন শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। এই দৃশ্য দেখার পর শত্রুসেনারা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সাদ তখন বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন, 'বাহ, তিরটি তো ভারি বরকতময়!' মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি এটা সযতনে আগলে রাখেন। মৃত্যুর পর তা উত্তরাধিকার-সূত্রে পুত্রদের হাতে চলে যায়।[৪]

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৫০

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬

[৪] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৫

মৃতদেহের সাথে মুশরিকদের পৈশাচিক কর্মকাণ্ড

এটা ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের সর্বশেষ আক্রমণ। নবিজির অবস্থান সম্পর্কে তাদের কাছে সঠিক কোনো তথ্য ছিল না। তারা ধরেই নিয়েছিল, তিনি নিহত হয়েছেন। এ কারণে তারা যার-যার মতো নিজেদের তাঁবুতে এসে মক্কায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। এদের মধ্যে কিছু লোক আবার মেতে ওঠে শহিদদের লাশ বিকৃতির মতো জঘন্য কাজে। নারীদের মধ্যে থেকেও অনেকে অংশ নেয় এ কাজে। তারা শহিদদের মৃতদেহের সাথে পৈশাচিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। কেটে ফেলে তাদের নাক-কান ও অন্যান্য অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা। চিরে ফেলে তাদের পেট ও বুক।

হিন্দা বিনতু উতবার জিঘাংসা সেদিন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। তার আচরণে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয় চরমভাবে। সে নবিজির প্রতি বিদ্বেষবশত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বুক চিরে কলিজা বের করে আনে! এরপর সেটা চিবুতে থাকে মানুষখেকো পশুর মতো। তার ইচ্ছে, আস্ত কলিজাটি গিলে খাবে। কিন্তু মানবের খাদ্যনালি দিয়ে আরেকটি মানবের অংশ নামতে চায় না। তাই বাধ্য হয়ে সে চর্বিত কলিজাটুকু থু করে ফেলে দেয়। এই নারী মুসলিমদের কর্তিত নাক-কান দিয়ে কানের দুল, গলার হার ও পায়ের মল বানিয়ে পরেছিল।[১]

যুদ্ধ চালিয়ে নিতে মুসলিম বাহিনী সদাপ্রস্তুত

যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে এমন দুটো ঘটনা ঘটে, যা দেখে বোঝা যায়, নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমরা একদম শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেইসাথে তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ বিলিয়ে দিতে ছিলেন সদাপ্রস্তুত। ঘটনাদুটি নিচে তুলে ধরা হলো—

[এক] কাব ইবনু মালিক বলেন, 'আমি পাহাড়ের ঘাঁটির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। সাথে আরও কয়েকজন সাহাবি। এমন সময় দেখি, মুশরিকরা মুসলিম শহিদদের লাশ বিকৃত করছে। ঘটনার বীভৎসতায় আমি চমকে উঠি, এ কেমন বর্বরতা! দ্রুত পায়ে ছুটে গেলাম ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখি, ভারী বর্মপরিহিত দৈত্যাকায় এক মুশরিক-সৈনিক মৃতদেহগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলছে, 'খাসির মাংসের মতো এদের কিমা বানাতে থাকো।'

এবার আমি আরেকটু সামনে তাকাই। দেখি, এক মুসলিম সৈনিক তরবারি হাতে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সেও বর্ম পরিহিত। মুখে মুখোশ থাকায় তাকে ভালো করে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০

চেনা যাচ্ছে না। আমি আলগোছে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াই। তার ও কাফির যোদ্ধার মাঝে তুলনা করি। কাফির লোকটা সমর-সজ্জায় সুসজ্জিত। তার তুলনায় মুসলিম যোদ্ধাটি নিতান্তই সাধারণ। আমি তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ও পরিণাম দেখার অপেক্ষা করছি। একটু বাদেই তারা পরস্পরের মুখোমুখি হলো। মুসলিম সৈনিকটি হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কাফিরের ওপর। সজোরে আঘাত হানে শত্রুর মাঝ বরাবর। সে আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, চোখের পলকে তার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে আসে তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ। এরপর তিনি মুখোশ সরিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কেমন দেখলে, কাব? আমি আবু দুজানা।'[১]

[দুই] যুদ্ধ শেষে কয়েকজন মুসলিম নারী ময়দানে আসেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আয়িশা বিনতু আবি বকর ও উম্মু সুলাইমকে দেখেছি, তারা পিঠে করে পানির মশক বহন করছেন আর রণক্লান্ত মুজাহিদদের পান করাচ্ছেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আবার গিয়ে মশক ভরে নিয়ে আসছেন। সবাইকে পান করাচ্ছেন। এ সময় ব্যস্ততার কারণে তাদের পায়ের গোছার কাপড় মাঝেমধ্যে সরে যাচ্ছিল।'[২] উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন উম্মু সালিত মশক ভরে ভরে আমাদের জন্য পানি এনেছিলেন।'[৩]

উম্মু আইমানও তাদের সাথে পানি আনছিলেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ করেন, পরাজিত মানসিকতার কিছু মুসলিম সৈনিক যুদ্ধের বিপর্যয় থেকে বাঁচতে মদিনার পথ ধরেছেন। তিনি তাদের মুখে কাদা ছুড়তে ছুড়তে বলেন, 'এই নাও সুতাকাটার যন্ত্র। তোমরা হাতে চুড়ি পরে ঘরে বসে সুতা কাটো আর তোমাদের তরবারিগুলো আমাদের দিয়ে যাও।'

তাদেরকে শাসিয়ে উম্মু আইমান দ্রুত যুদ্ধের ময়দানে ফিরে আসেন। আক্রান্তদের পানি পান করাতে থাকেন। এ সময় হিব্বান ইবনু আরিকা তাকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে। আঘাতের চোটে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায় তার দেহের পোশাক। আল্লাহর দুশমনটা এই দৃশ্য দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। নবিজির সামনেই এ দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। তিনি খুবই মর্মাহত হন এতে। সঙ্গে সঙ্গে সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের হাতে একটি পালকবিহীন তির তুলে দিয়ে বলেন, 'এটা ওই কাপুরুষটার গায়ে নিক্ষেপ করো।' সাদ তিরটি নিক্ষেপ করলে একেবারে তার গলায় গিয়ে বিঁধে। অমনি মাটির ওপর ধপাস করে পড়ে যায় সে। শক্ত মাটির আঘাতে তার দেহ বিবস্ত্র হয়ে যায়। লোকটির এমন করুণ দশা দেখে নবিজি হাসতে শুরু করেন।

---

[১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৮৮০, ৩৮১১, ৪০৬৪

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ২৮৮১, ৪০৭১

খানিকটা ঝলকে ওঠে তার মাড়ির দাঁতও। তারপর তিনি সাদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'সাদ, তুমি উম্মু আইমান-ঘটনার প্রতিশোধ নিতে পেরেছ। আল্লাহ তার মনের আকুতি শুনেছেন।'[১]

আঘাতকারীর প্রতি নবিজির বদদুআ!

ঘাঁটিতে আশ্রয় নেওয়ার পর আলি ইবনু আবি তালিব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য 'মিহরাস' থেকে ঢালে করে পানি নিয়ে আসেন। মিহরাস হচ্ছে কূপ-আকৃতির বিশাল পাথর, বৃষ্টি হলে যেখানে প্রচুর পানি জমে যায়। কারও কারও মতে অবশ্য এটি উহুদ প্রান্তরের একটি ঝরনার নাম। নবিজিকে ওই পানি পান করতে দেওয়া হলে, তার নাকে গন্ধ লাগে। তাই তিনি পান না করে তা দিয়ে মুখমণ্ডলের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করেন। মাথায়ও ঢালেন কিছুটা পানি। এ সময় তিনি স্বগতোক্তির মতো করে বলেন, 'ওই ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হোক, যে তার নবির মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করেছে।'[২]

সাহল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুলের রক্তাক্ত চেহারা কে ধুয়ে দিয়েছে, পানি কে ঢেলে দিয়েছে এবং কী দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে, তা আমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। আলি পানি ঢেলেছেন। আর নবি-কন্যা ফাতিমা ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করেছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, ক্ষতস্থান পরিষ্কার হলেও রক্ত পড়া কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি এক টুকরো চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই লাগিয়ে দেন ক্ষতস্থানে। অমনি রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।[৩] কিন্তু নবিজির পানির পিপাসা রয়েই যায়। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে শীতল ও মিষ্ট পানি নিয়ে আসেন। নবিজি পানি পান করে তার জন্য কল্যাণের দুআ করেন।[৪]

ব্যথার যন্ত্রণায় নবিজি সেদিন যুহরের সালাত বসে পড়ান। তাকে দেখে সাহাবিরাও বসে সালাত আদায় করেন।[৫]

আবু সুফিয়ানের বিদ্রুপ এবং উমারের জবাব

মুশরিকরা মক্কায় ফেরার প্রস্তুতি নেয়। যাওয়ার আগে আবু সুফিয়ান পাহাড়ের পাদদেশে

---

[১] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৫

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৭৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৪৬৫

[৪] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০

[৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৭

গিয়ে হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মাদ আছে? কেউ কোনো উত্তর দেয় না। একটু সময় নিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের মধ্যে কি আবু বকর ইবনু কুহাফা আছে?' এবারও সবাই নিরুত্তর। একটু সময় নিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করে, 'উমার ইবনুল খাত্তাবও কি নেই তোমাদের মধ্যে?' কারও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। নবিজির নির্দেশেই সবাই নীরব থাকেন। এই তিনজন ছাড়া আর কারও ব্যাপারে সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কারণ সে জানত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে এই তিনজনের মাধ্যমেই হবে। কারও সাড়া না পেয়ে সে খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, 'চলো এবার যাওয়া যাক। এ যাত্রায় প্রধান তিনজনের ঝামেলা তো মিটে গেল।'

এ কথা শুনে উমার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। তিনি গর্জে ওঠেন, 'ওরে দুর্ভাগা! তুই যাদের নাম নিয়েছিস, তারা সবাই এখনো বেঁচে আছেন। তোর শেষ পরিণতি দেখার জন্য আল্লাহ তাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।' তখন সে বলতে থাকে, 'তোমাদের বহু লাশের অঙ্গহানি করা হয়েছে। আমি লোকদের এসব করতে বলিনি। অবশ্য এতে আমার খারাপও লাগেনি।' এরপর সে হুবলের জয় হোক বলে সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হয়।

নবিজি তখন সাহাবিদের বলেন, 'তোমরা কি এর জবাব দেবে না?'

তারা জিজ্ঞেস করেন,'আমরা কী বলে এর জবাব দেব?

তিনি শিখিয়ে দেন, 'তোমরা বলো, জয় ও সম্মান কেবলই আল্লাহর।'

তাদের কথার উত্তরে আবু সুফিয়ান বলে, 'আমাদের উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই।'

নবিজি আবারও সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি এর জবাব দেবে না?'

তারা বলেন, 'আমরা কী বলে এর জবাব দেব?'

তিনি শিখিয়ে দেন, 'তোমরা বলো, আমাদের মালিক আল্লাহ। তোমাদের কোনো মালিক নেই।'

উত্তরে আবু সুফিয়ান বলে, 'তোমরা এবার সমুচিত জবাব পেলে। আজকের দিনটি বদরের প্রতিশোধ। যুদ্ধ মানেই জয়-পরাজয়ের খেলা।'

উমার জবাব দেন, 'আমাদের দুই পক্ষ সমান নয়। কারণ আমাদের শহিদেরা জান্নাতে যাবে। আর তোমাদের মৃতরা যাবে জাহান্নামে।'

আবু সুফিয়ান তখনো কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কেন যেন উমারকে ডেকে বলে, 'উমার, আমার কাছে এসো।'

নবিজি তাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, 'যাও, দেখো সে কী বলে।'

উমার কাছে এলে আবু সুফিয়ান বলে, 'আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, সত্যি করে বলো তো, মুহাম্মাদ কি এখনো বেঁচে আছে?'

উমার বলেন, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি এখনো জীবিত ও সুস্থই আছেন। আর এই মুহূর্তে তোর সব কথাও তিনি শুনতে পাচ্ছেন।'

আবু সুফিয়ান তখন বলে, 'তুমি আমার কাছে ইবনু কামিয়ার চেয়ে বেশি সত্যবাদী ও সজ্জন ব্যক্তি।'[১]

আরেকটি বদর যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ

আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা ফিরে যেতে যেতে বলে, 'আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে আবার যুদ্ধ হবে। এ চ্যালেঞ্জ ভুলো না যেন।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবিকে বলেন, 'বলে দাও, তোমাদের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম। তোমাদের সাথে এটা একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে রইল।'[২]

মুশরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আলি ইবনু আবি তালিবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'মক্কার লোকদের পিছু নাও। দেখো তারা কী করে? কী তাদের উদ্দেশ্য? তারা যদি ঘোড়া বাদ দিয়ে উটে চড়ে যাত্রা করে, তবে বুঝবে তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। তারা যদি ঘোড়ায় চড়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে, তারা মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাদের পরবর্তী নিশানা মদিনা হয়ে থাকলে, আমি সেখানে গিয়ে তাদের কঠিন জবাব দেব।'

আলি বলেন, 'আমি তাদের পিছু নিই। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। দেখি—তারা ঘোড়া ছেড়ে উটে করে মক্কার পথ ধরেছে।'[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৩-৯৪; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৪; *সহিহুল বুখারি* : ৩০৩৯, ৪০৪৩

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৪

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৪, ইবনু হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারিতে* লিখেছেন, মুশরিকদের অবস্থান যাচাই বাছাই করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে পাঠিয়েছেন। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৭]

আহত ও শহিদদের অনুসন্ধান

মক্কার মুশরিক বাহিনী চলে যাওয়ার পর মুসলিমরা তাদের আহত ও শহিদদের খোঁজখবর নিতে শুরু করে। যাইদ ইবনু সাবিত বলেন, 'আল্লাহর রাসুল উহুদের দিন আমাকে সাদ ইবনু রাবির খবর নিতে পাঠান। বলেন, 'তাকে দেখলে প্রথমে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। তারপর বলবে, আল্লাহর রাসুল জানতে চেয়েছেন, তোমার এখন কেমন লাগছে? আমি সুস্থ ও হতাহতদের মাঝে তাকে খুঁজতে থাকি। একপর্যায়ে তাকে পেয়েও যাই। দেখি, মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি কাতরাচ্ছেন। পুরোটা শরীর তার আঘাতে জর্জরিত। তির-তরবারি ও বর্শা মিলিয়ে ৭০টিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন তার গায়ে। আমি নবিজির কথাগুলো তাকে জানালে তিনি উত্তরে বলেন, 'তাকেও আমার সালাম জানাবে। আর বলবে, আমি এখন জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার আনসার ভাইদের এই বলে সতর্ক করবে, তাদের দেহে বিন্দু পরিমাণ শক্তি অবশিষ্ট থাকা অবস্থায়ও যদি শত্রুরা নবিজির কাছে পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না।' এতটুকু বলেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[১]

আহতদের মধ্যে উসাইরিম নামক আরও একজনকে পাওয়া যায়। তার মূল নাম আমর ইবনু সাবিত। তিনি তখন শেষ সময় পার করছিলেন। যুদ্ধের আগে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি কবুল করেননি। তাকে আহত অবস্থায় দেখে মুসলিমরা বিস্মিত হয়। কৌতূহলবশত সবাই তাকে জিজ্ঞেস করে, 'উসাইরিম, তুমি এখানে এসেছ কেন? ইসলামের টানে নাকি নিজের গোত্রের লোকদের সাহায্য করতে?' তিনি উত্তর দেন, 'ইসলামের টানে। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবিজির সাথে মুসলিমদের সহযোগিতায় যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এখন তো দেখতেই পাচ্ছ আমার কী হয়েছে!' এ কথা বলতে না বলতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি নবিজিকে জানানো হলে তিনি বলেন, 'সে জান্নাতি।' আবু হুরাইরা বলেন, 'অথচ তিনি জীবনে এক ওয়াক্ত সালাতও আদায় করেননি।'[২]

কুযমান নামের আরও একজনকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে ছিল বীরযোদ্ধা। অসীম সাহসী। এই যুদ্ধে সে একাই ৭-৮ জন মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। আমরা যখন তার সন্ধান পাই, তখন সে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। আমরা তাকে উদ্ধার করে বনু যফর মহল্লায় নিয়ে যাই। তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিই। কিন্তু তার উত্তর আমাদের সবাইকে হতাশ করে। সে বলে, 'আল্লাহর কসম! আমি ইসলামের জন্য নয়; বরং আমার গোত্রের লোকদের জন্য যুদ্ধ করেছি। তাদেরকে সাহায্য করার দরকার না হলে আমি কখনোই এ যুদ্ধে অংশ নিতাম না।' কিছুক্ষণ পর তার যন্ত্রণা

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৬

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৬; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯০

ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেইসাথে কমে আসতে থাকে তার সহন-ক্ষমতা। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে একপর্যায়ে সে নিজেই নিজের গলায় চাকু চালিয়ে দেয়। তার ব্যাপারে নবিজিকে জানানো হলে তিনি বলেন, 'সে জাহান্নামি।'[১]

কুযমানের এই করুণ পরিণতি নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার মহৎ উদ্দেশ্য পেছনে ফেলে যারা জাতীয়তাবাদ কিংবা অন্য কোনো চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করে, তাদের দশাও এমনই হবে—যদিও তারা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করে। আরেকটু কঠিন ভাষায় বললে, তারা নবিজি ও তার সাহাবিদের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তাদের শেষ ঠিকানা জাহান্নামই হবে।

নিহতদের খোঁজ নিতে গিয়ে তাদের মধ্যে বনু সালাবার এক ইহুদির লাশ পাওয়া যায়। যুদ্ধ চলাকালে সে তার গোত্রকে বলছিল, 'ও আমার ইহুদি ভাইয়েরা! তোমরা তো ভালো করেই জানো, মুহাম্মাদকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তাই আর বসে থেকো না। চলো এক্ষুনি।' তারা উত্তর দেয়, 'আজ তো শনিবার। যুদ্ধ করার অনুমতি নেই আমাদের।' সে তখন বলে, 'তোমাদের জন্য এখন আর শনিবারের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নয়।' এ কথা বলে সে তরবারি ও প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে, 'আমি যদি মারা যাই, তবে আমার ধনসম্পদ সবকিছু মুহাম্মাদের। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করবেন।' এরপর সে উহুদ প্রান্তরে মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়। নবিজি তার সম্পর্কে বলেন, 'মুখাইরিক ছিল একজন সম্ভ্রান্ত ইহুদি।'[২]

শহিদদের কাফন ও দাফন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও শহিদদের দেখতে বের হন। সারি সারি লাশ দেখে তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি। অশ্রুর ঢল নামে তার দু-চোখ বেয়ে। ভিজে যায় তার দাড়ি মুবারক। সিক্ত গলায় নবিজি বলতে শুরু করেন, 'এই শহিদদের পক্ষে রোজ হাশরে আমি সাক্ষ্য দেব। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এমনভাবে তুলবেন যে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সে রক্ত দেখতে লাল রঙেরই হবে। তবে তার ঘ্রাণ হবে মৃগনাভির মতো (অর্থাৎ খুবই সুগন্ধিময়)।'[৩]

কয়েকজন সাহাবি তাদের নিহত স্বজনদের মৃতদেহ নিয়ে মদিনায় চলে যান। তাদেরকে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৭-৯৮; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা ৮৮

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৮-৮৯

[৩] প্রাগুক্ত

ফিরিয়ে এনে শহিদ হওয়ার স্থানে দাফন করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'তোমরা কেউ এদেরকে গোসল করাবে না। নতুন করে কাফনও পরাবে না। বরং এদের গায়ে যে পোশাক আছে, কাফন হিসেবে সেগুলোই ব্যবহার করবে। তবে লোহার বর্ম ও চামড়ার পোশাক খুলে রাখবে।'

সেদিন তার নির্দেশ অনুসারে এক কবরে ২-৩ জন করে দাফন করা হয়। একই কাপড়ে একাধিক শহিদের কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এক কবরে একাধিক মৃতদেহ রাখার সময় তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এদের মধ্যে কে বেশি কুরআন মুখস্থ করেছে? সাহাবিরা যার দিকে ইশারা করেন, তিনি তাকে আগে কবরে রাখতে বলেন। দাফন শেষে নবিজি আরও বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি এদের পক্ষে সাক্ষ্য দেব।' আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনি হারাম এবং আমর ইবনু জামুহের মাঝে গভীর বন্ধুত্ব থাকায় তাদেরকে একই কবরে দাফন করা হয়।[১]

দাফনের সময় সবাইকে পাওয়া গেলেও হানযালাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। দীর্ঘক্ষণ তালাশের পর উহুদের এক কোণে তার মৃতদেহটি খুঁজে পাওয়া যায়। সবার দেহ থেকে যখন তপ্ত রক্ত ঝরছে, তার দেহ থেকে তখন ঝরছিল উত্তপ্ত পানি। নবিজিকে বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, 'ফেরেশতারা তাকে গোসল দিয়েছে।' এরপর তিনি সাহাবিদের বলেন, 'তার স্ত্রীর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করে দেখো। সে হয়তো কিছু বলতে পারবে এ ব্যাপারে।' পরে সাহাবিরা তার স্ত্রীর কাছ থেকে এর রহস্য জেনে নেয়।[২] সেদিন থেকেই হানযালার নাম হয় গাসিলুল মালাইকা। অর্থাৎ ফেরেশতারা যাকে গোসল করিয়ে দিয়েছে।[৩]

নবিজি এবার তার আপন চাচা ও প্রিয় দুধভাই হামযার পাশে এসে দাঁড়ান। তার সাথে যা ঘটেছে, তা দেখে তিনি ভীষণ মর্মাহত হন। তীব্র দুঃখ-কষ্টে বুকটা যেন ফেটে যায় তার। ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে তার কোমল হৃদয়। নবিজির ফুফু সাফিয়াও দেখতে এসেছেন ভাই হামযাকে। নবিজি তখন ফুফাতো ভাই যুবাইরকে বলেন, তাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ভাইকে দেখে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না। সাফিয়া তখন বলে ওঠেন, 'কেন

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৮; *সহিহুল বুখারি* : ১৩৪৩, ১৩৪৭, ১৩৫৩, ৪০৭৯

[২] হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আগেও বলা হয়েছে। জিহাদের ময়দানে আসার আগে তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছেন। এ কারণে তার ওপর গোসল ফরজ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ঘোষণা শোনামাত্র এক মুহূর্ত দেরি না করে তিনি রণসাজে বেরিয়ে পড়েন। এতে তার ফরজ গোসল আর করা হয়ে ওঠে না। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে দান করলেন এক অফুরান ও অভাবিত মর্যাদা। ফেরেশতাদের মাধ্যমে তার গোসল সম্পন্ন করেন। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৫; মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, ১৩৭৫ হিজরি, মিশর]

[৩] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৪

পারব না? আমি জানি, আমার ভাইয়ের মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছে। আর তা হয়েছে আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে। আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে। তাই এ ব্যাপারে আমার কোনো কষ্ট থাকতে পারে না। আমি অবশ্যই ধৈর্যধারণ করব এবং এ ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের আশা করব।' এভাবে বলার পর কাউকে আসলে আটকে রাখা যায় না। নবিজিও পারেননি তার ফুফুকে আটকে রাখতে। তিনি খুব কাছ থেকে স্নেহের ভাইকে দেখেন। তার জন্য দুআ করেন। ইন্নালিল্লাহ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন প্রিয়তম ভাইটির জন্য।

নবিজি তাকে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সাথে দাফন করার নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ ছিলেন তার ভাগ্নে ও দুধভাই।

ইবনু মাসউদ বর্ণনা করেন, হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের শাহাদাতে নবিজি যত বেশি কেঁদেছেন, আর কারও মৃত্যুতে তাকে এত বেশি কাঁদতে দেখিনি। তিনি হামযাকে কিবলার দিকে রেখে তার জানাযার সালাত পড়েন। সালাতেও নবিজি অনবরত কেঁদেছেন।[১]

অন্যান্য শহিদের অবস্থাও ছিল হৃদয়বিদারক। বুক ফেটে যাচ্ছিল তাদের অবস্থা দেখে। খাব্বাব ইবনু আরত বর্ণনা করেন, হামযার কাফনের জন্যে সাদা-কালো ডোরাকাটা এক টুকরো চাদর ছাড়া আর কোনো কিছুরই ব্যবস্থা করা যায়নি। সে চাদরটাও এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা আবার পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। পরে টুকরো কাপড়টুকু দিয়ে মাথা ঢাকা হয়। আর পা ঢাকা হয় ইজখির ঘাস[২] দিয়ে।[৩]

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ বলেন, মুসআব ইবনু উমাইর সবদিক থেকেই আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি শহিদ হলে তার কাফনের জন্য কেবল এক টুকরো চাদর জোগাড় করা গিয়েছে। তারও মাথা ঢাকলে পা আবার পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকত। খাব্বাব থেকেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে তিনি উপরিউক্ত বর্ণনার সাথে এটুকুও বলেছেন যে, কাফনের ঘাটতি দেখা দিলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কাপড় দিয়ে মাথা ঢাকো। আর পা ঢাকো ইজখির ঘাস দিয়ে।[৪]

---

[১] ইবনু শাযান এটি বর্ণনা করেছেন। [*মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৫৫]

[২] ইজখির একটি ভেষজ উদ্ভিদ, যা উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে প্রচুর হয়। গোলাপের মতো ঘ্রাণ, মোটা শিকড়, অনেকগুলো শাখা আর ছোট ছোট পাতাবিশিষ্ট এসব গাছ ২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের মরুভূমি, সমভূমি এবং পাহাড়ে এগুলো উৎপন্ন হয়। [*তাহযিবুল লুগাহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭৬; *মুখতারুস সিহাহ*, পৃষ্ঠা : ১১২; *আল-মিসবাহুল মুনির*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১]

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২১০৭২; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ১৬১৫; এর সনদ সহিহ।

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৪৭, ৪০৮২; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৮৭৬

আল্লাহর প্রতি নবিজির বিশেষ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন

উহুদের দিন মুশরিকরা মক্কায় ফিরে গেলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবিদের বলেন, 'তোমরা সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়াও। আমি আমার রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করব।' সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিগণ তার পেছনে সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। তিনি খুব আকুলতার সাথে বলতে শুরু করেন—

'হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা কেবলই আপনার। আপনি কোনো কিছু সংকুচিত করতে চাইলে, কেউ তার প্রসার ঘটাতে পারে না। আবার আপনি কোনো কিছু প্রসারিত করতে চাইলে, কেউ তা সংকুচিত করতে পারে না। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সুপথে চালাতে পারে না। ঠিক একইভাবে আপনি যাকে সুপথে চালান, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না। আপনি কোনো কিছু থেকে বারণ করলে, কেউ তা এনে দিতে পারে না। আবার আপনি কোনো কিছু দিলে, কেউ তা আটকে রাখতেও পারে না। আপনি যেটা দূরে রেখেছেন, সেটা কেউ কাছে টানতে পারে না। আবার আপনি যেটা কাছে এনে দিয়েছেন, কেউ সেটা দূরেও সরাতে পারে না। হে আল্লাহ, আমাদের প্রতি আপনার দান, দয়া, রিজিক ও অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে স্থায়ী ও অফুরন্ত নিয়ামত চাই। আরও চাই অভাবের দিনে আপনার সাহায্য এবং ভয়ের দিনে আপনার নিরাপত্তা। হে আল্লাহ, আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, সেসবের অকল্যাণ থেকে তো বটেই; যেগুলো দেননি, সেসবের অকল্যাণ থেকেও আপনার আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয়তর করে দিন। ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত করুন আমাদের ভেতর-বাহির; সেইসাথে আমাদের মধ্যে কুফর, পাপ ও অবাধ্যতার প্রতি আজন্ম ঘৃণা তৈরি করে দিন। সর্বোপরি আমাদেরকে ঠাঁই দিন হিদায়াতপ্রাপ্ত মানুষগুলোর কাতারে।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে দ্বীনের পথে অবিচল রাখুন, ইসলামের ওপর মৃত্যু দিন। মুসলিম হিসেবে বাঁচিয়ে রাখুন। ভালো মানুষদের সান্নিধ্যে আমাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত করুন। ফিতনা থেকে দূরে রাখুন। অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ, যারা আপনার রাসূলকে অস্বীকার করে এবং আপনার পথে বাধার সৃষ্টি করে, তাদের আপনি ধ্বংস করুন। তাদের ওপর নাযিল করুন আপনার আজাব ও গজব। হে আল্লাহ, হে মাবুদ, ওই কাফিরদেরও ধ্বংস করুন, যারা আপনার কিতাব পাওয়া সত্ত্বেও দ্বীন থেকে বিমুখ।'[১]

মদিনায় প্রত্যাবর্তন : ত্যাগ ও ভালোবাসার বিরল দৃষ্টান্ত

শহিদদের কাফন-দাফন এবং দুআ-মুনাজাত শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১] *আল-আদাবুল মুফরাদ,* ইমাম বুখারি : ৬৯৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৪৯২; হাদিসটি সহিহ।

সাল্লাম মদিনার পথ ধরেন। উহুদের ময়দানে মুজাহিদগণ ইসলাম ও নবির ভালোবাসায় যেভাবে আত্মত্যাগ করেছেন, পথপার্শ্বে অপেক্ষমাণ আত্মীয়স্বজনও ঠিক সেভাবেই ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেন তাদের মান্যবরের প্রতি।

মদিনায় ফেরার পথে নবিজির সাথে সর্বপ্রথম দেখা হয় হামনা বিনতু জাহশের। এ যুদ্ধে তার বেশ কয়েকজন আত্মীয় শহিদ হন। তাকে প্রথমে তার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে তার মাগফিরাত কামনা করেন। এরপর দেওয়া হয় তার মামা হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের শাহাদাতের খবর। এবারও তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়ে তার মাগফিরাতের দুআ করেন। সবশেষে তাকে সংবাদ দেওয়া তার স্বামী মুসআব ইবনু উমাইরের শাহাদাতের। এ সংবাদ শুনে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। অবিরল ধারায় কাঁদতে শুরু করেন। নবিজি তখন বলেন, 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।'[১]

এরপর মুজাহিদদের কাফেলার দেখা হয় বনু দিনার[২] গোত্রের এক নারীর সাথে। এই নারীরও স্বামী, ভাই ও বাবা শাহাদাত-বরণ করেছেন উহুদের প্রান্তরে। এক-এক করে সবার শাহাদাতের সংবাদ তাকে দেওয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আমার নবিজি কেমন আছেন? তিনি ঠিক আছেন তো?' সাহাবিরা উত্তর দেন, 'তুমি যেমন চাও, তিনি ঠিক তেমনই আছেন।' নারীটি তখন বলেন, 'আমি তাকে এক নজর দেখতে চাই।' সাহাবিরা ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। নবিজির প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্রই তিনি কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আপনার উপস্থিতিতে সকল বিপদই তুচ্ছ।'[৩]

কাফেলা আরেকটু অগ্রসর হতেই সাদ ইবনু মুআজের মা দৌড়ে আসেন। সাদ তখন নবিজির ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছিলেন। মাকে দেখিয়ে তিনি নবিজিকে বলেন, 'ইনি আমার মা।' নবিজি তাকে 'মারহাবা' বলে স্বাগত জানান। তার জন্য একদণ্ড দাঁড়ান এবং তার ছেলে আমর ইবনু মুআজের শাহাদাতে তাকে সান্ত্বনা দেন। তিনি বলেন, 'আপনাকে নিরাপদ দেখার পর সকল বিপদই আমার কাছে ঠুনকো।' নবিজি সেখানে দাঁড়িয়ে উহুদের শহিদদের জন্য আরও একবার দুআ করেন। এরপর বলেন, 'হে উম্মু সাদ! তুমি নিজে সুসংবাদ গ্রহণ করো! সেইসাথে অন্যান্য শহিদ-পরিবারকেও সুসংবাদ দাও, তাদের শহিদরা জান্নাতে একসাথে অবস্থান করছে। তারা তাদের পরিবারের লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করেছে এবং সে সুপারিশ মঞ্জুরও করা হয়েছে।' সাদের মা তখন বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এই সুসংবাদের পর কেউ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৮

[২] খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা।

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৯

কি আর কাঁদতে পারে! হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এবার তাদের পরবর্তী মানুষগুলোর জন্যও দুআ করে দিন।' তিনি দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, তাদের শোক-যন্ত্রণা মুছে দিন। তাদের ক্ষতি পূরণ করে দিন এবং তাদের দেখভাল করুন উত্তমরূপে।'[১]

মদিনায় এলেন নবিজি

তৃতীয় হিজরির ৭ শাওয়াল রবিবার শেষ বিকেলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদের নিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছান। সবাই যার যার পরিবারের কাছে ছুটে যায়। নবিজিও ঘরে ফেরেন। হাতের তরবারিটি মেয়ে ফাতিমাকে দিয়ে বলেন, 'মা, আমার! এটার রক্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করো। আল্লাহর কসম, এটা আজ আমার খুব কাজে লেগেছে।' আলি ইবনু আবি তালিবও তার তরবারিটি ফাতিমাকে পরিষ্কার করতে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমারও এটা আজ খুব কাজে লেগেছে।' নবিজি তখন বলেন, 'আলি, তুমি আজ সত্যি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ। তবে মনে রেখো, সাহল ইবনু হুনাইফ এবং আবু দুজানাও তোমার মতো বীরত্ব দেখিয়েছে।'[২]

হতাহতের সংখ্যা

হাদিস ও ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলের মতে, এ যুদ্ধে মোট ৭০ জন মুসলিম শাহাদাতবরণ করেন। এদের মধ্যে ৬৫ জন আনসার, ৪ জন মুহাজির এবং ১ জন ইহুদি। আনসারদের ৪১ জন ছিল খাযরাজের আর ২৪ জন আউসের।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, মুশরিক বাহিনীতে নিহত হয়েছিল ২২ জন। তবে মাগাযি ও সিয়ার বিশেষজ্ঞদের সকল মতামত পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তাদের নিহতের সংখ্যা ২২ নয় বরং ৩৭। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন। [৩]

মদিনায় যখন এক উদ্বেগজনক অবস্থা

তৃতীয় হিজরির ৭ শাওয়াল শনিবার দিবাগত রাতটি ছিল মুসলিমদের জন্য খুবই উদ্বেগজনক। একদিকে তারা রণক্লান্ত; টানা কয়েকদিন যুদ্ধের ধকল গেছে তাদের ওপর দিয়ে। সবার এখন বিশ্রাম প্রয়োজন। আরেকদিকে যেকোনো সময় শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। এ কারণে কারও চোখে ঘুম নেই। ভয়াবহ উদ্বেগ কাজ করছে সবার মধ্যে। সেই উদ্বেগ থেকেই মদিনার প্রবেশদ্বার ও অলিগলিতে সে রাতে বিশেষ টহলের

---

[১] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০০

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২-১২৯; *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৫১; *গাযওয়ায়ে উহুদ,* মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমিল, পৃষ্ঠা : ২৭৮-২৮০

ব্যবস্থা রাখা হয়। সেইসাথে জোরদার করা হয় নবিজির নিরাপত্তা। কারণ তিনিই মুসলিম সেনাদের সর্বাধিনায়ক। সেজন্য তার ওপর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল প্রবল।

হামরাউল আসাদের যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে গভীর চিন্তায় ডুবে যান। রাতভর যুদ্ধের খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেন। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েও ভাবেন বিস্তর। তার আশঙ্কা হয়—মুশরিকদের মাথায় এই চিন্তা আসা বিচিত্র নয় যে, 'এই যুদ্ধে তারা সমূহ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। খালি হাতেই ফিরে গেছে একরকম। আর এমন চিন্তা এলে, তাদের মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হওয়া এবং সেখান থেকে গতিপথ পালটে সহসাই মদিনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

ভাবনাটি মাথায় আসতেই নবিজি এর একটি সমাধান বের করে ফেলেন। সঙ্গো সঙ্গো তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, যেভাবেই হোক মক্কার মুশরিক বাহিনীকে পিছু হটাতে হবে। যেকোনো মূল্যে তাদের মাথা থেকে মদিনা আক্রমণের চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারদের ভাষ্য অনুযায়ী, নবিজি উহুদ যুদ্ধের পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় হিজরির ৮ শাওয়াল রবিবার সকালে উপস্থিত সবাইকে ডাকেন। শত্রুদের বিরুদ্ধে নতুন এক অভিযান পরিচালনার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। এরপর নবিজি বলেন, 'যারা উহুদ যুদ্ধে আমাদের সাথে অংশ নিয়েছে, কেবল তারাই এ যাত্রায় আমাদের সাথে বের হবে।' এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মুসলিমদের সাথে অংশ নিতে চায়। কিন্তু নবিজি তাকে অনুমতি দেননি। ঘোষণা শেষ হতেই যুদ্ধাহত মুসলিমরা আঘাতের ক্ষত ও স্বজন হারানোর বেদনা বুকে চেপে 'লাব্বাইক' বলে দাঁড়িয়ে যান পরবর্তী অভিযানে শরিক হওয়ার জন্য।'

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বিশেষ কারণে উহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তাই এ যাত্রায় অন্তত নবিজির সঙ্গী হতে চান। সেজন্য তিনি অনুমতি চেয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি সব যুদ্ধেই আপনার সঙ্গো থাকতে চাই। সেজন্য প্রস্তুতও থাকি সবসময়। তা সত্ত্বেও বিশেষ কারণে এ যুদ্ধে আপনার সঙ্গো থাকতে পারিনি। আসলে আমার বাবা ও বোনদের দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনি অনুমতি দিলে এ যাত্রায় অংশ নিয়ে আমি তার কাফফারা করতে চাই।' তার আবেগকে সম্মান জানিয়ে নবিজি তাকে অনুমতি দেন।

এরপর মনোনীত সৈনিকদের নিয়ে মুশরিক বাহিনীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। মদিনা থেকে দক্ষিণে প্রায় ৮ মাইল দূরে হামরাউল আসাদে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এরই মধ্যে মাবাদ ইবনু আবি মাবাদ খুযাই নামের এক ভদ্রলোক এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য কারও কারও মতে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি; কেবল নবিজির শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। খুযাআ ও বনু হাশিমের মধ্যে স্থাপিত মৈত্রীচুক্তি

তার মধ্যে এ সদিচ্ছা সঞ্চার করেছিল।

তিনি এসে বলেন, 'ভাই মুহাম্মাদ, আমি আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের বিপদে খুবই মর্মাহত। আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি আপনাদের নিরাপদ রাখবেন এবং সুস্থ করে তুলবেন।' কুশল জিজ্ঞেস শেষ হলে, নবিজি তাকে বলেন, 'এবার তুমি গিয়ে আবু সুফিয়ানের সাথে যুক্ত হও এবং তাকে কথার ফাঁদে ফেলে মদিনা-আক্রমণের চিন্তা তার মাথা থেকে দূর করে দাও।'

মুশরিক বাহিনী পুনরায় মদিনা আক্রমণ করতে পারে বলে নবিজি যে আশঙ্কা করেছিলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে সেটাই সত্য প্রমাণিত হয়। তারা মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করে। যুদ্ধের ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা কিছুটা নেমে এলে তাদের বোধোদয় হয়। একদল বলে, তোমরা তো কাজের কাজ কিছুই করোনি। তোমাদের কী করার কথা ছিল আর কী করে এলে! তাদের ক্ষমতা চূর্ণ করেও কী মনে করে আবার ছেড়ে দিলে তাদেরকে? তোমরা চাইলেই তো তাদের সমূলে বিনাশ করে দিতে পারতে? তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তো এখনো বহাল তবিয়তে আছে। তারা কিন্তু নির্বিকার বসে থাকবে না। শক্তি সঞ্চয় করে সহসাই আঘাত হানবে তোমাদের ওপর। তাই সে-সুযোগ না দিয়ে এখনই ফিরে চলো মদিনায় এবং সমূলে বিনাশ করো তাদেরকে।

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া এ মতের বিরোধিতা করে বলে, 'ও আমার ভাইয়েরা, তোমরা এমন কাজ কোরো না। আমার ভয় হচ্ছে, খাযরাজ ও অন্যান্য গোত্রের যেসব মুসলিম উহুদ প্রান্তরে যেতে পারেনি, আমরা মদিনায় আক্রমণ করলে তারাও এবার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন পরিস্থিতি তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও। বিজয় এখনো তোমাদের হাতে। আমি এটা নিয়ে সন্দিহান, তোমরা এখন মদিনায় আক্রমণ করলে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে কি না।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! দুয়েকজন বাদে কেউই তার কথায় সায় দিল না। অর্থাৎ মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে।

তারা মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করার ঠিক আগমুহূর্তে মাবাদ ইবনু আবি মাবাদ সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। মদিনার দিক থেকে আসতে দেখে আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করে, 'মুসলিমদের কেমন দেখে এলে?' মাবাদ বলে, 'মুসলিমরা এখন আগের চেয়েও সংঘবদ্ধ আর শক্তিশালী। মুহাম্মাদ তোমাদেরকে ধাওয়া করার জন্য এতক্ষণে তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা সংখ্যায় এত বেশি যে, এত বড় বাহিনী আমি আগে কখনো দেখিনি। উহুদে যারা অংশ নিতে পারেনি, তারাও এবার নেমে পড়েছে তোমাদের বিরুদ্ধে। গতকালের বিপর্যয়ে তারা ভীষণ লজ্জিত। সে লজ্জা আজ ক্রোধ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা হয়ে ফুটছে তাদের চোখেমুখে। মানুষ যে এতটা আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক হতে পারে, সেটা আজই প্রথম জানলাম।'

আবু সুফিয়ান বলে, 'কী বলছ এসব? এমন হয়ে থাকলে তো সর্বনাশ!'

মাবাদ বলে, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি মুসলিম বাহিনীকে না দেখা পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না।'

আবু সুফিয়ান বলে, 'আল্লাহর কসম! আমরা মুসলিমদের সমূলে বিনাশ করতে মদিনায় গিয়ে আবার তাদের ওপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মাবাদ বলে, 'এমন করলে নির্ঘাত বিপদে পড়বে তোমরা। আমার কথা শোনো। সময় থাকতে ফিরে যাও, ভাই!'

এই পর্যায়ে এসে মুশরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। মৃত্যুর ভয় জেঁকে বসে তাদের চোখে-মুখে। মক্কায় ফিরে যাওয়াই নিরাপদ মনে করে তারা। আবু সুফিয়ানও তাই মক্কায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় তাদেরকে। তবে এর আগে সে মুসলিম বাহিনীকে হতোদ্যম করতে এবং তাদের সংঘর্ষ এড়াতে একটি স্নায়ুযুদ্ধ পরিচালনা করে। সে লক্ষ্য করে, তার বাহিনী যখন চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, ঠিক তখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে আব্দুল কাইস গোত্রের মদিনাগামী একটি কাফেলা। সে তাদেরকে ডেকে বলে, 'তোমরা কি আমার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদকে একটি বার্তা দিতে পারবে? বিনিময়ে তোমরা মক্কার ওকাজ বাজারে গেলে, তোমাদের বাহনে যতগুলো উট আছে, সেগুলো বোঝাই করে কিশমিশ দিয়ে দেব।'

তারা বলল, 'ঠিক আছে, বলুন কী বলতে হবে।'

আবু সুফিয়ান বলল, 'মুহাম্মাদকে বলবে, আমরা তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে সমূলে বিনাশ করতে পুনরায় মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

মুসলিম বাহিনী হামরাউল আসাদে পৌঁছলে, তাদের সাথে ওই কাফেলার দেখা হয়। তারা নবিজিকে আবু সুফিয়ানের বার্তা পৌঁছে দিয়ে বলে, 'মক্কার লোকেরা তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য আবারও সংঘবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং সাবধান!' এ কথা শুনে মুসলিমদের ঈমান ও শক্তি-সাহস আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা দৃপ্তকণ্ঠে বলে ওঠে—

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও দয়া লাভ করে ফিরে আসে। কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করেনি তাদেরকে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।[১]

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৭৩-১৭৪

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩য় হিজরির ৮ শাওয়াল রবিবার সকালে হামরাউল আসাদ পৌঁছেন। সেখানে মোট ৩ দিন অবস্থান করেন। তারপর মদিনায় ফিরে আসেন। ফেরার আগে আবু ইযযা জুমাহি তার হাতে বন্দি হয়। এই লোক বদর যুদ্ধেও একবার বন্দি হয়েছিল। সে যাত্রায় নবিজি তার অভাব ও কন্যা সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন—এই শর্তে যে, ভবিষ্যতে সে নিজে তো নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেই না, এমনকি অন্য কাউকে সাহায্যও করতে পারবে না। কিন্তু সে শর্ত ভঙ্গ করে; নবিজির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কবিতা লিখে তার বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ উগড়ে দিতে থাকে। ছন্দে ছন্দে কাফিরদের উত্তেজিত করে তোলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে। নানাভাবে তাদেরকে উস্কানিও দিতে থাকে যুদ্ধের জন্য। তার এসব ক্রিয়াকলাপ উহুদ যুদ্ধের ইন্ধন জোগায়। সে নিজেও মক্কার মুশরিকদের সাথে অংশ নেয় এই যুদ্ধে।

নবিজি তাকে বন্দি করলে সে বলতে থাকে, 'হে মুহাম্মাদ, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাকে প্রাণভিক্ষা দিন। আমার মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার প্রতি দয়া করুন। আমি ছাড়া তাদেরকে দেখার আর কেউ নেই। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কখনোই আপনার বিরুদ্ধে কিছু করব না আমি।' উত্তরে নবিজি বলেন, 'আর সম্ভব নয়। তোমাকে এখন ছেড়ে দিলে মক্কায় ফিরে গিয়ে গর্ব করে বলে বেড়াবে, 'আমি মুহাম্মাদকে দুই-দুইবার ধোঁকা দিয়েছি। শোনো, মুমিন এক গর্তে দুইবার পা দিতে পারে না।' এরপর তিনি যুবাইর অথবা আসিম ইবনু সাবিতকে বলেন তাকে হত্যা করতে। নির্দেশ অনুসারে তখনই তাকে হত্যা করা হয়।

আবু ইযযার মতো আরও একজন গুপ্তচরকে সেবার হত্যা করা হয়। তার নাম মুআবিয়া ইবনু মুগিরা ইবনি আবিল আস। সে ছিল আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের নানা। উহুদ যুদ্ধ শেষ করে মুশরিকরা মক্কায় ফিরে গেলে সে তার চাচাতো ভাই উসমান ইবনু আফফানের কাছে এসে নিরাপত্তা চায়। উসমান নবিজির কাছে নিরাপত্তার সুপারিশ নিয়ে গেলে, তিনি ৩ দিনের নিরাপত্তা মঞ্জুর করেন এবং বলেন, '৩ দিন পর তাকে মদিনায় পাওয়া গেলে হত্যা করা হবে।' মুসলিম বাহিনী কাফিরদের তালাশে বেরিয়ে পড়লে, এই লোক ৩ দিনের বেশি মদিনায় থেকে যায়। কুরাইশদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে। মুসলিম বাহিনী ফিরে আসার খবর পেয়েই সে পালিয়ে যায়। নবিজি তখন যাইদ ইবনুল হারিসা ও আম্মার ইবনু ইয়াসারকে দায়িত্ব দেন তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে। তারা দুজন যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করেন।[১]

---

[১] উহুদ যুদ্ধ ও হামরাউল আসাদের বিস্তারিত বিবরণ নেওয়া হয়েছে নিম্নের গ্রন্থ থেকে। *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০-১২৯; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠ : ৯১-১০৮; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৫-৩৭৭; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৪২-২৫৭; এছাড়া আরও অন্যান্য উদ্ধৃতি। যেখানে যা প্রয়োজন, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

হামরাউল আসাদ অভিযানের মধ্য দিয়ে উহুদ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যুদ্ধের জয়-পরাজয় নিয়ে নানামাত্রিক আলোচনা আছে। ঐতিহাসিকগণ সেগুলো সবিস্তারে তুলে এনেছেন। তাদের সমস্ত আলোচনা ছাপিয়ে যে প্রশ্নটি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি হচ্ছে—এ যুদ্ধে মুসলিমদের জয় হয়েছে নাকি পরাজয়? মুসলিমদের নিরেট জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন বাদ দিলে এটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে, যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপে মুশরিকদের পাল্লাই ছিল ভারী। পুরো ময়দানে ছিল তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। এ সময়ে মুসলিমদের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তাদের একটি দল। এতে আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় মক্কার মুশরিকদের হাতে। তারপরও এ যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দেওয়াটা বেশ মুশকিল। কারণ—

» তারা মুসলিম শিবির দখলে নিতে পারেনি।

» মুসলিমরাও সদলবলে রণাঙ্গন ত্যাগ করেনি। চিন্তাগত একটি ভুলের কারণে তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে এলেও তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পথ হারায়নি। এজন্যই শেষ পর্যন্ত তারা নবিজির পাশে গিয়ে সংঘবদ্ধ হতে পেরেছে।

» শেষদিকে এসে মুসলিমরা রণাঙ্গন ছেড়ে শিবিরে ভিড়েছিল ঠিক; কিন্তু তাই বলে তাদের শক্তিমত্তা এতটাও খর্ব হয়নি যে, মক্কার মুশরিকরা চাইলেই তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন কিংবা কচুকাটা করতে পারত। এমন হয়ে থাকলে তারা কিছুতেই মাঝপথে এসে ফিরে যেত না।

» তাছাড়া এ যুদ্ধে মুশরিকরা কোনো মুসলিমকেই বন্দি করতে পারেনি; গনিমত তো অনেক পরের কথা।

» তৃতীয় দফায় মুশরিক বাহিনী যুদ্ধের জন্য ময়দানে আসেনি; অথচ মুসলিমরা তখনো তাদের শিবিরেই অবস্থান করছিল।

» সে সময় যুদ্ধের একটি বিশেষ রীতি ছিল, যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী দল দুয়েক দিন যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করবে। মক্কার মুশরিকরা সেটাও করেনি। উলটো তারাই মুসলিমদের আগে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে।

» উহুদ প্রান্তরে মুসলিমদেরকে ঘায়েল করার পর বিজয় নিশ্চিত করার জন্য তারা মদিনায় আক্রমণ করতে পারত। কারণ মদিনা তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। এত বড় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা মদিনায় আক্রমণ করার সাহস পায়নি। বিজয়ী সেনারা কখনোই এমন সুযোগ হেলায় নষ্ট করে না।

এসব দিক পর্যালোচনায় আনলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, এ যুদ্ধে মক্কার

মুশরিক বাহিনী মুসলিমদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ফেলতে পারলেও চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করতে পারেনি। ওপরের শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে, তবেই নিজেদেরকে বিজয়ী বলে দাবি করতে পারত তারা। কারণ নিছক বিপর্যয় মানেই পরাজয় নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ীরাও অনেক সময় এমন বিপর্যয়ে পড়ে। কাজেই মুসলিমদের নিছক এই বিপর্যয়কে মুশরিকদের বিজয় বলে অভিহিত করা যায় না।

তাছাড়া আবু সুফিয়ানের তড়িঘড়ি ময়দান ত্যাগ করা থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়, মুসলিমদের ওপর তৃতীয় দফা আক্রমণ করলে তার বাহিনী ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত বা পরাস্ত হতো। হামরাউল আসাদে আবু সুফিয়ানের নড়বড়ে অবস্থান আমাদের এ মতকে আরও পরিপুষ্ট করে দেয়। তাই আমরা এ যুদ্ধকে জয়-পরাজয়ের সুস্পষ্ট নিক্তিতে না ফেলে, অমীমাংসিত যুদ্ধ বলতে পারি। উভয় দলই এ যুদ্ধে ভালো করেছে, আবার ক্ষতির মুখেও পড়েছে। একটা সময় উভয় দলই রণাঙ্গন ত্যাগ করেছে; তবে কেউই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়নি। এমনকি কেউ কারও কাছে নিজের শিবিরও ছেড়ে দেয়নি। আর এসবই অমীমাংসিত যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য।

যুদ্ধের এই ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

আর শত্রুদলের অনুসরণে তোমরা অলসতা প্রদর্শন কোরো না। তোমরা যেমন যন্ত্রণায় কাতর হও, মনে রেখো, তারাও তোমাদের মতোই যন্ত্রণায় কাতর হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা করো, তারা তা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ উভয় পক্ষের কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতিকে একই নিক্তিতে মেপেছেন। এ থেকেও বোঝা যায়, ফলাফলের বিচারে এ যুদ্ধে দুই পক্ষের অবস্থানই ছিল সমপর্যায়ের। কেউ কারও ওপর বিজয়ী যেমন হতে পারেনি, তেমনি কেউ কারও কাছে পরাজয়ও বরণ করেনি।

কুরআনের পাতায় উহুদের যুদ্ধ

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে এই যুদ্ধ সম্পর্কে বহুমাত্রিক আলোচনা করেছেন। যুদ্ধের

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১০৪

বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থা তুলে ধরে মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির কারণগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তুলে এনেছেন তাদের শক্তি ও দুর্বলতার এবং দায়বদ্ধতা ও অবহেলার দিকগুলো। তাছাড়া একজন মুমিনের মধ্যে কী কী গুণ থাকতে হয় এবং কোন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়—সে ব্যাপারেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পরম মমতায়।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের যাবতীয় গুণাবলি নিহিত রেখেছেন। সৃষ্টিকুলের সমস্ত কিছুর ওপর তাদেরকে দিয়েছেন বিশেষ মর্যাদাগত অবস্থান। সে কারণে এই মর্যাদার পরিপন্থি বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন পবিত্র কুরআনে। স্রষ্টাপ্রদত্ত এই মর্যাদা ও দিকদর্শনই মুসলিম উম্মাহকে অনন্য করে রেখেছে অপরাপর জাতি থেকে। শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে সর্বত্র। যে জাতির জন্ম ও বিকাশ মানুষের কল্যাণে, এমনই হয়ে থাকে তাদের মর্যাদা।

মুসলিমদের পাশাপাশি মুনাফিকদের অবস্থাও আলোচিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি লালিত বিদ্বেষের কথা প্রকাশ করে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। তাদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের ফলে দুর্বল মুসলিমদের অন্তরে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, সেগুলো খণ্ডন করে দেখানো হয়েছে। মুশরিক, মুনাফিক ও তাদের দোসর ইহুদিদের চক্রান্তগুলোও সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে ফুটে উঠেছে যুদ্ধ-সম্পর্কিত নিগূঢ় রহস্য ও প্রশংসনীয় বিষয়গুলো। এমনকি এই যুদ্ধের ব্যাপারে সুরা আলি-ইমরানের ৬০টি আয়াত নাযিল হয়েছে। সেখানে যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা বর্ণনা করার পর পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হয়েছে ঘটনা প্রবাহের ওপর। কুরআনের ভাষায়—

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ... ﴿١٢١﴾

স্মরণ করুন, মুমিনদেরকে যুদ্ধের ঘাঁটিতে মোতায়েন করতে আপনি যখন খুব সকালে 'ঘর' থেকে বের হয়েছিলেন।[১]

সবশেষে যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় এভাবে—

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১২১

এখন তোমরা যে (মিশ্র) অবস্থায় আছ, আল্লাহ মুমিনদেরকে সে অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না—অপবিত্রকে (মুনাফিক) পবিত্র (মুমিন) থেকে পৃথক না করে। আল্লাহ তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করবেন না। তবে তিনি রাসুলদের মধ্য থেকে যাকে চান, বেছে নেন। তাই তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[১]

ঘটনার পেছনের ঘটনা

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকেই উহুদ যুদ্ধের পেছনের কল্যাণকর দিকগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।[২] ইবনু হাজার বলেন, আলিমগণ উহুদ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের পেছনে আল্লাহর বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও মুসলিমদের নানা কল্যাণ-উপাদান নিহিত আছে বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন—

১. মুসলিমদের সামনে অবাধ্যতার পরিণাম ও নিষিদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার ভয়াবহতা তুলে ধরা। নবিজির নির্দেশ উপেক্ষা করে তিরন্দাজ বাহিনীর ময়দানে নেমে আসা এবং তার সূত্র ধরে গোটা বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়া অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম হিসেবেই আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

২. নবি-রাসুলদেরকে মাঝেমধ্যে বিপদে ফেলে তাদের অনুসারীদের আত্মোন্নয়ন করা। কারণ সব যুদ্ধে তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকলে, মুসলিম সমাজে এমন কিছু লোকের অনুপ্রবেশ ঘটবে, যারা মূলত মুসলিম নয়। তখন সৎ ও অসৎ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অপরদিকে যদি সবসময় পরাজয়বরণ করে তাহলে নবি-রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে জয়-পরাজয় দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে। এতে সত্যমিথ্যার পার্থক্য সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। মুনাফিকদের মনের বিদ্বেষ ও কপটতা মুসলিমদের সামনে দৃশ্যমান হয়ে যায়। তখন তারা বুঝতে পারে, কিছু শত্রু তাদের ভেতরেই ঘাপটি মেরে আছে। তারা নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দিলেও আসলে তারা দুমুখো সাপ। তাই যেকোনো মূল্যে তাদের প্রতিহত করা উচিত।

৩. কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ মানবীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করার জন্যও মুমিনদের সাহায্য বিলম্বিত করে থাকেন। কারণ আল্লাহ চান মুমিনরা দুঃসময়ে ধৈর্যধারণ করবে। সুসময়ে শোকরগুজার হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের মধ্যে হতাশা বা অহংকার

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৭৯

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৯-১০৮

থাকবে না। তাছাড়া হতাশা বলুন কিংবা অহংকার—দুটোই মুনাফিকের চরিত্র। মুমিনদের এসব থেকে পবিত্র থাকা একান্ত আবশ্যক।

৪. আল্লাহ মুমিনদের জন্য বিশেষ সম্মাননা রেখেছেন। কিন্তু বান্দা তার সীমাবদ্ধ আমল নিয়ে সে স্তরে পৌঁছতে অক্ষম। এজন্য মাঝেমধ্যে পরীক্ষায় ফেলে তাদের সেই মর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

৫. শাহাদাত একদিকে যেমন মুমিনের আরাধ্য বিষয়, অপরদিকে তেমনি এটা তার জন্য সর্বোচ্চ সম্মাননাও। আর এ সম্মাননা অর্জন করতে হলে এ ধরনের সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৬. আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার শত্রুদের শাস্তি বিধান করতে চান। সেজন্য মাঝেমধ্যে তাদেরকে মুসলিমদের ওপর জুলুম ও আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেন, যাতে পরবর্তীকালে মুমিনদের হাতে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয় এবং মুমিনরা গুনাহমুক্ত জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারে।[১]

উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ

উহুদ যুদ্ধের দুঃখজনক ঘটনার পর মুসলিমদের দাপটে ভাটা পড়ে। চিড় ধরে সযতনে গড়ে তোলা সুনামের দেওয়ালে। এতদিনে প্রতিষ্ঠিত প্রভাব-প্রতিপত্তি, মানুষের অন্তরে গেঁথে যাওয়া সমীহবোধ ফিকে হয়ে আসে অনেকখানি। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা জাপটে ধরে তাদেরকে। সেইসাথে দেখা দেয় চারদিক থেকে মদিনার ওপর হামলার আশঙ্কা। ইহুদি, মুনাফিক ও বেদুইন আরবরা ঘোষণা দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় নেমে পড়ে। একযোগে সবাই তৎপর হয়ে ওঠে মুসলিমদের সমূলে বিনাশ করে দিতে।

উহুদ যুদ্ধের ২ মাস এখনো পেরোয়নি। পুরোপুরি স্বস্তি ফেরেনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়গুলোতে। এরই মধ্যে সংবাদ আসে—বনু আসাদ মদিনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের ঝামেলা চুকতে না চুকতেই চতুর্থ হিজরির সফর মাসে আযল ও কারাহ গোত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দেয়। ১০ জন সরলমনা সাহাবি তাতে ফেঁসে যান এবং প্রাণ হারান। একই মাসে বনু আমির গোত্রের প্রতারণার শিকার হয়ে ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত-বরণ করেন। ইতিহাস এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটিকে 'বিরে মাউনা' নামে সংরক্ষণ করেছে। বনু নাজিরও এ সময় প্রকাশ্যে শত্রুতার মহড়া দেয়। তাদের দুঃসাহস এতটা বেড়ে যায় যে, চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তারা নবিজিকে পর্যন্ত হত্যা করার চেষ্টা করে। এর অল্প কিছুদিন বাদে জুমাদাল উলা মাসে

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৭

বনু গাতফান মদিনা আক্রমণের দুঃসাহস দেখায়।

মোটকথা, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার কারণে একটা সময় পর্যন্ত তাদেরকে চতুর্মুখী বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। অবশ্য এই দুর্দিন খুব বেশি দীর্ঘ হয়নি। নবিজির বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতায় শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হয়ে যায়; সেইসাথে মুসলিমরা ফিরে পায় তাদের হৃতগৌরব ও হারানো মর্যাদা।

মুসলিমদের এই হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনতে নবিজি সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেটি হচ্ছে, তিনি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত মুশরিক বাহিনীকে তাড়া করেন। এতে মুসলিমদের মান অনেকখানি রক্ষা পায়; সেইসাথে নিয়ন্ত্রণের লাগাম পড়ে ইহুদি ও মুনাফিকদের মাত্রাতিরিক্ত আস্ফালন ও ধৃষ্টতায়। এ অভিযানের পর নবিজি এমন কিছু সামরিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেন, যা শুধু মুসলিমদের মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিই করেনি; বরং তা বাড়িয়ে দিয়েছে আগের চেয়েও বহুগুণ। তার সে যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে—

আবু সালামার অভিযান

উহুদের পর সর্বপ্রথম মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করে বনু আসাদ ইবনু খুযাইমা।[১] গোয়েন্দাদের গোপন সূত্রে জানা যায়, খুওয়াইলিদের দুই পুত্র—তালহা ও সালামা তাদের গোত্র ও অনুসারীদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মদিনা ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আক্রমণের জন্য তাদেরকে আহ্বান করছে। সংবাদ পেয়ে নবিজি সঙ্গে সঙ্গে একটি বাহিনী পাঠান। এতে মুহাজির ও আনসার মিলে মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০ জন। বাহিনীর নেতৃত্ব ও পতাকা দেওয়া হয় আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে।

বনু আসাদ সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অভিযান পরিচালনা করার আগেই আবু সালামা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসেন। তার অতর্কিত আক্রমণে বনু আসাদের লোকজন দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটে পালায়। এতে বিপুল পরিমাণ উট ও বকরি মুসলিমদের দখলে চলে আসে। তারা সেসব নিয়ে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন।

চতুর্থ হিজরির মুহাররমের ১ তারিখে এ অভিযানটি পরিচালিত হয়। মদিনায় ফেরার পর আবু সালামা অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। উহুদ যুদ্ধে পাওয়া আঘাতের যন্ত্রণা ক্রমশই বৃদ্ধি পায় এবং অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২]

---

[১] বনু আসাদ ইবনু খুযাইমা আরবের অনেক বড় শক্তিশালী একটি গোত্র। আরবের পুরোনো খান্দান। তাদেরকে আদনানীয় আরব বলে। নবিজির পূর্বপুরুষ থেকে এদের বংশীয় ধারাবাহিকতা। আসাদ ইবনু খুযাইমা ইবনি মুদরিকা ইবনি ইলিয়াস ইবনি মুযার ইবনি নিযারের সাথে সম্পৃক্ত।

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৮

আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইসের অভিযান

চতুর্থ হিজরির মুহাররম মাস। ৫ তারিখের চাঁদ আকাশে জ্বলজ্বল করছে। জোছনা বিধৌত মদিনায় খবর এল—খালিদ ইবনু সুফিয়ান হুযালি মুসলিমদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করছে। সংবাদ পেয়ে নবিজি আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইসকে পাঠান এর একটা বিহিত করতে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস মদিনার বাইরে ১৮ রাত অবস্থান করেন। যুদ্ধ শেষ করে ফিরে আসেন মুহাররমের ২৩ তারিখে। সাথে আছে নিহত খালিদের কর্তিত মস্তক। পেশ করেন নবিজির দরবারে। নবিজি খুশি হয়ে তাকে একটি লাঠি উপহার দেন এবং বলেন, 'কিয়ামতের দিন এই লাঠি তোমার ও আমার সম্পর্কের নিদর্শন হবে।' মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি নিকটাত্মীয়দের অসিয়ত করেন, 'দাফনের সময় এই লাঠিটিও যেন তার কবরে রাখা হয়।'[১]

হৃদয়বিদারক রাজির ঘটনা

চতুর্থ হিজরির সফর মাস। সময়টা বেশ নাজুক। বৈরী ভাবাপন্ন গোটা আরব। এরই মধ্যে আযাল ও কারাহ গোত্রের প্রতিনিধি দল নবিজির নিকট আসে। তারা জানায়, তাদের ওখানে খুব ইসলামচর্চা হচ্ছে। এই চর্চাকে সঠিক ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে তাদের কয়েকজন ধর্মীয় শিক্ষক ও কুরআনের প্রশিক্ষক প্রয়োজন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের সাথে ৬ জন সাহাবি পাঠিয়ে দেন।

এটি মূলত ইবনু ইসহাকের মত। তবে *সহিহুল বুখারির* বর্ণনায় তাদের সংখ্যা ১০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যার মতো দলনেতা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে এই দুই মনীষীর মধ্যে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা মতে, এই প্রশিক্ষক-দলের দলনেতা ছিলেন মারসাদ ইবনু আবি মারসাদ আল-গানাবি। অন্যদিকে বুখারির মতে, দলনেতার নাম আসিম ইবনু সাবিত।

যাইহোক, নবিজির নির্দেশে নির্দিষ্টসংখ্যক সাহাবি প্রতিনিধি দলের সাথে যাত্রা করেন। কাফেলাটি জেদ্দা ও রাবেগের[২] মাঝামাঝি পৌঁছলে, রাজি[৩] নামক একটি জলাধারার পাশে যাত্রাবিরতি দেওয়া হয়। এ জলাধারটি হুযাইল গোত্রের[৪] অধীনে। এর চারপাশে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৯; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬১৯ ও ৬২০

[২] মক্কা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত সৌদি আরবের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল।

[৩] রাজি সৌদির নাজদ এলাকায় অবস্থিত একটি কূপ।

[৪] আরব উপদ্বীপের পশ্চিমের বাসিন্দা। আদনানি বংশোদ্ভূত। এদের মধ্যে অনেক কবি-সাহিত্যিক গত হয়েছেন। তারা ইতিহাসজুড়ে বেশ পরিচিত।

তাদেরই লোকজন বসবাস করত। প্রতিনিধি দল এখানে এসে প্রশিক্ষকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। হুযাইলের শাখা-গোত্র লিহইয়ানকে লেলিয়ে দেয় তাদের বিরুদ্ধে। লিহইয়ানের ১০০ জন তিরন্দাজ তাদের তালাশে বের হয়। পদছাপ ধরে খুঁজতে খুঁজতে একসময় তাদেরকে পেয়েও যায়। মুহূর্তেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে সাহাবিদের সবাইকে। বাধ্য হয়ে তারা একটি উঁচু টিলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। কাফিররা তাদের বলে, 'আমরা কথা দিচ্ছি, তোমরা নেমে এলে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না।'

আসিম তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। সঙ্গীদের সাথে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। শুরু হয় উভয় পক্ষের তিরবর্ষণ। শত্রুপক্ষের অবিরাম তিরের আঘাতে ৭ জন সাহাবি সেখানেই শাহাদাত-বরণ করেন। জীবিত থেকে যান কেবল খুবাইব, যাইদ ইবনু দাসিনা ও তৃতীয় আরেকজন সাহাবি। লিহইয়ান দ্বিতীয়বারের মতো সাহাবিদের হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কথামতো এই ৩ জন পাহাড় থেকে নেমে আসেন। কিন্তু তারা এই তিনজনের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করে। টিলা থেকে নামতেই তারা ধনুকের রশি কেটে পিঠমোড়া করে তাদের হাত বাঁধে। তৃতীয়জন তখন বলেন, 'এটা তোমাদের প্রথম গাদ্দারি। আমি তোমাদের সাথে যাব না।' অমানুষগুলো তখন তাকে জোর করে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। তাই তাকে তারা সেখানেই হত্যা করে ফেলে রাখে। বাকি থাকেন শুধু খুবাইব ও যাইদ। তারা এই দুজনকে মক্কার বাজারে বিক্রি করে দেয়।

এই দুই সাহাবি বদর যুদ্ধে মক্কার কয়েকজন গোত্রপ্রধানকে হত্যা করেছিলেন। তারই প্রতিশোধ নিতে গোত্রপ্রধানদের আত্মীয়রা এ দুজনকে কিনে নেয়। কেনার পর প্রথমে তারা খুবাইবকে বন্দি করে রাখে। এরপর তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। হারামের বাইরে তানইমে শূলিকাষ্ঠ প্রস্তুত করে খুবাইবকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। খুবাইব নির্ভার কণ্ঠে বলেন, 'আমাকে একটু সময় দাও। আমি ২ রাকাত সালাত পড়তে চাই।' কুরাইশরা তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করে। তিনি সালাত শেষ করে বলেন, 'তোমরা হয়তো ভাববে, আমি মৃত্যুর ভয়ে সালাত লম্বা করছি। নয়তো আমি আরও সময় নিয়ে সালাত পড়তাম।' এরপর তিনি এই বলে তাদের জন্য বদদুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আপনি এদের প্রত্যেকের হিসেব রাখুন। এদেরকে এক-এক করে ধ্বংস করুন। আপনি এদের একটাকেও ছাড় দেবেন না।' সবশেষে খুবাইব একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যার অর্থ—

আমার মরণ দেখবে বলে শত্রু এল সদলবলে
বাদ যায়নি নারী-শিশু, রুগ্‌ণ বুড়ো-বুড়ি!
মস্তবড় খেজুরগাছের কাছে, সব দাঁড়িয়ে আছে
আমার মরণ দেখবে বলে করছে ঘোরাঘুরি।
হে আরশের রব, তুমিই আমার সব, সবর দিয়ো মনে

যা করবে করুক আমার সনে।

টুকরো করুক গোশত দেহের, ছড়াক জনে জনে

মাওলা ওগো, সবর দিয়ো মনে!

দুই পেয়ালার সামনে যখন দাঁড়াই। বলে, 'করতে পারিস বাছাই!'

এক পেয়ালায় কুফর, আর পেয়ালায় মরণ!

কুফর ছেড়ে এক নিমেষেই মরণ নিলাম বেছে,

মৃত্যুভয়ে কাঁপেনি এই চরণ!

স্বীকার করি, ক্ষোভ জমেছে মনে। চোখ ভিজেছে কান্নামাখা জলে!

কী বোকামি করছে কাফিরদলে!

স্বস্তি শুধু মরব ঈমান নিয়ে, দিইনি তা বিকিয়ে

ভয় পাইনি ওদের ছলেবলে।

শত্রু এসে অস্ত্র চালাক, তোমার রাহে জান যাবে যাক,

আর কিছু নয়, মদদ তোমার চাই,

আমার দেহ হোক না শত ভাগ, ছিন্ন হয়ে যাক

প্রতি কণার সুফল যেন পাই।

কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে, আবু সুফিয়ান তাকে বলে, তোমার বদলে আমরা যদি মুহাম্মাদকে শূলে চড়াই আর তোমাকে তোমার পরিজনদের কাছে পাঠিয়ে দিই, তাহলে তুমি কি এই প্রস্তাবে রাজি হবে? খুবাইব বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটা কখনোই সম্ভব নয়। নবিজির গায়ে একটা কাঁটা ফুটবে আর আমি আপনজনদের সাথে আরামে সময় কাটাব—এটা কিছুতেই হতে পারে না।'

এ কথা শোনার পর তারা সঙ্গে সঙ্গে খুবাইবকে শূলে চড়িয়ে দেয়। নির্দয়ভাবে হত্যা করে তাকে। এরপর বেশ কয়েকজন সৈন্য নিযুক্ত করে তার লাশের প্রহরায়। কিন্তু আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরির সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সামনে তাদের সে সাবধানতা কোনো কাজেই আসেনি। তিনি রাতের আঁধারে ছদ্মবেশ ধরে সেখানে উপস্থিত হন। সবার চোখে ধুলো দিয়ে কৌশলে সরিয়ে আনেন তার লাশ। এরপর সসম্মানে তাকে দাফন করেন। উল্লেখ্য, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কলকাঠি নেড়েছে উকবা ইবনু হারিস। যেহেতু বদর যুদ্ধে খুবাইবের হাতেই তার বাবা নিহত হয়েছিল।

সহিহুল বুখারির বর্ণনায় এসেছে, 'খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পূর্বমুহূর্তে ২ রাকাত সালাতের রীতি চালু করেন। বন্দিদশায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভার; আত্মসমাহিত। ভয় বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না তার চেহারায়। এ সময় তাকে

তাজা আঙুর খেতে দেখা গেছে। অথচ মক্কায় তখন খেজুর পাওয়াও ছিল ভারি দুষ্কর।'

আটককৃত অপর সাহাবি যাইদ ইবনু দাসিনাকে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া কিনে নেয় এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ হিসেবে নির্মমভাবে হত্যা করে।

আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহু এর আগেই মুশরিকদের নিক্ষিপ্ত তিরে নিহত হন। বদর যুদ্ধে তিনি প্রভাবশালী এক মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। তার পরিবার ও গোত্রের লোকেরা তাই আসিমের মৃতদেহের কিয়দংশ নিয়ে আসতে লোক পাঠায়। তারা গিয়ে দেখে একঝাঁক মৌমাছি তার মৃতদেহ ঘিরে রেখেছে। কোনো উপায় না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে তারা। এ যাত্রায় আর জিঘাংসা বাস্তবায়ন করা হয় না তাদের। এটি ছিল আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহুর দুআর বরকত। তিনি মৃত্যুর আগে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ কোনো মুশরিক যেন আমার দেহ স্পর্শও করতে না পারে।' আল্লাহর তার দুআ কবুল করেন এবং তাকে রক্ষা করেন মুশরিকদের অপবিত্র স্পর্শ থেকে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, 'আল্লাহ মুমিন বান্দাকে তার জীবদ্দশায় যেভাবে আগলে রাখেন, মৃত্যুর পরও ঠিক সেভাবেই দেখভাল করেন।'[১]

বিরে মাউনার রোমহর্ষক ঘটনা

রাজির ঘটনার পরপরই একই মাসেই আরও একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। আগেরটার তুলনায় এটা ছিল আরও বেশি বেদনাদায়ক। ইতিহাসে ঘটনাটি বিরে মাউনা নামে[২] পরিচিত। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো—আবু বারা আমির ইবনু মালিক একবার নবিজির সাক্ষাতে মদিনায় আসে। নবিজি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে 'হ্যাঁ/না' কিছুই না বলে প্রস্তাব রাখে, 'হে আল্লাহর রাসুল, দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে আপনার কয়েকজন সাহাবিকে নাজদে পাঠিয়ে দিন। আমি আশাবাদী, সেখানকার লোকেরা আপনাদের দাওয়াত কবুল করবে।' নবিজি বলেন, 'আমার সাহাবিদের জন্য নাজদবাসীকে আমি নিরাপদ মনে করি না।' আবু বারা তখন বলে, 'আমি তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি। তারা আমার আশ্রয়ে থাকবে।' ইবনু ইসহাকের বর্ণনামতে, তার কথায় আল্লাহর রাসুল ৪০ জন সাহাবি প্রেরণ করেন। বুখারির বর্ণনায় অবশ্য তাদের সংখ্যা

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২; ১৬৯-১৭৯; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৯, *সহিহুল বুখারি* : ৪০৮৬

[২] বিরে মাউনা একটি ঐতিহসিক জায়গা। এর সঠিক অবস্থান কেউ বলতে পারে না। একেক ঐতিহসিক একেক স্থানের কথা বলেছেন। যেমন : এক. হাযেমি আল-হামদানি বলেন, মক্কা ও মদিনার আসা-যাওয়ার পথে বনু সুলাইম গোত্রের কাছে অবস্থিত। দুই. যামাখশারি বলেন, বনু আমির, হাররা ও বনু সুলাইমের মাঝে অবস্থিত। লেখকের অভিমতও এটাই। তিন. ওয়াকিদি বলেন, বনু সুলাইম ও বনু কিলাব অঞ্চলে বিদ্যমান। এছাড়া আরও অনেক মতভেদ রয়েছে এ বিষয়ে।

৭০ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ।

এই বিশাল দাওয়াতি কাফেলার আমির নিযুক্ত হন মুনজির ইবনু আমর। তিনি ছিলেন বনু সাইদা গোত্রের। তার উপাধি 'আল-মুতাক লি-ইয়ামুত' বা মৃত্যুর জন্য উৎসর্গিত। এই কাফেলার প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণির মুসলিম। তারা সবাই ছিলেন সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাশীল এবং কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী। তারা দিনের কিছু সময় লাকড়ি সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফফার[১] জন্য খাবার কিনতেন। আর দিনের বাকি সময় কাটাতেন কুরআনের দারসে, ডুবে যেতেন কুরআনের মর্ম ও ভাব হৃদয়ঙ্গমের সাধনায়। গভীর রাতে তারা রবের সামনে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সিজদায় পড়ে একান্ত আরজি পেশ করতেন রবের সকাশে। এই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিদিনের কাজকর্ম। এমন গুণধর সাহাবিদেরকেই পাঠানো হয় নাজদের অধিবাসীদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করার জন্য। তারা মরুপ্রান্তর ও গিরি-উপত্যকা পেরিয়ে বিরে মাউনার ধারে এসে যাত্রাবিরতি করেন। বিরে মাউনা মূলত একটি কূপের নাম। এটি বনু আমির, হাররা ও বনু সুলাইমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

সেখানে পৌঁছে তারা উম্মু সুলাইমের ভাই হারাম ইবনু মিলহানকে নবিজির পত্র দিয়ে আমির ইবনু তুফাইলের কাছে পাঠান। কিন্তু নরাধমটা সে পত্র খুলে দেখার সৌজন্যটুকুও রক্ষা করেনি। দূতের পরিচয় পেতেই একজনকে নির্দেশ দেয় তাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করতে। অমনি পেছন থেকে বর্শা নিক্ষেপ করে আরেক নরাধম। সে আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে, মুহূর্তেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় হারাম ইবনু মিলহানের দেহ। এমনকি বুকের দিকে তাকিয়ে সে বর্শার রক্তমাখা মাথাটাও তিনি দেখতে পান। অমনি তিনি বলে ওঠেন, 'আল্লাহু আকবার, কাবার রবের কসম, আমি আমার উদ্দেশ্যে সফল।'

দূত হত্যার পর সে বাকি সাহাবিদের হত্যার জন্য বনু আমিরকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের গোত্রপতি আবু বারা সাহাবিদের নিরাপত্তা দিয়েছে বলে তারা জানতে পারে। তাদের সাড়া না পেয়ে আমির ইবনু তুফাইল বনু সুলাইম[২] গোত্রে যায়। তাদেরকে সফররত মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আহ্বান জানায়। উসাইয়া, রিল ও যাকওয়ান শাখার লোকেরা তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা মুসলিমদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। শুরু হয় একটি অসম লড়াই। তবু সাহাবিগণ প্রাণপণ লড়াই করে যান। একে একে শহিদ হন তাদের সবাই। প্রাণে

---

[১] সুফফা হলো মাসজিদে নববির পেছনের একটি অংশ, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগত অসহায় সাহাবিদের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। যারা এখানে বসবাস করত, তাদেরকে বলা হতো আহলে সুফফা বা সুফফার অধিবাসী। এখনো মাসজিদে নববিতে সুফফা নামক স্থানটি চিহ্নিত আছে। [দেখুন—*ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৯৫; *তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৪০]

[২] বনু সুলাইম আরব উপজাতি। হিজায ও নাজদ এলাকায় তারা বসবাস করত।

বেঁচে যান কেবল কাব ইবনু যাইদ ইবনি নাজ্জার। তিনি কোনোমতে প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হন। পরে তিনি খন্দক যুদ্ধে শহিদ হন।

ঘটনাক্রমে আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরি ও মুনজির ইবনু উকবা ইবনি আমির তখন ওই অঞ্চলের একটি চারণভূমিতে উট চরাচ্ছিলেন। পাশেই পাখিদের বৃত্তাকারে উড়তে দেখে তারা ছুটে আসেন সেখানে। এসে দেখেন এরই মধ্যে নির্মমভাবে শহিদ করা হয়েছে তাদের সঙ্গীদেরকে। মুনজির তখন মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত-বরণ করেন। তার সঙ্গী আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরি বন্দি হন তাদের হাতে। পরে যখন জানা যায়, তিনি মুযার গোত্রের লোক, তখন আমির তার মাথার ঝুটি চেঁছে এই বলে ছেড়ে দেয় যে, আমার মা একজন ক্রীতদাস মুক্তির মানত করেছিলেন (তাই তোকে ছেড়ে দিলাম)।

মুক্ত হয়ে তিনি সোজা নবিজির কাছে চলে আসেন। বিরে মাউনায় ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা খুলে বলেন তাকে। প্রথম সারির ৭০ জন সাহাবির মৃত্যু উহুদ যুদ্ধের বেদনাকে আরও গভীর করে তোলে। উহুদ যুদ্ধে তবু তো তারা লড়াই করতে পেরেছিলেন; কিন্তু এই ৭০ জন তো প্রতারণার শিকার হয়ে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছেন। এজন্য দুঃখবোধটা নিদারুণ শক্ত হয়ে বাজতে থাকে তাদের বুকের ভেতর।

আমর ইবনু উমাইয়া ফেরার পথে কানাত উপত্যকার কানকারা নামক স্থানে এসে যাত্রাবিরতি করেন। একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন কিছুক্ষণ। এ সময় আরও ২ জন মুসাফির এসে সেখানে যাত্রাবিরতি করে। তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমর তাদেরকে এই ভেবে হত্যা করেন যে, এরা ঘাতক সম্প্রদায়ের লোক। তাই নিহত মুসলিমদের রক্তপণ হিসেবে এদেরকে হত্যা করা আবশ্যক। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, নবিজির সাথে মাত্রই তাদের নিরাপত্তাচুক্তি হয়েছে। নবিজির কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'এমন দুজনকে হত্যা করেছ, যাদের রক্তপণ দিতে আমরা বাধ্য।' এ কথা বলে তিনি মুসলিম ও ইহুদি মিত্রদের থেকে রক্তপণ সংগ্রহের উদ্যোগ শুরু করেন। পরে এই রক্তপণ সংগ্রহ-চেষ্টাই বনু নাজিরের সাথে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১] সামনে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

উহুদ যুদ্ধের পরপরই ঘটে রাজির ঘটনা। সে ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই সামনে আসে বিরে মাউনার রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড।[২] এক সঙ্গে তিন-তিনটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮৩-১৮৮; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৯ ও ১১০; *সহিহুল বুখারি* : ৪০৯৩

[২] ইমাম ওয়াকিদি বলেন, রাজি ও মাউনার সংবাদ নবিজির কাছে একই রাত্রিতে এসে পৌঁছায়।

যাওয়ায় নবিজি খুবই মর্মাহত হন। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে তার চেহারায়।[১] সীমাহীন মনঃকষ্ট নিয়ে তিনি বদদুআ করতে থাকেন ঘাতক ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'বিরে মাউনায় যারা সাহাবিদের হত্যা করেছিল, আল্লাহর রাসুল তাদের বিরুদ্ধে একটানা ৩০ দিন বদদুআ করেন ফজরের সালাতে।' এসব গোত্রের মধ্যে ছিল রিল, যাকওয়ান, লিহইয়ান[২] ও উসাইয়া। দুআয় তিনি বলতেন, 'উসাইয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানি করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন।' নবিজির দুআর বদৌলতে শহিদ সাহাবিদের সম্মানে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী সময়ে সেই আয়াত মানসুখ বা রহিত করা হয়। আয়াতের অর্থ ছিল এরকম, 'আমাদের সম্প্রদায়কে এ কথা জানিয়ে দিন। আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এই সুসংবাদ পেয়ে নবিজি কুনুতে নাযেলা[৩] পাঠ করা ছেড়ে দেন।'[৪]

বনু নাজিরের যুদ্ধ

আমরা আগেই জেনেছি, ইহুদিরা ছিল খুবই হিংসাপরায়ণ। হিংসার চাষাবাদ ছিল তাদের হৃদয়-কুঠুরিতে। ইসলামের সাফল্য ও মুসলিমদের কর্মতৎপরতা দেখে তারা সবসময় হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরত। গায়ের জোরে কিছু করার সাহস তাদের ছিল না। তবে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ত ঠিকই। জন্মগতভাবেই তারা ভীরু ও কাপুরুষ। কারও সাথে যুদ্ধ করার মতো পৌরুষ তাদের কখনোই ছিল না। হিংসা-বিদ্বেষ এবং প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় তারা সিদ্ধহস্ত। এসব তাদের বিশেষ পুঁজি বা অবলম্বন। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এসব উগরে দিত আগ্নেয়গিরির মতো। মুসলিমরা যেহেতু তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল, তাই তাদের বিরুদ্ধেও তারা একই পথে হাঁটে। বিদ্বেষ ও শত্রুতার চর্চা করে সবখানে।

মুসলিমরা প্রথম যখন মদিনায় আসে, তখনই ইহুদিদের সাথে মৈত্রীচুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনু সাদ বর্ণনা করেন, রাজি ও মাউনার ঘটনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতটা কষ্ট-বেদনা পেয়েছেন, অন্য কোনো ব্যাপারে তাকে এত বেশি কষ্ট পেতে দেখিনি কখনো। [*মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৬০]

[২] আরবের এক পৌত্তলিক উপজাতি। আদনানিদের সাথে সম্পৃক্ত।

[৩] মানুষ-সৃষ্ট বিপদ-আপদে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুসলিমদের পরিত্রাণের জন্য কিংবা অন্য কারও ওপর বদদুআ করতে জামাতের সাথে ফজরের সালাতের শেষ রাকাতে যে বিশেষ দুআ করা হয়, তাকে কুনুতে নাযেলা বলে। সাধারণত অত্যাচারিত মুসলিমরা জালিমের বিরুদ্ধে এই দুআ করে বলে কুনুতে নাযিলা বদদুআ হিসেবেই বেশি প্রসিদ্ধ। [*যাদুল মাআদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৪; মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত]

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ২৮১৪, ১০০৩

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মোটামুটি ভালোই যাচ্ছিল তখন। কিন্তু পরে বনু কাইনুকার দেশান্তর এবং কাব ইবনু আশরাফের হত্যাকাণ্ড সে সম্পর্ক অনেকটা শীতল করে দেয়। তাদের ওপর মুসলিম-ভীতি চেপে বসে এবং তারা অনুভব করে যে, তাদের শিকড় ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে তারা ভক্তির মোড়কে শুরু করে বিদ্বেষের চাষাবাদ। উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর সেই খোলসটুকুও খসে পড়ে তাদের চেহারা থেকে। তাদের দুঃসাহসের মাত্রা বেড়ে যায়। তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে। মুনাফিকরা হয়ে ওঠে তাদের বন্ধু। একে অপরের যোগসাজশে চলতে থাকে নতুন সব চক্রান্ত। মক্কার মুশরিকদের সাথেও চলে তাদের গোপন দেন-দরবার। নিজেদের স্বার্থে আদাজল খেয়ে তারা মাঠে নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে।[১]

নবিজি সবই জানতেন। বলতেন না কিছুই। ধৈর্যের পরিচয় দিতেন মৈত্রীচুক্তির ব্যাপারগুলোতে। কিন্তু রাজি ও বিরে মাউনার দুঃখজনক ঘটনার পর তাদের স্পর্ধা এতটা বেড়ে যায় যে, তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এমনকি একপর্যায়ে নবিজিকেও হত্যা করার চেষ্টা করে।

পাথর-চাপা দিয়ে নবিজিকে হত্যার চেষ্টা

বিরে মাউনার ঘটনার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবি নিয়ে ইহুদি-পল্লিতে যান আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরির হাতে নিহত বনু কিলাবের[২] দুই ব্যক্তির রক্তপণ সংগ্রহ করতে। চুক্তি অনুযায়ী তারা এই রক্তপণ পরিশোধে সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। তারা নবিজির আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বলে, 'আবুল কাসিম! আপনি দয়া করে এখানে একটু বসুন। আমরা এখনই আপনার কাজ সমাধা করার চেষ্টা করছি।' নবিজি একটি ঘরের দেওয়াল-ঘেঁষে বসেন। তার সাথে তখন উপস্থিত ছিলেন আবু বকর, উমার, আলিসহ আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাহাবি।

এদিকে নবিজিকে বসিয়ে রেখে তারা গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। এ সময় শয়তান তাদের মাথায় কুবুদ্ধি ঢেলে দেয়। শয়তানের প্ররোচনায় তারা নিজেদের পরিণামের কথা ভুলে যায়। তাই শলা-পরামর্শে তারা নবিজিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। মনে মনে ভাবে, এই তো সুযোগ! এখনই শেষ করে দিতে হবে মুহাম্মাদকে। এরপর তারা আলোচনা করে এই হত্যাকাণ্ড কার মাধ্যমে ঘটানো যায় সে সম্পর্কে। নেতৃস্থানীয়রা বলে, 'আমরা মুহাম্মাদকে পাথর-চাপা দিয়ে হত্যা করতে চাই। এই সেই পাথর। তাই তোমাদের মধ্যে কে এই বিশাল পাথরটি ছাদের ওপর থেকে তার মাথায় ফেলতে পারবে?' আমর ইবনু জাহহাশ নামের এক হতভাগা বলে ওঠে, 'আমি পারব।' তখন

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০০৪; *আউনুল মাবুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১১৬ ও ১১৭

[২] বনু কিলাব ইসলামপূর্ব যুগে মধ্য আরবের নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা বনু আমির ইবনি সাসাআর প্রধান শাখা ছিল।

সাল্লাম ইবনু মিশকাম নামের এক ভদ্রলোক বলে, 'তোমরা এটা কোরো না। আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, তোমাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে এখনই তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে অদৃশ্য সত্তার পক্ষ থেকে। তাই সাবধান হয়ে যাও। তাছাড়া এমন কিছু করলে, তাদের ও আমাদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তিও ভেঙে যাবে।' কিন্তু কে শোনে কার কথা! তারা তাদের চক্রান্তের ওপর অবিচল থাকে। পরে তাদের খেসারতও দিতে হয়েছে সেভাবেই।

তাদের পরামর্শ শেষ হতে না হতেই জিবরিল আমিন ওহি নিয়ে আসেন নবিজির কাছে। মুহূর্তেই ফাঁস হয়ে যায় তাদের ষড়যন্ত্র। নবিজি সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন। সাহাবিরা তার আচানক প্রস্থানের কারণ জানতে চাইলে, তিনি ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরেন।

মদিনায় ফিরেই তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাকে এই নির্দেশ দিয়ে বনু নাজিরে[১] পাঠান, 'তোমরা অতি শীঘ্রই মদিনা ত্যাগ করো। তোমরা ইতোমধ্যেই এখানে বসবাসের অধিকার হারিয়েছ। তোমাদের ১০ দিনের সময় দিলাম। ১০ দিন পর কাউকে এখানে পাওয়া গেলে, তাকে হত্যা করা হবে।'

এই চরমতম হুঁশিয়ারির পর ইহুদিদের সামনে মদিনা ছেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। তাই সুবোধ বালকের মতো তারা তল্পিতল্পা গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুনাফিক-সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে বলে পাঠায়, 'তোমরা কোথাও যাবে না তোমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে। আমি ২ হাজার সৈন্য নিয়ে এখনই তোমাদের সাথে অবস্থান নিচ্ছি তোমাদের দুর্গে। তোমাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তাছাড়া বনু কুরাইজা[২] ও গাতফানের[৩] লোকেরাও এগিয়ে আসবে তোমাদের সাহায্যে।' তার এই বক্তব্য কুরআনে স্থান পেয়েছে এভাবে—

لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾

---

[১] বনু নাজির ইহুদিদের অনেক বড় গোত্র। তারা কুবা মসজিদের সন্নিকটে শহরতলিতে অবস্থান করত। নিজেদের বাপ-দাদার দেশ ত্যাগ করে মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব বাতহান নামক উপত্যকায় এসে বসতি গড়ে তোলে। বাতহান ছিল মদিনার সবচেয়ে বড় উপত্যকা।

[২] বনু কুরাইজা একটি ইহুদি উপজাতি। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তারা মদিনায় বসবাস করে। বংশতালিকায় কুরাইজা ইবনু নামাম ইবনি খাযরাজ থেকে হারুন ইবনু ইমরান আলাইহিস সালামের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

[৩] জাহিলি যুগের অনেক বড় একটি গোত্র। নাজদ এবং হিজায এলাকায় তারা বাস করত।

> তোমাদেরকে নির্বাসিত করা হলে, আমরাও তোমাদের সাথে দেশত্যাগ করব। তোমাদের ব্যাপারে কারও কোনো কথা মানব না। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের এ আশ্বাসে ইহুদিদের নেতা হুয়াই ইবনু আখতাব বুকে বল ফিরে পায় এবং সেই বলে বলীয়ান হয়ে সে নবিজিকে বলে পাঠায়, 'আমরা আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না। আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন।'

তাদের এই প্রতিউত্তরের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের জন্য ত্বরিত যথাযথ ব্যবস্থামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল বেশ কঠিন। কারণ মুসলিমরা তখন ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিনতম মুহূর্ত পার করছিল। উহুদ যুদ্ধের পর যে সময়টা ছিল ক্ষত সারিয়ে ওঠার, সে সময়টায় ক্ষত তো সারেইনি; বরং আরও গভীর হয়েছে রাজি ও বিরে মাউনার ঘটনায়। সবশেষে বনু নাজির কর্তৃক নবিজির-হত্যাচেষ্টা চরমভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে মুসলিমদের শেকড়। তাদের এই ধৃষ্টতার একমাত্র শাস্তি ছিল তরবারির শানিত আঘাত। কিন্তু মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এখন এর অনুকূল নয়। তাছাড়া বাইরের পরিস্থিতিও ভীষণ বৈরী। আরবের সকল গোত্র তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এজন্য তারা যেদিকেই যাচ্ছে, পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, নির্মমভাবে শহিদ হচ্ছে।

এই নাজুক পরিস্থিতিতে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া খুব সহজ কথা নয়। অবশ্য এসব বিবেচনা বাদ দিয়ে যদি শুধু বনু নাজিরের একক শক্তির দিকেও তাকানো হয়, তাহলেও এই মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খুব নিরাপদ নয়। কারণ তাদের দুর্গে অস্ত্র ও রসদের মজুদ মুসলিমদের চেয়েও ঢের বেশি। এজন্য সহসাই তারা আত্মসমর্পণ করবে—এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধ দীর্ঘ হবে। আর এই মুহূর্তে দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনা করা মানে নতুন বিপদ ডেকে আনা।

কিন্তু কারও যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন রুখে দাঁড়ানো ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। মুসলিমদের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়। উহুদের বিপর্যয় এবং রাজি ও বিরে মাউনার ঘটনায় চারপাশের মানুষদের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রিয় সঙ্গীদের বেঘোরে প্রাণ-বিসর্জন তাদের হৃদয়ে যে ক্ষোভ ও ক্ষত তৈরি করেছিল, বনু নাজিরের নবিহত্যার চেষ্টা সেটাকে বিস্ফোরক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে তারা বনু নাজিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। তাদের বিশ্বাস—এই যুদ্ধের ফলাফল যা-ই হোক, এর মাধ্যমে অন্তত নতুন পথের সূচনা হবে। অন্যথায় বিরোধী চক্রের যে লোলুপ

---

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ১১

দৃষ্টি তাদের দিকে প্রসারিত হয়েছে, তা তাদের শেকড় ধরে টান দেবে।

এসব দিক বিবেচনায় এনে হুয়াই ইবনু আখতাবের উদ্ধত জবাবের প্রেক্ষিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ঘোষণা দেন। মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করেন আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমকে আর যুদ্ধের পতাকা তুলে দেন আলি ইবনু আবি তালিবের হাতে। তারা বনু নাজিরের নাকের ডগায় পৌঁছে অবরোধ আরোপ করেন। নিশ্বাস ফেলতেও এবার চিন্তা করতে হয় তাদের। নিরুপায় হয়ে তারা সব গুটিয়ে আশ্রয় নেয় দুর্গের ভেতরে। আত্মরক্ষার্থে প্রাচীরের ওপর থেকে মুসলিমদের লক্ষ্য করে তির-পাথর নিক্ষেপ করে। এক্ষেত্রে চারপাশের খেজুর গাছ ও বাগ-বাগিচা বিশেষ কাজে আসে তাদের। তারা এগুলোর আড়াল কাজে লাগিয়ে মুসলিম সেনাদের নিশানায় পরিণত করে। কাজেই নবিজি সেগুলো কেটে ও পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এ দিকে ইঙ্গিত করেই কবি হাসসান আবৃত্তি করেন—

বিশাল বাগান পুড়ে গেল
তবু তাদের বিকার নাই,
মুখ বুজে সব মানতে হবে
এ ছাড়া যে উপায় নাই!

মহান আল্লাহ মুসলিমদের এই কাজের সমর্থনে অবতীর্ণ করেন—

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ... ﴿٥﴾

তোমরা খেজুরের যে গাছ কেটেছ বা তার শিকড়ের ওপর বহাল রেখেছ, তা আল্লাহরঅনুমতিক্রমেই।[১]

দুর্গ অবরোধ করা হলে বনু কুরাইজা তাদের থেকে পৃথক থেকে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। বনু গাতফানও ভুলে যায় তাদের মৈত্রীচুক্তির কথা। কেউ এগিয়ে আসে না তাদের দিকে। না সাহায্য নিয়ে আর না প্রাণ বাঁচাতে। তাদের নির্বিকার মিত্রদেরকে আল্লাহ শয়তানের সঙ্গে তুলনা করে বলেন—

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

---

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ৫

এরা আসলে শয়তানের মতো, সে মানুষকে বলে কুফরি করো। এরপর মানুষ যখন কুফরি করে, তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভীষণ ভয় করি।[১]

মুসলিমদের অবরোধ খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয় না। মাত্র ৬ রাত বা ১৫ রাত। এরই মধ্যে অবরুদ্ধ ইহুদিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ঢেলে দেন। তাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা যুদ্ধের সংকল্প ছেড়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী তারা নবিজির কাছে দূতের মাধ্যমে এই বার্তাটি পাঠায়—

আমরা মদিনা ত্যাগ করতে প্রস্তুত। দয়া করে অবরোধ তুলে নিন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শর্তে তাদের প্রস্তাব মেনে নেন যে, 'তারা তাদের সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে চলে যাবে। উটের পিঠে যতটুকু মালামাল বহন করা যায়, কেবল সেটুকুই সঙ্গে করে নিতে পারবে। এর বাইরে কোনো ধরনের অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না।'

বনু নাজির শর্ত মেনে আত্মসমর্পণ করে। এক-এক করে সবাই দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে। এ সময় তারা তাদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। কেটে ফেলে তাদের গাছগাছালি ও সাজানো বাগান। উটের পিঠে বহনের উপযুক্ত করে তোলা হয় ঘরের দরজা-জানালা। এমনকি, অনেককে ছাদের কড়িকাঠ, দেওয়ালের খুঁটি এবং এ জাতীয় অন্যান্য নির্মাণসামগ্রীও সঙ্গে নিতে দেখা যায়। তারা মোট ৬০০ উটে তাদের মালামাল বোঝাই করে মদিনা থেকে যাত্রা করে। অধিকাংশ ইহুদি, হুয়াই ইবনু আখতাব এবং সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইকের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খাইবারের পথ ধরে। বাকিরা পাড়ি জমায় সিরিয়ায়। এত এত লোকের মধ্যে সেদিন মাত্র ২ জন ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের একজন ইয়ামিন ইবনু আমর। অপরজন আবু সাদ ইবনু ওয়াহাব। এ দুজন সাহাবির ধনসম্পদসহ সবকিছু সংরক্ষণ করা হয়। কেউ হস্তক্ষেপ করে না সেগুলোতে।

বনু নাজির চলে যাওয়ার পর নবিজি তাদের অস্ত্রগুলো কবজা করেন। জমিজমা, বাড়িঘর ও ধনসম্পদ নিজের অধিভুক্ত করেন। অস্ত্রের মধ্যে ছিল ৫০টি লৌহ বর্ম, ৫০টি শিরস্ত্রাণ এবং ৩৪০টি তরবারি। আল্লাহ বিশেষভাবে তাঁর রাসুলকে এ সমুদয় সম্পত্তি ও যুদ্ধাস্ত্রের মালিক করেন। এখানে গনিমতের কোনো বিধান কার্যকর হয় না। কারণ বিনাযুদ্ধেই আল্লাহ এসব তার হাতে এনে দিয়েছেন। কোনো পদাতিক বা আরোহী যোদ্ধাকে যুদ্ধ করতে হয়নি এজন্য। তবু নবিজি সেসব সম্পদ প্রথম সারির

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ১৬

মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এর বাইরে আনসারদের মধ্যে শুধু আবু দুজানা ও সাহল ইবনু হুনাইফকে কিছু অংশ দেওয়া হয় তাদের দারিদ্র্যের দিকে লক্ষ রেখে। অবশ্য এখান থেকে নবিপত্নীদের সারা বছরের খরচপত্রও নির্বাহ করা হয়। বাকি সম্পদ ব্যয় করা হয়েছে অস্ত্র ও রসদের পেছনে।

বনু নাজিরের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল তথা ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সংঘটিত হয়। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ সুরা হাশর অবতীর্ণ করেন। সেখানে তিনি ইহুদিদের দেশান্তর হওয়া মুনাফিকদের শঠতা নিয়ে আলাপ করেন। 'মালে ফাই' বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিধান, আনসার ও মুহাজিরদের সদ্‌গুণ এবং বিশেষ বিবেচনায় শত্রু-ভূমিতে জ্বালাও-পোড়াও ও বনভূমি উজাড় করার বিধানাবলিও সবিস্তরে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনে এমন কিছু করতে হলে, সেটা কখনোই বিশৃঙ্খলা বলে বিবেচিত হয় না। এসব ঘটনা ও বিধানাবলি বর্ণনার পর তিনি মুমিনদেরকে তাকওয়া ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের উপদেশ দেন। সবশেষে তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর নামসমূহ, গুণাবলি ও প্রশংসামূলক কথা বলে সুরার সমাপ্তি টানেন। ইবনু আব্বাস বলেন, 'সুরাতুল হাশরের অপর নাম সুরা নাজির।'[১]

নাজদের যুদ্ধ

বনু নাজিরের যুদ্ধে মুসলিমরা কোনো ধরনের যুদ্ধবিগ্রহ বা সংঘর্ষ ছাড়াই বিশাল সাফল্য অর্জন করে। এতে মদিনায় তাদের হারানো জৌলুস ফিরে আসে। হাসি ফুটে ওঠে স্বজন-হারানো দুখী মানুষগুলোর মুখে। মজবুত হয় মুসলিমদের ভিত্তি। ওদিকে আবারও নড়বড়ে হয়ে ওঠে মুনাফিকদের অবস্থা ও অবস্থান। ভেস্তে যায় তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল।

মদিনা এখন নিরাপদ। ভেতরের পরিবেশ পুরোদস্তুর শান্ত। প্রাণজুড়ানো হিমেল হাওয়া বয়ে চলেছে ইয়াসরিবের প্রতিটি কোণে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার ভেতর সামলে বাইরের দিকে মনোযোগী হন। প্রথমেই তিনি বেদুইনদের পর্যবেক্ষণে আনেন। কারণ উহুদ যুদ্ধের পর থেকে এরা মুসলিমদের কষ্ট দিয়ে আসছিল। দ্বীনের দাঈদের ওপর খড়্গ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল তার বিশ্বস্ত ও প্রশিক্ষিত সাহাবিদের।[২] এরা এত বাড় বেড়েছিল যে, মদিনায় আক্রমণের ফন্দি পর্যন্ত এঁটেছিল।

বনু নাজিরের যুদ্ধ শেষে নবিজি বিশ্বাসঘাতক বেদুইনদের শিক্ষা দেওয়ার কথা

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯০-১৯২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭১ ও ১১০, *সহিহুল বুখারি* : ৪০২৯, ৪৮৮৩

[২] *ফিকহুস সিরাহ*, মুহাম্মাদ আল-গাযালি, পৃষ্ঠা : ২১৪

ভাবছিলেন। এরই মধ্যে সংবাদ আসে, বনু গাতফানের শাখাগোত্র বনু মুহারিব ও বনু সালাবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে বেদুইনদের থেকে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছে। সংবাদ পেয়ে নবিজি সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যসামন্ত নিয়ে নাজদ অভিমুখে রওনা করেন। এবার তার লক্ষ্য বেদুইনদের অন্তরে ভয়ের বীজ বপন করা, যেন অদূর ভবিষ্যতে তারা মুসলিমদের দিকে চোখ তুলেও তাকাতে না পারে।

লুণ্ঠন, ছিনতাই ও হঠকারিতায় অভ্যস্ত বেদুইনরা মুসলিমদের এই আকস্মিক অভিযানের সংবাদ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রতিরোধের কথা না ভেবে তারা সোজা গিয়ে আশ্রয় নেয় পাহাড়-চূড়ায়। মুহূর্তে তাদের মাথা থেকে উধাও হয়ে যায় মুসলিমদের ওপর আক্রমণের চিন্তা। তারাই বরং এখন মুসলিমদের ভয়ে কুণ্ঠিত। প্রাণভয়ে পলাতক। তাদের এই ভয়-বিহ্বলতায় নবিজির করুণা হয়। তিনি কোনো রকমের রক্তপাত না ঘটিয়ে কেবল ভয় দেখিয়েই এ যাত্রায় সমাপ্তি টানেন। ফিরে আসেন মদিনায়।

অবশ্য মাগাযি ও সিরাহ লেখকগণ চতুর্থ হিজরির রবিউল আখির বা জুমাদাল উলা মাসে নাজদ[১] ভূমিতে মুসলিমদের পরিচালিত সুনির্দিষ্ট আরও একটি যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে থাকেন। এ যুদ্ধকে তারা অভিহিত করেন জাতুর রিকা বলে। তৎকালীন মদিনার পরিবেশও এমন একটি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে সমর্থন করে। কারণ উহুদ যুদ্ধ থেকে আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার সময় পরবর্তী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় যুদ্ধে মিলিত হওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। মুসলিমদেরও সায় ছিল তাতে। এরপর দিন যত গড়াতে থাকে, সম্ভাব্য সেই যুদ্ধের সময়ও তত ঘনিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু মদিনাকে অবিন্যস্ত ও অরক্ষিত রেখে সেই বিশাল যুদ্ধে অংশ নিলে তার ফলাফল যে খুব ভালো হবে না তা মানব-ইতিহাসের সেরা সমরজ্ঞানী নবিজি তো বটেই, সাধারণ সাহাবিরাও বুঝতে পারছিলেন। এজন্য মদিনার চারপাশে লুণ্ঠন ও অরাজকতা-প্রিয় যেসকল বেদুইন বসবাস করত, তাদের দমন করা ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না। সামরিক এই দৃষ্টিকোণ সামনে রাখলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সে সময় অবশ্যই কোনো যুদ্ধ হয়ে থাকবে।

তবে এ যুদ্ধকে জাতুর রিকা বলা সঠিক নয়। কারণ জাতুর রিকা যুদ্ধে আবু হুরাইরা ও আবু মুসা আশআরিও অংশ নেন। অথচ আবু হুরাইরা ইসলাম গ্রহণ করেন খাইবার যুদ্ধের কিছুদিন আগে। তেমনি আবু মুসা আশআরিও খাইবার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন। তাই এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, জাতুর রিকা[২] খাইবার

---

[১] নাজদ সৌদি আরবের মধ্যবর্তী অঞ্চল। ওয়াহাবি আন্দোলনের সূতিকাগার। এখানের অধিবাসীদের অধিকাংশ লোক ওয়াহাবিপন্থি। সুলতান আব্দুল আজিজ ইবনু সউদ ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি নাজদকে রাজতন্ত্রে উন্নীত করেন।

[২] নবি-জীবনের একটি যুদ্ধ। এর সংঘটিত হওয়ার সময় নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, চতুর্থ হিজরিতে খন্দক যুদ্ধের পর এই যুদ্ধ হয়েছে। আবার কেউ বলেন, পঞ্চম হিজরির কথা। খাইবার যুদ্ধের পর

যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছে। চতুর্থ হিজরির পর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আরও একটি প্রমাণ হচ্ছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যুদ্ধে সালাতুল খাওফ[১] আদায় করেন, যা প্রবর্তন করা হয় গাযওয়ায়ে উসফানে।[২] আর সর্বসম্মতিক্রমে গাযওয়ায়ে উসফান হয় পঞ্চম হিজরির শেষ দিকে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধের পরে।

দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ

বেদুইনদের অবদমনের মধ্য দিয়ে মদিনার আকাশে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার কোমল ছায়া নেমে আসে। শুরু হয় আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি, মক্কার মুশরিকরা যার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে গিয়েছিল উহুদ প্রান্তরে। ইতিহাসে এ যুদ্ধটি দ্বিতীয় বদর নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে মুসলিমদের মুখোমুখি হতে হবে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু কুরাইশদের। দেখতে দেখতে প্রতিশ্রুত সে যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে আসে। চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামতে হবে সবার। কাজেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তিনি যুদ্ধের কৌশল নতুন করে সাজাবেন—যাতে উহুদ প্রান্তরের অমীমাংসিত বিষয়টির নিষ্পত্তি হয় এবং সবচেয়ে যোগ্য ও উপযুক্ত দলটি তাদের যথার্থতার প্রমাণ দিতে পারে।[৩]

সে লক্ষ্যে চতুর্থ হিজরির শাবান তথা ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে নবিজি দেড় হাজার সাহাবিকে নিয়ে প্রতিশ্রুত যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন। এ যাত্রায় তাদের সঙ্গে ১০টি ঘোড়াও ছিল। যুদ্ধের পতাকা আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। বদর প্রান্তরে যাওয়ার আগে নবিজি মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন আব্দুল্লাহ ইবনু

সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারেও মতামত পাওয়া যায়। লেখকের সিদ্ধান্ত এমনই। জাতুর রিকা বলার কারণগুলো হচ্ছে—

এক. এই যুদ্ধের সফরে সাহাবিদের পাথুরে জমি, কাঁটাযুক্ত পথ মাড়িয়ে চলার কারণে পা ফেটে রক্ত বের হয়। এ থেকে বাঁচার জন্য কাপড় ছিঁড়ে পায়ে বেঁধে নিতে হয়। এ কারণে এই যুদ্ধকে জাতুর রিকা বলা হয়।
দুই. কেউ বলেছেন, যেখানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সে স্থানের নাম এটা।

[১] যুদ্ধ চলাকালে বা শত্রু পক্ষের বেষ্টনীর ভেতরে সালাতের ওয়াক্ত শুরু হলে মুসলিম সৈন্যদল জামাতের সাথে যে সালাত আদায় করে, তাকে সালাতুল খাওফ বলা হয়। সালাত আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি ছাড়া বাকি সবকিছু অন্যান্য সালাতের মতোই। [*বাদায়িউস সানায়ি,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৩; *আল-মাজমু,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪০৪; *আল-মুগনি,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০২]

[২] উসফান—মদিনা থেকে ২০০ মাইল দূরে মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। এই উপত্যকার নিকটেই ছিল বনু লিহইয়ানের বসতি। খন্দক যুদ্ধের পর ৬ষ্ঠ হিজরির রবিউল আখির বা জুমাদাল উলা মাসে নবিজি ২০০ ঘোড়সওয়ার নিয়ে বনু লিহইয়ানের উদ্দেশে বের হন। তার লক্ষ্য ছিল, রাজির ঘটনায় ১০ জন সাহাবির হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়া। নবিজি পৌঁছলে বনু লিহইয়ানের সবাই পালিয়ে যায়। সেখানে ২ দিন অবস্থানের পর তিনি উসফান উপত্যকায় গিয়ে সেনা ছাউনি ফেলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এটাকে উসফানের যুদ্ধ বলেছেন। [*সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮০; *আস-সিরাতুন নববিইয়া,* ইবনু কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৫৯]

[৩] *ফিকহুস সিরাহ,* মুহাম্মাদ গাযালি, পৃষ্ঠা : ৩১৫

রাওয়াহাকে। মুসলিম বাহিনী যথাসময়ে বদর প্রান্তরে পৌঁছে যায়। সেখানে সেনাছাউনি ফেলে এবং অপেক্ষা করতে থাকে মুশরিকদের আগমনের।

ওদিকে আবু সুফিয়ানও ৫০টি ঘোড়া আর ২ হাজার সৈন্য নিয়ে ময়দানের উদ্দেশে রওনা করে। তারা মক্কা থেকে ১ দিনের দূরত্ব অতিক্রম করে মাররুজ জাহরানে পৌঁছে মাজিন্না নামক একটি জলাশয়ের পাশে ছাউনি ফেলে। এবার কেন জানি আবু সুফিয়ানের মক্কা থেকে বের হতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যুদ্ধে না এলেও মুখ থাকে না। তাই মুখ রক্ষার জন্য হলেও তাকে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়। কিন্তু এতদূর এসেও তার মন সায় দেয় না। যুদ্ধের পরিণামের কথা ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মুসলিমদের ভয় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরে। তাই মাররুজ জাহরানে শিবির স্থাপনের পরেও সে অজুহাত খুঁজতে থাকে মক্কায় ফিরে যাওয়ার। উপায় না দেখে সে তার সঙ্গীদের বলে, 'শোনো কুরাইশ যোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দ! যুদ্ধ করতে হয় সজীব ও উর্বর মৌসুমে। গাছভরা ফল থাকবে, ওলানভরা দুধ থাকবে তাই খেয়ে আমরা যুদ্ধে নামব। কিন্তু এখন তো খরা চলছে। তাই আমি মক্কা ফিরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছি। তোমরাও ফিরে চলো।' সৈনিকদের মনের অবস্থাও ছিল তাদের সেনাপতির মতোই। অন্যথায় তার এই মতের বিপরীতে কেউ না কেউ অবশ্যই মত দিত এবং যুদ্ধ না করেই ফিরে যাওয়ার জন্য অন্যদেরকে তিরস্কার করত। কিন্তু এমন কিছুই হয়নি সেদিন। সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে গেছে যার যার ঘরে।

এদিকে মুসলিমগণ বদর প্রান্তরে ৮ দিন শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকেন। সেখানকার স্থানীয়দের কাছে তাদের রসদ ও অন্যান্য মালামাল বিক্রি করেন। এ সময় প্রতিটি পণ্যে তাদের দ্বিগুণ লাভ হয়; মানে ১ দিরহামে ২ দিরহাম। অবশেষে শত্রুর দেখা না পেয়ে তারা মদিনায় ফিরে আসেন। সাথে নিয়ে আসেন আরব ভূখণ্ডের নেতৃত্বের লাগাম। সময়ের ব্যবধানে এই নেতৃত্ব মজবুত হতে থাকে; সেইসাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে মুশরিকদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সমীহবোধ।

এ যুদ্ধের বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে, বদরুল মাওইদ বা প্রতিশ্রুত বদর, বদরুস সানিয়াহ বা দ্বিতীয় বদর, বদরুল আখিরা বা শেষ বদর এবং বদরুস সুগরা বা ছোট বদর যুদ্ধ। [১]

দুমাতুল জানদালের যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বদর থেকে নিরাপদে ফিরে আসেন। সেই থেকে নিরাপত্তা নেমে আসে মদিনার মাটিতে। চারিদিকে গড়ে ওঠে শান্তিময় পরিবেশ। গোটা শহর ছেয়ে যায় প্রশান্তির ছোঁয়ায়। এই অবকাশে নবিজি দৃষ্টি দেন আরবসীমান্তে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০৯ ও ২১০; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১২

থাকা জনপদগুলোতে যাতে তাদের ওপরও মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই মদিনার শাসনব্যবস্থা মেনে নেয়।

দ্বিতীয় বদরের পর নবিজি টানা ৬ মাস নিশ্চিন্তে বসবাস করেন। এ সময় কোনো সংঘাত বা রক্তপাতে জড়াতে হয়নি তাকে। ৬ মাস পরে তার কাছে সংবাদ আসে যে, শামের সন্নিকটে দুমাতুল জানদাল এলাকায় একটি ডাকাত দল সাধারণ পথচারী ও বণিকদের লুণ্ঠন করছে। শুধু তা-ই নয়, মদিনা আক্রমণের লক্ষ্যে তারা বিশাল বাহিনী গঠনেরও উদ্যোগ নিয়েছে। সংবাদ পেয়ে নবিজি সিবা ইবনু উরফুতা আল-গিফারিকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করে পঞ্চম হিজরির ২৫ রবিউল আউয়াল মাসে তিনি নিজে ১ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে নেন বনু উযরাহ[১] গোত্রের মাযকুর নামক এক ব্যক্তিকে।

এই অভিযানে নবিজি রাতের বেলায় পথ চলতেন। আর দিনের বেলা থাকতেন আত্মগোপনে। এই বাড়তি সতর্কতা ছিল শত্রুপক্ষের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদেরকে দিশেহারা করে দেবার জন্য। এতকিছুর পরও মুসলিম সৈন্যবাহিনী লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেখে, শত্রুরা ইতোমধ্যেই নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছে। মুসলিম সেনারা তখন তাদের পশুপাল ও রাখালদের ওপর আক্রমণ করে। এতে বিপুলসংখ্যক গবাদি পশু মুসলিমদের দখলে চলে আসে। আক্রান্ত হয় বেশ কয়েকজন রাখালও। বাকিরা তাদের পশুপাল নিয়ে সটকে পড়ে আশেপাশের নিরাপদ স্থানে।

দুমাতুল জানদালের স্থানীয়রাও যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। মুসলিমরা তাদের এলাকায় প্রবেশ করে দেখতে পায় পুরো এলাকা জনমানবশূন্য। সুনসান নীরব। যেন কোনো কালেই কেউ বসবাস করেনি এখানে। নবিজি সেই বিরান এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি তার বাহিনীটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কোথাও কারও কোনো হদিস পাওয়া যায় না। শেষমেশ তারা মদিনায় ফিরে আসেন।

এ অভিযানে উয়াইনা ইবনু হিসনের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়। দুমাতুল জানদাল শামের সীমান্তবর্তী একটি জনপদ। এখান থেকে দামেশকের দূরত্ব ৫ রাত্রি। আর মদিনার দূরত্ব ১৫ রাত্রি।

নবিজির এই সাহসী ও বিচক্ষণ পদক্ষেপে মদিনা ও তার চারপাশে আবারও নেমে আসে অখণ্ড নিরাপত্তা। জনমনে স্থায়ীভাবে বসে যায় ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। নবিজি এই সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেন। এই অবসরে তিনি আগামীর জন্য মাঠ প্রস্তুত করেন। ভেতর ও বাইরের ঝুটঝামেলা মিটিয়ে ফেলেন। সেইসাথে

---

[১] মদিনার ওয়াদিল কুরার কাছে অবস্থিত হিময়ারি গোত্র। তারা ছিল ইহুদি ধর্মের অনুসারী। উক্কাশা ইবনু মিহসানের অভিযানের পর তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

নিরসন করেন মরুজীবনের নানা সংকট। এ সময় ইহুদিদের একটি গোত্রকেও দেশান্তর করা হয়। বাকিরা প্রতিবেশীর হক ও বিশ্বস্ততা রক্ষার শর্তে মদিনাতেই থেকে যায়।

ইসলাম ও মুসলিমদের এই উত্থানে মুনাফিকরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। বেদুইন গোত্রগুলোও হতাশায় ডুবে যায় তাদের জীবন নিয়ে। কুরাইশরাও মুসলিমদের ওপর আক্রমণের সাহস অনেকটা হারিয়ে ফেলে। সব মিলিয়ে মুসলিমরা পেয়ে যায় ইসলামের প্রচার-প্রসার ও দ্বীনের দাওয়াতের জন্য অবারিত সুযোগ।

খন্দকের যুদ্ধ

টানা ১ বছরের বিচ্ছিন্ন কিছু যুদ্ধ, ছোটবড় অভিযান এবং অনেকগুলো মর্মান্তিক ঘটনার পর আরব উপদ্বীপ এখন অনেকটা শান্ত। মদিনা ও তার চারপাশ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, কোনোকালেই অখণ্ড শান্তি সবাই সহ্য করতে পারে না। মদিনার ইহুদিরাও পারেনি। তারা সময়ে-অসময়ে নানান অপকর্ম, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষচর্চা করে শান্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা করেছে। সেজন্য বারবার চড়া মূল্যও তাদেরকে দিতে হয়েছে। এতেও বোধোদয় ঘটেনি তাদের। কিন্তু একটি সভ্য নগরীতে নির্দিষ্ট একটি চক্রের অব্যাহত অসভ্যতা বেশি দিন সহ্য করা যায় না। তাই শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে তাদেরকে নির্বাসিত করা হয় খাইবারে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা শান্তিচুক্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিমদের ভাগ্য-বিপর্যয়ের অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যেতে থাকে মুসলিমদের উত্থানে। দেখতে দেখতে মদিনার আশপাশেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে ইসলামি শাসন ও কর্তৃত্ব। এ অব্যাহত অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্য তারা নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে। পরিবেশ উত্তপ্ত করার পেছনে লেগে পড়ে। প্রস্তুতি নেয় পৃথিবী থেকে মুসলিমদের উৎখাতের। তবে এবার তারা সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে না। সে সাহস ও ক্ষমতা তাদের নেই। তারা এবার আগাবে ষড়যন্ত্রের গোপন ও জটিল পথে।

এ লক্ষ্যে ২০ জন ইহুদি ও বনু নাজিরের নেতৃস্থানীয় লোকদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কার কুরাইশদের কাছে গমন করে। তাদেরকে নানাভাবে নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। পুরোনো শত্রুতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করে তাদেরকে। সেইসাথে আশ্বাস দেয়, যুদ্ধের দিনে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার। তাদের এত এত প্রলোভনে কুরাইশরা সাড়া না দিয়ে পারে না। অবশ্য তাদের এই ত্বরিত সাড়াদানের পেছনে আরও একটি কারণ থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে, তারা অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় বদরে অংশ নেবে বলেও নেয়নি। মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছিল। সেদিন ধুলোয় মিশে গিয়েছিল তাদের মান-সম্মান ও জাত্যভিমান। তাই তারা ভাবে, এখনই সেই খুইয়ে ফেলা সম্মান পুনরুদ্ধারের উপযুক্ত সময়।

কুরাইশদেরকে সম্মত করার পর প্রতিনিধি দলটি যায় বনু গাতফানে। নানা প্রলোভনে

তাদেরকেও রাজি করে ফেলে। পরপর দুটি মন্ত্রণায় সফল হওয়ার পর তাদের উৎসাহ ও কর্মোদ্যম বেড়ে যায় বহুগুণ। তারা এবার আরবের অন্যান্য গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকেও উত্তেজিত করে তোলে। এরপর সবার সামনে একটি সর্বদলীয় আক্রমণের খসড়া প্রস্তাবনা পেশ করে। প্রায় সকল গোত্রই তাদের প্রস্তাবে সায় দেয়। এভাবে ইহুদি নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় জোট গঠনে ইন্ধন জোগায় এবং শতভাগ সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

এরপর সব দলের পরামর্শে যুদ্ধযাত্রার দিনক্ষণ নির্ধারিত হয়। সে অনুযায়ী দক্ষিণাঞ্চল থেকে কুরাইশ, কিনানা[১] এবং তিহামা অঞ্চলে[২] তাদের যেসকল মিত্র ছিল, তারা মদিনা অভিমুখে রওনা করে। এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৪ হাজার। এদের নেতৃত্বে আছে আবু সুফিয়ান। এরা মাররুজ জাহরানে পৌঁছলে, বনু সুলাইম[৩] এসে তাদের সাথে যুক্ত হয়। পূর্বদিক থেকে আসে বনু গাতফান, বনু ফাযারা, বনু মুররা ও বনু আশজা। ফাযারার সেনাপতির দায়িত্ব পালন করে উয়াইনা ইবনু হিসন। মুররার নেতৃত্বে আছে হারিস ইবনু আউফ আর বনু আশজার নেতৃত্ব মিসআর ইবনু রুখাইলার কাঁধে। এছাড়া বনু আসাদসহ[৪] বিভিন্ন গোত্রের লোকজন এই অভিযানে অংশ নেয়।

গোত্রগুলো তাদের চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে মদিনা অভিমুখে রওনা করে। দেখতে দেখতে অল্প দিনের ভেতর মদিনার সীমান্তে জড়ো হয়ে যায় বিশাল এক সর্বদলীয় বাহিনী। এ বাহিনীর মোট সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার, যা মদিনার নারী-শিশু ও যুবক-বৃদ্ধ মিলিয়ে মোট জনসংখ্যারও অনেক বেশি।

এই বিশাল বাহিনী সরাসরি মদিনার সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালালে মুসলিমদের জন্য মহাবিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। হয়তো ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে যেত ইসলাম ও মুসলিমদের নাম-পরিচয়। কিন্তু মদিনার নেতৃত্ব শুরু থেকেই ছিল সজাগ। সম্মিলিত বাহিনীর গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন মুসলিম গোয়েন্দারা। শত্রুদের প্রতিটি পদক্ষেপ তখন নবিজির নখদর্পণে।

নবিজি সাহাবিদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ বিষয়ে বিস্তর আলাপ হয় সেখানে। শুরা-সদস্যগণ যার যার বক্তব্য ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। এরপর সেগুলো নিয়ে বিস্তর পর্যালোচনা হয়। সবশেষে সালমান ফারসি রাযিয়াল্লাহু আনহুর

---

[১] নবিজির ঊর্ধ্বতন বংশীয় লোকদের থেকে নির্গত একটি গোত্র।

[২] আরব উপদ্বীপের লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল।

[৩] বনু সুলাইম আরবের একটি উপজাতি। ইসলামপূর্ব যুগে হিজাযে বসবাস করত।

[৪] আদনানি আরব। আসাদ ইবনু খুযাইমার প্রতি সম্পৃক্ত করে এই নাম ডাকা হয়। নাজদ এলাকার উপকণ্ঠে এদের বসবাস ছিল।

প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা পারস্যের লোকেরা কোনো যুদ্ধে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে, আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করতাম।' এটি একটি অব্যর্থ যুদ্ধকৌশল। তবে আরবের লোকেরা পরিখার সাথে পরিচিত নয়।

মদিনার ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় তার পরিকল্পনাটি সবার মনঃপূত হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাসম্ভব দ্রুত তা বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন এবং প্রতি ১০ জনকে ৪০ হাত[১] করে পরিখা খনন করতে বলেন।

মুসলিমরা বিপুল উদ্যমে খনন কাজ শুরু করেন। নবিজি তাদের উৎসাহ জোগান। তিনি নিজেও এই মহতী কাজে অংশ নেন। সাহল ইবনু সাদ বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুলের সাথে খনন কাজ করছিলাম। আমাদের একদল কোদাল ও শাবল দিয়ে মাটি খনন করছিল, আরেক দল সেগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মাথায় ও পিঠে করে। এ সময় আল্লাহর রাসুল বলেন, 'হে আল্লাহ, আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি মুহাজির ও আনসারদের ক্ষমা করুন।'[২]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল একদিন খন্দক পরিদর্শনে বের হয়ে দেখেন, মুহাজির ও আনসার সাহাবিরা প্রচণ্ড শীতের সকালে খনন কাজ করছেন। তাদের কাজ করে দেবার মতো পর্যাপ্ত গোলাম বা শ্রমিক ছিল না। এজন্য সবাইকেই গায়েগতরে খাটতে হচ্ছে। ক্ষুৎপিপাসায় শারীরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে কাজের সেই প্রথম প্রহরেই। এখন তারা কাজ করছেন সম্পূর্ণ মনের জোরে; আল্লাহ ও তাঁর নবির ভালোবাসায়। তাদের এই পরিশ্রান্ত মুখাবয়ব দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবিজির কোমল হৃদয়। অমনি তিনি আবৃত্তি করেন—

এই দুনিয়া তুচ্ছ অতি, আখিরাতই সার।
তোমার ক্ষমা পায় যেন মুহাজির-আনসার।

তার আবৃত্তির জবাবে সাহাবিগণ সুর মেলান—

আমরা শপথ নিয়েছি মুহাম্মাদের হাতে,
করব জিহাদ যতদিন বাঁচি দুনিয়াতে।[৩]

---

[১] খন্দক বা পরিখা খননের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি ১০ জন সাহাবিকে ৪০ গজ করে জায়গা ভাগ করে দেন—যা প্রায় ২৮ মিটারের সমান। পরিখার প্রস্থ ছিল ৯ গজ আর গভীরতা স্থানভেদে ৭ থেকে ১০ গজের মধ্যে। সে সময় সর্বমোট ৫ হাজার গজ দৈর্ঘ্যের পরিখা খনন করা হয়। ইবনু সাদের মতে, পরিখাটি খনন করতে সময় লেগেছিল মাত্র ৬ দিন। [*আসসিরাতুন নাবাবিয়া,* আবুল হাসান আলি নদভি, পৃষ্ঠা : ৩৪৮; দারু ইবনি কাসির, দামেশক]

[২] *সহিহুল বুখারি* (খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়) : ২৮৩৪, ৩৭৯৭, ৪০৯৮, ৪০৯৯, ৭২০১

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ২৮৩৪, ৪০৯৯, ৭২০১

বারা ইবনু আযিব বলেন, পরিখা খননের সময় আমি আল্লাহর রাসূলকে মাটি টানতে দেখেছি। ধুলোবালিতে তার গোটা দেহ তখন ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। মাটি টানতে টানতে তিনি গুনগুন করে ইবনু রাওয়াহার এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন—

আপনি না দেখালে মাবুদ, পেতাম না পথের দিশা,
ইবাদতে বসত না মন, কাটত না অমানিশা।
আপনার জন্য আমরা ফিদা, করুন আমাদের ক্ষমা,
যুদ্ধের দিনে আমরা যেন থাকি একসাথে জমা।
আমাদের বিরুদ্ধে আজ এক হয়েছে সব দুশমন,
কারণ আমরা কুফর ছেড়ে সঁপেছি ঈমানে মন।

বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি সেই কবিতার শেষ চরণটি দীর্ঘ লয়ে আবৃত্তি করেন। অপর এক বর্ণনায় কবিতার শেষাংশটি ছিল এমন—

অত্যাচারের খড়গ কৃপাণ নামছে দেখো মোদের ওপর
ষড়যন্ত্র রুখে দিতে আমরাও এবার হব তৎপর।[১]

ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর সাহাবিগণ। তবুও ছন্দের তালে তালে দ্রুত গতিতে এগোয় খনন কাজ। পিঠের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছিল তাদের পেটের চামড়া। সে কথা মনে পড়লেও গা শিউরে ওঠে। বুক ফেটে যায় মনস্তাপে।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খন্দক-খননকারীদের কাছে দুমুঠো যব আনা হতো। পচা দুর্গন্ধযুক্ত তেল দিয়ে রুটি বানিয়ে ক্ষুধার্ত সবার সামনে পেশ করা হতো। এই দুর্গন্ধযুক্ত অরুচিকর খাবারই তারা গলাধঃকরণ করতেন।[২] আবু তালহা বলেন, নবিজির কাছে আমরা ক্ষুৎপিপাসার অভিযোগ করি। কাপড় সরিয়ে পেটে বাঁধা পাথর দেখাই। তিনি মুখে কিছু না বলে আলগোছে তার পেটের কাপড় সরিয়ে দেন। আমরা তখন অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করি, তার পেটে একটি নয়, দুই-দুইটি পাথর বাঁধা।[৩]

পরিখা খননের সময় নবুয়তের বিশেষ কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ একবার লক্ষ করেন, প্রচণ্ড ক্ষুধায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারে গুটিয়ে গেছেন। তবু সমান তালে কাজ করে যাচ্ছেন সবার সাথে। বিষয়টি তাকে ব্যথিত করে। অমনি তিনি বাড়িতে চলে যান। তার একমাত্র ছাগলটি জবাই

---

[১] *সহিহুল বুখারি*, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায় : ৪১০৬

[২] *সহিহুল বুখারি*, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায় : ৪১০০

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ২৩৭১; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫২৫৪; হাদিসটির সনদ দুর্বল।

করেন। এরপর স্ত্রীকে রুটি বানাতে বলে তিনি চলে যান পরিখার ওখানে। স্ত্রী রুটি বানানো শুরু করেন। প্রায় আড়াই কেজি যবের রুটি বানান তিনি। সে হিসেবে জাবির চুপিসারে নবিজিকে বলেন, অল্প কয়েকজনকে নিয়ে আমার ঘরে দাওয়াত গ্রহণ করুন। যৎসামান্য গোশত-রুটির ব্যবস্থা হবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু নবিজি তাকে অবাক করে দিয়ে, খননরত সবাইকে নিয়ে তার বাড়িতে উপস্থিত হন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ১ হাজার। অবাক করা কাণ্ড হলো, সেই সীমিত খাবারই সবাই তৃপ্তিভরে খান। শুধু কি তা-ই, খাবার শেষ হলে দেখা যায়, রান্নার সময় পাত্রে গোশত-রুটি যতটুকু ছিল, সবার খাওয়া শেষেও ঠিক ততটুকুই আছে।[১]

নুমান ইবনু বাশিরের বোন তার অভুক্ত বাবা ও মামার জন্য থালায় করে কয়েকটি খেজুর নিয়ে আসেন খন্দকে। নবিজির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি খেজুরগুলো তার কাছ থেকে চেয়ে নেন। একটি কাপড় বিছিয়ে তার ওপর ছড়িয়ে দেন সবগুলো খেজুর। এরপর দাওয়াত দেন উপস্থিত সাহাবিদেরকে। সবাই এসে সেখান থেকে খেতে থাকেন। খেজুরের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। সবাই তৃপ্তিভরে খাওয়ার পরেও দেখা যায়, কাপড়ের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু খেজুর।[২]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরিখা খননের সময় আমরা সামনে হঠাৎ এক বিশাল পাথরের চাঁই দেখতে পাই। কিন্তু আমরা সেটা ভাঙতে পারিনি। নবিজিকে এ ব্যাপারে অবগত করা হলে, তিনি বলেন, 'দাঁড়াও, আমি দেখছি।' এ কথা বলে তিনি গর্তে নামেন। তার পেটে তখন দুটি পাথর বাঁধা। গত ৩ দিনে আমাদের কারও পেটে দানা-পানি পড়েনি। শক্তি বলতে আছে শুধু মনের জোরটুকু। নবিজি সেটুকু কাজে লাগিয়েই কুঠার দিয়ে সে পাথরে আঘাত করেন। আঘাতের সাথে সাথে পাথরটি বিচূর্ণ হয়ে বালুর স্তূপে পরিণত হয়।[৩]

বারা ইবনু আযিব বলেন, খন্দক খননের সময় আমাদের সামনে মস্ত এক পাথর পড়ে। কুঠারের অজস্র আঘাতের পরও আমরা সেটা ভাঙতে ব্যর্থ হই। বিষয়টি নবিজি জানতে পেরে সেখানে উপস্থিত হন। একটি কুঠার হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাথরে আঘাত করেন। এতে পাথরের একটি অংশ ভেঙে যায়। তিনি তাকবির ধ্বনি দিয়ে বলেন, 'আমাকে শামের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি সেখানকার লাল কেল্লাগুলো দেখতে পাচ্ছি।' এরপর তিনি দ্বিতীয় আঘাত করেন। এবার পাথরটির আরও একটি অংশ ভেঙে যায়। তিনি আবার তাকবির ধ্বনি দিয়ে বলেন, 'আমাকে পারস্যের

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪১০২; *সহিহ মুসলিম* : ২০৩৯

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৮

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪১০১

কর্তৃত্বও দেওয়া হয়েছে। আমি মাদায়েনের[১] শ্বেতপ্রাসাদগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এরপর 'বিসমিল্লাহ' বলে তৃতীয় আরেকটি আঘাত করেন। এতে বাকি অংশটুকুও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তিনি বলে ওঠেন, 'আল্লাহু আকবার! ইয়েমেনের কর্তৃত্বও আমাকেই দেওয়া হয়েছে। আমি এখান থেকে সানআর[২] প্রবেশদ্বার দেখতে পাচ্ছি।'[৩] ইবনু ইসহাকও সালমান ফারসির সূত্রে এমনটি বর্ণনা করেছেন।[৪]

মদিনা শহরের পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ছিল প্রস্তরময় ভূমি, পাহাড় ও নিশ্ছিদ্র খেজুর-বাগিচায় বেষ্টিত। শুধু উত্তর দিকটা উন্মুক্ত। মদিনা আক্রমণ করত হলে সে পথেই প্রবেশ করতে হবে শত্রুদের। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই পরিখা খনন করে সে পথটা বন্ধ করে দেন। এ কয়দিন নবিজি সূর্য ওঠার আগেই সাহাবিদের নিয়ে কাজে নেমে পড়তেন। দিনমান অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যা হলে ঘরে ফিরতেন। টানা কয়েক দিনের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সম্মিলিত বাহিনী মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছার আগেই খননকাজ সম্পন্ন হয়।[৫]

ওদিকে কুরাইশ ও তাদের মিত্রশক্তিগুলো ধেয়ে আসতে থাকে মদিনার অভিমুখে। কুরাইশের মূল বাহিনী ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনার অদূরে জুরফ ও যাআবার মধ্যবর্তী রুমার মাজমাউল আসয়ালে[৬] এসে শিবির স্থাপন করে। এদিকে বনু গাতফান তাদের অনুসারী ৬ হাজার নাজদি সৈন্য নিয়ে উহুদের প্রান্তদেশে 'যামবে নাকমি' নামক স্থানে এসে ছাউনি ফেলে। আসন্ন এই বিপদে আল্লাহ মুমিনদের মনের বিচিত্র অবস্থা প্রকাশ করে বলেন—

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

মুমিনরা সম্মিলিত বাহিনী দেখে বলে ওঠে, আরে, এর প্রতিশ্রুতিই তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের দিয়েছিলেন; আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্যই বলেছিলেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মনিবেদন আরও বৃদ্ধি পেল।[৭]

---

[১] লোহিত সাগরের পশ্চিম উপকূলবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী জনপদ হলো মাদায়েন। বর্তমানে পূর্ব জর্ডানের সামুদ্রিক বন্দর মুআনের অদূরে অবস্থিত।

[২] ইয়েমেনের রাজধানী।

[৩] *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৮০৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৬৯৪; হাদিসটির সনদ দুর্বল।

[৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৯

[৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩০ ও ৩৩১

[৬] উহুদ পর্বতের পশ্চিমে অবস্থিত একটি জনপদ।

[৭] সুরা আহযাব, আয়াত : ২২

কিন্তু মুনাফিক ও দুর্বলচিত্ত লোকেরা তখন ভড়কে যায়। আল্লাহ তাদের সে সময়কার মনোভাব তুলে ধরে বলেন—

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٢

আর স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা, যখন মুনাফিকরা এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের যে অঙ্গীকার দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়।[১]

শত্রুদেরকে প্রতিহত করার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে বের হন। মদিনার সীমান্তে পৌঁছে সালা[২] পর্বত পেছনে রেখে শিবির স্থাপন করেন। এখন তাদের পেছনে পাথুরে পর্বতশ্রেণি আর সামনে দীর্ঘ পরিখা। এজন্য তারা নিজেদেরকে অনেকটা সুরক্ষিত বোধ করেন। এ যুদ্ধে তাদের সাংকেতিক ভাষা ছিল হা-মিম লা-য়ুনসারুন অর্থাৎ হা-মিম এদের সাহায্য করা হবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ যাত্রায় মদিনার শাসনভার দিয়ে আসেন আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমকে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তার প্রতি বিশেষ নির্দেশনা ছিল। সে অনুসারে তাদেরকে মদিনার বিভিন্ন দুর্গ ও সংরক্ষিত বাড়িতে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এদিকে মুশরিকরা মদিনা আক্রমণের জন্য তাদের শেষ মঞ্জিল ত্যাগ করে। কিন্তু মদিনায় প্রবেশ করতে গিয়ে দেখে বিশাল এক পরিখা তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা পরিখাটি পরিমাপ করে দেখে যে, ঘোড়া নিয়ে কিছুতেই এই পরিখা পার হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ঘোড়া বা আরোহী একবার নিচে পড়ে গেলে উঠতে পারবে বলেও মনে হয় না তাদের। তবু তারা পায়ে হেঁটে বা ঘোড়া নিয়ে পার হওয়ার মতো ফাঁকফোকর খুঁজে বের করার জন্য বারবার পরিখার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চক্কর কাটতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই ভাগ্য তাদের সহায় হয় না। পরিখাও যে একটি অব্যর্থ যুদ্ধ-কৌশল হতে পারে, এটা তারা কল্পনাও করেনি। এমন অভিনব কৌশলে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় অবরোধের। মুসলিমরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। পরিখার আশেপাশে কাউকে দেখলে তার ওপর তিরবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়—যাতে করে কোনো শত্রু সেটা ডিঙিয়ে অথবা মাটি ভরাট করে মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে।

কুরাইশের অশ্বারোহীরা পরিখা পার হতে না পেরে ভেতরে ভেতরে জ্বলছে। এমন অসহায় অবস্থা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তাদের। অবরোধের ফলাফল কবে আসবে,

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ১২

[২] মদিনা মুনাওয়ারার একটি পর্বত।

সে অপেক্ষা অসহনীয় হয়ে ওঠে তাদের জন্য। যুবকরা উন্মাদের মতো ঘুরতে থাকে এদিক-ওদিক। হঠাৎ তাদের ক্ষুদ্র একটি দল পরিখার অপেক্ষাকৃত একটি সংকীর্ণ জায়গা আবিষ্কার করে ফেলে। এ দলের মধ্যে ছিল আমর ইবনু আবদি উদ, ইকরিমা ইবনু আবি জাহল এবং জিরার ইবনুল খাত্তাবসহ আরও কয়েকজন। পথটি পেয়েই তারা ঘোড়া নিয়ে সেদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সালা পর্বত ও পরিখার মধ্যবর্তী স্থানে এসে চক্কর কাটতে থাকে। হঠাৎ আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে সেখানে পৌঁছান এবং সেই স্থানটি নিয়ন্ত্রণে এনে শত্রুদের ফেরার পথ বন্ধ করে দেন। আমর তখন মুসলিমদেরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। আলি ইবনু আবি তালিব সামনে অগ্রসর হন। তাকে কথায় কথায় উত্তেজিত করে তোলেন। আমর ছিল কুরাইশের এক সাহসী যোদ্ধা। আলির কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামে। তরবারির আঘাতে সে নিজেই কেটে ফেলে তার ঘোড়ার পা ও মুখ। এরপর ক্রোধে গজরাতে গজরাতে আলির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়। একে অপরের ওপর তরবারির আঘাত হানে। আলির এক আঘাতেই আমর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর গলাকাটা মুরগির মতো তড়পাতে তড়পাতে নিস্তেজ হয়ে যায় তার দেহ। বাকিরা পড়িমরি করে ছুটে পালায় সেখান থেকে। তারা তখন এতই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, ইকরিমা তার বর্শা ফেলেই পালিয়ে যায়।

মুশরিকরা পরিখা অতিক্রম করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। মাটি দিয়ে ভরাট করার চেষ্টা করে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ জায়গাগুলো। কিন্তু সুবিধা করতে পারে না। মুসলিম যোদ্ধারা নানা কৌশলে পরিখা থেকে দূরে হটিয়ে দেয় তাদের। পরিখার কাছে ঘেঁষতে গেলেই তাদের ওপর নেমে আসে তির ও পাথরবৃষ্টি। তারাও কম যায় না। তারা ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নিতে পারে না। পরিখা অতিক্রম করাও সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে। নিরুপায় হয়ে ব্যর্থ মনোরথে পরিখার ওপারেই অবস্থান করতে হয় তাদের।

কাফিরদের পরিখা অতিক্রম করার অব্যাহত চেষ্টা এবং তার বিপরীতে মুসলিমদের নিশ্ছিদ্র প্রতিরোধব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে নবিজি এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, তার কয়েক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যায়। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, খন্দক যুদ্ধ চলাকালে একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব কাফিরদের গালাগাল করতে করতে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সূর্য অস্ত যায় যায়; এখনো আসরের সালাত পড়তে পারিনি। তিনি বলেন, 'আমারও তো একই অবস্থা। আমিও সালাত আদায় করতে পারিনি।' এরপর আমরা তার সাথে বাতহান নামক স্থানে এসে ওজু করি। কিন্তু ততক্ষণে সূর্য ডুবে যায়। নবিজি প্রথমে আসরের এবং পরে মাগরিবের সালাত আদায় করেন।[১]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৯৬, ৬৪১, ৪১১২

খন্দক যুদ্ধের মানচিত্র
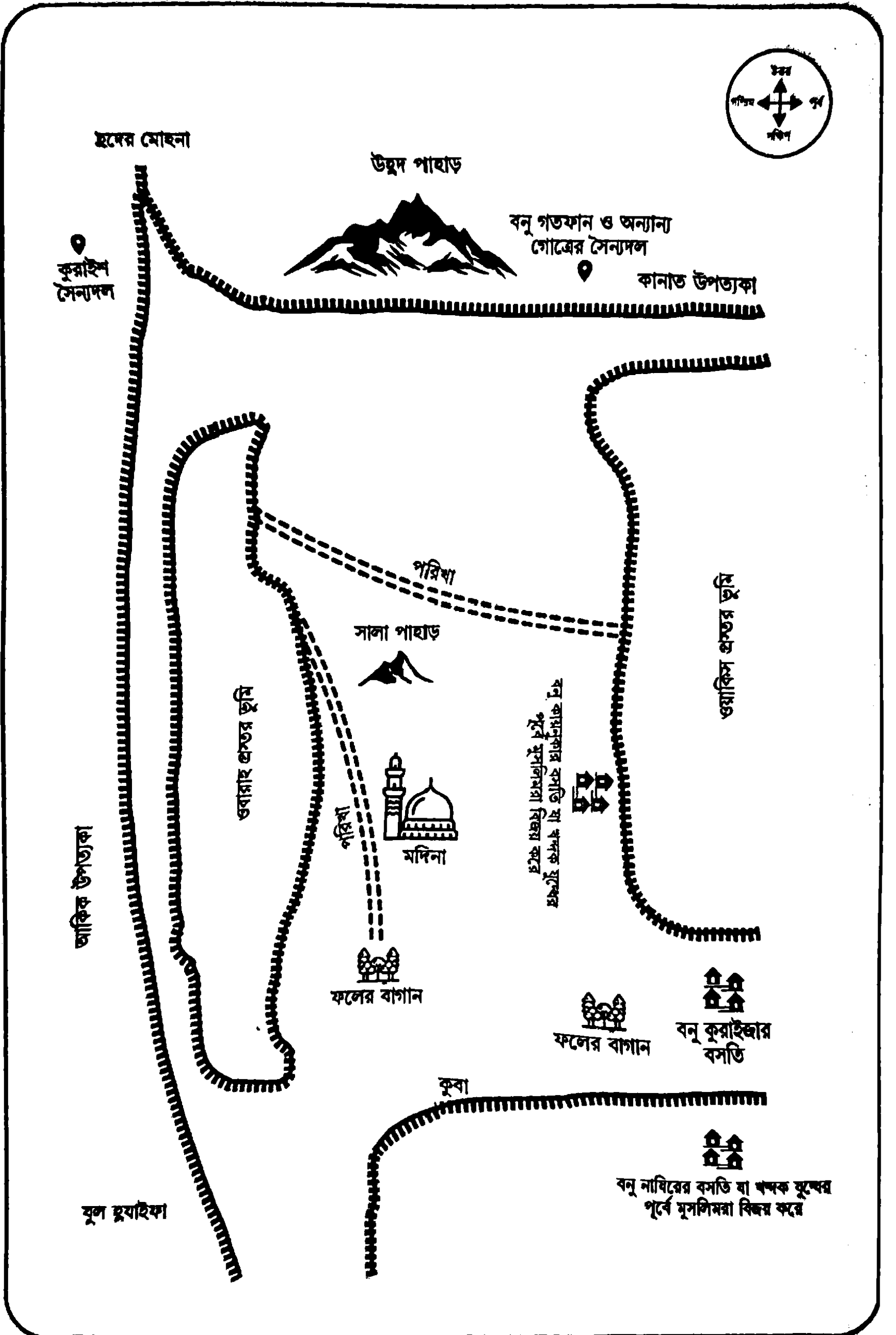
যথাসময়ে সালাত আদায় করতে না পেরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই মর্মাহত হন। বুকের গভীর থেকে বদদুআ বেরিয়ে আসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খন্দক যুদ্ধের একপর্যায়ে আল্লাহর রাসুল বলেন, 'হে আল্লাহ, মুশরিকদের কবর ও ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিন। ওরা আমাদেরকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করেছে।'[১]

মুসনাদু আহমাদ এবং *মুসনাদু শাফিয়িতে* বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছিল। পরে অবসর সময়ে তিনি এসব সালাত আদায় করে নেন। ইমাম নববি বলেন, উপরিউক্ত দুই বর্ণনার সারকথা হচ্ছে, খন্দক যুদ্ধ টানা কয়েকদিন চলে। কোনো দিন হয়তো এক ওয়াক্তের সালাত পড়তে সমস্যা হয়েছে। অন্যদিন হয়তো আরেক ওয়াক্তের সালাত কাজা হয়েছে।[২]

প্রতিরোধ-ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সালাত আদায়ে বিলম্ব হওয়া এবং সেজন্য মুশরিকদের দায়ী করে গালাগাল বা বদদুআ করার ঘটনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, মুশরিকরা খন্দক পার হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। কিন্তু মুসলিমদের কয়েক দিনের অব্যাহত প্রতিরোধে তা ভেস্তে গেছে। উভয় বাহিনীর মধ্যে পরিখার আড়াল থাকায় মুখোমুখি যুদ্ধের ঘটনা ঘটেনি। তির-নিক্ষেপ ও ছোটখাটো সংঘর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যুদ্ধের ব্যাপ্তি। ফলে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে তুলনামূলক কম। এই যুদ্ধে ৬ জন মুসলিম ও ১০ জন মুশরিক নিহত হয়। এদের দুয়েক জন বাদে বাকি সবাই নিহত হয় তিরের আঘাতে।

সেদিন সাদ ইবনু মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহু তিরবিদ্ধ হন। বাহুর প্রধান শিরায় আঘাত লাগে তার। কুরাইশের পক্ষ থেকে তিরটি নিক্ষেপ করে হিব্বান ইবনু আরিকা। আহত হওয়ার পর তিনি দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আপনি জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসুলকে মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করেছে, দেশান্তর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কাছে যতটা প্রিয়, অন্যদের সাথে করা ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ, আমার মনে হয়, আপনি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। যদি কুরাইশদের সাথে কোনো যুদ্ধ বাকি থেকে থাকে, আমায় জীবিত রাখুন—যেন তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য জিহাদ করতে পারি। আর যদি এটাই হয়ে থাকে শেষ যুদ্ধ, তবে এ ক্ষত শুকানোর আর দরকার নেই, এটাকেই বানিয়ে দিন আমার মৃত্যুর কারণ।'[৩] দুআর শেষে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, বনু কুরাইজার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৯৩১, ৪১১১

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৮৭; *শারহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৭

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০১, ৪১২২

হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিয়েন না।'[১]

মুসলিমরা যখন ভয়াবহ এক যুদ্ধে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ঠিক তখন বিদ্বেষের বিষধর সাপ ইহুদিদের মনের ভেতর ঢুকে কুণ্ডলী পাকায় এবং সেই বিষ মুসলিমদের গায়ে উগরে দিতে প্ররোচনা দেয়। বনু নাজিরের কুখ্যাত অপরাধী হুয়াই ইবনু আখতাব বনু কুরাইজায় গিয়ে তাদের সর্দার কাব ইবনু আসাদ কুরাযির সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়। ভদ্রলোকের সাথে আগে থেকেই নবিজির মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। কথা ছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ হলে, সে ও তার গোত্র নবিজিকে সাহায্য করবে। তাই হুয়াই এসে তার দরজায় হাঁক ছাড়লে সে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুয়াই নাছোড়বান্দা। দেখা করেই যাবে। এজন্য সে এমন সব কথাবার্তা বলা শুরু করে, যাতে বাধ্য হয়েই কুরাযির দরজা খুলে দিতে হয়। হুয়াই বলে, 'হে কাব! আমি তোমার জন্য ইতিহাসের সেরা সম্মাননা ও সমুদ্রের উত্তাল জলরাশি নিয়ে এসেছি। কুরাইশ নেতাদের রুমার মাজমাউল আসয়ালে এনে দাঁড় করিয়েছি। বনু গাতফান ও তাদের মিত্রদের শিবির স্থাপন করতে বলেছি উহুদের প্রান্তবর্তী যামবে নাকমিতে। তারা আমার সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ—মুহাম্মাদ ও তার সাথিদের ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করে তারা এখান থেকে একচুলও সরবে না।'

কাব উত্তর দেয়, 'আল্লাহর কসম! তুমি আমার জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে লাঞ্ছনাকর প্রস্তাব ও বৃষ্টিহীন মেঘমালার আশ্বাস নিয়ে এসেছ। এতে শুধু বিজলির চমক আছে। দু-পয়সার উপকার করার ক্ষমতা নেই। হুয়াই! আফসোস তোমার জন্য। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। মুহাম্মাদের মধ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা ছাড়া আর কিছু দেখিনি আমি।'

হুয়াই এতেও আশাহত হয় না। সে অনবরত কাবের চুলের খোঁপা ও কাঁধে হাত বুলিয়ে ফুসলাতে থাকে। একপর্যায়ে তাকেও বশে নিয়ে আসে। অবশ্য এজন্য তাকে কাবের সঙ্গে এই মর্মে একটি অঙ্গীকার করতে হয়, 'কুরাইশ ও বনু গাতফান এ যাত্রায় মুহাম্মাদকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলে, সে-ও কাবের সঙ্গে তার দুর্গে প্রবেশ করবে। কাবের যা হবে, তারও সেই ভাগ্যবরণ করতে হবে।' এই অঙ্গীকার নিয়ে কাব নবিজির সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।[২]

বনু কুরাইজার ইহুদিরাও এবার সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়। ইবনু ইসহাক বলেন, সাফিয়া বিনতু আব্দিল মুত্তালিব হাসসান ইবনু সাবিতের 'ফারি' নামক দুর্গে আশ্রয় নেন। নারী ও শিশুদের নিয়ে হাসসান নিজেও সেখানে অবস্থান করছিলেন। সাফিয়া বলেন, হঠাৎ আমি লক্ষ করি, এক ইহুদি দুর্গের চারপাশে চক্কর কাটছে। এর কিছুক্ষণ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৭

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২০ ও ২২১

আগে আমরা সংবাদ পেয়েছি, বনু কুরাইজা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। এখন নবিজি ও তাদের মধ্যে কোনো মিত্রতা নেই। কাজেই ইহুদিটা যেকোনো সময় নারীদের দুর্গে ঢুকে অঘটন ঘটাতে পারে। তাকে প্রতিহত করার মতো কোনো পুরুষ সৈনিকও তখন সেখানে ছিল না। সবাই এখন খন্দক-প্রান্তরে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সুতরাং তাদের কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা এই মুহূর্তে অন্তত নেই। আমি হাসসানকে বললাম, ওই ইহুদিটা দুর্গের আশপাশে ঘুরঘুর করছে। আল্লাহর কসম! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে ফিরে গিয়ে তার স্বজাতি ও সহযোদ্ধাদের বলবে, ফারি দুর্গে মুসলিম নারী ও শিশুরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সেখানে কোনো পুরুষ যোদ্ধা নেই। তখন বিপদের শেষ থাকবে না। তাই আপনি এক্ষুনি গিয়ে তাকে হত্যা করুন। হাসসান বলেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি তো জানেনই, আমি এ কাজের জন্য উপযুক্ত নই।' এরপর আমি কোমর বেঁধে একটি লাকড়ি হাতে নিই। দুর্গ থেকে নেমে এই লাকড়ি দিয়েই ইহুদির ওপর সজোরে আঘাত করি। এক আঘাতেই তার দফারফা হয়ে যায়। ফিরে এসে আমি হাসসানকে বলি, আপনি গিয়ে নিহত ইহুদিটার জিনিসপত্র খুলে নিয়ে আসুন। সে পুরুষ বলে আমি এ কাজটি করিনি। হাসসান বলেন, 'এগুলো আমার প্রয়োজন নেই।'[১]

বলার অপেক্ষা রাখে না, নবিজির ফুফু সাফিয়ার এই সাহসী পদক্ষেপ মুসলিম নারী ও শিশুদের নিরাপত্তায় অনেক বড় ভূমিকা রাখে। একটি মাত্র হত্যাকাণ্ড থেকেই ইহুদিরা ধরে নেয়, দুর্গ ও গুহাগুলো মুসলিম সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণে। এজন্য তারা আর সরাসরি যুদ্ধ করতে আসেনি। তবে মুশরিকদের সঙ্গে একাত্মতার প্রমাণস্বরূপ তারা রসদ সরবরাহ করে। মুসলিমরা একবার তাদের রসদবাহী ২০টি উট আটকেও দেয়।

বনু কুরাইজার এ বিদ্রোহের সংবাদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে, তিনি এর সত্যতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেন যাতে তাদের মনোভাব বুঝতে পারেন এবং সে আলোকে নতুন করে সমর-পরিকল্পনা সাজাতে পারেন। এ লক্ষ্যে তিনি সাদ ইবনু মুআজ, সাদ উবনু উবাদা, আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা এবং খাওয়াত ইবনু যুবাইরকে পাঠান। তাদের বলে দেন, 'তোমরা যাও। এই গোত্রের ব্যাপারে আমার কাছে যে সংবাদ এসেছে, তা সঠিক কি না যাচাই করো। সত্য হলে, আমার কাছে এসে সাংকেতিক ভাষায় বুঝিয়ে বলবে। জনসম্মুখে প্রকাশ করে তাদের দুশ্চিন্তা বাড়াবে না।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৮; এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, হাসসান রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন কিছুটা ভীরু প্রকৃতির মানুষ। তবে হাদিস বিশারদগণের মতে, এটা একটা মুনকাতি (সূত্র-বিচ্ছিন্ন) হাদিস। আর এ কারণে অনেকেই ওপরের ঘটনাটি সত্য বলে মেনে নেয়নি।

হাফিয ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উক্ত ঘটনার বর্ণনা যদি সহিহও হয়ে থাকে, তবু হাসসান রাযিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। হতে পারে, কথাটা তিনি ঠাট্টার ছলে বলেছেন অথবা তিনি সেদিন অসুস্থ ছিলেন। অনেকে আবার মনে করে, হাসসানের এই ভীরুতা জন্মেছে তার কাঁধে সাফওয়ান ইবনু মুআত্তালের আঘাতের পর থেকে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আর যদি তারা প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে, তবে সবার সামনে সে কথা ঘোষণা করবে।' প্রতিনিধি দল তদন্তে নেমে দেখতে পায়, ইহুদিরা এতটাই উত্তেজিত যে, তাদের উপস্থিতিতেও তারা ইসলাম ও তার নবিকে গালাগাল করতে ভাবিত হচ্ছে না। তারা বলে, 'রাসুল আবার কে? আমাদের ও মুহাম্মাদের মধ্যে কোনো অঙ্গীকার নেই। নেই কোনো চুক্তিও।'

প্রতিনিধিরা ফিরে এসে নবিজিকে বলেন, এরাও আযল ও কারার মতোই। অর্থাৎ এরাও আযল, কারাহ ও রাজির অধিবাসীদের মতোই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিষয়টি যথাসম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করা হয়। তারপরও বেশির ভাগ মানুষ জেনে যায়। তাদের কানে বেজে ওঠে এক ভয়ংকর দিনের অশনি সংকেত।

মুসলিমরা তখন আক্ষরিক অর্থেই বিপদসীমার ওপর দাঁড়িয়ে। বনু কুরাইজা ও মুসলিমরা একই ভূখণ্ডের বাসিন্দা। কোনো রকমের আড়াল বা সীমানা-প্রাচীর নেই তাদের মধ্যে। তাছাড়া মুসলিম নারী ও শিশুদেরকে রেখে যাওয়া হয়েছে তাদের পার্শ্ববর্তী অরক্ষিত একটি দুর্গে। এমন পরিস্থিতিতে তারা সেই দুর্গে আক্রমণ করলে অথবা পেছন থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, মুহূর্তেই সব তছনছ হয়ে যাবে। আবার চোখের সামনে বিশাল শত্রুবাহিনী রেখে পেছনে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। এতে অবস্থা আরও গুরুতর হতে পারে।

মহান আল্লাহ মুসলিমদের এই উভয় সংকটের চিত্র এঁকেছেন এভাবে—

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝١٠ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝١١

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল তোমাদের ওপর এবং নিচ থেকে; তখন (ভয়ে) তোমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা করতে শুরু করেছ; বিরূপ সব ধারণা। সেই সময় মুমিনদেরকে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, এমনকি ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল তাদের ভিত।[১]

ইহুদিদের দেখাদেখি মুনাফিকরাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল, আমরা কাইসার-কিসরার ধন-ভান্ডারের মালিক হব, অথচ আমরা এখন নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই উদ্বিগ্ন। নিশ্চিন্তে প্রাকৃতিক কাজ করাটাও

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ১০-১১

তো এখন কষ্টকর হয়ে গিয়েছে আমাদের জন্য।' এদের কেউ কেউ আবার নবিজিকে গিয়ে বলছিল, 'আমাদের ঘরবাড়ি মদিনার বাইরে অনিরাপদ অবস্থায় পড়ে আছে। দয়া করে আমাদের অনুমতি দিন। আমরা সেখানে গিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি।'

তাদের এসব কথাবার্তায় বনু সালিমাও মনোবল হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তখন অবতীর্ণ করেন—

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

স্মরণ করুন, যখন মুনাফিক ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। আরও স্মরণ করুন, যখন তাদেরই একটি দল বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী, (এখানে) তোমরা টিকতে পারবে না। তাই (ঘরে) ফিরে যাও। তাদের আরেকটি দল তো নবির কাছে এই বলে অনুমতি চাইছিল, আমাদের ঘরগুলো অরক্ষিত (আমাদের ফিরে যেতে দিন)। অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। বরং পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য।[১]

বনু কুরাইজার বিদ্রোহের সংবাদ নিশ্চিত হলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রেখে কিছু সময় শুয়ে থাকেন। এতে জনমনে বিপদের আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি শয্যা থেকে উঠলে, দেখা যায় তার মুখমণ্ডলে আশার আলো চিকচিক করছে। তিনি দাঁড়িয়ে শরীরের ধুলোবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, 'হে মুসলিম জাতি! আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' এ কথা বলে তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ কিছু সতর্ক পদক্ষেপ নেন। তার অংশ হিসেবে বাছাই করা কয়েকজন সাহাবির ছোট একটি দল পাঠিয়ে দেন মদিনার প্রহরায় যেন নারী-শিশুদের ওপর ইহুদিরা অতর্কিত হামলা করতে না পারে।

কিন্তু শত্রুপক্ষ প্রোপাগান্ডা ও বন্ধুত্বের প্রলোভনের মাধ্যমে যেভাবে তাদের দল ভারী করছিল, তার বিপরীতে মুসলিমদের এই সতর্কতা যথেষ্ট ছিল না। তাদের জন্য তখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল, যেকোনো মূল্যে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা। এ লক্ষ্যে নবিজি

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ১২-১৩

বনু গাতফানের সর্দার উয়াইনা ইবনু হিসন ও হারিস ইবনু আউফের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। এ চুক্তিতে তাদেরকে মদিনার মোট উৎপাদিত খাদ্যশস্যের তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়ার প্রস্তাব থাকবে। আর এমন সুবিধা পেলে তারা শত্রুপক্ষ ছেড়ে ঘরে ফিরে যাবে। তখন মুসলিমরা বেশ ভালোভাবে কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের মোকাবেলা করতে পারবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই প্রস্তাবনা নিয়ে সাহাবিদের সাথে পরামর্শে বসেন। প্রাথমিক আলাপে সবার মতামত নেন। সবশেষে তিনি আলাদা করে সাদ ইবনু মুআজ ও সাদ ইবনু উবাদার মতামত জানতে চান। তারা দুজনেই ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, 'এ প্রস্তাবনা আল্লাহর নির্দেশে হয়ে থাকলে এটাই আমাদের জন্য শিরোধার্য। কিন্তু তা না হয়ে, এটা যদি হয় আমাদের প্রতি আপনার স্বপ্রণোদিত কল্যাণচিন্তার বহিঃপ্রকাশ, তবে আমরা বলব, এসবের দরকার নেই। আমরা যখন তাদের মতো মুশরিক ছিলাম, তখনই তো তারা বেচাকেনা ছাড়া আমাদের কাছ থেকে একটি শস্যদানাও আশা করতে পারত না! আর এখন কিনা আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করার পর এদেরকে আমাদের সম্পদ দেব? আল্লাহর কসম, তরবারির আঘাত ছাড়া তাদের জন্য আমাদের কাছে আর কিছুই বরাদ্দ নেই।' নবিজি তাদের অভিমত সমর্থন করে বলেন, 'তোমরা ঠিকই বলেছ। তবে আমি দেখছি, গোটা আরব আজ তোমাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। সবার তিরের নিশানা আজ তোমাদের দিকে। তাই আমি তোমাদের জন্য সহজ কিছু করতে চাইছিলাম।'

এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় সহসাই শত্রুদের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়। তাদের মনোবলে ভাটা পড়ে। স্তিমিত হয়ে আসে তাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা। বনু গাতফানের নুআইম ইবনু মাসউদ ইবনি আমির আশজাই নবিজির কাছে এসে চুপিসারে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি সবে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার সম্প্রদায় আমার ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয়। আপনি যা ইচ্ছা, আমাকে আদেশ করুন। নবিজি তাকে বলেন, 'তুমি একা মানুষ। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ তুমি নিতে পারবে না। সেটা উচিতও হবে না। তবে তুমি তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করতে পারো। নষ্ট করে দিতে পারো তাদের মনোবল। জেনে রেখো, যুদ্ধ মানেই বুদ্ধির খেলা!'

নুআইম কালক্ষেপণ না করে সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত বাহিনীর কাছে চলে যান। ইসলামগ্রহণের পূর্বে এসব গোত্রের সাথে তার বেশ সখ্য ছিল। তিনি প্রথমে বনু কুরাইজায় যান। তাদেরকে বলেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমার ও তোমাদের বন্ধুত্ব কতটা গভীর!' তারা বলল, 'অবশ্যই।' নুআইম বললেন, 'তোমরা ও কুরাইশরা এক নও। তারা এখানে বহিরাগত। তোমরা স্থানীয়। এ দেশ তোমাদের। তোমাদের ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী-পরিজন সবই এখানে। এদের সবাইকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয়। কুরাইশ ও বনু গাতফান মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ করতে

এসেছে। আর তোমরা কিনা স্বদেশের লোকদের ছেড়ে তাদেরকেই সাহায্য করছ! ভুলে যেয়ো না, তাদের ধনসম্পদ ও স্ত্রী-পরিজন এখান থেকে অনেক দূরে। তারা সুবিধা পেলে যুদ্ধ করবে; অন্যথায় ফিরে যাবে নিজ দেশে। তখন তোমাদেরকে অথবা মুহাম্মাদকে নিয়ে ভাববার অবসর থাকবে না তাদের। মাঝখান দিয়ে তোমরা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসায় মুহাম্মাদ তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নেবেন। এরপরও তোমরা যুদ্ধ করতে চাইলে, কুরাইশদের থেকে উচ্চমূল্যের বন্ধক গ্রহণ করো। এতে যুদ্ধের ফলাফল যা-ই হোক, তোমাদের ক্ষতির পরিমাণ অন্তত কমে আসবে।' জবাবে তারা বলল, 'তুমি আমাদের ঠিক পরামর্শটাই দিয়েছ।'

বনু কুরাইজাকে মন্ত্রণা দেওয়ার পর নুআইম সোজা চলে যান কুরাইশদের কাছে। তাদেরকে বলেন, 'তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক কতটা গভীর, সেটা নিশ্চয়ই আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সেই সম্পর্কের দায়বদ্ধতা থেকেই তোমাদেরকে গোপন একটি তথ্য দিতে চাই।' তারা বলল, 'যুদ্ধের দিনে এর চেয়ে বড় উপকার আর কিছু হতে পারে না।' তিনি বললেন, 'ইহুদিরা মুহাম্মাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে এখন অনুতপ্ত। শীঘ্রই তারা তোমাদের কাছে লোক পাঠাবে। মূল্যবান কিছু বন্ধক চাইবে তোমাদের কাছে। এরপর সেগুলো মুহাম্মাদের হাতে তুলে দেবে অঙ্গীকার ভঙ্গের বিনিময় হিসেবে। এভাবে আবার মুহাম্মাদের সাথে গড়ে উঠবে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। মাঝখান দিয়ে তোমরা পড়ে যাবে অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপে। তাই তারা তোমাদের কাছে বন্ধক চাইলে, তোমরা দিয়ো না।' এখানেও তিনি সফল হন। পরপর দুটি সাফল্য অর্জনের পর তিনি চলে যান বনু গাতফানের কাছে। কুরাইশদের মতো তাদেরকেও তিনি একই কথা বলে বিভ্রান্তিতে ফেলেন।

৫ম হিজরির শাওয়াল মাসের শুক্রবার দিবাগত রাতে কুরাইশরা দূত-মারফত বনু কুরাইজার ইহুদিদের কাছে বার্তা পাঠায়, 'আমাদের অবস্থানের জায়গাটি ভালো নয়। আমাদের ঘোড়া ও উটগুলো মারা যাচ্ছে। তাই চলো, আমরা একযোগে মুহাম্মাদের ওপর আক্রমণ করি।' জবাবে ইহুদিরা বলে পাঠায়, 'আজ তো শনিবার। শনিবারের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করার কারণে আমাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া তোমরা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বন্ধক না রাখলে, আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে যাচ্ছি না।' দূত এ সংবাদ নিয়ে এলে কুরাইশ ও বনু গাতফান একযোগে বলে ওঠে, 'আল্লাহর কসম! নুআইম তোমাদের সত্য বলেছে।' উপায় না দেখে তারা বনু কুরাইজার ইহুদিদের বলে পাঠায়, 'আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে আমরা কিছুই বন্ধক রাখব না। চাইলে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে আমাদের সাথে যোগ দাও অথবা চরম ভাগ্য-বিপর্যয়ের অপেক্ষা করো।' উত্তরে তারা বলে, 'আল্লাহর কসম! নুআইম সত্য বলেছে। এভাবে উভয় দলের মধ্যে অনৈক্য তৈরি হয়।' সেই সূত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম

বিশৃঙ্খলা। মনোবল হারিয়ে ফেলে কুরাইশ ও বনু গাতফানের যোদ্ধারা।

এদিকে মুসলিমরা আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করছিল, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন। আমাদেরকে ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন।' নবিজিও দুআ করছিলেন। তার দুআর পুরোটাই ছিল সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ, হে কিতাব-অবতরণকারী, হে দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী, এই সম্মিলিত বাহিনীকে আপনি পরাজিত করুন।'[১] আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুল ও মুসলিমদের দুআ কবুল করেন। মুশরিকদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে দেন। তাদের মনোবল ভেঙে দেন। সেইসাথে সৃষ্টি করেন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া। বাতাসের তোড়ে তাদের তাঁবুর সব খুঁটি ভেঙে পড়ে। শামিয়ানা উড়ে যায়। চুলায় চড়ানো পাতিল মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করে। মুহূর্তেই লন্ডভন্ড হয়ে যায় সবকিছু। তাদের একদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াবারও জো থাকে না সেখানে। তার ওপর আল্লাহ তাআলার নির্দেশে আসমান থেকে নেমে আসে একদল ফেরেশতা। তারা শত্রুপক্ষের প্রতিটি সৈন্যের হৃদয়ে সঞ্চার করে দেন সীমাহীন ভয় ও উৎকণ্ঠা। শৈত্য-প্রবাহ ও ভয়-উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে তারা।

এরই মধ্যে রাতের কালো আঁধার জেঁকে বসে তাদের ওপর। মুশরিকদের জন্য পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরও বিপজ্জনক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে পাঠান শত্রু-শিবিরে। তিনি রাতের আঁধার গলে সেখানে গিয়ে দেখতে পান, সবাই মক্কায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি ফিরে এসে এ সংবাদ দিলে, নবিজি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। আল্লাহ তাঁর শত্রুদের খালিহাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ যুদ্ধে তাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি কিছুই। শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ একাই যথেষ্ট। তিনি তাঁর কথা রেখেছেন। তাঁর পক্ষের লোকদের সম্মানিত করেছেন। নানাভাবে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা পাঠিয়েছেন এবং একাই পরাজিত করেছেন মক্কার কুরাইশ, মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকদের। এমন একটি অভাবিতপূর্ব যুদ্ধ শেষে নবিজি মদিনায় ফিরে আসেন।

বিশুদ্ধ মতানুসারে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরির শাওয়াল মাসে। মুশরিকরা প্রায় ১ মাস মদিনা অবরোধ করে রাখে। ঐতিহাসিক সূত্রাবলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অবরোধ শুরু হয়েছিল শাওয়াল মাসে এবং শেষ হয়েছিল জিলকদ মাসে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনু সাদ বলেন, নবিজি বুধবার মদিনায় ফিরে আসেন। তখনো জিলকদ মাস শেষ হওয়ার ৭ দিন বাকি।

খন্দক যুদ্ধে রক্তপাতের ঘটনা তেমন ঘটেনি বললেই চলে। এ যুদ্ধ ছিল আগাগোড়া একটি স্নায়ুযুদ্ধ। তবু ইসলামের ইতিহাসে এর গুরুত্ব ও প্রভাব বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৯৩৩, ২৯৬৫, ৩০২৪, ৪১১৫, ৬৩৯২

এর মধ্য দিয়ে মুশরিকদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। সেইসাথে জনমনে এটাও বদ্ধমূল হয়, আরবের কোনো শক্তিই মদিনার অগ্রসরমাণ ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সমূলে বিনাশ করতে পারবে না। কারণ মক্কার মুশরিকরা এই খন্দক যুদ্ধে যে পরিমাণ সৈন্য একত্র করতে পেরেছে, ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে সেটা আর সম্ভব হবে না। এজন্যে তারা খন্দক ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় নবিজি মন্তব্য করেন, 'এখন থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করব। তারা আমাদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করার সাহস করবে না। এখন থেকে ক্রমশ আমরা এগিয়ে যেতে থাকব তাদের দিকে।'[১]

বনু কুরাইজার যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধ শেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন মদিনায় ফেরেন, সেদিনই দুপুর বেলা জিবরিল আমিন এসে বলেন, 'আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? ফেরেশতারা কিন্তু এখনো তাদের অস্ত্র রাখেনি; আসমানেও ফিরে যায়নি। তারা সবাই বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকদের সন্ধানে বেরিয়েছে। আপনিও এক্ষুনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে আমাদের সাথে চলুন। আমি আপনাকে সামনে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। তাদের দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করব। সেইসাথে তাদের মনে জাগিয়ে তুলব সীমাহীন ভয়।' এ কথা বলে জিবরিল আমিন তার সহচর ফেরেশতাদের নিয়ে আগে আগে চলতে থাকেন।

নবিজি তখন গোসল করছিলেন। জিবরিলের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসেন এবং একজন ঘোষককে সকলের সামনে ঘোষণা দিতে বলেন, 'যে ব্যক্তির শোনার ও মানার যোগ্যতা আছে, সে যেন বনু কুরাইজায় গিয়ে আসরের সালাত আদায় করে নেয়।' মদিনার প্রশাসনিক দায়িত্ব এবার অর্পিত হয় আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমের ওপর। যুদ্ধের পতাকা দেওয়া হয় আলি ইবনু আবি তালিবের হাতে। সাহাবিদের একটি দল নিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যান বনু কুরাইজার উদ্দেশে। দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছলে তারা শুনতে পান, ভেতর থেকে নরাধমগুলো অকথ্য ভাষায় নবিজিকে গালিগালাজ করছে।

আনসার ও মুহাজিরদের আরেকটি দল নিয়ে নবিজি নিজেও বের হন। তিনি বনু কুরাইজার একটি কূপের ধারে গিয়ে যাত্রাবিরতি দেন। কূপটির নাম আন্না। মদিনার অন্যান্য মুসলিমের কাছেও ততক্ষণে বনু কুরাইজা আক্রমণের সংবাদ এবং নবিজির নির্দেশনা পৌঁছে যায়। এক-এক করে যুদ্ধক্ষম প্রত্যেকে বেরিয়ে পড়ে তার অনুসরণে। পথিমধ্যে আসরের সময় হয়ে যায়। নবিজি যেহেতু বলেছেন বনু কুরাইজায় গিয়ে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪১১০

সালাত আদায় করতে, তাই হঠাৎ করে সালাত পড়া নিয়ে সাহাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ অনুসারে আমরা গন্তব্যে পৌঁছেই সালাত আদায় করব।' এমনকি তাদের কেউ কেউ ইশার পর আসর আদায় করেন। আরেক দল বলেন, 'আল্লাহর রাসুল মূলত সেই কথাটি আমাদের বলেছিলেন দ্রুত পথ চলতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।' এ কথা বলে তারা যথাসময়ে পথেই আসরের সালাত পড়ে নেন। পরবর্তীকালে এ ঘটনা নবিজির গোচরে দেওয়া হলে, তিনি দুদলের দুরকমের আমলকেই সমর্থন করেন।

মোটকথা, মুসলিমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে বনু কুরাইজার দিকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে সবাই নবিজির সঙ্গে মিলিত হয়। মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৩ হাজার। এদের মধ্যে অশ্বারোহী মাত্র ৩০ জন। সকল সৈন্য একত্র হলে তারা বনু কুরাইজার দুর্গের চারপাশে গিয়ে অবস্থান নেন এবং অবরোধ আরোপ করেন। দিনদিন অবরোধ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। ইহুদিদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। রসদ ফুরিয়ে আসে তাদের। কারও পক্ষ থেকে কোনো রকমের সাহায্য আসার পথও বন্ধ। এমন পরিস্থিতিতে নিরুপায় ইহুদি সর্দার কাব ইবনু আসাদ তার লোকদের সামনে ৩টি প্রস্তাব রাখে—

১. ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে মুহাম্মাদের আনুগত্য করো। তার দ্বীনকে সত্য বলে মেনে নাও। এতে তোমাদের জানমাল, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী-পরিজন সবই নিরাপদ থাকবে। তোমরা নিশ্চয় জানো—তিনিই আল্লাহর রাসুল। তার রিসালাত তোমাদের কাছে সূর্যের চেয়েও বেশি পরিষ্কার। তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থেও এর সত্যতার প্রমাণ তোমরা পেয়েছ।

২. তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তান ও অবলা নারীদের নিজ হাতে হত্যা করো। এরপর পিছুটান ছেড়ে তরবারি হাতে মুহাম্মাদের দিকে অগ্রসর হও। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো তার ওপর। এতে তোমরা হয় বিজয়ী হবে, নয়তো তোমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত লড়াই করে যাবে তার বিরুদ্ধে।

৩. অথবা তোমরা শনিবারে আক্রমণ করে বসো মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের ওপর। এ দিন আমরা যুদ্ধ করি না বলে তারা খুব সহজেই প্রতারিত হবে এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাদের তির-তরবারির নিশানায় পরিণত হবে।

তবে দুঃখের বিষয়, ৩টি প্রস্তাবের কোনোটিই তাদের পছন্দ হয় না। কাব তখন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'মায়ের কোলে জন্ম নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি তোমরা কোনো বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারোনি।'

প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর তাদের সামনে কেবল একটি পথই খোলা থাকে। সেটি হচ্ছে নবিজির কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তার হাতে

অর্পণ করা। তবে আত্মসমর্পণের আগে তারা তাদের কয়েকজন মুসলিম মিত্রের সাথে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা ভেবেছিল, এই আলোচনার মাধ্যমে হয়তো মুসলিমদের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। এ চিন্তা থেকেই তারা নবিজির কাছে অনুরোধ জানায়, আপনি দয়া করে আবু লুবাবাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা তার সাথে পরামর্শ করতে চাই। আবু লুবাবা তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাছাড়া তার বাগান ও পরিবার-পরিজনের অবস্থানও ইহুদিদের এলাকায়।

তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে নবিজি তাকে দুর্গে যাওয়ার অনুমতি দেন। দুর্গের সবাই তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানায়। নারী-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ ডুকরে কেঁদে ওঠে তাকে দেখে। তাদের সে কান্না হৃদয় ছুঁয়ে যায় আবু লুবাবার। তার কোমল হৃদয়টা অনেক বেশি আর্দ্র হয়ে ওঠে। ইহুদিরা জিজ্ঞেস করে, 'আবু লুবাবা, আমরা কি মুহাম্মাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি?' তিনি বলেন, 'অবশ্যই।' এরপর তিনি গলায় চাকু চালানোর ইশারা করেন। এর অর্থ মৃত্যুদণ্ড। পরক্ষণেই তার মনে হয়, এটা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। এজন্য তিনি খুবই লজ্জিত হন। দুর্গ থেকে বের হয়ে সোজা চলে যান মাসজিদে নববিতে। সেখানে গিয়ে মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে বাঁধেন। এরপর শপথ করেন, নবিজি নিজ হাতে তার বাঁধন খুলে না দিলে তিনি একচুলও নড়বেন না সেখান থেকে। মাড়াবেন না বনু কুরাইজার ভূমিও। এদিকে নবিজি তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। পরে অন্যদের মাধ্যমে তার কথা জানতে পারলে তিনি বলতে শুরু করেন, 'সে এসব না করে সরাসরি আমার কাছে চলে এলেই পারত। আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতাম। কিন্তু সে যেহেতু কসম কেটে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। তাই আল্লাহ তার তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত আমার আর কিছুই করার নেই।'

আবু লুবাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও বনু কুরাইজা নবিজির হাতে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ তারা চাইলে খুব সহজেই অবরোধটাকে দীর্ঘ করে যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন করতে পারত। সেই বৈষয়িক সামর্থ্য তাদের ছিল। কারণ খাদ্যশস্য ও মিঠা পানির বিরাট জোগান তাদের হাতে। তাছাড়া তাদের দুর্গটিও বেশ মজবুত এবং অনেকটাই দুর্ভেদ্য। অপরদিকে মুসলিম সৈনিকরা ক্ষুধায় কাতর। খোলা আকাশের নিচে প্রচণ্ড শীতে থরথর করে কাঁপছে সবাই। পরপর কয়েকটি যুদ্ধের ক্লান্তি ও অবসাদ তো ছিলই সর্বাঙ্গজুড়ে। একমাত্র মন ছাড়া সমস্ত দেহই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়তে চাইছিল বেলে মাটির মতো। এ অবস্থায় ইহুদিরা চাইলে যুদ্ধের মোড় হয়তো ঘুরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে সাহস তাদের হয়নি। মূলত এটা ছিল একটা স্নায়ুযুদ্ধ। এ যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের অন্তরে ভয় ঢেলে দিয়েছেন। এতে তাদের সাহস ও মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে। প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত করার শক্তি ছিল না কারও। বিশেষ করে যখন আলি ইবনু আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম হায়দারি হাঁক ছেড়ে

তাদের দিকে এগিয়ে যান। আলি হুংকার ছেড়ে বলেন, 'শোনো ঈমানদারেরা, আল্লাহর কসম, হামযার মতো আজ আমিও শহিদ হব, নয়তো তাদের এই দুর্গ জয় করব।'

এই রণহুংকারে ইহুদিরা আরও ভড়কে যায়। সুড়সুড় করে দুর্গ থেকে নেমে আসে। নবিজির নির্দেশে সেখানকার পুরুষ মানুষগুলোকে বন্দি করা হয়। আর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার তত্ত্বাবধানে হাতকড়া পরানো হয়। নারী ও শিশুদেরকে দূরে রাখা হয় পুরুষদের থেকে। আউস গোত্রের লোকেরা তখন নবিজির কাছে এসে বলে, 'হে আল্লাহর রাসুল, বনু কাইনুকার সাথে আপনি তুলনামূলক কোমল আচরণ করেছিলেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সেটা। তারা ছিল আমাদের ভাই খাযরাজের মিত্র। আর এরা আমাদের মিত্র। তাই এদের প্রতিও আপনি দয়ার আচরণ করুন।' নবিজি জিজ্ঞেস করেন, 'তাদের বিচারের ভার তোমাদেরই একজনের হাতে দেওয়া হলে কেমন হয়?' তারা উত্তর দেয়, 'বেশ ভালো হয়।' নবিজি বলেন, 'ঠিক আছে। তাদের বিষয়টি সাদ ইবনু মুআজের বিবেচনায় ছেড়ে দেওয়া হলো। সে যা রায় দেবে, তাই হবে।' তারা বলে, 'আমরা এতে রাজি।'

সাদ ইবনু মুআজ তখন মদিনায় ছিলেন। খন্দক যুদ্ধে তিনি হাতে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ার কারণে এ যুদ্ধে আর অংশ নিতে পারেননি। পরে ইহুদিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য নবিজি তাকে ডেকে পাঠান। একটি গাধায় করে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে অপরাপর ইহুদি ও বনু কুরাইজার মিত্ররা তাকে অনুনয় করে বলে, 'সাদ, তোমার ভাইদের প্রতি সদাচার করো। নবিজি তোমাকেই তাদের বিচারক স্থির করেছেন। তারা এখন তোমার দয়ার ভিখারি।' কিন্তু সাদ কোনো উত্তর দেন না। এতে তাদের মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। তখন তিনি বলতে শুরু করেন, 'আমি এখন এমন সময় পার করছি, যেখান থেকে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করা উচিত নয়।' তার এমন উত্তর সবাইকে হতাশ করে। অনেকে সেখান থেকেই বন্দি ইহুদিদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মদিনায় ফিরে আসে।

সাদ নবিজির কাছে পৌঁছলে তিনি সাহাবিদের বলেন, 'তোমরা তোমাদের সর্দারকে অভ্যর্থনা করো।' তারা গিয়ে তাকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে আনেন। এরপর বলেন, 'হে সাদ, এরা তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।' সাদ জিজ্ঞেস করেন, 'এদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই কি চূড়ান্ত?' তারা ইতিবাচক উত্তর দেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, 'মুসলিমদের ওপরও কি আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে?' তারা আবারও সবাই একই উত্তর দেন। তারপর নবিজির সম্মানে তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'ওখানে যিনি আছেন, তার ওপরও কি কার্যকর হবে?' নবিজি বলেন, 'হ্যাঁ, তোমার সিদ্ধান্ত আমার ক্ষেত্রেও কার্যকর।' এভাবে সবদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে তিনি বলেন, 'এদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এদের পুরুষদের হত্যা করা হোক। নারী ও শিশুদের বন্দি করতে হবে এবং সবার মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে তাদের ধনসম্পদ।' তার এই

অভাবিত সিদ্ধান্ত শুনে নবিজি বলেন, 'সাদ, তুমি আল্লাহর ফয়সালা অনুসারেই সিদ্ধান্ত দিয়েছ। তিনি এটা বহু আগেই সাত আসমানের ওপরে লিখে রেখেছেন।'

সাদের এই সিদ্ধান্ত ছিল খুবই ন্যায়সংগত ও ইনসাফপূর্ণ। কারণ বনু কুরাইজা বরাবরই বিশ্বাসঘাতকতা করে আসছিল। সর্বশেষ, মুসলিমরা যখন খন্দক-প্রান্তরে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে, ঠিক তখন তারা হাত মেলায় শত্রুর সাথে। তাছাড়া মুসলিমদের নির্মূল করার জন্য তারা দেড় হাজার তরবারি, ২ হাজার বর্শা, ৩০০ লৌহবর্ম এবং ৫০০টি ঢালের বিশাল মজুদ গড়ে তোলে—যা দুর্গজয়ের পর মুসলিমদের দখলে চলে আসে।

নবিজির নির্দেশে নাজ্জার গোত্রের এক বাসিন্দা হারিসের মেয়ের বাড়িতে বনু কুরাইজার লোকদেরকে আটকে রাখা হয়। এদিকে মদিনার বাজারে তাদের জন্য খনন করা হচ্ছে বিশাল বিশাল গর্ত। খনন কাজ শেষ হলে তাদের এক-এক জনকে সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয় সেসব গর্তে। তাদের একদলকে গর্তের পাড়ে নিয়ে যাওয়া হলে, অন্যরা কাব ইবনু আসাদকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, আমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে?' উত্তরে সে বলে, 'তোমরা কি আসলেই বুঝতে পারছ না, তাদেরকে নিয়ে কী করা হচ্ছে! তোমরা কি দেখছ না যাকে একবার ডাকা হচ্ছে, সে আর ফিরে আসছে না। আল্লাহর কসম! তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। তোমাদের সাথেও ঠিক তা-ই করা হবে।' সেদিন বনু কুরাইজার ৬০০-৭০০ জন যুদ্ধক্ষম পুরুষকে হত্যা করা হয়। এরা জাতিগতভাবেই বিশ্বাসঘাতক, ধোঁকাবাজ ও দুমুখো সাপ। এদের অপরাধ বহুমাত্রিক। এরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। মুসলিমদের ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে এবং যুদ্ধাপরাধে জড়িয়েছে। এজন্য তাদের মৃত্যুদণ্ড ছিল সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত।

এদের সাথে বনু নাজিরের দাগি আসামি হুয়াই ইবনু আখতাবও নিহত হয়। উম্মুল মুমিনিন সাফিয়ার পিতা সে। বনু কুরাইজার সর্দার কাবের সাথে হুয়াই ইবনু আখতাব চুক্তি করেছিল, এ যাত্রায় তারা মুহাম্মাদকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলে কাবের দুর্গে এসে আশ্রয় নেবে এবং কাবদের ভাগ্যে যা ঘটবে, সেও তা মেনে নেবে। তার এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই মূলত কাব মুসলিমদের সঙ্গে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তি ভঙ্গ করে। পরে কুরাইশ ও বনু গাতফান ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে হুয়াই তার অঙ্গীকার অনুসারে বনু কুরাইজার দুর্গে এসে আশ্রয় নেয় এবং সেও তাদের ভাগ্যবরণ করে। শাস্তির জন্য তাকে সামনে আনা হলে, দেখা যায়, সে লম্বা একটি চাদর দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছে। চাদরটি ছেঁড়াফাটা। সে নিজেই চাদরটির এই দশা করেছে—যেন তার মৃত্যুর পরে গনিমতের মাল হিসেবে এটা অন্য কাউকে দেওয়া না যায়।

দুই হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে তাকে গর্তের পাশে হাজির করা হয়। সে তখন নবিজিকে বলে, 'আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমার সাথে শত্রুতার কারণে আমার কোনো

আফসোস নেই। যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে সে তো পরাজিত হবেই।' এরপর সে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলে, 'শোনো তোমরা! এটাই আল্লাহর ফয়সালা। তাকদিরের লিখন। যা হওয়ার ছিল, তা-ই হচ্ছে। এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। বনি ইসরাইলের ভাগ্যে এই পরিণাম আল্লাহই লিখে রেখেছেন।' বক্তব্যের পর সে নিথর হয়ে বসে পড়ে। অন্যদের মতো তাকেও হত্যা করা হয়। পুরুষদের পাশাপাশি এক নারীকেও সেদিন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কারণ সে জাঁতা নিক্ষেপ করে খাল্লাদ ইবনু সুওয়াইদকে হত্যা করেছিল।

এছাড়া নারী, শিশু, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অক্ষমদেরকে নবিজি প্রাণের নিরাপত্তা দেন। আতিয়া কুরাজি তখন নাবালক ছিলেন। এজন্য তাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তিনি ইসলামের ছায়াতলে এসে সাহাবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

সাবিত ইবনু কাইস নবিজির কাছে আবেদন জানান, তিনি যেন যুবাইর ইবনু বাতা ও তার পরিবারকে সাবিতের জিম্মায় দিয়ে দেন। কারণ তার ওপর যুবাইরের বিশেষ একটি অনুগ্রহ ছিল। তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি এই আবেদন করেন। নবিজি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। যুবাইরকে সপরিবারে তার হাতে তুলে দেন। সাবিত যুবাইরকে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল আমার অনুরোধে তোমাকে সপরিবারে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম; তুমি সবাইকে নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে পারো।' কিন্তু যুবাইর অন্যান্য ইহুদির হত্যার কথা শুনে বলে ওঠে, 'আমি তোমার কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, আমাকে মুক্ত না করে বরং আমাকে আমার প্রিয়জনদের কাছে পাঠিয়ে দাও। তাদের সাথেই আমি ভালো থাকব।' উপায় না দেখে তাকেও হত্যা করে জাহান্নামে তার প্রিয়জনদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সাবিত তখন যুবাইরের পুত্র আব্দুর রহমান ইবনু যুবাইরকে প্রাণে বাঁচানোর চেষ্টা করে সফল হন। বড় হয়ে আব্দুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করে। একইভাবে বনু নাজ্জারের উম্মুল মুনজির সালমা বিনতু কাইস রাযিয়াল্লাহু আনহা রিফাআ ইবনু সামওয়াল কুরাজিকে তার জিম্মায় দিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। তার কথামতো নবিজি রিফাআকে তার জিম্মায় দিয়ে দেন। পরবর্তীকালে রিফাআও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং লাভ করেন সাহাবি হওয়ার অনন্য মর্যাদা।

সেদিন আত্মসমর্পণের আগে কিছু ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে তাদের জানমাল ও সন্তানসন্ততির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। মুসলিমদের সাথে কোনো ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, এমন এক ভদ্রলোকও বনু কুরাইজায় ছিল। তার নাম আমর। সে দুর্গ থেকে বের হলে মুসলিম কমান্ডার মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা তাকে চিনতে পারেন এবং তার পথ ছেড়ে দেন। এরপর সে কোথায় যায়, তার ব্যাপারে আর কিছু জানা যায়নি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কুরাইজার ধনসম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আলাদা করে বাকিটা সব মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এর মধ্যে অশ্বারোহীরা পায় তিন ভাগ আর পদাতিক সৈন্যরা এক ভাগ। কিছু বন্দিকে সাদ ইবনু যাইদ আনসারির নেতৃত্বে নাজদে পাঠানো হয় এবং তাদের বিনিময়ে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র কিনে আনা হয়।

এছাড়া নবিজি বনু কুরাইজার নারীদের মধ্যে রাইহানা বিনতু আমর ইবনি খানাকাকে নিজের জন্য নির্বাচন করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনামতে, আল্লাহর রাসুলের ইন্তেকাল পর্যন্ত রাইহানা তার মালিকানাতেই ছিলেন।[১] কিন্তু কালবি বলেন, আল্লাহর রাসুল ষষ্ঠ হিজরিতে তাকে মুক্ত করে তার সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিদায় হজ্জ পালন শেষে মদিনায় ফিরে আসার পরপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।[২]

বনু কুরাইজার বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দা সাদ ইবনু মুআজের দুআ কবুল করেন। খন্দক যুদ্ধে আহত হওয়ার পর সাদ বড় আবেগ নিয়ে তার রবকে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি জানেন, যে সম্প্রদায় আপনার রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দেশান্তর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমার কাছে যতটা প্রিয়, অন্যদের সাথে করা ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ, আমার মনে হয়, এখন আপনি তাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন। যদি কুরাইশদের সাথে কোনো যুদ্ধ বাকি থেকে থাকে, আমায় জীবিত রাখুন—যেন তাদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য জিহাদ করতে পারি। আর যদি এটাই হয়ে থাকে শেষ যুদ্ধ, তবে এ ক্ষত আর শুকানোর দরকার নেই, এটাকেই বানিয়ে দিন আমার মৃত্যুর কারণ।'[৩]

আল্লাহ তার দুআ কবুল করেছেন। নবিজি তার শুশ্রূষার জন্য মসজিদের এক কোণে তাঁবু খাটিয়েছিলেন। বনু কুরাইজার মোকাদ্দামা শেষ হতেই তার ক্ষত তাজা হয়ে ওঠে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'তার ক্ষতস্থান থেকে এত বেশি রক্তক্ষরণ হয় যে, তার পাশে খাটানো বনু গিফারের তাঁবুর দিকে বানের পানির মতো সে রক্ত গড়িয়ে যেতে থাকে। তারা রক্ত দেখে আঁতকে ওঠে। শশব্যস্ত হয়ে বলে, হে তাঁবুবাসী! তোমাদের তাঁবু থেকে এসব কী আসছে আমাদের দিকে? তখন দেখা যায় সাদের ক্ষতস্থান থেকে অবিরল ধারায় রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়।'[৪]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৪৫

[২] *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ১২

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪১২২, ৩৯০১

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৪১২২, ৪৬৩

ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সাদের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে।'[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাদের জানাযা বহন করার সময় মুনাফিকরা বলতে থাকে, 'কত হালকা তার মৃতদেহ!' জবাবে আল্লাহর রাসুল বলেন, 'ফেরেশতারা ধরে রেখেছে বলে তোমাদের কাছে হালকা মনে হচ্ছে।'[২]

বনু কুরাইজা অবরোধকালে মুসলিমদের একজন শাহাদাত-বরণ করেন। তার নাম খাল্লাদ ইবনু সুওয়াইদ। বনু কুরাইজার এক মহিলা জাঁতা নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। এছাড়া উক্কাশার ভাই আবু সিনান ইবনু মিহসানও অবরোধকালে মৃত্যুবরণ করেন।

এদিকে আবু লুবাবা ৬ রাত নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। সালাতের সময় হলে, তার স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন। সালাত শেষে আবার তিনি নিজেকে খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলতেন। এভাবেই ৬ রাত কেটে যায়। সপ্তম রাতের শেষ প্রহরে নবিজির কাছে তার তাওবা কবুল হয়েছে বলে ওহি অবতীর্ণ হয়। নবিজি তখন উম্মু সালামার ঘরে অবস্থান করছিলেন। ওহির কথা উম্মু সালামা তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উদ্বেলিত কণ্ঠে বলেন, 'হে আবু লুবাবা, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন।' ঘোষণা শেষ হতেই উপস্থিত লোকজন দৌড়ে আসে তার বাঁধন খুলে দিতে। কিন্তু তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি চাই না, নবিজি ছাড়া অন্য কেউ আমার বাঁধন খুলে দিক।' পরে ফজরের সালাতে যাওয়ার সময় নবিজি নিজ হাতে তার বাঁধন খুলে দেন।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে। টানা ২৫ দিন অবরোধ অব্যাহত থাকে।[৩]

আল্লাহ খন্দক ও বনু কুরাইজার যুদ্ধ সম্পর্কে সুরা আহযাবের বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। সেখানে উভয় যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি, মুসলিমদের অবস্থান, মুনাফিকদের বেইমানি, সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হওয়া এবং ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তার ফলাফল সবিস্তারে তুলে ধরেন।

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮০৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৬৬; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৮৪৮

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৮৪৯; *মুসনাদুল বাযযার* : ৭২৫৪; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৮; আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৩-২৩৭; *সহিহুল বুখারি* : ৪১২২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭২-৭৪; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৮৭-২৯০

বনু কুরাইজা যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ

নবিজির নির্দেশে আবু রাফির হত্যাকাণ্ড

সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইক ওরফে আবু রাফি একজন কট্টর ইহুদি। সেইসাথে চরম ইসলাম-বিদ্বেষীও বটে। তার অপরাধের কোনো সীমা ছিল না। সে ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে মুসলিম-বিরোধী চক্রকে সাহায্য করত। যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহ করত তাদের।[১] শুধু তা-ই নয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পর্যন্ত কষ্ট দিত সে।

বনু কুরাইজার মামলা নিষ্পত্তির পর খাযরাজ গোত্র নবিজির কাছে আবু রাফিকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করে। এর আগে তার বন্ধু কাব ইবনু আশরাফ আউস গোত্রের হাতে নিহত হয়েছে। সেই থেকে খাযরাজের লোকেরাও এমন একটি মর্যাদা নিজেদের করে নিতে আগ্রহী। এজন্য তারা আবু রাফির অপরাধের চরিত্র বিচার করে সবার আগেই নবিজির কাছে তাকে হত্যার অনুমতি চায়। নবিজি অনুমতি দেন। তবে এই বলে সতর্ক করেন যে, কোনোভাবেই নিরপরাধ নারী ও শিশুকে হত্যা করা যাবে না। অনুমতি পেয়ে ৫ সদস্যের ছোট্ট একটি দল প্রস্তুত হয়ে যায়। সবাই খাযরাজের শাখাগোত্র বনু সালামার। তাদের দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবনু আতিক।

আবু রাফি তখন খাইবারে তার একটি দুর্গে অবস্থান করছিল। তাই আব্দুল্লাহ ইবনু আতিক তার সহযোগীদের নিয়ে খাইবার[২] অভিমুখে রওনা করেন। তারা যখন দুর্গের

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪৩

[২] খাইবার হলো মদিনা শহরের ১৫৩ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি শহর। সপ্তম হিজরিতে মুসলিমরা ইহুদিদের থেকে খাইবার জয় করে।

কাছাকাছি পৌঁছান, তখন সন্ধ্যা ছুঁইছুঁই। সূর্য ডুবে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। রাখালেরা গবাদি পশু নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আতিক সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা এখানে বসো। আমি যাচ্ছি। ফটকের প্রহরীর সাথে কথাবার্তা বলে ভেতরে যাওয়ার পথ পাওয়া যায় কি না দেখি। আশা করছি, কোনো না কোনো উপায় খুঁজে পাবই।'

এ কথা বলে তিনি ফটকের কাছাকাছি আসেন। কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত করে এক জায়গায় চুপটি করে বসে পড়েন। দেখে মনে হয়, তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। এদিকে দুর্গের ফটক বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। রাখালেরা ইতোমধ্যেই পশুগুলোকে যথাস্থানে বেঁধে ভেতরে চলে গেছে। এমন সময় বাইরে একজনকে প্রাকৃতিক কাজ সারতে দেখে প্রহরী শশব্যস্ত হয়ে হাঁক ছাড়ে, 'এই যে আল্লাহর বান্দা! ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে জলদি করো। নইলে এখনই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।' আব্দুল্লাহ ইবনু আতিক বলেন, 'আমি ভেতরে প্রবেশ করে এক জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকি। প্রহরী দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়। চাবিগুলো একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে সে চলে যায় অন্য কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যে এক-এক করে অন্যরাও চলে যায় নিজ নিজ অবস্থানে। আমি তখন খানিকটা নিরাপদ বোধ করি। সেইসাথে এটাও বুঝতে পারি যে, আবু রাফি ওপর তলায় জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। তার মদ-মত্ত উল্লাস নিচতলা থেকেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাদে আড্ডা শেষ হয়। দুর্গজুড়ে নেমে আসে মরুভূমির নীরবতা। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নিশাচর পাখিগুলোর ডানা ঝাপটানোও থেমে গেছে ততক্ষণে। আমি সেই নীরব নিস্তব্ধ সময়ে আরও নীরবে চাবিগুচ্ছ হাতে নিয়ে ফটকের দরজা খুলি। এরপর ধীর পায়ে উঠে যাই ওপর তলায়। আমি এক-একটি দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করছিলাম এবং এই ভেবে ভেতর থেকে সেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম, যেন রক্ষী বা চাকর-বাকরদের কেউ দেখে ফেললেও আবু রাফিকে হত্যা করার আগপর্যন্ত আমাকে ছুঁতে না পারে।

এভাবে একসময় আমি তার কাছাকাছি পৌঁছে যাই। সে তখন পরিবারের সাথে নিজ কামরায় বিশ্রাম করছিল। আমি তার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু তরবারি চালানোর জন্য সুনির্দিষ্ট করে তার অবস্থান শনাক্ত করতে পারছিলাম না। এজন্য আমি বুদ্ধি করে আওয়াজ দিই, 'আবু রাফি!' সে বলে উঠল, 'কে ওখানে!' আমি আওয়াজের উৎস লক্ষ্য করে তরবারি চালাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সেই আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কারণ আর কিছুই না, উত্তেজনায় আমার মানসিক ভারসাম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া অবচেতন ত্বরাপ্রবণতাও বড় একটি কারণ।

আমার আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই সে চিৎকার করে ওঠে। আমি কামরা থেকে বের হয়ে যাই। কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। আবু রাফির শঙ্কাভাব কিছুটা কমে এলে

আমি ভেতরে প্রবেশ করি। এবার কণ্ঠে কিছুটা পরিবর্তন এনে শশব্যস্ত এক ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আবু রাফি, কীসের আওয়াজ হলো ভেতরে?' সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'তোমার মা ধ্বংস হোক। একটু আগে তরবারি দিয়ে কে যেন আঘাত করেছে আমাকে।' সে উত্তর দিতেই আমি আওয়াজের উৎস লক্ষ্য করে দ্বিতীয়বার তরবারি চালাই। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। শব্দ শুনে খুব সহজেই আমি তার অবস্থান শনাক্ত করে ফেলি এবং তরবারির অগ্রভাগ তার বুকে ঠেকিয়ে জোরে চাপ দিই। মুহূর্তে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় সে।

তার মৃত্যু নিশ্চিত করে আমি সেখান থেকে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এক-একটি দরজা খুলে খুব সাবধানে বের হতে থাকি। সবগুলো দরজা নিরাপদেই পার হই। সিঁড়ির দিকটাতে কিছুটা অন্ধকার তখনো জটলা বেঁধে ছিল। আমি সমতল জায়গা মনে করে সেভাবেই পা ফেলি। কিন্তু সামনে হঠাৎ সিঁড়ি পড়ায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। এতে আমার পা মচকে যায়। আমি পাগড়ি দিয়ে শক্ত করে পা বাঁধি। এরপর কোনোরকমে ফটক পার হই। বাইরে এসে দেখি চারদিকে চাঁদের আলো খেলা করছে। আমি চুপিসারে একপাশে গিয়ে বসে পড়ি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, হত্যার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে এখান থেকে সরব না। খানিক বাদে মোরগ ডাকে। নতুন দিনের সূচনা হয়। অমনি এক ঘোষকের কণ্ঠে বেজে ওঠে এক মৃত্যুসংবাদ—হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফি নিহত হয়েছে।

ঘোষণা শেষ হতেই আমি দ্রুত পায়ে সাথিদের কাছে ছুটে আসি। তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলি, 'দুরাচারীটার হাত থেকে এবার রক্ষা পাওয়া গেছে। আল্লাহ তাকে মৃত্যুর ঘাট পার করে দিয়েছেন।' এটুকু বলেই আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করি। সোজা চলে আসি নবিজির কাছে। তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলি। তিনি বলেন, 'তোমার পা-টা মেলে দাও।' আমি পা মেলে দিই। তিনি সেখানে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেন। সঙ্গো সঙ্গো আমার সব ব্যথা দূর হয়ে যায়। মনে হয়, আমি যেন কোনোদিন পায়ে কোনো ব্যথাই পাইনি।'[১]

এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারির। অপরদিকে ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, 'পাঁচ সদস্যের সবাই আবু রাফির ঘরে প্রবেশ করেছে এবং তার হত্যাকাণ্ডে সমান ভূমিকা রেখেছে। তবে তরবারির আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস।' এ বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে—'আবু রাফিকে হত্যা করে ফেরার সময় আব্দুল্লাহ ইবনু আতিকের পায়ের গোড়ালি মচকে যায়। সঙ্গীরা তাকে ধরাধরি করে একটি ঝরনার পাশে নিয়ে আসে। ততক্ষণে আবু রাফির মৃত্যুসংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদিরা আলো জ্বেলে খুঁজতে থাকে হত্যাকারীদের। কিন্তু কাউকে না পেয়ে হতাশ মনে ফিরে যায় তাদের নিহত গোত্রপতির কাছে। ওদিকে সাহাবিরাও তাদের দলনেতাকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৩৯

আসেন নবিজির কাছে।[১]

এই ক্ষুদ্র দলটি পাঠানো হয়েছিল পঞ্চম হিজরির জিলকদ বা জিলহজ্জ মাসে।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক, বনু কুরাইজা যুদ্ধ ও তাদের যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার পর আরবের উচ্ছৃঙ্খল বেদুইন ও অপরাপর গোত্রগুলোকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ তালিকায় সবার আগে রাখা হয় তাদেরকে, যারা এতদিন ধরে মদিনার শান্তি ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করে আসছিল এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া যাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ জেগে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না।

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার অভিযান

আবু রাফির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার নেতৃত্বে কারতায় একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। জায়গাটি নাজদের বাকারাত অঞ্চলের যারিয়ার পাশে অবস্থিত। যারিয়া ও মদিনার মাঝখানে সাত রাতের দূরত্ব। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ষষ্ঠ হিজরির ১০ মুহাররম বনু বকর ইবনি কিলাবের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মোট ৩০ জন অশ্বারোহী অংশ নেন এ অভিযানে। বনু বকর মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েই লোকালয় ছেড়ে চলে যায়। তাদের ঘরবাড়ি ও আস্তাবলগুলো পড়ে থাকে অরক্ষিত। ফলে বিনাযুদ্ধেই মুসলিমদের হস্তগত হয় প্রচুর পরিমাণ উট, বকরি ও অন্যান্য গবাদি পশু।

মুহাররমের একদিন বাকি থাকতে তারা মদিনায় ফিরে আসেন। সাথে বিপুল পরিমাণ গনিমত আর এক যুদ্ধবন্দি। তার নাম সুমামা ইবনু উসাল হানাফি। সে মুসাইলামাতুল কাযযাবের নির্দেশে ছদ্মবেশে নবিজিকে হত্যা করতে এসেছিল।[৩] পথিমধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। মাসজিদে নববির একটি খুঁটিতে শক্ত করে বাঁধা হয় তাকে। নবিজি কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'সুমামা, তোমার কাছে কী আছে?' সে বলে, 'আমার কাছে প্রভূত কল্যাণ আছে। আপনি আমাকে হত্যা করলে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন। আবার যদি দয়াপরবশ হয়ে মুক্ত করে দেন, তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই দয়া দেখাবেন। আপনার সম্পদের চাহিদা থাকলে বলুন, যা চাইবেন তা-ই দেব!' নবিজি কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পরে গিয়ে আবারও একই প্রশ্ন করেন। সুমামাও একই উত্তর

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৪-২৭৫

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৩; এবং বনু কুরাইজা ও খন্দক যুদ্ধে উল্লেখিত বিভিন্ন উৎস থেকে এই ঘটনা নেওয়া হয়েছে।

[৩] *আস-সিরাতুল হালাবিইয়া*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৭

দেয়। নবিজি এবারও কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পরে আবার যান তার কাছে। এবারও আগের মতো প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। নবিজি খানিকক্ষণ ভেবে উপস্থিত সাহাবিদের বলেন, 'সুমামাকে তোমরা মুক্ত করে দাও।'

সুমামা এখন স্বাধীন। তার হাত বাঁধনমুক্ত। প্রশ্নোত্তরের লম্বা সময়টায় সে নবিজির আচরণ, মানুষের ছড়ানো গুজব ও তার নিজের অবস্থান নিয়ে বিস্তর ভেবেছে। তার আগের ও পরের ভাবনার মধ্যে এখন আসমান-জমিনের ফারাক। তাই তো বাড়ির পথ না ধরে সে মাসজিদে নববির পার্শ্ববর্তী খেজুর বাগানের দিকে পা বাড়ায়। ছায়াঢাকা কোমল পরিবেশ সেখানে। মাঝখানে একটি মিষ্টি পানির নহর। সেখানে নেমে সে গোসল করে। ঘষেমেজে পবিত্র করে নিজেকে। এরপর নবিজির কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলামগ্রহণের পর তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, এই একটু আগেও আপনি ছিলেন আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। আর এখন, এই মুহূর্তে আপনার চেয়ে প্রিয় কেউ নেই আমার এই পৃথিবীতে। আল্লাহর কসম, একটু আগেও আপনার ধর্ম ছিল আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বস্তু। আর এখন তার চেয়ে ভক্তির ধন দ্বিতীয়টি নেই আমার দৃষ্টিতে। আমি উমরা করতে যাচ্ছিলাম। মাঝপথ থেকে আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে তুলে এনেছে।' তার ইসলামগ্রহণে নবিজি খুবই আনন্দিত হন। তাকে এর শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেন এবং উমরা পালন করতে বলেন।

অনুমতি পেয়ে সুমামা মক্কার পথে পা বাড়ান। কাবায় পৌঁছে উমরা করেন। উমরা তিনি আগেও করেছেন। তবে এবারের উমরায় তার আত্মনিবেদন অন্যরকম। সবকিছুতেই সমূহ পরিবর্তন দৃশ্যমান। এ পরিবর্তন চোখ এড়ায় না কুরাইশদের। তারা কোনোরকম রাখঢাক ছাড়াই বলে, 'সুমামা, তুমি তো দেখি বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ।' তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! মোটেও না। আমি তো বরং নতুন করে ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি। মুহাম্মাদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! নবিজির অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা থেকে একটি যবের দানাও তোমাদের কাছে আসবে না আগামীতে।' ইয়ামামা ছিল মক্কাবাসীর শস্যভূমি। সেখান থেকে তাদের সারা বছরের খাদ্যশস্য সরবরাহ হতো।

উমরা শেষ করে সুমামা তার দেশে ফিরে যান এবং যথারীতি মক্কায় খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এতে মক্কাবাসী তাদের দুয়ারে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পায়। কষ্টেসৃষ্টে কোনোরকম দিন গুজরান করে তারা। সুমামা ছিলেন ইয়ামামার মান্যবর নেতাদের একজন। তার আদেশ উপেক্ষা করার সাধ বা সাধ্য কোনোটাই ছিল না কারও। সেজন্য কুরাইশরা বাধ্য হয়ে নবিজির কাছে পত্র লেখে। আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাকে অনুরোধ করে, তিনি যেন দূত বা পত্র মারফত সুমামাকে মক্কায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে বলেন। নবিজি তাদের অনুরোধ রাখেন এবং সুমামাকে তার স্বেচ্ছা-আরোপিত

বয়কট তুলে নিতে বলেন।[১]

বনু লিহইয়ানের যুদ্ধ

বনু লিহইয়ান[২] ছিল বিশ্বাসঘাতক এক গোত্র। রাজির ঘটনায় তারা ১০ জন সাহাবিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু সে সময় তাদের থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়নি—যেহেতু তাদের দেশ তখন হিজাযের অভ্যন্তরে মক্কার সীমানার ভেতর। তাছাড়া কুরাইশ ও বেদুইনদের সাথে সম্পর্কের সবচেয়ে খারাপ সময় যাচ্ছিল মুসলিমদের। এহেন সংকটময় মুহূর্তে প্রতিবেশীদের ওপর আক্রমণ করা এবং পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলা সমীচীন মনে হয়নি নবিজির কাছে। তাই তিনি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করেন।

কিছুদিন যেতে না যেতেই তার এই অপেক্ষার ফল ফলতে থাকে। মুশরিকরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। এতে মনোবল ভেঙে পড়ে তাদের। শক্তিও খর্ব হয়ে যায় অনেকটা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্ঝঞ্ঝাট সময়টাকে বেছে নেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য।

সে লক্ষ্যে ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আউয়াল বা জুমাদাল উলা মাসে ২০০ জন সাহাবি নিয়ে তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। তবে ঠিক কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন, সেটা গোপন রাখেন সবার থেকে। সৈন্যদের কেবল এতটুকু আভাস দেন যে, তিনি শামের দিকে যেতে চাইছেন। এ যাত্রায় আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমকে মদিনার ভারপ্রাপ্ত শাসক মনোনীত করা হয়।

কাফেলা দ্রুত পথ চলতে থাকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা পৌঁছে যান আমাজ ও উসফানের মধ্যবর্তী উপত্যকা 'বাতনে গুরানে'। এখানেই বনু লিহইয়ানের লোকেরা সাহাবিদের হত্যা করেছিল। নবিজি নিহতদের জন্য রহমতের দুআ করেন। এরই মধ্যে মুসলিমদের আগমন-সংবাদ পৌঁছে যায় বনু লিহইয়ানের কানে। তারা কালক্ষেপণ না করে সঙ্গো সঙ্গো পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয় পাহাড়ের চূড়ায়। নবিজি তাদের জনপদে দুদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে সৈন্যদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। কিন্তু কারও ছায়াটিও দেখা যায় না। সেখানে দুদিন অবস্থানের পর তিনি উসফান অভিমুখে রওনা করেন। সেখানে পৌঁছে ১০ জন সাহাবিকে প্রেরণ করেন কুরাউল গামিমে[৩]—যেন কুরাইশদের কানে মুসলিম বাহিনীর আগমন-সংবাদ পৌঁছে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৯; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৯২ ও ২৯৩

[২] আরবের এক পৌত্তলিক উপজাতি। আদনানিদের সাথে সম্পৃক্ত।

[৩] হিজাযের একটি অঞ্চল। মক্কা মুকাররমা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

এবং তারা আরও একটি স্নায়ুযুদ্ধে পরাস্ত হয়। কুরাউল গামিমেই নবিজি অভিযান শেষ করেন। এরপর সোজা ফিরে আসেন মদিনায়। এ যাত্রায় তিনি মোট ১৪ রাত মদিনার বাইরে অবস্থান করেন।

নবিজির অবিরাম অভিযান

মদিনায় ফিরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। এখানে সংক্ষেপে তার বিবরণ তুলে ধরা হলো—

গামর অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আউয়াল বা রবিউল আখির মাসে উক্কাশা ইবনু মিহসান ৪০ জন সেনা নিয়ে গামর অভিযানে বের হন। গামর বনু আসাদের একটি কূপের নাম। তার আগমন-সংবাদ পেয়ে স্থানীয়রা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। গনিমত হিসেবে ২০০টি উট মুসলিমদের দখলে চলে আসে। তারা সেগুলো নিয়ে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন।

যুল কিসসা অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আউয়াল বা রবিউল আখির মাসে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার নেতৃত্বে ১০ সদস্যের ছোট্ট একটি দল যুল কিসসা অভিযানে বের হন। যুল কিসসা মূলত বনু সালাবার একটি আবাসিক এলাকা। মুসলিম সৈন্যরা সেখানে পৌঁছলে, স্থানীয় শতাধিক শত্রু তাদের ভয়ে আত্মগোপন করে। মুজাহিদগণ তাদের অপেক্ষায় সেখানেই রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তই কাল হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য। রাতে তারা ঘুমিয়ে পড়লে শত্রুপক্ষ অতর্কিত হামলা চালায়। এতে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ছাড়া বাকি সবাই শাহাদাত-বরণ করেন। তিনি মারাত্মক আহত হন এবং কোনো রকমে সেখান থেকে সরে আসতে সক্ষম হন।

যুল কিসসায় পালটা আক্রমণ

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার সহযোদ্ধারা নিহত হওয়ার পরপরই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাকে যুল কিসসা আক্রমণের দায়িত্ব দেন। এবার তার সাথে সৈন্য দেওয়া হয় ৪০ জন। সবাই ছিলেন পদাতিক। তারা রাতে পথ চলতেন এবং দিনে বিশ্রাম নিতেন। একদিন ভোর-বিহানে তারা বনু সালাবায় পৌঁছে যান। তাদের অতর্কিত আক্রমণে রণে ভঙ্গ দেয় স্থানীয়রা। আশ্রয় নেয় বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের চূড়ায়। পিছু ধাওয়া করে তারা একজনকে বন্দি করতে পারেন। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ উট, বকরি ও গবাদি পশু মুসলিমদের অধীনে চলে আসে।

জামুম অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রবিউল আখির মাসে যাইদ ইবনুল হারিসাকে জামুম অভিযানে পাঠানো হয়। জামুম হচ্ছে মাররুজ জাহরানে অবস্থিত বনু সুলাইমের একটি ঝরনা। পথিমধ্যে মুযাইনা গোত্রের হালিমা নামের এক নারী মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। অভিজ্ঞ সেনাপতি তাকে পথপ্রদর্শনের কাজে ব্যবহার করেন। সে পথ দেখিয়ে দিলে মুজাহিদগণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যান। এতে শত্রুপক্ষের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো সহজ হয় তাদের পক্ষে। এ অভিযানে প্রচুর বন্দি, উট, বকরি ও অন্যান্য গবাদি পশু হস্তগত হয় তাদের। যাইদ সেসব নিয়ে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন। নবিজি পথদেখানো সেই নারীকে মুক্ত করে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

ঈস অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল উলা মাসে পরিচালিত এ অভিযানটিতেও যাইদ ইবনুল হারিসা নেতৃত্ব দেন। এ যাত্রায় তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৭০। প্রত্যেকেই অশ্বারোহী। তারা কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মালামাল জব্দ করেন। কাফেলাটির আমির ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা আবুল আস। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। কাফেলা আক্রান্ত হলে তিনি মদিনায় এসে স্ত্রী যাইনাবের কাছে আশ্রয় নেন এবং তার মাধ্যমে নবিজির কাছে জব্দকৃত পণ্যসামগ্রী ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান। নবিজি তার আবেদনে সাড়া দেন। সবাইকে খুশিমনে তাদের যাবতীয় মালামাল ফেরত দিতে বলেন। সবাই তা-ই করেন। কমবেশি, ছোটবড়—যার কাছে যা ছিল, সবাই ফেরত দিয়ে দেন। আবুল আস সব নিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসেন। প্রত্যেকের আমানত তার হাতে পৌঁছে দেন। সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হন। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় ফিরে আসেন।

তিনি মদিনায় এলে নবিজি প্রথম বিবাহের ভিত্তিতে প্রিয় কন্যা যাইনাবকে পুনরায় তার কাছে ফিরিয়ে দেন। তাদের এই পুনর্মিলন হয় ৩ বছর কিংবা তারও অনেক পরে। সহিহ হাদিসে প্রথম বিবাহের ভিত্তিতে ফিরিয়ে দেওয়ার কথাই বর্ণিত হয়েছে।[১] কারণ কাফিরদের জন্য মুসলিম নারী বিবাহ করা হারাম হওয়ার আয়াত তখনো অবতীর্ণ হয়নি। যেসব হাদিসে এ কথার উল্লেখ আছে, নতুন বিবাহের মাধ্যমে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিংবা ৬ বছর পর ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তা অর্থগত দিক দিয়ে বিশুদ্ধ নয়। তাছাড়া সেসব হাদিসের সনদ ও বর্ণনাসূত্রও সঠিক নয়।[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২২৪০, হাদিসটি সহিহ; আরও দেখুন, *আউনুল মাবুদ শারহু সুনানি আবি দাউদ*, অধ্যায় : ইলা মাতা তারুদ্দু আলাইহি ইমরাআতুহু ইযা আসলামা বা'দাহা।

[২] উভয় প্রকারের হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা জানতে দেখুন, *তুহফাতুল আহওয়াযি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৫ ও ১৯৬

তারপরও যারা দুর্বল হাদিসের আশ্রয় নিয়ে এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের কার্যকলাপ দেখে অবাক হতে হয়। কারণ একদিকে তারা বলেন, 'আবুল আস অষ্টম হিজরির শেষ দিকে মক্কাবিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার আরেক দিকে বলেন, যাইনাব অষ্টম হিজরির শুরুর দিকে মৃত্যুবরণ করেন।' এ বিষয়ে *বুলুগুল মারাম* গ্রন্থের টীকায় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসা ইবনু উকবা মনে করেন, আবুল আসের বাণিজ্যিক মালামাল জব্দ করার ঘটনা সপ্তম হিজরিতে আবু বাসির ও তার সঙ্গীসাথিদের মাধ্যমে ঘটেছিল। কিন্তু তার এই অভিমত সঠিক নয়। কারণ তার এ মতের সমর্থনে বিশুদ্ধ কিংবা দুর্বল কোনো ধরনের হাদিসই পাওয়া যায় না।

তরফ বা তরক অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসে পরিচালিত এ অভিযানেও নেতৃত্ব দেন যাইদ ইবনুল হারিসা। এবার তিনি ১৫ জন সৈন্য নিয়ে বনু সালাবার বেদুইনপল্লি অভিমুখে রওনা করেন। সংবাদ পেয়ে তারা আগেই সরে পড়ে। বিনাযুদ্ধে ২০টি উট মুসলিম বাহিনীর হাতে চলে আসে। তারা ৪ রাত সেখানে অবস্থান করে মদিনায় ফিরে যান।

ওয়াদিল কুরা অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রজব মাসে যাইদ ইবনুল হারিসা ১২ জন সৈন্য নিয়ে ওয়াদিল কুরা অভিযানে বের হন। তাদের এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু ওয়াদিল কুরার লোকেরা এক অতর্কিত হামলায় তাদের ৯ জনকে হত্যা করে ফেলে। বাকিরা মারাত্মকভাবে আহত হন। তাদের একজন ছিলেন যাইদ ইবনুল হারিসা।[১]

খাবত অভিযান

বলা হয়ে থাকে, এ অভিযানটি অষ্টম হিজরির রজব মাসে পরিচালনা করা হয়। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা বিচার করলে বোঝা যায়, অভিযানটি হুদাইবিয়ার আগে পাঠানো হয়। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররার নেতৃত্বে আমাদের ৩০০ যোদ্ধার এক অশ্বারোহী বাহিনী পাঠান। এ অভিযানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা অনুসন্ধান করা। মরুপথে চলতে চলতে আমাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা পায়। ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু না পেয়ে গাছের পাতা, বাকল ও লতাপাতা খেতে শুরু করি। সেই থেকে

---

[১] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২০-১২২; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসারের* টীকা, পৃষ্ঠা : ২৮, ২৯

আমাদের বাহিনীর নাম হয়ে যায় খাবত বাহিনী।

সে সময় আমরা এমনই সংকটে পড়ি যে, আমাদের একজন প্রথমে ৩টি উট জবাই করেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি হয় না। পরে তিনি আরও ৩টি উট জবাই করেন। এ সময়ের ভেতরও কোনো খাদ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে আরও ৩টি উট জবাই করতে হয় তাকে। আবু উবাইদা শুরু থেকে বিষয়টা লক্ষ করছিলেন। এবার তিনি উট জবাই করতে নিষেধ করে দিলেন সবাইকে। কারণ এভাবে চলতে থাকলে, বাহন ও খাবারহীন মরুসফরে মৃত্যুই হবে তাদের শেষ সঙ্গী। আল্লাহর কী রহমত! আবু উবাইদা নিষেধাজ্ঞা জারি করতেই সমুদ্রতীরে বিশাল এক আম্বর মাছ ভেসে আসে। ১৫ দিন পর্যন্ত আমরা সে মাছ আহার করি এবং এর তেল ব্যবহার করতে থাকি। ১৫ দিন পর দেখা যায় আমাদের স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ঢের বেড়েছে। দূর হয়ে গেছে সফরের ক্লান্তিও।

আবু উবাইদা ওই মাছের বুকের খাঁচার একটি কাঁটা উঁচু করে ধরেন। এরপর সবচেয়ে দীর্ঘদেহী সৈন্যটিকে সবচেয়ে বড় উট নিয়ে সামনে হাজির হতে বলেন। সৈন্যটি বিশাল এক উট নিয়ে এগিয়ে আসেন। তারপর আবু উবাইদা তাকে সেই উটের পিঠে চড়ে মাছের কাঁটার নিচ দিয়ে যেতে বলেন। মাছটির কাঁটাটি এতটাই বিশাল ছিল যে, লোকটি অনায়াসেই কাঁটার নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আমরা এই মাছের কিছু অংশ সঙ্গে করে নিয়ে আসি। মদিনায় পৌঁছে আমরা সবার আগে নবিজির কাছে যাই। পুরো ঘটনা সবিস্তারে জানাই তাকে। তিনি সব শুনে বলেন, 'এটা ছিল তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ রিজিক। তোমাদের কাছে কি এর কোনো অংশ আছে? থাকলে আমাদেরকেও কিছু খেতে দিয়ো।' আমরা তখন নবিজির জন্য কিছু অংশ পাঠিয়ে দিই।[১]

এ অভিযানের সময়কাল সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা বলেছি, ঘটনার পূর্বাপর ও ইতিহাস পরিক্রমা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল হুদাইবিয়ার আগে। কারণ হুদাইবিয়ার[২] সন্ধির পর মুসলিমরা কোনো কুরাইশ কাফেলার পিছু নেয়নি।

বনুল মুস্তালিকের[৩] যুদ্ধ

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুদ্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও মুসলিম সমাজ ও

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৩৬২, ৫৪৯৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৯৩৫

[২] মক্কা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। হুদাইবিয়া মূলত একটি কূপের নাম। এই নামে স্থানের নামকরণ হয়েছে।

[৩] মক্কা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খুযাআ গোত্রের একটি শাখার নাম।

সভ্যতায় এর গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল অপরিসীম। কারণ এ যুদ্ধে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যেগুলো মুসলিমদের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়। সেইসাথে মুনাফিকদের ওপর থেকে সরিয়ে দেয় মিথ্যার আবরণ। তাছাড়া এ সময় ইসলামি শরিয়ার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাস্তির বিধানও অবতীর্ণ হয়, যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ইসলামি সমাজ সম্মান ও আদর্শ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে এক উচ্চ আসনে আসীন হয়। আমরা এখানে প্রথমে যুদ্ধ-সম্পর্কিত নানা বিষয় তুলে ধরব। তারপর প্রবেশ করব যুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলির গভীরে।

বিশুদ্ধ মতানুসারে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয় ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে।[১] এ যুদ্ধের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, নবিজির কাছে একবার সংবাদ পৌঁছে, বনুল মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবনু আবি জিরার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার সমমনা অন্যান্য আরব গোত্রও যোগ দিচ্ছে তার সাথে। সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে নবিজি তখনই বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আসলামিকে পাঠিয়ে দেন। তিনি এসে সংবাদ যাচাই করেন। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন বেশ ভালোভাবে। সাক্ষাতে কথাও বলেন বনুল মুস্তালিকের গোত্রপতি হারিসের সাথে। আলোচনা শেষ করে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন এবং নবিজির সামনে সবিস্তারে তুলে ধরেন তার পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কথা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগত এ সংবাদ সত্য বলে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বনুল মুস্তালিক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। সে মতে শাবানের ২ তারিখ সাহাবিদের নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যাত্রায় মুনাফিকদের একটি দলও অংশ নেয়। যদিও এর আগে কোনো যুদ্ধে তাদেরকে অংশ নিতে দেখা যায়নি। এবার মদিনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় যাইদ ইবনুল হারিসাকে। কেউ কেউ অবশ্য সে সময়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আবু যর এবং নুমাইলা ইবনু আব্দিল্লাহ আল-লাইসির নামও উল্লেখ করেছেন।

---

[১] ইমাম বুখারি বলেন, 'এই যুদ্ধের অপর নাম মুরাইসির যুদ্ধ।' তিনি নুমান ইবনু রাশিদের সূত্রে যুহরি থেকে বর্ণনা করেন, 'এ যুদ্ধেই ইফকের ঘটনা অর্থাৎ আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ঘটেছিল।' ইমাম ওয়াকিদি রাহিমাহুল্লাহ এই যুদ্ধের সময়কাল উল্লেখ করেছেন ৫ম হিজরির শাবান মাসে।

সিরাহ-বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে। শাইখ সফিউর রহমান মুবারাকপুরি রাহিমাহুল্লাহ ইবনু ইসহাকের মতটি গ্রহণ করেছেন। কারণ ইফকের ঘটনাটি ঘটেছে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে। আর পর্দার বিধানটি নাযিল হয়েছে যাইনাব বিনতু জাহশ রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবিজির বিয়ের সময়। অর্থাৎ ৫ম হিজরির জিলকদ মাসে। তাই [illegible] মতটিকেই প্রধান্য দিয়েছেন। অপরদিকে বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধ হয়েছে শাবান মাসে, যা ৫ম হিজরির শাবান মাসে সংঘটিত হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্রষ্টব্য : *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১৫; *আসসিরাতুন নববিইয়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৭; দারুল মাআরিফা। *মাগাযিল ওয়াকিদি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৪; দারুল আলামি, বৈরুত, ১৯৮৯ ঈসায়ি

এদিকে হারিস ইবনু আবি জিরার মুসলিম বাহিনীর খবরাখবর সরবরাহ করতে একজন গুপ্তচর নিযুক্ত করে। ঘটনাক্রমে সেই গুপ্তচর মুসলিমদের হাতে ধরা পড়ে এবং গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়। হারিস ও তার দোসররা যখন জানতে পারে, এ যুদ্ধে স্বয়ং নবিজি অংশ নিয়েছেন এবং ইতোমধ্যেই তার গুপ্তচর নিহত হয়েছে, তখন আশপাশের লোকজন তো বটেই, সে নিজেও ঘাবড়ে যায়। ভয়ে নীল হয়ে যায় তাদের চেহারা। প্রতিবেশী যেসকল গোত্র তার সাথে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারাও সটকে পড়ে আলগোছে। হারিস পড়ে যায় মহাবিপদে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুরাইসিতে পৌঁছে যাত্রাবিরতি দেন। মুরাইসি হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল কাদিদের[১] একটি জলাশয়। সংবাদ পেয়ে বনুল মুস্তালিকের যোদ্ধারা রণসাজে সেখানে উপস্থিত হয়। নবিজি সাহাবিদের সারিবন্ধ করেন। মুহাজির ও আনসারদের পতাকা দেন যথাক্রমে আবু বকর সিদ্দিক ও সাদ ইবনু উবাদার হাতে। এরপর শুরু হয় যুদ্ধ। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথমে কিছুক্ষণ তির-বিনিময় হয়। তারপর নবিজির নির্দেশে মুজাহিদরা শত্রুপক্ষের ওপর একযোগে আক্রমণ চালান এবং খুব সহজেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। মুশরিকরা সেদিন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের কিছু সৈন্য নিহত হয়। বাকিদের বন্দি করা হয় নারী ও শিশুদের সাথে। এ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ উট ও বকরি মুসলিমদের দখলে চলে আসে। বিপরীতে মাত্র একজন মুজাহিদ শহিদ হন—তাও এক আনসার সাহাবি তাকে শত্রু মনে করে ভুলবশত হত্যা করে ফেলেন।

সিরাত ও মাগাযি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত এমনই। তবে ইবনুল কাইয়িম বলেন, এটা তাদের ভুল ধারণা। মুসলিম ও বনুল মুস্তালিকের মধ্যে সে সময় কোনো যুদ্ধই হয়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলাশয়ের পাশে তাদের ওপর চড়াও হলে, যুদ্ধক্ষম পুরুষেরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। থেকে যায় কেবল নারী, শিশু আর গবাদি পশু। মুসলিমরা সেগুলো জব্দ করে সঙ্গে নিয়ে আসেন। বুখারির বর্ণনা থেকেও এমনটিই বোঝা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, নবিজি বনুল মুস্তালিকের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করলে তারা দিশেহারা হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। এরপর ইবনুল কাইয়িম পুরো হাদিসটি উল্লেখ করেন।[২]

বন্দি নারীদের মধ্যে বনুল মুস্তালিকের সর্দার-কন্যা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। গনিমত বণ্টনের সময় সাবিত ইবনু কাইসের ভাগে পড়েন তিনি। জুয়াইরিয়া মুক্ত হওয়ার জন্য টাকার বিনিময়ে তার সাথে চুক্তি করেন। নবিজি তার সে টাকা পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করেন। পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নবিজির সাথে। এভাবে বন্দি সম্প্রদায়ের সাথে

---

[১] কাদিদ মক্কা শহরের একটি উপত্যকা।

[২] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল ইতক : ২৫৪১; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৩০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৪১

নবিজির নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিমরা তাদের হাতে সদ্য বন্দি হওয়া বনুল মুস্তালিকের ১০০টি পরিবার আজাদ করে দেন এবং বলেন, নবিজির শ্বশুরবাড়ির লোকদের আমরা গোলাম করে রাখতে পারি না। তাদের এই মহানুভবতা বিফলে যায়নি। পরে বনুল মুস্তালিকের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের বিবরণ এতটুকুই। তবে এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার দোসররা বেশ কিছু ঘটনার জন্ম দেয়। আমরা সেসবের বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার আগে মুসলিম সমাজে তাদের ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

ইসলামের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের কার্যকলাপ

আমাদের পূর্বের আলোচনায় আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষের প্রসঙ্গটি বহুবার উঠে এসেছে। সেইসাথে এটাও স্পষ্ট হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল মদিনার আর সবার চেয়ে ঢের বেশি। কারণ আউস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তারা যখন এই ভবিতব্য নেতার মাথায় মুকুট পরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখনই নবিজি ইসলামের বার্তা নিয়ে মদিনায় আগমন করেন। এতে সবাই ভীষণ প্রভাবিত হয়। ইসলামও গ্রহণ করে নেয় তাদের অনেকে। ফলে মুকুট আর পরানো হয় না তার মাথায়। এজন্য সে নবিজিকে দায়ী করত। তার দৃষ্টিতে নবিজিই তার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন।

এ কারণে ইসলামের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের পূর্বে তো বটেই, পরেও নবিজির প্রতি প্রকাশ পেত তার সীমাহীন বিদ্বেষ। একদিন হয়েছে কি, নবিজি গাধায় চড়ে সাদ ইবনু উবাদাকে দেখতে যাচ্ছিলেন। পথে একটি সভা চলছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইও সেখানে ছিল। নবিজিকে দেখে সে নাক চেপে বলে, 'এভাবে আমাদের কাছে এসে ধুলোবালি ওড়াবেন না।' এ সময় নবিজি কুরআন তিলাওয়াত করতে গেলে সে বলে, 'আপনার ঘরে বসে থাকাই ভালো। এভাবে আমাদের সভা-সমাবেশে এসে বিরক্ত করা ঠিক নয়।'[২]

এটা তার লোকদেখানো ইসলামগ্রহণের আগের ঘটনা। বদর যুদ্ধের পর সে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করে। তখন থেকে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বিদ্বেষের চাষাবাদ করতে থাকে মুসলিমদের অগোচরে। মুসলিম পরিচয়ে মুসলিম সমাজে বসবাস করে সে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় ভাঙন সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। ইসলামের কালিমাকে

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১২-১১৩; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮৯-২৯৫

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৮৪ ও ৫৮৭; *সহিহুল বুখারি* : ৪৫৬৬, ৫৬৬৩, ৬২০৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৯৮

নিচু করে দেখানোর চেষ্টা করে। ইসলামের শত্রুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। বনু কাইনুকার সাথে তার গোপন আঁতাতের কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। উহুদ যুদ্ধে তার মূল বাহিনী থেকে সরে পড়া এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টার কথাও পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তার কোনো চেষ্টাই সফলতার মুখ দেখেনি।

অবশ্য এত কিছুর পরও সে থেমে থাকেনি; বরং বিপুল উদ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে সবসময়। তারই অংশ হিসেবে প্রতি জুমআয় সে নিয়ম করে সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলত, 'তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসুল উপস্থিত রয়েছেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের সম্মানিত করেছেন। তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। পদে পদে তোমাদের সাহায্য করেছেন। সেইসাথে তোমাদের শক্তি জুগিয়েছেন। তাই তোমরা তাকে সবসময় মেনে চলবে। কখনো তার কথার অবাধ্য হবে না।' সে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় একনাগাড়ে এ কথাগুলো বলে বসে পড়ত। তারপর নবিজি দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

উহুদ যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও মুসলিম শিবিরে বিভক্তি তৈরির অপচেষ্টার পরেও এক জুমআয় সে যথারীতি আগের কথাগুলো বলার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। মুসলিমরা তখন চারপাশ থেকে তার কাপড় টেনে ধরে এবং বলতে থাকে, 'বসে পড় আল্লাহর দুশমান। তোর মুখে এসব মানায় না। তোর কীর্তিকলাপ ও চিন্তাভাবনা আমাদের জানা হয়ে গেছে!' এ সময় সে বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করতে করতে মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে, 'তাকে সমর্থন করতে গিয়ে যেন আমি কোনো অপরাধ করে ফেলেছি! তাই আজ আমাকে এভাবে থামিয়ে দেওয়া হলো!' মসজিদের দরজায় এক আনসার সাহাবির সাথে তার দেখা হয়। তিনি বলেন, 'আরে, করছ কী! করছ কী!

মসজিদে ফিরে যাও। নবিজি তোমার জন্য ক্ষমা চাইবেন আল্লাহর কাছে।' আবারও বিরক্তি ফুটে ওঠে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের চোখে-মুখে—'লাগবে না তার ক্ষমা চাওয়া। তার ক্ষমা দিয়ে আমি কী করব?' এটা বলে সে রাগ দেখিয়ে চলে যায়।[১]

এছাড়াও বনু নাজিরের সাথে ছিল তার গলায় গলায় ভাব। এই সম্পর্কের পুরোটাই সে কাজে লাগাত মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত ও শলাপরামর্শে, 'তোমরা যুদ্ধে গেলে, আমরা তোমাদের সঙ্গী হব। তোমরা আক্রান্ত হলে আমরা তোমাদের পাশে দাঁড়াব।'[২] খন্দক যুদ্ধেও সে এবং তার দোসররা একইভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাজ করে। সবদিক থেকে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে জনমনে ভয়, বিভ্রান্তি ও হতাশা সৃষ্টি করতে। মহান আল্লাহ সুরা আহযাবে তাদের সেই তৎপরতার বর্ণনা দেন

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৫

[২] সুরা হাশর, আয়াত : ১১

এভাবে—

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

....

স্মরণ করুন, যখন মুনাফিক ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও স্মরণ করুন, যখন তাদেরই একটি দল বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী, (এখানে) তোমরা টিকতে পারবে না। তাই (ঘরে) ফিরে যাও। তাদের আরেকটি দল তো নবির কাছে এই বলে অনুমতি চাইছিল যে, আমাদের ঘরগুলো অরক্ষিত; (আমাদেরকে ফিরে যেতে দিন) অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। পালিয়ে যাওয়াটাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। যদি (মদিনার) চারদিক থেকে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটত, এরপর বিদ্রোহ করার জন্য তাদেরকে উসকে দেওয়া হতো, তাহলে অবশ্যই তারা সেটা করে বসত। মোটেও কালক্ষেপণ করত না এতে। অথচ এর আগে তারাই আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছিল, তারা পিছু হটবে না। এই ওয়াদার ব্যাপারে

অবশ্যই (তাদেরকে) কৈফিয়ত দিতে হবে। বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু কিংবা হত্যার ভয়ে পালিয়ে যাও, তবু তা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। বরং সামান্যই ভোগ করতে পারবে তোমরা। বলুন, এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে, যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করতে চান? অথবা (কে তোমাদের ক্ষতি করতে পারে) যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান? তারা আল্লাহকে ছাড়া নিজেদের জন্য না পাবে কোনো অভিভাবক; আর না পাবে কোনো সাহায্যকারী। আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা (মানুষকে যুদ্ধে যেতে) বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে চলে এসো। তারা নিজেরাও (সাধারণত) যুদ্ধে আসে না; কদাচিৎ আসে—তোমাদের (সম্পদের) প্রতি লালায়িত হয়ে। কাজেই যখন ভয়ের কোনো কারণ ঘটে, তখন তাদেরকে দেখবে, মৃত্যু-ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির মতো তারা তোমার দিকে চোখ উলটে তাকাচ্ছে। কিন্তু যে-ই ভয়ের কারণ দূর হয়ে যায়, অমনি তারা সম্পদের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আঘাত করতে শুরু করে। তারা আদৌ ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের কর্মগুলো নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী (এখনো) চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী (পুনরায়) এসে পড়ে, তাহলে তারা কামনা করবে যে, তারা যদি যাযাবর মরুচারীদের সাথে থেকে তোমাদের খবরাখবর নিতে পারত, (তাহলে সেটাই হতো ভালো!) অবশ্য তারা তোমাদের সাথে থাকলেও যৎসামান্যই যুদ্ধ করত।[১]

ইহুদি, মুনাফিক কিংবা মুশরিক—ইসলামের সকল শত্রুই এটা জানত, ইসলামের জয়যাত্রা জাগতিক উপায়-উপকরণ কিংবা অস্ত্রবল ও জনবলের আধিক্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং এ বিজয়ের নিয়ামক শক্তি হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস, উন্নত নীতি-নৈতিকতা, ইসলামি মূল্যবোধ এবং এসবের প্রতি তাদের আত্মনিবেদন। তারা এটাও জানত, এই শক্তির মূল উৎস নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই এ বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বাতিঘর। তিনিই এ আত্মনিবেদনের প্রেরণা।

ইসলামের আবির্ভাবের পরপরই তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে। এর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে টানা ৫ বছর যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা। এ দুই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা যে নতুন নির্ণয়ে পৌঁছেছে সেটা হচ্ছে, নিছক অস্ত্রবলে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। তাই এবার তারা ভিন্ন ফন্দি আঁটে। চরিত্র ও ঐতিহ্যের দরজা দিয়ে ইসলামের ওপর আঘাত হানবে বলে স্থির

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ১২-২০

করে। সেজন্য স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে এবং গণমানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রোপাগান্ডায় নামে। আর মুনাফিকরা যেহেতু মদিনার স্থানীয় ছিল এবং মুসলিমদের সাথে একই সমাজে বসবাস করত, সেহেতু মুসলিমদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা এবং সেটাকে কাজে লাগিয়ে যখন-তখন তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানা ছিল তাদের জন্য খুবই সহজ একটা ব্যাপার। এসব দিক বিবেচনা করেই মুনাফিকরা প্রোপাগান্ডার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। আর এ কাজে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয় আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই।

খন্দক যুদ্ধের পর মুনাফিকদের এই ঘৃণ্য তৎপরতা সর্বপ্রথম মুসলিমদের সামনে আসে। এ সময় নবিজি উম্মুল মুমিনিন যাইনাব বিনতু জাহশকে বিয়ে করেন। যাইনাব ছিলেন নবিজির পালকপুত্র যাইদ ইবনুল হারিসার স্ত্রী। অনেক চেষ্টার পরেও তাদের মধ্যে বনিবনা হয় না। অবশেষে যাইদ তাকে তালাক দিয়ে দেন। এরপর নবিজি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মূলত মহান আল্লাহই তাকে এ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা ছিল আরবের রীতি ও ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। আরবের লোকেরা বিশ্বাস করত—'নিজের পুত্রের মতো পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা পিতার জন্য সম্পূর্ণ হারাম।' মুনাফিকরা এই ঐতিহ্যের দোহাই দিয়েই নবিজি ও যাইনাবের বিয়েকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করে। তার নামে কুৎসা রটায় এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে দুভাবে প্রোপাগান্ডা চালায়—

১. যাইনাব তার পঞ্চম স্ত্রী। অথচ কুরআনে একসঙ্গে চার স্ত্রীর বেশি রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোনোভাবেই তার জন্য এ বিয়ে বৈধ হতে পারে না।

২. যাইনাব তার পালকপুত্রের সাবেক স্ত্রী। আর পালকপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া গুরুতর অপরাধ। আরবের রীতি-বিরুদ্ধও।

এ দুটো দিক সামনে রেখে তারা নবিজির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালাতে থাকে। মনগড়া গল্প ও কল্পকথাও জুড়ে দেয় এর সাথে। শুধু তা-ই নয়, ঘটনাটাকে রসালো করার জন্য তারা নবিজি ও যাইনাবকে নিয়ে জঘন্য সব কাহিনি বানাতে শুরু করে। মুনাফিকরা এই কল্পকাহিনি এমনভাবে প্রচার করে এবং সরলমনা মুসলিমদের হৃদয়ে তা এতটাই প্রভাব ফেলে যে, পরবর্তীকালে বিভিন্ন তাফসির ও হাদিসগ্রন্থে সেই কল্পকাহিনির বিবরণ উঠে আসে। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের এই অভিযোগ ও আপত্তির জবাব দেন। সুরা আহযাবের শুরুতে তাদের এই মিথ্যা অভিযোগ ও ঠুনকো ঐতিহ্য খণ্ডন করে বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝٣ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ
اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۝٤ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٥ النَّبِيُّ
أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم
مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝٦

....

হে নবি, আল্লাহকে ভয় করুন। কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী; পরম প্রাজ্ঞ। আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা ওহি করা হয়, তার অনুসরণ করুন। আল্লাহ আপনাদের কাজকর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবগত। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। কার্যনির্বাহী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ কোনো মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। তোমাদের যেসব স্ত্রীর সাথে তোমরা যিহার করো, আদতে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে তোমাদের মা বানাননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও বানাননি তোমাদের আপন-পুত্র। এগুলো তোমাদের মুখের কথামাত্র। আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনি কেবল সঠিক পথেরই সন্ধান দেন। (এখন থেকে) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকবে।[১] আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই অধিক সংগত। তোমরা যদি তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করে ফেললে, তোমাদের গুনাহ হবে না। কিন্তু মনে (এর) সুপ্ত ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা (সেক্ষেত্রে গুনাহ হবে)। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। নবি মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি আপন; তার স্ত্রীগণ তাদের

---

[১] ইমাম কুরতুবি বলেন, 'এই আয়াত যাইদ ইবনুল হারিসার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, এ বিষয়ে সকল মুফাসসির একমত। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ অর্থাৎ 'তোমরা পালকপুত্রদেরকে তাদের আসল পিতার নামে ডাকো' এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যাইদ ইবনুল হারিসাকে যাইদ ইবনু মুহাম্মাদ বলে ডাকতাম।' জাহিলি যুগে আরবে পালকপুত্রকে ঔরসজাতপুত্রের মতোই মনে করা হতো। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটন করতেই আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নবিজিকে আদেশ করেন, তালাক-শেষে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর তিনি যেন যাইদের স্ত্রী যাইনাব বিনতু জাহাশকে বিয়ে করেন। [*তাফসিরুল কুরতুবি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১৮]

মা। (উত্তরাধিকার প্রশ্নে) আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরগণের (পারস্পরিক সম্পর্ক অপেক্ষা) রক্তসম্পর্কের আত্মীয়রা একে অন্যের বেশি আপন। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করো, তাহলে ভিন্ন কথা। এগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে লাওহে মাহফুজে।[১]

এই আয়াতগুলোতে স্পষ্টভাবে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধপূর্ব মুনাফিকদের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এমন গর্হিত কার্যকলাপও পরম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সাথে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। সাধারণ মুসলিমরাও মুনাফিকদের অপতৎপরতা ও তার কুফল থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে ধৈর্যের সাথে দিনযাপন করছিলেন। কারণ তারা জানতেন, মুনাফিকরা তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে শুরু থেকেই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে আসছে। তাই খুব শীঘ্রই তাদের এ মিথ্যাচার উন্মোচিত হবে এবং তারা আরও একবার লাঞ্ছিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

তারা কি দেখে না প্রতিবছরই তাদের দুয়েকবার পরীক্ষায় ফেলা হয়? তারপরও তারা তাওবা করে না! শিক্ষা তো নেয়ই না।[২]

মুনাফিকদের চক্রান্ত—বিশৃঙ্খলা ও অপপ্রচার

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধে মুনাফিকরাও অংশ নেয়। তাদের অংশগ্রহণের হালচিত্র তুলে ধরে মহামহিম আল্লাহ বলেন—

لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

অবশ্য তারা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিপদই কেবল বাড়িয়ে দিত এবং বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোটাছুটি করত তোমাদের মাঝে। তাছাড়া

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ১-৬

[২] সূরা তাওবা, আয়াত : ১২৬

তোমাদের মধ্যেও রয়েছে তাদের গুপ্তচর। আল্লাহ এমন জালিমদের ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত।[১]

যুদ্ধে অংশ নেওয়ায় তাদের সামনে দুটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। **এক.** মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। **দুই.** নবিজির বিরুদ্ধে গর্হিত অপপ্রচার চালানো। আমরা এখানে সেগুলো সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ক. মদিনা থেকে মুহাজিরদের বহিষ্কারের ঘোষণা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনুল মুস্তালিক অভিযান শেষে মুরাইসি-জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছেন। এমন সময় কয়েকজন মুজাহিদ পানি আনতে যান। তাদের মধ্যে জাহজাহ নামে উমার ইবনুল খাত্তাবের এক কর্মচারীও ছিল। তার সাথে পানি নিয়ে সিনান ইবনু ওয়াবার জুহানির কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সেটা পরিণত হয় তুমুল ঝগড়ায়। জুহানি তখন চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আনসাররা কোথায়, এদিকে এসো!' ওদিকে জাহজাহও হাঁক ছাড়ে, 'মুহাজির ভাইয়েরা, কোথায় তোমরা? জলদি এসো!' নবিজি তখন দুই পক্ষের এই কোন্দল থামানোর জন্য বললেন, 'আমি যেখানে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত, সেখানে কোন যুক্তিতে তোমরা একে অন্যকে জাহিলি যুগের সাম্প্রদায়িকতার দিকে আহ্বান করছ? এসব ছেড়ে দাও। এগুলো দুর্গন্ধ ছড়ায়।'

এক আনসার ও মুহাজিরের সাময়িক বিবাদের এ সংবাদ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলের কানে পৌঁছলে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে বলে, 'মুহাজিররা কি আসলেই এমন করেছে? আমাদের আশ্রয়ে থেকে আমাদের সাথেই এমন শত্রুর মতো আচরণ করছে? আমাদেরকেই দাপট দেখাচ্ছে? আমাদের মধ্যেই ঘৃণার চাষাবাদ করছে! আমরা কি তাহলে দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি এতদিন? শোনো, আমরা মদিনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের অভিজাত লোকেরা নির্ঘাত এই নিমকহারামদের বের করে দেবে।' এরপর সে উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলে, 'এই বিপদ তোমরা নিজেরাই ডেকে এনেছ। নিজেদের ঘরে বাইরের মানুষদের জায়গা দিয়েছ। ভাগ বসাতে দিয়েছ তোমাদের নিজেদের উপার্জনেও। অথচ তোমরা তাদের থেকে দানের হাত গুটিয়ে রাখলে, কবেই তারা তোমাদের শহর ছেড়ে চলে যেত!'

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই যখন এমন হম্বিতম্বি চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন কিশোর সাহাবি যাইদ ইবনু আরকামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চাচার[২] সাথে তিনিও এই অভিযানে অংশ

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৪৭

[২] আরবিতে عَمٌّ (আম্মুন) শব্দ দ্বারা চাচা ও মামা দুজনকেই বোঝানো হয়। এ যুদ্ধে যাইদ ইবনু আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর আপন চাচা সাবিত ইবনু কাইস ও আপন মামা আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা দুজনেই উপস্থিত

নিয়েছেলেন। তিনি এসে চাচার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। চাচা গিয়ে নবিজিকে বলেন। সেখানে তখন বেশ কয়েকজন সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাবও ছিলেন। তিনি ঘটনা শুনে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আববাদ ইবনু বিশরকে অনুমতি দিন; সে গিয়ে নরাধমটাকে হত্যা করে আসুক।' নবিজি বলেন, 'এটা কী করে সম্ভব? মানুষ তো তখন বলাবলি করবে মুহাম্মাদ নিজেই তার সহযোদ্ধাদের হত্যা করে! না, এমনটা হতে দেওয়া যায় না। তারচেয়ে বরং তুমি এখনই সবার মধ্যে কাফেলা যাত্রা করার সময় হয়েছে বলে ঘোষণা করো।'

অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে, এই অসময়ে যাত্রা করার কথা ছিল না। সবাই ছিল যার যার কাজে ব্যস্ত। তবু নবিজির নির্দেশে সবাই নিজেকে চটজলদি গুছিয়ে নেয় এবং কাফেলার সাথে মদিনা অভিমুখে রওনা হয়ে যায়। এমন সময় উসাইদ ইবনু হুজাইর ছুটে আসেন নবিজির কাছে। সালাম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'এই অসময়ে যাত্রা করার কারণ কী? নবিজি বলেন, 'কেন, তোমাদের দেশবন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই কী বলেছে, শোনোনি?' উসাইদ আবার জিজ্ঞেস করেন, 'সে এমন কী বলেছে যে আপনাকে এই অসময়ে যাত্রা করতে হলো?' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, 'সে বলেছে, মদিনায় ফিরে আমাদের অভিজাত লোকেরা নির্ঘাত এই নিমকহারামদের বের করে দেবে!'

এ কথা শুনে উসাইদ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা তাকেই মদিনা থেকে বের করে দেব। আল্লাহর কসম করে বলছি, সে এক নিকৃষ্ট ইতর। আপনি সম্মানিত! হে আল্লাহর রাসুল! আপনি তার প্রতি বিনম্র হোন। আল্লাহ আপনাকে এমন একসময়ে আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছেন, যখন স্বজাতির লোকেরা তার মাথায় নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু আপনার আগমনের পর সে মুকুট আর তার মাথায় চড়েনি। তাই তো সে আপনাকেই দায়ী মনে করে। আর এ কারণেই সে প্রতিনিয়ত আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে যাচ্ছে।'

উসাইদের সাথে আলাপ শেষ করে নবিজি আবার পথ চলতে শুরু করেন। সেদিন সকাল থেকে পরদিন ভোরের আলো প্রখর হওয়ার আগপর্যন্ত একটানা পথ চলেন। তারপর যাত্রাবিরতি দেন। তাঁবু খাটিয়ে সবাই নিজ নিজ বিশ্রামের ব্যবস্থা করে। তারা এতটাই

ছিলেন। স্পষ্ট কোনো দলিল না থাকায় ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আলামতের ওপর ভিত্তি করে মুহাদ্দিসগণ ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন। তবে সাবিত ইবনু কাইসের দিকের মত বেশি শক্তিশালী। কারণ যাইদ ইবনু আরকাম তার চাচার সংস্পর্শে বেশি থাকতেন।

ইমাম তাবারানি ও ইবনু মারদাওয়াইহির মতে, এখানে চাচা দ্বারা আপন চাচাকে বোঝানো হয়নি; বরং তিনি ছিলেন সাদ ইবনু উবাদা। কারণ তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সর্দার। যাইদ ইবনু আরকাম যেহেতু কিশোর ছিলেন, তাই তাকে চাচা বলে সম্বোধন করেছেন। [*ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬৪৫; দারুল মাআরিফা, বৈরুত]

ক্লান্ত ছিল যে, বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই রাজ্যের ঘুম এসে ভর করে চোখের পাতায়। মুহূর্তেই সবাই তলিয়ে যান গভীর নিদ্রায়। নবিজি এটাই চাইছিলেন। সাহাবিরা বসে বসে জাহজাহ ও সিনানের মধ্যে ঘটে যাওয়া বিবাদ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবে, নবিজি এটা পছন্দ করেননি। তাই তিনি চেয়েছেন সফরের অবিরাম ক্লান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার মাধ্যমে সমস্ত ক্লেদ মুছে দিতে।

এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই যখন জানতে পারে, যাইদ ইবনু আরকাম তার মজলিসে ছিল এবং সে তার সমস্ত কথা নবিজিকে জানিয়ে দিয়েছে, তখন সে হন্তদন্ত হয়ে নবিজির কাছে ছুটে আসে এবং বারবার শপথ করে বলতে থাকে, 'যাইদের কথা সত্য নয়। আমি তেমন কিছুই বলিনি।' তার এই ভণিতায় সাহাবিরা বিভ্রান্ত হন। কয়েকজন আনসার বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, হতে পারে বাচ্চা ছেলে বুঝতে ভুল করেছে।'

ঘটনা যাইহোক, বাহ্যিক অবস্থা বিচারে নবিজি আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইর কথা সত্য বলে মেনে নেন। যাইদ তখন বলেন, 'ঘটনাটি আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। হতাশা ও দুঃখবোধ প্রায়ই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে। সারাদিন বাড়ির আঙিনায় বসে থাকি। মানুষকে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। বাড়ি থেকে বের হই না তাই খুব একটা। এরই মধ্যে আল্লাহ তাআলা সুরা মুনাফিকুন অবতীর্ণ করে তার মিথ্যাচার প্রকাশ করে দেন। কুরআনের ভাষায়—

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসুল।' আল্লাহ জানেন, অবশ্যই আপনি তাঁর রাসুল। অপরদিকে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' তারা তাদের শপথসমূহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং মানুষকে ফিরিয়ে রাখে আল্লাহর পথ থেকে। তারা যা করে বেড়ায়, তা কতই না নিকৃষ্ট! এমনটা করার কারণ তারা ঈমান আনার পর আবার কুফরি করেছে। ফলে মোহর এঁটে দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে। তাই (এখন আর) তারা উপলব্ধি করতে পারে না (কিছুই)। আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, আপনাকে মোহিত করে তাদের গঠনাকৃতি। তারা যখন কথা বলে, আপনি (আগ্রহভরে) তাদের কথা শোনেন। অথচ তারা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের টুকরার মতো। তারা প্রতিটি আওয়াজকেই তাদের প্রতিকূল মনে করে। তারাই আসল শত্রু। তাই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। 'আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন'—তারা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভ্রান্ত হয়ে! যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো। আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আপনি দেখতে পান, অহংকার দেখিয়ে তারা চলে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আর না-ই করুন—দুটোই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ মোটেও ক্ষমা করবেন না তাদেরকে। আল্লাহ কখনোই হিদায়াত দেন না পাপে নিমজ্জিত সম্প্রদায়কে। তারাই বলে, 'আল্লাহর রাসুলের সাহচর্যে যারা আছে, তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কোরো না'—যাতে তারা বাধ্য হয়ে (রাসুলের ছত্রছায়া থেকে) কেটে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা সেটা বোঝে না। তারা আরও বলে, 'আমরা যদি মদিনায় ফিরে যাই, তাহলে সেখানকার মর্যাদাশীল ব্যক্তিরা বের করে দেবে হীন মানুষগুলোকে।' প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা বরাদ্দ কেবল আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।[১]

যাইদ বলেন, 'সুরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল আমাকে ডেকে পাঠান। নিজেই ওপরের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শোনান। অতঃপর বলেন, আল্লাহ তোমার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।'[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলের ছেলের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। তার স্বভাব-চরিত্র একদম তার বাবার বিপরীত। তিনি একজন পুণ্যবান সাহাবি। এই ঘটনার পর তিনি

---

[১] সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ১-৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৯০০-৪৯০৪; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯০-২৯২

নিজেকে বাবার কর্মকাণ্ড থেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করেন। সবার আগে এসে মদিনার প্রবেশদ্বারে অবস্থান নেন। তরবারি হাতে বাবার পথ আগলে দাঁড়ান। বাবা এলে তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'নবিজির অনুমতি না পেলে আমি তোমাকে কিছুতেই মদিনায় প্রবেশ করতে দেব না। জেনো রাখো, আমাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে সম্মানিত আর তুমি চরম পর্যায়ের নিকৃষ্ট।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এলে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার কাছে প্রবেশের অনুমতি চায়। তিনি অনুমতি দেন। পুত্র আব্দুল্লাহ তখন তার পথ থেকে সরে গিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে, দয়া করে এই কাজটি আমাকে করতে দিন। তার কাটা মাথাটা আমি আপনার পায়ের নিচে রাখতে চাই।'[১]

খ. ইফকের ঘটনা

এই যুদ্ধে আরও একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে। সেটা হলো ইফকের ঘটনা। ইফক শব্দের অর্থ হচ্ছে, চারিত্রিক অপবাদ দেওয়া। ঘটনার সারসংক্ষেপ অনেকটা এমন—যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবিজি এক স্থানে যাত্রাবিরতি দেন। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। তিনি হাওদা থেকে নেমে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। প্রয়োজন সেরে আবার ফিরে আসেন হাওদায়। এমন সময় গলায় হাত দিয়ে তিনি চমকে ওঠেন। বোনের কাছ থেকে ধার নিয়ে যে হারটি তিনি পরেছিলেন, সেটা তার গলায় নেই। হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা খুঁজতে বের হন। এরই মধ্যে কাফেলার যাত্রার ঘোষণা আসে। হাওদা-বহনকারীরা ভাবেন, আয়িশা তো হাওদার ভেতরেই আছেন। তাই তারা হাওদাটি উটের পিঠে চড়িয়ে দেয়। আয়িশা ছিলেন ছিপছিপে গড়নের। তাই তার থাকা না-থাকায় হাওদার ওজনে খুব একটা তারতম্য হয়নি। কেউ তার অনুপস্থিতি টেরই পায়নি। দুজন মিলে হাওদা উঁচু করলে, হয়তো টের পাওয়া যেত। কিন্তু কয়েকজন মিলে উঁচু করার কারণে সে সম্ভাবনাটাও বিলীন হয়ে যায়।

এদিকে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হার খুঁজতে থাকেন। একসময় পেয়েও যান সেটা। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, কাফেলার কেউ নেই। সবাই চলে গেছে তাকে ফেলে। চারপাশে সুনসান নীরবতা। একটু ভয় লাগে তার। কিন্তু পরক্ষণেই তা কাটিয়ে ওঠেন, 'কাফেলার কেউ না কেউ অবশ্যই আমার অনুপস্থিতি টের পাবে। তখন ঠিকই তারা এসে আমাকে নিয়ে যাবে।' এটা ভেবে সেখানেই চুপ করে বসে পড়েন তিনি। কিন্তু সবকিছু তো আর মানুষের ভাবনা অনুযায়ী ঘটে না। কিছু ঘটনা ঘটে একেবারেই

---

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২৭৭

আল্লাহ তাআলার ইশারায়, অভাবিত পন্থায়। এখানেও ঠিক তা-ই ঘটেছে। অপেক্ষা করতে করতে তিনি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। সফরের ক্লান্তি খুব বেশি জেগে থাকতে দেয় না তাকে। চোখের পাতা লেগে আসতেই তলিয়ে যান গভীর ঘুমে। হঠাৎ কারও 'ইন্নালিল্লাহ' শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি হুড়মুড় করে উঠে দেখেন সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল একটু দূরে দাঁড়িয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ছেন। তাকে উঠতে দেখে সাফওয়ান বিস্ময়ঝরা গলায় বলেন, 'নবিজির সহধর্মিণী পেছনে পড়ে গেছেন!'

যাত্রাবিরতির সময় সাফওয়ান সেনাছাউনির একেবারে শেষপ্রান্তে বিশ্রাম নিয়েছেন। তিনি বেশ ঘুমকাতুরে। কাফেলার প্রস্থানের ঘোষণা তার ঘুম ভাঙাতে পারেনি।[১] ঘুম থেকে উঠেই তিনি কাফেলার পেছনে চলতে শুরু করেন। হঠাৎ দেখতে পান, পথের ওপর আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা শুয়ে আছেন। যেহেতু পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আয়িশাকে দেখেছিলেন, তাই দেখামাত্রই তিনি তাকে চিনে ফেলেন। সাফওয়ান ইশারায় তার উটটিকে বসিয়ে ইশারায় আয়িশাকে উটের পিঠে উঠতে বলেন। আয়িশা উটের পিঠে চড়ে বসেন। সাফওয়ান উটের রশি ধরে পথ চলতে থাকেন। পুরো পথে এক 'ইন্নালিল্লাহ' ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি তাদের মধ্যে। না সাফওয়ান কোনো কথা বলেছেন আর না আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কোনো জবাব দিয়েছেন।

মধ্যদুপুরে যাত্রাবিরতির সময় তারা মূল কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হন। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে। দুজনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে এই ঘটনার কারণ ও প্রেক্ষাপট বোঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তো মুনাফিকদের সর্দার। সে তখন সুযোগ পেয়ে যায়। সমস্ত বিদ্বেষ উগরে দিয়ে মা আয়িশার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে মানুষের কান ভারী করে তোলে এবং মূল ঘটনার সাথে হাজারো মিথ্যা জুড়ে দিয়ে জনমনে সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বীজ বপন করে দেয়। সে নিরালায় বসে, পথেঘাটে দাঁড়িয়ে এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশে গিয়ে ক্লান্তিহীনভাবে এই অপবাদ ছড়াতে থাকে। এতে তার সঙ্গীসাথিরাও রসদ পেয়ে যায়। সবাই মিলে একযোগে বিষ ছড়াতে থাকে মুসলিম সমাজে।

---

[১] সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু কাফেলার পেছনে থাকার কারণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে— 'তিনি ছিলেন ঘুমকাতুরে। তাই কাফেলা প্রস্থানের ঘোষণা তার ঘুম ভাঙতে পারেনি।' *সিরাতু ইবনি হিশামে* বলা হয়েছে, 'কোনো এক কারণে তিনি পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন।' *সুনানু আবি দাউদে* বর্ণিত একটি হাদিসের কারণে কেউ কেউ তার ঘুমকেই পেছনে পড়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে *সিরাতু ইবনি হিশামের* ব্যাখ্যাকার ইমাম সুহাইলি নিজ গ্রন্থ *আর-রাওযুল উনুফে* বলেন, 'সাফওয়ান ইবনু মুআত্তালকে নবিজি কাফেলার পেছনে নিযুক্ত করেন; যাতে কেউ কিছু ফেলে রেখে গেলে তিনি তা কুড়িয়ে আনতে পারেন।' কাফেলার এই অনুগামী দল এক বা একাধিক হয়ে থাকত। যারা মূল সৈন্যদল থেকে একদিন বা আধাদিন দূরত্বে অবস্থান করত। [*আর-রাওযুল উনুফ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৪; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

মদিনায় পৌঁছে তারা যেন একইসাথে হালে পানি আর পালে বাতাস পেয়ে যায়। রসিয়ে রসিয়ে বলে বেড়াতে থাকে তাদের বানোয়াট গল্প। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুবই মর্মাহত হন। প্রতিবাদের ভাষাও হারিয়ে ফেলেন তিনি। সবকিছু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে ওহির অপেক্ষায় বসে থাকেন। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়, কিন্তু কোনো ওহি আসে না। এতে মানসিক চাপ ও দুঃখবোধ আরও বেড়ে যায় তার। এ সময় তিনি আয়িশাকে বিবাহ বন্ধনে রাখা বা না-রাখার ব্যাপারে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। আলির প্রচ্ছন্ন পরামর্শ ছিল তাকে ছেড়ে অন্য কাউকে বিয়ে করা। অপরদিকে উসামা-সহ অন্যরা নবিজিকে শত্রুদের কথায় কান না দিয়ে আয়িশার সাথে সংসার করতে বলেন।

নবিজি পরামর্শ সেরে মিম্বারে দাঁড়ান। খুতবা দেন। ইবনু উবাইর দেওয়া কষ্ট থেকে মুক্তিপ্রার্থনা করেন। আউস গোত্রের সর্দার উসাইদ ইবনু হুজাইর মুনাফিকটাকে হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খাযরাজ-সর্দার সাদ ইবনু উবাদা এর বিরোধিতা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই খাযরাজের লোক হওয়ায় গোত্রীয় পক্ষপাত প্রবল হয়ে ওঠে তার ভেতর। এতে উভয়ের মধ্যে শুরু হয় বাগ্‌বিতণ্ডা। তার কিছুটা প্রভাব পড়ে উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যেও। ক্রমশ উঁচু হতে থাকে তাদের গলার আওয়াজ। নবিজি সবাইকে শান্ত হতে বলেন। সবাই শান্ত হলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন। সেদিন আর কারও সাথে কোনো কথা বলেন না এ ব্যাপারে।

এদিকে যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় একমাস শয্যাশায়ী থাকেন। বাইরে তাকে নিয়ে কী ঘটছে, তার কিছুই জানেন না তিনি। তবে এতটুকু বুঝতে পারছেন, নবিজি হয়তো কোনো কারণে তার প্রতি একটু মনঃক্ষুণ্ণ। তাই আর আগের মতো খোঁজখবর নিচ্ছেন না এখন। নয়তো অসুস্থতার এই দিনগুলোতে তার সেবা ও সময়—দুটোই বেশি পাওয়া যায়।

কিছুটা সুস্থ হলে একরাতে তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে উম্মু মিসতার সাথে বাইরে বের হন। হাঁটতে গিয়ে পরনের কাপড় পায়ের নিচে পড়ে উম্মু মিসতার। এতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান তিনি। অমনি তার মুখ ফসকে ছেলে মিসতার বিরুদ্ধে বদদুআ বেরিয়ে আসে। আয়িশার কাছে ব্যাপারটা খুবই বাজে ঠেকে। তিনি তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করেন। উম্মু মিসতা তখন তার এই বদদুআর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে রচিত মিথ্যা অপবাদ এবং এক্ষেত্রে তার ছেলে মিসতার ভূমিকার কথা খুলে বলেন।

আয়িশা সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে আসেন। ঘটনার সত্যতা ও গতিপ্রকৃতি জানার জন্য তিনি বাবার বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নবিজির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছুটে আসেন বাবা-মায়ের কাছে। এরপর অপবাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বান নেমে আসে। টানা দুই রাত এক দিন কেটে যায় তার কাঁদতে কাঁদতে। এ সময়ে

একমুহূর্তের জন্যও তার চোখদুটো শুকনো ছিল না। ভেতরের গুমোট কান্নার পুরোটা যেন অশ্রুজলে বের হয়ে আসতে পারছিল না। তাই বারবার তার মনে হচ্ছিল, কান্নার তীব্রতায় এখনই হয়তো বুক ফেটে মারা যাবেন তিনি। এরই মধ্যে নবিজি তার সাথে দেখা করতে আসেন। একবার কালিমা শাহাদাত পাঠ করে বলেন, 'আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এই-এই অভিযোগ এসেছে। তুমি নিরপরাধ হয়ে থাকলে, আল্লাহ শীঘ্রই তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন। তবে তোমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে, আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। তাওবা করো তাঁর কাছে। আল্লাহ তাঁর বান্দার অনুতপ্ত হৃদয়ের তাওবা কবুল করে থাকেন।'

প্রাণের স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান। চোখের অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়া অশ্রু শুকিয়ে যায় এক নিমিষে। রাগে-অভিমানে তিনি মা-বাবাকে বলেন, তার পক্ষ হয়ে নবিজির কথার উত্তর দিয়ে দিতে। কিন্তু তারা কী বলবেন, ভেবে পান না। অখণ্ড নীরবতা ঘিরে ধরে সবাইকে।

উপায় না দেখে রাজ্যের হতাশা আর একবুক কষ্ট নিয়ে আয়িশা নিজেই সে নীরবতা ভেঙে বলতে থাকেন, 'আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, আপনারা শোনাকথা সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। এই কদিনে সেগুলো বদ্ধমূল হয়ে গেছে আপনাদের অন্তরে। এখন আমি যদি হাজার বারও বলি—আমি নির্দোষ, আপনারা আমার কথা কানে তুলবেন না। অথচ আল্লাহ জানেন, আপনারা যে কথাটা বিশ্বাস করবেন না, সেটাই প্রকৃত সত্য। আবার আমি যদি আপনাদের অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করি, তাহলে আপনারা নির্দ্বিধায় সেটা সত্য বলে মেনে নেবেন। অথচ আল্লাহ জানেন, আপনারা যেটাকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছেন, সেটা নির্জলা মিথ্যা আর আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথা তুলে ধরা ছাড়া আমার আর কীই-বা করার আছে! তার মতো আমিও বলতে চাই, এখন ধৈর্য ধরাটাই উত্তম। তোমরা যা বলছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই কেবল আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'[১]

এ কথা বলে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক পাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়েন। তার কিছুক্ষণ পরেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহি নাযিল হতে শুরু করে। মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে তার মুখমণ্ডলে। ওহি নাযিল শেষ হলে সর্বপ্রথম তিনি আয়িশাকে ডেকে বলেন, 'শোনো আয়িশা, আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। সচ্চরিত্রতার সনদ দিয়েছেন তোমাকে।' এ কথা শুনতেই আয়িশার মা দৌড়ে যান মেয়ের কাছে। মাথায় হাত রেখে বলেন, 'যাও মা, আল্লাহর রাসুলের কাছে ফিরে যাও।' কিন্তু আয়িশা তার সতীত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা এবং প্রিয় স্বামীর প্রতি নিরেট শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রেখে অভিমানী সুরে বলেন, 'আমি তার কাছে যাব না। আমি আল্লাহ

---

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮

ছাড়া আর কারও প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করব না।'

মহান আল্লাহ এই অপবাদ নিরসনে সুরা নুরের ১০টি আয়াত অবতীর্ণ করেন—

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

যারা (আয়িশার ব্যাপারে) অপবাদ রটিয়েছে, তারা তোমাদেরই লোক। তোমরা এটাকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে কোরো না। বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের মধ্যে যারা পাপ করেছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে তার সমুচিত শাস্তি। আর যে এতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। তারা যখন এটা শুনল, তখন মুমিন নরনারীগণ কেন নিজেদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করল না এবং কেন বলল না, এটা একেবারেই মিথ্যা অপবাদ? তারা কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করল না? যেহেতু তারা কোনো সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি, তাই আল্লাহর বিচারে তারাই মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা (অপবাদের) যে অপরাধে লিপ্ত হয়েছ, সেজন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করত ভয়াবহ এক শাস্তি। কারণ তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং মুখ দিয়ে এমন সব (জঘন্য) কথা বলে বেড়াচ্ছিলে, যে ব্যাপারে তোমাদের আদৌ কোনো জ্ঞান ছিল না। তোমরা এটাকে তুচ্ছ

মনে করছিলে, কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে তা খুবই গুরুতর। তোমরা যখন এ (অপবাদ) শুনতে পেলে, তখন কেন বললে না যে, এ ব্যাপারে বলাবলি করার অধিকার আমাদের নেই। হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র। এটা তো গুরুতর অপবাদ! আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি সত্যিই মুমিন হয়ে থাকো, তবে আর কখনো এমন কাজ কোরো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত এবং আল্লাহ যদি দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন (তাহলে তোমাদের অবস্থা হতো খুবই শোচনীয়)।[১]

মুনাফিকদের বাকচাতুর্যে বিভ্রান্ত হয়ে যেসকল মুসলিম এই গর্হিত অপবাদচর্চায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা হলেন—মিসতা ইবনু উসাসা, হাসসান ইবনু সাবিত এবং হামনা বিনতু জাহাশ। তাদের প্রত্যেককে ইসলামি শরিয়া আইন অনুসারে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু এর মূল হোতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। দুনিয়ায় তাকে শাস্তির আওতা থেকে মুক্ত রাখার কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তবে এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ দুনিয়ায় তাকে যাচ্ছেতাই করা সুযোগ দিয়ে আখিরাতে পাকড়াও করতে চান কঠোরভাবে। সেজন্যই হয়তো সে একাধিকবার যুদ্ধাপরাধের মতো গুরুতর কাজ করলেও নবিজি তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি একবারও।[২]

এইভাবে এক মাসের ব্যবধানে মদিনার আকাশ থেকে সংশয়, সন্দেহ ও মানসিক অস্বস্তির গুমোট মেঘ দূরীভূত হয়ে যায়। অপরদিকে মুনাফিকদের সর্দার এতটাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয় যে, পরে আর সে কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। ইবনু ইসহাক বলেন, 'এরপর থেকে যখনই সে নতুন কোনো ষড়যন্ত্র করতে যেত, তার গোত্রের লোকেরাই তাকে গালমন্দ করে থামিয়ে দিত। প্রয়োজন বোধে শায়েস্তাও করত।'

পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর নবিজি উমারকে বলেন, 'উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলের ব্যাপারে এখন তোমার অভিমত কী? তুমি যেদিন তাকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিলে, সেদিন যদি সত্যি তাকে হত্যা করা হতো, তবে নির্ঘাত মানুষের মধ্যে এর বিরূপ প্রভাব পড়ত। অনেকেই ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিত আমাদের থেকে।

[১] সুরা নুর, আয়াত : ১১-২০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৪১, ৪৭৫০, ৪৭৫৭; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৩-১১৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৭-৩০৭

অথচ আজকের অবস্থা দেখো। আজ যদি আমি হত্যা করার আদেশ দিই, তবে তারা একমুহূর্ত না ভেবেই তাকে হত্যা করে ফেলবে।' উমার বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার মতামতের তুলনায় আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী।'[১]

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ

দুমাতুল জানদাল অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে আব্দুর রহমান ইবনু আউফের নেতৃত্বে দুমাতুল জানদালে অবস্থিত বনু কালবের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে বের হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমানকে ডেকে পাঠান। সামনে বসিয়ে নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ি বাঁধেন। সাথে উপহার দেন যুদ্ধ-সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাসিহা। নবিজি আরও বলেন, 'বনু কালব যদি বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদের সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করে নেবে।'

আব্দুর রহমান ইবনু আউফ ৩ দিন দিয়ারে বনু কালবে অবস্থান করেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ৩ দিনের মধ্যেই তাদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। নবিজির পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তাদের সর্দার-কন্যা তুমাজির বিনতু আসবাগকে বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে তিনি উম্মু আবি সালামা নামে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার বাবা ছিলেন মান্যবর নেতা ও গোত্রপ্রধান।

ফাদাক অভিযান

মদিনা শহর থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে ফাদাক অঞ্চলে ছিল বনু সাদের বসবাস। ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে নবিজির কাছে সংবাদ আসে—ফাদাকবাসী মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদিদেরকে সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংবাদ পেয়ে তিনি আলির নেতৃত্বে ২০০ মুজাহিদের একটি বাহিনী পাঠান। আলি তার অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে রাতে পথ চলতেন আর দিনের বেলায় বিশ্রাম নিতেন। পথিমধ্যে বনু সাদের এক গুপ্তচর তার হাতে বন্দি হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে বলে, খাইবারের খেজুরের বিনিময়ে ইহুদিদেরকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়ে আমাকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। বনু সাদের লোকেরা কোথায় কোথায় লুকিয়ে আছে, সেসবও বলে দেয় সে। তার দেওয়া তথ্য কাজে লাগিয়ে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু অতর্কিত হামলা চালান। গনিমত হিসেবে তার হাতে আসে ৫০০টি উট আর ৫ হাজার বকরি। গোত্রের লোকেরা অবশ্য পালিয়ে যায়। তাদের গোত্রপ্রধানের নাম ছিল ওয়াবার ইবনু আলিম।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৩

ওয়াদিল কুরা অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির রামাদানে আবু বকর সিদ্দিক, মতান্তরে যাইদ ইবনুল হারিসার নেতৃত্বে ওয়াদিল কুরায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। বনু ফাযারার একটি শাখাগোত্র আততায়ী হামলায় নবিজিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে, তিনি আবু বকর সিদ্দিককে পাঠিয়ে দেন তাদেরকে শিক্ষা দিতে। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন, 'এ অভিযানে আমিও তার সাথে অংশ নিই। একদিন বাদ ফজর তিনি আমাদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। স্থানীয় একটি জলাশয়ের পাশে তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। আবু বকর সেখানে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেন। কিছুটা দূরে একদল লোককে পালিয়ে যেতে দেখি। তাদের মধ্যে নারী ও শিশুই ছিল বেশি। আমার আশঙ্কা হয়, একমুহূর্ত দেরি হলেই তারা আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। আশ্রয় নেবে সুউচ্চ পাহাড়-চূড়ায়। তখন হিসাবে গরমিল লেগে যাবে।

তাই আমি দ্রুত তাদের পিছু নিলাম। পাহাড় ও তাদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটিতে একটি তির নিক্ষেপ করি। তির দেখে সবাই থমকে দাঁড়ায়। আমি পুরো দলটিকে আবু বকরের কাছে নিয়ে আসি। তাদের মধ্যে উম্মু কিরফা নামে এক নারী ছিল। তার পরনে একটি চামড়ার চাদর। সাথে তার এক যুবতি মেয়ে, যার সৌন্দর্য বহু আরব পুরুষের নজর কেড়েছে। আমি তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে এলে, আবু বকর সেই আরব-সুন্দরীকে আমার মালিকানায় দিয়ে দেন। তবে তার সাথে আমার কখনো শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। মদিনায় ফিরে এলে নবিজি মেয়েটিকে চেয়ে নেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করেন।[১]

উম্মু কিরফা ছিল ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির মহিলা। সবসময় সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চাইত। একবার তো তাকে হত্যার জন্য ৩০ জন অশ্বারোহীকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে যাত্রায় ৩০ জনই মুসলিমদের হাতে নিহত হয় এবং তাকেও ভোগ করতে হয় শাস্তি।

উরাইনা অভিযান

ষষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে কুরয ইবনু জাবির ফিহরির নেতৃত্বে উরাইনা অভিমুখে একটি অভিযান পরিচালিত হয়।[২] এ অভিযানটি পরিচালিত হয় উকল ও উরাইনা গোত্রের গাদ্দারির কারণে। তারা মদিনায় এসে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৫৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬৯৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৬১২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৮৪৬; কেউ কেউ বলেন, এই অভিযান সপ্তম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে।

[২] তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে সাফওয়ান যুদ্ধে মদিনার চারণভূমিতে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কাবিজয়ের দিন শাহাদাত-বরণ করেন।

মদিনার পরিবেশ তাদের অনুকূল না হওয়ায় দুদিন যেতে না যেতেই সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসা হিসেবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারণভূমির উটশালায় পাঠিয়ে দেন এবং নিয়মিত উটের মূত্র ও দুগ্ধ পান করতে বলেন। নির্দেশমতো তারা মূত্র ও দুগ্ধ পান করতে থাকে। এতে ধারণার চেয়েও দ্রুততম সময়ে সুস্থ হয়ে ওঠে তারা।

কিন্তু সুস্থ হতেই রাখালদের হত্যা করে তারা উট নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে নবিজি তাদের সন্ধানে কুরয ইবনু জাবিরের নেতৃত্বে ২০ জন সাহাবির একটি দল পাঠান। সেইসাথে এই অকৃতজ্ঞ দুর্বৃত্তদের জন্য এই বলে বদদুআ করেন, 'হে আল্লাহ, এদেরকে পথ ভুলিয়ে দিন। এদের চলার পথ চিকন চুড়ির চেয়েও অধিক সংকীর্ণ করে দিন।'

আল্লাহ তাঁর রাসুলের দুআ কবুল করেন। মরুভূমির বিস্তীর্ণ মরীচিকায় ধাঁধা লেগে যায় তাদের। খুব বেশি দূর এগুতে পারে না। দিকশূন্য হয়ে এক জায়গায়ই ঘুরতে থাকে উদ্ভ্রান্তের মতো। এরই মধ্যে কুরয ইবনু ফিহর গিয়ে তাদের বন্দি করেন। শাস্তি হিসেবে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হয়। চোখ উপড়ে ফেলা হয়। মোটকথা রাখালদের সাথে তারা যা যা করেছিল, শাস্তি হিসেবে সেগুলোই তারা ভোগ করে। এরপর হাররা নামক উত্তপ্ত প্রান্তরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছটফট করতে করতে সেখানেই মারা যায় তারা।[১] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে তাদের এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে *সহিহুল বুখারিতে*।[২]

সিরাত-বিশেষজ্ঞগণ কাছাকাছি সময়ে আরও একটি অভিযানের কথা উল্লেখ করেন। এ অভিযানটি শুরু হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরির শাওয়াল মাসে; আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরি ও সালামা ইবনু আবি সালামার সমন্বয়ে। আবু সুফিয়ান নবিজিকে হত্যা করতে মদিনায় এক বেদুইন পাঠালে তার জবাবে আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরি সালামাকে নিয়ে মক্কায় যান আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে। এ অভিযানে দুই পক্ষের কেউই আহত বা নিহত হননি।

সিরাত-বিশেষজ্ঞগণ বলেন, আমর পথিমধ্যে ৩ জন ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং তিনিই খুবাইবের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তবে প্রসিদ্ধ হলো, রাজির ঘটনার কয়েক মাস বা কয়েক দিন পরে খুবাইব শহিদ হন। আর রাজির ঘটনা ঘটে চতুর্থ হিজরির সফর মাসে। এই কারণে স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না যে, সিরাত-বিশেষজ্ঞগণ দুটি ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলেছেন নাকি দুটি ঘটনা একই সফরে ঘটেছে চতুর্থ হিজরির সফর মাসে। সম্ভবত এজন্যই আল্লামা মানসুরপুরি এ ঘটনাকে যুদ্ধ বা সংঘাত বলতে রাজি নন। বাস্তবতা আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৫০১, ৪১৯২; *সহিহ মুসলিম* : ১৬৭১; *জামিউত তিরমিযি* : ৭২

খন্দক ও বনু কুরাইজার যুদ্ধের পর পরিচালিত এসব অভিযানে বিশেষ কোনো সংঘাত বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কোনোটায় ঝটিকা লড়াই হয়েছে। কোনোটায় সেটুকুও হয়নি। মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে অথবা তাদেরকে সতর্ক করেই অভিযান সমাপ্ত করেছেন। কাজেই এগুলোকে বড়জোর টহল বা সতর্কীমূলক অভিযান বলা যেতে পারে। বেদুইন ও আরবের বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে সতর্ক ও সংযত করাই ছিল এসব অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য।

এসব অভিযানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ফলাফল পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, খন্দক যুদ্ধের পর থেকে একদিকে যেমন ইসলাম ও মুসলিম সমাজ সুগঠিত ও সুসংহত হতে থাকে, অপরদিকে তেমনি শত্রুরা হারিয়ে ফেলতে থাকে তাদের সাহস ও মনোবল। একপর্যায়ে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধের শেষ আশাটুকুও আর বাকি থাকে না তাদের। হুদাইবিয়ার সন্ধির মধ্য দিয়ে তারা নতুন একটি শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় মুসলিমদেরকে। তখন থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের উত্থান দৃশ্যমান হয়ে ওঠে সবার সামনে। তাদেরকে জাযিরাতুল আরবের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চিন্তা করাটাও তখন দুঃসাহসিক হয়ে ওঠে ইসলাম-বিরোধী চক্রের জন্য।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

উমরার প্রস্তুতি

এতদিনের সংগ্রাম-সাধনার ফলে আরব উপদ্বীপের বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে নেমে এসেছে স্বস্তি। মুসলিমদের একক কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকখানি। তারই সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে ইসলামি দাওয়াতের সফলতা ও মহান বিজয়ের লক্ষণগুলো। মুশরিকরা গত ৬ বছর ধরে মুসলিমদেরকে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। সেই হারানো অধিকার ফিরে পেতেও এখন চেষ্টা চলছে বেশ জোরেশোরে।

এরই মধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন—'তিনি সাহাবিদের নিয়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। কাবার চাবিগুচ্ছ শোভা পাচ্ছে তার হাতে। সাহাবিরা উমরার তাওয়াফ করছেন। তাওয়াফ শেষে মাথা কামিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই। কেউ আবার খাটো করে দিচ্ছেন অন্যদের চুল।' নবিজি সাহাবিদেরকে এই স্বপ্নের কথা বললে তারা যারপরনাই আনন্দিত হন এবং এ বছরই উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাচ্ছেন বলে ধরে নেন। নবিজি নিজেও উমরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। অমনি শুরু হয়ে যায় উমরার ব্যাপক প্রস্তুতি।

মক্কার উদ্দেশে যাত্রার ঘোষণা

মদিনা ও তার আশপাশের লোকজনও যেন এমন একটি পুণ্যের কাজে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী হতে পারে—সেজন্য তিনি সর্বত্র উমরায় যাওয়ার ঘোষণা দেন। ঘোষণা শুনে বেদুইনপল্লীর কিছু লোক ইতস্তত করে। প্রস্তুতি গ্রহণে গড়িমসি করতেও দেখা যায় বেশ কয়েকজনকে। এদিকে নবিজি পোশাক-পরিচ্ছদ সব পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি কারও অপেক্ষা না করে তার উটনী কাসওয়ার

ওপর চেপে বসেন। মদিনায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুম বা নুমাইলা আল-লাইসিকে। ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসের প্রথম সোমবার তিনি মদিনা থেকে রওনা করেন। নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে তার সফরসঙ্গী হন উম্মু সালামা। সাহাবিরা সংখ্যায় ছিলেন দেড় হাজার। এ সফরে কোষবন্ধ তরবারি ছাড়া কারও সাথে কোনো যুদ্ধাস্ত্র দেখা যায়নি।

যুদ্ধে নয়, আমরা উমরায় এসেছি

কাফেলা শান্ত গতিতে মক্কার দিকে এগুতে থাকে। যুল হুলাইফায় পৌঁছে নবিজি হাদির[১] গলায় মালা পরান। কুঁজ চিরে সেগুলোকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হিসেবে চিহ্নিত করেন। এরপর সেখান থেকেই উমরার ইহরাম বাঁধেন—যাতে করে মানুষজন নিশ্চিত হতে পারে যে, তিনি কেবল উমরার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছেন। কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইচ্ছা তার নেই।

মক্কার লোকদের সাথে যেহেতু আগে থেকেই যুদ্ধাবস্থা চলছিল, তাই নবিজি কুরাইশদের মনোভাব বোঝার জন্য খুযাআ গোত্রের এক গোয়েন্দাকে কাফেলার আগে পাঠিয়ে দেন। কাফেলা উসফানে পৌঁছলে ওই গোয়েন্দা ফিরে এসে জানায়, আমি কাব ইবনু লুয়াইকে দেখে এলাম, সে সম্মুখ যুদ্ধে আপনাকে প্রতিহত করার জন্য হুবশিদের[২] ঐক্যবদ্ধ করছে। আপনাকে বাইতুল্লাহর যিয়ারত থেকে বিরত রাখার জন্য তারা আবারও একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠনের চেষ্টা করছে। আহরিত সংবাদের প্রেক্ষিতে নবিজি সাহাবিদের সঙ্গে জরুরি পরামর্শে বসেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মতামত কী? যারা আমাদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমরা কি তাদের ওপর আক্রমণ করব? আমাদের আক্রমণ যদি তারা মাথা পেতে নেয়, তাহলে তারা কিছুটা লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু সবাই প্রাণে বেঁচে যাবে। অপরদিকে তারা যদি আমাদের রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের অনেকের দেহ থেকে ধড় আলাদা হয়ে যাবে। নাকি তোমরা চাও আমরা কাবা অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকব? চলার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, তাকে প্রতিহত করব।'

---

[১] হাজিগণ হজের সফরে কুরবানির উদ্দেশ্যে সাথে যে পশু নিয়ে আসেন, তা-ই হাদি।

[২] হুবশি হচ্ছে মক্কা থেকে ৬ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের নাম। নবিজির পরদাদা আব্দু মানাফ ইবনু কুসাইয়ের সময়ে সেখানে বনুল মুস্তালিক ও বনুল হাওন ইবনি খুযাইমা গোত্রের সাথে কুরাইশদের মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। তারা সেখানে এ কথার ওপর অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল—'যতদিন দিনরাত চলমান থাকবে, অবিচল থাকবে এই হুবশি পাহাড়—অন্যদের মোকাবেলায় আমরা এক হাতের মতো থাকব।' তখন থেকে তাদেরকে সেই পাহাড়ের নামানুসারে 'আহাবিশু কুরাইশ' বলা হতো। নবিজির আগমনের কথা শুনে কাব ইবনু লুয়াই 'হুবশিদের একত্র করেছিল' বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে—যারা সে সময় কুরাইশদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিল। [*মুজামুল বুলদান*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২১৪; দারু সাদির, বৈরুত]

এ কথা শুনে আবু বকর বলেন, 'এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো বলতে পারবেন। তবে আমরা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি, যুদ্ধ করতে নয়। তাছাড়া কেউ যদি আমাদের এবং বাইতুল্লাহ যিয়ারতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করতে বাধ্য। আবু বকরের কথা শুনে নবিজি বলেন, বেশ! তবে চলো!

বাইতুল্লাহ যিয়ারতে কুরাইশের বাধা

এদিকে কুরাইশরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় আগমনের সংবাদ শুনে জরুরি পরামর্শ ডাকে এবং সেখানে সিদ্ধান্ত নেয়—'যেকোনো মূল্যে মুসলিমদেরকে বাইতুল্লাহর যিয়ারত থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে।' নবিজি সংঘবদ্ধ হুবশিদের এড়িয়ে সামনে চলেন। পথিমধ্যে বনু কাবের এক লোক সংবাদ নিয়ে আসে—'কুরাইশরা যু-তুওয়া নামক স্থানে শিবির ফেলেছে এবং কুরাউল গামিমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে ২০০ অশ্বারোহী অবস্থান নিয়েছে।'

এ স্থানটি মক্কাগামী প্রধান সড়কে অবস্থিত। খালিদ এখানেই মুসলিমদের রুখে দেওয়ার চেষ্টা করে। সে তার অশ্বারোহীদের নিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নেয়, যেখান থেকে উভয় পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পায়। এ সময় খালিদ লক্ষ করে, মুসলিমরা যুহরের সালাত পড়ছে এবং পূর্ণ একাগ্রতার সাথে রুকু সিজদা আদায় করছে। সালাত শেষ হলে, সে তার সহযোদ্ধাদের বলে, 'সালাতের সময় তারা অসতর্ক ও অপ্রস্তুত ছিল। এই সুযোগে আমরা আক্রমণ করলে, তাদেরকে কাবু করতে পারতাম।' এ পর্যবেক্ষণের আলোকে সে সিদ্ধান্ত নেয়—মুসলিমরা আসরের সালাতে দাঁড়ালে সে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করবে। এতে এক নিমিষেই শেষ হয়ে যাবে তারা। আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও পাবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন কিছু। খালিদের বাহিনী যখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে আক্রমণের মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই ওহিযোগে নবিজির ওপর সালাতুল খাওফের বিধান অবতীর্ণ হয়। এতে খালিদের সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

সংঘাত এড়াতে নবিজির কৌশল

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে প্রধান সড়ক বামে ফেলে ডানদিকের গিরিপথে নেমে আসেন। এ পথটি খামশের ভেতর দিয়ে সানিয়াতুল মুরার হয়ে মক্কার উপকণ্ঠবর্তী হুদাইবিয়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে। নবিজি সে পথেই হুদাইবিয়ায় পৌঁছেন। তার এই অকস্মাৎ পথ পরিবর্তনে খালিদ বিচলিত হয়ে পড়ে এবং কুরাইশদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে মক্কার উদ্দেশে ঘোড়া ছোটায়।

এদিকে নবিজি সানিয়াতুল মুরারে পৌঁছলে তার উটনী—কাসওয়া হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। উপস্থিত লোকেরা নানাভাবে উটনীটিকে ওঠানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই

কিছু হয় না। উপায় না দেখে তারা বলতে থাকে, 'কাসওয়া বেঁকে বসেছে।' জবাবে নবিজি বলেন, 'কাসওয়া নিজের ইচ্ছায় বসেনি। হস্তীবাহিনীকে যিনি রুখে দিয়েছিলেন, তিনিই আজ কাসওয়াকে বসিয়ে দিয়েছেন। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর মর্যাদা রক্ষার শর্তে তাদের যেকোনো প্রস্তাব আমি মেনে নিতে প্রস্তুত।' এরপর নবিজি উটনীটিকে উঠতে বললেই, সে লাফিয়ে ওঠে। তিনি সেখান থেকে আবার পথ বদল করেন এবং অন্য পথে হুদাইবিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। হুদাইবিয়া মূলত একটি স্বল্প পানির কূপ। সেখানে পৌঁছে নবিজি সবাইকে তাঁবু খাটাতে বলেন। পানির প্রয়োজন হলে আগন্তুকরা ওই কূপের পানি ব্যবহার করেন। কিন্তু পানির পরিমাণ খুব অল্প হওয়ায় তা মুহূর্তের মাঝেই শেষ হয়ে যায়। নবিজিকে এ বিষয়টি জানানো হলে তিনি তূণীর থেকে একটি তির সাহাবিদের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'এটা কূপে ফেলে দাও।' তিরটি কূপে ফেলতেই নিচ থেকে পানি উথলে উঠতে থাকে। সবাই তখন তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে। বাহনের পশুগুলোকেও পান করানো হয়। এরপর মশক ভরে সবাই ফিরে আসে তাঁবুতে।

বুদাইল ইবনু ওয়ারাকার মধ্যস্থতা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় স্থির হয়ে বসলে বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা খুযাআ গোত্রের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে তার সাক্ষাতে আসেন। তিহামার অধিবাসীদের মধ্যে বনু খুযাআ ছিল নবিজির খুবই কল্যাণকামী। বুদাইল বলেন, 'দেখে এলাম কাব ইবনু লুয়াই হুদাইবিয়ার কূপের কাছে ছাউনি ফেলেছে।[১] নারী ও শিশুদেরকেও সাথে এনেছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তারা আপনার বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করবে এবং যেকোনো মূল্যে আপনাকে আল্লাহর ঘর যিয়ারত থেকে বিরত রাখবে।' নবিজি তাকে বলেন, 'কিন্তু আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি উমরা পালন করতে। তাছাড়া যুদ্ধে হারতে হারতে কুরাইশরা এখন বেশ ক্লান্ত। তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক। কাজেই তারা চাইলে আমরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারি। এতে অন্যদের মতো তারাও আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা পাবে। তবে সেজন্য আমার ও আমার সহযাত্রীদের পথ থেকে তাদের সরে দাঁড়াতে হবে।

---

[১] ইমাম যুহরির সূত্রে ইবনু হিশাম বলেন, 'কুরাইশরা নবিজির আগমনের খবর পেয়ে তাকে প্রতিহত করতে স্ত্রী-সন্তানসহ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং যু-তুওয়া নামক স্থানে অবস্থান করে।'

যু-তুওয়া হারামের সীমানার মধ্যে হুদাইবিয়ারই একটি অংশ। লেখক এখানে কুরাইশদের অবস্থান হুদাইবিয়ায় ছিল বলে মূলত যু-তুওয়াকেই বুঝিয়েছেন। তবে হুদাইবিয়া কূপটির কাছে মুসলিম বাহিনী অবস্থান করে এবং সেখানেই বাইআতে রিজওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫৬; দারুল কুতুবিল আরাবিইয়া, বৈরুত; *মুজামুল বুলদান*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৯; দারুসাদির, বৈরুত]

কিন্তু যুদ্ধই যদি হয়ে থাকে তাদের শেষ ইচ্ছা, তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যাব।'

বুদাইল বলেন, 'আপনার বার্তা আমি তাদের কাছে পৌঁছে দেব।' সে কুরাইশদের কাছে ফিরে এসে বলে, 'আমি মুহাম্মাদের কাছ থেকে এসেছি। তিনি কিছু কথা বলেছেন। তোমরা শুনতে চাইলে আমি বলতে পারি।' কুরাইশের নির্বোধেরা তখন এই বলে খেঁকিয়ে ওঠে, 'তার সূত্রে বা তার সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলার দরকার নেই।' কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা তাদের থামিয়ে দিয়ে বুদাইলকে অনুরোধ করে, 'তুমি যা শুনেছ, আমাদেরকে বলো।' বুদাইল নবিজির কথাগুলো তাদের বুঝিয়ে বলেন। তারা মিকরায ইবনু হাফসকে হুদাইবিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। নবিজি তাকে দেখে মন্তব্য করেন, 'লোকটা চরম বিশ্বাসঘাতক!' তারপরও নবিজি তাকে দূত হিসেবে সমীহ করেন এবং বুদাইল ও তার সঙ্গীদের যে বার্তা দিয়েছিলেন, সেগুলো বলেই তাকে ফেরত পাঠান। সে-ও কুরাইশদের কাছে ফিরে এসে যথারীতি তার বার্তাগুলো পৌঁছে দেয়।

নবিজির কাছে কুরাইশের প্রতিনিধিদল

এই পর্যায়ে এসে কিনানা গোত্রের হুলাইস ইবনু আলকামা বলে, 'অনুমতি দিলে আমি গিয়ে মুহাম্মাদের সাথে কথা বলতে পারি।' তারা বলে, 'ঠিক আছে, যাও।' তখনই সে হুদাইবিয়া প্রান্তরে ছুটে আসে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে তাকে দেখে মন্তব্য করেন, 'এখন অমুক আসছে। সে হাদির পশুকে খুব সম্মান করে। তাই তার আগমন পথে তোমরা সেগুলো দাঁড় করিয়ে রাখো।' সাহাবিরা সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করেন এবং তালবিয়া পাঠ করতে করতে তাকে স্বাগত জানান। এসব দেখে সে বলে ওঠে, 'সুবহানাল্লাহ! এরা তো দেখছি উমরা করতে এসেছে। কুরাইশদের উচিত নয় এদেরকে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দেওয়া।' সেখান থেকেই সে ফিরে আসে এবং কুরাইশ ও তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলে, 'সেখানে আমি হাদির পশু দেখেছি। উমরা শেষে তারা সেগুলো জবাই করবে। সেগুলোর গলায় মালা ঝুলছে। কুঁজ কেটে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই আমি মনে করি, তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।'

এ সময় উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফি বলেন, 'এই লোক খুবই সুন্দর প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে তোমাদের সামনে। তোমরা এটা মেনে নাও। অবশ্য অনুমতি পেলে আমিও একবার তার সাথে দেখা করে আসতে পারি।' লোকেরা বলে, 'ঠিক আছে, যাও।' সে এসে নবিজির সাথে কথা বলে। নবিজি বুদাইলকে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাকেও আবার সেগুলোই বলেন। উরওয়া তখন খানিকটা খেদ নিয়ে বলে, 'আচ্ছা মুহাম্মাদ, বলুন তো, আপনি যদি স্বজাতির লোকদের সমূলে বিনাশ করেন, তবে আপনার আগে আরবের এমন কোনো নেতার ব্যাপারে আপনি জানেন কি, যে তার স্বজাতিকে ধ্বংস করেছে? আর যদি এর বিপরীত হয়, অর্থাৎ স্বজাতির লোকেরা যদি আপনার বিনাশে

ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে আপনার চারপাশে এমন অনেককে দেখতে পাচ্ছি, যারা একমুহূর্ত না ভেবে আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাবে।' এ কথা শুনে আবু বকর উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'যাও এখান থেকে! এরপর তিনি তাকে একটি কটূবাক্য বলেন। তুমি এটা ভাবলে কী করে যে, আমরা তাকে ফেলে পালিয়ে যাব?' উরওয়া জিজ্ঞেস করে, 'এই লোকটা কে?' জবাবে বলা হয়, 'আবু বকর।' পরিচয় পেয়ে সে আবু বকরকে উদ্দেশ্য করে বলে, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার প্রতি তোমার কিছু অনুগ্রহ আছে। নইলে আজ তোমার এ কথার শক্ত একটা জবাব দিয়ে দিতাম!'[১]

এরপর সে আবার নবিজির সাথে কথা বলতে শুরু করে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে বারবার নবিজির দাড়িতে হাত দিচ্ছিল। মুগিরা ইবনু শুবা তখন নবিজির মাথার কাছে দাঁড়ানো। তার হাতে ছিল তরবারি। মাথায় লোহার পাগড়ি। উরওয়া যখনই নবিজির দাড়িতে হাত দিতে যাচ্ছিল, মুগিরা তখনই তরবারি বাঁট দিয়ে তার হাতে আঘাত করে বলছিলেন, 'নবিজির দাড়ি থেকে হাত সরাও।' উরওয়া এতে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এটা আবার কে?' সাহাবিরা বলেন, 'মুগিরা ইবনু শুবা।' অমনি সে বলে ওঠে, 'তুমি তো আস্ত একটা বেইমান! তোমার বেইমানির দায়মুক্তির জন্য আমি কত কী না করেছি?' জাহিলি যুগে মুগিরা তার সঙ্গীদের হত্যা করে তাদের সমস্ত মালামাল আত্মসাৎ করেন।[২] এরপর মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় নবিজি তাকে বলেছিলেন, 'ইসলামে তোমাকে স্বাগতম। তবে যে ধনসম্পদ তুমি ছিনিয়ে এনেছ, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' ওদিকে সম্পর্কের দিক থেকে মুগিরা ছিলেন উরওয়ার ভাতিজা।

নবিজির সাথে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে উরওয়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, সাহাবিরা নবিজির প্রতি কতটা সমব্যথী, বন্ধুসুলভ, শুভাকাঙ্ক্ষী ও আনুগত্যশীল। এরপর মক্কায় ফিরে এসে তার সঙ্গীদের বলতে শুরু করে, 'শোনো ভাইয়েরা, কাইসার-কিসরা-নাজাশিসহ[৩] পৃথিবীর বহু সম্রাটের দরবারে আমি গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কসম,

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৯২৮; *মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক* : ৯৭২০; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] ঘটনাটি ছিল—মুগিরা ইবনু শুবা সাকিফ গোত্রের শাখা গোত্র মালিক গোত্রের ১৩ জনকে হত্যা করে। যারা তার সাথে ব্যাবসায়িক সফরে ছিল। অধিক মদ্যপানে বেহুঁশ হয়ে পড়লে সবাইকে হত্যা করে সে তাদের সমস্ত মাল নিয়ে মদিনায় গিয়ে মুসলিম হয়। পরে সাকিফ গোত্র রক্তপণ দাবি করলে মুগিরার পক্ষে থেকে ১৩ জনেরই রক্তপণ আদায় করে উরওয়া ইবনু মাসউদ আস-সাকাফি। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬০; দারুল কুতুবিল আরাবিইয়া, বৈরুত]

[৩] 'কাইসার' হচ্ছে সে সময়ের রোমের বাদশাহর উপাধি। এ নামেই তাদের সম্বোধন করা হতো। তাদের তখন দুনিয়াজোড়া প্রসিদ্ধি। অপরদিকে 'কিসরা' পারস্য সাম্রাজ্যের বাদশাহর উপাধি। বর্তমান ইরান ছিল সেই সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ড। আর 'নাজাশি' হাবশা বা আফ্রিকার বাদশাহর উপাধি। বর্তমান ইথিওপিয়া ছিল তাদের মূল ভূখণ্ড।

মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাকে যতটা সম্মান করে, কোনো রাজা-বাদশাহকেও আমি ততটা সম্মান পেতে দেখিনি তার প্রজাদের থেকে। সে তো থুতু ফেললেও লোকেরা সেটা লুফে নিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কল্যাণ লাভের আশায় তা চোখে-মুখে মাখে। সে কোনো নির্দেশ দিলে রীতিমতো সবাই প্রতিযোগিতায় নেমে যায় সেটার বাস্তবায়নে। আর যখন ওজু করে, মনে হয়, ওজুর অতিরিক্ত পানিটা ভাগে পাওয়ার জন্য যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে তারা। সে কথা বলা শুরু করলে, সবার আওয়াজ নিচু হয়ে আসে। পিনপতন নীরবতা ছেয়ে ফেলে তাদেরকে। কেউ তার চোখে চোখ রেখে কথা বলে না। তারা এতটাই সম্মান করে যে, পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেও দ্বিধা করে। এমন এক ব্যক্তি যখন ভালো কোনো প্রস্তাব দেয়, তখন সেটা তোমাদের গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।'

কুরাইশ যুবকদের ব্যর্থ চেষ্টা

কুরাইশের যুদ্ধপ্রিয় যুবকরা যখন দেখে, তাদের প্রবীণ লোকগুলো সমঝোতা ও মীমাংসায় আসতে চাইছে, তখন তাদের মাথায় এক দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যেকোনো মূল্যে সন্ধির পথ বন্ধ করে উভয় পক্ষে যুদ্ধের দাবানল জ্বালিয়ে দেবে। এতে তারা পরাজয়ের গ্লানি মেটাবার সুযোগ পাবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৭০-৮০ জন যুবক রাতের আঁধারে তানইম পাহাড় ডিঙিয়ে মুসলিম শিবিরে হামলা করার চেষ্টা করে। কিন্তু টহল দলের প্রধান মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা তাদের সবকটাকে বন্দি করে নবিজির সামনে হাজির করেন। তিনি সন্ধি ও সমঝোতার বিষয়টি সামনে রেখে তাদের সবার অপরাধ ক্ষমা করেন এবং সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে দেন। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনে অবতীর্ণ হয়—

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

মক্কার উপকণ্ঠে তিনিই তোমাদের থেকে তাদের হাত এবং তাদের থেকে তোমাদের হাত দূরে সরিয়ে রেখেছেন—তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।[১]

উসমান ইবনু আফফানের মক্কা গমন

কুরাইশ যুবকদের আক্রমণ-চেষ্টা ব্যর্থ হলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাবেন, কুরাইশদের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে মুসলিমদের এ সফরের উদ্দেশ্য স্পষ্ট

[১] সুরা ফাতহ, আয়াত : ২৪

করা প্রয়োজন। এতে হয়তো যুদ্ধাবস্থার উন্নতি ঘটবে। সে লক্ষ্যে তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, মক্কায় বনু কাবে আমার আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই। এমন পরিস্থিতিতে কুরাইশের লোকজন আমার ওপর চড়াও হলে, কেউ এসে আমার পাশে দাঁড়াবে না! তারচেয়ে বরং উসমান ইবনু আফফানকে পাঠিয়ে দিন। সেখানে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী আছে। তাই আমার বিবেচনায় তিনিই এ কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত।' উমারের পরামর্শমতে নবিজি উসমানকেই কুরাইশদের কাছে দূত হিসেবে পাঠান, যেন তাদের জানানো হয়, 'আমরা এখানে যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি উমরা করতে। উমরা শেষ করেই চলে যাব। আর হ্যাঁ, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে ভুলো না। তাদের সাথে সংলাপ শেষ হলে, মক্কায় অবস্থানরত মুমিন নরনারীদের খবর নেবে। তাদেরকে আসন্ন বিজয়ের সুসংবাদ দেবে। সেইসাথে এটাও জানাবে, শিগগিরই আল্লাহ মক্কার বুকে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন। তখন আর কারও গোপনে ইবাদত করতে হবে না।'

নির্দেশ পেয়ে উসমান মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। বালদাহ নামক স্থানে পৌঁছলে একদল কুরাইশের সাথে তার দেখা হয়। তারা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছ উসমান?' তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসুল এই-এই বার্তা দিয়ে আমাকে কুরাইশদের কাছে পাঠিয়েছেন।' তারা জানায়, 'আমরা এগুলো আগেই জেনেছি। তুমি তোমার কাজ করে যাও।' এ সময় আবান ইবনু সাইদ ইবনিল আস উসমানকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে এবং তার নিজের ঘোড়ায় বসিয়ে তাকে মক্কায় নিয়ে যায়। উসমান যথাসময়ে কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে নবিজির বার্তা পৌঁছে দেন। তারা তাকে বাইতুল্লাহ তাওয়াফের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব নাকচ করে বলেন, 'আল্লাহর রাসুলকে রেখে তার পক্ষে একা তাওয়াফ করা সম্ভব নয়।'

উসমান হত্যার গুজব ও বাইআতে রিজওয়ান

কুরাইশরা উসমানকে আটকে রাখে। তারা হয়তো ভেবেছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে তাদের একটু সময়ের প্রয়োজন। এ সময়ে তারা অভিজ্ঞদের সাথে বিস্তর আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং উসমানকে সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে মুসলিমদের কাছে ফেরত পাঠাবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে তারা যথেষ্ট দেরি করে ফেলে। এতে মুসলিমদের মধ্যে উসমান হত্যার গুজব রটে যায়।

নবিজির কানেও যায় সংবাদটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন, 'উসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা এখান থেকে একচুলও নড়ব না।' এ কথা বলে তিনি সাহাবিদেরকে বাইআতের জন্য আহ্বান করেন। তারা সোৎসাহে এই মর্মে বাইআত করেন যে, কোনো পরিস্থিতিতেই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে না। একদল আবার আমৃত্যু লড়ে যাবেন বলেও অঙ্গীকার করেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আবু সিনান ইবনু আসাদি।

এছাড়া সাহাবি সালামা ইবনুল আকওয়া পরপর তিনবার মৃত্যুর বাইআত করেন। একবার শুরুতে, একবার মাঝখানে, আরেকবার শেষে। সবশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের এক হাত আরেক হাতের ওপর রেখে বলেন, 'এই হাতটা উসমানের পক্ষ থেকে।' এভাবে বাইআত সম্পন্ন হয়। কিছুক্ষণ বাদে উসমান নিজেও সেখানে উপস্থিত হন। নবিজির হাতে হাত রেখে তিনিও বাইআত করেন। জাদ ইবনু কাইস নামের এক মুনাফিক ছাড়া বাকি সবাই এ বাইআতে অংশ নেয়।

নবিজি একটি গাছের নিচে সবার থেকে এ বাইআত নেন। এ সময় উমার তার হাত ধরে রেখেছিলেন। মাথার ওপর নুয়ে পড়া ডালগুলো উঁচিয়ে রেখেছিলেন মাকিল ইবনু ইয়াসার। এ বাইআতকেই বাইআতে রিজওয়ান বলে। এতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন—

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ... ﴿١٨﴾

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার নিকট বাইআত গ্রহণ করেছে।[১]

সন্ধিচুক্তি ও তার ধারাসমূহ

মুহূর্তেই বাইআতের সংবাদ কুরাইশদের কানে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে তারা দ্রুত সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে সুহাইল ইবনু আমরকে নবিজির কাছে পাঠায়। তাকে খুব জোর দিয়ে বলে দেওয়া হয়, মুসলিমদেরকে এ বছর উমরা না করেই ফিরে যেতে হবে, এই মর্মে একটি শর্ত থাকতে হবে সন্ধিচুক্তিতে—যাতে আরবের কেউ বলতে না পারে, মুহাম্মাদ গায়ের জোরে মক্কায় প্রবেশ করেছে। কুরাইশের বার্তা নিয়ে সুহাইল নবিজির কাছে আসে। নবিজি দূর থেকে তাকে দেখে মন্তব্য করেন, 'তোমাদের কাজ এখন সহজ হয়ে যাবে। এই লোককে পাঠানোর অর্থই হচ্ছে কুরাইশরা এখন সন্ধি করতে চায়।

সুহাইল এসে নবিজির সাথে দীর্ঘ বৈঠক করে। এরপর দুজন নিচের শর্তগুলোতে একমত পোষণ করে—

» এ বছর উমরা না করেই ফিরে যেতে হবে। আগামী বছর মুসলিমরা ৩ দিন মক্কায় অবস্থানের অনুমতি পাবে। এ সময় তারা কেবল কোষবদ্ধ তরবারি সঙ্গে রাখতে পারবে। কুরাইশরা কোনো কাজে তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

---

[১] সুরা ফাতহ, আয়াত : ১৮

» উভয় পক্ষ ১০ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি মানতে বাধ্য থাকবে। এ সময় সবাই সবার থেকে নিরাপদ থাকবে। কোনো পক্ষ আক্রান্ত হবে না অন্য পক্ষের দ্বারা।

» এ সময়কালে কোনো ব্যক্তি বা গোত্র মুহাম্মাদ অথবা কুরাইশের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলে, তাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে এবং প্রবেশকারীদেরকে চুক্তিসম্পাদনকারী মূল সম্প্রদায়ের সদস্য বলে গণ্য করা হবে। এমতাবস্থায় প্রবেশকারী ব্যক্তি বা গোত্রের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে, ধরা হবে সেটা মূল সম্প্রদায়ের ওপরই করা হয়েছে।

» অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে কেউ মক্কা থেকে মদিনায় মুহাম্মাদের কাছে পালিয়ে গেলে, তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মদিনা থেকে কেউ মক্কায় পালিয়ে এলে তাকে আর ফেরত দেওয়া হবে না।

চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হলে নবিজি তা লেখার জন্য আলিকে ডেকে পাঠান। তাকে বলেন, 'লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।' সুহাইল তখন বাগড়া দিয়ে বলে, 'রাহমান আবার কে? আমরা তো এ নামে কাউকে চিনি না। তুমি লেখো, বিসমিকা আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, তোমার নামে শুরু করছি।' নবিজি আলিকে তা-ই লিখতে বলেন। তারপর লিখতে বলেন, 'চুক্তিটি সম্পাদিত হচ্ছে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ ও কুরাইশদের মধ্যে...।' সুহাইল এবারও আপত্তি জানিয়ে বলে, 'আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলেই জানতাম, তাহলে তো বাইতুল্লাহয় যেতে বাধাই দিতাম না। যুদ্ধও করতাম না আপনার বিরুদ্ধে। তারচেয়ে বরং লিখতে বলুন, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ও কুরাইশদের মধ্যে...।' নবিজি বলেন, 'তোমরা না মানলেও আমি আল্লাহর রাসুল।' তবে তার দাবি রক্ষার্থে আলিকে 'আল্লাহর রাসুল' কথাটি মুছে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ লেখার নির্দেশ দেন। কিন্তু আলি এমনটা করতে ইতস্তত করতে থাকেন। তখন নবিজি নিজেই সেই কথাগুলো মুছে দেন। এরপর সন্ধির ধারা ও শর্তগুলো লিপিবদ্ধ হয়। সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর বনু খুযাআ এসে নবিজির সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এরা আব্দুল মুত্তালিবের সময় থেকেই বনু হাশিমের মিত্র ছিল। পূর্বে আমরা এ ব্যাপারে আলোকপাত করে এসেছি। চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে তারা পুরোনো সেই সম্পর্ককে আরও জোরদার করে। অপরদিকে বনু বকর মিত্রতা করে কুরাইশের সাথে।[১]

আবু জানদালের প্রত্যর্পণ

চুক্তিপত্র যখন লেখা হচ্ছিল, ঠিক তখনই পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় সুহাইলের পুত্র আবু জানদাল সেখানে এসে উপস্থিত হয়। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে

---

[১] বনু বকর নামটি বকর ইবনু ওয়াইলের প্রতি সম্পৃক্ত। মক্কার নিকটস্থ একটি আদনানি জনগোষ্ঠী এটি।

লোহার বেড়ি বয়েই তিনি পালিয়ে এসেছেন হুদাইবিয়ার প্রান্তরে। তাকে দেখামাত্র সুহাইল বলে ওঠে, 'এই দেখুন, যে শর্তে আমরা সন্ধি করছি, তা কার্যকর করার প্রথম সুযোগ আপনার সামনে উপস্থিত। চুক্তি অনুসারে আপনি তাকে ফিরিয়ে দিন।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এখনো তো চুক্তি সম্পন্নই হয়নি। কাজেই তাকে ফেরানোর প্রশ্নই ওঠে না।' সুহাইল বলে, 'তাহলে আর সন্ধির আলোচনা সামনে এগুবে না।' নবিজি তখন অনুরোধ করে বলেন, 'অন্তত আমার খাতিরে তাকে মুক্ত করে দাও।' সুহাইল উত্তর দেয়, 'আপনার খাতিরেও সেটা সম্ভব নয়।' নবিজি বলেন, 'না, তোমাকে এটা করতেই হবে।' কিন্তু সে এবারও বলে, 'আমি কিছুতেই এমনটা করব না।'

এরপর সুহাইল আবু জানদালের গালে সজোরে এক থাপ্পড় মেরে বসে। ঘাড় ধরে তাকে মুশরিকদের কাছে নিয়ে যেতে থাকে। এ সময় আবু জানদাল চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'ও আমার মুসলিম ভাইয়েরা, তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছ? তারা তো আমাকে দ্বীন পালনে বাধা দেবে।' নবিজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আবু জানদাল, আরেকটু সবুর করো; সাওয়াবের আশা রাখো। শীঘ্রই আল্লাহ তোমার ও মক্কার অপরাপর নির্যাতিত মুসলিমদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। আমরা ইতোমধ্যেই কুরাইশদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। উভয় পক্ষ আল্লাহকে সাক্ষী রেখেছে। এখনই আমরা সেই চুক্তি ভাঙতে পারি না।'

উমার ইবনুল খাত্তাব তখন আবু জানদালের কাছে ছুটে যান। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলতে থাকেন, 'আবু জানদাল! তারা তো মুশরিক। তাদের রক্ত কুকুরের রক্তের মতোই মূল্যহীন।' এ কথা বলার সময় তিনি তরবারির বাঁট বারবার আবু জানদালের দিকে এগিয়ে ধরছিলেন। উমার বলেন, 'আমি আশা করছিলাম, আবু জানদাল আমার হাত থেকে তরবারিটি নিয়ে তার বাবা সুহাইলের ওপর হামলে পড়বে। কিন্তু সে তার বাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে। এতে চুক্তি সম্পাদনকালেই তার একটি শর্ত কার্যকর হয়ে যায়।'

নবিজির মাথা মুণ্ডন এবং পশু কুরবানি

সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে বলেন, 'যাও, কুরবানি করে হালাল হয়ে যাও।' তিনি পরপর তিনবার এ নির্দেশ দিলেও সাহাবিদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। সবাই বসে থাকেন নির্বিকার। এতে নবিজি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে উম্মু সালামার কাছে চলে যান। সন্ধি এবং সন্ধি-পরবর্তী সাহাবিদের আচরণের কথা তাকে খুলে বলেন। তিনি পরামর্শ দেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যদি চান, তারা সবাই এখনই হালাল হোক, তবে কারও সাথে কথা না বলে চুপচাপ গিয়ে আপনার নিজের পশুটি কুরবানি করুন। তারপর একজন নাপিত ডেকে আপনার মাথাটাও মুণ্ডন

করে ফেলুন।' পরামর্শটি নবিজির মনে ধরে। তিনি তাঁবু থেকে বের হয়ে আসেন। কারও সাথে কথা না বলে চুপচাপ তার নিজের পশুটি জবাই করেন। এরপর নাপিত ডেকে মাথা মুড়িয়ে ফেলেন। এসব দেখার পর সাহাবিদের পক্ষে আর নির্বিকার বসে থাকা সম্ভব হয় না। তারাও উঠে গিয়ে যার যার পশু কুরবানি করেন এবং একজন আরেকজনের মাথা কামিয়ে দেন। ভেতরে ভেতরে তারা এতটাই মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, তারা চুল নয় আস্ত কল্লাটাই কেটে ফেলবেন মনের দুঃখে।

সেদিন প্রতিটি উট ও গরু ৭ জনের পক্ষ থেকে কুরবানি করা হয়। মুশরিকদেরকে ক্রুদ্ধ করার জন্য নবিজি আবু জাহলেরও একটি উট কুরবানি করেন। উটটির নাকে ছিল রুপার নোলক। সেদিন যারা মাথা মুণ্ডন করে, নবিজি তাদের জন্য তিন বার আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। আর যারা চুল ছোট করে, তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন একবার।

এ সফরেই আল্লাহ কাব ইবনু উজরার খাতিরে মুহরিমের জন্য 'ফিদয়াতুল আযা'র বিধান অবতীর্ণ করেন। এতে অসুস্থ হাজিদের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। ফিদয়াতুল আযা হচ্ছে, ইহরাম অবস্থায় চর্মরোগজাতীয় জটিল কোনো সমস্যা থাকলে মাথা মুণ্ডন করার পরিবর্তে সিয়াম রাখা, সাদাকা করা অথবা কোনো পশু জবাই করা যাবে।

মুহাজির নারীরা মক্কায় ফিরে যাবে না!

সন্ধিচুক্তির পর বেশ কয়েকজন নারী সাহাবি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। তাদের অভিভাবকরা চুক্তির একটি শর্তের কথা উল্লেখ করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানায়। কিন্তু নবিজি তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেন, চুক্তিপত্রে নারীদের কোনো কথা নেই। সেখানে লেখা আছে, 'আমাদের মধ্য থেকে যদি কোনো পুরুষ মদিনায় যায়, তবে সে আপনার ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকলেও তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে।'[১] আর চুক্তির এই ভাষ্যমতে নারীদের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার চুক্তিটি কার্যকর নয়। কারণ নারীরা কখনোই পুরুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৭৩১; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭৬৫

مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

হে ঈমানদারগণ, মুমিন নারীরা তোমাদের কাছে হিজরত করে এলে, তোমরা একটু যাচাই করে নিয়ো তাদেরকে। আল্লাহই ভালো জানেন তাদের ঈমান সম্পর্কে। তোমাদের যদি বিশ্বাস হয়, তারা মুমিন, তাহলে তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। তারা কাফিরদের জন্য হালাল নয়; কাফিররাও হালাল নয় তাদের জন্য। তবে কাফিররা (মোহর বাবদ) যা ব্যয় করেছে, তা দিয়ে দিয়ো তাদেরকে। পরে মোহর দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করায় তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখো না; তোমরা (মোহর বাবদ) যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নিয়ো (তাদের স্বামীদের থেকে)। একইভাবে, কাফিররা (তাদের ইসলামগ্রহণকারী স্ত্রীদের মোহর বাবদ) যা ব্যয় করেছিল, তাও যেন তারা চেয়ে নেয় (তোমাদের কাছ থেকে)। এটাই তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১]

কোনো নারী হিজরত করে এলে, নবিজি তার ঈমান যাচাই করতেন কুরআনের এই আয়াতটির মাধ্যমে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

হে নবি, মুমিন নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এই বলে বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অপবাদ রটাবে না এবং আপনাকে অমান্য করবে না কোনো সৎকাজে—তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করে নিন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ যথেষ্ট ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

যে এই শর্ত মেনে নিত, নবিজি তাকে বলতেন, তোমার বাইআত নেওয়া হলো। এরপর

[১] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১০

[২] সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ১২

আর তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতেন না।

উপরিউক্ত এই নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মুসলিমরা তাদের কাফির স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন। সেদিন উমার তার দুই স্ত্রীকে তালাক দেন। তাদের একজনকে বিয়ে করেন মুআবিয়া, অপরজনকে বিয়ে করেন সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া।[১]

সন্ধির শর্তে মুসলিমদের বিজয়

পূর্বে আমরা সন্ধির ধারা ও শর্তগুলো উল্লেখ করেছি। গভীর দৃষ্টিতে সেগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এ সন্ধি ছিল মুসলিমদের জন্য বিরাট এক বিজয়। কারণ যে কুরাইশ একসময় জাতি হিসেবে মুসলিমদের স্বীকৃতিই দিতে চায়নি; বরং চেয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে তাদেরকে নির্মূল করতে এবং ইসলামের দাওয়াতকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে, সেই তারাই এখন সন্ধিচুক্তির মধ্য দিয়ে মুসলিমদেরকে একটি শক্তিধর জাতি হিসেবে তাদের পাশের আসনটিতে জায়গা দিচ্ছে।

কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সন্ধিতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে অন্তত সমমানের শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেইসাথে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দুর্বলতার জানান দেওয়া। কুরাইশদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই হয়েছে। তাছাড়া সন্ধির তৃতীয় শর্ত প্রমাণ করে, কুরাইশরা যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিজেদের ঐতিহ্য বলে দাবি করত, মুসলিমদের তোপের মুখে সেটাও তারা বেমালুম ভুলে গেছে। এখন অবস্থা এমনটা হয়েছে, গোটা আরব ইসলামে দীক্ষিত হলেও সে ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বলপ্রয়োগ বা হস্তক্ষেপের চিন্তা তো নেই-ই। অবস্থার এই পরিবর্তন কি জাত্যভিমানে অন্ধ কুরাইশদের জন্য পরাজয় নয়? নয় কি নিরস্ত্র মুসলিমদের জন্য মহান বিজয়?

মুসলিমরা কখনোই সম্পদ উপার্জন, প্রাণহানি, ধ্বংসযজ্ঞ অথবা মানুষকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করার জন্য যুদ্ধ করেনি; তারা যুদ্ধ করেছে কেবলই মানুষের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ চাইলে ঈমান আনতে পারে, আবার কেউ চাইলে কুফরের ওপরও বহাল থাকতে পারে।[২]

এটা প্রত্যেকের মানবিক অধিকার। কেউ চাইলেই এ অধিকার হরণ করতে পারে না। আড়াল হয়ে দাঁড়াতে পারে না ব্যক্তি ও তার পছন্দের মাঝে। সন্ধির মাধ্যমে এ অধিকারটিই অর্জিত হয়েছে, যা হয়তো অনেকগুলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেও অর্জন

---

[১] মুআবিয়া ও সাফওয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ কারণে তারা কাফির নারীদের বিয়ে করেন।

[২] সুরা কাহফ, আয়াত : ২৯

করা সম্ভব হতো না। এ সন্ধির কল্যাণে মুসলিমরা স্বাধীনভাবে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ পায়। বিনা বাধায় দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের আহ্বান। সন্ধি সম্পাদনকালে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার। কিন্তু মাত্র ২ বছরের ব্যবধানে মক্কাবিজয়ের সময় সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১০ হাজারে।

সন্ধির দ্বিতীয় ধারাটিও মুসলিমদের হাতে বিজয় হয়ে ধরা দেয়। কারণ কিছুদিন যেতে না যেতেই কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গ করে। পায়ে পাড়া দিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারাই তোমাদের প্রথমে আক্রমণ করেছে।'[১]

মুসলিমদের তাবৎ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল কুরাইশ ও অপরাপর শত্রুদের আস্ফালন বন্ধ করা, তাদের মধ্য থেকে আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করার বাতিক দূর করা এবং উভয় পক্ষ সম-অধিকারের ভিত্তিতে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। মুসলিমদের অব্যাহত যুদ্ধাভিযান যেখানে এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছিল, সেখানে ১০ বছর মেয়াদের এই সন্ধিচুক্তিটি শতভাগ সফল হয়। এর মধ্য দিয়ে কুরাইশদের আস্ফালন বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার বাতিক দূর হয়ে যায়। সেইসাথে প্রতিষ্ঠিত হয় সম-অধিকার। পরে তারাই যখন শর্ত ভেঙে গায়ে পড়ে যুদ্ধ করে, তখন এটা বুঝতে আর সমস্যা হয় না যে, শর্তটা বাহ্যিকভাবে তাদের অনুকূল থাকলেও বাস্তবে সেটা ছিল তাদের জন্য বিপজ্জনক। সেজন্যই কিছুদিন বাদে তাদের মধ্যে পরাজিত মানসিকতা জেগে ওঠে এবং সেটা ঢাকতে ব্যর্থ হয়ে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

অবশ্য প্রথম শর্তটি বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের জন্য ছিল খুবই অবমাননাকর। কিন্তু তাই বলে এতে কুরাইশদের কোনো সাফল্য ছিল না। তারা মুসলিমদের কেবল সে বছরের মতো বাইতুল্লাহর যিয়ারত থেকে বিরত রাখতে পেরে একটু আত্মতৃপ্তিতে ভুগছিল, এই যা। এটুকু বাদ দিলে, এই শর্তটাও ছিল তাদের জন্য চরম পরাজয়ের। কারণ এর আগে মুসলিমদের জন্য মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই শর্তের পর সেই অসীম সীমা সংকুচিত হয়ে এক বছরে এসে ঠেকে। এখন তারা শুধু এ বছরই বাধা দিতে পারবে। পরবর্তী বছর থেকে মাসজিদুল হারাম থাকবে মুসলিমদের জন্য সদা উন্মুক্ত।

এই পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে এটাই বোঝা যায়, কুরাইশদের দেওয়া ৪টি শর্তের ৩টিই ছিল মুসলিমদের অনুকূলে। বাকি একটি ছিল তাদের নিজেদের অনুকূলে। কিন্তু সেটা ছিল খুবই নগণ্য। এতে আপাতদৃষ্টিতে তাদের কিছুটা লাভ থাকলেও মুসলিমদের কোনো ক্ষতি ছিল না। কারণ একজন মানুষ ইসলামগ্রহণের পর মুরতাদ না হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ত্যাগ করতে পারে না, হিজরত-ভূমি মদিনা ছেড়ে যেতে পারে না

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১৩

এবং কাফিরদের সাথে আপস করতে পারে না। এখন কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং ওপরের কাজগুলো করে বসে, তবে ইসলাম ও মুসলিম সমাজে তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ধর্মত্যাগের অপরাধে ইসলাম তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

কাজেই মৃত কেউ গিয়ে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে যুক্ত হলে, তাতে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কিছু নেই। এদিকে ইঙ্গিত করেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমাদের থেকে কেউ আলাদা হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ নিজ দায়িত্বে তাকে আমাদের থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।'[১]

অবশ্য এ শর্তে মক্কার মুসলিমদের জন্য কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়। তাদের জন্য মদিনায় যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে কী? আল্লাহর জমিন তো আর মক্কার চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়। কুরাইশরা যখন অহর্নিশ মুসলিমদের পেছনে লেগেছিল, তখন হাবশা কি ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য উর্বর ও নিরাপদ ভূমি বলে প্রমাণিত হয়নি? এদিকে ইঙ্গিত করে নবিজি বলেন, 'ইসলামগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে যে আমাদের দলে যোগ দেবে, আল্লাহ তার মুক্তি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবেন।'[২]

এই মূল্যায়ন সামনে রাখলে এ কথা হলফ করেই বলা যায়, হুদাইবিয়ার সন্ধি বাহ্যিক বিচারে কুরাইশদের জন্য সম্মানজনক হলেও বাস্তবে ছিল তাদের ভয়, অস্থিরতা, পরাজিত মানসিকতা ও তাদের পৌত্তলিক-ব্যবস্থার ভঙ্গুরতার প্রমাণ। তারা যেন স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিল, পৌত্তলিক-ব্যবস্থা এখন তার অন্তিম মুহূর্ত পার করছে। সহসাই সেটা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে বেলে মাটির মতো। সেই ভগ্নদশাকে আরও কিছু সময় টিকিয়ে রাখার জন্য এমন একটি চুক্তির ছদ্মাবরণে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না তাদের সামনে। এতকিছুর পরেও নবিজি মক্কায় আশ্রয়গ্রহণকারী কোনো মুসলিমকে ফেরত না চাওয়ার যে শর্ত মেনে নিয়েছিলেন, সেটা একদিক থেকে যেমন হেয়কর, অপরদিক থেকে আবার তার উন্নত আদর্শ ও শক্তিমত্তার ওপর পূর্ণ আস্থার বহিঃপ্রকাশ। তিনি এই শক্তির দিকে তাকিয়েই নিঃশঙ্ক চিত্তে ভেবে নিয়েছিলেন, এ ধরনের শর্তে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতির কোনো কারণ নেই।

নিজের আচরণে অনুতপ্ত উমার

সন্ধির শর্তাবলি কার জন্য কতটা লাভজনক ছিল, সেটা ইতোমধ্যেই আমরা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সেখানে দুটি ব্যাপার এমন ছিল, যে কারণে মুসলিমরা মানসিক কষ্টে

---

[১] *সহিহ মুসলিম*, হুদাইবিয়ার সন্ধি পরিচ্ছেদ : ১৭৮৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪০৪৪

[২] প্রাগুক্ত

মুষড়ে পড়েন—এক. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, বাইতুল্লাহয় গিয়ে তাওয়াফ করবেন। কিন্তু এখন তাওয়াফ না করেই কেন ফিরে যাচ্ছেন? দুই. তিনি তো আল্লাহর রাসুল। সত্যের ধারক। তাছাড়া আল্লাহ নিজেই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমন অবস্থায় কেন তিনি কুরাইশদের চাপ সহ্য করছেন? সন্ধি করতে গিয়ে কেন ছোট করছেন নিজেকে? এই দুটো বিষয় মুসলিমদের মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। নানা প্রশ্ন, সংশয় ও অপমানবোধ জাগিয়ে তুলছে তাদের মধ্যে। এতে তারা সন্ধির সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে চিন্তা করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। আর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উমার ইবনুল খাত্তাবের মধ্যে। তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। নবিজির কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন—

'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি সত্য আর তারা কি মিথ্যার অনুসারী নয়?'

'অবশ্যই।'

'আমাদের শহিদরা কি জান্নাতি আর ওদের নিহতরা কি জাহান্নামি নয়?'

'অবশ্যই।'

'তবে আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করার আগেই কেন আমরা এ ধরনের অবমাননাকর শর্ত মেনে মদিনায় ফিরে যাচ্ছি?'

'শোনো, আমি আল্লাহর রাসুল। তাঁর নির্দেশের বাইরে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। তিনিই আমার সাহায্যকারী। তাই তিনি আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারেন না।'

'আপনি কি আমাদের বলেননি যে, শিগগিরই বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবেন?'

'অবশ্যই। তবে আমি কি এটা বলেছি যে, এ বছরই বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করব?'

'না, তা বলেননি।'

'তবে এটা ভালো করে মনে রাখো, শিগগিরই তুমি আসবে এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে।'

উমার এবার হতাশ হয়ে আবু বকরের কাছে ছুটে যান। নবিজিকে করা প্রশ্নগুলো তাকেও করেন এবং ঘটনাক্রমে তিনিও নবিজির মতো একই উত্তর দেন। শুধু তা-ই নয়, তিনি উমারকে উপদেশ দিয়ে বলেন, যতদিন বেঁচে আছ, চোখ বন্ধ করে তাকে অনুসরণ করো। কারণ তিনি নিঃসন্দেহে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এরই মধ্যে আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার সন্ধির ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন। সেখানে বলেন, 'আমি

তোমাদেরকে দিয়েছি স্পষ্ট বিজয়।'[১] নবিজি তখনই উমারকে ডেকে পাঠান। আয়াতটি তাকে তিলাওয়াত করে শোনান। উমার বিস্মিত হয়ে জানতে চান, 'এটাও কি বিজয়?' নবিজি বলেন, 'হ্যাঁ, এটাই বিজয়।' উত্তর শুনে তার মন শান্তিতে ভরে যায়। তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসেন এবং আগের আচরণের জন্য অনুতপ্ত হন। উমার বলেন, 'হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় নবিজির সাথে আমার যে অনাকাঙ্ক্ষিত বাক্য বিনিময় হয়েছিল, তার কাফফারাস্বরূপ আমি অনেক আমল করেছি। সাদাকা করেছি। সিয়াম রেখেছি। সালাত পড়েছি এবং দাস মুক্ত করে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে আমি এখন কল্যাণের আশাবাদী।'[২]

কুরাইশরা যখন মহাবিপাকে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন। কিছুটা স্বস্তি আসে প্রতিদিনকার যাপিত জীবনে। এরই মধ্যে নতুন এক সমস্যা সৃষ্টি হয়। কাফিরদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আবু বাসির নামের এক মুসলিম মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে আসেন। গোত্র-পরিচয়ে তিনি ছিলেন কুরাইশের মিত্র বনু সাকিফের লোক। খবর পেয়ে কুরাইশ নেতারা তার সন্ধানে দুজন লোক পাঠায়। তারা এসে নবিজির কাছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। শর্ত অনুযায়ী তিনি তাকে আগন্তুকদের হাতে বুঝিয়ে দেন। আগন্তুকরা তাকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা করে। যুল-হুলাইফায় পৌঁছে তারা যাত্রাবিরতি দেয়। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে খেজুর খেতে বসে। এই ফাঁকে আবু বাসির তাদের একজনকে বলেন, 'তোমার তরবারিটা তো দারুণ দেখতে!' প্রশংসা শুনে লোকটার চেহারা ঝলমল করে ওঠে। অমনি সে খাপ থেকে তরবারিটি বের করে বাঁটের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সত্যি এ এক দারুণ তরবারি! আমি বহুবার এর ধার পরীক্ষা করেছি বহু যুদ্ধে।' আবু বাসির গলায় আরেকটু রস ঢেলে বলেন, 'হাতে নিয়ে একবার দেখতে পারলে বড় ভালো লাগত!' প্রশংসায় প্রীত হয়ে সে তরবারিটি তুলে দেয় আবু বাসিরের হাতে। অমনি তিনি প্রচণ্ড এক আঘাতে লোকটিকে দু-ভাগ করে ফেলেন।

অপরজন পালিয়ে মদিনায় চলে আসে। পড়িমরি করে মাসজিদে নববিতে প্রবেশ করে। নবিজি দূর থেকে দেখে বলেন, 'লোকটাকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কোনো কারণে সে খুব ভয় পেয়েছে।' এরই মধ্যে সে হাঁপাতে হাঁপাতে নবিজির কাছে এসে বলে, 'আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে। আমিও হয়তো এখনই মারা পড়ব।' তার কথা

---

[১] সুরা ফাতহ, আয়াত : ১

[২] হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ দেখতে দেখুন, *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৩৯-৪৫৮; *সহিহুল বুখারি* : ২৭৩১, ৩১৮২, ৪৮৪৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০৮-৩২২; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২-১২৭; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ২০৭-৩০৫; *তারিখু উমার ইবনিল খাত্তাব*, ইমাম ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ৩৯-৪০

শেষ হতে না হতেই আবু বাসির সেখানে উপস্থিত হন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে দায়মুক্ত করেছেন। চুক্তি অনুসারে আপনি আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ আমাকে পুনরায় মুক্ত করেছেন।' নবিজি তখন বলেন, 'তার মায়ের কোল খালি হোক! এ তো দেখছি যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে! একে থামানোর কেউ কি নেই?'

আবু বাসির নবিজির শেষ কথাটি শুনে বেশ ঘাবড়ে যান। তিনি ধরেই নেন, এবারও তাকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি মদিনা ত্যাগ করেন এবং সমুদ্র তীরবর্তী একটি এলাকায় অবস্থান নেন। আবু জানদাল ইবনি সুহাইলও মক্কা থেকে পালিয়ে তার সাথে এসে মিলিত হন। তারপর থেকে যে মুসলিমই মক্কার কুরাইশদের হাত থেকে পালিয়ে আসতে পারত, সে-ই এসে যোগ দিত আবু বাসিরের সাথে। এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাদের একটি দল হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে তারা যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন, কুরাইশের সিরিয়াগামী বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো সে পথ দিয়েই যাওয়া-আসা করত। আর এই সুযোগে আবু বাসির তার ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এরপর সবাইকে হত্যা করে মালামাল লুট করত।

কুরাইশরা এতে ভারি বিপদে পড়ে যায়। তারা আল্লাহ তাআলা এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নবিজির কাছে এই বলে দূত পাঠায়—'যারা আমাদের থেকে পালিয়ে আপনার কাছে আসবে, তারা নিরাপদ। তাদেরকে আর আমাদেরকে কাছে পাঠাতে হবে না।' নবিজি এই সুসংবাদ আবু বাসির ও তার সঙ্গীদের কাছে পাঠালে তারা সবাই মদিনায় চলে আসে।[১]

কুরাইশ বীরসেনাদের ইসলামগ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরির শুরুর দিকে আমর ইবনুল আস, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ এবং উসমান ইবনু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা মদিনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, 'মক্কা তার কলিজাগুলো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।'[২]

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] এই সাহাবিগণ কোন বছর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তা নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। রিজাল সম্পর্কিত কিতাবাদিতে অষ্টম হিজরির কথা বলা হয়েছে। তবে বাদশাহ নাজাশির কাছে আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণের ঘটনা প্রসিদ্ধ। আর তা ছিল সপ্তম হিজরির ঘটনা। আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হাবশা থেকে ফেরার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও উসমান ইবনু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ তিনি হাবশা থেকে ফেরার পর মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। তারা উভয়ে পথিমধ্যে তাকে পেয়ে তিনজন মিলে নবিজির কাছে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। অতএব সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তারা সকলেই সপ্তম হিজরির শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয় পর্যায় : ইসলামে নবধারার সূচনা

ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এর আগে কুরাইশরা ছিল আরবের পরাশক্তি। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি সহিংস। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধি তাদের ভরাডুবি এনে দেয়। তারা মুসলিমদেরকে তাদের সমমানের আরব-শক্তি হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এতে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা বন্ধ হয়ে যায়। নিরাপত্তা নেমে আসে গোটা আরবজুড়ে।

অমুসলিমদের যুদ্ধক্ষম শক্তিশালী ৩টি পক্ষ ছিল—কুরাইশ, গাতফান ও ইহুদি। সন্ধির ফলে তাদের সবারই মনোবল ভেঙে যায়। পুরো আরবে মূর্তিপূজারিদের নেতৃত্বে ছিল কুরাইশ। সকল কাজ ও প্রবণতায় এদের দেখেই অনুপ্রাণিত হতো অন্যরা। ফলে এরা পিছু হটার দরুন অন্যরাও হতোদ্যম হয়ে পড়ে খুব সহজেই। এতে ইসলামের প্রতি বৈরিতা নেমে আসে শূন্যের কোটায়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, সন্ধি-পরবর্তী সময়ে বনু গাতফানের তরফ থেকে বড় ধরনের কোনো সমস্যা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়নি। যুদ্ধের পদক্ষেপ নিতেও দেখা যায়নি তাদের কাউকে। বস্তুত বনু গাতফান যা কিছু করেছিল, তার কোনো কিছুই নিজস্ব চিন্তায় তাড়িত হয়ে করেনি; করেছে ইহুদিদের প্ররোচনায়।

অভিশপ্ত ইহুদিদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হলে তারা খাইবারে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে বসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। খাইবার পরিণত হয় ষড়যন্ত্র ও মুসলিম বিদ্বেষের আখড়ায়। তাদের ঝানু শয়তানগুলো বসে বসে সব পাপ কাজের ইন্ধন জোগায়। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল সমাজে তারা অশান্তির আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করে। মদিনার আশপাশে বসবাসরত আরবদের মদিনার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে থাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার মিশনে নামে তারা। এ যাত্রায় শতভাগ সফল না হলেও ইসলামের অপূরণীয়

ক্ষতি করে তবেই তারা ক্ষান্ত হবে বলে স্থির করে। তাদের এসব তৎপরতা নবিজির অগোচরে ছিল না। তাই হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি সর্বপ্রথম তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামের দাওয়াত প্রচারের বিরাট সুযোগ এনে দেয় মুসলিমদেরকে। বিপুল উৎসাহে দাওয়াতি কাজে নেমে পড়েন সবাই। যুদ্ধবিরতির পুরো সময়জুড়ে সামরিক তৎপরতার চেয়েও বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে দাওয়াতি কার্যক্রম। তাই আমরা এ অধ্যায়টি দুটি শিরোনামে আলোচনা করব—এক. দাওয়াতি কার্যক্রম। দুই. সামরিক তৎপরতা।

ইসলাম প্রচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দাওয়াত। ইসলামের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে মুসলিমরা নানাবিধ নিপীড়ন সহ্য করেন। যুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তাদেরকে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে। তাই আমরা প্রথমে দাওয়াতি কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব।

রাজাবাদশাহ ও শাসকগোষ্ঠীর কাছে পত্রপ্রেরণ

ষষ্ঠ হিজরির শেষ দিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসেন। নিরুদ্বেগ সময় পেয়ে তিনি ইসলামের প্রচারকাজে মনোযোগী হন। আশপাশের রাষ্ট্রগুলোর রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। সংগত কারণেই তখন সিলমোহর তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কাজের জন্য তিনি রুপার একটি আংটি তৈরি করেন। তাতে লেখা—মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহ। ৩টি লাইনে ৩টি শব্দ—একটি লাইনে মুহাম্মাদ, একটি লাইনে রাসুল এবং একটি লাইনে আল্লাহ।[১]

পত্র আদান-প্রদানের জন্য নবিজি এমন কয়েকজন বিচক্ষণ সাহাবিকে মনোনীত করেন, যাদের বিভিন্ন রাজ-দরবারে দূত হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আল্লামা মানসুরপুরি দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেন, নবিজি খাইবারের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কিছুদিন আগে দূত মারফত বিভিন্ন দেশে পত্র পাঠিয়েছেন।[২] আমরা সেসব পত্রের ভাষ্য ও সারসংক্ষেপ এখানে তুলে ধরছি—

হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে পত্রপ্রেরণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে হাবশার বাদশাহ ছিলেন আসহামা ইবনু আবজার। ষষ্ঠ হিজরির শেষ দিকে অথবা সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে আমর

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৫, ২৯৩৮, ৫৮৭২, ৫৮৭৫, ৭১৬২

[২] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭১

ইবনু উমাইয়া আজ-জামরিকে দিয়ে নবিজি তার কাছে পত্র পাঠান। ওই পত্রের ভাষ্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম তাবারি ওই পত্রের যে ভাষ্য উল্লেখ করেছেন, তা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, পত্রটি হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে নয়; বরং তার আগে মাক্কি যুগে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া সে পত্রের বাহক আমর নয়; বরং নবিজির চাচাতো ভাই জাফর ইবনু আবি তালিব ছিলেন। মক্কার মুসলিমরা যখন মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, নবিজি তখন হাবশার বাদশাহর উদ্দেশে একটি পত্র লিখে তাদেরকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন। এ পত্রটি মূলত সে সময়কার। পত্রের শেষে মুহাজিরদের ব্যাপারে লেখা ছিল, 'আমি আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফর এবং তার সাথে আরও কয়েকজন মুসলিম পাঠিয়েছি। আপনি তাদেরকে আশ্রয় দেবেন। আতিথেয়তা করবেন। কোনোরকম বল প্রয়োগ করবেন না তাদের ওপর।'

ইমাম বাইহাকি ইবনু ইসহাকের সূত্রে নাজাশির কাছে পাঠানো চিঠির যে ভাষ্য উল্লেখ করেছেন তা এমন—

নবি মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার মহান বাদশাহ আসহামার প্রতি। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস রাখে, সৎ পথে চলে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই; নেই কোনো স্ত্রী-সন্তানও। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। তাই ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, 'হে কিতাবিগণ, এসো, নিজেদের মধ্যে অভিন্ন কিছু বিষয়ে আমরা একমত হই—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না। কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার বানাব না এবং তাঁর পরিবর্তে আমরা কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, তোমরা অন্তত সাক্ষী থাকো যে, আমরা নিশ্চিত মুসলিম।'[১]

জেনে রাখুন, আপনি যদি ইসলামগ্রহণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে স্বজাতির গুনাহের ভার আপনাকেই বহন করতে হবে।'

সম্প্রতি ডক্টর হামিদুল্লাহ ওই পত্রের হস্তলিখিত একটি খসড়া হাতে পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। কেবল একটি শব্দ বাদ দিলে ডক্টর হামিদুল্লাহ ও ইবনুল কাইয়িমের আহরিত পত্রের ভাষ্য হুবহু মিলে যায়। ডক্টর হামিদুল্লাহ বহু গবেষণার পর ওই

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৬৪

ভাষ্যটিকে নাজাশির কাছে পাঠানো চিঠির ভাষ্য বলে প্রমাণ করতে পেরেছেন। তার আহরিত পত্রের ভাষ্য ছিল এমন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশার মহান বাদশাহ নাজাশির প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসারী আল্লাহ তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

পর সমাচার, আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি পবিত্র। তিনি শান্তির বিধানদাতা। নিরাপত্তা প্রদানকারী। সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈসা ইবনু মারইয়াম আল্লাহর রুহ ও তাঁর কালিমা। আমি আপনাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি; যিনি এক, যাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর আনুগত্যে পরস্পরের সহযোগিতা কামনা করছি। আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রতি ঈমান আনুন। আমি আল্লাহর রাসুল। আমি আপনাকে ও আপনার সৈন্যবাহিনীকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। আল্লাহ আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করছি। তাই আমার অনুরোধ ও উপদেশ গ্রহণ করুন। যে হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করেন।[১]

ডক্টর হামিদুল্লাহ খুব দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পত্রটি নাজাশির কাছে পাঠিয়েছেন।' এখানে মূলত দুটি বিষয়। এক. হুবহু এই পত্রটিই আল্লাহর রাসুলের কি না। দুই. পত্রটি হুদাইবিয়ার পরে পাঠানো হয়েছে কি না।

পত্রের ভাষ্য, বিষয়বস্তু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে, এটুকু বোঝা যায়, পত্রটি নবিজির পক্ষ থেকেই পাঠানো। তবে এখানে এ বিষয়ক কোনো প্রমাণ নেই যে, পত্রটি হুদাইবিয়ার সন্ধির পরেই পাঠানো হয়েছে।

ইমাম বাইহাকি ইবনু ইসহাকের সূত্রে যে পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটাও হুদাইবিয়ার সন্ধি-পরবর্তী চিঠিপত্রের সাথে বেশ মিলে যায়। কারণ অন্যান্য পত্রের মতো সেখানেও সুরা আলি-ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াত ও আসহামার নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে ডক্টর হামিদুল্লাহর উল্লেখিত পত্রে এ দুটি বিষয় অনুপস্থিত। তাই আমার বিচারে ডক্টর হামিদুল্লাহ কর্তৃক উদ্ধৃত চিঠিটি নবিজি আসহামার মৃত্যুর পর

---

[১] *রাসুলে আকরাম কি সিয়াসি যিন্দেগি*, পৃষ্ঠা : ১০৮-১০৯ ও ১২২-১২৫; *যাদুল মাআদ* গ্রন্থের শেষ বাক্য হলো শান্তি বর্ষিত হোক ঐ ব্যক্তির ওপর যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬০

তার স্থলাভিষিক্ত শাসকের কাছে পাঠিয়েছেন এবং সেজন্যই ওই চিঠিতে বাদশাহর মূল নামটা বাদ পড়েছে।

অবশ্য আমার এই বিচারের পেছনেও অকাট্য কোনো প্রমাণ নেই। চিঠিগুলোর ভাষ্য, বিষয়বস্তু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে এটা অনুমান করছি কেবল। তবে ডক্টর হামিদুল্লাহর এ বক্তব্য খুবই বিস্ময়কর যে, ইমাম বাইহাকি ইবনু আব্বাসের সূত্রে যে পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি নাকি আসহামার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্তদের কাছে লেখা হয়েছে; অথচ সেখানে স্পষ্টভাবে আসহামার নাম উল্লেখ আছে। প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন।[১]

যাইহোক, আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরি নবিজির পত্র নিয়ে নাজাশির কাছে পৌঁছান। পত্রটি হাতে পেয়ে বাদশাহ সসম্মানে সেটি চোখে লাগান। ভক্তিভরে চুমু খান। সিংহাসন থেকে নেমে আসেন এবং জাফর ইবনু আবি তালিবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। নাজাশি তার অনুভূতি জানিয়ে নবিজির কাছে ফিরতি পত্রে লেখেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাদশাহ আসহামা নাজাশির পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের প্রতি। হে আল্লাহর নবি! আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, করুণা ও কল্যাণধারা বর্ষিত হোক। তিনি ছাড়া আমাদের আর কোনো রব নেই।

পর সমাচার, আমার কাছে আপনার পত্রটি পৌঁছেছে। হে আল্লাহর রাসুল, সেখানে আপনি ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ এনেছেন। আসমান-জমিনের রবের শপথ, ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আপনি যা উল্লেখ করেছেন, তিনি ঠিক তেমনই; তার বেশি নন। আপনার পাঠানো বার্তা সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই অবগত। আমি আপনার চাচাতো ভাই ও তার সঙ্গী-সাথিদের আতিথেয়তা করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল। সত্য নবি। সত্যায়িত নবি। আমি আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করছি। এর আগে আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছেও বাইআত গ্রহণ করেছি এবং বিশ্ব-পালনকর্তার আনুগত্যের শপথ নিয়েছি।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহামাকে এ কথাও লিখেছিলেন—তিনি যেন হাবশায় হিজরতকারী জাফর ও তার সঙ্গী-সাথিদের পাঠিয়ে দেন। কথামতো আসহামা দুটি জাহাজে করে আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরির সাথে মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন।

---

[১] *রাসুলে আকরাম কি সিয়াসি যিন্দেগি*, ডক্টর হামিদুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১০৮-১১৪, ১২১-১৩১

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬১

নবিজি খাইবারে অভিযান পরিচালনাকালে তারা এসে তার সাথে মিলিত হয়।[১]

তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরির রজব মাসে আসহামা মৃত্যুবরণ করেন। নবিজি সবাইকে তার মৃত্যুর সংবাদ দেন এবং তার জন্য গায়েবানা জানাযার সালাত আদায় করেন। তার মৃত্যুর পর নবিজি তার স্থলাভিষিক্তের কাছেও চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠি পেয়ে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল কি না, ইতিহাস ঘেঁটে এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।[২]

সম্রাট মুকাওকিসের কাছে নবিজির চিঠি

মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন সম্রাট ছিলেন জুরাইজ ইবনু মাত্তা।[৩] তার উপাধি ছিল মুকাওকিস। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছেও একটি পত্র প্রেরণ করেন। সে পত্রের ভাষ্য ছিল এমন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কিবত সম্প্রদায়ের মহান সম্রাট মুকাওকিসের প্রতি। যারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

পর সমাচার, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনার গুনাহ তো বটেই, কিবত সম্প্রদায়ের গুনাহের ভারও আপনার ওপর চড়াও হবে। 'হে কিতাবিগণ, চলো, নিজেদের মধ্যে অভিন্ন কিছু বিষয়ে আমরা একমত হই—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না। কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার বানাব না এবং তাঁর পরিবর্তে আমরা কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, তোমরা অন্তত সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।'[৪]

পত্রটি বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয় হাতিব ইবনু আবি বালতাআকে। তিনি মুকাওকিসের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আপনার পূর্বে এমন অনেকে গত হয়েছে, যারা নিজেদেরকে রব দাবি করত। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের শাস্তি দিয়েছেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫৯

[২] এ কথা *মুসলিমের* বর্ণনা থেকেও নেওয়া যায়। যা তিনি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন—*সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৯।

[৩] *রাসুলে আকরাম কি সিয়াসি যিন্দেগি*, পৃষ্ঠা : ১৪১; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, আল্লামা মানসুরপুরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৮; তবে ডক্টর হামিদুল্লাহ তার নাম বিনইয়ামিন উল্লেখ করেছেন।

[৪] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৬৪

সেইসাথে তাদেরকে শিক্ষার মাধ্যম বানিয়েছেন গোটা মানবজাতির জন্য। আল্লাহ তাদের দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নিয়েছেন। পরে আবার চরম শাস্তি দিয়েছেন তাদেরকে। তাই পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন এবং নিজেকে করে তুলুন শিক্ষার মাধ্যম।'

মুকাওকিস বলেন, 'আমাদের একটি ধর্ম আছে। সে ধর্মের চেয়ে উত্তম কিছু পাওয়া অবধি আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারি না।' হাতিব বলেন, 'আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। মহান আল্লাহ এ ধর্মকে পূর্ণতা দিয়েছেন। সকল ধর্মের ওপর একে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর নবি মুহাম্মাদ মানুষদেরকে এ শান্তির ধর্মেরই দাওয়াত দিচ্ছেন। কিন্তু কুরাইশরা তার বিরোধিতা করছে। শত্রুতায় মেতে উঠেছে ইহুদিরা। নমনীয় ও সহমর্মী পাওয়া যাচ্ছে কেবল খ্রিষ্টানদেরকে। আমার জীবনের শপথ! মুসা আলাইহিস সালাম ঈসা সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। অনুরূপ ঈসা আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে সুসংবাদ দিয়েছেন, সেটাও বাস্তব রূপ পেয়েছে। আপনারা যেমন মানুষদেরকে ইঞ্জিলের প্রতি আহ্বান করেন, আমরাও ঠিক তেমনি কুরআনের প্রতি আহ্বান করি। যখন যে নবির আবির্ভাব ঘটে, তখনকার মানুষজন তারই উম্মত বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং বর্তমান নবি মুহাম্মাদের অনুসরণ করা আপনাদের অবশ্য কর্তব্য। আপনি সত্যি বড় ভাগ্যবান। আপনি বেঁচে থাকতেই একজন নবি পেয়েছেন। আমরা আপনাকে ঈসা মাসিহর দ্বীন থেকে বিমুখ হতে বলছি না। আমরা আপনাকে আহ্বান করছি এর সম্পূরক দ্বীনের প্রতি।'

মুকাওকিস বলেন, 'আমি তোমার নবির ব্যাপারে ভেবে দেখেছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, তিনি কোনো মন্দ কাজের আদেশ করেন না। ভালো কাজ করতে নিষেধ করেন না। তাছাড়া তিনি পথভ্রষ্ট জাদুকর অথবা ধূর্ত মুনি-ঋষিও নন। এক কথায়, আমি তার মধ্যে নবুয়তের নিদর্শন পেয়েছি। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ দেন। তবে তার ব্যাপারে আমাকে আরেকটু ভাবতে হবে।'

এ কথা বলে মুকাওকিস পত্রটি হাতির দাঁতের তৈরি একটি বাক্সে সযত্নে তুলে রাখেন। তারপর তার ওপর সিলমোহর করে এক বাঁদিকে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেন এবং পত্রলেখক দিয়ে নবিজির উদ্দেশে লিখেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কিবত সম্প্রদায়ের মহান সম্রাট মুকাওকিসের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহর প্রতি। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পর কথা, আপনার পত্রটি পড়ার সুযোগ হয়েছে। পত্রের প্রতিটি কথা আমি গভীরভাবে অনুধাবন করেছি। আপনি যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেছেন, সেটা

বুঝতেও অসুবিধে হয়নি। আমি আগে থেকেই জানতাম, একজন নবি আসবেন। ধারণা ছিল তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের যথাযথ সম্মান করেছি। আপনার জন্য দুজন দাসী উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছি। কিবত সম্প্রদায়ের কাছে এদের মর্যাদা অনেক বেশি। সাথে কিছু কাপড়চোপড়ও পাঠাচ্ছি। সাথে আরেকটি খচ্চর দিচ্ছি আপনার আরোহণের জন্য। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

মুকাওকিসের পত্রে এটুকুই ছিল। সেখানে তার ইসলামগ্রহণের কথাও ছিল না। যে দুজন বাঁদি সে পাঠিয়েছিল, তাদের একজনের নাম মারিয়া। অপরজনের নাম সিরিন আর খচ্চরের নাম দুলদুল। খচ্চরটি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল।[১] নবিজি মারিয়াকে নিজের কাছে রেখে দেন। তার থেকেই নবি-পুত্র ইবরাহিম জন্মগ্রহণ করেন। সিরিনকে দিয়ে দেন হাসসান ইবনু সাবিতের দায়িত্বে।

পারস্যসম্রাট কিসরার কাছে পত্রপ্রেরণ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্যসম্রাট কিসরার কাছেও একটি পত্র পাঠান। সেটির ভাষ্য ছিল এমন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যসম্রাট কিসরার সমীপে। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে এবং এই সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল—তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আমাকে পাঠানো হয়েছে জীবিতদের সতর্ক করার জন্য। যারা সতর্ক হবে, তারা বেঁচে যাবে। আর যারা অবাধ্য হবে, তাদের ওপর নেমে আসবে শাস্তি। ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। আর যদি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে মনে রাখবেন, আপনার নিজের পাপ তো বটেই, অগ্নিপূজারিদের পাপের ভারও আপনাকেই বহন করতে হবে।

এ পত্রটি নিয়ে যান আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফা সাহমি। তিনি এটা হস্তান্তর করেন বাহরাইনের গভর্নরের কাছে। গভর্নর তার এক কর্মচারী অথবা আব্দুল্লাহ সাহমির মাধ্যমেই পত্রটি সম্রাটের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পর সম্রাটের দরবারে পত্রটি পৌঁছে যায়। পত্রটি পড়া শেষ হতে না হতেই সম্রাট সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬১

এরপর অহংকারের সুরে বলতে থাকে, 'কত বড় স্পর্ধা! আমার তুচ্ছ এক গোলাম, তার নাম আমার নামের আগে লিখেছে!

নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুবই কষ্ট পান এবং বলেন, 'আল্লাহ তার রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দেবেন।' পরবর্তীকালে নবিজির এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়।

এদিকে পারস্যসম্রাট পত্রের মাধ্যমে ইয়েমেনের শাসনকর্তা বাযানকে নির্দেশ করেন—'এক্ষুনি দুজন লোক পাঠিয়ে হিজাযের সেই উদ্ধত লোকটাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।' নির্দেশমতো বাযান একটি চিঠি দিয়ে দুজন লোককে হিজাযে পাঠান। সেই চিঠিতে নবিজিকে কিসরার কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তারা মদিনায় আসে। নবিজি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের একজন বলে, 'আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের রাজাধিরাজ পারস্যসম্রাট ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ করেছেন। আর তাই আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। লোকটি এরপর চড়া গলায় আরও কিছু কথা বলে। নবিজি পরের দিন পুনরায় সাক্ষাতের কথা বলে বৈঠক সমাপ্ত করেন।

এরই মধ্যে একযুদ্ধে সম্রাট কাইসারের সৈন্যদলের সামনে কিসরার বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এরই জেরে কিসরার রাজপ্রাসাদে ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় কিসরার পুত্র শেরওয়াহ। সে-ই তার বাবাকে হত্যা করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে। এ ঘটনা ঘটে সপ্তম হিজরির জুমাদাল উলা মাসের মঙ্গলবার রাতে। ওহির মাধ্যমে নবিজিকে এ সংবাদটি জানানো হয়।

পরদিন কিসরার দূত এলে তিনি তাদেরকে কিসরার মৃত্যু-সংবাদ শোনান। তারা বলে, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন, আপনি কী বলছেন? আমরা আপনার সাধারণ কথাবার্তাও অপরাধ হিসেবে গণ্য করি। আর এটা তো রীতিমতো দণ্ডনীয় অপরাধ। আপনার কথা কি আমরা লিখে রাখব? আমাদের সম্রাটকে জানাব? নবিজি বলেন, 'হ্যাঁ, লিখে রাখো। আমার এসব কথা তাদের কানে পৌঁছে দিয়ো। তাদেরকে বোলো, শীঘ্রই আমার দ্বীন ও প্রভাব-কর্তৃত্ব পারস্যে পৌঁছে যাবে। শুধু তা-ই নয়, স্থলসীমান্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আমার দ্বীন। তাদেরকে আরও বলবে, তারা যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করে, তবে বর্তমানে যা কিছু তাদের অধীনে আছে, সেগুলো তাদেরই থাকবে। তাদেরকেই বহাল রাখা হবে স্বজাতির শাসক হিসেবে।'

বৈঠক শেষে আগন্তুকরা মদিনা ত্যাগ করে। তারা বাযানের কাছে এসে আদ্যোপান্ত সব বলতে শুরু করে। ততক্ষণে 'শেরওয়াহর হাতে কিসরা-হত্যা'র চিঠিটিও তাদের দরবারে এসে পৌঁছে। চিঠিতে লেখা, 'আমার বাবা যে লোকটিকে ধরে নিয়ে আসার

কথা বলেছিল, তার বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখো। আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ তাকে বিরক্ত করবে না।'

এটাই ছিল বাযান, তার সহকর্মী ও অধীনে থাকা লোকদের ইসলামগ্রহণের প্রধান কারণ।[১]

রোমসম্রাট কাইসারের প্রতি

ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ দীর্ঘ একটি হাদিসে রোমসম্রাট হিরাকলের[২] কাছে পাঠানো চিঠির কথা বর্ণনা করেন এভাবে[৩]—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমসম্রাট কাইসারের প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকুন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দুটি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে আপনার প্রজাদের পাপও জুটবে আপনার ভাগ্যে। 'হে কিতাবিগণ, এসো, নিজেদের মধ্যে অভিন্ন কিছু বিষয়ে আমরা একমত হই—আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না। কোনো কিছুকে তাঁর অংশীদার বানাব না এবং তাঁর পরিবর্তে আমরা কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করব না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, তোমরা অন্তত সাক্ষী থাকো যে, আমরা নিশ্চিত মুসলিম।'[৪]

পত্রটি পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় দিহইয়া ইবনু খলিফা আল-কালবিকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, তুমি আপাতত বসরার গভর্নর পর্যন্ত চিঠিটি পৌঁছে দেবে। পরে সে পৌঁছে দেবে কাইসারের হাতে। ইমাম বুখারি ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব বলেন, 'হিরাকল কুরাইশের এক কাফেলার সাথে আমাকেও রাজপ্রাসাদে ডেকে পাঠায়। আমি তখন বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ায় অবস্থান করছি। মক্কার কুরাইশ ও মুহাম্মাদের মধ্যে সন্ধি চলছে। ডাক

---

[১] *মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল-ইসলামিইয়া*, খুজারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৭; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১২৭, ১২৮

[২] কাইসার হচ্ছে রোমসম্রাটের উপাধি। সে সময় কাইসার পদে নিয়োজিত ছিল ফ্লাভিয়াস অগাস্টাস হারকিলিস। আরববিশ্বের লোকেরা তার নাম দিয়েছে হিরাকল। সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের কারণে সে তার উপাধির তুলনায় নিজের নামেই অধিক পরিচিত।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৭

[৪] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৬৪

পেয়ে আমি কাফেলা-সহ বাইতুল মাকদিসে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হই। সম্রাটের চারপাশে মন্ত্রিপরিষদ উপবিষ্ট। সম্রাট একজন দোভাষীকে ডেকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, যে লোক নবি দাবি করছে, এখানে কি তার বংশীয় কোনো নিকটাত্মীয় আছে? আবু সুফিয়ান বলে, আমি আছি। বংশীয়ভাবে আমি তার নিকট আত্মীয়। সম্রাট বলে, তাকে সামনে নিয়ে এসো। তার সঙ্গী-সাথিদেরও কাছে এনে তার পেছনে বসিয়ে দাও। এরপর সম্রাট সবাইকে লক্ষ্য করে বলে, আমি ওই ব্যক্তি সম্পর্কে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। সে মিথ্যে বললে, তোমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আবু সুফিয়ান বলে, আমার মনে যদি এই ভয় না থাকত যে, এখন আমি মিথ্যা বললে, পরে উপস্থিত লোকজন আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে, তাহলে অবশ্যই আমি তার ব্যাপারে মিথ্যে বলতাম।

সম্রাট : সর্বপ্রথম আমি তোমার কাছে জানতে চাইব, তোমাদের মাঝে তার বংশমর্যাদা কেমন?

আবু সুফিয়ান : তিনি খুবই সম্ভ্রান্ত। বংশমর্যাদায় অনন্য।

সম্রাট : তার আগে তার বংশের কেউ এমন দাবি করেছে?

আবু সুফিয়ান : না।

সম্রাট : তার পূর্বপুরুষদের কেউ রাজাবাদশাহ ছিল?

আবু সুফিয়ান : না।

সম্রাট : তার অনুসারী কারা—সমাজের উচ্চপদস্থ লোকজন নাকি দুর্বল ও অসহায় লোকেরা?

আবু সুফিয়ান : দুর্বল ও অসহায় লোকেরা।

সম্রাট : তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমছে না বাড়ছে?

আবু সুফিয়ান : বাড়ছে।

সম্রাট : তার দ্বীনে প্রবেশ করার পর কঠোরতার কারণে কেউ কি সেই দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে?

আবু সুফিয়ান : না।

সম্রাট : সে এই দাবি করার আগে তোমরা কি কখনো তাকে মিথ্যা বলতে দেখেছ?

আবু সুফিয়ান : না।

সম্রাট : সে কি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?

আবু সুফিয়ান : না। তবে এখন আমরা তার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ। জানি না সে এখন কী করবে? [আবু সুফিয়ানের ভাষ্যমতে, সেদিন তিনি নবিজির ব্যাপারে এই একটিমাত্র কথা ছাড়া আর কোনো সংশয়মূলক কথা বলার সুযোগ পাননি।]

সম্রাট : তার সাথে কি তোমাদের যুদ্ধ হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : হ্যাঁ।

সম্রাট : যুদ্ধের ফলাফল কী?

আবু সুফিয়ান : কখনো আমরা জয়ী হয়েছি; আবার কখনো সে।

সম্রাট : সে কীসের আদেশ করে?

আবু সুফিয়ান : সে বলে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। তোমাদের পূর্বপুরুষদের মতাদর্শ ত্যাগ করো। এছাড়াও সে সালাত পড়ার এবং সত্য বলার আদেশ করে। সেইসাথে আদেশ করে গুনাহমুক্ত জীবনযাপন এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে।

সম্রাট তখন দোভাষীকে বলতে বলে, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি তার বংশমর্যাদা কেমন? তুমি বলেছ, তোমাদের মধ্যে সে বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। জেনে রাখো! যারা স্বজাতির কাছে নবি হিসেবে প্রেরিত হন, তাদের মর্যাদা এমনই।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তার গোত্রের কেউ কি আগে কখনো এমন দাবি করেছিল? তুমি বলেছ, না। যদি কেউ এমন দাবি করত, তাহলে বলতাম, সে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা করছে।

তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তার পূর্বপুরুষদের কেউ রাজাবাদশাহ ছিল কি না। তুমি বলেছ, না। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনো রাজাবাদশাহ থাকলে বলতাম, সে-ও তার পূর্বপুরুষদের মতো রাজত্ব-প্রত্যাশী।

তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, এই দাবি করার আগে সে কি কখনো মিথ্যা বলেছে? তুমি বলেছ, না। আমি ভালোভাবেই জানি, যে লোক মানুষের সাথে মিথ্যা বলতে পারে না, সে আল্লাহ সম্পর্কেও কখনো মিথ্যা বলবে না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, বিত্তবান লোকেরা তার অনুসরণ করে নাকি অসহায় দরিদ্ররা? তুমি বলেছ, অসহায় দরিদ্ররা। দরিদ্র লোকেরাই মূলত নবি-রাসুলদের অনুসরণ করে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করেছি, তাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। ঈমান এমনই হয়ে থাকে। পূর্ণতায় পৌঁছার আগপর্যন্ত তা বাড়তেই থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করেছি, তার দ্বীনের কঠোরতার কারণে কেউ কি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? তুমি বলেছ, না। ঈমান এমনই। মুহূর্তে মিশে যায় অন্তরের পরতে পরতে।

আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি তোমাদের কোন কাজের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করতে নিষেধ করেন। এছাড়া মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকতে বলেন। সেইসাথে আদেশ করেন সালাত, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার। তোমার এসব কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, জেনে রাখো, আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গার মালিকও তিনি হবেন।

আমি জানতাম, একজন নবি আসবেন। তবে আমার এটা জানা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। আমি তার সাক্ষাৎ পাব বলে মনে হলে, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার কাছে পৌঁছার চেষ্টা করতাম এবং দু-হাতে ধুয়ে দিতাম তার পা।'

এ কথা বলে তিনি নবিজির পত্র পাঠ করতে বলেন। পত্রপাঠ শেষ হতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় দরবারজুড়ে। তখন আমাদেরকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবু সুফিয়ান বের হতে হতে সাথিদের বলে, আবু কাবশার[১] ছেলের গ্রহণযোগ্যতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। বনু আসফারের[২] সম্রাটও আজ তাকে সমীহ করছে। আমি তখন থেকে নিশ্চিত ছিলাম, তিনি যে আল্লাহর রাসুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবেন। পরে তো আল্লাহ আমাকেও ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেন।[৩]

আবু সুফিয়ানের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রোমসম্রাট কাইসারের ওপর এ পত্রের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। সেজন্যই তিনি নবিজির দূত দিহইয়া ইবনু খলিফা আল-কালবিকে ধনদৌলত ও মূল্যবান পোশাক-সামগ্রী দিয়ে পুরস্কৃত করেন। কিন্তু মদিনা ফেরার পথে হাসমা নামক এলাকায় জুযাম গোত্রের একদল ডাকাত তার ওপর আক্রমণ করে। তারা

---

[১] ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু কাবশার ছেলে বলতে আবু সুফিয়ান এখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝিয়েছে। কারণ ইবনু আবি কাবশা ছিল এমন ব্যক্তি, যে জাহিলি যুগে কোনো দেবদেবীর পূজা করত না এবং সে পালন করত সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ধর্ম। নবিজিও যেহেতু কোনো ধরনের মূর্তিপূজা করেন না; বরং এমন এক ধর্ম পালন করেন, যা সমগ্র আরবে নতুন; তাই আবু সুফিয়ান নবিজিকে এই নামে সম্বোধন করেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, নবিজির দুধমাতা হালিমার স্বামীর উপনাম আবু কাবশা হওয়ায় আবু সুফিয়ান এই নামে সম্বোধন করেছে। [*আল-মিনহাজ*, ইমাম নববি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১১০-১১১]

[২] রোম-সম্রাটকে 'বনুল আসফারের সম্রাট' বলার কারণ হাবশিরা একসময় রোমানদের একটি ভূমি দখল করে নিয়েছিল। হাবশিদের দ্বারা সেখানকার মেয়েরা গর্ভবতী হয় এবং জন্ম দেয় এমন শিশুদের, যাদের গায়ের রং অনেকটা হলুদ বর্ণের। আসফার অর্থ হলুদ বর্ণ। রোমানদের সাদা আর হাবশিদের কালো রং মিলে এই হলুদ বর্ণের শিশুদের জন্ম হয়েছিল। এরপর থেকে আরবরা রোমানদের তাচ্ছিল্য করতে এই নামে সম্বোধন করত। [*আল-মিনহাজ*, ইমাম নববি, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১১০-১১১]

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৩

সম্রাটের দেওয়া উপঢৌকন ছিনিয়ে নেয়। মদিনায় পৌঁছে তাই নিজের ঘরে না গিয়ে তিনি নবিজির সাথে দেখা করেন। সফর ও পথের দুর্ঘটনার কথা তাকে খুলে বলেন। নবিজি তখনই যাইদ ইবনুল হারিসাকে ৫০০ সৈন্য দিয়ে হাসমা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। হাসমা হলো ওয়াদিল কুরার পেছনের একটি অঞ্চল। কুরায় অর্ধশত সৈন্য নিয়ে অবস্থান নেন যাইদ ওয়াদিল। যাইদ ইবনুল হারিসা রাত্রিবেলা ওদের ওপর অতর্কিত হামলা করেন। এতে অনেকেই নিহত হয়। গনিমত হিসেবে হাতে আসে অগণিত গবাদি পশু। নারী-শিশুদেরও অনেকে বন্দি হয়। গবাদি পশুর মধ্যে ছিল ১ হাজার উট আর ৫ হাজার বকরি। নারী-শিশুদের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন।

বনু জুযাম ও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি ছিল। মুসলিমদের আক্রমণের ঘটনায় তাই বনু জুযামের সর্দার যাইদ ইবনু রিফাআ ছুটে আসেন নবিজির কাছে। এসে আক্রমণের প্রতিবাদ জানান। অল্পকিছু দিন আগে তিনি ও তার গোত্রের বেশ কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। ডাকাতির সময় তারা দিহইয়াকে সাহায্যও করেছিলেন। নবিজি তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গবাদি পশু ও বন্দিদের ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

অধিকাংশ মাগাযি-বিশেষজ্ঞের মতে, এ যুদ্ধটি হুদাইবিয়ার আগে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিচারে তাদের এ মত সম্পূর্ণ ভুল। কারণ নবিজি রোমসম্রাটের কাছে পত্র পাঠান হুদাইবিয়ার পর। ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, হুদাইবিয়ার পরে পত্রটি পাঠানো হয়।'[১]

নবিজির পত্র মুনজির ইবনু সাবির দরবারে

মুনজির ইবনু সাবির ছিলেন বাহরাইনের শাসক। তার কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পত্র পাঠান। পত্রটি নিয়ে যান আলা ইবনু হাযরামি। মুনজির নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের উত্তরে লেখেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, বাহরাইনবাসীদের উদ্দেশে পাঠানো আপনার পত্রটি পেয়েছি। এখানকার অনেকেই ইসলাম পছন্দ করে। ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণও করেছে কেউ কেউ। তবে ইসলাম অপছন্দ করা লোকের সংখ্যাও খুব কম নয়। আমার এখানে অগ্নিপূজারি ও ইহুদিদের বসবাস বেশি। কাজেই এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের বিষয়টি আপনার হাতে ন্যস্ত করছি।' উত্তরে নবিজি লেখেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুনজির ইবনু সাবির প্রতি। আল্লাহ আপনার প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। সমস্ত প্রশংসা ওই মহান সত্তার, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২; *হাশিয়াতু তালকিহি ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ২৯

নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বান্দা। আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। যে অন্যের প্রতি সৌজন্য দেখায়, সে মূলত নিজেকেই সৌজন্য লাভের উপযুক্ত বানায়। তাই যে আমার দূতের অনুসরণ করবে এবং তার নির্দেশ মেনে চলবে, সে আমারই আনুগত্য করছে বলে গণ্য হবে। একইভাবে, যে আমার দূতের প্রতি কল্যাণকামী হবে, সে আমারও কল্যাণকামী হিসেবে বিবেচিত হবে। আমার দূত আপনার ব্যাপারে প্রশংসা করেছে। আপনার জাতির ব্যাপারে আপনার সুপারিশ গ্রহণ করলাম। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন। আর যারা অপরাধী, তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনিও তাদের ক্ষমা করে দিন। যতদিন আপনি সত্য ও সুন্দরের পথে থাকবেন, ততদিন আপনাকে আপনার পদ থেকে সরানো হবে না। অবশ্য ইহুদি ও অগ্নিপূজারিদের ওপর জিযিয়া কর আরোপিত হবে।[১]

হাওযা ইবনু আলির সমীপে

ইয়ামামার[২] শাসক হাওযা ইবনু আলির কাছে পাঠানো এক চিঠিতে নবিজি বলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। জেনে রাখুন! আমার এই দ্বীন স্থলভাগের শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ইসলাম বিজয়ী হবে। তাই ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকুন। ইসলাম গ্রহণ করলে এখন আপনার নেতৃত্বে যা আছে, তা আপনার হাতেই থাকবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রে সিল করে দিলে সালিত ইবনু আমর আল-আমেরি সেটি নিয়ে যান। হাওযা তার খুব যত্নাদি করেন। সালিত তাকে পত্র পড়ে শোনান। কিন্তু হাওযার মধ্যে বিশেষ কোনো উচ্ছ্বাস বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। পত্রপাঠ শেষ হলে তিনি লিখে পাঠান, 'আপনি যে বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন, তা খুবই সংগত! তবে এটা মেনে নিলে, আরবের লোকদের কাছে আমার অবস্থান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কাজেই আপনি আমাকে সহজ কিছু নির্দেশনা দিন। আমি সেগুলো মেনে এসব অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করব।'

---

[১] *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬১-৬২; নিকট অতীতে এই চিঠিখানা হস্তগত হয়। ডক্টর হামিদুল্লাহ এর ফটোকপি প্রচার করেন। *যাদুল মাআদ*-এর সাথে একটি শব্দে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ ফটোকপিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র পরিবর্তে লেখা আছে 'লা ইলাহা গায়রুহু'।

[২] জাযিরাতুল আরবের একটি শহর। নাজদের দক্ষিণে অবস্থিত।

এরপর তিনি উপহার-সামগ্রী দিয়ে সালিতকে বিদায় জানান। হিজরের তৈরি বিশেষ কিছু কাপড়চোপড়ও দেন তাকে। সালিত সেগুলো নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। নবিজির সামনে সবকিছু আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন। পত্রপাঠ শেষ হলে নবিজি বলেন, 'সে যদি আমার কাছে এক টুকরো জমিনও চায়, তবু আমি দেব না। তার হাতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে। ধ্বংস হবে সে নিজেও।'

নবিজি মক্কাবিজয়ের পর মদিনায় ফেরার পথে জিবরিল তাকে হাওযার মৃত্যুসংবাদ দেন। তখন তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, শোনো, ইয়ামামায় এক মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে। সে নিজেকে নবি দাবি করবে। আমার তিরোধানের পর সে নিহত হবে। একজন জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাকে কে হত্যা করবে? নবিজি বলেন, তুমি ও তোমার সাথিরা। পরবর্তীকালে নবিজির এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়।[১]

হারিস ইবনু আবি শিমর গাসসানি বরাবর

হারিস ছিল দামেশকের শাসক। তার উদ্দেশে পাঠানো পত্রে নবিজি বলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারিস ইবনু আবি শিমর গাসসানির প্রতি। যে হিদায়াত অনুসরণ করে এবং ঈমান আনে, তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনাকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করছি। তার কোনো অংশীদার নেই। ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার রাজত্ব স্থায়ী হবে।

এ পত্র পাঠানো হয় বনু আসাদ ইবনু খুযায়মা গোত্রের শুজা ইবনু ওয়াহাবের মাধ্যমে। পত্রটি হারিসের কাছে পৌঁছলে সে উদ্ধত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'আমার রাজত্ব কে ছিনিয়ে নেবে? কার এত বড় সাহস? আমি এক্ষুনি তার ওপর আক্রমণ করব।'[২]

ওমান-সম্রাটের হাতে নবিজির পত্র

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমান-সম্রাট জাইফার ও তার ভাই আবদের নামে একটি পত্র পাঠান। তাদের পিতার নাম জুলান্দি। পত্রের ভাষ্য ছিল এমন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহর পক্ষ থেকে জুলান্দির পুত্র জাইফার ও আবদের প্রতি।

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬৩; নবিজির ভবিষ্যদ্বাণীর সেই কুখ্যাত লোকটি হলো মুসাইলামাতুল কাযযাব। সে ইয়ামামার জাবিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে, যা নাজদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

[২] প্রাগুক্ত; *মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খুজারি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৬

যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তার ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। পর সমাচার, আমি আপনাদের দুজনকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। ইসলাম গ্রহণ করুন; নিরাপদ থাকুন। আমাকে বিশ্ববাসীর প্রতি রাসুল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আমি জীবিতদের সতর্ক করি—যেন ভালোরা বেঁচে যায়, আর কাফিররা শাস্তি পায়। আপনারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করলে, শাসনদণ্ড আপনাদের হাতেই থাকবে। তবে অস্বীকৃতি জানালে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে আপনাদের রাজত্ব। আপনাদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে প্রবেশ করবে আমার সৈন্যবাহিনী এবং সহসাই আমার নবুয়ত বিজয় লাভ করবে আপনাদের রাজত্বের ওপর।

এ পত্রটি বহন করেন আমর ইবনুল আস। তিনি বলেন, 'আমি ওমান পৌঁছে প্রথমে আবদের সাথে সাক্ষাৎ করি। দুই ভাইয়ের মধ্যে সে-ই ছিল অধিক মিষ্টভাষী ও দূরদর্শী। চারিত্রিক দিক দিয়েও বেশ কোমল স্বভাবের। তাকে বলি, আমি নবিজির একজন বার্তাবাহক। আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে তার পত্র নিয়ে এসেছি। আবদ বলেন, রাজত্ব পরিচালনা কিংবা বয়স—দুটোতেই আমার ভাই আমার চেয়ে জ্যেষ্ঠ। আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। তাকেই তুমি পত্র পাঠ করে শোনাও। আচ্ছা, তুমি কীসের দাওয়াত নিয়ে এসেছ?

আমর : আমার দাওয়াতের সারকথা হলো, আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের পূজা-অর্চনা ত্যাগ করুন। সেইসাথে সাক্ষ্য দিন, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

আবদ : হে আমর, আপনি আপনার গোত্রের সর্দারের ছেলে। আপনার বাবা বিষয়টি কীভাবে দেখছেন? তার দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের অনুসৃত আদর্শ।

আমর : তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনেনি। কিন্তু আমার দুঃখ হয়, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহর নবির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন, তবে বড় বাঁচা বেঁচে যেতেন। আমিও তার মতোই ছিলাম। তার সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলাম। পরে আল্লাহ আপন দয়াগুণে আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন; ইসলামের জন্য কবুল করেছেন।

আবদ : আপনি কখন থেকে তার অনুসরণ করেন?

আমর : এই তো কিছুদিন হলো।

আবদ : আপনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

আমর : নাজাশির কাছে। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আবদ : তার সম্প্রদায় ও রাজ্যের লোকেরা তার সাথে কেমন আচরণ করেছে?

আমর : তারা তাকে মেনে নিয়েছে। তার আনুগত্য করেছে। তাকেই বহাল রেখেছে রাজ্যের ক্ষমতায়।

আবদ : মন্ত্রিপরিষদ ও ধর্মযাজকরাও কি তার আনুগত্য করেছে?

আমর : হ্যাঁ।

আবদ : আমর কী বলছ এসব? মানুষের জন্য মিথ্যাচারের চেয়ে জঘন্য ও অপমানজনক আর কিছু নেই।

আমর : আমি মিথ্যা বলিনি। আমাদের দ্বীনে মিথ্যা বলা বৈধ নয়।

আবদ : হিরাক্ল কি নাজাশির ইসলাম সম্পর্কে জানে?

আমর : হ্যাঁ, জানে।

আবদ : তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, বিষয়টি রোমসম্রাট হিরাক্ল জানতে পেরেছেন?

আমর : নাজাশি তার পক্ষে কর আদায় করতেন। কিন্তু ইসলামগ্রহণের পর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, হিরাক্ল যদি আমার কাছে এক দিরহামও চায়, আমি তাকে দেব না। হিরাকলের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তার ভাই নিয়াক ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, আপনি কি আপনার গোলামকে এতটাই ছাড় দেবেন যে, সে আপনার পক্ষে করটাও আদায় করবে না? তাছাড়া সে আপনার দ্বীন ছেড়ে অন্য দ্বীনে দীক্ষিত হবে। হিরাক্ল বলেন, সে এক নতুন দ্বীন পছন্দ করেছে। সেটা গ্রহণও করেছে। এখন আমি কী করতে পারি তার বিরুদ্ধে? আল্লাহর কসম! আমার রাজত্বের মোহ না থাকলে তার মতো আমিও একই আচরণ করতাম।

আবদ : আমর, কী বলছ? ভেবেচিন্তে বলো একটু।

আমর : আল্লাহর কসম! আমি সত্য বলছি।

আবদ : আচ্ছা এবার বলো, তিনি কী করতে বলেন, আর কী করতে নিষেধ করেন?

আমর : তিনি আল্লাহর নির্দেশমতো চলতে বলেন। তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। ধৈর্যধারণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে বলেন। বিরত থাকতে বলেন খুনোখুনি, হানাহানি ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে। এছাড়া তিনি ব্যভিচার এবং মূর্তি ও ক্রুশপূজা করতেও বারণ করেন।

আবদ : তিনি তো ভালোই বলেন। আহ! আমার ভাই যদি এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুহাম্মাদের ওপর ঈমান আনত, তবে কত ভালো হতো! আমি তার পরশে গিয়ে ধন্য

হতাম। কিন্তু আমার ভাইয়ের রাজত্বের মোহ বেশি। সে কিছুতেই কারও অধীনতা স্বীকার করবে বলে মনে হয় না।

আমর : সে ইসলাম গ্রহণ করলে তো আল্লাহর রাসুল তাকে স্বপদে বহালই রাখবেন। পরে তাকে দায়িত্ব দেবেন ধনীদের থেকে সাদাকা নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে।

আবদ : এটা তো খুবই ভালো প্রস্তাব। তাছাড়া কাজটাও তো মানবিক। তবে সাদাকা কী?

আমর : আল্লাহর রাসুল বিত্তশালীদের ওপর শতকরা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ধার্য করেন। প্রতিবছর সে সম্পদ ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদের দেওয়ার নামই সাদাকা। [আমরের ভাষ্যমতে, এরপর তারা উটের যাকাত নিয়ে আলোচনা করেন।]

আবদ : আমর! আমাদের যেসব চতুষ্পদ জন্তু চারণভূমিতে চরে বেড়ায়, সেখান থেকেও কি দিতে হবে কিছু?

আমর : হ্যাঁ, দিতে হবে।

আবদ : আমার মনে হয় না, এ দূরদেশের এত বিপুলসংখ্যক মানুষ তোমার এই প্রস্তাবে সম্মত হবে।

আমর ইবনুল আস বলেন, কিছুদিন আমি সেখানে অবস্থান করি। সে তার ভাই জাইফারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে এবং আমার খবরাখবর তাকে জানাতে থাকে। একদিন জাইফার আমাকে ডেকে পাঠায়। ডাক পেয়ে আমি তার কাছে যাই। ভেতরে প্রবেশ করতে গেলে প্রহরীরা আমার বাহু টেনে ধরে। জাইফার ইশারায় আমাকে ছেড়ে দিতে বলে। আমি বসতে গেলে, তারা বসতে বারণ করে। আমি বিনীত ভঙ্গিতে জাইফারের দিকে তাকাই। সে জলদগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী চাও?' আমি কোনো কথা না বলে মোহরাঙ্কিত চিঠিটি তার দিকে বাড়িয়ে দিই। সে চিঠি খুলে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে। এরপর তার ভাইয়ের হাতে দেয়। সে-ও পুরো চিঠি পড়ে নেয়। এ সময় আমি লক্ষ করি, জাইফারও অত্যন্ত নম্র-ভদ্র। যথেষ্ট কোমল স্বভাবের। দুজনের পত্রপাঠ শেষ হলে জাইফার আবার আমার প্রতি মনোযোগী হয়। আমাকে জিজ্ঞেস করে, কুরাইশরা তার সাথে কেমন আচরণ করেছে?

আমর : সকলেই তার আনুগত্য স্বীকার করেছে; কেউ স্বেচ্ছায়, আবার কেউ তরবারির ভয়ে।

জাইফার : তার অনুসারীরা কেমন?

আমর : তার অনুসারীরা সবকিছুর ওপর তাকে প্রাধান্য দেয়। তারা প্রবলভাবে বিশ্বাস করে যে, তার নবুয়ত দাবির আগে সবাই ভ্রান্তিতে ছিল। আল্লাহ তাদেরকে সেখান থেকে টেনে তুলে হিদায়াত দিয়েছেন। শুনুন, এই মুহূর্তে এই মরু অঞ্চলে এক আপনি ছাড়া সবাই তার অনুগত। এমন পরিস্থিতিতে আপনি তার অবাধ্য হলে, তার অশ্বারোহী বাহিনী আপনার ভূমিতে প্রবেশ করবে এবং মুহূর্তেই তছনছ করে দেবে এখানকার সবুজ-শ্যামলিমা। তাই ইসলাম গ্রহণ করুন। নিরাপদ থাকুন। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাকে স্বপদে বহাল রাখা হবে। নেতৃত্ব আপনারই থাকবে। ক্ষমতা হরণের জন্য কেউ প্রবেশ করবে না আপনার ভূমিতে।

জাইফার : আমাকে একটু সময় দাও। ভেবে দেখি। আগামীকাল তুমি আবার এসো।

আমর বলেন, আমি তখন তার ভাই আবদের কাছে চলে আসি। আবদ আমাকে বলে, ‘আমর! তার রাজত্বের লোভ না থাকলে, আশা করি সে ইসলাম গ্রহণ করবে।’ পরের দিন একই সময়ে আবার তার কাছে যাই। কিন্তু প্রহরীরা আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয় না। আমি আবদের কাছে এসে সমস্যার কথা বললে, সে আমাকে জাইফারের কাছে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেয়। জাইফার বলে, ‘তুমি যে দাওয়াত নিয়ে এসেছ, আমি সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং রীতিমতো দোটানায় পড়ে গেছি। কারণ আমি বিনাযুদ্ধে রাজত্ব তার হাতে ছেড়ে দিলে, আরবের সবচেয়ে দুর্বল শাসক বলে গণ্য হব। আবার তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে, তার সৈন্যরা এখানে অভিযান চালাবে এবং একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেক প্রাণহানি ঘটবে।’

আমর বলেন, আমি তাকে জানালাম, আগামীকাল আমি ফিরে যাচ্ছি। আমার ফিরে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে একান্তে তার ভাইয়ের সাথে বৈঠকে বসে। তার ভাইকে বলে, ‘আমাদের এমন শক্তি নেই, যার দ্বারা আমরা বিজয়ী হব। তাছাড়া তিনি যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছেন, সবাই তার দাওয়াত কবুল করেছে।’

পরদিন সকালে আবার আমার ডাক পড়ে জাইফারের দরবারে। আমি সেখানে উপস্থিত হলে, প্রথমে জাইফার, তারপর তার ভাই আবদ এবং অবশেষে সেখানে উপস্থিত সকলেই আমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেইসাথে আমাকে দায়িত্ব দেন সাদাকা উসুল, বণ্টন ও মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনার। এসব কাজে কেউ আমার বিরোধিতা করলে এই দুই সহোদর আমার পাশে দাঁড়াতেন।[১]

এই ঘটনার পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অন্যান্য শাসকের তুলনায় তাদের কাছে দাওয়াতি পত্রটি দেরিতে পৌঁছে। খুব সম্ভব তাদের কাছে পত্রটি পৌঁছায়

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬২, ৬৩

মক্কাবিজয়ের পরে।

যাইহোক, হুদাইবিয়ার সন্ধি ও যুদ্ধবিরতির অবসরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্রযোগে বিভিন্ন দেশের শাসক ও রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। এদের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন; কেউ কেউ আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্য থেকে। তবে এতেও ইসলামের উপকারই হয়। আরবের বাইরে দেশ থেকে দেশান্তরে ইসলাম ও মুসলিমদের একটি পরিচিতি গড়ে ওঠে। সর্বোপরি, দাওয়াতি কার্যক্রমের এই সাফল্যে কাফিরদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে, আরব ভূখণ্ডে ইসলাম নামে যে শক্তির উত্থান ঘটেছে, তাকে আর কখনোই পরাজিত করা যাবে না।

হুদাইবিয়ার সন্ধি-পরবর্তী সামরিক তৎপরতা

আল-গাবা বা যু-কারাদের যুদ্ধ

বনু ফাযারার[১] একদল দুর্বৃত্ত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে গেলে এ অভিযানটি পরিচালিত হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর এটাই ছিল সর্বপ্রথম সামরিক অভিযান। নবিজি নিজেও এ অভিযানে অংশ নেন। যুদ্ধের ধারাক্রম বিচারে এ অভিযানটি পরিচালিত হয় খাইবারের পূর্বে। *সহিহুল বুখারিতে* ইমাম বুখারি 'খাইবারের ৩ দিন আগে এ অভিযান পরিচালিত হয়' শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেন। ইমাম মুসলিমও তা-ই মনে করেন এবং উভয়েই এই শিরোনামের অধীনে সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে হাদিস এনেছেন। তবে অধিকাংশ মাগাযি-বিশেষজ্ঞের মতে, এ অভিযান হুদাইবিয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আমার বিচারে ইমাম বুখারির মতই অধিক শুদ্ধ।[২]

এই অভিযানের একজন সাহসী বীর হচ্ছেন সালামা ইবনুল আকওয়া। তিনি বলেন, একদিন দুপুরে নবিজি তার গোলাম রাবাহকে দিয়ে একপাল পশু চারণভূমিতে পাঠান। আবু তালহার ঘোড়া নিয়ে আমিও তার সাথে যাই। দুপুর বেলায় আব্দুর রহমান ফাযারি পশুপালের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। রাখালকে হত্যা করে পশুগুলো নিয়ে রওনা দেয়। আমি ঘোড়া থেকে নেমে রাবাহকে বলি, তুমি ঘোড়াটা আবু তালহার কাছে পৌঁছে দিয়ো। আর নবিজিকে এক্ষুনি ঘটনাটা জানাও। আমি ঘাতক দলকে সামলানোর চেষ্টা

---

[১] বনু ফাযারা বনু গাতফানের একটি শাখা। এদের আবাস ভূমি ছিল নাজদ এলাকায়।

[২] *সহিহুল বুখারি,* যু-কারাদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ : ৪১৯৪; *সহিহ মুসলিম,* যু-কারাদ ও অন্যান্য যুদ্ধ পরিচ্ছেদ : ১৮০৬-১৮০৭; *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৬০-৪৬৩; *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬০

করছি। এ কথা বলে আমি একটি উঁচু টিলার ওপর গিয়ে দাঁড়াই। মদিনার দিকে মুখ করে ৩ বার হাঁক ছেড়ে বলি, ইয়া সাবাহা (অর্থাৎ আমরা শত্রুর কবলে পড়েছি)। এরপর আমি আক্রমণকারীদের পেছনে পেছনে এগুতে থাকি। তির নিক্ষেপ করে তাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করি। আমি এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এগিয়ে যাই—

আমি আকওয়ার সন্তান,

মায়ের দুধ কে কতটুকু করেছে পান

আজ হবে তা প্রমাণ।

আমি উপর্যুপরি তির নিক্ষেপ করতে থাকি। তিরের আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ঘাতক দল। ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে তাদের পেছন দিক। মাঝেমধ্যে অশ্বারোহীরা ছুটে আসে আমার দিকে। মুহূর্তের মাঝে গাছের আড়ালে মিলিয়ে যাই আমি। বিপুল উৎসাহে তির নিক্ষেপ করতে থাকি। এক নিমিষে তাদেরকে পৌঁছে দিই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। কিছু দূর গিয়ে ওরা একটি সরু গিরিপথে প্রবেশ করে। আমি ওপথে না গিয়ে সোজা পাহাড়ে আরোহণ করি। তিরের পাশাপাশি এবার ওপর থেকে পাথরও নিক্ষেপ করি। সেইসাথে সতর্ক দৃষ্টি রাখি তাদের গতিবিধির ওপর। আমি স্থির করে নিই, তারা নবিজির উট পাল ছেড়ে না গেলে আমিও পিছু হটব না। তিরের আঘাতে জর্জরিত করে ফেলব ওদের।

কাজেই আমি দুর্বার গতিতে তাদের পেছনে ছুটতে থাকি। তারা ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে ওঠে। এক পর্যায়ের গায়ের চাদর ও বাড়তি পোশাকও বোঝা মনে হতে থাকে তাদের কাছে। তারা সেগুলো ফেলে ভারমুক্ত হয়ে যায়। একে একে তারা ত্রিশের অধিক চাদর ও বর্শা ফেলে যায়। আমি সেগুলো পাথরচাপা দিয়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হই, যাতে নবিজি ও তার সহযোগীরা শত্রুর পথ চিনতে পারে এবং আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের ধাওয়া করতে পারে। তারা আরও কিছু পথ অগ্রসর হয়ে দুপুরের খাবার খেতে বসে একটি সরু রাস্তার বাঁকে। আমি পাহাড়-চূড়ায় গিয়ে চুপিসারে বসে পড়ি। ঘটনাক্রমে তাদের চারজন লোক আমাকে দেখে ফেলে। ওরা আমাকে ধরতে পাহাড়ে আরোহণ করে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, 'তোমরা কি আমাকে চেনো? আমি সালামা ইবনুল আকওয়া। আমি চাইলে তোমাদের যে-কাউকে একদৌড়ে ধরতে পারব। কিন্তু তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও আমাকে ছুঁতে পারবে না।' এ কথা শুনে তারা ফিরে যায়।

আমি সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকি। এরই মধ্যে নবিজির অশ্বারোহী বাহিনী সেদিকে আসতে দেখি। ঘন গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে সামনে এগুচ্ছেন তারা। তাদের সবার আগে আখরাম। তার পেছনে আবু কাতাদা। তার পেছনে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আব্দুর রহমান ফাযারি ও আখরামের মাঝে লড়াই বেধে যায়। আখরাম আব্দুর রহমানের ঘোড়ায় আঘাত করলে, ঘোড়াটি মাটিতে লুটিয়ে। কিন্তু আব্দুর রহমান টাল সামলে উঠে আখরামকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে আখরাম

শহিদ হন। আব্দুর রহমান তার ঘোড়ায় চড়ে বসে এবং সেখান থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করে। এমন সময় আবু কাতাদা তাকে নিশানা করে বর্শা ছুড়ে মারে। অমনি সে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যরা পিছু হটতে থাকে। আমরা তাদের অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হতে থাকি। আমি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলাম। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে তারা একটি ঘাঁটিতে পৌঁছে। সেখানে যু-কারাদ নামে একটি ঝরনা ছিল। তারা তখন খুবই তৃষ্ণার্ত। সেজন্য পানি দেখে থেমে যায়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তির ছুড়ে তাদেরকে ঝরনা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করি। তাদের আর পানি পান করা হয় না। এরই মধ্যে সূর্য ডুবে যায়। আমি ওদের চোখে চোখে রাখি। ইশার একটু আগে নবিজি সেখানে এসে পৌঁছেন। আমি তাকে বলি, 'হে আল্লাহর রাসুল, ওরা খুবই তৃষ্ণার্ত। এই মুহূর্তে আপনি আমাকে ১০০ জন অশ্বারোহী দিয়ে পাঠালে, আমি তাদের লুট করা সমস্ত কিছু ফিরিয়ে আনতে পারব। সেইসাথে তাদেরকেও উপস্থিত করতে পারব আপনার সামনে।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ইবনুল আকওয়া! তুমি যথেষ্ট করেছ। এখন বিশ্রাম নাও। তারা এখন বনু গাতফানের আতিথ্য গ্রহণ করছে।' এরপর নবিজি বলেন, 'আজ আমাদের সর্বোত্তম ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আর সর্বোত্তম পদাতিক সালামা ইবনুল আকওয়া।'

সালামা বলেন, 'এ অভিযানে আমাকে গনিমতের দুই ভাগ দেওয়া হয়। এক ভাগ পেয়েছি পদাতিক সৈন্য হওয়ার কারণে। আরেক ভাগ ঘোড়সওয়ারের কারণে। ফেরার পথে আমি নবিজির সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। আমরা গাদবা নামক একটি উটের পিঠে করে মদিনায় ফিরে আসি।'

এ যুদ্ধে পতাকা ছিল মিকদাদ ইবনু আমরের হাতে। যুদ্ধে যাওয়ার আগে নবিজি মদিনার শাসনভার দিয়ে যান আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মি মাকতুমকে।[১]

খাইবারের যুদ্ধ

মদিনা থেকে ৬০ অথবা ৮০ মাইল দূরের একটি শহর হচ্ছে খাইবার। চারদিকে বড় বড় দুর্গ। আছে খেতখামারও। আবহাওয়া খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। বর্তমানে এটি একটি সাধারণ জনপদ।

যুদ্ধের কারণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির কল্যাণে মদিনার জনজীবনে স্বস্তি নেমে এসেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনেকটা নিরুদ্বেগ এখন। শত্রুজোটের সবচেয়ে শক্তিশালী পক্ষ কুরাইশ এখন আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। তাই নবিজি

---

[১] প্রাগুক্ত

ভাবলেন, এই অবসরে শত্রুজোটের অপর দুই পক্ষ অর্থাৎ ইহুদি ও নাজদবাসীদের সাথেও হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এতে করে সবদিক থেকেই নিরাপদে থাকা যাবে। আরব-ভূখণ্ডে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা হবে। সেইসাথে যুদ্ধ এড়িয়ে নিরাপদে আল্লাহর পয়গাম প্রচারের অবারিত সুযোগ আসবে মুসলিমদের হাতে।

খাইবার ছিল ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া। এখান থেকেই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি করত; নিত সামরিক প্রস্তুতিও। এ কারণে মুসলিমরা এবার এদিকে মনোযোগ দেয়।

খাইবার আসলেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া ছিল কি না—সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে খন্দক যুদ্ধের কার্যকারণের দিকে আরেকবার ফিরে তাকাতে হবে। তখন আমরা দেখতে পাব, এই খাইবারের লোকেরাই খন্দক যুদ্ধের ইন্ধন জুগিয়েছিল। মুশরিকদের সবাইকে কানপড়া দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এরাই বনু কুরাইজার লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্ররোচিত করেছিল। এরাই ইসলামি সমাজের কীট মুনাফিকদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছিল; সেইসাথে আঁতাত করেছিল বনু গাতফান ও বেদুইনদের সঙ্গে। তাছাড়া এরা নিজেরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে। তার অংশ হিসেবে নানাভাবে তারা উত্যক্ত করছিল মুসলিমদেরকে। এমনকি নবিজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল তারা। এসব কারণে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ছাড়া মুসলিমদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

এ অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য—সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইক ও উসাইর ইবনু যারিমের মতো জালিমকে শায়েস্তা করা। ইহুদিদের অপরাধের মাত্রা বিচার করলে, অনেক আগেই মুসলিমদের এই পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কৌশলগত কারণে তারা সেটা করেননি। কারণ আরবে তখনো ইহুদিদের চেয়ে কুরাইশরা বেশি শক্তিশালী, সুসংগঠিত, যুদ্ধবাজ ও দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ। আর এমন যোগ্য প্রতিপক্ষকে উন্মুক্ত ছেড়ে রেখে দুর্বল শত্রুর প্রতি মনোনিবেশ করা সমর-বিচক্ষণতার পরিপন্থি। কাজেই নবিজি কুরাইশদেরকে সন্ধির সুতোয় বেঁধে ইহুদিদের শায়েস্তা করার পথ রচনা করেন। উদ্যোগ নেন তাদের হিসাব-নিকাশ কড়ায়-গন্ডায় বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

খাইবারের উদ্দেশে যাত্রা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে ফিরে পুরো জিলহজ এবং মুহাররম মাসের কয়েকদিন মদিনায় অবস্থান করেন। এরপর খাইবারের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

তাফসিরবিদগণ লিখেছেন, আল্লাহ আগেই মুসলিমদেরকে খাইবার জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কুরআনের ভাষায়—

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিপুল পরিমাণ গনিমতের, তোমরা যেসবের অধিকারী হবে। তবে এটিকে তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন এবং মানুষের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন, যাতে তা হয়ে ওঠে মুমিনদের জন্য এক বিশেষ নিদর্শন; সেইসাথে আল্লাহ তোমাদের পরিচালিত করেন সরল পথে।[১]

এ আয়াতে 'এটিকে তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছেন' বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বোঝানো হয়েছে। আর 'বিপুল পরিমাণ গনিমত' বলতে বোঝানো হয়েছে খাইবারের কথা।

মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা

মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকেরা হুদাইবিয়ার সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না গিয়ে নিজেদের ঘরে বসে থাকে। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসুলকে বলেন—

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

তোমরা যখন গনিমত সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা (যুদ্ধে না গিয়ে) পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা চায় আল্লাহর কথাকে বদলে দিতে। বলুন, তোমরা একদমই আমাদের সঙ্গে আসবে না। আল্লাহ পূর্বেই এমনটি ঘোষণা করেছেন। তারা অবশ্যই বলবে, তোমরা আমাদের প্রতি হিংসা করছ। বস্তুত তারা খুব সামান্যই বোঝে।[২]

---

[১] সুরা ফাতহ, আয়াত : ২০

[২] সুরা ফাতহ, আয়াত : ১৫

নবিজি খাইবার অভিমুখে রওনা করার সময় ঘোষণা করেন, তার সাথে কেবল তারাই যেতে পারবে, যাদের আসলেই জিহাদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। এ ঘোষণার ফলে কেবল তারাই এ যাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়, যারা হুদাইবিয়ায় বাইআতে রিজওয়ানে অংশ নিয়েছে। আর তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০।

এ অভিযানের সময় মদিনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া হয় সিবা ইবনু উরফুতা গিফারিকে। ইবনু ইসহাকের মতে এ যাত্রায় ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করা হয় নুমাইলা ইবনু আব্দিল্লাহ আল-লাইসিকে। তবে বিশেষজ্ঞদের নির্ণয়ে প্রথমোক্ত মতটিই অধিক নির্ভরযোগ্য।[১]

আবু হুরাইরা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসেন। সিবা ইবনু উরফুতা তখন ফজরের সালাত পড়ছিলেন। সালাত শেষ হলে আবু হুরাইরা তার কাছে যান। সিবা তার পথখরচের ব্যবস্থা করে দেন। আবু হুরাইরা তখনই খাইবারের উদ্দেশে রওনা করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, খাইবার মুসলিমদের অধিকারে চলে এসেছে। নবিজি তাকে গনিমত দেওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে তাকেও একটি অংশ দেওয়া হয়।

ইহুদিদের সাথে মুনাফিকদের যোগসাজশ

এ সময়ে ইহুদিদের সাহায্যার্থে মুনাফিকরা যথেষ্ট ছুটোছুটি করে। মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই আগেই খাইবারে খবর পাঠিয়েছিল—'মুহাম্মাদ তোমাদের ওদিকে যাচ্ছেন। সতর্ক হয়ে যাও। যথাযথ প্রস্তুতি নাও, ভয় পেয়ো না। তোমাদের জনবল ও অস্ত্রবল দুটোই পর্যাপ্ত। অপরদিকে মুহাম্মাদের সঙ্গীরা মুষ্টিমেয়; নিরস্ত্র প্রায়।' সংবাদ পেয়ে তারা কিনানা ইবনু আবিল হুকাইক ও হাওযা ইবনু কায়িসকে পাঠায় বনু গাতফানের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাতে। বনু গাতফান ছিল খাইবারের ইহুদিদের পরম মিত্র ও মুসলিমদের ঘোরবিরোধী। ইহুদিরা বনু গাতফানকে প্রলুব্ধ করতে তাদের সঙ্গে এই অঙ্গীকার করে বসে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তারা খাইবারের মোট উৎপাদনের অর্ধেক খাদ্যশস্য বনু গাতফানকে দেবে।

খাইবারের পথে

খাইবার যাওয়ার পথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসর পাহাড় ও সাহবা প্রান্তর অতিক্রম করে আর-রাজি উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেন। রাজি থেকে বনু গাতফানের বসতি একদিন-একরাতের দূরত্বে অবস্থিত। বনু গাতফান ইহুদিদের ডাকে সাড়া দিয়ে খাইবারের পথে রওনা হয়েছিল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তারা পেছন থেকে

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৬৫; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৩

শোরগোল শুনতে পায়। তাতেই তাদের পিলে চমকে যায়। তারা ভাবে, মুসলিমরা বুঝি তাদের অরক্ষিত পরিবার ও পশুপালের ওপর হামলে পড়েছে। অমনি তারা বাধ্য ছেলের মতো খাইবারের পথ ছেড়ে ঘরে ফিরে আসে।

বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য দুজন পথনির্দেশক ছিল। তাদের একজনের নাম হুসাইল। এখানে এসে নবিজি তাদের ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে উত্তর দিক থেকে খাইবারে প্রবেশের সহজতম পথের সন্ধান চান, যাতে করে ইহুদিদের সামনে সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়; সেইসাথে রহিত হয়ে যায় এ পথে বনু গাতফানের সাহায্য আসার সম্ভাবনাও। কারণ বনু গাতফান ও সিরিয়ার অবস্থান ছিল খাইবার থেকে ঠিক উত্তরে।

দুজন পথপ্রদর্শকের একজন বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে সবচেয়ে সহজ পথের সন্ধান দিতে পারব।'

নবিজি তাকে অনুমতি দিলে তিনি বাহিনীর আগে আগে চলতে থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে, সামনে একটি চৌরাস্তা পড়ে। পথপ্রদর্শক সেখানে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই ৪টি পথের যেকোনোটি দিয়েই আপনি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

নবিজি বলেন, এক-এক করে সবগুলো পথের নাম বলো।

পথপ্রদর্শক একটি পথ দেখিয়ে বললেন, এটার নাম হাযান।

নবিজি বললেন, না, এ পথে যাওয়া যাবে না।

পথপ্রদর্শক আরেকটি পথ দেখিয়ে বললেন, ওটার নাম শাশ।

নবিজি এবারও একই কথা বললেন।

পথপ্রদর্শক আরেকটি পথ দেখিয়ে বললেন, ওটার নাম হাতিব। এটাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দ হলো না।

পথপ্রদর্শক অনেকটা হতাশ হয়ে বললেন, আর মাত্র একটা পথ বাকি আছে।

উমার বললেন, সেটার নাম কী?

পথপ্রদর্শক বললেন, মারহাব।

নবিজির নামটি পছন্দ হলো এবং তিনি সে পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

যাত্রাপথে ঘটে যাওয়া কিছু আলোচিত ঘটনা

[এক] সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন, আমরা রাত্রিবেলা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খাইবারের উদ্দেশে রওনা করি। পথিমধ্যে এক লোক আমার চাচা আমিরকে বলেন, আমাদেরকে দুয়েকটা কবিতা শোনাও না! আমির ছিলেন স্বভাবজাত কবি। অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি নিচের কবিতা পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করতে করতে সবার আগে পথ চলতে থাকেন—

আপনি না দেখালে মাবুদ, পেতাম না পথের দিশা,
ইবাদতে বসত না মন, কাটত না অমানিশা।
আপনার জন্য আমরা ফিদা, করুন আমাদের ক্ষমা,
যুদ্ধের দিনে আমরা যেন থাকি একসাথে জমা।
আমাদের বিরুদ্ধে আজ এক হয়েছে সব দুশমন,
কারণ আমরা কুফর ছেড়ে সঁপেছি ঈমানে মন।

নবিজি কবিতা শুনে কবির পরিচয় জানতে চান। সাহাবিরা বলেন, তিনি আমির ইবনুল আকওয়া। নবিজি বলেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। এ সময় একজন সাহাবি মন্তব্য করেন, এবার আমিরের শাহাদাত অনিবার্য। কিন্তু আমরা যে তার দীর্ঘ সাহচর্যের অভিলাষী![১]

সাহাবিগণ জানতেন, যুদ্ধের সময় নবিজি কোনো সাহাবির জন্য বিশেষভাবে রহমত-মাগফিরাতের দুআ করলে তিনি শহিদ হয়ে যান।[২] খাইবার যুদ্ধে আমিরের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটে।

[দুই] পথিমধ্যে মুসলিম বাহিনী একটি উপত্যকা দেখতে পায়। অমনি তারা উঁচু গলায় তাকবির দিতে শুরু করে। নবিজি তাদের থামতে বলেন, তোমরা শান্ত হও। কোনো অন্ধ, বধির বা নিরুদ্দেশ সত্তাকে ডাকছ না তোমরা। তোমরা যাকে ডাকছ, তিনি তোমাদের কাছেই আছেন। তোমাদের সমস্ত কিছু আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন।[৩]

[তিন] খাইবারের কাছাকাছি সাহবা প্রান্তরে পৌঁছে নবিজি আসরের সালাত আদায় করেন। সালাত শেষ করে খাবারের ব্যবস্থা করতে বলেন। খাবার হিসেবে তখন কেবল ছাতু ছিল মুসলিমদের হাতে। নবিজি সে ছাতুই খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। এরপর সাহাবিদের নিয়ে আহার করেন। আহার শেষে আসরের ওজুতেই মাগরিবের সালাত পড়েন। মাঝখানে কেবল কুলি করেন। সাহাবিরাও তার অনুসরণে আসরের ওজুতে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৯৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৮০৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৯৬, ৬১৪৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৮০২, ১৮০৭

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪২০৫

মাগরিব পড়েন।[১] তারপর ইশার ওয়াক্ত হলে যথাসময়ে ইশার সালাত পড়েন।[২]

খাইবারে মুসলিম বাহিনীর হঠাৎ আগমন

যুদ্ধ শুরু হয় সকালে। তার আগের রাত মুসলিমরা যে খাইবারের উপকণ্ঠে রাত্রিযাপন করেছে, ইহুদিরা তা টের পায়নি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, তিনি রাতের বেলা কোনো জনপদে পৌঁছলে, সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতেন; রাতেই তাদের ওপর আক্রমণ করতেন না। সেদিন খুব ভোরে, কিছুটা অন্ধকার থাকতে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। এরপর মুসলিম সেনারা যার যার বাহনে করে খাইবারের দিকে অগ্রসর হন।

খাইবারের লোকজন তখন কাঁধে কোদাল নিয়ে খেতখামারে কাজ করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুসলিম সেনাদের দেখে তারা ছুটে পালাতে থাকে। এ সময় তাদেরকে বলতে শোনা যায়, 'হায়, মুহাম্মাদ দেখি এই সাতসকালেই দলবল নিয়ে হাজির!' তাদের এই ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে নবিজি বলেন, 'আল্লাহু আকবার, খাইবারের বরবাদি ঘনিয়ে আসছে। আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের ভূমিতে পদার্পণ করি, তখন তাদের সকাল কাটে চরম দুরবস্থায়।'[৩]

নবিজি শিবির স্থাপনের জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করেন। এ সময় হুবাব ইবনুল মুনজির এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এখানে শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আল্লাহর আদেশে নাকি কৌশলগত কারণে?' তিনি বলেন, 'কৌশলগত কারণেই এই সিদ্ধান্ত।' হুবাব তখন বলেন, 'এই জায়গাটা নাতাত দুর্গের খুব কাছাকাছি। খাইবারের সকল যোদ্ধা এই দুর্গেই থাকে। এখানে শিবির স্থাপন করলে ওরা আমাদের গতিবিধি টের পাবে। কিন্তু আমরা ওদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারব না। ওরা তির নিক্ষেপ করলে সেই তির আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। কিন্তু আমাদের নিক্ষিপ্ত তির ওদের পর্যন্ত পৌঁছবে না। তাছাড়া রাতের বেলা আমাদের ওপর ওদের অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা থেকে যাবে। এসব চিন্তা বাদ দিলেও এ জায়গাটার চারিদিকে খেজুর বাগান, জায়গাটাও নিচু। এটা আমাদের জন্য বাড়তি সমস্যা তৈরি করবে। কাজেই যেখানে এসব সমস্যা নেই, সেখানে অবস্থান নিলে ভালো হতো।' নবিজি বলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।' এরপর তিনি সাহাবিদের নিয়ে উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।

খাইবারের অদূরে নিরাপদ একটি স্থানে গিয়ে নবিজি সাহাবিদের থামতে বলেন। এরপর

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২০৯

[২] *মাগাযিল ওয়াকিদি*, পৃষ্ঠা : ১১২

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ২৯৯১, ৩৬৪৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৭৫

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, সাত আসমান ও সেগুলোর ছায়াতলে আশ্রিত সমস্ত কিছুর রব, সাত স্তর জমিন ও সেগুলোতে বিরাজমান সমস্ত কিছুর রব, শয়তান ও শয়তানের হাতে পথভ্রষ্টদের রব, বাতাস এবং তাতে ভেসে বেড়ানো সমস্ত কিছুর রব, আমি আপনার কাছে এ জনপদ ও জনপদবাসীদের কল্যাণ তো বটেই, এখানে বিদ্যমান সমস্ত কিছুর কল্যাণ চাইছি। সেইসাথে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ জনপদ, জনপদবাসী এবং এখানে থাকা সমস্ত কিছুর অনিষ্ট থেকে।' দুআ শেষ করে সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, এবার তোমরা আল্লাহর নামে আগে বাড়ো।

সার্বিক পরিস্থিতি এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতি

যে রাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার-সীমান্তে প্রবেশ করেন, সে রাতেই[১] তিনি সাহাবিদের বলেন, 'আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও যাকে ভালোবাসেন।' সকালে সাহাবিগণ নবিজির সামনে হাজির হন। সবার মনে পতাকা হাতে পাওয়ার সুপ্ত আশা। নবিজি বলেন, 'আলি ইবনু আবি তালিব কোথায়?' সাহাবিগণ জানান, তার চোখ উঠেছে। তিনি পেছনে বসে আছেন। নবিজি বলেন, 'তাকে নিয়ে এসো।' তাকে আনা হলে নবিজি তার চোখে সামান্য থুতু লাগিয়ে দেন এবং দুআ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আলি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার মনে হয়, তিনি জীবনে কখনো চোখের সমস্যায় আক্রান্তই হননি।

এরপর তার হাতে যুদ্ধের পতাকা দেওয়া হয়। পতাকা পেয়ে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, ওরা আমাদের মতো হওয়ার আগপর্যন্ত আমি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব।' নবিজি বলেন, 'ঠিক আছে, দেখেশুনে যাও। লোকালয়ে গিয়ে প্রথমে ওদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। এরপর তাদেরকে জানাবে—তাদের ওপর আল্লাহর কী কী অধিকার রয়েছে। আল্লাহ যদি তোমার মাধ্যমে একজনকেও হিদায়াত দেন, তবে সেটা হবে তোমার জন্য বহুসংখ্যক লাল উট প্রাপ্তির চেয়েও বেশি কল্যাণকর।'[২]

খাইবারের জনবসতি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ৫টি দুর্গ। যথা—নায়িম দুর্গ,

---

[১] ইবনু ইসহাক, ইবনু হিব্বান, ইবনু হিশামসহ প্রায় সকল সিরাত-বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত, খাইবারে মুসলিমরা সর্বপ্রথম আক্রমণ করে নায়িম দুর্গ। আর নবিজি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—'আমি আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন'—তা ছিল কামুস দুর্গ আক্রমণ করার সময়। প্রথম দিন নবিজি পাঠিয়েছিলেন আবু বকরকে, তিনি ফিরে আসেন। দ্বিতীয় দিন পাঠান উমারকে, তিনিও ফিরে আসেন। তখন নবিজি তৃতীয় দিন আলির হাতে পতাকা তুলে দেন। খাইবার সীমান্তে প্রবেশ দ্বারা লেখক হয়তো কামুস দুর্গ এলাকায় প্রবেশের কথা বুঝিয়েছেন। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৪]

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৯৪২, ৩০০৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৪০৬

সাব ইবনু মুআজ দুর্গ, যুবাইর দুর্গ, উবাই দুর্গ, নিজার দুর্গ। এই দুর্গগুলোর মধ্যে প্রথম ৩টি 'নাতাত' এলাকায় অবস্থিত ছিল আর পরের দুটি 'শিক' অঞ্চলে। দ্বিতীয় ভাগের জনবসতি 'কাতিবা' নামে পরিচিত। সেখানে ছিল ৩টি দুর্গ—কামুস, ওয়াতি ও সালালিম।

এছাড়াও আরও অনেকগুলো দুর্গ ছিল খাইবার এলাকায়। তবে সেগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট ও প্রতিরোধ-শক্তিতে অপ্রতুল হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় কেবল প্রথম ভাগের দুর্গগুলোর সাথে। দ্বিতীয় ভাগের ৩টি দুর্গে পর্যাপ্ত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও বিনাযুদ্ধেই সেগুলো মুসলিমদের অধীনে চলে আসে।

নায়িম দুর্গ জয়

মুসলিম বাহিনী নায়িম দুর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। ইহুদিদের প্রতিরক্ষায় এ দুর্গের অবস্থান ছিল সবার আগে। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মারহাব এর অধিপতি। আরবের লোকদের দৃষ্টিতে সে একাই হাজার সৈন্যের সমান। আলি ইবনু আবি তালিব সৈন্যদের নিয়ে এ দুর্গের সামনে গিয়ে উপস্থিত হন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা অনুসারে প্রথমে ইহুদিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তার দাওয়াত ফিরিয়ে দেয় এবং যথারীতি তাদের দলপতি মারহাবের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে মারহাব দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। সে সময়কার গোটা অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন, আমরা নায়িম দুর্গে পৌঁছলে মারহাব তলোয়ার হাতে উন্মত্ত হাতির মতো বের হয়ে আসে। এ সময় সে দাঁত কামড়ে আবৃত্তি করতে থাকে—

জানে খাইবার, আমি মারহাব, চির উন্নত শির
সজ্জিত আজ যুদ্ধের সাজে আমি গর্বিত বীর!
যুদ্ধের এই ময়দান যবে হয়ে ওঠে অধীর!

প্রতিউত্তরে আমার চাচা আমির বলেন—

জানে খাইবার, আমিরের চির উন্নত শির
সজ্জিত আজ যুদ্ধের সাজে আমি নির্ভীক বীর!

আবৃত্তি শেষ হতেই একজন আরেকজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম আঘাত হানে মারহাব। আমির ঢাল দিয়ে সে আঘাত মোকাবেলা করেন। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে মাহরাবের উরু বরাবর তরবারি চালান। কিন্তু তার তরবারি দৈর্ঘ্যে ছোট হওয়ায় মাহরাবের নাগাল পেতে ব্যর্থ হয়। উলটো ফিরে এসে তার নিজেরই হাঁটুতে আঘাত লাগে। পরে সে আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। নবিজি তার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে
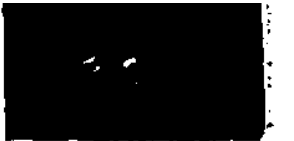
বলেন, আমিরের জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। তার রণকৌশল অনন্য। তার মতো বীর আরবে বিরল।[১]

এরপর মারহাব দ্বিতীয়বার হাঁক ছাড়ে—

জানে খাইবার, আমি মারহাব, চির উন্নত শির
সজ্জিত আজ যুদ্ধের সাজে আমি গর্বিত বীর!
যুদ্ধের এই ময়দান যবে হয়ে ওঠে অধীর!

প্রতিউত্তরে আলি ইবনু আবি তালিব নিচের কবিতা পঙ্‌ক্তি কয়টি আবৃত্তি করতে করতে সামনে এগিয়ে যান—

আমি হায়দার, দুর্নিবার, মায়ের রাখা নাম
সিংহের মতো থাবা আমার, যবে ক্ষেপলাম
এক আঘাতে তার পাওনা বুঝিয়ে দিলাম!

আবৃত্তি শেষ হতেই আলির তরবারি বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত হানে মারহাবের ঘাড় বরাবর। এক আঘাতেই নরাধমটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার মৃত্যুর পর দুর্গ জয় খুব সহজ হয়ে যায়।[২]

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্গের কাছাকাছি গেলে, এক ইহুদি দুর্গের ওপর থেকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? আলি বলেন, আমি আলি ইবনু আবি তালিব। ইহুদি বলে, আল্লাহর নবি মুসার ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থের শপথ! তোমরা বিজয়ী।

এমন সময় মারহাবের ভাই ইয়াসির বের হয়ে আসে। গজরাতে গজরাতে সে বলে, কে আমার মোকাবেলা করবে? যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যান। যুবাইরের মা সাফিয়া তখন নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার ছেলে কি নিহত হবে? নবিজি তাকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'না। আপনার ছেলের হাতেই বরং শত্রুটা মারা যাবে।' হলোও ঠিক তা-ই। যুবাইর তাকে হত্যা করে নিরাপদে ফিরে আসেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হলে নায়িম দুর্গের প্রাঙ্গণে উভয় দলের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়। ইহুদিদের

---

[১] *সহিহ মুসলিম*, খাইবার যুদ্ধ অধ্যায়, হাদিস নং : ১৮০২; যু-কারাদ যুদ্ধ অধ্যায়, হাদিস নং : ১৮০৭; *সহিহুল বুখারি*, খাইবার যুদ্ধ অধ্যায়, হাদিস নং : ৪১৯৬

[২] মারহাবের হত্যাকারী কে ছিলেন, কবে তাকে হত্যা করা হয়, কার হাতে এই দুর্গ বিজিত হয়, তা নিয়ে ঐতিহাসিক সূত্রগুলোতে মতভেদ লক্ষ করা যায়। এই মতভেদ সম্পর্কিত কিছুটা আলাপ *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমেও* পাওয়া যায়। উপরিউক্ত মতটি *সহিহুল বুখারি* থেকে নেওয়া।

কয়েকজন নেতা মারা পড়ে। এতে তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ভেঙে যায়। মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি হারিয়ে ফেলে তারা। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোর পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, এ লড়াই বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয় এবং মুসলিম সৈন্যরা ইহুদিদের কঠোর প্রতিরোধের মুখে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহুদিরা প্রতিরোধের মনোবল হারিয়ে ফেলে। নায়িম দুর্গ ছেড়ে তারা সাব দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই সুযোগে মুসলিমরা নায়িম দুর্গ দখল করে নেয়।

সাব ইবনু মুআজ দুর্গ জয়

নায়িম দুর্গের পরে এটাই ছিল সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। হুবাব ইবনুল মুনজির আল-আনসারির নেতৃত্বে একদল মুসলিম এ দুর্গ আক্রমণ করে। ইহুদিরা সম্মুখ যুদ্ধে না এসে দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নেয়। মুসলিমরা ৩ দিন দুর্গটি অবরোধ করে রাখে। কিন্তু তাতেও কোনো সুফল মেলে না। তৃতীয় দিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গটি জয়ের জন্য বিশেষভাবে দুআ করেন। ইবনু ইসহাক বলেন, অবরোধের একপর্যায়ে আসলামের শাখাগোত্র বনু সাহমের লোকজন এসে নবিজিকে বলেন, আমরা সাধ্যের সর্বোচ্চটা করেছি। আমাদের হাতে খাদ্যসামগ্রী বলতে এখন আর কিছুই নেই। তখন নবিজি তাদের জন্য এই বলে দুআ করেন, হে আল্লাহ, আপনি তো এদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। এদের শক্তি-সামর্থ্য ও আহার্য বলতে এখন আর কিছুই নেই। আমার হাতেও কিছু নেই ওদেরকে দেবার মতো। তাই এদের জন্য আপনি এখানকার সবচেয়ে ধন-দৌলত-সমৃদ্ধ ও খাদ্যশস্যপূর্ণ দুর্গটি জয় করে দিন। নবিজির দুআয় আগন্তুকরা খুশি হয়ে চলে যায়। নবোদ্যমে লড়াই শুরু করে। আল্লাহ তাদের হাতে সাব ইবনু মুআজ দুর্গ বিজিত করেন। সমগ্র খাইবারে এ দুর্গের মতো খাদ্যশস্য ও গবাদি পশুর মজুদ ছিল না অন্য কোনো দুর্গে।[১]

দুআ শেষ করে নবিজি যখন মুসলিম সৈনিকদের সর্বশক্তি নিয়ে দুর্গটি আক্রমণের নির্দেশ দেন, তখন আসলাম গোত্রের লোকজন তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দুর্গের সামনে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে কঠিন লড়াই হয়। সেদিনই সূর্যাস্তের পূর্বে দুর্গটি মুসলিমদের হাতে বিজিত হয়। মুসলিমরা দুর্গ থেকে বেশ কয়েকটি মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র)[২] ও ট্যাংক[৩] উদ্ধার করেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩২

[২] মিনজানিক হচ্ছে পাথর বা আগুনের গোলা নিক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রাচীন যন্ত্র। সাধারণত শত্রুপক্ষের ব্যাপক প্রতিরোধ কিংবা বিশাল দুর্গের প্রাচীর ভাঙতে এই ক্ষেপণ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতো।

[৩] সে সময়ের ট্যাংক আধুনিক ট্যাংকের মতো ছিল না। সেগুলো তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে। তার ভেতরে ঢুকে নিজেরাই উঁচু করে দুর্গ বা শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হতো। এটি শুধু তিরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারত।

ইবনু ইসহাকের উপরিউক্ত বর্ণনায় আরও বলা হয়, খাদ্য সংকটের কারণে কয়েকজন মুসলিম গাধা জবাই করে উনুনে কড়াই চাপিয়ে দেয়। নবিজির কানে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে বারণ করেন।

যুবাইর দুর্গ জয়

নায়িম ও সাব দুর্গ জয়ের পর ইহুদিরা সদলবলে 'নাতাত' এলাকার দুর্গগুলো ছেড়ে যুবাইর দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এই দুর্গের অবস্থান পাহাড়ের চূড়ায়। ঘোড়ায় চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে এ দুর্গে পৌঁছানো শুধু কষ্টকরই নয়; বরং দুঃসাধ্যও বটে। সেজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গ অবরোধের আদেশ করেন। টানা ৩ দিন অবরোধ জারি থাকে। এ সময় এক ইহুদি এসে বলে, হে আবুল কাসিম, আপনি একটানা একমাস অবরোধ জারি রাখলেও তাদের বিশেষ কোনো সমস্যা হবে না। কারণ তাদের দখলে অনেকগুলো গভীর কূপ রয়েছে। রাতের বেলা গোপন পথে তারা সেখান থেকে পানি নিয়ে আসে। সে পানিতেই তাদের দিন কেটে যায়। আপনি তাদের পানি সরবরাহ বন্ধ করতে পারলে, তবেই তারা নতিস্বীকার করবে। সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নবিজি পানি সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। এতে তারা বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামে। শুরু হয় তুমুল লড়াই। বেশ কয়েকজন মুসলিম শহিদ হন এ লড়াইয়ে। অপরদিকে ইহুদি নিহত হয় ১০ জন। অবশেষে মুসলিমদের হাতে এ দুর্গেরও পতন হয়।

উবাই দুর্গ জয়

যুবাইর দুর্গ জয়ের পর ইহুদিরা উবাই দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিমরা এখানেও অবরোধ জারি করে। এ সময় ইহুদিদের পক্ষ থেকে একে একে দুজন বীরযোদ্ধা দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়। দুজন মুসলিম তাদেরকে জাহান্নামে পাঠায়। দুজনের দ্বিতীয়জনকে হত্যা করেন লাল পাগড়িধারী বিখ্যাত বীর সাহাবি আবু দুজানা সাম্মাক ইবনু খারশা আল-আনসারি রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে হত্যা করে তিনি দ্রুতগতিতে দুর্গে প্রবেশ করেন। মুসলিম বাহিনীর অন্য সৈন্যরা তাকে অনুসরণ করেন। একটানা লড়াই চলে দুর্গের ভেতর। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ইহুদিরা সেখান থেকে সরে যেতে থাকে। একপর্যায়ে তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় নিজার দুর্গে। এটি ছিল খাইবারের প্রথম ভাগের সর্বশেষ দুর্গ।

নিজার দুর্গ জয়

ইহুদিদের বিশ্বাস ছিল, মুসলিমরা হাজার চেষ্টা করলেও নিজার দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য তারা নারী ও শিশুদেরও সঙ্গে রাখে এ দুর্গে, যেটা আগের ৪টি দুর্গে করার সাহস করেনি তারা।

মুসলিমরা এই দুর্গে কঠোর অবরোধ আরোপ করে। কিন্তু দুর্গটি উঁচু পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত হওয়ায় মুসলিমরা তাতে প্রবেশ করার কোনো পথ খুঁজে পায় না। এদিকে ইহুদিরাও সাহস পাচ্ছিল না দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলিমদের মোকাবেলা করতে। কিন্তু তাই বলে তারা একেবারে নির্বিকার বসে ছিল না। দুর্গের ওপর থেকে তির-পাথর নিক্ষেপ করে মুসলিমদেরকে অস্থির করে তুলছিল।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখেন, নিছক অবরোধ দিয়ে দুর্গ জয় করা যাচ্ছে না, তখন তিনি মিনজানিক ব্যবহারের নির্দেশ দেন। মুসলিম সৈন্যরা মিনজানিক দিয়ে গোলা ও পাথর ছুড়তে আরম্ভ করে। এতে দুর্গের দেওয়ালে বড় বড় ছিদ্র তৈরি হয়। মুসলিম সৈন্যরা সে পথ ধরে ভেতরে প্রবেশ করে। শুরু হয় দুর্গের ভেতরে তুমুল যুদ্ধ। ইহুদিরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কারণ অন্যান্য দুর্গ থেকে সহজে সটকে পড়া গেলেও এই দুর্গ থেকে সটকে পড়া অতটা সহজ ছিল না। তাছাড়া এ দুর্গে তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরও ঠাঁই দিয়েছে। এরপরও যারা পালাবার, তারা নারী ও শিশুদেরকে মুসলিমদের হাতে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এই দুর্গের পতনের মধ্য দিয়ে খাইবারের প্রথম ভাগ অর্থাৎ নাতাত ও শিক এলাকা পুরোপুরিভাবে মুসলিমদের দখলে চলে আসে। সেখানে ছোট ছোট আরও অনেকগুলো দুর্গ ছিল। কিন্তু বড় দুর্গগুলো পতনের পর ইহুদিরা সেগুলো ছেড়ে খাইবারের দ্বিতীয় ভাগে পালিয়ে যায়।

খাইবারের দ্বিতীয় ভাগ মুসলিমদের দখলে

নাতাত ও শিক এলাকা জয়ের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতিবা, ওয়াতি ও সালালিম এলাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। সালালিম ছিল বনু নাজিরের কুখ্যাত ইহুদি আবুল হুকাইকের দুর্গ। নাতাত ও শিক এলাকা থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিরা এখানেই আশ্রয় নেয়। এ এলাকায় ৩টি দুর্গ ছিল। তবে এখানকার কোনো দুর্গে যুদ্ধ হয়েছিল কি না, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, কামুস দুর্গ জয়ের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল। ইহুদিরা আত্মসমর্পণ বা সমঝোতার পথে যায়নি।[১]

অপরদিকে ঐতিহাসিক ওয়াকিদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, মোটাদাগে এখানকার সবগুলো দুর্গই সমঝোতার মাধ্যমে মুসলিমদের অধিকারে আসে। কামুস দুর্গে ইহুদিরা প্রথমে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও পরে সমঝোতায় আসে। বাকি দুটো বিনাযুদ্ধেই মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩১-৩৩৭

নবিজি খাইবারের দ্বিতীয় ভাগে পৌঁছে কাতিবা অঞ্চলে কঠোর অবরোধ আরোপ করেন। টানা ১৪ দিন বলবৎ থাকে এ অবরোধ। কিন্তু এতেও ইহুদিরা দুর্গ থেকে বের হয় না। পরে নবিজি মিনজানিক ব্যবহারের নির্দেশ দিলে ইহুদিরা প্রাণভয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়।

অবশেষে সন্ধিচুক্তি

আবুল হুকাইকের পুত্র নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব পাঠায়, আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। নবিজি অনুমতি দেন। সে এসে এই চুক্তি করে—দুর্গের ভেতরে যারা রয়েছে, তাদের সবার প্রাণভিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেক পুরুষের সাথে তার স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজনও মুক্তি পাবে। সবাই নিজ নিজ ঘোড়া, বর্ম, সোনা-রুপা ও অন্যান্য অর্থসম্পদ রেখে এক-কাপড়ে খাইবার ত্যাগ করবে।[১]

প্রস্তাব শুনে নবিজি বলেন, তোমরা মূল্যবান কিছু গোপন করলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবেন। নবিজির শেষোক্ত শর্ত মেনে তারা সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন করে। এই সন্ধির মাধ্যমে খাইবারের সকল দুর্গ মুসলিমদের অধিকারে আসে এবং খাইবার-ভূমি সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়।

চুক্তি ভঙ্গের দায়ে দুজনের মৃত্যুদণ্ড

উল্লেখিত চুক্তি লঙ্ঘন করে আবুল হুকাইকের দুই ছেলে বড় একটি চামড়ার ব্যাগে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ এবং হুয়াই ইবনু আখতাবের মূল্যবান অলংকারাদি লুকিয়ে রাখে। মদিনা থেকে বনু নাজিরকে দেশান্তর করার সময় হুয়াই এসব অলংকার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, সন্ধির পরে কিনানা ইবনুর রবিকে নিয়ে আসা হয় নবিজির কাছে। বনু নাজিরের গুপ্তধন তারই সংরক্ষণে ছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলে, গুপ্তধন কোথায় আছে কিংবা আদৌ আছে কি না, সে ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। এ সময় এক ইহুদি এসে জানায়, আমি প্রতিদিন সকালে কিনানাকে একটি ধ্বংসস্তূপে আনাগোনা করতে দেখি। নবিজি তখন কিনানাকে লক্ষ করে বলেন, ওখানে গুপ্তধন পাওয়া গেলে তোমাকে হত্যা করা হবে। তুমি রাজি তো? সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে। নবিজি তৎক্ষণাৎ খানাতল্লাশির নির্দেশ

---

[১] তবে *সুনানু আবি দাউদের* বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়, সন্ধির সময় সে এই চুক্তিও করেছিল, ইহুদিদেরকে খাইবার থেকে দেশান্তর করার সময় মুসলিমরা খুশি হয়ে তাদেরকে বাহনভরতি সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবে এবং এমনটাই করা হয়। [*সুনানু আবি দাউদ*, খাইবারের জমির বিধান অধ্যায়, হাদিস নং : ৩০০৬; এর সনদ হাসান।]

দেন। তল্লাশিতে বেশ কিছু সম্পদ বেরিয়ে আসে সেখান থেকে। নবিজি তখন কিনানার কাছে বাকি সম্পদের সন্ধান চান। কিন্তু এবারও সে আগের মতোই মিথ্যা বলতে থাকে। ফলে তাকে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, গুপ্তধনের সন্ধান না দেওয়া পর্যন্ত একে শাস্তি দিতে থাকো।

যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক টুকরো কাঠ দিয়ে তার বুকের ওপর উপর্যুপরি আঘাত করেন। এতে সে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে। দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয় এই বুঝি তার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে। তবু সে গুপ্তধনের ব্যাপারে কোনো তথ্য ফাঁস করে না। উপায় না দেখে নবিজি তাকে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার হাতে তুলে দেন। তিনি তার ভাই মাহমুদ ইবনু মাসলামার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করেন। উল্লেখ্য, মাহমুদ ইবনু মাসলামা নায়িম দুর্গের দেওয়ালের ছায়ায় বসে ছিলেন। এমন সময় কিনানা এসে ওপর থেকে চাক্কি ফেলে তাকে শহিদ করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করেন, কিনানার চাচাতো ভাই আবুল হুকাইকের দুই পুত্রের বিরুদ্ধে সম্পদ গোপন করার অভিযোগ করলে, আল্লাহর রাসুল তাদেরকেও হত্যা করার নির্দেশ দেন।

এর বাইরে নবিজি সাফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাবকে বন্দি করেন। তিনি ছিলেন কিনানা ইবনু আবিল হুকাইকের নব পরিণীতা। কিছুদিন আগেই তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

গনিমত বণ্টন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছে ছিল, খাইবার থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করবেন। কিন্তু ইহুদিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেন। ইহুদিরা অনুনয় করে বলে, হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাদের এখানেই থাকতে দিন। আমরা ফের চাষাবাদ করব। এখানকার মাটি ও তার উর্বরতা সম্পর্কে আমরা আপনাদের তুলনায় ভালো জানি। নবিজি ভাবেন, এই মুহূর্তে তার ও সাহাবিদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে দাস নেই। তাই লোক দিয়ে এসব জমি চাষাবাদ বা তদারক করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সাহাবিদের নানামুখী যে ব্যস্ততা, সেগুলো সামলে চাষাবাদে সময় দেওয়াও তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তৃতীয় পক্ষ দিয়ে চাষাবাদ করিয়ে উৎপাদিত শস্যের ভাগ ঘরে তুলতে পারাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই ভাবনা থেকেই নবিজি মোট উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক প্রদানের শর্তে খাইবারের সমস্ত ভূমি ইহুদিদের কাছে বর্গা দেন। সেইসাথে তাদেরকে এটাও বলে দেন যে, তিনি যতদিন চাইবেন, ততদিনই কেবল তারা এখানে থাকতে পারবে। তার ইচ্ছে হলে, যেকোনো সময় তিনি তাদের বহিষ্কার করতে পারবেন।

চুক্তির পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে এসব জমির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

খাইবারের জমি ৩৬ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি ভাগে রাখা হয় ১০০ অংশ। এভাবে মোট জমি ৩ হাজার ৬০০টি অংশে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ১৮০০টি ভাগ ছিল নবিজি ও মুসলিমদের। নবিজি এখান থেকে সাধারণ মুসলিমদের মতো একটিমাত্র ভাগ নেন। বাকিগুলো বরাদ্দ রাখেন মুসলিমদের মধ্যে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য। খাইবারের জমি এতগুলো অংশে ভাগ করার কারণ হচ্ছে, যারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য এ জমিগুলো ছিল বিশেষ উপহারস্বরূপ।

খাইবারে উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত—প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে সমান ভাগীদার। আর সংখ্যায় তারা ছিলেন ১৪০০। সাথে ২০০ ঘোড়া। প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য দেওয়া হয় দুটি করে অংশ। এজন্য খাইবারকে মোট ১৮০০টি অংশে ভাগ করা হয়।[১] প্রত্যেক অশ্বারোহী ৩টি করে অংশ পায়। আর পদাতিকরা পায় ১টি করে।[২]

---

[১] নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের গনিমতের মাল বণ্টন করেন বাইআতে রিজওয়ান তথা কেবল যারা হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন, সেসব সাহাবির মাঝে। যেহেতু সেখানে উপস্থিত সাহাবিদের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, তাই খাইবারের গনিমত বণ্টনের পরিমাণ নিয়েও সিরাত-বিশেষজ্ঞগণ, মুসলিম ঐতিহাসিক ও ফকিহগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুদাইবিয়া সন্ধির সময় আমরা ছিলাম সংখ্যায় ১৪০০। [*সহিহুল বুখারি* : ৪৮৪০] আবার জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়েই ১৫ শ সাহাবির উপস্থিত থাকার কথা বর্ণনা করছেন। [*মুসনাদু আহমাদ* : ৩৮০৭; হাদিসটি সহিহ।] ইমাম ইবনু হাজার বলেন, মূলত সংখ্যা ছিল ১৪ শয়েরও বেশি, তবে ১৫ শ থেকে কম। তাই দুটি বর্ণনার মধ্যস্থতা এভাবে হতে পারে—যারা ১৪ শ বলেছেন, তারা ১৪ শয়ের সাথে বাকি সংখ্যাটা বাদ দিয়ে বলেছেন। আর যারা ১৫ শ বলেছেন, তারা নিকটতম পূর্ণসংখ্যায় বলেছেন।

ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও বাইহাকি বর্ণনা করেন, 'নবিজি খাইবারের ভূমি ৩৬ ভাগে ভাগ করেন। অর্ধেক (অর্থাৎ ১৮ ভাগের) প্রত্যেকটি আবার ১০০ ভাগ করেন। নবিজি-সহ অন্য সকল সাহাবির মাঝে এই ১৮ শ ভাগ সমানভাবে বণ্টন করেন। আর বাকি অর্ধেক রেখে দেন আগত প্রতিনিধি দল, প্রয়োজনীয় বিষয় এবং মানুষের বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও দুর্যোগের জন্য।'

১৫ শ সৈন্যবাহিনীর ৩০০ ছিল ঘোড়সওয়ার। তদের দুটি করে অংশ দেওয়া হয়। একটি তার নিজের, অপরটি ঘোড়ার। আর ১২ শ পদাতিক সাহাবিকে দেন ১২ শ ভাগ। [*মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৪১৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩০১২; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৪৩৭; হাদিসের সনদ সহিহ। *দালাইলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৫; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত; *আস-সিরাতুন নববিইয়া*, ইবনু কাসির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮২; দারুল মাআরিফ, বৈরুত]

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৩৮

খাইবারে প্রচুর গনিমত অর্জিত হয়। ইবনু উমার বলেন, খাইবার জয়ের আগপর্যন্ত আমরা তৃপ্তিভরে আহার করতে পারিনি। আয়িশা বলেন, খাইবার জয়ের পর আমরা বলতে থাকি, এখন থেকে তৃপ্তিভরে খেজুর খাওয়া যাবে।[১]

নবিজি খাইবার থেকে মদিনায় ফিরে এলে, মুহাজির সাহাবিগণ আনসার ভাইদের দেওয়া খেজুর গাছগুলো তাদের ফিরিয়ে দেন। কেননা খাইবারে তারা বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও খেজুর গাছ ভাগে পেয়েছিলেন।[২]

জাফর ইবনু আবি তালিবের প্রত্যাবর্তন

খাইবার যুদ্ধ চলাকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই জাফর ইবনু আবি তালিব ও তার সঙ্গীগণ আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসেন। আবু মুসা আশআরি-সহ আশআর গোত্রের আরও কিছু সদস্য ছিল তার সঙ্গো। আবু মুসা আশআরি বলেন, আমরা ইয়েমেনে থাকতেই আমাদের কাছে নবিজির হিজরতের সংবাদ পৌঁছে। তখন আমার গোত্রের প্রায় ৫৩ জন তার কাছে হিজরত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। আমি ও আমার দুই ভাইও ছিলাম তাদের মধ্যে। আমরা একটি নৌকায় উঠি। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া আমাদেরকে হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে নিয়ে যায়।

সেখানে আমরা জাফর ইবনু আবি তালিব ও তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হই। জাফর বলেন, আল্লাহর রাসুল আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। এখানেই অবস্থান করতে বলেছেন আমাদেরকে। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গো এখানে থাকুন। তার কথামতো আমরা সেখানেই থেকে যাই। পরে খাইবারে গিয়ে আমরা নবিজির সঙ্গো মিলিত হই। তিনি তখন খাইবার জয় করে গনিমত বণ্টনে ব্যতিব্যস্ত। আমাদের দেখে আমাদের জন্যও তিনি গনিমতের অংশ বরাদ্দ দেন। আমাদের ছাড়া খাইবার অভিযানে অনুপস্থিত আর কাউকে কোনো অংশ দেননি তিনি।'[৩]

জাফর ইবনু আবি তালিব নবিজির সঙ্গো দেখা করলে নবিজি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। এরপর ভীষণ আনন্দিত হয়ে বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না, ঠিক কোন কারণে আজ আমার এত খুশি লাগছে, খাইবার জয় করতে পেরে নাকি জাফরকে পেয়ে!'[৪]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪২৪২

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৮; *সহিহুল বুখারি* : ২৬৩০; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭১

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩১৩৬; *সহিহ মুসলিম* : ২৫০২; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৮৪-৪৮৭

[৪] *যাদুল মাআদ* : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৯

নবিজি তাদেরকে ফেরত চেয়ে আমর ইবনু উমাইয়া আজ-জামরিকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশির কাছে পাঠিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে বাদশাহ তাদেরকে দুটি নৌযানে ফেরত পাঠান। তারা ছিল ১৬ জন পুরুষ, তাদের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের অন্যরা। বাকিরা এর আগেই মদিনায় চলে এসেছিলেন।[১]

সাফিয়ার সঙ্গো শুভ পরিণয়

কিনানা ইবনু আবিল হুকাইক গাদ্দারির কারণে মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। তার স্ত্রী সাফিয়া হয় রাজবন্দি। যুদ্ধশেষে সকল বন্দিকে একত্র করা হলে, দিহইয়া ইবনু খলিফা আল-কালবি এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এখান থেকে একটি বাঁদি দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যাও, যেকোনো একজনকে বেছে নাও। তিনি সাফিয়াকে বেছে নেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি বনু কুরাইজা ও বনু নাজিরের সর্দারনি সাফিয়া বিনতু হুয়াইকে দিহইয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন। সাফিয়া বরং আপনারই যোগ্য।

নবিজি তৎক্ষণাৎ দিহইয়াকে ডেকে পাঠান। তিনি সাফিয়াকে নিয়ে উপস্থিত হলে নবিজি সাফিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে দিহইয়াকে বলেন, তুমি অন্য একজনকে বেছে নাও। এ কথা বলে নবিজি সাফিয়াকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সাফিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্ত্রীর মর্যাদা দেন। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাকেই মোহর নির্ধারণ করা হয় এ বিয়েতে।

মদিনায় ফেরার পথে নবিজি সাহবা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। উম্মু সুলাইম সাফিয়াকে দুলহানের সাজে সাজিয়ে দেন। এরপর নবিজি তার সাথে বাসর করেন। সকালবেলা খেজুর, ঘি ও ছাতুর সমন্বয়ে তৈরি একপ্রকার পায়েস দিয়ে ওয়ালিমা খাওয়ান সাহাবিদেরকে। এ যাত্রায় তিনি সাফিয়ার সঙ্গো এক নাগাড়ে ৩ দিন অবস্থান করেন।[২]

এ সময় সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার গালে দাগ দেখতে পেয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, এটা কীসের দাগ? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার খাইবারে আগমনের পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি, আকাশের চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আল্লাহর কসম! তখনো আপনার কথা আমার মনে আসেনি। ঘটনাটি আমার স্বামীকে জানালে তিনি আমার গালে চড় দিয়ে বলেন, তার মানে তুমি

---

[১] *মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৭১; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৭

মদিনার বাদশাহকে পেতে চাও![১]

বিষমিশ্রিত বকরির ঘটনা

খাইবার জয়ের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় থিতু হন। এ সময় সাল্লাম ইবনু মিশকামের স্ত্রী যাইনাব বিনতুল হারিস তাকে একটি ভুনা বকরি হাদিয়া পাঠাতে চান। তবে পাঠানোর আগে সে জানতে চায়, নবিজি বকরির কোন অংশ খেতে বেশি পছন্দ করেন? সাহাবিরা বলেন, বকরির বাহুর গোশত তার বেশি পছন্দের। এটা শুনে মহিলা বাড়ি ফিরে যায়। এরপর একটি ছাগল জবাই করে তাতে অধিক পরিমাণে বিষ মিশিয়ে দেয়।

বকরির ভুনা গোশত নবিজি মুখে দিলেন। কিন্তু সেটুকু না গিলে একটু চিবিয়েই ফেলে দেন। এরপর সাহাবিদের বলেন, 'এই হাড়টি আমাকে বলছে, এতে বিষ মেশানো হয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকে ডেকে পাঠানো হয়। সে অকপটে সবকিছু স্বীকার করে নেয়। নবিজি তখন জানতে চাইলেন, 'তুমি এটা কেন করেছ?' সে উত্তরে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি যদি শুধুই একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে থাকেন, তাহলে এই বিষপ্রয়োগে আমরা আপনার হাত থেকে বেঁচে যাব। আর নবি হয়ে থাকলে খাওয়ার আগেই আপনি সত্যটা জেনে যাবেন।' এ কথা শুনে নবিজি তাকে ছেড়ে দেন।

তবে তিনি সবাইকে সতর্ক করার আগেই বিশর ইবনুল বারা এক লোকমা খেয়ে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বিশর-হত্যার অপরাধে পরে সেই নারীকে হত্যা করা হয় না কি ছেড়ে দেওয়া হয়—তা নিয়ে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা শোনা যায়। কিন্তু আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথমে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পরে বিশর-হত্যার দায়ে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়।[২]

হতাহতের সংখ্যা

খাইবার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ১৬ জন মুজাহিদ শহিদ হন। তার মধ্যে ৪ জন ছিলেন মুহাজির। তারা যথাক্রমে কুরাইশ, আশজা, আসলাম ও খাইবার গোত্রের স্থানীয় বাসিন্দা। আর বাকি ১২ জন আনসারি সাহাবি।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, খাইবারের যুদ্ধে সর্বমোট ১৮ জন শহিদ হন। এদিকে

---

[১] প্রাগুক্ত; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৬

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৯-১৪০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৯৭; মূল ঘটনাটি *সহিহুল বুখারিতে* বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত উভয়ভাবে এসেছে। দেখুন, *সহিহুল বুখারি* : ৩১৬৯; *সিরাতু ইবনি হিশাম* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৭-৩৩৮

আল্লামা মানসুরপুরি ১৯ জনের কথা উল্লেখ করে বলেন, অনেক গবেষণার পর আমি ২৩ জনের নাম পেয়েছি। এর মধ্যে একজনের নাম পাওয়া যায় কেবল *তারিখুত তাবারিতে*। আরেকজনের নাম কেবল ইমাম ওয়াকিদি উল্লেখ করেছেন। অন্য একজন হলেন বিষমিশ্রিত খাবার খেয়ে মৃত্যুবরণকারী। অবশ্য সর্বশেষ ব্যক্তিকে নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি আসলে বদরে শহিদ হয়েছেন নাকি খাইবারে। তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি বদরে শহিদ হয়েছেন।[১]

এই যুদ্ধে ইহুদিদের মধ্য থেকে নিহত হয়েছিল ৯৩ জন।

ফাদাক জয়

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারে পৌঁছে মাহিসা ইবনু মাসউদকে প্রেরণ করেন ফাদাকের ইহুদিদের কাছে। মাহিসা গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবে খাইবার-জয়ের সংবাদে তাদের অহংবোধ ঠিকই মিটে যায়; সেইসাথে ভয় ছড়িয়ে পড়ে তাদের সবার মধ্যে। সেজন্য তারা লোক পাঠিয়ে নবিজিকে সন্ধিচুক্তির আবেদন জানায় এবং অনুনয় করে বলে, খাইবারবাসী যেভাবে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক প্রদানের ভিত্তিতে সন্ধি করেছে, আমরাও ঠিক সেভাবে ফাদাকের অর্ধেক ফসল আপনাকে দিতে আগ্রহী। নবিজি তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। তবে ফাদাক জয়ের পেছনে যেহেতু মুসলিম বাহিনীর শ্রম দিতে হয়নি, তাই এখানকার সমুদয় আয় নবিজির জন্য বরাদ্দ থাকে।[২]

ওয়াদিল কুরা জয়

খাইবার ও ফাদাক জয়ের পরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদিল কুরা অভিমুখে রওনা করেন। সেখানে বিপুলসংখ্যক ইহুদির সমাবেশ। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে বেদুইন আরবেরও একটি দল। মুসলিম বাহিনী ওয়াদিল কুরার কাছাকাছি পৌঁছলে, ইহুদিরা তির নিক্ষেপ শুরু করে। তাদের নিক্ষিপ্ত তিরে নবিজির এক ভৃত্য মারা যায়। সাহাবিরা সুধারণাবশত বলাবলি করতে থাকেন, জান্নাত তার জন্য মুবারক হোক। নবিজি তাদের কথা শুনে বলেন, এটা কখনোই হওয়ার নয়। খাইবারের গনিমত বন্টনের আগে সে ওখান থেকে যে চাদরটা আত্মসাৎ করেছিল, তার গায়ে তা আগুনের শিখা হয়ে জ্বলবে। এ কথা শুনে এক লোক তার কাছে থাকা একটি বা দুটি জুতার ফিতা নিয়ে আসেন। নবিজি বলেন, এগুলো আগুনের ফিতা।[৩]

---

[১] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৮-২৭০

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৭, ৩৫৩

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৭০৭; *সহিহ মুসলিম* : ১১৫

গনিমতের মাল আত্মসাতের ব্যাপারে সতর্ক করার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে সেনাপতিদের হাতে পতাকা তুলে দেন। সেদিন যারা পতাকা ধারণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তারা হচ্ছেন—সাদ ইবনু উবাদা, হুবাব ইবনুল মুনজির, সাহল ইবনু হানিফ এবং আব্বাদ ইবনু বিশর রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

এভাবে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নবিজি ইহুদিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা সে দাওয়াত নাকচ করে এবং যথারীতি তাদের এক যোদ্ধা এসে মুসলিমদের প্রতি দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। যুবাইর ইবনুল আওয়াম তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং এক আঘাতেই তার ইহলীলা সাঙ্গ করেন। এরপর আরেকজন আসে চ্যালেঞ্জ নিয়ে। যুবাইর তাকেও হত্যা করেন। তারপর আসে আরও একজন। সে-ও বেঘোরে প্রাণ হারায়। এভাবে একে একে তাদের ১১ জন সৈন্য নিহত হয়। একজন করে নিহত হচ্ছিল আর নবিজি বাকিদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালে সালাতের সময় হয়ে গেলে নবিজি সাহাবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তারপর ফিরে এসে পুনরায় ইহুদিদের ইসলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিতেন। তারা অস্বীকৃতি জানালে, যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। এভাবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। পরদিন সকালে নবিজি আবারও যথারীতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সূর্যের আলো তখনো প্রখর হয়ে ওঠেনি, এমন সময় ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করে। তাদের সম্পদ মুসলিমদের কাছে হস্তান্তর করে। এ যুদ্ধে আল্লাহ মুসলিমদেরকে প্রচুর গনিমত দান করেন।

নবিজি ওয়াদিল কুরায় ৪ দিন অবস্থান করেন। প্রাপ্ত গনিমত সাহাবিদের মাঝে বিলিয়ে দেন। এরপর সেখানকার জমি ও খেজুর বাগান ইহুদিদের কাছে বর্গা দিয়ে চলে যান।[১]

তাইমা জয়

তাইমার ইহুদিদের কানে খাইবার, ফাদাক ও ওয়াদিল কুরার ইহুদিদের আত্মসমর্পণের সংবাদ পৌঁছলে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে ফেলে। স্বেচ্ছায় সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে নবিজির কাছে। নবিজি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সহায়-সম্পদ নিয়ে সেখানেই তাদেরকে থাকার সুযোগ দেন এবং তাদের নামে একটি চুক্তিপত্র লিখে পাঠান—

‘এটি তাইমাবাসীর প্রতি আল্লাহর নবি মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পাঠানো বিশেষ পত্র। স্থানীয় ইহুদিরা এখানে জিম্মি হিসেবে অবস্থান করবে এবং জিযিয়া কর দেবে। তাদের

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৬-১৪৭

প্রতি কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করা হবে না। এমনকি দেশান্তরিতও করা হবে না। এই চুক্তি পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।'

চুক্তিপত্রটি লিখেছিলেন খালিদ ইবনু সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

মদিনায় প্রত্যাবর্তন

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার পথ ধরেন। পথিমধ্যে রাত নেমে আসে। নবিজি যাত্রা অব্যাহত রাখেন। শেষ রাতের দিকে ঘুমোতে যান। যাওয়ার সময় বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, 'আজ রাত তুমি আমাদের পাহারা দেবে।' বিলাল গিয়ে তার বাহনে হেলান দিয়ে বসেন। ক্লান্তিতে চোখদুটো লেগে আসে তার। ফলে সেই রাতে কেউই আর সময়মতো জাগতে পারেন না। সকালে সূর্যের রোদ গায়ে পড়লে, সবার আগে নবিজির ঘুম ভাঙে। তিনি সবাইকে ডেকে তোলেন। এরপর সবাইকে নিয়ে ময়দান ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। এ ঘটনা অন্য এক সফরে ঘটেছে বলেও মত পাওয়া যায়।[২]

খাইবার যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ সামনে রাখলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবিজি সপ্তম হিজরির সফর অথবা রবিউল আউয়াল মাসে মদিনায় ফিরে আসেন।

নাজদ অভিযান

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমরজ্ঞান ও দূরদর্শিতা ছিল অন্য যেকোনো সেনাপতির চেয়ে ঢের বেশি। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন—যুদ্ধের নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হলে মদিনাকে অরক্ষিত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ মদিনার আশপাশের বেদুইনরা সবসময় মুসলিমদের অসাবধানতার অপেক্ষায় থাকে এবং সুযোগ পেলেই লুটপাট শুরু করে দেয়। এ কারণে নবিজি খাইবারে যাওয়ার সময় আবান ইবনু সাইদের নেতৃত্বে নাজদে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল, বেদুইনদের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের লাগাম টেনে ধরা এবং তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা। আবান তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন এবং খাইবারে এসে নবিজির সাথে মিলিত হন। অবশ্য খাইবার ততক্ষণে বিজিত হয়ে গেছে।

খুব সম্ভবত উপরিউক্ত সামরিক অভিযানের ঘটনাটি সপ্তম হিজরির সফর মাসে ঘটেছে।[৩]

---

[১] *আত-তবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৪

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪০, ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৭

[৩] *সহিহুল বুখারি,* খাইবার যুদ্ধ অধ্যায় : ৪২৩৮

ইমাম ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এই সামরিক অভিযান সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।[১]

[১] *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৯১

সপ্তম হিজরির আরও কিছু সামরিক অভিযান

জাতুর রিকার যুদ্ধ

ইসলামের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল মক্কার কুরাইশ, খাইবারের ইহুদি এবং মদিনার আশপাশের সাধারণ বেদুইনগণ। প্রথম দুই পক্ষের সাথে সন্ধি ও যুদ্ধের মাধ্যমে একটা মীমাংসা হয়। এবার তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোযোগ নিবন্ধ করেন নাজদের দুর্ধর্ষ ও বর্বর বেদুইনদের প্রতি। মানুষের সম্পদ লুট করাই এদের একমাত্র পেশা ও উপার্জন-মাধ্যম।

এদের বসবাসের নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। নেই কোনো দুর্গ বা প্রাসাদও। এ কারণে মক্কা ও খাইবারের লোকদের তুলনায় তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা অথবা স্থায়ীভাবে তাদের দস্যুবৃত্তি দমন করা ছিল ভীষণ কঠিন। এদিকে লক্ষ্য করেই মুসলিমরা কেবল তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে বিভিন্ন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এরই অংশ হিসেবে খাইবার যুদ্ধের পর নবিজি নিজে তাদের বিরুদ্ধে আরও একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন, যা গাযওয়া—জাতুর রিকা নামে পরিচিত।

অধিকাংশ গবেষকের দৃষ্টিতে এ অভিযানটি সপ্তম হিজরিতে নয়; বরং চতুর্থ হিজরিতে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু আবু মুসা আশআরি ও আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এটি সপ্তম হিজরিতে খাইবার যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছে। আমার মতেও এটি সপ্তম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ঘটনা।

বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধের সারসংক্ষেপ হলো, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সংবাদ আসে—বনু আনমার, বনু সালাবা ও বনু গাতফানের

বনু মুহারিব শাখার লোকজন মুসলিমদের বিরুদ্ধে জড়ো হচ্ছে। সংবাদ পেয়ে তিনি ৪০০ জন মতান্তরে ৭০০ জন সাহাবি সঙ্গো নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। মদিনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে যান বিশিষ্ট সাহাবি আবু যর অথবা উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে। মদিনা থেকে দুদিনের দূরত্বে শত্রু-এলাকার 'নাখল' নামক স্থানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে বনু গাতফানের একদল লোকের সাথে মুসলিমদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তারা নবিজির সঙ্গো একাত্মতা পোষণ করায় সেখানে সংঘাতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে সেদিন নবিজি সাহাবিদের নিয়ে সালাতুল খাওফ আদায় করেন।

আবু মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক এলাকার ৬ জন এ যাত্রায় নবিজির সঙ্গো বের হই। আমাদের বাহন বলতে একটিমাত্র উট। আর সেটাতেই আমরা পালা করে আরোহণ করছিলাম। গরম বালু আর পাথুরে পথে হাঁটতে গিয়ে আমাদের পায়ে ফোসকা পড়ে যায়। নখগুলো খসে পড়ে। আমরা পায়ে কাপড় বেঁধে কোনো রকম পথ চলতে থাকি। সেজন্য একে জাতুর রিকা বা 'পট্টিযুদ্ধ' বলা হয়।[১]

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন, জাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা আল্লাহর রাসুলের সঙ্গো ছিলাম। একটি ছায়াদার গাছের নিচে পৌঁছে আমরা তা নবিজির জন্য ছেড়ে দিই। লোকেরা বাবলা গাছের টুকরো টুকরো ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে বিশ্রাম নিতে থাকে। আল্লাহর রাসুল নিজেও বাবলা গাছে তরবারি ঝুলিয়ে ছায়ায় বিশ্রাম নেন। সফরের ক্লান্তিতে মুহূর্তেই চোখ লেগে আসে আমাদের সবার। হঠাৎ এক মুশরিক এসে নবিজির তরবারি হাতে নিয়ে বলে, তুমি কি আমায় ভয় করো? নবিজি বলেন, না। সে বলে, আমার হাত থেকে এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আল্লাহ! জাবির বলেন, এ সময় নবিজি আমাদের ডাকলে, আমরা দ্রুত ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, এক বেদুইন তার পাশে বসে আছে। তিনি বলেন, আমি ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এ লোকটি এসে আমার তরবারি হাতিয়ে নেয়। তারপর তরবারিটি কোষমুক্ত করে আমার ওপর উঁচু করে ধরে। শব্দ পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। উঠে দেখি, তার হাতে খোলা তরবারি। সে আমাকে বলে, এবার কে তোমাকে বাঁচাবে আমার হাত থেকে? উত্তরে আমি বলি, আল্লাহ, আল্লাহ এবং আল্লাহ। এই দেখো, সে এখানেই বসে আছে।' পরে কোনো রকম শাস্তি না দিয়েই তিনি তাকে ছেড়ে দেন।[২]

আবু আওয়ানার বর্ণনায় এসেছে, নবিজি 'আল্লাহ' বলার সঙ্গো সঙ্গো মুশরিকের হাত থেকে তরবারিটি খসে পড়ে। নবিজি সেটি তুলে নিয়ে বলেন, এবার তোমাকে কে

---

[১] *সহিহুল বুখারি*, জাতুর রিকা যুদ্ধ অধ্যায় : ৪১২৮; *সহিহ মুসলিম*, জাতুর রিকা যুদ্ধ অধ্যায় : ১৮১৬

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৯১০, ২৯১৩, ৪১৩৫

রক্ষা করবে আমার হাত থেকে? লোকটি বলে, আপনি উত্তম তরবারি-ধারক হোন।[১] নবিজি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এটা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল? লোকটি উত্তর দেয়, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। এমনকি কোনো দল আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে, তাদের সঙ্গেও থাকব না। এ কথা শুনে নবিজি তাকে ছেড়ে দেন। সে তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, আজ আমি জগতের সবচেয়ে ভালো মানুষটির কাছ থেকে ফিরে এলাম।[২]

মুসাদ্দাদ রাহিমাহুল্লাহ আবু আওয়ানার সূত্রে আবু বিশর থেকে বর্ণনা করেন, সেই বেদুইনের নাম ছিল গাওরাস ইবনুল হারিস।[৩] ইমাম ইবনু হাজার বলেন, এই ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াকিদি বলেন, লোকটির নাম ছিল দাসুর। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, ঘটনাদুটি দুই যুদ্ধে ঘটেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।[৪]

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর নবিজি সালাতের সময় হলে সৈন্যদলকে দুভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগকে নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর তারা পেছনে চলে যায়। এ সময় দ্বিতীয় দল এসে পেছনে দাঁড়ায় এবং নবিজির অনুসরণে ২ রাকাত আদায় করে। এভাবে নবিজির ৪ রাকাত পূর্ণ হয় আর সৈন্যদলের পূর্ণ হয় দুই-দুই রাকাত করে।[৫]

এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সাহাবিরা একজন মুশরিক নারীকে বন্দি করেন। তার স্বামী সেটা জানতে পেরে প্রতিজ্ঞা করে, সৈন্যদের মধ্য থেকে অন্তত একজনকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হবে না সে। তাই সে রাতের বেলা মুসলিম বাহিনীর কাছে আসে। নবিজির

---

[১] 'আপনি উত্তম তরবারি-ধারক হোন'—কাফির লোকটি এ কথার দ্বারা বুঝিয়েছে, তার ভুল ক্ষমা করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। কারণ মর্যাদাবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরা কখনো নিরস্ত্র মানুষের ওপর আক্রমণ করে না। যেহেতু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তাই তিনি সেই কাফির লোকটাকে ছেড়ে দেন এবং স্বাভাবিকভাবে তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। লোকটির ওপর শারীরিক ও মানসিক কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। এর প্রমাণ মেলে, সে ইসলামগ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর পরও নবিজি তাকে ছেড়ে দেন। যেহেতু ঘটনাটি যুদ্ধের ময়দানে ঘটেছে, তাই সে আর কখনো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না বলে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয়।

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪৩২২; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪১৬; হুবহু বর্ণনাটি আমরা আবু আওয়ানার বর্ণনায় খুঁজে পাইনি। তবে ইমাম হাকিম তার *মুস্তাদরাকে* হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৩৬

[৪] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৮

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৩৬

দুই সাহাবি তখন পালা করে ঘুমন্ত বাহিনীকে পাহারা দিচ্ছিলেন। তারা ছিলেন যথাক্রমে আব্বাদ ইবনু বিশর ও আম্মার ইবনু ইয়াসির।

আব্বাদ ইবনু বিশরের পালা এলে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান, আর তখনই লোকটির ছুড়ে দেওয়া তির তার গায়ে এসে বিঁধে। তিনি সালাত না ছেড়ে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকেন। পরপর ৩টি তির এসে তার গায়ে বিঁধে যায়। তবু তিনি সালাত থামাননি। সালাম ফেরানোর পর অপর সাথি আম্মারকে জাগিয়ে তোলেন। বিস্ময়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে আম্মারের। তিনি বলেন, কী আশ্চর্য! এতক্ষণ জাগাননি কেন আমাকে? আব্বাদ বলেন, আমি সালাতে একটি সুরা পাঠ করছিলাম। সেটি শেষ না করে সালাত ছেড়ে দিতে মন সায় দিচ্ছিল না।

এই যুদ্ধের মাধ্যমে বর্বর আরব বেদুইনদের মাঝে ভীতি সঞ্চার হয়। ফলে বনু গাতফানের গোত্রগুলো আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সাহস পায়নি। সভ্য হয়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। একসময় ইসলামও গ্রহণ করে তাদের অনেকে। মক্কাবিজয়ের সময় মুসলিমদের পক্ষে বনু গাতফানের বেশ কয়েকটি গোত্র অংশ নেয়। হুনাইন যুদ্ধেও অংশ নিয়ে গনিমতের ভাগীদার হয় তারা। মক্কাবিজয়ের পর নবিজি তাদের কাছে যাকাত উসুলকারীদের পাঠালে তারা যাকাত পরিশোধ করে। এভাবেই খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ত্রিমুখী শক্তির সব কয়টির পতন হয়। সেইসাথে হিজায অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় অখণ্ড শান্তি ও নিরাপত্তা। ফলে মুসলিমদের মধ্যে তৈরি হয় যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সক্ষমতা।

এজন্য দেখা যায়, জাতুর রিকা যুদ্ধের পর থেকে মুসলিমরা হিজাযের বাইরের বিভিন্ন শহর ও রাজ্য জয়ের অভিযাত্রায় নামেন। অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলোর শান্তি ও স্থিতি তাদেরকে এ সুযোগ করে দেয়।

এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর সপ্তম হিজরির শাওয়াল মাস পর্যন্ত নবিজি মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বাহিনী প্রেরণ করেন। এখানে তার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো—

কাদিদ অভিযান

কাদিদ অঞ্চলে বনু মুলাব্বি নামে এক গোত্র বাস করত। সপ্তম হিজরির সফর বা রবিউল আউয়াল মাসে তারা বাশির ইবনু সুওয়াইদের সাথিদের হত্যা করে। তারই শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে গালিব ইবনু আব্দিল্লাহর নেতৃত্বে সেখানে একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তারা গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের ওপর চড়াও হন। বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে তাদের উটের পাল নিয়ে রওনা হন মদিনার পথে। এ সময় শত্রুপক্ষের বড় একটি অস্ত্রধারী দল তাদের ধাওয়া করে। কিন্তু তারা মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি আসতেই

মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। মুহূর্তেই স্রোত বইতে থাকে দুই দলের মাঝখান দিয়ে। এতে শত্রুসেনারা কাছে ঘেঁষতে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে তারা নিরাপদে ফিরে আসে মদিনায়।

হাসমা অভিযান

এ অভিযান পরিচালিত হয় সপ্তম হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসে। রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠিপত্র-প্রেরণ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করেছি।

তুরবা অভিযান

সপ্তম হিজরির শাবান মাসে উমারের নেতৃত্বে 'তুরবা' অঞ্চলে একটি অভিযান চালানো হয়। তিনি ৩০ জন সৈন্য নিয়ে অভিযানে বের হন। যাত্রাপথে তারা রাতের বেলা পথ চলতেন আর দিনের বেলা আত্মগোপন করে থাকতেন। এরপরও কীভাবে যেন সেখানে বসবাসকারী হাওয়াযিন গোত্রের কানে তাদের সংবাদ পৌঁছে যায় এবং তারা রণেভঙ্গ দেয়। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

ফাদাক অভিযান

সপ্তম হিজরির শাবান মাসে বাশির ইবনু সাদের নেতৃত্বে ফাদাকের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৩০ জনের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। তারা শত্রুদের পরাস্ত করে বিপুল পরিমাণ উট ও ভেড়া গনিমত হিসেবে লাভ করেন। কিন্তু ফেরার পথে শত্রুরা তাদের পিছু নেয়। শুরু হয় উভয় পক্ষের তির বিনিময়। এক পর্যায়ে মুসলিম সেনাদের সমস্ত তির শেষ হয়ে যায়। সেই সুযোগে শত্রুরা তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলে। প্রাণে বেঁচে যান কেবল বাশির। আহত অবস্থায় তার ঠাঁই হয় এক ইহুদি শিবিরে। ঘা শুকিয়ে গেলে পরে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

মিফাআ অভিযান

সপ্তম হিজরির রামাদান মাসে মিফাআ অঞ্চলে বসবাসরত বনু আউয়াল ও বনু আবদ ইবনি সালাবা গোত্রের বিরুদ্ধে গালিব ইবনু আব্দিল্লাহর নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠানো হয়। অবশ্য কারও কারও মতে, তাকে জুহাইনা গোত্রের 'হুরাকাত' শাখায় পাঠানো হয়েছে। এ যাত্রায় মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৩০। তারা একযোগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং যারাই মোকাবেলা করতে আসে, তাদের সবাইকে হত্যা করেন। এরপর উট ও ভেড়ার পাল নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

এ যুদ্ধেই উসামা ইবনু যাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মিরদাস ইবনু নাহিক নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যে ধরাশায়ী হওয়ার পর হত্যার ঠিক আগমুহূর্তে শাহাদাহ পাঠ করেছিল। উসামা ভেবেছিলেন, এটা তার জীবন বাঁচানোর কৌশলমাত্র। তাই তিনি তাকে হত্যা

করে ফেলেন। এ ঘটনা শুনে নবিজি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। উসামাকে তিরস্কার করে তিনি বলেন, তুমি কি তার অন্তর দুভাগ করে দেখেছিলে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী?

খাইবার অভিযান

সপ্তম হিজরির শাওয়াল মাসে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার নেতৃত্বে খাইবারে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে ৩০ জন সৈন্য অংশ নেয়। অভিযানের কারণ এই ছিল যে, উসাইর মতান্তরে বাশির ইবনু রিযাম মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গাতফান গোত্রের লোকদের সমবেত করছিল। তখন মুসলিমরা উসাইরকে আশ্বাস দেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খাইবারের গভর্নর করবেন। এ আশ্বাস পেয়ে উসাইর এবং তার ৩০ জন সঙ্গী মুসলিমদের সাথে মদিনায় যেতে রাজি হয়। কিন্তু কারকারাতু নায়ার নামক স্থানে পৌঁছে, উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং তার জের ধরে উসাইর ও তার সঙ্গীরা মুসলিমদের হাতে প্রাণ হারায়।

জাবার অভিযান

সপ্তম হিজরির শাওয়াল মাসে খবর আসে—ইয়েমেন ও জাবারের অধিবাসী বনু গাতফান মতান্তরে ফাযারা ও আযরা গোত্রের লোকেরা মদিনা আক্রমণের জন্য জড়ো হচ্ছে। সংবাদ পেয়ে তখনই বাশির ইবনু সাদের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে ৩০০ জন সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। কৌশলগত কারণে এ বাহিনীটি দিনের বেলা আত্মগোপনে থাকত আর রাতের বেলা পথ চলত। এত কিছুর পরও শত্রুদের কানে তাদের সংবাদ পৌঁছে যায় এবং তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এতে বিনাযুদ্ধে বাশিরের বাহিনী বিপুল পরিমাণ উট গনিমত হিসেবে লাভ করেন। স্থানীয় দুজনকে বন্দি করতেও সক্ষম হন তিনি। পরে তাদেরকে নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। মদিনায় এসে বন্দিরা ইসলাম গ্রহণ করে।

গাবা অভিযান

ইমাম ইবনুল কাইয়িমের মতে, এটি সপ্তম হিজরিতে উমরাতুল কাজার পূর্বে পরিচালিত অভিযানগুলোর একটি। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো, জুশাম ইবনু মুআবিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি বেশকিছু সৈন্য নিয়ে গাবায় উপস্থিত হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জনমত তৈরি করা। সংবাদ পেয়ে নবিজি আবু হাদরাদকে দুজন সৈন্য-সহ সেখানে পাঠান। তিনি এমন সমরকুশলতার পরিচয় দেন, তার কৌশলের সামনে শত্রুরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। আর তিনি প্রচুর উট ও বকরি নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন মদিনায়।[১]

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫০; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৯-২৩১;

উমরাতুল কাজা

ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বেশ কয়েকটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, জিলকদ মাসের চাঁদ দেখা গেলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদেরকে হুদাইবিয়ার কাজা উমরা আদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত ছিল, তাদের কেউ যেন এ যাত্রায় অনুপস্থিত না থাকে। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যারা শাহাদাত-বরণ করেছেন, তারা বাদে বাকিরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। হুদাইবিয়ায় অনুপস্থিত ব্যক্তিরাও যাত্রা করেন তাদের সাথে। নারী ও শিশু ব্যতীত এ যাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ২ হাজার।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার আবু রুহম আল-গিফারিকে মদিনার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে মক্কার উদ্দেশে রওনা করেন। কুরবানির জন্য সঙ্গে নেন ৬০টি উট। এগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় নাজিয়া ইবনু জুনদুব আল-আসলামিকে। যুল-হুলাইফা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধেন। এরপর তালবিয়া পাঠ করেন। সাহাবিরাও তার অনুসরণে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করতে থাকেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় নবিজি এবার সাথে রেখেছেন অস্ত্রশস্ত্র ও হালকা কিছু যুদ্ধ-সরঞ্জাম। ইয়াজিজ প্রান্তরে পৌঁছে অপেক্ষাকৃত ভারী অস্ত্রগুলো সেখানে জমা করেন। সেসব অস্ত্রের মধ্যে ছিল ঢাল, তির, বর্শা ইত্যাদি। অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করে নবিজি সামনে এগিয়ে যান। কোষবদ্ধ তরবারি এবং একজন মুসাফিরের সঙ্গে সাধারণত যেটুকু অস্ত্র থাকে, সেটুকু নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।[২]

মক্কায় প্রবেশকালে নবিজি তার উটনী কাসওয়াতে সওয়ার ছিলেন। সাহাবিগণ তার চারপাশে বৃত্ত তৈরি করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং কোষবদ্ধ তরবারি উঁচিয়ে জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

মক্কার মুশরিকরা 'তামাশা' দেখার জন্য কাবার উত্তরদিকে অবস্থিত কায়াইকায়ান পাহাড়ে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিমদের সফর-ক্লান্ত দেহাবয়ব দেখে পরিহাস করে বলতে থাকে, মদিনার জ্বর এদের কাবু করে ফেলেছে। তাই জোর নেই কারও দেহে। এ কথা শুনে নবিজি সাহাবিদের বলেন, তোমরা সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণকালে তিনবার বীরদর্পে চলবে। রুকনে ইয়েমেনি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝের জায়গাটা চলবে স্বাভাবিক গতিতে। সাহাবিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তিনি সবকটি চত্বর জোর কদমে

যাদুল মাআদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৫০; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৩১; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩২২-৩২৪

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭০০

[২] প্রাগুক্ত; *যাদুল মাআদ* : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫১

চলার নির্দেশ দেননি। তার এই নির্দেশের একমাত্র কারণ ছিল, মুশরিকদের সামনে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করা।[১]

এ সময় তিনি সাহাবিদের ইযতিবা করারও নির্দেশ দেন। ইযতিবা হচ্ছে, ডান কাঁধ অনাবৃত রেখে ইহরামের চাদর বাহুমূলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের ওপর ফেলে রাখা।

নবিজি মক্কার পাহাড়ি ঘাঁটির পথ ধরে অগ্রসর হন। মুশরিকরা তার কর্মকাণ্ড দেখার জন্য আগে থেকেই সেখানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। নবিজি তালবিয়া পাঠ করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। বাইতুল্লাহয় পৌঁছে হাতে থাকা ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। এরপর তাওয়াফ শুরু করেন। তার দেখাদেখি সাহাবিগণও তাওয়াফ করেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা নবিজির সামনে দিয়ে তরবারি উঁচিয়ে যেতে যেতে আবৃত্তি করেন—

কাফির সম্প্রদায়, ছাড়ো রাসুলের পথ
রাসুলের পথেই রয়েছে রহমত।
তার কাছে এসেছে পবিত্র কুরআন
নিয়মিত তিনি তা করেন পাঠদান।
তার প্রতি আমি এনেছি ঈমান
তার কাছে পেয়েছি সত্যের জ্ঞান।
তার পথে প্রাণ দিলে আছে কল্যাণ
প্রাণপণে লড়ে নেব শত্রুর প্রাণ।
শূন্যপানে উড়বে খুলি শত্রুদের
মারের চোটে যাবে ভুলে বন্ধুদের!

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তার কবিতা শুনে বলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, তুমি নবিজির সামনে পবিত্র হারামের ভেতরে কবিতা পাঠ করছ? নবিজি বলেন, উমার, তাকে বলতে দাও। কারণ এই কবিতা তিরের চেয়েও দ্রুতগতিতে বিঁধে যাচ্ছে মুশরিকদের গায়ে।[২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিগণ সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণকালে ৩টি চক্কর সম্পন্ন করেন একেবারে বীরদর্পে। মুশরিকদের বোল তখন পালটে যায়।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৬০২, ৪২৫৬; *সহিহ মুসলিম* : ১২৬৬

[২] *জামিউত তিরমিযি*, অনুমতি প্রার্থনা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, কবিতা পাঠ অনুচ্ছেদ : ২৮৪৭; হাদিসটি সহিহ।

তারা পরস্পরকে বলতে থাকে, তোমরা না বলেছিলে, মদিনার জ্বরে এরা কাবু হয়ে পড়েছে? কই, এরা তো দেখছি, অমুক অমুক বীরের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।[১]

তাওয়াফ ও সায়ি শেষে নবিজি কুরবানির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা পশুগুলো মারওয়ার নিকটে নিয়ে দাঁড় করান। এরপর বলেন, এটি কুরবানির পশু জবাইয়ের স্থান। এছাড়া মক্কার আরও যত জায়গা আছে, সেগুলোও কুরবানির পশু জবাইয়ের উপযোগী। এ কথা বলে তিনি পশু জবাই করেন এবং সেখানেই মাথা মুণ্ডন করে নেন। সাহাবিরাও যথারীতি তাকে অনুসরণ করেন। এরপর নবিজি কয়েকজনকে ইয়াজিজ প্রান্তরে পাঠান। তারা অস্ত্রভাণ্ডার দেখাশোনার দায়িত্ব নেন এবং পূর্বের দলটিকে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন।

এ যাত্রায় নবিজি ৩ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন সকালে মুশরিকরা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলে, তোমার সঙ্গী মুহাম্মাদকে মদিনায় ফিরে যেতে বলো। তার নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে। নবিজি সঙ্গে সঙ্গে মক্কা থেকে রওনা করেন এবং সারিফ প্রান্তরে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করেন প্রথমবারের মতো।

নবিজি তার সাহাবিদের নিয়ে মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছোট্ট মেয়েটি তাদের পিছু নেয়। এরপর কাছাকাছি এসে 'চাচা' বলে ডাকতে শুরু করে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে কোলে তুলে নেন। কিন্তু তার দায়িত্বভার কে বহন করবে—এ নিয়ে আলি, জাফর ও যাইদের মাঝে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হলে নবিজি জাফরের পক্ষে রায় দেন। কারণ মেয়েটির খালা জাফরের সহধর্মিণী।

এই উমরা আদায়কালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইমুনা বিনতুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নবিজি মক্কায় প্রবেশের আগে জাফর ইবনু আবি তালিবকে মাইমুনা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে পাঠান তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। মাইমুনা বিয়ের সম্বন্ধ সম্পন্ন করার এখতিয়ার দেন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। যেহেতু আব্বাস ছিলেন তার ভগ্নিপতি। মাইমুনার অনুমতি পেয়ে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেন। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় মাইমুনাকে আনার দায়িত্ব দেওয়া হয় আবু রাফি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তাকে নিয়ে আসা হলে নবিজি সারিফ প্রান্তরে তার সঙ্গে বাসর করেন।[২]

উপরিউক্ত এই উমরাকে বলা হয় উমরাতুল কাজা বা কাজা উমরা। এটি হুদাইবিয়ার সময়কার উমরার কাজা ছিল বিধায় এই নামে নামকরণ করা হয়। সে হিসেবে উমরাতুল কাজার অর্থ হতে পারে হুদাইবিয়ার সন্ধির উমরা। গবেষকগণ দ্বিতীয় মতটিকেই

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১২৬৬

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫২

অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[১]

ইতিহাসগ্রন্থে এই উমরার চারটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—এক. উমরাতুল কাজা। দুই. উমরাতুল কাজিয়া। তিন. উমরাতুল কিসাস। চার. উমরাতুস সুল।[২]

উমরাতুল কাজার পরবর্তী অভিযানসমূহ

বনু সুলাইম অভিযান

সপ্তম হিজরির জিলহজ মাসে বনু সুলাইম গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য ইবনু আবিল আওজার নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। কিন্তু তারা ইসলামের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে বলে, তোমাদের ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। এতে আবুল আওজা আহত হন। শত্রুদের মধ্য থেকে দুজন বন্দি হয়।

ফাদাক অভিযান

অষ্টম হিজরির সফর মাসে ফাদাক এলাকায় বাশিরের সৈন্যদের যেখানে হত্যা করা হয়, সেখানে গালিব ইবনু আব্দিল্লাহর নেতৃত্বে ২০০ জনের একটি সেনাদল পৌঁছে যায়। তারা বেশ কজন শত্রুকে বধ করে এবং তাদের পশুপাল দখল করে নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে।

যাতু আতলা অভিযান

অষ্টম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে বনু কুজাআ গোত্রের লোকজন মুসলিমদের ওপর আক্রমণের লক্ষ্যে বিশাল একটি সম্মিলিত বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়। সংবাদ পেয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দমনের সিদ্ধান্ত নেন এবং সে লক্ষ্যে কাব ইবনু উমাইরের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা গিয়ে শত্রুদের ইসলামের দাওয়াত দেন। জবাবে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তির ছুড়তে শুরু করে। এই তিরযুদ্ধে সবাই শাহাদাত-বরণ করেন। নিহতদের মধ্য থেকে কেবল একজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়।[৩]

যাতু ইরক অভিযান

বনু হাওয়াযিনের বসবাস ছিল যাতু ইরক এলাকায়। তারা ইসলামের শত্রুদের অনবরত

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭২; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫০০

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩১

সাহায্য করে যাচ্ছিল। এদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে অষ্টম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে শুজা ইবনু ওয়াহব আল-আসাদির নেতৃত্বে নবিজি ২৫ জনের একটি সেনাদল পাঠান সেখানে। শত্রুরা তাদের ভয়ে পালিয়ে যায়। এ কারণে কোনো সংঘর্ষ হয়নি এ অভিযানে। মুসলিমরা তাদের পশুপাল নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসেন মদিনায়।[১]

মুতার যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মুসলিমরা যতগুলো যুদ্ধাভিযান করেছিল, এ যুদ্ধটি ছিল সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও হৃদয়বিদারক। এ যুদ্ধটিই খ্রিষ্টান দেশগুলো জয়ের পথ উন্মোচন করে দেয়। অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা তথা ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত হয় এ যুদ্ধ।

মুতা শামের বালকা অঞ্চলের নিকটবর্তী একটি জনপদ। সেখান থেকে বাইতুল মাকদিসের দূরত্ব মাত্র ২ দিনের।

যুদ্ধের কারণ

নবিজি হারিস ইবনু উমাইর আল-আযদিকে দিয়ে বসরার গভর্নরের কাছে একটি পত্র পাঠান। হারিস বালকায় পৌঁছলে, সেখানে রোমসম্রাট হিরাকলের পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর শুরাহবিল ইবনু আমর আল-গাসসানি তাকে বন্দি করার আদেশ দেয়। প্রথমে তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। এরপর শুরাহবিলের সামনে এনে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

তখনকার সময়েও দূতহত্যা ছিল একটি গর্হিত কাজ। দূতহত্যা প্রেরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ভীষণ মর্মাহত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৩ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন বালকার উদ্দেশে। এর আগে খন্দক যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো যুদ্ধে এত বিশাল সৈন্যসমাবেশ দেখা যায়নি।

সেনাপতিদের উদ্দেশে নবিজির উপদেশ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইদ ইবনুল হারিসাকে এ যুদ্ধের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। তারপর বলেন, যাইদ শহিদ হলে, তার জায়গায় জাফর সেনাপতি হবে। জাফরও যদি শহিদ হয়, তবে সেনাপতি হবে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।[২] এরপর নবিজি মুসলিম বাহিনীর জন্য একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে সেটা যাইদ ইবনুল হারিসার

---

[১] প্রাগুক্ত; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, ইবনুল জাওযি, পৃষ্ঠা : ৩৩, টীকা

[২] *সহিহুল বুখারি*, মুতা যুদ্ধ অধ্যায় : ৪২৬১

হাতে তুলে দেন।[১]

যুদ্ধযাত্রার আগে নবিজি তাদের বলে দেন—

হারিস ইবনু উমাইর যেখানে বন্দি ও শহিদ হয়েছিলেন, প্রথমে তোমরা সেখানে যাবে। এরপর সেখানকার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা সে দাওয়াত কবুল করলে, তাদের সাথে সৌজন্য রক্ষা করে চলবে। এর বাইরে অন্য কিছু করলে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য চাইবে এবং যুদ্ধে নেমে পড়বে।

নবিজি তাদের আরও বলেন—

তোমরা আল্লাহর নামে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে। কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। লক্ষ্য থেকে চুল-পরিমাণ সরে দাঁড়াবে না। শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও গির্জায় অবস্থানকারী দুনিয়াত্যাগী লোকদের হত্যা করবে না। খেজুর বা অন্য কোনো গাছ কাটবে না। কোনো স্থাপনা ধ্বংস করবে না।[২]

মুসলিম বাহিনীর যাত্রা

মুসলিম বাহিনী যাত্রা করার প্রাক্কালে মদিনার আপামর জনগণ তাদেরকে বিদায় জানাতে আসে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোনীত সেনাপতিদের দুআ ও সালাম জানিয়ে বিদায় দেয় তারা। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা কেঁদে ফেলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, দুনিয়ার মহব্বত অথবা সম্পর্কের মায়ায় পড়ে আমি কাঁদছি না। আমি কাঁদছি নবিজির মুখে কুরআনের একটি আয়াত শুনে, যেখানে আল্লাহ বলেছেন—

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾

তোমরা প্রত্যেকেই জাহান্নাম অতিক্রম করবে, এটি আপনার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।[৩]

জানি না, জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রমকালে আমার কী অবস্থা হবে! লোকেরা তাকে বলে, আল্লাহ তোমাদের নিরাপত্তার চাদরে জড়িয়ে রাখুন। সকল

[১] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩২৭

[২] প্রাগুক্ত; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭১

[৩] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৭১

বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করুন। যুদ্ধ শেষে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন সৎকর্মশীল, সফল ও গনিমত লাভকারী হিসেবে। আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা তখন আবৃত্তি করেন—

আল্লাহর কাছে প্রথমেই আমি চাইছি মাগফিরাত
মগজ আমার থেঁতলে যাবে, চাই এমন আঘাত!
বর্শার আঘাতে যেন আমার কলিজা চিরে যায়
ক্ষতবিক্ষত আমাকে চেনার থাকে না যেন উপায়!
আমার কবরের পাশ দিয়ে গেলে সবাই যেন বলে
'এই যোদ্ধা জীবন দিয়েছে আল্লাহর পথে চলে।'

কবিতা আবৃত্তির পর মুসলিম বাহিনী রওনা হয়ে যায়। নবিজি সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দেন। এরপর বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে আসেন।[১]

মুসলিম শিবিরে উৎকণ্ঠা

মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। হিজাযের উত্তরাঞ্চল-সংলগ্ন শামের মাআন নামক স্থানে এসে শিবির স্থাপন করে। এ সময় গুপ্তচর মারফত তারা জানতে পারে, রোমসম্রাট হিরাকল বালকা অঞ্চলের অন্তর্গত মাআবে ১ লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। পাশাপাশি আরব ভূখণ্ডের লাখাম, জুযাম, বালকিন, বাহরা, বালা প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরও ১ লক্ষ সৈন্য।

জরুরি বৈঠক ও সমাবেশ

মুসলিমদের ধারণাও ছিল না, তারা এই দূরদেশে এসে এমন দুর্ধর্ষ ও বিশাল এক শত্রুদলের মুখোমুখি হবেন। তাদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ২ লাখ শত্রুসেনার বিশাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, নাকি বিকল্প কিছু ভাববেন? রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়ে যান মুসলিম সেনা ও সেনাপ্রধানরা। টানা দুদিন তারা এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। গভীরভাবে চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। সবকিছু মাথায় রেখে তারা সিদ্ধান্ত নেন—শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা জানিয়ে নবিজির কাছে একটি পত্র লিখবেন। তিনি ভালো মনে করলে তাদের সাহায্যে সৈন্য পাঠাবেন, অন্যথায় তাদেরকে বিকল্প কোনো নির্দেশ দেবেন এবং তারা সে নির্দেশনা মেনে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা সবার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। সৈন্যদেরকে উৎসাহ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৭৩-৩১৪; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৬; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩২৭

দেন। তাদের হিম্মত জোগান এবং নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ দিয়ে তাদেরকে উজ্জীবিত করে তোলেন। তিনি বলেন—

প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা যা এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ তা তো পরম আরাধ্য—শাহাদাত! এর জন্যই তো তোমরা বেরিয়েছ। আমরা কখনো সৈন্যসংখ্যা, শক্তিমত্তা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিচারে যুদ্ধ করি না। আমরা তো কেবল সেই দ্বীনের জন্য লড়াই করি—যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এগিয়ে চলো। দুটির একটি তো অর্জিত হবেই—হয় বিজয় নয় শাহাদাত!

অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার বক্তব্য অনুসারে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মুসলিম বাহিনীর যাত্রা

মুসলিম বাহিনী মাআন এলাকায় দুই রাত যাপনের পর শত্রু-অভিমুখে রওনা করেন। বালকার অন্তর্গত 'মাশারিফে' গিয়ে তারা হিরাকলের বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকেন। শত্রুবাহিনী আরও এগিয়ে এলে তারা মুতা প্রান্তরে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখানে ঘাঁটি গাড়েন এবং যুদ্ধের জন্য সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করেন। বাহিনীর ডানপক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয় কুতবা ইবনু কাতাদাকে, আর বামপক্ষের দায়িত্ব অর্পিত হয় উবাদা ইবনু মালিক আল-আনসারির কাঁধে।

যুদ্ধের সূচনা এবং সেনাপতিদের শাহাদাত

মুতা প্রান্তরে উভয় দল মুখোমুখি হয়। সূচনা হয় এক তিক্ত লড়াইয়ের। ২ লক্ষ সৈন্যের বিপরীতে মাত্র ৩ হাজার সৈন্যের অসম যুদ্ধ। এক অদ্ভুত লড়াইয়ের সাক্ষী হয় গোটা বিশ্ব। ঈমানি ঝড় যখন বইতে শুরু করে, তখন এমন কত বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা যে ঘটে!

সর্বপ্রথম নবিজির পালকপুত্র যাইদ ইবনুল হারিসা পতাকা হাতে সামনে অগ্রসর হন। প্রাণপণে লড়াই করতে থাকেন তিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সাহস আর বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের নজির কেবল সাহাবিদের মধ্যেই পাওয়া যায়। বর্শার অনবরত আঘাতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া অবধি তিনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে যান। অবশেষে পান করেন শাহাদাতের অমিয় সুধা।

তার শাহাদাতের পর নবিজির চাচাতো ভাই জাফর ইবনু আবি তালিব ঝান্ডা হাতে এগিয়ে যান। তিনিও অভূতপূর্ব বীরত্বের সাথে লড়াই করে যান শত্রুদের সাথে। তীব্র লড়াইয়ের একপর্যায়ে তিনি তার সাদাকালো ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়েন শত্রুদের ওপর। উপর্যুপরি আঘাতে অস্থির করে তোলেন তাদেরকে। শত্রুরা সমান বেগে আঘাত হানে তার ওপর। এ সময় তার ডান হাত কাটা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাম

হাতে পতাকা তুলে নেন। ওভাবেই যুদ্ধ চালিয়ে যান যথারীতি। কিন্তু শত্রুরা তার বাম হাতটাও কেটে ফেলে। তবু দমে যান না তিনি। বাহু দিয়ে বুকে আগলে রাখেন ইসলামের পতাকা। মৃত্যু পর্যন্ত তার বুকের ওপর উড়তে থাকে সে পতাকা। এক বর্ণনায় এসেছে, এক রোমক সৈনিক প্রচণ্ড আঘাতে তার দেহ দুই ভাগ করে ফেলে। বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দুটি ডানা উপহার দেন। সাথে জান্নাতের সর্বত্র বিচরণের সৌভাগ্য। এ দিকে লক্ষ করেই তাকে বলা হয় 'জাফর আত-তাইয়ার' এবং 'জাফর যুল জানাহাইন'; এর অর্থ যে উড়তে পারে বা ডানাওয়ালা।

জাফরের মৃত্যুর পর ইবনু উমার তার দেহ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন, তাতে তরবারি ও বর্শার সর্বমোট ৫০টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সবগুলো আঘাতই ছিল দেহের সামনের অংশে; পেছনের অংশে কোনো আঘাত ছিল না।[১]

ইবনু উমার বলেন, মুতার যুদ্ধে আমিও অংশ নিয়েছিলাম। যুদ্ধশেষে আমরা জাফর ইবনু আবি তালিবের খোঁজে বের হই। তাকে শহিদদের মধ্যে পাওয়া যায়। তার দেহে তরবারি ও বর্শার আঘাত ছিল ৯০টিরও বেশি।[২]

উমারির সূত্রে নাফির অপর এক বর্ণনায় এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমরা দেখতে পাই, তার গায়ের সবগুলো আঘাতই সামনের অংশে।[৩]

জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বীরোচিত শাহাদাতের পর যুদ্ধের পতাকা তুলে নেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। তিনি এক হাতে পতাকা আর এক হাতে তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যান শত্রুব্যূহ লক্ষ্য করে। শত্রুর উচ্ছ্বসিত জোয়ারে মনে দ্বিধা জাগলে তিনি আবৃত্তি করতে থাকেন—

দোহাই লাগে মন রে আমার, চল জিহাদে চল!
মনের ধোঁকায় পড়িস না তুই, বুকে রাখিস বল।
দেখ চেয়ে দেখ, যুদ্ধে সবাই পুরো ময়দানজুড়ে
তুই নিজেকে রাখবি কেন জান্নাত থেকে দূরে?

এরপর তিনি বীরবিক্রমে লড়াই করতে থাকেন। শত্রুর চাপ কমলে তার চাচাতো ভাই এক টুকরো গোশত নিয়ে এসে বলেন, এটা খেয়ে কোমরটা অন্তত সোজা করে নাও। এই কদিনের ঝড়-ঝাপটায় পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি তোমার। তিনি টুকরোটি

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪২৬০

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫১২

হাতে নিয়ে এক কামড় খেয়ে বাকিটা ফেলে দেন। এরপর তরবারি হাতে নিয়ে আবার শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বীরবিক্রমে লড়তে লড়তে শাহাদাত-বরণ করেন।

পতাকা বহনের দায়িত্ব হস্তান্তর

আজলান গোত্রের সাবিত ইবনু আরকাম নামক এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে পতাকা হাতে তুলে নেন। এরপর সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা উপযুক্ত একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করো। তারা বলে, তুমিই নাও এ দায়িত্ব। তিনি বলেন, আমি এর যোগ্য নই। এরপর সবাই মিলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে সেনাপ্রধান মনোনীত করেন। তিনি পতাকা হাতে নেওয়ার পর নবোদ্যমে লড়াই শুরু হয়। খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুতার যুদ্ধের দিন আমার হাতে ৯টি তরবারি ভেঙেছে। সবশেষে আমার হাতে কেবল একটি ছোট ইয়েমেনি তরবারি থেকে যায়।[১] আরেক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, সেদিন আমার হাতে সব মিলিয়ে ৯টি তরবারি ভেঙেছে। শেষমেশ খুব ছোট একটা ইয়েমেনি তরবারিই ছিল আমার একমাত্র ভরসা।[২]

এদিকে লোক-মারফত যুদ্ধের সংবাদ নবিজির কাছে পৌঁছার আগেই ওহির আলোকে তিনি উপস্থিত সাহাবিদের সামনে যুদ্ধের বিবরণ দিচ্ছিলেন—যাইদ পতাকা হাতে নিয়েছে। সে শহিদ হয়ে গেছে। এরপর পতাকা নিয়েছে জাফর, সেও শাহাদাত-বরণ করেছে। তারপর নিয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা। সেও এখন নেই। নবিজি যখন এই বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তার দুচোখ বেয়ে তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছিল। তিনি বলেন, অবশেষে আল্লাহর এক তরবারি[৩] পতাকা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। এরপর আল্লাহ মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন।[৪]

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অভিনব যুদ্ধকৌশল

মুসলিম সেনাদের হাজার বীরত্ব, অসীম সাহসিকতা ও জীবন বাজি রাখার অনিঃশেষ চেতনা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র একটি বাহিনীর পক্ষে শত্রুদের উত্তাল সমুদ্রের সামনে টিকে থাকা রীতিমতো অসম্ভব ও বিস্ময়কর। তার ওপর পরপর ৩ জন সেনাপ্রধানের পরপর মৃত্যুতে অবস্থা এখন আরও জটিল। এই দুঃসময়ে মুসলিম বাহিনীর সামনে এসে নেতৃত্ব দেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি সেদিন এমন রণনৈপুণ্য ও

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪২৬০

[২] প্রাগুক্ত

[৩] আল্লাহর তরবারি বলতে এখানে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বোঝানো হয়েছে। কারণ তার উপাধি সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি।

[৪] প্রাগুক্ত

বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, যা ইতিহাসের পাতায় চির-অম্লান হয়ে থাকবে।

যুদ্ধের শেষ ফলাফল কী দাঁড়িয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। সকল বর্ণনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের প্রথম দিন শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন, এদেরকে প্রতিহত করতে হবে এক অভিনব যুদ্ধকৌশলের মাধ্যমে। যেকোনোভাবেই হোক এদের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দিতে হবে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করেন, যাতে রোমানরা বিষয়টি টের না পায় এবং পেছন থেকে ধাওয়া করে না বসে। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, মুসলিমদের প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা ও পিছু হটার বিষয়টি টের পেয়ে গেলে ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়দিন সকালবেলা খালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সৈন্যদের অবস্থানে পরিবর্তন আনেন। সম্মুখভাগের সৈন্যদের পেছনে এবং পেছনের সৈন্যদের সামনে নিয়ে আসেন। ঠিক একইভাবে ডানদিকের সৈন্যদের বামদিকে এবং বামদিকের সৈন্যদের ডান দিকে নিয়ে আসেন। এতে বাহিনীর নতুন একটি কাঠামো তৈরি হয়। রোমান সেনারা ভাবে, মুসলিমদের সঙ্গে নিশ্চয়ই নতুন কোনো বাহিনী এসে যুক্ত হয়েছে। আর তাদের সৈন্যসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যথাসময়ে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খালিদ তার বাহিনীর সেনা-বিন্যাস ঠিক রেখে তাদেরকে নিয়ে একটু একটু করে পিছু হটতে থাকেন। রোমান সৈন্যরা ভাবে, মুসলিমরা নিশ্চয়ই কৌশলগত সুবিধা নেওয়ার জন্য পিছু হটছে। এখন তাদেরকে ধাওয়া করতে গেলে তারা আমাদের সবাইকে বিজন মরুপ্রান্তরে নিয়ে নতুন কোনো ফাঁদে ফেলবে। তখন বেঘোরে প্রাণ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। এই ভয়ে তারা মুসলিমদের ধাওয়া না করে স্বদেশে ফিরে যেতে মনস্থির করে। ওদিকে মুসলিমরা পিছু হটতে থাকে এবং নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে।[১]

হতাহতের সংখ্যা

এই যুদ্ধে ১২ জন সাহাবি শহিদ হন। রোমক বাহিনীর ঠিক কতজন নিহত হয়েছিল, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায়, তাদের নিহতের সংখ্যা ছিল মুসলিমদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

যুদ্ধের প্রভাব

মূলত দূতহত্যার প্রতিশোধ নিতেই মুসলিম বীরসেনারা মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৫১৩-৫১৪; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৬

হাজারো বাধা সত্ত্বেও তারা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুদের ওপর। তবে যে লক্ষ্যে মুসলিম সৈন্যরা এমন এক দুঃসাহসী অভিযানে নেমেছিলেন, তা অর্জিত না হলেও সমগ্র আরববিশ্বে তাদের অসীম বীরত্বের কথা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুতার যুদ্ধে জয়লাভ না করেও সর্বমহলে তারা ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। কারণ রোমনরা তখন সারা বিশ্বের পরাশক্তি। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়া মানে নিশ্চিত পরাজয় বরণ করা। সেখানে মাত্র ৩ হাজার সৈন্য তাদের ২ লাখ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই নিরাপদে ফিরে আসতে পারা ছিল একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

তাদের এই অসম্ভবকে সম্ভব করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, মুসলিমরা ছিল আরবের অতীত ও বর্তমানের শক্তিধরদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্যপ্রাপ্ত। তাদের রাসুল একজন সত্য নবি। এ যুদ্ধের পর কাফিরদের চোখেও ধরা পড়ে এ সত্যগুলো। তারা দেখতে পায়, একসময় যেসকল গোত্র মুসলিমদের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত ছিল, এ যুদ্ধের পর তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গোত্র হলো—বনু সুলাইম, আশজা, গাতফান, জুবিয়ান, ফাযারা প্রমুখ।

রোমকদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধ মুসলিমরা সুস্পষ্ট জয় না পেলেও, পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহর জয় ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইসলামের পরিধি বিস্তারে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যাতুস সালাসিল অভিযান

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারেন, মুতার যুদ্ধে শামের আরব গোত্রগুলো রোমকদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, তখন তিনি এমন একটি কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি মনে করেন, যার কল্যাণে রোমক ও আরব গোত্রগুলোর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং সেই দূরত্ব শামের আরব গোত্র ও মদিনার মুসলিমদের নৈকট্যের কারণ হবে। এটা করা গেলে, ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এত বড় সৈন্যসমাবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে।

এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবিজি আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্বাচন করেন। তাকে বিশেষভাবে নির্বাচনের কারণ হচ্ছে, তার দাদি ছিলেন শামের বালা গোত্রের নারী। মুতা যুদ্ধের পরপর অষ্টম হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসে নবিজি তাকে সেখানে পাঠান।

অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে নবিজি খবর পেয়েছেন, শামে বসবাসরত কুজাআ গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক হামলার উদ্দেশ্যে

মদিনার আশপাশে জড়ো হয়েছে। তাদেরকে দমনের জন্য তিনি আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে এ বাহিনী পাঠান। হতে পারে, উপরিউক্ত ঘটনাদুটি একই সূত্রে গাঁথা।

নবিজি এ যাত্রায় আমর ইবনুল আসের জন্যে দুটি পতাকা প্রস্তুত করেন। একটি সাদা, অন্যটি কালো। এরপর ৩০০ জন বিশিষ্ট সাহাবির নেতৃত্বভার তাকে দিয়ে শামের দিকে পাঠিয়ে দেন। এ বাহিনীতে ঘোড়া ছিল ৩০টি। যাত্রার আগে নবিজি তাদের বলে দেন, পথিমধ্যে তারা যেন বালা, আযরা ও বালকিন গোত্রের কাছে সাহায্য চায়।

নবিজির নির্দেশনা অনুসারে যথাসময়ে বাহিনী রওনা হয়ে যায়। তারা রাতের বেলা চলতেন আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে তারা জানতে পারেন, শত্রুদল অনেক ভারী। সেনাপতি আমর ইবনুল আস পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে পেরে রাফি ইবনু মাকিস আল-জুহানির মাধ্যমে নবিজির কাছে সৈন্য-সাহায্যের আবেদন করেন। নবিজি তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররার নেতৃত্বে ঝান্ডা-সহ ২০০ জনের আরেকটি সৈন্যদল পাঠান। এদের মধ্যে আবু বকর, উমার-সহ বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মুহাজির ও আনসার সাহাবিও ছিলেন। নবিজি আবু উবাইদাকে বলেছিলেন, আমর ইবনুল আসের সঙ্গো মিলিত হতে এবং উভয় দল মিলেমিশে কাজ করতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আবু উবাইদা পুরো সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিতে চান। আমর বলেন, আপনি তো সহায়ক সৈন্যদল নিয়ে এসেছেন। মূল সেনানায়ক তো আমি। এরপর আবু উবাইদা তার নেতৃত্ব মেনে নেন। সালাতের সময় আমর ইবনুল আস ইমামতি করেন।

অবশেষে তিনি সেনাদল নিয়ে কুজাআ গোত্রে পৌঁছেন। তারা বশ্যতা স্বীকার করলে, বিনাযুদ্ধেই কুজাআর সমগ্র অঞ্চল মুসলিমদের অধীনে চলে আসে। মুসলিম বাহিনী শহরের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত বিজয় অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে তারা একটি শত্রুদলের অস্তিত্ব টের পান। কালক্ষেপণ না করে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের ওপর। তাদের আক্রমণের মুখে শত্রুরা সেখান থেকে সরে পড়ে।

মুসলিম সেনাপতি তখন আউফ ইবনু মালিক আল-আশজায়িকে দিয়ে নবিজির কাছে খবর পাঠালেন, মুসলিমরা সফল হয়েছে। শত্রুপক্ষ হার মেনেছে। আমরা এখন নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসছি।

যাতুল সুলাসিল বা সালাসিল হলো ওয়াদিউল কুরার পেছনে অবস্থিত একটি জায়গা। এই জায়গাটি মদিনা থেকে ১০ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। ইবনু ইসহাক বলেন, মুসলিমরা জুযাম গোত্রে সালসাল নামক একটি জলাশয়ের কাছে অবতরণ করায় এই অভিযানের নামকরণ করা হয় যাতুস সালাসিল।[১]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২৩-৬২৬; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৭

খাযরা অভিযান

বনু গাতফানের লোকেরা নাজদের অন্তর্গত খাযরা এলাকায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ ঘটালে অষ্টম হিজরির শাবান মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু কাতাদার নেতৃত্বে সেখানে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫ জন। এ অভিযানে বেশ কজন শত্রু হতাহত হয়। বন্দিও হয় অনেকে। বিপুল গনিমত চলে আসে মুসলিমদের হাতে। এ যাত্রায় আবু কাতাদা ১৫ দিন মদিনার বাইরে অবস্থান করেন।[১]

[১] *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৩; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৩৩

মক্কাবিজয়

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মক্কাবিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক মহান বিজয়। এ বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীন, রাসুল এবং মুসলিমদের সম্মানিত করেন। বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য নির্মিত কাবাকে রক্ষা করেন কাফির-মুশরিকদের কর্তৃত্ব থেকে। এ বিজয়ে আসমানবাসীদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। দুনিয়াবাসী দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে শুরু করে। নিখিল বিশ্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক অপার্থিব আলোয়।[১]

মক্কা অভিযানের কারণ

হুদাইবিয়ার ঘটনায় আমরা উল্লেখ করেছি, সেখানে সম্পাদিত চুক্তির একটি দফা এমন ছিল—'যেকোনো গোত্র চাইলে মুসলিম অথবা কুরাইশদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। তবে যে গোত্র যাদের সঙ্গে যুক্ত হবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এরপর প্রবেশকারী গোত্রের ওপর কোনো ধরনের অত্যাচার করা হলে, ধরে নিতে হবে গোটা সম্প্রদায়ের ওপরই অত্যাচার করা হয়েছে।'

উল্লেখিত শর্তের ভিত্তিতে বনু খুযাআ মুসলিমদের সঙ্গে যোগ দেয়, আর বনু বকর যোগ দেয় কুরাইশদের সঙ্গে। দুই গোত্র দুই পক্ষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এটাও একটা কারণ যে, জাহিলি যুগ থেকেই বনু খুযাআ ও বনু বকরের মধ্যে বিরোধ চলছিল। পছন্দের গোত্র বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও সে বিরোধের প্রতিফলন ঘটে। সন্ধিচুক্তি মেনে বনু খুযাআ নিজেদের সংযত রাখতে পারলেও বনু বকর সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। তাদের

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬০

মনে জেগে ওঠে প্রতিশোধগ্রহণের এক পাশবিক কামনা। সে লক্ষ্যে তারা খুযাআ গোত্রে আক্রমণের ছক আঁকে। তাদের নেতা নাওফাল ইবনু মুআবিয়া আদ-দাইলি একদল সৈন্য নিয়ে অষ্টম হিজরির শাবান মাসের একরাতে খুযাআ গোত্রের ওপর হামলে পড়ে। কুরাইশরা অস্ত্র দিয়ে তাকে সাহায্য করে। উৎসাহী কিছু কুরাইশ সশরীরে অংশও নেয় এ আক্রমণে।

খুযাআ গোত্র তখন 'ওয়াতির' নামক ঝরনার ধারে বসবাস করত। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণে তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রাণ হারায় অসংখ্য পুরুষ। যারা কোনোরকম প্রাণে বেঁচে যায়, তাদের অনেকে পবিত্র হারামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বনু বকরের লোকেরা সেখানেও পৌঁছে যায়। যাদের মনে তখনো হারামের কিছুটা সম্মান বাকি ছিল, তারা তাদের গোত্রপতি নাওফালকে সতর্ক করে বলে, 'নাওফাল, আমরা এখন হারামে প্রবেশ করেছি। তোমার রবের দোহাই লাগে, এবার একটু থামো।' সে তখন খুব অহংকারের সাথে জবাব দিয়েছিল, 'আজ কোনো রব নেই! তোমরা তোমাদের প্রতিশোধ নাও। তোমরা তো হারামে চুরিও করো। তাহলে প্রতিশোধ নিতে সমস্যা কোথায়?'

খুযাআর যেসব লোক হারামে প্রবেশ করতে পারেনি, তারা গিয়ে আশ্রয় নেয় বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা আল-খুযাই ও তাদের আজাদকৃত গোলাম রাফির ঘরে।

এদিকে আমর ইবনু সালিম আল-খুযাই এ দুঃসংবাদ নিয়ে সরাসরি মদিনায় ছুটে আসেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবিদের নিয়ে মাসজিদে নববিতে উপবিষ্ট ছিলেন। আমর সবার সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সেই রোমহর্ষক ঘটনার বর্ণনা দেন এভাবে—

হে দয়াময়, শপথ করি প্রতিজ্ঞার, যা দিয়েছি নবিকে।
তার আগে তার পিতাকে। সে বেশ আগের কথা...
এ মজলিসের সবাই তখন শিশু, আমরা ছিলাম পিতা।
আর ছিঁড়েনি সেই মিতালির মালা, পিঠ বাঁকিয়ে হয়নি পলায়ন।
সেই থেকে আমরা নবির মিতা!

দোহাই নবি, ডাকুন তবে আজ, সেপাইরা নিক সাজ
তাদের মাঝে চাঁদের মতো আপনারই বিরাজ!
গমসোনালি রঙের ছটায় জ্বলবে জামার ভাঁজ!
তবু যেজন জুলুম করে, ঠাট্টাবাজি ছুড়ে মারে

কী আসে যায়, নবি!
কালিভুসায় মলিন হবে তারই মুখচ্ছবি।
নবির সেপাই ঢলের মতো, সাগর ফেনার রাশি
আপনি দাঁড়ান! ওগো নবি, তাদের মাঝে আসি।
ভেঙ্গো গেছে চুক্তি সকল, শত্রুরা তাই বাজায় বগল
সন্ধি-সনদ ছুড়ছে পায়ের তলে,
কুরাইশ আজ গাড়ল ঘাঁটি! যখন এলাম চলে।
ফেরার পথে কুদায় নাকি আমায় নেবে তুলে
'কেউ যাবে না সঙ্গো আমার!' তাই ভেবেছে ভুলে!
ইতর ওরা, নগণ্যজন। হামলা দিল রাতে!
আমরা তখন রত ছিলাম রবের ইবাদতে।
তাই তো খুনে লাল হয়েছে প্রান্তর ওয়াতির
সিজদামাঝে নত ছিল এই আমাদের শির।

নবিজি তার অভিযোগ শুনে বলেন, শোনো আমর ইবনু সালিম, তোমার সাহায্য এসে গেছে। খানিক বাদেই আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখা যায়। নবিজি সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেন, এই মেঘ বনু কাবের সাহায্যের সুসংবাদ নিয়ে যাচ্ছে।

আমরের পর বুদাইল ইবনু ওয়ারাকা আল-খুযাইর নেতৃত্বে বনু খুযাআ গোত্রের আরও একটি দল মদিনায় এসে নবিজিকে বনু বকরের নৃশংসতা সম্পর্কে অবহিত করে। সেইসাথে এ নৃশংসতায় কুরাইশদের ভূমিকা কী ছিল, সেটাও খুলে বলে।

চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা

কুরাইশ ও তার মিত্ররা যা করেছিল, সেটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও বিশ্বাসঘাতকতা। তারা নিজেরাও এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। কাজেই তারা চটজলদি একটি সুরাহা বের করার জন্য জরুরি পরামর্শসভা ডাকে এবং সবার পরামর্শে সন্ধি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ান ইবনু হারব মদিনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কুরাইশরা কী পদক্ষেপ নিতে পারে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই সেটা সাহাবিদের জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি, আবু সুফিয়ান সন্ধি নবায়ন ও তার মেয়াদ বৃদ্ধি করতে তোমাদের কাছে আসছে।

হলোও ঠিক তা-ই। কুরাইশদের পরামর্শের ভিত্তিতে আবু সুফিয়ান মদিনার উদ্দেশে

রওনা করে। উসফান নামক স্থানে পৌঁছলে, বুদাইল ইবনু ওয়ারাকার সঙ্গে তার দেখা হয়। বুদাইল তখন মদিনা থেকে ফিরছিলেন। আবু সুফিয়ান পরিষ্কার বুঝতে পারে, বুদাইল মুহাম্মাদের কাছ থেকেই ফিরছে। তারপরও জিজ্ঞেস করে, কোত্থেকে ফিরছ বুদাইল? বুদাইল বলেন, এই তো, খুযাআর সাথে ওই উপকূলে গিয়েছিলাম। আবু সুফিয়ান গলার স্বর কিছুটা তীক্ষ্ণ করে আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুহাম্মাদের কাছে যাওনি? বুদাইল বলেন, কই, না তো!

বুদাইল কথোপকথন সংক্ষিপ্ত করে দ্রুত সেখান থেকে মক্কার পথে রওনা করেন। আবু সুফিয়ান ভাবে, বুদাইল মদিনায় গিয়ে থাকলে, অবশ্যই তার উটকে মদিনার খেজুর খাইয়েছে। তাই উটের মল পরীক্ষা করলেই আসল সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। যেই ভাবা সেই কাজ! সে বুদাইলের উট বসার জায়গাটি খুঁজে বের করে এবং উটের মল পরীক্ষা করে যথারীতি সে মদিনার খেজুরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। তখন সে আল্লাহর নামে কসম করে বলে, বুদাইল অবশ্যই মদিনায় গিয়েছিল।

কিন্তু সেসব ভেবে এখন আর কোনো লাভ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তাই সে মদিনায় গিয়ে সোজা তার মেয়ে উম্মুল মুমিনিন উম্মু হাবিবার ঘরে হাজির হয়। মেয়ের ঘরে সাজানো বিছানা দেখে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিতে মন চায় তার। কিন্তু সে বিছানার কাছে যাওয়ামাত্রই উম্মু হাবিবা বিছানা গুটিয়ে নেন। ক্লান্ত পিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, মা আমার, এই বিছানা কি আমার উপযুক্ত নয়? নাকি আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই? মেয়ে উত্তর দিল, বাবা, এটা পবিত্র বিছানা। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল এটা ব্যবহার করেন। কিন্তু আপনি তো মুশরিক। শিরকের অপবিত্রতা আছে আপনার মধ্যে। তার কথায় আবু সুফিয়ান আহত হয় এবং রাগতস্বরে বলে ওঠে, আমার কাছ থেকে চলে আসার পর তুমি বখে গিয়েছ।

মেয়ের ঘর থেকে বের হয়ে আবু সুফিয়ান নবিজির কাছে উপস্থিত হয়। তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু নবিজির পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পায় না সে। পরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে তাকে সুপারিশ করার অনুরোধ করে। আবু বকর বলেন, আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এরপর সে একই প্রস্তাব নিয়ে যায় উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। উমার বলেন, আমি করব তোমার জন্য সুপারিশ? তাও আবার নবিজির কাছে? আল্লাহর কসম, এক টুকরো কাঠ যদি হয় আমার শেষ সম্বল, তবে সেটি দিয়েই আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব!

উমারের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে সে যায় আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। ফাতিমা ও হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুমাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাসান তখন বেশ ছোট। হামাগুড়ি দিয়ে খেলছিল। আবু সুফিয়ান আলিকে বলেন, বংশীয় দিক থেকে তুমি আমার সবচেয়ে কাছের। বিশেষ একটি প্রয়োজনে আমি তোমার কাছে এসেছি। খালি

হাতে ফিরে যেতে চাই না। তুমি কি আমার জন্য মুহাম্মাদের কাছে সুপারিশ করতে পারবে? আলি উত্তর দেন, আফসোস তোমার জন্য, আবু সুফিয়ান। আল্লাহর রাসুল একটি প্রতিজ্ঞা করেছেন। ফলে এ ব্যাপারে আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। উপায় না দেখে আবু সুফিয়ান ফাতিমার দিকে ফিরে বলে, তুমি কি তোমার ছেলেকে এই আদেশ করতে পারবে যে, সে সবাইকে নিরাপত্তা দেবে এবং এর মধ্য দিয়ে সে আরবের কিংবদন্তি সর্দারে পরিণত হবে? ফাতিমা বলেন, আল্লাহর কসম, আমার ছেলে এখনো কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো যোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া নবিজির উপস্থিতিতে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কেউ নেইও আমাদের এখানে।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে, আবু সুফিয়ান দুচোখে অন্ধকার দেখতে পায়। চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলে, হে আবুল হাসান, আমি লক্ষ করছি, বিষয়টা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। কাজেই আমাকে ভালো কোনো পরামর্শ দাও। আলি বলেন, তোমার জন্য আমার কাছে ভালো কোনো পরামর্শ নেই। আর তুমি পরামর্শ দিয়েই-বা করবেটা কী? তুমি তো বনু কিনানার সর্দার। তাই তুমি দাঁড়িয়ে জনসম্মুখে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করো। তারপর বাড়ি ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান বলে, তোমার কি মনে হয় এটা ভালো কোনো ফল বয়ে আনবে? আলি বলেন, তা অবশ্য মনে হয় না। তবে তুমি চেষ্টা তো করে দেখতে পারো। এছাড়া আর কোনো উপায়ও তো দেখছি না। বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ান মসজিদে দাঁড়িয়ে বলে, হে লোকসকল, আমি তোমাদের সামনে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করছি। এ কথা বলে সে উটের পিঠে চড়ে সোজা মক্কায় চলে আসে।

আবু সুফিয়ান মক্কায় ফিরে এলে উৎসুক কুরাইশরা তাকে ঘিরে ধরে। মদিনার অবস্থা জানতে চায় তার কাছে। আবু সুফিয়ান বলে, মুহাম্মাদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। পরে গিয়েছি আবু কুহাফার ছেলের কাছে। সে-ও ভালোমন্দ কিছু বলেনি। উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে গিয়ে তো তাকে রীতিমতো কট্টর দুশমন মনে হয়েছে। সবশেষে গেলাম আলি ইবনু আবি তালিবের কাছে। তাকে সবচেয়ে নমনীয় মনে হয়েছে। সে আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছে। আমি সে অনুযায়ী কাজ করেছি। কিন্তু জানি না, সেটা কোনো কাজে আসবে কি না।

লোকেরা জিজ্ঞেস করে, সে তোমাকে কী করতে বলেছে। আবু সুফিয়ান বলে, সে আমাকে জনসম্মুখে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করতে বলেছে। লোকেরা আবার জানতে চায়, মুহাম্মাদ কি সেটা অনুমোদন করেছে? আবু সুফিয়ান বলে, না, করেনি। সবাই তখন একসাথে তিরস্কার করে ওঠে, তোমার ধ্বংস হোক। আলি তোমার সাথে সেরেফ মশকরা করেছে। আবু সুফিয়ান অসহায়ের মতো বলে, এছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার।

গোপনে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি

সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের সংবাদ আসার ৩ দিন আগে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দিতে বলেন। আয়িশা ছাড়া আর কেউ তখনো এ বিষয়টা জানত না। এরই মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরে উপস্থিত হন। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দেখে জিজ্ঞেস করেন, কীসের প্রস্তুতি চলছে? আয়িশা কোনো সদুত্তর দিতে না পেরে বলেন, বলতে পারছি না। আবু বকর বলেন, এখন তো রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নয়। তাহলে নবিজি কোথায় যাওয়ার মনস্থ করেছেন? আয়িশা বলেন, আল্লাহর কসম, আমি কিছুই জানি না। তৃতীয় দিন সকালে আমর ইবনু সালিম আল-খুযাই ৪০ জন আরোহী-সহ মদিনায় আসেন। উপস্থিত একটি শোকগাথা রচনা করে শোনান। লোকেরা এতে কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি বুঝতে পারে। আমরের পরে আসে বুদাইল। তারপর আবু সুফিয়ান। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ লোকদের আগমনে পুরো ব্যাপারটি সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেইসাথে নবিজি সবাইকে ডেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এবার আমরা মক্কা অভিযানে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ।

নবিজি তার অভিযানের কথা গোপন রাখতে চান। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, গোয়েন্দা ও গুপ্তচরেরা যেন এ সংবাদ কুরাইশদের কানে পৌঁছাতে না পারে। আমরা তাদের ভূমিতে অবতরণের আগে যেন তারা কেউই টের না পায়।'

দুআর পাশাপাশি কৌশলগত ব্যবস্থাও নেন তিনি। তার অংশ হিসেবে আবু কাতাদা ইবনু রিবয়ির নেতৃত্বে ৮ জনের একটি ক্ষুদ্রদল পাঠান 'বাতনু ইযাম' নামক জায়গায়। এ জায়গাটি যু-খাশাব ও যুল-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর অবস্থান ছিল মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে। অষ্টম হিজরির রামাদানের শুরুর দিকে এ দলটি পাঠানো হয়। এদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের দৃষ্টি মূল ঘটনা থেকে অন্য দিকে ফেরানো। নবিজি তার উদ্দেশ্যে সফল হন। মানুষজন ধরেই নেয়, অগ্রবর্তী দল যেদিকে গেছে, নবিজির গন্তব্যও এবার সেদিকেই। মুহূর্তেই এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। অগ্রবর্তী দলটি নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছলে, তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হয়—নবিজি মক্কা অভিমুখে রওনা করেছেন। সংবাদ পেয়ে তারাও মাঝপথে এসে নবিজির সঙ্গে মিলিত হয়।[১]

---

[১] এই অভিযানেই আমির ইবনু আযবাতের হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। আমির ইসলামি রীতি অনুযায়ী মুসলিম সৈন্যদের সালাম জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুরোনো কোনো শত্রুতার জের ধরে মুসলিম বাহিনীর এক সদস্য মুহাল্লিম ইবনু যাসসামা তাকে খুন করে ফেলেন। এরপর তার উট-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র আত্মসাৎ করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়—'যে ব্যক্তি তোমাদের সালাম জানায়, তাকে বোলো না, তুমি মুমিন নও।' [সুরা নিসা, আয়াত : ৯৪]

এরপর সাহাবিরা নবিজির কাছে মুহাল্লিমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

কিন্তু ঘটনাক্রমে সাহাবি হাতিব ইবনু আবি বালতাআ কুরাইশদের কাছে নবিজির আগমন-সংবাদ জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠি কুরাইশদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এক নারীকে অর্থের বিনিময়ে রাজি করান। ওই নারী চিঠিটি তার খোঁপায় লুকিয়ে মক্কার পথে রওনা করে। এদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজিকে হাতিব ইবনু আবি বালতাআর কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আলি ও মিকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে এই বলে পাঠিয়ে দেন—'তোমরা এক্ষুনি রাওযায়ে খাখ পর্যন্ত যাও। সেখানে গেলে দেখতে পাবে, বাহনের পিঠে হাওদায় বসা এক নারীর কাছে একটা চিঠি আছে। চিঠিটা কুরাইশদের উদ্দেশে লেখা।'

নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা রওনা হয়ে যান। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে তাদের ঘোড়াদুটো। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তারা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছান এবং ওই নারীকে পেয়ে যান। তারা ওই নারীকে বাহন থেকে নামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কাছে কি কোনো চিঠি আছে?' সে উত্তর দেয়, 'না তো, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।' তারা তখন তার বাহন তল্লাশি করতে লাগলেন। কিন্তু সেখানেও কিছু পাওয়া যায় না। পরে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর নামে শপথ করে বলো, তোমার কাছে কোনো চিঠি আছে কি না! নবিজি কখনো মিথ্যে বলেন না। আর আমরাও তোমাকে মিথ্যা বলছি না। আল্লাহর কসম করে বলছি, হয় তুমি চিঠিটা বের করবে, নয়তো আমরা তোমার কাপড়চোপড় খুলে তল্লাশি করব।' অবস্থা বেগতিক দেখে মহিলাটি বলল, 'আপনারা একটু ঘুরে দাঁড়ান। আমি দিচ্ছি।' তারা ঘুরে দাঁড়ালে মহিলা তার চুলের খোঁপা থেকে চিঠিটা বের করে দেয়। তারা দ্রুত নবিজির কাছে ফিরে আসেন। চিঠিতে লেখা—হাতিব ইবনু আবি বালতাআর পক্ষ থেকে কুরাইশদের প্রতি...।

তিনি এতে নবিজির পরিকল্পিত অভিযানের কথা উল্লেখ করেন। নবিজি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার হাতিব, তুমি এসব করতে গেলে কেন? হাতিব বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, (দয়া করে) আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমি মুরতাদ হয়ে যাইনি কিংবা আমার মাঝে কোনো পরিবর্তনও আসেনি। আমি কুরাইশদের স্বগোত্রীয় কেউ নই। আমি তাদের মিত্র গোত্রের সাধারণ এক সদস্য মাত্র। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন, কুরাইশ গোত্রে তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ হিফাযত করছে। আর কুরাইশ গোত্রে যেহেতু আমার বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই,

---

সাল্লাম সমস্ত ঘটনা শুনে বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহ, মুহাল্লিম যেন ক্ষমা না পায়।' এ কথাটি তিনি ৩ বার উচ্চারণ করেন। নবিজির মুখে এমন বদদুআ শুনে মুহাল্লিম কাপড় দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে যান। ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, মুহাল্লিমের গোত্রের লোকেরা ধারণা করেছিল, পরবর্তীকালে নবিজি তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছেন। [*যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫০; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২৬-৬২৮]

তাই আমি ভাবলাম, যদি আমি তাদের কোনো উপকার করে দিই, তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের দেখাশোনায় এগিয়ে আসবে।

তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে গাদ্দারি করে মুনাফিকদের দলে যোগ দিয়েছে। নবিজি উমারকে থামিয়ে বলেন, দেখো, সে বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আর তুমি হয়তো শুনেছ, আল্লাহ বদরে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ঘোষণা করেছেন—'তোমরা যা খুশি করতে পারো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।' এ কথা শুনে উমার কাঁদতে শুরু করেন। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ে। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবকিছু ভালো বোঝেন।[১]

এভাবেই আল্লাহ মক্কা অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষা করেন। ফলে কুরাইশরা কিছুই জানতে পারে না মুসলিমদের ব্যাপারে।

মক্কা-অভিমুখে মুসলিম বাহিনী

অষ্টম হিজরির ১০ই রামাদান নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিমুখে রওনা করেন। তার সঙ্গে ছিলেন ১০ হাজার সাহাবি। মদিনায় তার স্থলাভিষিক্ত করে যান আবু রুহম আল-গিফারিকে।

কাফেলা জাহফার কাছাকাছি পৌঁছলে চাচা আব্বাসের সঙ্গে নবিজির সাক্ষাৎ হয়। আব্বাস তখন ইসলাম গ্রহণ করে সপরিবারে মদিনায় হিজরত করছিলেন।

আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছলে, তার সাথে দেখা হয় চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস এবং ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়ার সঙ্গে। নবিজি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। একসময় তারা নবিজিকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কবিতা লিখে প্রচার করেছে মানুষের মাঝে। নবিজির এই উপেক্ষাভাব উম্মু সালামার চোখে ধরা পড়ে। তিনি সবিনয়ে বলেন, আপনার কারণে আপনার চাচাতো ও ফুফাতো ভাইকে দুর্ভোগ পোহাতে হলে সেটা খুব একটা ভালো দেখাবে না। এদিকে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসকে বলেন, তুমি নবিজির কাছে গিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের মতো বলো—

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩০০৭, ৬২৫৯

আল্লাহর কসম, আমাদের ওপর আল্লাহ আপনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী।[১]

সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস নবিজির কাছে গিয়ে ওপরের আয়াতটি তিলাওয়াত করে। তার চোখে-মুখে অনুতপ্ত-লজ্জিত ভাব ফুটে ওঠে। জবাবে তিনিও ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো করে বলেন—

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[২]

এরপর আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস কয়েক লাইন কবিতা পড়ে শোনান, যার অর্থ—

দামি নবির দামি জীবন—সেই জীবনের কসম!
বলব যা আজ নেইকো ফাঁকিজুকি।
লাতের নিশান উড়িয়েছি কত,
যখন ছিলাম ভীষণ আঁধারমুখী!
আঁধার রাতের পান্থ ছিলাম, দিক ছিল না জানা।
তাই বলে যে তেমন রবো! যায় না এটা মানা।
সময় এল আলো পাব, যেই পথে মোর প্রভু—
হিদায়াতের আশা আছে তবু।
মন মানে না, নাই-বা মানুক—পথ দেখালেন নবি!
যেই নবিকে তাড়িয়ে ছিলাম কেড়ে নিয়ে সবই।

আবেগের আতিশয্যে নবিজি তার বুক চাপড়ে বলেন, এই তুমিই আমাকে সবখানে উপেক্ষা করেছিলে।[৩]

---

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৯১

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৯২

[৩] ইসলামগ্রহণের পর আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস একজন ভালো মুসলিমে পরিণত হন। বলা হয়, ইসলামগ্রহণের পর লজ্জার কারণে তিনি কখনো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি চোখ

মাররুজ জাহরানে মুসলিম সেনাদের আগমন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনবরত পথ চলতে থাকেন। সিয়াম রেখেছেন তিনি-সহ সকল সাহাবি। উসফান ও কুদাইদের মধ্যবর্তী কাদিদ জলাশয়ে পৌঁছে তারা সিয়াম ভাঙেন।[১]

এরপর আবার প্রত্যেকে যাত্রা শুরু করেন। রাতের প্রথম প্রহরে মাররুজ জাহরান প্রান্তরে এসে পৌঁছেন তারা। নবিজির নির্দেশে সাহাবিরা আলাদা আলাদা জায়গায় আগুন জ্বেলে তাঁবু খাটান। দিগন্তজুড়ে হাজার হাজার অগ্নিশিখা জ্বলজ্বল করতে থাকে। নবিজি সে রাতে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাহারার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব

মুসলিমরা মাররুজ জাহরানে অবতরণ করলে, আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা খচ্চরে করে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকেন। তিনি চাইছিলেন, আশেপাশে কাউকে পাওয়া গেলে, তাকে দিয়ে মক্কার কুরাইশদের কাছে নবিজির আগমনের সংবাদ পাঠাবেন—যাতে নবিজি মক্কায় প্রবেশের আগেই তারা এসে নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে নিতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। কুরাইশদের কানে সংবাদ পৌঁছতে দেবেন না বলেই হয়তো তিনি স্থির করেছিলেন। ফলে সঠিক সংবাদ তাদের আর জানা হয় না। উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে দিন কাটতে থাকে তাদের। এরই মধ্যে আবু সুফিয়ান মুসলিমদের সংবাদ জানতে ছদ্মবেশে মক্কার বাইরে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে হাকিম ইবনু হিযাম ও বুদাইল ইবনু ওয়ারাকাকে।

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজির খচ্চরে করে মক্কার লোক খুঁজছিলাম। এমন সময় আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনু ওয়ারাকার কথোপকথনের শব্দ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। আবু সুফিয়ান বলে, আমি আজকের মতো আগুন ও সৈন্যবাহিনী আগে কখনো দেখিনি। পাশ থেকে বুদাইল বলে, এরা খুযাআর লোক। যুদ্ধ ওদের বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। প্রতিউত্তরে আবু সুফিয়ান বলে, না, খুযাআ গোত্রের এত বড় সৈন্যবাহিনী থাকতেই পারে না।

তুলে তাকাননি। নবিজিও তাকে মহব্বত করতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন। তিনি বলতেন, আশা করি, আবু সুফিয়ান হামযার পথ অনুসরণ করবে। মৃত্যুর সময় আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, তোমরা আমার জন্য কেঁদো না। ইসলামগ্রহণের পর আমি কখনো পাপকাজ করিনি। [*যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬২-১৬৩]

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৯৪৪, ২৯৫৩, ৪২৭৫, ৪২৭৬

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করি, আবু হানযালা নাকি? আবু সুফিয়ানও আমার স্বর চিনে ফেলে এবং জানতে চায়, কে? আবুল ফজল নাকি? আমি বলি, হ্যাঁ। সে বলে, আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি কুরবান হোক। কী ব্যাপার? আমি জানাই, কুরাইশের কপালে অমঙ্গল আছে। নবিজি বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আবু সুফিয়ান বলে, আমার মাতা-পিতা তোমার প্রতি কুরবান হোক। এখন বাঁচার উপায় কী? আমি বলি, তোমাকে পেলে গর্দান উড়িয়ে দেবে এরা। চুপচাপ আমার খচ্চরের পেছনে উঠে বসো। আমি তোমাকে নবিজির কাছে নিয়ে যাব। তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। এ কথা শুনে সে আমার পেছনে উঠে বসে। বাকি দুজন ফিরে যায়।

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাকে নিয়ে মুসলিমদের যতগুলো জটলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, সবাই বলাবলি করছিল, কে যায়? এরপর আল্লাহর রাসুলের খচ্চরের ওপর আমাকে দেখতে পেয়ে বলে, আল্লাহর রাসুলের চাচা তার খচ্চরে করে যাচ্ছেন। অবশেষে উমার ইবনুল খাত্তাবের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই লোকটা কে? এ কথা বলেই তিনি এগিয়ে আসেন। আমার পেছনে আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেন, আরে! আল্লাহর দুশমন আবু সুফিয়ান না? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কোনো প্রকার সংঘাত ছাড়াই যিনি তোমাকে আমার হস্তগত করেছেন। এ বলে তিনি আল্লাহর রাসুলের কাছে ছুটে যান। আমিও দ্রুত বেগে আমার খচ্চর হাঁকাই এবং আল্লাহর রাসুলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। ইতোমধ্যে উমারও সেখানে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, এই হলো আবু সুফিয়ান। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আবু সুফিয়ানকে নিরাপত্তা দিয়েছি।

এরপর আল্লাহর রাসুলের কাছাকাছি বসে তার মাথায় হাত রেখে বলি, আল্লাহর কসম, আজ রাতে আমি ছাড়া আর কেউ তার সঙ্গে কোনো রকম কথা বলতে পারবে না। এ সময় উমার বারবার আবু সুফিয়ানের কথা বললে আমি বলি, থামো উমার! আজ আবু সুফিয়ান যদি বনু আদি গোত্রের কেউ হতো, তাহলে তো এমন কথা বলতে না। জবাবে উমার বলেন, আপনিই বরং থামুন! আমার বাবা খাত্তাবও যদি ইসলামগ্রহণ করতেন, তবু তার ইসলামগ্রহণের চেয়েও আপনার ইসলামগ্রহণ আমার কাছে বেশি পছন্দের হতো। এর একমাত্র কারণ আল্লাহর রাসুলের কাছে আমার বাবা খাত্তাবের ইসলাম অপেক্ষা আপনার ইসলাম অধিক পছন্দনীয়।

নবিজি আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তাকে আপনার তাঁবুতে নিয়ে রাখুন। সকাল হলে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নবিজির কথামতো আমি তাকে নিয়ে যাই। সকালবেলা ফের তাকে নবিজির সামনে হাজির করি। নবিজি তাকে দেখে বলেন, তোমার জন্য আফসোস আবু সুফিয়ান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এ কথাটা বোঝার সময়

কি তোমার এখনো আসেনি? আবু সুফিয়ান বলে, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি কত উদার, কত দয়ালু, কত মহানুভব। যদি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য থাকত, তবে এই মুহূর্তে অবশ্যই তা আমার কাজে আসত।

নবিজি আবার বলেন, তোমার জন্য আফসোস রয়েই গেল আবু সুফিয়ান। তোমার কি এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমিই আল্লাহর পাঠানো রাসুল? আবু সুফিয়ান বলে, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি কত উদার, কত দয়ালু, কত মহানুভব। তবে আপনার নবি হওয়া নিয়ে আমার মনে সামান্য দ্বিধা আছে। আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আফসোস আবু সুফিয়ান! এখনই ইসলাম গ্রহণ করো। গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার আগে সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। তারপর আবু সুফিয়ান কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কাছে আবদার করে বলেন, আবু সুফিয়ান এই অঞ্চলের মর্যাদাবান ব্যক্তি। আপনি তার জন্য মর্যাদাপূর্ণ কোনো ঘোষণা দিন। নবিজি বলেন, আচ্ছা ঠিকাছে। তাহলে সবাইকে বলে দিন, আবু সুফিয়ানের ঘরে যারা আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ থাকবে। যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, তারাও নিরাপদ এবং যারা মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ।

মক্কার উপকণ্ঠে মুসলিম সেনাদল

ওইদিন সকালে অর্থাৎ অষ্টম হিজরির ১৭ রামাদান সকালবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাররুজ জাহরান থেকে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। এ সময় তিনি তার চাচা আব্বাসকে বলেন, আবু সুফিয়ানকে যেন তিনি পাহাড়ের পাদদেশে সংকীর্ণ এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখেন, যাতে করে মুসলিম সেনারা সে পথ অতিক্রমকালে, আবু সুফিয়ান খুব কাছ থেকে তাদের দেখতে পারেন। নির্দেশ অনুসারে আব্বাস তাকে সরু এক গিরিপথে নিয়ে দাঁড় করান।

অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল গোত্র এক-এক করে আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে। প্রত্যেক গোত্রের সঙ্গে আলাদা আলাদা পতাকা। প্রথমে একটি গোত্র অতিক্রম করে গেলে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, আব্বাস, এরা কারা? আব্বাস বলেন, এরা সুলাইম গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বলেন, সুলাইম গোত্রের সাথে আমার কোনো সংঘাত নেই। এরপর মুযাইনা গোত্রের লোকেরা চলে যায়। আবু সুফিয়ান আবার জিজ্ঞেস করে, এরা কারা? আব্বাস উত্তর দেন, এরা মুযাইনা গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বলেন, এদের সাথেও আমার কোনো বিরোধ ছিল না কখনো। এভাবে প্রত্যেক গোত্র যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করতে থাকেন, এরা কারা? আব্বাস তাদের পরিচয় জানালে তিনি বলেন, এদের সঙ্গেও আমার বিরোধ ছিল না কখনো!

সবশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের বিশেষ বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তাদের হাতে তখন সবুজ রঙের পতাকা। তারা প্রত্যেকে লোহার পোশাক পরিহিত। আবু সুফিয়ান তাদের দেখে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আব্বাস, এরা কারা? আব্বাস উত্তরে বলেন, এরা আল্লাহর রাসুলের বাহিনী। এরা সবাই আনসার ও মুহাজির সাহাবি। আবু সুফিয়ান বলেন, এদেরকে মোকাবেলা করার শক্তি নেই কারও। হে আবুল ফজল, তোমার ভাতিজা তো দেখছি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী! প্রতিউত্তরে আব্বাস বলেন, এটা রাজত্ব নয়; নবুয়ত। আবু সুফিয়ান বলেন, তবে তো এমনই হওয়ার কথা!

আনসারদের পতাকা ছিল সাদ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে। তিনি আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলেন, 'আজ লড়াইয়ের দিন। আজ খুন হালাল করা হবে। আজ আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন কুরাইশদের।' তার এ কথা শেষ হতেই নবিজি আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে চলে যান। আবু সুফিয়ান তাকে ডেকে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সাদের কথা কি আপনি শুনেছেন? নবিজি জিজ্ঞেস করেন, কেন, কী বলেছে সাদ? আবু সুফিয়ান নবিজিকে সাদের কথাগুলো শোনান। উসমান ও আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা তখন বলেন, আমরা সাদের হাতে কুরাইশদের নিরাপদ মনে করছি না! নবিজি অভয় দিয়ে বলেন, আজ তো বরং কাবার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন। আজকের দিনে আল্লাহ কুরাইশকে সম্মানিত করবেন। এরপর তিনি লোক পাঠিয়ে সাদের হাত থেকে পতাকা নিয়ে তার ছেলে কাইসের হাতে দেন। যেহেতু পতাকা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলের হাতে দেন, তাই মনে হয়, পতাকাটি সাদের হাতেই আছে। অবশ্য সাদের হাত থেকে পতাকা নিয়ে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়ার বর্ণনাও পাওয়া যায় সিরাত গ্রন্থগুলোতে।

কুরাইশের মুখোমুখি মুসলিম বাহিনী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে বলেন, তোমার গোত্রের লোকদের কাছে যাও এবার। আবু সুফিয়ান দ্রুত গিয়ে মক্কার উপকণ্ঠে হাজির হন। এরপর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, শোনো কুরাইশের জনগণ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যে, তাদের মোকাবেলা করার শক্তি তোমাদের নেই। তাই যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ থাকবে। এ সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা তার দিকে তেড়ে যায় এবং তার গোঁফ টেনে ধরে বলে, এই জঘন্য উটকো বুড়োটাকে কেউ মেরে ফেলো। বাজে খবর নিয়ে আসা এই বুড়োটার অকল্যাণ হোক।

আবু সুফিয়ান বলেন, দুর্ভাগ্য তোমাদের। জীবন বাঁচানোর প্রশ্নে এই নারী যেন তোমাদের

বিভ্রান্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আবারও বলছি, যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ থাকবে। উপস্থিত লোকেরা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক। তোমার একার ঘরে কি আমাদের সবার জায়গা হবে? আবু সুফিয়ান বলেন, তোমরা যারা নিজেদের ঘরে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রাখবে, তারাও নিরাপদ থাকবে। এমনকি যারা মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ থাকবে।

লোকজন তখন নিজেদের ঘর ও মাসজিদুল হারামে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তবে কুরাইশের কিছু উঠতি নেতা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে ভুল করে। তারা একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক জড়ো করে বলে, আপাতত এদেরকে আমরা মুসলিমদের সাথে মোকাবেলার জন্য পাঠাচ্ছি। এরা সফল হলে আমরাও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেব। আর যদি ধরাশায়ী হয়, তবে এরা আমাদের কাছে যা চাইবে, আমরা তা-ই দিয়ে দেব তাদেরকে।

এ লক্ষ্যে কুরাইশের নির্বোধ লোকেরা ইকরিমা ইবনু আবি জাহল, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া এবং সুহাইল ইবনু আমরের নেতৃত্বে খানদামা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে জড়ো হয় মুসলিমদের প্রতিহত করতে। এদের মধ্যে হিমাস ইবনু কাইস নামে বনু বকরের এক লোকও ছিল। সে অনেক দিন ধরে একটি তরবারিতে শান দিচ্ছিল। তার স্ত্রী একদিন তাকে জিজ্ঞেস করে, কার সাথে লড়াই করার জন্য তুমি এত প্রস্তুতি নিচ্ছ? হিমাস উত্তর দেয়, মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের সাথে। এটা শুনে স্ত্রী তাকে বলে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের মোকাবেলা করার শক্তি কারও নেই। তখন হিমাস বলে ওঠে, আল্লাহর কসম, এদের কয়েকজনকে আমি তোমার গোলাম বানিয়ে ছাড়ব। আজ যদি আমার পাল্লায় পড়ে, তবে তাদের আর নিস্তার নেই। আক্রমণের সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত রেখেছি আমি। এই দেখো, দু-ধারি তলোয়ার ও ধারালো বর্শা। এরপর কুরাইশের হতভাগা লোকদের সাথে সেও যোগ দেয় খানদামা পাহাড়ের পাদদেশে।

যু-তুয়ার বুকে বীরসেনাদের আগমন

এদিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাররুজ জাহরান থেকে রওনা হয়ে যু-তুয়ায় এসে পৌঁছেন। এ সময় তিনি আল্লাহপ্রদত্ত সম্মানের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতায় মাথা নিচু করে রাখেন। দাড়িগুলো তখন বাহনের পিঠ স্পর্শ করে। এখানে এসে তিনি সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে রাখেন ডানপক্ষে। এ ভাগে আসলাম, সুলাইম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা-সহ আরও কিছু গোত্রের লোকজন ছিল। ডানপক্ষ প্রস্তুত হয়ে গেলে নবিজি খালিদকে নির্দেশ করেন, নিচু এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে। কুরাইশের কেউ ঝামেলার চেষ্টা করলে মেরে ফেলবে তাকে। এরপর সাফা পাহাড়ে আমার সাথে মিলিত হবে।

বাহিনীর বামপক্ষের দায়িত্ব দেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। নবিজির পতাকা তার কাছেই ছিল। নবিজি তাকে বলেন, তোমরা প্রবেশ করবে উঁচু এলাকার

ওপর দিয়ে। এরপর হাজুন নামক স্থানে পৌঁছে সেখানে পতাকা স্থাপন করবে। আর আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে সেখানে।

পদাতিক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন আবু উবাইদা। অবশ্য তাদের সঙ্গে কোনো সমরাস্ত্র ছিল না। নবিজি তাকে সমতল পথের ওপর দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে বলেন। সেখানেই তিনি তার সঙ্গে মিলিত হবেন।

কাফির-মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশমতো প্রত্যেক সেনাপতি তার সৈন্যদল নিয়ে নির্ধারিত পথে অগ্রসর হন। যেসকল মুশরিক খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও তার সহযোদ্ধাদের পথ রোধ করার চেষ্টা করে, তাদেরকে হত্যা করা হয়। এ সময় দুজন মুসলিম সেনা শহিদ হন—কুরয ইবনু জাবির আল-ফিহরি এবং খুনাইস ইবনু খালিদ ইবনি রবিআ। তারা দুজনেই বাহিনীর মূল পথ থেকে সরে যান আর এ কারণেই শত্রুদের হাতে নিহত হন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ খানদামায় পৌঁছলে কুরাইশের সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের সাথে ছোটখাটো যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সংঘর্ষ চলে বেশ কিছুক্ষণ। এ পর্যায়ে মুশরিকদের ১২ জন নিহত হয় এবং তারা পরাজয় মেনে নিয়ে রণেভঙ্গ দেয়। পলাতকদের মধ্যে হিমাস ইবনু কাইসও ছিল। সে তার ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দেয়। স্ত্রীকে ডেকে বলে, দরজা বন্ধ রাখবে, যত দরকারই হোক না কোনো, এই দরজা খুলবে না। স্ত্রী তাকে তিরস্কার করে বলে, কোথায় গেল তোমার সেই বাহাদুরি? হিমাস উত্তর দেয়—

দেখতে যদি খানদামার সে কী তুমুল যুদ্ধ!
ভেগেছে সবাই সাফওয়ান-ইকরামা সুদ্ধ।
তাদের হাতে হাতে ছিল নাঙা তলোয়ার,
অস্ত্রের মুখে পড়লে আজ রক্ষা ছিল না আর!
চারদিকে ছিল আহতদের করুণ হাহাকার
দেখলে সেসব করতে না আর এমন তিরস্কার![১]

পথের শত্রুদের মোকাবেলা করে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মক্কার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সেখানকার বিভিন্ন এলাকা মাড়িয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে নবিজির সঙ্গে মিলিত হন।

এদিকে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুও তার নির্ধারিত পথ ধরে সামনে এগিয়ে যান। তিনি তার বাহিনী নিয়ে নির্বিঘ্নে মাসজিদুল ফাতহের কাছাকাছি হাজুন নামক স্থানে গিয়ে

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৮

পৌঁছান। এরপর নবিজির নির্দেশ অনুসারে সেখানে পতাকা গাড়েন। সাময়িক অবস্থানের জন্য একটি তাঁবু খাটান এবং নবিজির আগমন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

সত্যের জয়গান মিথ্যার অবসান

মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য সাধারণ মুসলিম পরিবেষ্টিত হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু খান। এরপর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, তার হাতে ছিল একটি ধনুক। বাইতুল্লাহর চৌহদ্দিতে তখন ৩৬০টি মূর্তি। তিনি ধনুক দিয়ে সেগুলোর গায়ে খোঁচা দিতে থাকেন আর পাঠ করতে থাকেন[১]—

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

আর বলুন, সত্য এসেছে। মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[২]

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

বলুন, সত্য এসে পড়েছে। মিথ্যা না পারে নতুন কিছু বানাতে আর না পারে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে।[৩]

তিনি খোঁচা দিতেই মুখ থুবড়ে টপাটপ পড়তে থাকে মূর্তিগুলো।[৪]

নবিজি এ যাত্রায় বাহনে চড়ে তাওয়াফ করেন। ইহরাম বাঁধা ছিল না বিধায় তিনি শুধু তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ-শেষে উসমান ইবনু তালহাকে ডেকে তার কাছ থেকে কাবাঘরের চাবি নেন। এরপর তার নির্দেশে কাবাঘর খোলা হয়। তিনি কাবায় প্রবেশ করে দেখেন, ভেতরে অনেকগুলো ছবি টাঙানো। সেখানে ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালামের ছবিও ছিল। ছবিতে তাদের দুজনের হাতে মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তির। এসব দেখে নবিজি বলেন, যারা ছবিগুলো এখানে রেখেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৪৭৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮১; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১২৩৩

[২] সুরা ইসরা, আয়াত : ৮১

[৩] সুরা সাবা, আয়াত : ৪৯

[৪] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৫২২; *আল-মুজামুল কাবির*, তবারানি : ২৩০৩; এর সনদ সহিহ।

করুন। ইবরাহিম ও ইসমাইল কখনোই তির দিয়ে ভাগ্যনির্ণয় করেননি। আরেকটু ভেতরে গিয়ে নবিজি কাঠের তৈরি একটা কবুতর দেখতে পান। তিনি নিজ হাতে ভাঙেন সেটা। এরপর তার নির্দেশে সাহাবিরা সবগুলো ছবি নষ্ট করে দেন।

জাতির উদ্দেশে নবিজির ভাষণ

কাবাঘরে প্রবেশের পর নবিজি ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে দেন। তার সঙ্গে ছিলেন উসামা ও বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। দরজা বন্ধ করে তার ঠিক বিপরীত দিকের দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। তার ও দেওয়ালের মাঝখানে তখন ৩ হাতের ব্যবধান। কাবার দুটি খুঁটি তার বাঁ দিকে, একটি ডানদিকে আর বাকি ৩টি খুঁটি ছিল তার পেছনে। কাবাঘরে তখন সর্বমোট এই ৬টি খুঁটিই ছিল।

নবিজি সেখানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে পুরো কাবা একবার প্রদক্ষিণ করেন। প্রতিটি কোনায় গিয়ে তাকবির বলেন এবং আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করেন। এরপর দরজা খুলে বাইরে আসেন। কুরাইশরা তখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাবাচত্বরে। নবিজির সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। তাদের দেখে তিনি দরজার দুই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে বলেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। জাহিলি যুগের সকল রীতিনীতি, লুটপাট ও রক্তপাত এখন আমার এই দুই পায়ের নিচে। তবে বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধান এবং হাজিদের পানি পান করানোর যে রীতি ছিল, তা বহাল থাকবে। মনে রেখো, চাবুক বা লাঠির আঘাতে কেউ নিহত হলে, সেটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গণ্য হবে। চড়ামূল্যের রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে তখন। আর রক্তপণের পরিমাণটা হলো ১০০ উট, যার ৪০টি হতে হবে গর্ভবতী।[১]

শোনো হে কুরাইশের জনগণ, আল্লাহ তোমাদের জাহিলি যুগের সকল অহমিকা ও বংশীয় গৌরব চূর্ণ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান, আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৫৪৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৬৯৭৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৬২৮; হাদিসটি হাসান।

হে মানবজাতি, আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে—যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু জানেন।[১]

আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই!

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শোনো কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের কী ধারণা, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে পারি? সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, আমাদের বিশ্বাস, আপনি সুন্দর আচরণই করবেন। কারণ আপনি তো একজন দরদি মানুষ। আমাদের এক রহমদিল ভাইয়ের সন্তান আপনি! নবিজি তখন বলেন, আজ আমি তোমাদের তাই বলব, যা ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই।'[২] যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।[৩]

মুশরিকের হাতে কাবাঘরের চাবি

তারপর নবিজি মাসজিদুল হারামে গিয়ে বসেন। এ সময় আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু কাবার চাবি নিয়ে যান তার কাছে। গিয়ে বলেন, হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্বের পাশাপাশি কাবাঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত করুন। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। অন্য এক বর্ণনামতে, আলি নন; বরং আব্বাস এই আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে নবিজি বলেন, 'উসমান ইবনু তালহা কোথায়?' উসমানকে ডাকা হলে সে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়। নবিজি তাকে বলেন, 'এই নাও তোমার চাবি। আজ হলো পুণ্য ও বিশ্বস্ততা রক্ষার দিন।'

নবিজি উসমানের কাছে চাবিটি হস্তান্তর করার সময় বলেছিলেন, 'উসমান, চিরকালের জন্য এই চাবি তোমার। জালিম ছাড়া আর কেউ তোমার হাত থেকে এটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ তোমাকে তার এই ঘর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজেই এখান থেকে যা কিছু অর্জিত হবে, তা তুমি গ্রহণ করতে পারো।'[৪]

---

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

[২] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৯২

[৩] *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১৮২৭৫; *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার* : ১৮২২৯; বাইহাকির সনদে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

[৪] *আত-তবাকাতুল কুবরা,* ইবনু সাদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০৪

কাবার ছাদে বিলালের সুমধুর আজান

সালাতের সময় হলে নবিজি বিলালকে কাবার ছাদে উঠে আজান দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠে আজান দেন। আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, আত্তাব ইবনু উসাইদ ও হারিস ইবনু হিশাম তখন কাবার আঙিনায় বসে গল্প করছিল। আজান শুনে আত্তাব মন্তব্য করে, আল্লাহ উসাইদকে বাঁচিয়েছেন, সে আজানের ধ্বনি শুনতে পায়নি। নয়তো আজ তাকে অপ্রীতিকর কিছু কথা শুনতে হতো। হারিস বলে, আমি যদি বুঝতে পারি, মুহাম্মাদ আসলেই সত্যের ওপর আছে, তবে নির্দ্বিধায় তাকে অনুসরণ করব। আবু সুফিয়ান বলে, এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। বললে, পাথরের এই টুকরোগুলো নির্ঘাত সেটা ফাঁস করে দেবে।

এমন সময় নবিজি তাদের কাছে এসে বলেন, আমি জানি, তোমরা এতক্ষণ কী বলাবলি করেছ। এরপর তিনি তাদের প্রত্যেকের বলা কথাগুলো তাদেরকে শোনান। হারিস ও আত্তাব সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল। আল্লাহর কসম করে বলছি, এখানে এমন কেউই ছিল না, যে আমাদের কথাগুলো আপনার কানে পৌঁছাতে পারে।[১]

আশ্রয় খুঁজে পেল পলাতক আসামি

সেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন চাচাতো বোন উম্মু হানি বিনতু আবি তালিবের ঘরে ওঠেন। এরপর গোসল সেরে ৮ রাকাত সালাত আদায় করেন। তখন দিনের প্রথম প্রহর। এজন্য কেউ কেউ এটাকে চাশতের সালাত বলেছেন। এটা মূলত বিজয় ও শোকরানা সালাত।

উম্মু হানি সেদিন তার দুই দেবরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নবিজি সেটা জানতে পেরে বলেন, 'শোনো উম্মু হানি, তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছ, আমার পক্ষ থেকেও তাদের আশ্রয় দেওয়া হলো।' আসলে উম্মু হানির ভাই আলি এই দুজনকে হত্যা করতে চাইছিলেন। ফলে উম্মু হানি তাদেরকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেন এবং নবিজির কাছে তাদের নিরাপত্তার আবেদন জানান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নবিজি ওপরের কথাটি বলেন।[২]

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ৯ আসামি

সেদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ জন চিহ্নিত অপরাধীর হত্যার নির্দেশ জারি করে বলেন, এদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে; এমনকি

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৭, ৩১৭১; *সহিহ মুসলিম* : ৩৩৬; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৬৯২৮

কাবার গিলাফের ভেতরে আশ্রয় নিলেও। এরা হলো—১. আব্দুল উযযা ইবনু খাতাল। ২. আব্দুল্লাহ ইবনু আবি সারহ। ৩. ইকরিমা ইবনু আবি জাহল। ৪. হারিস ইবনু নুফাইল। ৫. মিকইয়াস ইবনু সুবাবা। ৬. হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ। ৭-৮. ইবনু খাতালের দুজন দাসী, যারা নবিজিকে উপহাস করে গান গাইত। ৯. বনু আব্দিল মুত্তালিবের দাসী সারা, যার কাছে হাতিব ইবনু আবি বালতাআর চিঠি পাওয়া গিয়েছিল।

নামগুলো শোনার পর উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনু আবি সারহকে সাথে নিয়ে নবিজির সামনে হাজির হন। সুপারিশ করেন আব্দুল্লাহর জন্য। কিন্তু নবিজি সাথে সাথেই প্রাণভিক্ষা দেননি তাকে। বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়েছেন। তিনি মনে মনে চাইছিলেন, কোনো সাহাবি এসে যেন এই সুযোগে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়। কিন্তু না, কেউ তাকে হত্যার জন্য এগিয়ে এল না। এরপর নবিজি আব্দুল্লাহ ইবনু আবি সারহর কাছ থেকে ইসলামগ্রহণের মৌখিক স্বীকারোক্তি নিয়ে তাকে প্রাণভিক্ষা দিয়ে দেন। এর আগেও সে একবার ইসলাম গ্রহণ করেছিল। শুধু তা-ই নয়, হিজরতও করেছিল সবার সাথে। কিন্তু পরে সে মুরতাদ হয়ে মক্কায় ফিরে যায়।

আরেক দাগি আসামি ইকরিমা ইবনু আবি জাহল পালিয়ে যায় ইয়েমেনে। তার স্ত্রী এসে নবিজির কাছে ইকরিমার জন্য প্রাণভিক্ষা চান। নবিজি তার আবদার রাখেন। তারপর তিনি ইয়েমেনে গিয়ে স্বামীকে ফিরিয়ে আনেন। মক্কায় ফিরে এসে ইকরিমা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেন একজন খাঁটি মুসলিম হিসেবে।

ইবনু খাতাল আশ্রয় নেয় কাবাঘরের পর্দার আড়ালে। এক সাহাবি নবিজিকে এ খবরটি জানিয়ে দেন। এরপর নবিজির নির্দেশমতো সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়।

মিকইয়াস ইবনু সুবাবাকে হত্যা করেন নুমাইলা ইবনু আব্দিল্লাহ। মিকইয়াস প্রথমে মুসলিম ছিল। কিন্তু পরে এক আনসার সাহাবিকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের দল ভারী করে।

হারিস ইবনু নুফাইলকে হত্যা করেন আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। এই নরাধমটা মক্কায় নবিজিকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল।

হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ ছিল ভয়ংকর অপরাধী। সে হিজরতের সময় নবিজির বড় মেয়ে যাইনাবকে এত জোরে ধাক্কা মেরেছিল যে, তিনি বাহন থেকে শক্ত মাটির ওপর আছড়ে পড়েন। যাইনাব তখন গর্ভবতী। মাটিতে আছড়ে পড়ার কারণে তার গর্ভপাত হয়। মক্কাবিজয়ের দিন ভয়ে পালিয়ে যায় হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ। পরে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করেন। তিনি একজন খাঁটি মুসলিম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন অনন্য এক উচ্চতায়।

ইবনু খাতালের দুজন দাসীর মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়, অপরজন প্রাণভিক্ষা পেয়ে

ইসলাম গ্রহণ করে। সারাও প্রাণভিক্ষা পায় এবং যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

ইবনু হাজার বলেন, অপরাধীদের তালিকায় হারিস ইবনু তালাতিল ছিল বলেও উল্লেখ করেন আবু মাশার। আলি তাকে হত্যা করেন। এই তালিকায় ইমাম হাকিম উল্লেখ করেছেন কাব ইবনু যুহাইরের নাম। তার ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবিজির প্রশংসায় কবিতাও রচনা করেন। এই তালিকায় ওয়াহশি ইবনু হারব এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবার নামও ছিল। তারা দুজনেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনু খাতালের দাসী আরনাব এবং আরেক নারী উম্মু সাদকেও হত্যা করা হয়, যেমনটা ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে। এই হিসেবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পুরুষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮, আর নারীর সংখ্যা ৬। হতে পারে আরনাব ও উম্মু সাদ একজনই ছিল, উপনাম বা উপাধিগত পার্থক্যের কারণে দুই জায়গায় তার নাম এসেছে।[২]

ক্ষমার উজ্জ্বল নিদর্শন, অবশেষে ইসলামগ্রহণ

পদমর্যাদায় সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া কুরাইশের অনেক বড় নেতা। সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি নয়। তবে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল। তাই মক্কাবিজয়ের দিন সে ভয়ে পালিয়ে যায়। পরে উমাইর ইবনু ওয়াহব তার জন্য প্রাণভিক্ষা চাইলে নবিজি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং নিদর্শন হিসেবে নিজের মাথার পাগড়ি খুলে উমাইরকে দিয়ে দেন।

সাফওয়ান তখন সাগরপথে জেদ্দা থেকে ইয়েমেনে পালিয়ে যেতে নৌকায় ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উমাইর তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনেন। ফিরে এসে নবিজির কাছে সে ২ মাসের সময় চায়। কিন্তু নবিজি তাকে সময় দেন ৪ মাস। পরে সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী তার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবিজি তাদের পূর্বের বিয়ে বহাল রাখেন।

অপরদিকে ফাযালা ইবনু উমাইর খুবই দুঃসাহসী একজন মানুষ। তাওয়াফের সময় সে নবিজিকে হত্যা করতে চুপি চুপি তার কাছে এসে বসে। কিন্তু নবিজি ওহির মাধ্যমে জেনে যান সবকিছু। এমনকি ফাযালার মনের কথাও। এতে সে হতবাক হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।[৩]

মক্কাবিজয়ের পরদিন নবিজির ভাষণ

মক্কাবিজয়ের পরদিন নবিজি জনসমক্ষে ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ান। প্রথমে হামদ

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১০-৪১১

[২] *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১১-১২

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১৭-৪১৮

ও সানা পাঠ করে তারপর বলতে শুরু করেন—

‘আল্লাহ মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে এখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার গাছপালা কেটে ফেলা কিছুতেই বৈধ নয়। আর যদি কেউ বলে, নবিজি তো ঠিকই এখানে যুদ্ধ ও রক্তপাত করেছেন এবং এ কথা বলে নিজের জন্য সুযোগ নিতে চায়, তবে তোমরা তাকে বলে দিয়ো, আল্লাহ তাঁর নবিকে বিশেষ বিবেচনায় কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য তিনি অনুমতি দেননি। আর আমার অনুমতিও ছিল সামান্য সময়ের জন্য। এরপর সেদিনই তা পুনরায় হারাম হয়ে গেছে, যেভাবে তা আগে হারাম ছিল। তোমরা আমার এ কথাগুলো এখানে যারা আসতে পারেনি তাদের কাছে পৌঁছে দেবে।’[১]

অপর বর্ণনায় এসেছে, নবিজি বলেছেন, ‘এখানকার ঘাস কেউ কাটবে না। কোনো কাঁটাগাছ কেউ উপড়ে ফেলবে না। কোনো পশুকে শিকারের উদ্দেশ্যে ধাওয়া করতে পারবে না। কোনো বস্তু পড়ে থাকলে তা ছুঁয়েও দেখবে না, তবে ঘোষণা করার নিয়ত থাকলে ভিন্ন কথা।’ এ সময় আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, ইজখির ঘাসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলে ভালো হতো। কারণ এটা বাসাবাড়ির অনেক কাজে দরকার পড়ে।’ নবিজি তখন বলেন, ‘ঠিক আছে, তাহলে ইজখির ঘাস বাদ দেওয়া হলো।’[২]

সেদিন খুযাআ গোত্রের লোকেরা জাহিলি যুগে তাদের একজন নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনু লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। নবিজি এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘শোনো খুযাআর জনগণ, তোমরা খুনখারাবি থেকে দূরে থেকো। এসবে যদি কল্যাণ থাকত, তবে তোমরা তা অবশ্যই দেখতে পেতে। কিন্তু এমন তো হয়নি। তোমরা একজনকে হত্যা করেছ, যার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই নেব। এখন থেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির স্বজন চাইলে ঘাতকদের হত্যা করতে পারবে, আবার চাইলে রক্তপণও নিতে পারবে।’[৩]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এ সময় ইয়েমেনের বাসিন্দা আবু শাহ দাঁড়িয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এ কথাগুলো আমাকে লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।’ নবিজি তখন সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা তাকে কথাগুলো লিখে দাও।’[৪]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১০৪, ৪২৯৫; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৫৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১১২, ১৮৩৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৫৩

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৫০৪; *শারহু মাআনিল আসার* : ৫৪৫৯; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ২৪৩৪, ৬৮৮০; *সহিহ মুসলিম* : ১৩৫৫; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা :

নবিজি কি আর মদিনায় ফিরে যাবেন না?

মক্কাবিজয়ের কাজ সুসম্পন্ন হলে আনসার সাহাবিরা কানাঘুষা করতে লাগল, নবিজি কি তার মাতৃভূমিতেই থেকে যাবেন? তিনি কি আর মদিনায় ফিরে যাবেন না? নবিজি তখন সাফা পাহাড়ে দুআয় মগ্ন। দুআ শেষে তিনি আনসারদের কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা কী বিষয়ে কথা বলছিলে? তারা উত্তরে বললেন, কই? কিছু না তো। বার কয়েক জিজ্ঞাসার পর তারা তাদের শঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন। নবিজি তখন বড় আবেগভরা কণ্ঠে বলেন, আল্লাহ রক্ষা করুন, আমার জীবন ও মরণ যেন তোমাদের সাথেই হয়।[১]

দলে দলে ইসলামগ্রহণ

মক্কাবিজয়ের মধ্য দিয়ে মক্কাবাসীর সামনে সত্য উন্মোচিত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে, সর্বকালীন সাফল্যের একমাত্র পথ ইসলাম। ফলে তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং তার হাতে বাইআতের জন্য সমবেত হয়। নবিজি সাফা পাহাড়ে বসে তাদের থেকে এক-এক করে বাইআত নেন। উমার ইবনুল খাত্তাব তখন নবিজির একটু নিচে বসে ছিলেন। তিনি লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে নবিজিকে সাহায্য করেন। সবাই নবিজির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প নিয়ে বাইআত হয়।

নবিজি পুরুষদের বাইআত শেষে সাফা পাহাড়েই নারীদের বাইআত নিতে শুরু করেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তখনো একধাপ নিচে বসে ছিলেন এবং নবিজির নির্দেশনা ও নাসিহাগুলো উচ্চ কণ্ঠে নারীদের কানে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। এ সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবাও সেখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত হন। হামযার ঘটনায় জড়িত থাকায় তিনি কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। ভাবছিলেন নবিজি তাকে চিনে ফেললে সমস্যা হতে পারে।

নারীরা উপস্থিত হলে নবিজি বলেন, আমি তোমাদের থেকে বাইআত নিচ্ছি এই শর্তে—তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। উমার উচ্চকণ্ঠে তা পুনরাবৃত্তি করে সবার কানে পৌঁছে দেন এবং তাদের থেকে বাইআত নেন। এরপর নবিজি বলেন, তোমরা অপচয় করবে না। তখন হিন্দা বলেন, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমি যদি তার সম্পদ থেকে কিছু গ্রহণ করি, তাহলে কি তা ঠিক হবে? তখন আবু সুফিয়ান বলেন, আমার যা কিছু তোমার হাতে পড়বে, সবই তোমার। এ কথা শুনে

৪১৫-৪১৬; উপরিউক্ত অন্যান্য হাদিসের সনদ স্ব-স্ব স্থানে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪১৬; নাসায়ি ও অন্যান্য হাদিসে ঘটনাটি কিছুটা ভিন্নভাবে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, নবিজিকে আনসারদের ওই কথাবার্তার ব্যাপারে ওহির মাধ্যমে জানানো হয়েছিল এবং পরে তারা নবিজির কাছে নিজেদের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্তও হয়েছেন। দেখুন, *সুনানুন নাসায়ি* : ১১২৩৪; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৬৮৯৯; এর সনদ সহিহ।

নবিজি মুচকি হাসেন আর হিন্দাকেও চিনে ফেলেন। এরপর মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলেন, তুমি নিশ্চয়ই হিন্দা? হিন্দা উত্তরে বলেন, জি, আল্লাহর রাসুল। আমার আগের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন।

নবিজি আবার বলতে শুরু করেন, তোমাদের কেউ যিনা-ব্যভিচার করবে না। হিন্দা মন্তব্য করে বসেন, কোনো স্বাধীন নারী কি ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে? নবিজি তার বক্তব্য চালিয়ে যান, তোমরা কেউ সন্তানদের হত্যা করবে না। এটা শুনে হিন্দা বলেন, হ্যাঁ, ছোট থেকে আমরা তাদের লালনপালন করে বড় করে তুলব আর বড় হলে আপনারা তাদের হত্যা করবেন (হিন্দা এখানে মূলত বদরের যুদ্ধে তার ছেলে হানযালার নিহত হওয়ার বিষয়টি ইঙ্গিত করছিলেন)। তার এসব কথা শুনে উমার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। নবিজির মুখেও স্মিত হাসি ফুটে ওঠে। এরপর তিনি বলেন, তোমরা কেউ কাউকে অপবাদ দেবে না। হিন্দা জানান, অপবাদ আরোপ করা তো ঘৃণ্য একটি কাজ। আর আপনি তো সবসময় আমাদের উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। নবিজি বলেন, কোনো বিষয়ে আল্লাহর রাসুলের অবাধ্য হবে না। হিন্দা জবাব দেন, আল্লাহর কসম, আমরা এখানে আপনার অবাধ্য হওয়ার নিয়তে আসিনি।

এরপর হিন্দা বাড়ি ফিরে ঘরের সব মূর্তি ভাঙতে ভাঙতে বলেন, এতদিন তোদের কারণে আমি ধোঁকায় পড়ে ছিলাম।[১]

নবিজির মক্কায় অবস্থান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থান করেন ১৯ দিন। এ সময়টাতে তিনি মানুষকে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিখিয়ে দেন। হিদায়াত ও তাকওয়ার পথের সন্ধান দেন সবাইকে। আবু উসাইদ আল-খুযাইকে দিয়ে নতুন করে হারামের খুঁটি মেরামত করান। ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধিদল পাঠান। তার আদেশে মক্কার আশপাশের সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। তার পক্ষ থেকে একজন ঘোষণা করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে যেন তার ঘরে থাকা সকল মূর্তি ভেঙে ফেলে।'[২]

মূর্তি অপসারণের লক্ষ্যে সেনাবাহিনী প্রেরণ

[এক] মক্কাবিজয় ও তার পরবর্তী ব্যস্ততা সেরে অষ্টম হিজরির রামাদানের ২৫ তারিখ নবিজি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে উযযা মূর্তি অপসারণের উদ্দেশ্যে পাঠান। কুরাইশ ও

---

[১] *মাদারিকুত তানযিল*, ইমাম নাসাফি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৭২; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ২২৯-২৩০

[২] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৭; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৬৪

বনু কিনানা গোত্রের লোকজন এই মূর্তির পূজা করত। এটাই ওদের সবচেয়ে বড় মূর্তি। বনু শায়বান এটির তত্ত্বাবধান করত। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ৩০ জন অশ্বারোহী নিয়ে সেখানে যান। এরপর সবগুলো মূর্তি ধ্বংস করে দেন।

মূর্তি অপসারণ শেষে খালিদ নবিজির কাছে ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি ওখানে কিছু দেখেছ?' খালিদ বলেন, 'কই না তো!' নবিজি বলেন, 'তার মানে তুমি এখনো মূর্তিটা ভাঙতেই পারোনি।' এ কথা শুনে খালিদ তরবারি খাপমুক্ত করে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আবার ঘটনাস্থলে ফিরে যান। এসে দেখেন উসকোখুসকো চুলের এক নগ্ন কুৎসিত মহিলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। খালিদ তাকে দেখামাত্রই দেহের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে তরবারি চালিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ দু-ভাগ হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ নবিজির কাছে আনন্দচিত্তে ফিরে আসেন। নবিজি তখন বলেন, 'হ্যাঁ, এবার তুমি মূর্তিটি ভাঙতে পেরেছ। সে-ই ছিল উযযা। এদেশে এখন আর তার কোনো পূজা হবে না।'

[দুই] একই মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সুওয়া' নামের একটা মূর্তি ভাঙার উদ্দেশ্যে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান। মক্কা থেকে ৩ মাইল দূরে রিহাত এলাকার হুযাইল গোত্রের মূর্তি এটা। আমর ইবনুল আস সেখানে পৌঁছলে, পুরোহিত তাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা এখানে কেন এসেছ?' আমর বলেন, 'আল্লাহর রাসুল আমাকে মূর্তিটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।' পুরোহিত বলে, 'তোমরা এটা কখনোই ভাঙতে পারবে না। এটা ভাঙতে গেলে তুমি অদৃশ্য এক শক্তির সম্মুখীন হবে।' আমর বলেন, 'আফসোস, তুমি এখনো অলীক বিশ্বাস নিয়ে পড়ে আছ! এসব মূর্তি কি শুনতে বা দেখতে পায়?'

এ কথা বলে তিনি মূর্তিটির দিকে এগিয়ে যান এবং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন। এরপর সঙ্গীদের নির্দেশ দেন মূর্তিঘর ও কোষাগার ধসিয়ে দিতে। সবকিছু ধ্বংসের পর তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া যায় না সেখানে। সব কাজ সমাধা করার পর আমর ইবনুল আস পুরোহিতকে বলেন, 'কী? কেমন দেখলে?' সে তখন বলে ওঠে, 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম।'

[তিন] এ মাসেই নবিজি সাদ ইবনু যাইদ আল-আশহালিকে ২০ জন অশ্বারোহী-সহ 'মানাত' মূর্তি অপসারণের উদ্দেশ্যে পাঠান। কুদাইদের কাছাকাছি মুশাল্লাল নামক স্থানে রয়েছে এটা। মদিনার আউস, খাযরাজ, গাসসান ও আরও কিছু গোত্রের লোকজন এর পূজা-অর্চনা করে। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছলে পুরোহিত তাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী চাও এখানে?' সাদ বলেন, 'মানাতকে ধ্বংস করতে এসেছি।' পুরোহিত বলে, 'চেষ্টা করে দেখতে পারো।' সাদ মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলে এলোমেলো চুলের এক বিবস্ত্র কুৎসিত নারী তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বুক চাপড়ে 'হায় হায়' করতে থাকে

সে। পুরোহিত তখন বলে ওঠে, 'তোমার অবাধ্যদের কঠিন শাস্তি দিয়ে দাও, মানাত!' অমনি সাদ তরবারির এক আঘাতে সেই নারীকে হত্যা করে ফেলেন। এরপর মূর্তিটি ধ্বংস করেন। মূর্তিঘরের কোষাগারেও তল্লাশি চালান। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি সেখানে।

[চার] উযযা মূর্তি অপসারণের পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে অষ্টম হিজরির শাবান মাসে বনু জাযিমা গোত্রের কাছে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া, যুদ্ধ করা নয়। খালিদ মুহাজির, আনসার ও বনু সুলাইম গোত্রের ৩৫০ জন লোকসহ বনু জাযিমার উদ্দেশে রওনা করেন। সেখানে পৌঁছে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা 'আসলামনা' তথা 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম'—এ কথাটি ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে পারছিল না। তারা বলছিল, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। এতে খালিদ বিভ্রান্ত হন। তাদেরকে হত্যা ও বন্দি করতে থাকেন।

যুদ্ধ শেষে এক-একজন বন্দিকে এক-একজন সাহাবির দায়িত্বে দিয়ে বলেন, 'সবাই যার যার বন্দিকে হত্যা করে ফেলুন।' ইবনু উমার ও তার কাছের লোকেরা এতে আপত্তি জানান। উপায় না দেখে বন্দি হত্যার বিষয়টি অমীমাংসিত রেখেই মক্কায় ফিরে আসেন এবং স্বয়ং নবিজিকে মীমাংসার ভার দেন। নবিজি তখন দুহাত তুলে বলেন, 'হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে, তা থেকে আমি আপনার কাছে দায়মুক্তি চাই।' এ কথাটি তিনি দুবার বলেন।[১]

খালিদের নির্দেশে বনু সুলাইম গোত্রের লোকেরা তাদের বন্দিদের হত্যা করলেও মুহাজির ও আনসাররা তাদের বন্দিদের হত্যা করেননি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সহযোগিতা ও ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব দিয়ে নবিজি আলিকে সেখানে পাঠান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান ইবনু আউফের মাঝে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। সংবাদটি নবিজির কানে গেলে তিনি খালিদকে ডেকে বলেন, 'থামো খালিদ। আমার সঙ্গীদের কিছু বলা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর কসম, যদি উহুদ পাহাড় সোনায় পরিণত হয় আর তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তারপরও আমার কোনো এক সাহাবির একটি সকাল বা একটি বিকেলের ইবাদতের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না।'[২]

এই হলো মক্কা অভিযানের বিবরণ। এই সেই যুগান্তকারী অভিযান ও মহাবিজয়, যা মুশরিক শক্তির এতদিনের সমস্ত অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছে। আরব ভূখণ্ডে তাদের

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৩৩৯, ৬৩৪১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৫৯২২; *মুসনাদুল বাযযার* : ৬০০৬

[২] এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে যথাক্রমে এই সূত্রগুলো থেকে—*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮৯-৪৩৭; *সহিহুল বুখারি*, জিহাদ ও হজ অধ্যায়; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩-২৭; *সহিহ মুসলিম* : জিহাদ ও সফর অধ্যায়; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬০-১৬৮; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩২২-৩৫১।

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা অবশিষ্ট রাখেনি। আরবের সাধারণ গোত্রগুলো অপেক্ষায় ছিল, মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যকার চলমান এই সংঘাতের শেষ ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য। এসব গোত্র খুব ভালো করেই জানত, পবিত্র ভূমি হারামের কর্তৃত্ব তাদের হাতেই যাবে—যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে আবরাহার হস্তীবাহিনীর ঘটনায় এই বিশ্বাস তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। তারা সেদিন দেখেছিল, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অধিকারী আবরাহার সেই হস্তীবাহিনী কীভাবে চর্বিত খড়কুটোয় পরিণত হয়েছে।

বস্তুত হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল মক্কাবিজয়ের ভূমিকা বা সূচনা। এই সন্ধির ফলে সবার মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়ে। সবাই একে-অপরের সঙ্গে দিলখোলা আলাপ এবং ইসলাম-বিষয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ পায়। মক্কার যেসব মুসলিম নিজেদের ইসলামগ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিল, তারাও তা প্রকাশ করা, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া এবং দ্বীনের বিষয়ে তর্ক ও মতবিনিময়ের অবাধ সুযোগ পেয়ে যায়। এতে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়। ফলে এই অভিযানে মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা বেড়ে ১০ হাজারে গিয়ে পৌঁছায়। এর আগে যা ছিল সর্বোচ্চ ৩ হাজার।

এই চূড়ান্ত অভিযানে মানুষের দৃষ্টি খুলে যায়। ইসলাম ও তাদের মাঝে সর্বশেষ যে আবরণ ছিল, সেটাও দূর হয়ে যায়। মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ময়দানে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগপৎ তাদের অধিকারে আসে দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্ব ও দুনিয়াবি কর্তৃত্ব।

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য যে অনুকূল পরিস্থিতির সূচনা হয়েছিল, মক্কাবিজয়ের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আরবজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। আরবের লোকদের একমাত্র ব্যস্ততা হয়ে ওঠে তখন নবিজির কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ, তার হাতে ইসলামগ্রহণ এবং সারাবিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসার। পরবর্তী দু-বছর তাদের এ কাজেই ব্যয় হয়।

তৃতীয় পর্যায় : দিকে দিকে ইসলামের বিজয়

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ পর্যায় এটি। তার দাওয়াতি জীবনে যত অর্জন, সব এই পর্যায়ে এসে ধরা দেয়। ২০ বছরেরও অধিক সময়ের সংগ্রাম, কষ্ট-সাধনা, দুঃখ-দুর্যোগ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানের পর জীবনের এই পর্যায়ে এসে দাঁড়ান তিনি।

মক্কাবিজয় ছিল মুসলিমদের এযাবৎ কালের সবচেয়ে বড় অর্জন। এ বিজয়ের ফলে সর্বত্র পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। পালটে যায় আরবের পরিবেশ ও সমাজব্যবস্থাও। মোটকথা এ বিজয় পূর্বাপর সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কারণ আরবদের চোখে কুরাইশরা ছিল দ্বীনের খাদেম ও সহযোগী। সেজন্য সাধারণ আরবরা ধর্মীয় বিষয়ে তাদেরকে অনুসরণ করত। সে হিসেবে কুরাইশদের পরাজয়ের অর্থ দাঁড়ায়—আরব ভূখণ্ড থেকে মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে।

এ পর্যায়টিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক. যুদ্ধ ও সংগ্রাম। **দুই.** বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর ইসলামগ্রহণ।

এই দুইটি বিষয় একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে তুলে ধরব। যেহেতু যুদ্ধ ও সংগ্রামের বিষয়টি পূর্বের অধ্যায়গুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ, তাই আমরা এটা আগে উল্লেখ করব।

হুনাইনের যুদ্ধ

এত অল্প সময়ের ব্যবধানে মক্কাবিজয়ে আরবরা হতবাক হয়ে যায়। কুরাইশদের প্রতিবেশী গোত্রসমূহের জন্য এ আক্রমণের মোকাবেলা করা সম্ভবপর ছিল না। ফলে শক্তিশালী ও অহংকারী কিছু গোত্র ছাড়া বাকি সব গোত্র মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার

করে নেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ছিল হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্র। তাদের সঙ্গো নাসর, জুশাম এবং সাদ ইবনু বকর-সহ বনু বিলালের কিছু লোকও যোগ দেয়। মুসলিমদের কাছে আত্মসমর্পণকে এরা নিজেদের জন্য অপমানজনক বলে মনে করে এবং তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মালিক ইবনু আউফ আন-নাসরির নেতৃত্বে যুদ্ধের ছক আঁকে।

শত্রুদের অভিযাত্রা

শত্রুপক্ষের কমান্ডার মালিক ইবনু আউফ যুদ্ধের জন্য সবাইকে জড়ো করার সময় সৈন্যদের পশুপাল, স্ত্রী ও সন্তানদেরও সঙ্গো করে নিয়ে আসে। এরপর তারা আওতাসে এসে হাজির হয়। আওতাস মূলত হুনাইনের কাছাকাছি হাওয়াযিন এলাকার একটি প্রান্তর। মনে রাখতে হবে—আওতাস আর হুনাইন প্রান্তর এক নয়। দুটো আলাদা। হুনাইন হলো যুল-মাজাযের সন্নিকটে অবস্থিত একটি প্রান্তর। সেখান থেকে আরাফা হয়ে মক্কার দূরত্ব ১০ মাইলেরও বেশি।[১]

অভিজ্ঞ যোদ্ধার সুপরামর্শ

সৈন্যদলটি আওতাসে পৌঁছার পর বেসামরিক লোকজনও সেখানে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে দুরাইদ ইবনুস সিম্মা নামের এক প্রবীণ সমরবিদও ছিল। বয়সকালে সে ছিল এক কুশলী যোদ্ধা। তবে বয়সের ভারে সে এখন এতটাই ন্যুব্জ যে, পরামর্শ দিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো গতি নেই তার। সে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোন প্রান্তরে আছ এখন? লোকেরা বলে, আওতাস প্রান্তরে। দুরাইদ বলে, হ্যাঁ, এটাই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান। কিন্তু উট, গাধা, পশুপালের ডাকাডাকি ও বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে? লোকজন বলে, কমান্ডার মালিক সৈন্যদের সঙ্গো তাদের স্ত্রী, পশুপাল ও বাচ্চাদেরও নিয়ে এসেছে।

তখন সে মালিককে ডেকে এমনটা করার কারণ জিজ্ঞেস করে। মালিক উত্তর দেয়, যুদ্ধের সময় প্রত্যেক যোদ্ধার পেছনে তার পরিবার ও পশুপাল থাকবে। ফলে সে এদের টানে মরণপণ যুদ্ধ করবে। ঘুণাক্ষরেও পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারবে না। দুরাইদ বলে, তুমি তো ভেড়ার রাখাল। পরাজিত ব্যক্তিকে কোনোকিছু ধরে রাখতে পারে? দেখো, যদি তুমি যুদ্ধে জয়ী হও, তবে তো তরবারি ও বর্শা দ্বারাই জয়ী হবে। আর যদি পরাজিত হও, তবে পরিবার পরিজন-সহ অপমানিত ও অপদস্থ হবে। এরপর দুরাইদ বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নানান তথ্য জেনে নেয়।

এরপর বলে, শোনো মালিক, হাওয়াযিন গোত্রের পরিবার-পরিজন ও পশুপাল সঙ্গো

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৭, ৪২

করে নিয়ে এসে ঠিক কাজ করোনি। এদেরকে বরং এলাকার নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দাও। এরপর তোমরা ঘোড়া হাঁকিয়ে বেদ্বীনদের মোকাবেলায় নেমে পড়ো। যুদ্ধে যদি তোমরা জিতে যাও, তবে এরা তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে। আর যদি হেরে যাও, তবে আর যাই হোক—তোমাদের পরিবার-পরিজন ও পশুপাল অন্তত নিরাপদ থাকবে।

কিন্তু কমান্ডার মালিক তার এ প্রস্তাবটি অবজ্ঞাভরে ফিরিয়ে দেয়। তার এক কথা, 'আমি কখনোই এমনটা করব না। তোমার শরীরের সাথে দেখছি বুদ্ধিটাও বুড়িয়ে গেছে। আল্লাহর কসম করে বলছি, হাওয়াযিন গোত্র আমার আনুগত্য না করলে, আমি আমার তরবারি বুকে ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করব।' দুরাইদকে এইভাবে নাকচ করতে দেখে, অন্যরা পরামর্শ বা মতামত জানাতে সাহস পায় না আর। তারা মালিককে বলে, আমরা তোমার অনুগত থাকব। দুরাইদ তখন এ কথাগুলো বলতে থাকে—'হায়! আজ যদি আমি যুবক হতাম, আজ যদি আমার দুর্বার বেগে ছুটে চলার বয়স থাকত, তবে পশমি ঘোড়াগুলোকেও আমি নেতৃত্ব দিতাম।'

গুপ্তচরদের বেহাল দশা!

কমান্ডার মালিক মুসলিমদের তথ্য সংগ্রহের জন্য কয়েকজন গুপ্তচর নিয়োগ দেয়। কিন্তু তারা মুসলিমদের কাছে পৌঁছার আগেই বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে আসে। মালিক উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? এ অবস্থা কেন তোমাদের? তারা জবাব দেয়, আমরা চিত্রল ঘোড়ায় করে শুভ্র চেহারার একদল আরোহী দেখেছি। তারাই আমাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী।

শত্রুশিবিরে মুসলিম গোয়েন্দা

নবিজির কাছে শত্রুদের যুদ্ধ-প্রস্তুতির বিভিন্ন সংবাদ আসতে থাকে। কিন্তু যার-তার সংবাদের ভিত্তিতে তো আর যুদ্ধের করণীয় ঠিক করা যায় না! তাই তিনি আবু হাদরাদ আল-আসলামিকে পাঠান সঠিক সংবাদ জোগাড় করতে। তিনি নবিজির নির্দেশনা অনুসারে শত্রুশিবিরে গিয়ে তাদের সাথে একেবারে মিশে যান এবং সঠিক তথ্য নিয়ে ফিরে আসেন।

মক্কা থেকে হুনাইনের পথে যাত্রা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় প্রবেশের ১৯ তম দিন অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসের ৬ তারিখে তিনি মক্কা থেকে রওনা করেন। এ যাত্রায় তার সঙ্গে আছে ১২ হাজার সৈন্য। এর মধ্যে ১০ হাজার সৈন্য মক্কাবিজয়ের অভিযাত্রী। বাকি ২ হাজার মক্কার স্থানীয়। এদের অধিকাংশই নওমুসলিম। এ যুদ্ধে নবিজি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার কাছ থেকে অস্ত্রসহ ১০০ লৌহবর্ম ধার নেন। মক্কায় তার পরিবর্তে নিযুক্ত করেন আত্তাব ইবনু উসাইদকে।

সেদিন বিকেলে এক ঘোড়সওয়ার এসে বলে, আমি অমুক পাহাড়ে চড়ে দেখেছি, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাদের পরিবার ও পশুপাল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। এ সংবাদ শুনে আল্লাহর রাসুল মুচকি হেসে বলেন, ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল এগুলো মুসলিমদের গনিমতে পরিণত হবে। সেই রাতে মুসলিমদের পাহারাদার নিযুক্ত করা হয় আনাস ইবনু আবি মারসাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।[১]

হুনাইনে যাওয়ার পথে সাহাবিরা একটি বিশাল আকারের বরইগাছ দেখতে পান। গাছটির নাম 'যাতু আনওয়াত'। পৌত্তলিক আরবরা এতে তরবারি ঝুলিয়ে রাখত। গাছের নিচে পশু জবাই করে তারপর মেলা বসাত। গাছটির পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় একজন বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের জন্যও এমন একটি গাছের ব্যবস্থা করুন। নবিজি বিস্মিত গলায় বললেন, আল্লাহু আকবার! মুসা আলাইহিস সালামের উম্মত তার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল, 'হে মুসা, মূর্তিপূজারিদের যেমন উপাস্য রয়েছে, আমাদেরও তেমন উপাস্যের ব্যবস্থা করুন।' উত্তরে মুসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'তোমরা তো দেখছি গণ্ডমূর্খ!' তাদের মতো তোমরাও আজ একই রকম কথা বলছ। শীঘ্রই তোমরা তাদের পথে চলতে শুরু করবে।[২]

সেদিন মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দেখে কেউ কেউ তো এটাও বলে বসে, আজ অন্তত কেউ আমাদের হারাতে পারবে না। কথাটা নবিজিকে ভীষণ কষ্ট দেয়।

মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলা

শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার রাতে মুসলিম বাহিনী হুনাইনের কাছাকাছি চলে আসে। মালিক ইবনু আউফ আগেই সেখানে পৌঁছে যায়। শুধু তা-ই নয়, সে তার তিরন্দাজ বাহিনীকে বলে, 'তোমরা এখানকার বিভিন্ন ঘাঁটি ও প্রবেশপথে ঘাপটি মেরে থাকবে। মুসলিম বাহিনী তোমাদের নাগালে আসামাত্র একযোগে তাদের ওপর তির ছুড়তে শুরু করবে। তারা দলছুট হয়ে গেলে সবাই একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর।'

শেষরাতের দিকে নবিজি সৈন্যদের বিন্যস্ত করেন। বীরযোদ্ধাদের হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দেন। ভোরবেলা তাদেরকে নিয়ে পদার্পণ করেন হুনাইন প্রান্তরে। তাদের জানা ছিল না যে, শত্রুপক্ষের তিরন্দাজ বাহিনী আগে থেকেই এখানে ওত পেতে আছে। তাই তারা নিশ্চিন্তে অবস্থান করছিলেন সেখানে। এমন সময় হঠাৎ শুরু হয় তিরবৃষ্টি। মুসলিমরা টাল সামলাতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শত্রুসেনারা সেই সুযোগে তরবারি হাতে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। অপ্রস্তুত মুসলিমরা দিগ্বিদিক

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ২৫০১; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৮১৯; হাদিসটি সহিহ।

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ২১৮০; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৭৩৭৫; হাদিসটি সহিহ।

ছুটতে থাকে তখন। কেউ কারও দিকে ফিরে তাকানোর সময়ও পায় না তারা। তাদের এই লজ্জাজনক সূচনা ও পলায়নপরতা দেখে নওমুসলিম আবু সুফিয়ান ইবনু হারব মন্তব্য করেন, 'শত্রুরা এদেরকে তাড়া করে সাগরপাড়ে গিয়ে তবেই ক্ষান্ত হবে।' জাবালা কিংবা কালাদা ইবনুল জুনাইদ নামের এক কাফির তখন চিৎকার করে বলে ওঠে, 'তোমাদের জাদুর খেলা আজ শেষ!'

এদিকে নবিজি তার সৈন্যদের সমবেত ও পুনর্বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেন। প্রান্তরের ডানপাশে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বলতে থাকেন, 'আমার দলের সবাই কোথায়? তোমরা আমার কাছে এসো। আমি আল্লাহর রাসুল। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ।' সে সময় তার পাশে কয়েকজন মুহাজির ও তার বংশের লোকজন ছাড়া তেমন কেউই ছিল না। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবিজি নজিরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি কাফির বাহিনীর দিকে খচ্চর ছুটিয়ে দিয়ে আবৃত্তি করতে থাকেন—

আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান আমি।
আমি সত্য নবি, মিথ্যাবাদী নই।

আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস তখন নবিজির খচ্চরের লাগাম ধরে রাখেন আর আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ধরেন খচ্চরের গদি সংলগ্ন পা-দানি। যেন খচ্চরটি খুব বেশি ছুটতে না পারে। তাদের এসব কাজে নবিজি খচ্চর থেকে নেমে এই বলে আল্লাহর কাছে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দিন।'

ঘুরে দাঁড়াল মুসলিম বাহিনী

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাচা আব্বাসকে নির্দেশ দেন সাহাবিদের উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে। আব্বাসের ছিল দরাজ গলা। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকতে থাকেন, 'কোথায় বাইআতুর রিজওয়ানের বীরসেনারা?' আব্বাস বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমার ডাক শুনে সাহাবিরা এমনভাবে ছুটে আসেন, যেভাবে গাভির ডাকে ছুটে আসে তার দুধের বাছুর।' সবাই তখন একসাথে বলে ওঠেন, 'লাব্বাইক! আমরা উপস্থিত!'[১]

সাহাবিদের ওপর তার ডাকের প্রভাব এত বেশি পড়েছিল যে, কোনো কোনো সাহাবি উটকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সেটার গলায় বর্শা ঝুলিয়ে ছেড়ে দেন। এরপর আব্বাসের আওয়াজ অনুসরণ করে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে পায়ে হেঁটে নবিজির সামনে হাজির হন। এভাবে মুহূর্তের মাঝে প্রায় ১০০ সাহাবি জড়ো হয়ে যায়। তাদেরকে নিয়েই নবিজি ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুদের ওপর।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ৮৫৯৩

আব্বাসের প্রথম ডাকে যারা ছুটে আসেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন মুহাজির। তাই এবার তিনি আনসারদের ডাকেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়, কোথায় তোমরা?' ডাক শুনে আনসাররাও দ্রুত ছুটে আসেন। যে গতিতে তারা রণাঙ্গান ছেড়েছিলেন, তার চেয়েও দ্রুততার সাথে ফিরে আসেন তির-তরবারি ও বর্শা হাতে নিয়ে। শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল লড়াই।

নবিজি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বলেন, এবার হবে আসল যুদ্ধ। এ কথা বলে তিনি একমুষ্টি ধুলো নিয়ে শত্রুদের মুখ বরাবর ছুড়ে মারেন। সেইসাথে দুআ করেন, 'এদের চেহারা বিগড়ে যাক!' নবিজির নিক্ষিপ্ত ধুলোর সাথে অজস্র ধূলিকণা মিশে শত্রুদের চোখে গিয়ে পড়ে। ছানি পড়ে যায় তাদের সবার চোখে। ফলে চোখ ডলতে ডলতে এক নিমিষে পালিয়ে যায় তারা রণাঙ্গান থেকে।

মুসলিমদের সেনাদের অকল্পনীয় বিজয়

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুলো নিক্ষেপের কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধে সাকিফ গোত্রেরই ৭০ জন নিহত হয়। শত্রুদের সমুদয় সম্পদ, অস্ত্র-সরঞ্জাম, পশুপাল ও পরিবার মুসলিম বাহিনীর দখলে চলে আসে। এ ঘটনা সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

আল্লাহ বহু যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন, (বিশেষ করে) হুনাইন যুদ্ধের দিন—যখন তোমরা গর্ব করেছ তোমাদের সৈন্যসংখ্যা নিয়ে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনোই কাজে আসেনি। বরং প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে এসেছিল এবং তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ প্রশান্তি বর্ষণ করেন তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতি, সেইসাথে পাঠান এমন এক বাহিনী, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি দেন কাফিরদের। এটাই ওদের কর্মফল।[১]

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ২৫-২৬

শত্রুবাহিনীর সবাই লেজ গুটিয়ে পালাল

শত্রুবাহিনী পরাজিত হওয়ার পর তাদের একদল তায়েফের দিকে পালিয়ে যায়। আরেকদল যায় নাখলার দিকে। তৃতীয় একটি দল যায় আওতাসের দিকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবিকে আওতাসগামী শত্রুদের তাড়া করতে বলেন। এদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু আমির আল-আশআরি। সেখানে পৌঁছানোর পর দুই পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ লড়াই হয়। মুশরিকরা এখানেও পরাজিত হয়। মুসলিমদের নেতা আবু আমির আল-আশআরি শহিদ হন।[১]

সাহাবিদের আরেকটি অশ্বারোহী দল ধাওয়া করেন নাখলার দিকে পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের। প্রবীণ যোদ্ধা দুরাইদ ইবনুস সিম্মাহ এদের হাতে বন্দি হয় এবং রবিআ ইবনু রাফি রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন।

আর যেসব শত্রু তায়েফে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, গনিমতের সম্পদ জমা করার পর নবিজি সাহাবিদের নিয়ে নিজেই তাদের দিকে অগ্রসর হন।

বিপুল পরিমাণ সম্পদ মুসলিমদের দখলে

এ যুদ্ধে গনিমতের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার যুদ্ধবন্দি, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজারেরও বেশি বকরি এবং ৪ হাজার উকিয়া রৌপ্যমুদ্রা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবিদের সেসব একত্র করার নির্দেশ দেন। এরপর 'জিরানা' নামক স্থানে সেগুলো সংরক্ষণ করে মাসউদ ইবনু আমর আল-গিফারিকে সেখানকার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন। তায়েফে পালিয়ে যাওয়া শত্রুদের হিসাব চুকানোর আগপর্যন্ত গনিমত বণ্টন মুলতবি রাখা হয়।

বন্দিদের মধ্যে শিমা বিনতুল হারিস আস-সাদিয়াও ছিলেন। তিনি নবিজির দুধবোন। একটি চিহ্নের মাধ্যমে নিজের পরিচয় তুলে ধরলে, নবিজি তাকে চিনতে পারেন। পরিচয় লাভের পর নবিজি তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। বসার জন্য নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দেন। এরপর বেশকিছু উপহার-সহ তাকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরিয়ে দেন।

তায়েফ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ

এটা মূলত হুনাইন যুদ্ধেরই অংশ। কেননা হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের কমান্ডার

---

[১] আবু আমির আল-আশআরি শহিদ হওয়ার পর পতাকা হাতে নেন আবু মুসা আশআরি। তিনি আবু আমিরের চাচাতো ভাই। পরে আল্লাহ তাআলা আবু মুসার হাতেই বিজয় দান করেন। [*সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৯৮; দারুল কুতুবিল আরাবিইয়া, বৈরুত]

মালিক ইবনু আউফ আন-নাসরি-সহ তাদের বেশিরভাগ সৈন্যই এখানকার বিভিন্ন দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জিরানা' নামক স্থানে হুনাইন যুদ্ধের গনিমত একত্র করার পর এখানে এসে তাদের ওপর আক্রমণ করেন।

প্রথমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে ১ হাজার সৈন্য তায়েফের উদ্দেশে পাঠানো হয়। এরপর নবিজি এসে যুক্ত হন তাদের সাথে। পথিমধ্যে তিনি আন-নাখলাতুল ইয়ামানিইয়া, করনুল মানাযিল ও লিয়া অঞ্চল অতিক্রম করেন। লিয়াতে মালিক ইবনু আউফের একটি দুর্গ ছিল। সেটা ধ্বংস করে দিতে বলেন সাহাবিদেরকে। এরপর তিনি তায়েফ গিয়ে পৌঁছেন। সেখানকার প্রধান দুর্গের কাছে ঘাঁটি স্থাপন করে তা অবরোধ করেন।

দুর্গটি বেশ কয়েকদিন অবরোধ করে রাখেন তিনি। আনাস বলেন, দীর্ঘ ৪০ দিন অবরুদ্ধ ছিল দুর্গটি। তবে সিরাত-গবেষকদের মাঝে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। কারও মতে অবরোধের সময়কাল ২০ দিন। কারও মতে আরও বেশি। কয়েকজন বলেছেন, ১৮ দিন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ১৫ দিন।[১]

এই সময়টাতে বেশ কয়েকবার উভয় পক্ষ থেকে তির-পাথর বিনিময় হয়। মুসলিমরা প্রথমবার যখন দুর্গ অবরোধ করে, শত্রুরা তখন দুর্গের ছাদ ও পাঁচিলের ওপর থেকে পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে তির নিক্ষেপ করে। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হন। শহিদ হন ১২ জন। তাদের আক্রমণের মুখে বাধ্য হয়ে মুসলিমরা তাদের ঘাঁটি স্থানান্তর করে বর্তমান তায়েফ মসজিদের জায়গাটিতে নিয়ে আসেন।

এ সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করতে বলেন। এরপর তার সাহায্যে পরপর কয়েকটি ভারী পাথর নিক্ষেপ করা হলে দুর্গের দেওয়ালে ফাটল ধরে যায়। বড় বড় ছিদ্র তৈরি হয় এখানে-সেখানে। এরই মধ্যে কয়েকজন মুসলিম ট্যাংক[২] নিয়ে দুর্গের কাছাকাছি যান এবং তাতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শত্রুরা ওপর থেকে আগুনে প্রজ্বলিত লোহার পাত নিক্ষেপ করলে, তারা ট্যাংক থেকে বের হয়ে ছুটতে থাকেন। এ সময় শত্রুর ছোড়া তিরে তাদের বেশ কয়েকজন শহিদ হন।

নবিজি তখন দুর্বৃত্তদের ঘায়েল করতে ভিন্ন উপায় আবিষ্কার করেন। তাদের আঙুর গাছগুলো কেটে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলিমরা গাছ কাটতে শুরু করলে সাকিফ গোত্রের লোকেরা বিচলিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৫

[২] সে সময়ের ট্যাংক আধুনিক ট্যাংকের মতো ছিল না। সেগুলো তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে। তার ভেতরে ঢুকে নিজেরাই উঁচু করে দুর্গ বা শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হতো। এটি শুধু তিরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারত।

নবিজিকে বিরত থাকতে বলে এ কাজ থেকে। নবিজি তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন।

এখানে এসে নবিজি আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেন। দুর্গের ভেতরে এই ঘোষণা পৌঁছে দেন, যেসব ক্রীতদাস দুর্গ থেকে বের হয়ে আত্মসমর্পণ করবে, তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। ঘোষণা শেষ হতে না হতেই ৩০ জন ক্রীতদাস বের হয়ে আসে দুর্গ থেকে। তাদের মধ্যে আবু বাকরা নামের এক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি দুর্গের দেওয়ালে চড়ে ঘূর্ণায়মান চরকায় ঝুলে নিচে নামেন। এজন্য নবিজি তাকে উপাধি দেন 'আবু বাকরা' যার অর্থ ঘূর্ণায়মান চরকাওয়ালা।

তারা বেরিয়ে এলে, নবিজি তার ঘোষণামতো ৩০ জনকে ভিন্ন ভিন্ন সাহাবির দায়িত্বে দিয়ে বলেন, আজ থেকে এরা মুক্ত। এদেরকে তোমরা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দাও। এরাও আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে। এই ঘটনা দুর্গের লোকদের জন্য বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু এরপরও দুর্গের লোকেরা আত্মসমর্পণ করে না। অবরোধ ক্রমশ দীর্ঘ হতে থাকে। এদিকে দুর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত তির ও লোহার পাতে আক্রান্ত হয়ে মুসলিম সেনাদের হতাহতের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। দুর্গের লোকেরা অন্তত ১ বছরের রসদ মজুত করে রেখেছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। আর তেমন হয়ে থাকলে এই অবরোধ মুসলিমদের কেবল সম্পদ ও প্রাণহানিই বৃদ্ধি করবে। সেজন্য নবিজি নাওফাল ইবনু মুআবিয়া আদ-দাইলামির সঙ্গে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ করেন। নাওফাল বলেন, শৃগাল তার গর্তে প্রবেশ করলে যেমন হয়, এদের অবস্থাও ঠিক তা-ই। আপনি যদি অবরোধ বহাল রাখেন, তাহলে একসময় না একসময় তাদের ধরতে পারবেন। আর যদি অবরোধ তুলে নেন, তাহলে ধরতে পারবেন না। অবশ্য এতে তারা আপনার কোনো ক্ষতিও হয়তো করতে পারবে না। সার্বিক অবস্থা বিচার করে নবিজি তখন অবরোধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে-মতে উমারকে বলেন, যাও, ঘোষণা করে দাও, আগামীকাল আমরা মক্কায় ফিরে যাব, ইনশাআল্লাহ।

উমারের এ ঘোষণা সাহাবিদের মনঃকষ্টের কারণ হয়। তারা বলেন, তায়েফ জয় না করেই আমরা ফিরে যাব? এটা কী করে সম্ভব? তখন নবিজি বলেন, ঠিক আছে। আগামীকাল তাহলে আক্রমণ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। পরদিন সাহাবিরা আক্রমণ করলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন। নবিজি বলেন, আমরা আগামীকাল ফিরে যাব, ইনশাআল্লাহ। সাহাবিরা তখন নবিজির কথামতো চুপচাপ সামানাপত্র গোছাতে শুরু করেন। তাদের অবস্থা দেখে নবিজির চেহারায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে।

সাহাবিরা যখন মনভার করে তায়েফ থেকে ফিরছিলেন, নবিজি তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, বলো—

آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী এবং তাঁর প্রশংসাকারী।[১]

সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি সাকিফ গোত্রের লোকগুলোর জন্য বদদুআ করুন। প্রতিউত্তরে নবিজি বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি সাকিফ গোত্রের লোকদের হিদায়াত দিন এবং তাদেরকে আমার সান্নিধ্যে নিয়ে আসুন।'

গনিমত বণ্টনে নবিজির দূরদর্শিতা

তায়েফ থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিরানায় ফিরে আসেন। সেখানে ৫ রাতেরও বেশি সময় অবস্থান করেন। কিন্তু গনিমত বণ্টনে হাত দেন না। তিনি হয়তো চাইছিলেন, হাওয়াযিনের লোকেরা এসে তাওবা করুক। তাহলে তিনি তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু কেউই আসে না। ফলে নবিজি গনিমত বণ্টন শুরু করে দেন। বিভিন্ন গোত্রের প্রধান ও মক্কার নেতৃস্থানীয় নওমুসলিমরা গনিমত লাভের জন্য উন্মুখ ছিলেন। নবিজি সেটা বুঝতে পেরে নবদীক্ষিত মুসলিমদের সবার আগে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গনিমত দেন।

আবু সুফিয়ান ইবনু হারব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি ৪০ উকিয়া রৌপ্য ও ১০০টি উট দিয়েছেন। আবু সুফিয়ান তখন বলেন, আমার ছেলে ইয়াযিদ? নবিজি তাকেও সমপরিমাণ গনিমত দেন। আবু সুফিয়ান আবার বলে ওঠেন, আমার ছেলে মুআবিয়া? নবিজি তাকেও একই হারে গনিমত দেন। এরপর আবু সুফিয়ান অতিরিক্ত আরও ১০০টি উটের আবদার জানালে নবিজি সেই আবদারও রাখেন। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াকেও দিয়েছেন ১০০ উট। পরে সেটা বাড়তে বাড়তে তিনশোতে গিয়ে পৌঁছায়।[২]

এছাড়াও হারিস ইবনুল হারিস এবং কুরাইশের অন্যান্য নেতার প্রত্যেককে ১০০ করে উট দেন। বাকিদের কাউকে ৫০ আবার কাউকে ৪০টি করে দেন। নবিজির এই বদান্যতা দেখে মানুষের মুখে মুখে রটে যায়, 'মুহাম্মাদ দান করেন। দারিদ্র্যের ভয় করেন না।' এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আরব বেদুইনরা এসে ভিড় জমায়। তারা গোলাকার হয়ে এমনভাবে নবিজিকে ঘিরে ধরে যে, একটি গাছের সাথে তার পিঠ ঠেকে যায়। গায়ের চাদর আটকে যায় সে গাছের কাঁটায়। নবিজি তখন তাদের বলেন, আরে আল্লাহর বান্দারা, আমার চাদরটা তো নিতে দাও। ওই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে যদি তিহামার গাছগুলোর সমপরিমাণ পশুপাল থাকত, তবে সেগুলোও আমি তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম। এরপর তোমরা চাক্ষুষ বুঝতে পারতে, আমি

---

[১] *যাদুল মাআদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৩৫, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

[২] *আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুসতাফা*, কাজি ইয়াজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৬

কৃপণ, ভীরু কিংবা মিথ্যাবাদী নই।

আগন্তুকদের সামলে নবিজি তার উটের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। এরপর উটের কুঁজ থেকে কয়েকটি পশম তুলে আঙুল দিয়ে উঁচু করে ধরে লোকদের বলেন, 'শোনো হে জনতা, আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমাদের এই সকল সম্পদ, এমনকি এই পশমের মধ্যেও ৫ ভাগের ১ ভাগ আমার পাওনা। আমি তাও তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। নিজের জন্য কিছুই রাখিনি।'

নওমুসলিমদের মাঝে বণ্টনশেষে নবিজি যাইদ ইবনু সাবিতকে নির্দেশ দেন, 'বাকি সম্পদগুলো নিয়ে এসো। আর সাহাবিদেরকে বলো, আমার সামনে হাজির হতে।' সবাই উপস্থিত হলে, অবশিষ্ট সম্পদ তিনি সকল সাহাবির মাঝে ভাগ করে দেন। এবার সাধারণ যোদ্ধারা পায় ৪টি করে উট এবং ৪০টি করে বকরি। অশ্বারোহী যোদ্ধারা ১২টি করে উট এবং ১২০টি করে বকরি।

এই বণ্টনে নবিজি রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কারণ পশুর সামনে তাজা ঘাস ঝুলিয়ে তাকে যেমন নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া যায়, তেমনই কিছু মানুষও আছে যারা চিন্তাভাবনা করে নয়, খাদ্যের টানে সত্যের কাছে যায়। এই শ্রেণির মানুষকে পার্থিব কিছু দিয়ে হলেও প্রলুব্ধ করতে হয়। কিন্তু অন্তরে একবার ইসলাম বসে গেলে, তখন আর চিন্তা নেই, তারাই পরিণত হয় ইসলামের আন্তরিক সেবকে।[১]

আনসারদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই রাজনৈতিক কৌশল প্রাথমিকভাবে সবাই বুঝতে না পারায় আনসারদের কেউ কেউ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখান। মনঃক্ষুণ্ণ হন অনেকেই। কারণ হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ এসব সম্পদ থেকে তাদেরকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়। অথচ যুদ্ধের সংকটময় সময়ে নবিজির পক্ষ থেকে ডাক এলে তারাই প্রথম বীরবিক্রমে ছুটে এসেছিলেন তার পাশে। পরাজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে যুদ্ধটাকে টেনে তুলেছিলেন বিজয়ের কন্দরে। কিন্তু গনিমত বণ্টনের সময় দেখা গেল, দুঃসময়ে যারা পলায়নের পথ খুঁজছিল, দয়া ও দানে তাদের হাতই পরিপূর্ণ। আর বীরেরা বঞ্চিত।[২]

আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, নবিজি হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের মাঝে অধিক পরিমাণে বণ্টন করেন। অপরদিকে আনসারদের রাখেন সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এতে আনসারদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এ নিয়ে নানারকম মন্তব্য চলতে থাকে তাদের মধ্যে। একজন

---

[১] *ফিকহুস সিরাহ,* মুহাম্মাদ আল-গাযালি, পৃষ্ঠা : ২৯৮-২৯৯

[২] প্রাগুক্ত

তো বলেই বসেন, আল্লাহর রাসুল স্বজাতির লোকদের পেয়ে আমাদের ভুলে গেছেন!

সাদ ইবনু উবাদা তখন নবিজির কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টন নিয়ে আনসাররা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। কারণ আপনি আপনার স্বজাতির লোকদের এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে দিল উজাড় করে দিয়েছেন। এদিকে আনসাররা কিছুই পায়নি। নবিজি জিজ্ঞেস করেন, সাদ, এ ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কী? সাদ বলেন, আমি তো আনসারদেরই একজন। নবিজি তখন বলেন, বেশ, তোমার গোত্রের সবাইকে এই তাঁবুতে জড়ো হতে বলো।

সাদ গিয়ে সবাইকে ডেকে আনেন। বেশকিছু মুহাজির সাহাবিও সেখানে চলে আসেন। তাদের কয়েকজন ভেতরে বসার অনুমতি পান, আর কয়েকজনকে নবিজি ফিরিয়ে দেন। আনসারি সাহাবিগণ সমবেত হওয়ার পর নবিজি সেখানে উপস্থিত হন। এরপর হামদ ও সানা পাঠ করেন বলতে শুরু করেন—

'হে আমার আনসার সাহাবিরা, শুনলাম, তোমরা অনেকেই নাকি আমার ওপর নারাজ হয়েছ! সত্যি করে বলো তো, যখন আমি মদিনায় প্রথম এলাম, তখন কি তোমরা বিপথগামী ছিলে না? এরপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা অসহায় ও নিঃস্ব ছিলে। এরপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের রিজিক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোমাদের অভাবমুক্ত করেছেন। তোমরা কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে না? এরপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের একত্র করেছেন।'

সবাই তখন সমস্বরে বলে ওঠেন, 'জি, অবশ্যই। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগ্রহই আমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি।' এরপর নবিজি বলেন, 'হে আমার আনসার সাহাবিরা, তোমরা কি আল্লাহর রাসুলের কথার জবাব দেবে না?' তারা বলেন, 'আমরা আর কী জবাব দেব, হে আল্লাহর রাসুল? আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অনুগ্রহই তো আমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি।'

তিনি বলেন, 'তোমরা তো চাইলে এটাও বলতে পারো যে, সবাই যখন আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আমরা তখন আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন অসহায় অবস্থায়, আমরা আপনার পাশে দাঁড়িয়েছি। আপনি এসেছিলেন নির্বাসিত হয়ে, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি এসেছিলেন খালিহাতে, আমরা আপনার হাত ধনসম্পদে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। এটা বলার অধিকারও তোমাদের আছে।

হে আমার আনসার সাহাবিরা, তোমরা কি দুনিয়ার এমন এক তুচ্ছ বিষয়ে মন খারাপ করে আছ—যা দিয়ে আমি কিছু লোককে ইসলামের প্রতি অনুগত করেছি? অপরদিকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি মহিমান্বিত ইসলাম। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও

যে, অন্যরা বকরি ও উট নিয়ে ঘরে ফিরবে, আর তোমরা ফিরবে আল্লাহর রাসুলকে সঙ্গে নিয়ে?

ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, হিজরতের বিশেষ মূল্য না থাকলে, আমি নিজেকে আনসার বলেই পরিচয় দিতাম। সবাই যদি একটি গিরিপথ ধরে চলে, অপরদিকে আনসাররা চলে আরেক গিরিপথ ধরে, তাহলে আমি আনসারদের পথেই চলব। হে আল্লাহ, আপনি আনসারদের প্রতি রহম করুন। তাদের সন্তান ও বংশধরদের প্রতিও রহম করুন।'

নবিজির কথা শুনে তাঁবুর ভেতরে বসে থাকা সবাই কাঁদতে শুরু করে। চোখের জলে তাদের দাড়ি আর বুক ভিজে যায়। কান্না-বিজড়িত থমথমে গলায় তারা বলে ওঠেন, আল্লাহর রাসুলের বণ্টনে আমরা সন্তুষ্ট। এরপর নবিজি সেই তাঁবু থেকে বের হয়ে আসেন। আর আনসাররাও ফিরে যান নিজ নিজ স্থানে।[১]

কোনটা চাও? পরিবার নাকি ধনসম্পদ?

গনিমত বণ্টন শেষে হাওয়াযিনের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। সংখ্যায় তারা ১৪ জন। তাদের দলপতি যুহাইর ইবনু সারদ। তাদের মধ্যে নবিজির দুধচাচা আবু বারকানও ছিলেন। তারা এসে তাদের বন্দি ও সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। তারা এমনভাবে কথাগুলো বলেন যে, উপস্থিত লোকদের খুবই মায়া হয়। নবিজি তখন বলেন, তোমাদের কোনটা বেশি দরকার, পরিবার-পরিজন নাকি ধনসম্পদ? তারা বলে, পরিবারের সঙ্গে কি আর ধনসম্পদের তুলনা চলে? নবিজি বলেন, যুহরের সালাতের পর তোমরা দাঁড়িয়ে বলবে, আমরা আল্লাহর রাসুলের মাধ্যমে মুমিনদের কাছে এবং মুমিনদের মাধ্যমে রাসুলের কাছে আবেদন করছি, আমাদের বন্দিদের যেন ফেরত দেওয়া হয়।

যুহরের পর তারা যথারীতি দাঁড়িয়ে সবাইকে অনুরোধ জানায়। নবিজি তখন বলেন, আমার ও বনু আব্দিল মুত্তালিবের অধিকারে যা এসেছে, সব তোমাদের দিয়ে দেওয়া হলো। এখন অন্য লোকদের কাছেও তোমাদের জন্য আবেদন করব। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মুহাজির ও আনসাররা বলেন, আমাদের অধিকারে যা কিছু এসেছে, সব আল্লাহর রাসুলের। আকরা ইবনু হাবিস বলেন, আমার ও বনু তামিম গোত্রের অধিকারে যা এসেছে, সেগুলো আল্লাহর রাসুলের জন্য নয়। উয়াইনা ইবনু হিসন বলেন, আমার ও বনু ফাযারা গোত্রের যা আছে, সেগুলো আল্লাহর রাসুলের জন্য নয়। আব্বাস ইবনু মিরদাস বলেন, আমার ও বনু সুলাইম গোত্রের যা আছে, সেগুলো আল্লাহর রাসুলের জন্য নয়। কিন্তু তার গোত্রের সাধারণ লোকজন তখন বলে ওঠে, আমাদের যা আছে, সব

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৯৯-৫০০; *সহিহুল বুখারি* : ৪৩৩০-৪৩৩১; *সহিহ মুসলিম* : ১০৬১

আল্লাহর রাসুলের। আব্বাস ইবনু মিরদাস তখন বলেন, তোমরা আমায় অপমান করলে।

এভাবে সবাই যার যার সিদ্ধান্ত জানানোর পর নবিজি বলেন, এই লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করে এসেছে। তাদের এই বোধোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়েই আমি বন্দি-বণ্টনে দেরি করেছি। তাছাড়া তাদেরকে স্ত্রী-সন্তান ও ধনসম্পদের মধ্য থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেছি। তারা প্রথমটি বেছে নিয়েছে। তাই যাদের কাছে বন্দি রয়েছে এবং যারা স্বেচ্ছায় তাদের ফিরিয়ে দিতে চায়, তারা যেন ফিরিয়ে দেয়। আর যারা তাদের প্রাপ্য অংশ রাখতে চায় তারাও যেন বন্দিদের ছেড়ে দিয়ে বাকিটা রেখে দেয়। বিনিময়ে ভবিষ্যতে এ জাতীয় সম্পদ গনিমত হিসেবে আমাদের হাতে এলে, তাদের ৬ গুণ দেওয়া হবে।

লোকজন তখন বলে, আমরা আল্লাহর রাসুলের খাতিরে স্বেচ্ছায় সমস্ত কিছু ফিরিয়ে দিলাম।

নবিজি বলেন, তোমাদের কে স্বেচ্ছায় দিচ্ছে, আর কে দিচ্ছে অনিচ্ছায়, আমি তা জানি না। সবাই নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যাও। আমি তোমাদের নেতাদের কাছ থেকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জেনে নেব।

নেতাদের সাথে মতবিনিময়ের পর নবিজি তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। প্রত্যেকে তখন নিজেদের অধিকারে আসা নারী ও শিশুদের ফেরত দেন। কেবল উয়াইনা ইবনু হিসন বাদে সবাই সকল বন্দিকে ছেড়ে দেন। উয়াইনার ভাগে পড়েছিলেন একজন বৃদ্ধা। তিনি ওই বৃদ্ধাকে ফেরত দিতে চাইছিলেন না। পরে অবশ্য ফিরিয়ে দেন। নবিজি প্রত্যেক বন্দিকে একটি করে কিবতি কাপড় দিয়ে বিদায় জানান।

৮ বছর আগের ও পরের দুনিয়া

নবিজি জিরানায় গনিমত বণ্টন শেষে উমরার ইহরাম বাঁধেন। যথাসময়ে মক্কায় এসে উমরা আদায় করেন। এরপর আত্তাব ইবনু উসাইদকে মক্কার দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে অষ্টম হিজরির ২৪ জিলকদ তিনি মদিনার উদ্দেশে রওনা হন।

মুহাম্মাদ আল-গাযালি বলেন, ৮ বছর আগে হিজরতের সময় নবিজির মদিনায় আগমন এবং ৮ বছর বাদে মক্কাবিজয়ের পর এই মুহূর্তে তার আগমনের মধ্যে কত ব্যবধান! সে সময় তিনি মদিনায় এসেছিলেন নিরাপত্তাপ্রত্যাশী হয়ে, অপরিচিত এক আগন্তুকের মতো দ্বিধা-শঙ্কাগ্রস্ত অবস্থায়। এখানকার লোকেরা তার পরিবারকে উত্তম আশ্রয় দিয়েছিল, সাহায্য করেছিল। হিদায়াতের যে আলো তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, তা অনুসরণ করেছিল তারা। কেবল তার দিকে চেয়েই তারা সবার শত্রুতাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। আর এখন ৮ বছর পর তিনি যখন মদিনায় প্রবেশ করছেন, তখন পূর্বের মতো সেই লোকগুলোই তাকে দ্বিতীয়বার অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মক্কা তখন তার পদানত। মক্কাবাসীর সকল গৌরব ও মূর্খতার আঁধার তার পদতলে পিষ্ট। তিনি সকল অপরাধ

মাফ করে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে। আল্লাহর বাণী আসলেই সত্য—

...إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝٩٠

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, এমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আল্লাহ বিনষ্ট করেন না।[১]

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯০

মক্কাবিজয়ের পরবর্তী অভিযান

মক্কার দীর্ঘ সফর ও সফল অভিযান শেষে নবিজি মদিনায় ফিরে আসেন। এ সময় আরবের নানা প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিদল আসতে শুরু করে মদিনায়। নবিজি তাদের অভ্যর্থনা জানান। বিভিন্ন জায়গায় যাকাত ও জিযিয়া-আদায়কারীদের পাঠান। দাওয়াতি কাফেলা প্রেরণ করেন। এতকিছুর পরও যারা ইসলামগ্রহণ ও নমনীয়তা প্রদর্শনের পরিবর্তে দম্ভ প্রকাশ করে যাচ্ছিল, বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল না, তাদের অবদমিত করেন। নিচে এসব পদক্ষেপের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হলো—

যাকাত আদায়ে নিয়োজিত যারা

পূর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি, নবিজি মদিনায় ফিরে এসেছেন অষ্টম হিজরির একেবারে শেষের দিকে। নবম হিজরির মুহাররমের চাঁদ ওঠার পরপরই তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্রে তহশিলদার পাঠান। তালিকাটি হলো—

যাকাত-আদায়কারী সাহাবির নাম	যে অঞ্চল বা গোত্রে পাঠানো হয়
উয়াইনা ইবনু হিসন	বনু তামিম
ইয়াযিদ ইবনুল হুসাইন	বনু আসলাম ও বনু গিফার
আব্বাদ ইবনু বিশর আল-আশহালি	বনু সুলাইম ও মুযাইনা
রাফি ইবনু মাকিস	বনু জুহাইনা
আমর ইবনুল আস	বনু ফাযারা
যাহহাক ইবনু সুফিয়ান	বনু কিলাব

যাকাত-আদায়কারী সাহাবির নাম	যে অঞ্চল বা গোত্রে পাঠানো হয়
বাশির ইবনু সুফিয়ান	বনু কাব
ইবনুল লুতবিয়া আল-আযদি	বনু জুবিয়ান
মুহাজির ইবনু আবি উমাইয়া	সানআ
যিয়াদ ইবনু লাবিদ	হাজারামাউত
আদি ইবনু হাতিম	বনু তাঈ ও বনু আসাদ
মালিক ইবনু নাওয়িরাহ	বনু হানযালা
যাবারকান ইবনু বদর	বনু সাদের শাখাগোত্র
কাইস ইবনু আসিম	বনু সাদের শাখাগোত্র
আলা ইবনুল হাযরামি	বাহরাইন
আলি ইবনু আবি তালিব	নাজরান

এমন নয় যে, উল্লেখিত সবাইকে নবম হিজরির মুহাররম মাসেই পাঠানো হয়। বরং কিছু কিছু গোত্র ও এলাকায় ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে লোক পাঠানো হয়, যাতে করে তারা চারপাশ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইসলামে প্রবেশের সুযোগ পায়। তবে হ্যাঁ, যাকাত ও জিযিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গো লোকপাঠানোর এই ধারা শুরু হয় নবম হিজরির মুহাররম মাসে। আর বিস্তৃত পরিসরে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বানের কার্যক্রম শুরু হয় এরও আগে, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় থেকে। সবশেষে মক্কাবিজয়ের পর শুরু হয় মানুষের দলে দলে ইসলামগ্রহণ।

সামরিক অভিযান

সমগ্র আরবে অখণ্ড নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু জায়গায় সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

বনু তামিম অভিযান

নবম হিজরির মুহাররম মাসে উয়াইনা ইবনু হিসন আল-ফাযারির নেতৃত্বে বনু তামিম গোত্রে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে ৫০ জন অশ্বারোহী অংশ নেন। তবে তাদের মধ্যে কোনো মুহাজির ও আনসারি সাহাবি ছিলেন না। বনু তামিমের লোকজন অন্যান্য গোত্রকে উসকানি দিয়ে জিযিয়া প্রদান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলে এ অভিযানটি পরিচালিত হয়।

এ অভিযানে উয়াইনা ইবনু হিসন রাতের বেলা পথ চলতেন। আর দিনের বেলা আত্মগোপনে থাকতেন। কয়েক দিনের লাগাতার সফরে তারা শত্রুদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছে যান। পরে মোক্ষম সময়ে একটি খোলা প্রান্তরে তাদের ওপর চড়াও হন। দুর্বৃত্তরা তখন পালিয়ে যায়। এ সময় মুসলিমদের হাতে বন্দি হয় ১১ জন পুরুষ, ২১ জন নারী ও ৩০ জন শিশু। যুদ্ধ শেষে উয়াইনা তাদেরকে মদিনায় নিয়ে আসেন এবং রামলা বিনতুল হারিসের ঘরে আটকে রাখেন।

এরই মধ্যে বনু তামিমের ১০ জন নেতা মদিনায় চলে আসে। এরপর তারা সোজা নবিজির দরজায় গিয়ে হাঁক ছাড়ে, 'হে মুহাম্মাদ, বাইরে আসুন।' নবিজি ঘর থেকে বের হলে সবাই তাকে জড়িয়ে ধরে। নানা বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে তার সাথে। দেখতে দেখতে যুহরের সময় হয়ে যায়। নবিজি যুহরের সালাত আদায় করে মসজিদের আঙিনায় বসেন। এ সময় আগন্তুকরা বংশীয় গৌরব প্রকাশমূলক বিতর্কের আগ্রহ প্রকাশ করে। নবিজি সায় দেন।

তারা উতারিদ ইবনু হাজিবকে দাঁড় করিয়ে দেয় নিজেদের পক্ষে কথা বলতে। তার বক্তব্য শেষ হলে নবিজি খতিবুল ইসলাম খ্যাত সাবিত ইবনু কাইস ইবনি শাম্মাসকে দাঁড় করিয়ে দেন জবাব দেওয়ার জন্য। সাবিতের বক্তব্য শেষ হলে, তারা এবার কবি যাবারকান ইবনু বদরকে দাঁড় করিয়ে দেয় কথা বলতে। সে কবিতার ছন্দে ছন্দে তাদের গৌরবগাঁথা তুলে ধরে। তার বিপরীতে ইসলামের কবি হাসসান ইবনু সাবিতও কবিতা পাঠ করে শোনান।

উভয় বক্তা ও কবি ক্ষান্ত হলে আকরা ইবনু হাবিস দাঁড়িয়ে বলেন, তাদের বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে পটু, তাদের কবিও আমাদের কবির চেয়ে পারঙ্গম। তাদের কণ্ঠ আমাদের কণ্ঠের চেয়ে উঁচু এবং তাদের কথামালা আমাদের কথামালার চেয়ে উচ্চমার্গীয়। এ কথার মধ্য দিয়ে বিতর্ক শেষ হয়। বনু তামিমের আগন্তুকরা ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি তাদের আকর্ষণীয় উপহার দেন। সেইসাথে মুক্ত করে দেন তাদের বন্দিদের।[১]

খাসআম অভিযান

নবম হিজরির সফর মাসে কুতবা ইবনু আমিরের নেতৃত্বে খাসআমের একটি শাখাগোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এরা তুরবার নিকটবর্তী তবালা অঞ্চলে বসবাস করত। কুতবা ২০ জন সৈন্য ও ১০টি উট নিয়ে অভিযানে বের হন। যাত্রাপথে তারা পালা করে উটে আরোহণ করেন। গন্তব্যে পৌঁছে শত্রুদের ওপর জোরদার হামলা চালান। তুমুল যুদ্ধ হয় দুই পক্ষের মধ্যে। হতাহতও হয় অনেক। কুতবা-সহ আরও কয়েকজন মুসলিম শহিদ হন এ যুদ্ধে। তবে শেষ পর্যন্ত মুসলিমরাই বিজয়ী হয়। তারা

---

[১] যুদ্ধ-বিষয়ক গবেষকগণ এমনটাই উল্লেখ করেছেন।

যুদ্ধলব্ধ উট, বকরি ও বন্দিদের নিয়ে ফিরে আসেন মদিনায়।

বনু কিলাব অভিযান

নবম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে যাহহাক ইবনু সুফিয়ান আল-কিলাবির নেতৃত্বে বনু কিলাব গোত্রে একটি বাহিনী পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাদের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তারা প্রচণ্ড ঘৃণার সাথে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বাধ্য হয়ে মুসলিমরাও হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। যুদ্ধে বনু কিলাব পরাজয়-বরণ করে। তাদের একজন নিহত হয়। অপরদিকে মুসলিমরা নিরাপদে ফিরে আসে মদিনায়।

জেদ্দার উপকূলীয় অঞ্চল অভিযান

নবম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে আলকামা ইবনু মুজাযযায আল-মুদলিজির নেতৃত্বে জেদ্দার সমুদ্র উপকূলে ৩০০ জন সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠানো হয়। একদল হাবশি মক্কায় লুটপাট ও রাহাজানি করার উদ্দেশ্যে জেদ্দার সমুদ্র উপকূলে জড়ো হলে এ অভিযানটি পরিচালিত হয়। আলকামা উপকূলে কাউকে না পেয়ে সমুদ্র-অভিযানে নেমে পড়েন। সামনে অগ্রসর হতে হতে একটি দ্বীপ পর্যন্ত চলে যান। সংবাদ পেয়ে হাবশিরা পালিয়ে যায় সেখান থেকে।[১]

তাঈ অভিযান

নবম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তাঈ গোত্রের কালস মূর্তি ভাঙতে আলি ইবনু আবি তালিবের নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠানো হয়। নবিজি ১৫০ জন সৈন্য, ১০০ উট ও ৫০ ঘোড়াসহ তাদের প্রেরণ করেন। সঙ্গে দিয়ে দেন একটি কালো, আরেকটি সাদা পতাকা। মুসলিম সৈন্যরা ফজরের সময় হাতিম তাঈয়ের এলাকায় ব্যাপক হামলা চালিয়ে মূর্তিটি ধসিয়ে দেয়। প্রচুর বন্দি, উট ও বকরির পাল তাদের মালিকানায় চলে আসে। বন্দিদের মধ্যে আদি ইবনু হাতিমের বোনও ছিলেন। আদি ইবনু হাতিম শামে পালিয়ে যান।

কালস মূর্তির কোষাগার থেকে সৈন্যরা ৩টি তরবারি ও ৩টি বর্ম উদ্ধার করে। অভিযান থেকে ফেরার পথে তারা গনিমত ভাগ করে নেয়। তবে বাছাইকৃত কিছু জিনিস তুলে রাখে নবিজির জন্য। আর হাতিমের কন্যার বিষয়টি স্থগিত থাকে। কারও ভাগে দেওয়া হয় না তাকে।

বাহিনী মদিনায় ফিরে এলে আদি ইবনু হাতিমের বোন নবিজির অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৫৯

বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, এখানে যার আসার কথা সে নিখোঁজ, বাবা তো আগেই মারা গেছেন। আমিও বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কারও খেদমত করার শক্তি নেই আমার। তাই আমার প্রতি একটু দয়া করুন, আল্লাহও আপনার প্রতি দয়া করবেন। নবিজি জিজ্ঞেস করেন, এখানে কার আসার কথা ছিল? বৃদ্ধা বলেন, আমার ভাই আদি ইবনু হাতিমের। নবিজি বলেন, সেই লোকের, যে কিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছ থেকে পালিয়েছে? এ কথা বলে নবিজি উঠে চলে যান।

পরের দিনও একই রকম প্রশ্নোত্তর হয় বৃদ্ধার সাথে। তৃতীয় দিন নবিজি তার প্রতি কোমল আচরণ করেন। এ সময় নবিজির পাশে একজন সাহাবি বসে ছিলেন। সম্ভবত আলি ইবনু আবি তালিব। তিনি বৃদ্ধাকে বলেন, তুমি নবিজির কাছে বাহনের অনুরোধ করো। বৃদ্ধার অনুরোধের খাতিরে নবিজি তার জন্য একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিতে বলেন।

বৃদ্ধা তার ভাইয়ের খোঁজে শাম দেশে চলে যান। ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে তার কাছে নবিজির অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি আমার প্রতি যতটা দয়া করেছেন, তোমার বাবাও ততটা দয়া করতেন না। কিছুটা ভয় থাকলেও প্রবল আশা নিয়ে তুমি তার কাছে যাও। আদি বোনের কথায় সাহস পান এবং কালবিলম্ব না করে নবিজির সাক্ষাতে মদিনায় চলে আসেন।

নবিজি তাকে সামনে এনে বসান। এরপর হামদ ও সানা পাঠ করে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি পালিয়েছিলে কেন? তুমি কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার ভয়ে পালিয়েছিলে? আচ্ছা, তুমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে মনে করো? আদি উত্তরে 'না' বলেন। আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর নবিজি জিজ্ঞেস করেন, তবে কি তুমি 'আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়'—এ কথা বলতে গিয়ে ভয়ে পালিয়েছিলে? তোমার দৃষ্টিতে কি আল্লাহর চাইতে বড় কেউ আছে? আদি জবাব দেন, না, কেউ নেই। নবিজি বলেন, তোমার জেনে রাখা উচিত, ইহুদিরা আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত আর খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট। আদি বলেন, আমি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। আদির মুখ থেকে এই বাক্যটি শোনামাত্র নবিজির চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি আদির জন্য একজন আনসারি সাহাবির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এরপর থেকে আদি সকাল-বিকাল নবিজির কাছে হাজির হতেন।[১]

ইবনু ইসহাকের সূত্রে আদি ইবনু হাতিম থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি তাকে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আদি, তুমি তো আগে পুরোহিত ছিলে, তাই না? আদি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়েন। নবিজি তারপর জানতে চাইলেন, তোমার সম্প্রদায় যে গনিমত পেত, তুমি কি সেটার চার ভাগের এক ভাগ পেতে? আদি এবার মুখ খোলেন, জি,

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২০৫

পেতাম। নবিজির জিজ্ঞেস করেন, তুমি তো ঠিকই জানতে, তোমার ধর্মে এর অনুমোদন নেই। আদি বলেন, জি, আমি জানতাম।

পরবর্তী সময়ে আদি মন্তব্য করেন, সেদিনই আমি বুঝতে পারি, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য একজন নবি। তিনি এমন কিছু জানেন, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।[১]

অন্য এক বর্ণনায় এই ঘটনাটিই একটু ভিন্নভাবে এসেছে, নবিজি আদিকে বলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করে নাও। এতে তুমি নিরাপদে থাকতে পারবে। জবাবে আদি বলেন, আমি তো অন্য এক ধর্মের অনুসারী। নবিজি মন্তব্য করেন, আমি তোমার ধর্মের ব্যাপারে তোমার চেয়ে ভালো জানি। নবিজির এ কথায় আদি বেশ অবাক হন, আপনি আমার ধর্মের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো জানেন? নবিজি উত্তর দেন না। চুপ করে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। এরপর বলতে শুরু করেন, তুমি আগে পুরোহিত ছিলে। তখন তোমার গোত্রের কাছ থেকে গনিমতের চার ভাগের এক ভাগ পেতে। আদি বলেন, হ্যাঁ, পেতাম। নবিজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক নাগাড়ে বলতে থাকেন, অথচ তুমি খুব ভালো করেই জানতে, তোমার ধর্মে এটা বৈধ নয়। নবিজির মুখে এ কথাটি শুনে আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলি।[২]

আদি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আমি আল্লাহর রাসুলের কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে তার দুঃখ-দুর্দশার কথা জানায়। একটু পর আরেকজন আসে ডাকাতির অভিযোগ নিয়ে। নবিজি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আদি! তুমি কি হিরায় গিয়েছ কখনো? আমি বলি, যাইনি, তবে আমি এর রাস্তা চিনি। তিনি বলেন, তুমি দীর্ঘায়ু পেলে দেখবে, নারীরা উটের পিঠে চড়ে একা একা হিরা থেকে রওনা হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে যাবে। পথে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বলি, তাঈ গোত্রের ডাকাতগুলোর তখন কী হবে, যাদের লুণ্ঠন ও অরাজকতায় দেশটা সবসময় অশান্ত থাকে! নবিজি বলেন, তুমি দীর্ঘজীবী হলে আরও দেখতে পাবে, কিসরার ধনভান্ডার তোমাদের অধিকারে চলে এসেছে। আমি জানতে চাই, কিসরা ইবনু হুরমুযের? তিনি বলেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবনু হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে তুমি দেখবে, লোকেরা যাকাতের সোনা-রুপা হাতে নিয়ে গরিব মানুষদের খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু সেগুলো নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না।

হাদিসের শেষাংশে এসেছে, আদি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি, এক ভদ্রমহিলা হিরা থেকে উটের পিঠে চড়ে একা একা রওনা হয়ে মক্কায় পৌঁছে কাবা

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮১

[২] *মুসনাদু আহমাদ :* ১৮২৬০; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা :* ৩৬৬০৬; হাদিসটি হাসান সহিহ।

ঘরের তাওয়াফ করেছে। পথে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায়নি। পারস্যসম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমিও একজন। তোমরা আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে দেখবে, যাকাত দেওয়ার জন্য মানুষ মুঠি মুঠি সোনা-রুপা নিয়ে বের হবে। কিন্তু কেউ সেগুলো নিতে চাইবে না।[১]

তাবুক যুদ্ধ

মক্কাবিজয় ছিল হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী এক অভিযান। এ যুদ্ধের পর নবিজির নবুয়তের সত্যতা বিষয়ে আরবের লোকদের সংশয় ও সন্দেহের অবসান ঘটে। বদলে যায় ইতিহাসের গতি। দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে লোকজন। আমরা এ বিষয়ে খুব শীঘ্রই বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ। অবশ্য বিদায় হজে উপস্থিত হওয়া মুসলিমদের সংখ্যা থেকেও বিষয়টি অনুমান করা যায়। যাইহোক, আরবের অভ্যন্তরীণ গোলমাল চুকে যাওয়ায় মুসলিমরা প্রসন্নচিত্তে ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামি শরিয়তের শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

যুদ্ধের কারণ

বিনা-উসকানিতে মুসলিমদের সাথে বিবাদে জড়াতে চাইছিল আরেকটি শক্তি। তারা হলো রোমান জাতি; তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শুরাহবিল ইবনু আমর আল-গাসসানির হাতেই মুসলিম ও রোমানদের এই সংঘাতের সূত্রপাত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসরার গভর্নরের কাছে হারিস ইবনু উমাইর আল-আযদিকে দূত করে পাঠালে শুরাহবিল তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরে যাইদ ইবনুল হারিসার নেতৃত্বে নবিজি সেখানে একটি সৈন্যদল পাঠান। মুতার প্রান্তরে তাদের সঙ্গে রোমানদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলিমরা জালিমদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি—যদিও আরব ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের মাঝে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

মানুষের এই পরিবর্তন দৃষ্টি এড়ায়নি রোমসম্রাট কাইসারের। সে সুযোগও অবশ্য ছিল না। কারণ এ অভিযানের ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে রোমানদের শোষণ থেকে মুক্তির চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেইসাথে সিরিয়ার রোম-আরব সীমান্ত অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে—যা ছিল রোম সাম্রাজ্যের জন্য এক অশনি সংকেত।

এসব দিক মাথায় রেখে সম্রাট চিন্তা করে, মুসলিম শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠার আগেই তাদের দমন করতে হবে। এতে আর যাইহোক, রোমের সীমান্তবর্তী আরব অঞ্চলসমূহে বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠার সুযোগ থাকবে না। এদিকে লক্ষ করেই মুতার যুদ্ধের এক

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৯৫; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৮৫৮২; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮৫৭

বছরের মাথায় সম্রাট কাইসার রোম ও তার সংলগ্ন আরব অঞ্চলে সৈন্য জড়ো করতে শুরু করে। এটা ছিল মুসলিমদের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

মুসলিমদের মনে ভয় ও উৎকণ্ঠা!

গোয়েন্দা মারফত রোমান ও গাসসানীয়দের যুদ্ধ-প্রস্তুতির সংবাদ মদিনায় পৌঁছে যায়। উৎকণ্ঠা নেমে আসে মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে। কোথাও অস্বাভাবিক শব্দ শুনলেই আঁতকে ওঠেন—এই বুঝি রোমান সৈন্যরা আক্রমণ করে বসল। মুসলিমদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার নমুনা হিসেবে নবম হিজরিতে সংঘটিত উমারের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সময় কোনো এক কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে ইলা[১] করেছিলেন। সাহাবিরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তারা ভেবেছিলেন, নবিজি হয়তো তার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এই ঘটনা নিয়েও সাহাবিরা ছিলেন বেশ চিন্তিত ও ব্যথিত। উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, আমার একজন আনসারি সাথি ছিল। আমি যখন নবিজির মজলিসে অনুপস্থিত থাকতাম, সে আমাকে তখনকার ঘটে যাওয়া ঘটনা ও সংবাদগুলো জানাত। একইভাবে সে অনুপস্থিত থাকলে আমি তাকে সে সময়কার খুঁটিনাটি জানাতাম। আমরা তখন গাসসানের শাসকের আক্রমণের ভয়ে উৎকণ্ঠিত। জানা যায়, সে আমাদের ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এতে আমাদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আমি তাকে বলেছিলাম, গাসসান ও রোমান সৈন্যদের যেকোনো সংবাদ এলে আমাকে তা জানাতে। সে সময়টাতে একদিন আমার আনসারি ভাইটি দরজায় বিকট শব্দে করাঘাত করে—দরজা খোলো! দরজা খোলো! আমি জিজ্ঞেস করি, গাসসানের সৈন্যরা কি আক্রমণ করেছে? সে বলে, না, বরং তার চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। শুনেছি, আল্লাহর রাসুল তার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন।[২]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, উমার বলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম, গাসসান সম্রাট আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত করছেন। এমনই একদিন ওই আনসারি ভাই রাতের বেলা আমার দরজায় বিকট শব্দে করাঘাত করে বলে, লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! আমি হকচকিয়ে উঠি। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসি তার কাছে। সে বলে, ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি ব্যাকুল হয়ে জানতে চাই, 'গাসসানের সৈন্যরা কি আক্রমণ করেছে?' সে বলে, 'না, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটেছে। শুনলাম, আল্লাহর রাসুল তার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন।'[৩]

---

[১] স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থান না করার শপথ করা।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৯১৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৪৭৯

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ২৪৬৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৪৭৯

প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। বিভিন্ন গোত্র ও জনপদ থেকে দলে দলে লোকজন মদিনায় সমবেত হতে থাকে। কেবল চিহ্নিত মুনাফিক ও তিনজন মুসলিম ছাড়া কেউই বিরত থাকেনি এ যুদ্ধ থেকে। অভাবগ্রস্ত সাহাবিরাও নিজেদের সেরা চেষ্টাটুকু করেছিলেন। তারা নবিজির কাছে যুদ্ধে যাওয়ার বাহন চাইতে এসেছিলেন। না পেয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন। কুরআনের ভাষায়—

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

একইভাবে তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই, যারা আপনার কাছে বাহন চাইতে এলে আপনি তাদের বলেছিলেন, আমার কাছে তো তোমাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন নেই। তারা তখন ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হওয়ার কষ্টে অশ্রুবিগলিত নয়নে ফিরে গিয়েছিল।[১]

সাহাবিগণ আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় পাঠানোর জন্য একটি কাফেলা প্রস্তুত করেছিলেন। এতে ছিল ২০০টি সুসজ্জিত উট। সাথে ছিল ২০০ উকিয়া রৌপ্য, আধুনিক পরিমাপে যা ছিল প্রায় সাড়ে ১৯ কেজি। এর পুরোটাই তিনি এ যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ রাখেন। পাশাপাশি খাদ্য-রসদে সুসজ্জিত আরও ১০০টি উট দান করেন। এরপর ১০০ দিনার স্বর্ণ এনে নবিজির সামনে পেশ করেন, যার ওজন প্রায় ৫ কেজি। তিনি সেগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন আর বলছিলেন, আজকের পর থেকে উসমান যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি হবে না।[২] যুদ্ধে যাওয়ার আগপর্যন্ত তিনি এভাবেই দান করতে থাকেন। সবশেষে নগদ অর্থ বাদে তার মোট দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০০টি উট ও ১০০টি ঘোড়া।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফও ২০০ উকিয়া রৌপ্য নিয়ে আসেন। আবু বকর তো রীতিমতো অবাক করে দেন সবাইকে। তার ঘরে যা কিছু ছিল, সব নিয়ে তিনি হাজির হন নবিজির দরবারে। তার দেওয়া সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪০০ দিরহাম। তিনিই সবার আগে সাদাকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। উমার তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হন। নবিজির চাচা আব্বাস বহুমূল্য সম্পদ নিয়ে আসেন। বিশিষ্ট তিনজন সাহাবি তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, সাদ ইবনু উবাদা ও মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাও হাজির হন নিজেদের সাধ্যের

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৯২

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৭০১; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪৫৫৩; হাদিসটি হাসান সহিহ।

সে সময় মুসলিমদের ওপর রোমানদের হামলার হুমকি কতটা ভয়াবহ ছিল, তা এই ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এদিকে কিছু মুনাফিক রোমানদের যুদ্ধপ্রস্তুতির অতিরঞ্জিত সংবাদ মুসলিমদের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। সেইসাথে তারা এটাও লক্ষ করেছে, তাদের এসব গুজবে নবিজির মধ্যে ভাবান্তর ঘটছে না। তাছাড়া তিনি এ পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই সফল নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর কোনো শক্তিকেই তিনি ভয় পান বলে মনে হয় না। বরং তার সামনে কোনো বাধা এলে মুহূর্তের মাঝেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এতকিছুর পরও মুনাফিকরা আশা করছে, এবার আর মুসলিমদের রক্ষা নেই। ইসলামকে চিরতরে ধ্বংস করার যে স্বপ্ন তারা দীর্ঘদিন ধরে লালন করে আসছে, তা অতি শীঘ্রই পূরণ হতে চলেছে। তাদের এই পরম আকাঙ্ক্ষা ত্বরান্বিত করতে তারা একটি আস্তানা গড়ে তোলে। সম্পূর্ণ মসজিদের অবয়বে। তাদের এ মসজিদকেই বলা হয় মসজিদে জিরার। কুফরের বিস্তার এবং মুমিনদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত লোকদের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এ মসজিদ। পরে তারা নবিজিকে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মসজিদটি উদ্বোধনের দাওয়াত দেয়। বস্তুত তাদের এই দাওয়াতের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, নবিজি যদি এখানে এসে সালাত আদায় করেন, তাহলে এই মসজিদটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। কেউ তাদের এই ঘাঁটিকে আর সন্দেহের চোখে দেখবে না। ফলে মসজিদের ভেতরে ঘটমান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কেউ কিছু জানতেও পারবে না। আর এই মসজিদটি তখন মুনাফিক ও তাদের দোসরদের জন্য এক অভয়ারণ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু নবিজি তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকায় মসজিদের উদ্বোধন পিছিয়ে দেন। ফলে এর সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে। মুনাফিকদের পরিকল্পনা এ যাত্রায় মাঠে মারা যায়। এরই মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন চক্রান্ত জানিয়ে দেন তাঁর রাসুলকে। ফলে তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে মসজিদটি উদ্বোধন না করে বরং গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

রোমান সেনাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি

এ সময় শাম থেকে তেল আনতে যাওয়া নাবতিদের মাধ্যমে এই মর্মে সংবাদ আসে, রোমসম্রাট হিরাকল ৪০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছেন। বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে রোমের বিখ্যাত কোনো সেনাপতি। রোমান সেনাবাহিনী ছাড়াও তার অধীনে যোগ দিয়েছে খ্রিষ্টানদের দুটি গোত্র লাখাম ও জুযামসহ অন্যান্য আরব যোদ্ধারাও। এই বিশাল সৈন্যবহরের প্রথমাংশ এখন বালকা এসে পৌঁছেছে।

প্রতিকূল পরিবেশ নাজুক পরিস্থিতি

তখন প্রচণ্ড খরা চলছিল। অর্থনৈতিক মন্দা তো আছেই। যুদ্ধের অস্ত্র ও বাহনও

ছিল শত্রুদের তুলনায় অপ্রতুল। তার ওপর মদিনায় তখন খেজুর পাকার মৌসুম। সারা বছরের আয় খেজুর বিক্রির অর্থ থেকেই আসে মদিনাবাসীদের। সাধারণত এ সময়টায় কেউ যুদ্ধে বের হয় না। তার ওপর দুর্গম পথ; দূরত্বও অনেক।

দ্বীন রক্ষার্থে নবিজির সুদূরপ্রসারী চিন্তা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারেন, সময়ের পিছুটানে পড়ে যদি রোমানদের মোকাবেলায় ত্রুটি বা শিথিলতা দেখানো হয় এবং সেই সুযোগে তারা যদি মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলে হস্তক্ষেপের অথবা মদিনায় প্রবেশের সুযোগ পায়, তবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে তা মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। সেইসাথে ক্ষুণ্ণ হবে মুসলিমদের সামরিক সুনামও। এতে হুনাইনের যুদ্ধে পর্যুদস্ত কুফরি শক্তিও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। রোমানরা মুসলিমদের সামনে থেকে আঘাত হানলে, মুনাফিকরা তাদের মিত্রশক্তিদের সাথে নিয়ে ছুরিকাঘাত করবে পেছন থেকে। ফলে ইসলাম প্রচারে নবিজি ও তার সাহাবিদের এতদিনের শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। ফিকে হয়ে যাবে তাদের রক্তভেজা অর্জন।

এসব দিক বিবেচনা করে নবিজি সিদ্ধান্ত নেন—পরিস্থিতি যতই নাজুক আর সংকটময় হোক না কেন, রোমানদেরকে মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। শুধু তা-ই নয়, তাদের ভূখণ্ডে গিয়েই আঘাত হানতে হবে তাদের ওপর।

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা

নবিজি সবদিক বিবেচনা করে সাহাবিদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। আরবের বিভিন্ন গোত্র ও মক্কাবাসীর কাছে সংবাদ পাঠিয়ে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। অন্যান্য যুদ্ধে নবিজি বিভিন্ন কৌশলে গন্তব্যের কথা গোপন রাখতেন। কিন্তু এবারের যুদ্ধে পথ বেশ দুর্গম, তার ওপর সময়টাও বেশ প্রতিকূলে। তাই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন—এবার আমরা রোমানদের মুখোমুখি হব, যাতে সবাই যথাযথভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারে।

ঘোষণার পর তিনি নানাভাবে সবাইকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রেক্ষাপটে সুরা তাওবারও একাংশ অবতীর্ণ হয়। নবিজি তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি আল্লাহর পথে অকাতরে দান-সাদাকা করার প্রতিও উৎসাহিত করেন। কারণ যুদ্ধের সফরে উচ্চ মনোবলের পাশাপাশি পর্যাপ্ত রসদ থাকাও অত্যন্ত জরুরি।

মুসলিমদের প্রাণপণ যুদ্ধপ্রস্তুতি

নবিজির মুখে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা শোনামাত্রই সাহাবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়ে যায়। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে সবাই যুদ্ধের

প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। বিভিন্ন গোত্র ও জনপদ থেকে দলে দলে লোকজন মদিনায় সমবেত হতে থাকে। কেবল চিহ্নিত মুনাফিক ও তিনজন মুসলিম ছাড়া কেউই বিরত থাকেনি এ যুদ্ধ থেকে। অভাবগ্রস্ত সাহাবিরাও নিজেদের সেরা চেষ্টাটুকু করেছিলেন। তারা নবিজির কাছে যুদ্ধে যাওয়ার বাহন চাইতে এসেছিলেন। না পেয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন। কুরআনের ভাষায়—

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿٩٢﴾

একইভাবে তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই, যারা আপনার কাছে বাহন চাইতে এলে আপনি তাদের বলেছিলেন, আমার কাছে তো তোমাদের দেওয়ার মতো কোনো বাহন নেই। তারা তখন ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হওয়ার কষ্টে অশ্রুবিগলিত নয়নে ফিরে গিয়েছিল।[১]

সাহাবিগণ আল্লাহর পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় পাঠানোর জন্য একটি কাফেলা প্রস্তুত করেছিলেন। এতে ছিল ২০০টি সুসজ্জিত উট। সাথে ছিল ২০০ উকিয়া রৌপ্য, আধুনিক পরিমাপে যা ছিল প্রায় সাড়ে ১৯ কেজি। এর পুরোটাই তিনি এ যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ রাখেন। পাশাপাশি খাদ্য-রসদে সুসজ্জিত আরও ১০০টি উট দান করেন। এরপর ১০০ দিনার স্বর্ণ এনে নবিজির সামনে পেশ করেন, যার ওজন প্রায় ৫ কেজি। তিনি সেগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন আর বলছিলেন, আজকের পর থেকে উসমান যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি হবে না।[২] যুদ্ধে যাওয়ার আগপর্যন্ত তিনি এভাবেই দান করতে থাকেন। সবশেষে নগদ অর্থ বাদে তার মোট দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০০টি উট ও ১০০টি ঘোড়া।

আব্দুর রহমান ইবনু আউফও ২০০ উকিয়া রৌপ্য নিয়ে আসেন। আবু বকর তো রীতিমতো অবাক করে দেন সবাইকে। তার ঘরে যা কিছু ছিল, সব নিয়ে তিনি হাজির হন নবিজির দরবারে। তার দেওয়া সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪০০ দিরহাম। তিনিই সবার আগে সাদাকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। উমার তার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে হাজির হন। নবিজির চাচা আব্বাস বহুমূল্য সম্পদ নিয়ে আসেন। বিশিষ্ট তিনজন সাহাবি তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, সাদ ইবনু উবাদা ও মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাও হাজির হন নিজেদের সাধ্যের

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৯২

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৭০১; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪৫৫৩; হাদিসটি হাসান সহিহ।

সবটুকু নিয়ে। আসিম ইবনু আদি ৯০ ওয়াসাক তথা সাড়ে ১৩ হাজার কেজি বা সোয়া ১৩ টন খেজুর নিয়ে আসেন। সাহাবিদের প্রত্যেকেই কমবেশি সাদাকা করেন। দুয়েক মুষ্টি খাবারও নিয়ে আসেন কেউ কেউ, যাদের এর বেশি দেওয়ার সামর্থ্যই ছিল না। মহিলারাও নিজেদের সামর্থ্য মতো গলার হার, ঝুমকো, পায়েল ও আংটি দান করেন।

দান করার ক্ষেত্রে কেউই হাত গুটিয়ে রাখেননি। কার্পণ্য করেননি মোটেও; কেবল মুনাফিকরা বাদে—

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

মুমিনদের মধ্যে যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে সাদাকা করে এবং যারা কষ্টার্জিত সামান্য বস্তু ছাড়া (দান করার মতো) কিছু পায় না, তাদেরকে যারা কটাক্ষ ও বিদ্রুপ করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাসের পাত্র বানান। তাছাড়া তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।[১]

তাবুকের পথে মুসলিম বাহিনী

অবশেষে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা মতান্তরে সিবা ইবনু উরফুতাকে মদিনায় তার স্থলাভিষিক্ত করেন। আলিকে দিলেন তার পরিবার-পরিজন দেখাশোনার দায়িত্ব। এতে মুনাফিকরা আলির সমালোচনা শুরু করে দিল। তিনি বিরক্ত হয়ে মদিনা থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং যথারীতি নবিজির সঙ্গে মিলিত হলেন। কিন্তু নবিজি তাকে এটা বলে ফেরত পাঠালেন, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মুসা আলাইহিস সালামের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মাধ্যমে হারুন আলাইহিস সালাম যে মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তুমিও আমার পক্ষ থেকে সেই মর্যাদা লাভ করবে? অবশ্য আমার পরে আর কোনো নবি আসবে না।'

বৃহস্পতিবার নবিজি উত্তর দিকে তাবুক অভিমুখে রওনা হন। এ যাত্রায় মুসলিম সৈন্যদল অনেক বড়। সর্বমোট ৩০ হাজার যোদ্ধা তাদের বাহিনীতে। এর আগে এত বড় বাহিনী নিয়ে মুসলিমরা যুদ্ধযাত্রা করেনি কখনো। মুসলিমদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও পুরো বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। সৈন্যসংখ্যার তুলনায় পাথেয় ও বাহন ছিল খুবই অপ্রতুল। প্রতি ১৮ জনের ভাগে মাত্র একটি করে উট। পর্যায়ক্রমে তারা তাতে সওয়ার হতেন। খাদ্যসংকটের ফলে গাছের পাতা খেতে হয়

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৯

একসময়। এতে তাদের ঠোঁট ফুলে যায়। পানির অভাব এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, উট জবাই করে তার পেট থেকে পানি বের করে খেতে হয়েছে তাদের। এজন্য এই সৈন্যদলকে বলা হয় 'জাইশুল উসরাহ' অর্থাৎ অভাব-অনটনে নিপতিত সৈন্যদল।

তাবুক যাওয়ার পথে মুসলিম সৈন্যদলের সামনে সামুদ সম্প্রদায়ের একটি বসতি পড়ে। এর নাম হিজর। এখানকার লোকেরা পাথর কেটে ঘরবাড়ি বানাত। হিজরের একটি কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে সৈন্যরা যখন রওনা হচ্ছিল, তখন নবিজি তাদের বলেন, তোমরা এই কূপের পানি পান কোরো না, এমনকি এ পানি দিয়ে সালাতের জন্য ওজুও কোরো না। এখানকার পানি দিয়ে যে আটার খামিরা তৈরি করেছ, তা উটকে খেতে দাও। নিজেরা খেয়ো না। সামনে আরও একটি কূপ পড়বে। সালিহ আলাইহিস সালামের উটনী সে কূপ থেকে পানি পান করত। তোমরা সেখান থেকে পানি তুলে খাও এবং তা দিয়ে তোমাদের অন্যান্য প্রয়োজনও পূরণ করো।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেন, 'আল্লাহর রাসুল সামুদ জাতির বসতি অতিক্রম করার সময় সাহাবিদের সতর্ক করে বলেছিলেন, নিজেদের ওপর জুলম করার কারণে এখানকার বাসিন্দাদের ওপর যে আজাব এসেছিল, তা যেন তোমাদের ওপরও না আসে, সেজন্য তোমরা (আল্লাহর ভয়ে) কান্নারত অবস্থায় তাদের এলাকায় প্রবেশ করবে। এরপর তিনি মাথা ঢেকে অতি দ্রুত সেই স্থান অতিক্রম করেন।'[১]

পথিমধ্যে আরও একবার পানির ভীষণ প্রয়োজন দেখা দেয়। সবাই মিলে নবিজির কাছে তাদের প্রয়োজনের কথা বললে, তিনি পানির জন্য দুআ করেন। তখনই আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। খানিক বাদে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। সবাই তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করে। তারপর সামনে অগ্রসর হয়।

তাবুকের কাছাকাছি পৌঁছে নবিজি বলেন, তোমরা আগামীকাল সকালের মধ্যেই তাবুকের ঝরনায় পৌঁছবে ইনশাআল্লাহ। আমি সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমরা কেউ তার পানি স্পর্শ করবে না। মুআজ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, দুজন লোক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন। ঝরনা থেকে তখন ক্ষীণ ধারায় সামান্য পানি বের হচ্ছিল। নবিজি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি ঝরনার পানি স্পর্শ করেছ? তারা উত্তর দেয়, হ্যাঁ! এটা শুনে নবিজি তাদের তিরস্কার করেন। এরপর ঝরনার পানিতে কিছুক্ষণ আঁজলা পেতে রাখেন। তাতে একটু পানি জমলে, সে পানি দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেলেন। বাকি পানিটুকু ঢেলে দেন ঝরনায়। অমনি প্রবল ধারায় পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে সেখান থেকে। সবাই সে পানি পান করে। প্রয়োজনমতো সংরক্ষণ করে। এরপর নবিজি মুআজকে ডেকে বলেন, হে মুআজ, তুমি দীর্ঘায়ু পেলে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪১৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৯৮০; *আস-সুনানুল কুবরা,* নাসায়ি : ১১২০৬

দেখবে, এই জায়গাটি একদিন বাগানে পরিণত হবে।[১]

তাবুক যাওয়ার পথে অথবা তাবুক পৌঁছে নবিজি বলেন, আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় হবে। তাই তোমরা কেউ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে না। যাদের সাথে উট আছে, তারা উটের রশি শক্তভাবে ধরে রাখবে। সত্যি সে রাতে প্রচণ্ড ঝড় হয়। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে ঝড়ো হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাঈ' নামক স্থানের দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফেলে দেয়।[২]

পথে নবিজি যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার সালাত একসাথে আদায় করে নেন।

তাবুকে মুসলিম সেনাদের অবতরণ

তাবুকে পৌঁছে মুসলিম সেনাদল তাঁবু স্থাপন করে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তারা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এ সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি সাহাবিদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় দেখান। জান্নাতের অনাবিল সুখের সুসংবাদ দেন। এতে সাহাবিদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। সামরিক সাজ-সরঞ্জামের অভাব ও অপূর্ণতা খুবই গৌণ মনে হয় তাদের কাছে।

অপরদিকে রোমান ও তাদের মিত্ররা তেজোদ্দীপ্ত মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদ পেয়ে ঘাবড়ে যায়। সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলিমদের মোকাবেলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদের ভূখণ্ডেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এতে আরব-অনারব সবার মধ্যেই মুসলিমদের সামরিক সক্ষমতার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ অভিযানে মুসলিমরা যে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করে, রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও তা অর্জন করা সম্ভবপর ছিল না।

তাবুকে অবস্থানকালে আইলার শাসক ইয়াহনা ইবনু রুবা নবিজির কাছে এসে জিযিয়া প্রদানের ভিত্তিতে সমঝোতা চুক্তি করে। জারবা ও আযরুহর অধিবাসীরাও এসে জিযিয়া প্রদানের অঙ্গীকার করে। এ সময় নবিজি তাদের জন্য একটি পত্র-নির্দেশনা লিখে দেন—

> *পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এই শান্তি পরোয়ানা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ইয়াহনা ইবনু রুবা ও আইলাবাসীর জন্য। জলে ও স্থলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি থাকবে। তাদের সাথে যেসব সিরীয় ও সমুদ্র-উপকূলবাসী রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এ নিরাপত্তা-বিধান কার্যকর*

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৭০৬; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ৯৬৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৩৯২; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৯১৫

হবে। তবে তাদের মধ্যে কেউ যদি গোলমাল পাকায়, তার অর্থসম্পদ রক্ষার দায়দায়িত্ব নেওয়া হবে না। এমন ব্যক্তির সম্পদ কেউ গ্রহণ করলে, সেটা তার জন্য হালাল। তাদেরকে কোনো কূপ বা জলাশয়ে অবতরণ কিংবা জলে-স্থলে চলাচলে বাধা দেওয়া যাবে না।

এছাড়া নবিজি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ৪০০ জন ঘোড়সওয়ার সৈন্য দিয়ে দুমাতুল জানদালের শাসক আকাইদারের বিরুদ্ধে পাঠান। পাঠানোর সময় নবিজি তাকে বলে দেন, 'তুমি তাকে নীল গাভি শিকাররত অবস্থায় পাবে।' নির্দেশ পেয়ে খালিদ তখনই রওনা হয়ে যান। দূর থেকে আকাইদারের প্রাসাদ তার দৃষ্টির সীমানায় দৃশ্যমান হয়। এমন সময় কোত্থেকে একটা নীল গাভি বের হয়ে শিং দিয়ে প্রাসাদের গেটে অনবরত গুঁতো দিতে থাকে। আকাইদার সঙ্গে সঙ্গে সেটি শিকার করতে বের হয়। সেদিন ছিল চাঁদনি রাত। খালিদ তাকে বন্দি করে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে প্রাণভিক্ষা দেন। বিনিময়ে তার থেকে নেন ২ হাজার উট, ৮০০ ক্রীতদাস, ৪০০ বর্ম ও সমপরিমাণ বর্শা। আকাইদার জিযিয়া দেওয়ার বিষয়েও সম্মত হয়। নবিজি তার ও ইয়াহনার সাথে দুমাতুল জানদাল, তাবুক, আইলা ও তাইমা অঞ্চল থেকে জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিস্থাপন করেন।

রোমানদের মিত্র গোত্রগুলো তখন নিশ্চিত বুঝতে পারে, রোমানদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। ক্ষমতার পালাবদল হতে চলেছে। ক্ষমতা এখন মুসলিমদের হাতে। এভাবেই ইসলামি ভূখণ্ডের পরিধি বিস্তৃত হয়ে রোমান-সাম্রাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সেই সূত্রে রোমানদের একচেটিয়া আধিপত্য লোপ পায়।

বিজয়ীর বেশে মদিনার বুকে

মুসলিম সেনাদল তাবুক থেকে বিজয়ী বেশে ফিরে আসে। এ যাত্রায় কোনো ধরনের সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়নি তাদের। তাদের পক্ষে আল্লাহ নিজেই সে কাজটা করে দিয়েছেন। কিন্তু ফেরার সময় এক গিরিপথ অতিক্রমকালে ১২ জন মুনাফিক নবিজিকে হত্যার চেষ্টা করে। আম্মার তখন নবিজির সাথে ছিলেন। তিনি নবিজির উটের রশি ধরে সামনে এগোচ্ছেন। পেছনে হুজাইফা। তিনি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই দুজন ছাড়া বাকিরা তখন উপত্যকায়। মুনাফিকগুলো এই সুযোগটাকে লুফে নেয়। নবিজিকে লক্ষ্য করে পেছন থেকে ছুটে আসে। নবিজি ও তার সঙ্গীদ্বয় তাদের পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে পেছনে তাকান।

মুনাফিকগুলো তখন চেহারা ঢেকে সামনে এগিয়ে আসছিল। নবিজি তাদের কুমতলব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে হুজাইফাকে পাঠান তাদের প্রতিহত করার জন্য। হুজাইফা একটি ঢাল দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকেন তাদের বাহনগুলোর মুখে। ওপর

থেকে আল্লাহ ভয় ঢেলে দেন তাদের হৃদয়ে। তারা এক দৌড়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিশে যায়।

এ সময় নবিজি হুজাইফার সামনে এক-এক করে তাদের সবার নাম বলে দেন। এজন্য হুজাইফাকে বলা হয় 'সাহিবু সিররি রাসুলিল্লাহ' বা নবিজির গুপ্ত বিষয়াদির ধারক। মুনাফিকদের এই হত্যাচেষ্টার ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

...وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟...﴿٧٤﴾

তারা এমন এক সংকল্প করেছিল, যা বাস্তবায়ন করতে পারেনি।[১]

চলতে চলতে পথ ফুরিয়ে আসে। দূর থেকে মদিনার লোকালয় নবিজির দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে আপনমনে বলে ওঠেন, এই হচ্ছে তাললা, এই হচ্ছে উহুদ। আমরা একে ভালোবাসি। এ-ও আমাদের ভালোবাসে। মুহূর্তে তার আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে মদিনার ঘরে ঘরে। নারী-শিশুরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মুসলিম বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানাতে। ছন্দে ছন্দে তারা গেয়ে ওঠে[২]—

চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে ওই সানিয়া পাহাড়ে।
শোকর করো আল্লাহ তাআলার, আনলেন যিনি তাহারে।[৩]

নবিজি তাবুক অভিযানে বের হন রজব মাসে। ফিরে আসেন রামাদানে। এ অভিযান চলে ৫০ দিন ধরে। এর মধ্যে ২০ দিন তাবুকে, আর বাকি দিনগুলো কেটে যায় যাত্রাপথে। তাবুক ছিল নবিজির শেষ যুদ্ধাভিযান।

তাবুক যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেননি

তাবুক যুদ্ধ বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত হওয়ায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রকৃত মুমিন কারা তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পরীক্ষা করে থাকেন। যেমনটা পবিত্র কুরআনে এসেছে—

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ...﴿١٧٩﴾

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৭৪

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০

[৩] এটি বর্ণনা করেন ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ।

সৎ থেকে অসৎকে আলাদা না করে, তোমরা যেভাবে রয়েছ, সেভাবে আল্লাহ মুমিনদের রেখে দিতে পারেন না।[১]

সত্যিকারের মুমিনমাত্রই এ যুদ্ধে অংশ নেয়। যুদ্ধে অংশ না নেওয়াকে বিবেচনা করা হয় মুনাফিকির আলামত হিসেবে। এজন্য কাউকে অনুপস্থিত পাওয়া গেলে সাহাবিরা যখন তার কথা নবিজির সামনে তুলে ধরতেন, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহর হাওলা। তাকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থেকে থাকলে, আল্লাহ তাকে তোমাদের সঙ্গে মিলিত করবেন। অন্যথায় তোমরা তার কপটতা থেকে মুক্তি পাবে।

মোটকথা, বিশেষ অপারগ এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধবাদী মুনাফিকরা ছাড়া কেউই এই যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল না। মুনাফিকদের অনেকেই মিথ্যা ওজর দেখিয়ে নবিজির কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিল। কেউ কেউ তো সেটারও দরকার মনে করেনি। তবে হ্যাঁ, ৩ জন সত্যিকারের মুমিন ছিলেন, যারা বিশেষ কোনো ওজর না থাকা সত্ত্বেও এ যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ তাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন এবং অবশেষে তাদের তাওবা কবুল করে নেন।

নবিজি মদিনায় পৌঁছে সবার আগে মসজিদে যান। সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। তারপর লোকজন এসে তার সাথে দেখা করে। মুনাফিকরা এসে যুদ্ধে অনুপস্থিতির নানারকম ওজর দেখাতে থাকে। এদের সংখ্যা ছিল আশিরও বেশি।[২] এ সময় কেউ কেউ নিজের বক্তব্য সত্য প্রমাণে আল্লাহর নামে কসমও করে। নবিজি তাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি গ্রহণ করে আনুগত্যের বাইআত নেন এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন। তবে তাদের প্রকৃত অবস্থা বিচারের ভার ছেড়ে দেন আল্লাহর হাতে।

যে ৩ জন সাহাবি কোনোরকম ওজর বা অপারগতা ছাড়াই অনুপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন কাব ইবনু মালিক, মুরারা ইবনুর রবি ও হিলাল ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তারা নবিজির কাছে সত্য কথা বলেন এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। তাদের শাস্তি হিসেবে নবিজি সাহাবিদের বলেন, কেউ যেন তাদের সঙ্গে কথা না বলে। এভাবে তাদেরকে একঘরে করে রাখা হয়। চেনা মানুষও অচেনা হয়ে যায় তাদের জন্য। এক অপরিচিত জগতে বাস করতে থাকেন তারা। পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৭৯

[২] ওয়াকিদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উল্লেখিত সংখ্যাটি ছিল আনসারদের মাঝে লুকিয়ে থাকা মুনাফিকদের। এছাড়া আরবের বনু গিফার ও অন্যান্য গোত্রের বেদুইনদের মাঝে ওজর পেশ করা লোকের সংখ্যা ছিল ৮২ জন। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সাঙ্গোপাঙ্গারা ছিল এই সংখ্যার বাইরে। তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক। [*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১১৯]

হয়ে আসে। জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। দীর্ঘ ৩৯ দিন তাদের এভাবেই কাটে।

চল্লিশতম দিনে এর সঙ্গো যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। তাদেরকে জানানো হয়, তারা আর স্ত্রীদের সঙ্গো থাকতে পারবেন না। আলাদা থাকতে হবে তাদেরকে। এটা ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। এভাবে আরও ১০ দিন কেটে যায়। মোট ৫০ দিন পূর্ণ হলে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করে আয়াত অবতীর্ণ করেন—

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

যে ৩ জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, তাদের প্রতিও তিনি অনুগ্রহ করেছেন—যখন বিস্তৃতি সত্ত্বেও পৃথিবী তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল, জীবন হয়ে উঠেছিল তাদের জন্য দুর্বিষহ এবং তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার উপায় একমাত্র তিনিই—তখন তিনি তাদের তাওবা কবুল করেছেন, যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[১]

উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট তিন সাহাবি তো বটেই, সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা একে অন্যকে এ সুসংবাদ দিতে ছুটে যান এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি। দান-সাদাকা ও উপহার বিলিয়ে আনন্দ ছড়িয়ে দেন সবার মধ্যে। এক কথায়, এ দিনটি ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে আনন্দময় দিনগুলোর একটি।

অপরদিকে যেসকল সাহাবি সুনির্দিষ্ট ওজরের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿٩١﴾

যারা দুর্বল, অসুস্থ ও ব্যয়ভার বহনে অক্ষম, (অভিযানে যেতে না পারায়) তাদের কোনো অপরাধ নেই—যদি তারা আন্তরিক থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি।[২]

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১১৮

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ৯১

তাছাড়া তাবুক থেকে ফেরার পথে নবিজি মদিনার কাছাকাছি এসে এদের সম্পর্কে বলেছিলেন, মদিনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই গিয়েছ, যে অঞ্চলই অতিক্রম করেছ, তারাও তোমাদের সঙ্গে ছিল। উপযুক্ত কারণবশত তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, তারা মদিনায় থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিল? নবিজি উত্তর দেন, হ্যাঁ, তারা মদিনায় থেকেও তোমাদের সঙ্গে ছিল।

আরববিশ্বে মুসলিমদের নবজাগরণ

আরব ভূখণ্ডে মুসলিমদের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধিতে এ যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, আরবে ইসলামি শক্তি ব্যতীত আর কোনো শক্তিই টিকে থাকতে পারবে না। সুযোগসন্ধানী মুনাফিক ও পৌত্তলিকরা অনবরত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার যে অলীক স্বপ্নে বিভোর ছিল, তা আর কখনোই বাস্তবতার মুখ দেখবে না। কারণ রোমানরাই ছিল তাদের শেষ ভরসা। কিন্তু এই যুদ্ধ তাদের সেই আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে দেয়। ফলে তারা বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাদের বুঝতে বাকি থাকে না, এই পরম বাস্তবতা উপেক্ষা করার সুযোগ বা শক্তি কোনোটিই তাদের নেই।

এমন পরিস্থিতিতে মুনাফিকদের সঙ্গে মুসলিমদের নমনীয় আচরণ করার কোনো মানে হয় না। তাই আল্লাহ তাদেরকে মুনাফিকদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। সেইসাথে এটাও বলে দেন যে, এখন থেকে তাদের সাদাকা গ্রহণ করা যাবে না, তাদের জানাযায় অংশ নেওয়া যাবে না, তাদের জন্য ইস্তিগফার করা যাবে না এবং তাদের কবরও যিয়ারত করা যাবে না। তাছাড়া যুদ্ধের আগে তারা ষড়যন্ত্রের আখড়া হিসেবে যে মসজিদ গড়ে তুলেছিল, সেটিও গুঁড়িয়ে দিতে বলা হয়। একাধিক আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তাআলা তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন। সবার সামনে প্রকাশিত হয়ে যায় তাদের পরিচয়। তাদেরকে চিনতে বাকি থাকে না আর কারও।

এছাড়াও মক্কাবিজয়ের পর বিভিন্ন স্থান থেকে মদিনায় প্রতিনিধি দল আগমনের যে ধারা শুরু হয়েছিল, এ যুদ্ধের পরে সেটা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়।[১]

কুরআনের পাতায় তাবুকের বিবরণ

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সুরা তাওবার অনেকগুলো আয়াত অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে কিছু আয়াত অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে, কিছু আয়াত বের হওয়ার পরে সফররত অবস্থায়, আর

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫১৫-৫৩৭; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২-১৩; *সহিহুল বুখারি* : ৪৪১৫-৪৪১৯, ২৪৬৮; *সহিহ মুসলিম* : ৭০৬, ১৩৯২; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১১০-১২৬; *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ৩৯১-৪০৭

কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয় অভিযান শেষে মদিনায় ফিরে আসার পর। এসব আয়াতে যুদ্ধের বিভিন্ন পরিস্থিতির বিবরণ, মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন, নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের প্রশংসা, সত্যবাদী মুমিনদের তাওবা গ্রহণ, যারা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন কিংবা যারা নেননি—সবার আলোচনাই কমবেশি স্থান পেয়েছে।

আলোচিত কিছু ঘটনা

» নবিজি তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর উওয়াইমির আল-আজলানি ও তার স্ত্রীর মাঝে 'লিআন'[১] সংঘটিত হয়।

» গামিদি গোত্রের এক নারী যিনায় লিপ্ত হয়। এরপর নবিজির কাছে এসে সব স্বীকার করে। নবিজি তাকে সন্তান প্রসবের পরে আসতে বলেন। সন্তান প্রসবের পর দুধ ছাড়ানো হলে, তাকে যথারীতি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

» আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশি মৃত্যুবরণ করেন। তার প্রকৃত নাম আসহামা। তিনি মুসলিম ছিলেন; ছিলেন ইসলামের অন্যতম সহযোগীও। এজন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

» এ বছর নবিজির তৃতীয় কন্যা আদরের দুলালি উম্মু কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন। নবিজি এতে ভীষণ ব্যথিত হন। তার জামাতা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, যদি আমার আরও একটি কন্যা থাকত, তবে আমি তাকেও তোমার হাতে সঁপে দিতাম।

» নবিজি তাবুক থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুল মারা যায়। নবিজি তার জন্য ইস্তিগফার করেন। উমারের বাধা সত্ত্বেও নবিজি তার জানাযা আদায় করেন। অবশেষে উমারের অবস্থানের পক্ষে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুনাফিকদের জন্য ইস্তিগফার ও তাদের জানাযা আদায় চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়।

আবু বকরের নেতৃত্বে হজ পালন

নবম হিজরির জিলকদ অথবা জিলহজ মাসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[১] লিআনের আভিধানিক অর্থ—একে অপরকে অভিসম্পাত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নৈতিক স্খলনের অভিযোগ দায়ের করা এবং স্ত্রী কর্তৃক সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা। এরপর উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ ও অভিসম্পাত করার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ চূড়ান্ত করা। এভাবে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিধানকে 'লিআন' বলে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সমকালীন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত *বিষয়ভিত্তিক বিশুদ্ধ হাদিস সংকলন* বইটি পড়ুন।

আবু বকরকে হজের আমির নিযুক্ত করে মক্কায় পাঠান। এরই মধ্যে সুরা তাওবার শুরুর দিকের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এতে অমুসলিমদের সঙ্গো কৃত সকল প্রতিশ্রুতি ইনসাফের ভিত্তিতে সমাপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নবিজি সে-নির্দেশনা সংশ্লিন্ট ব্যক্তিবর্গকে জানাতে আলিকে পাঠান। যেকোনো প্রতিশ্রুতির মেয়াদকাল শেষ করার এটাই ছিল আরবীয় রীতি।

নির্দেশনা নিয়ে আলি সঙ্গো সঙ্গো বেরিয়ে পড়েন। 'আরয' অথবা 'যাজনান' নামক স্থানে গিয়ে আবু বকরের সঙ্গো মিলিত হন তিনি। আবু বকর তখন হজের উদ্দেশ্যে পথ চলছিলেন। তিনি আলিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি দায়িত্বশীল হিসেবে এসেছেন নাকি অনুগত হিসেবে? আলি বলেন, অনুগত হিসেবে। এরপর তারা সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন।

আবু বকর সবাইকে নিয়ে হজ সম্পন্ন করেন। ১০ই জিলহজ অর্থাৎ কুরবানির দিন আলি জামরার নিকটে দাঁড়িয়ে নবিজির নির্দেশনা ঘোষণা করেন। অঙ্গীকারবন্ধ সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অঙ্গীকার মুলতবি ঘোষণা করা হয়। সবাইকে সময় দেওয়া হয় ৪ মাস। যাদের সঙ্গো কোনো অঙ্গীকার ছিল না, তাদেরকেও এ সময় দেওয়া হয়। তবে যারা মুসলিমদের সঙ্গো কৃত অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেনি এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের অঙ্গীকার বহাল থাকে।

আবু বকর তখন প্রতিটি অলিতে-গলিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দেন, এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোনো বিবস্ত্র ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।

এটি ছিল মূলত আরব ভূখণ্ড থেকে পৌত্তলিকতা ও মূর্তিপূজার অবসানের ঘোষণা—যার অর্থ এই বছরের পর এখানে আর কখনো পৌত্তলিকতার চর্চা হবে না।[১]

যুদ্ধ-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আমরা যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সশস্ত্র অভিযান, সামরিক বাহিনী ও প্রতিনিধিদল প্রেরণ, রণকৌশল, সেনাবিন্যাস এবং এর প্রভাব ও ফলাফল বিচার করি, তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারি—নবিজি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরবিদ। সবচেয়ে সজাগ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক সেনাপতি। নবুয়ত ও রিসালাতের ক্ষেত্রে তিনি যেমন সবার সেরা ছিলেন, একইভাবে যুদ্ধ পরিচালনাতেও অনন্য ও অতুলনীয়। তার প্রতিটি যুদ্ধই পরিচালিত হয়েছিল যথাসময়ে ও যথাস্থানে। প্রতিটি যুদ্ধেই তার সমর-কুশলতা, দক্ষতা

---

[১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২০, ৪৫১; খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬২৬, ৬৭১; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৪৩-৫৪৬

ও সাহসিকতা ছিল অনন্য। যতগুলো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, কোনোটিতেই প্রজ্ঞাহীনতা, সৈন্যবিন্যাসগত ত্রুটি কিংবা স্থান নির্ধারণগত বিচ্যুতির কারণে পরাজয়ের মুখোমুখি হননি। বরং এসব ক্ষেত্রে তিনি এমন বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, পৃথিবী যার নজির দেখেনি।

উহুদ ও হুনাইন যুদ্ধে যা ঘটেছিল, তার সবই ছিল সৈন্যদের দুর্বলতা এবং তার নির্দেশ অমান্য করার ফলাফল। কিন্তু সেই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও নবিজি যে বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোনো দৃষ্টান্ত নেই। উহুদের যুদ্ধে অবিচল থেকে যেভাবে শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, হুনাইনের যুদ্ধে স্থান পরিবর্তন করে পালটা আঘাত হেনে যেভাবে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন, তা ছিল চরম অবিশ্বাস্য। সাধারণত এমন কঠিন সময়ে সেনাপতিদের বোধশক্তি লোপ পায়। এমন চাপের মুখে পড়লে আত্মরক্ষার চিন্তা ব্যতীত কিছুই তাদের মাথায় আসে না।

এ তো ছিল যুদ্ধের সামরিক দিক। এর বাইরে আমরা যদি অন্যান্য দিকও বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব—এসব যুদ্ধের মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেছেন, ফিতনার অনল নির্বাপিত করেছেন, ইসলাম ও পৌত্তলিকতার মধ্যকার চলমান সংঘাতে শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছেন, তাদের সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করেছেন এবং ইসলামের দাওয়াতের পথ করেছেন মসৃণ ও সুগম। তাছাড়া এসব যুদ্ধের মাধ্যমেই তিনি প্রকৃত সাহাবিদের মাঝে লুকিয়ে থাকা ছদ্মবেশী মুনাফিকদের চিহ্নিত করেছেন, যারা তলে তলে খিয়ানত ও গাদ্দারির ফন্দি আঁটছিল।

নবিজি এমন এক সামরিক বাহিনী গঠন করে যান, যারা পরবর্তী সময়ে ইরাক ও শামে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে পারসিক ও রোমানদের মুখোমুখি হন। তাদেরকে পর্যুদস্ত করেন। ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ, বাগবাগিচা থেকে উচ্ছেদ করে নির্বাসনে পাঠান তাদের। অপরদিকে মুসলিমদের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান, খেতখামার ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। অসংখ্য উদ্বাস্তুর গৃহায়ন করেন। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও রসদ মজুত করেন। অসহায়দের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। এসব করতে গিয়ে কেউ যেন তার জুলুমের শিকার না হয়, সেদিকেও ছিল তার সজাগ দৃষ্টি।

জাহিলি যুগে যেসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধ হতো, সেগুলো তিনি আমূল বদলে ফেলেন। একসময় যুদ্ধ মানেই ছিল লুটপাট, ছিনতাই, রাহাজানি, অন্যায় হত্যা, জুলুম, শোষণ, শত্রুতা, প্রতিশোধ, সম্পদ হরণ, দুর্বলকে ঘায়েল করা, জনপদ বিরান করা, বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া, নারীদের লুণ্ঠন, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি নিষ্ঠুরতা, ফল-ফসলাদি বিনষ্ট করা, পশুপাল হত্যা করা—এক কথায় সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো। তিনি যুদ্ধের এই অসদুদ্দেশ্য উপড়ে ফেলে যুদ্ধকে ব্যবহার করেন অবকাঠামো নির্মাণ, উপযুক্ত উপায়-উপকরণ সরবরাহ এবং শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার কাজে। যুদ্ধ তখন আর শুধু

যুদ্ধ থাকে না; হয়ে ওঠে সুমহান জিহাদ—যার মাধ্যমে মানবতার জয় নিশ্চিত হয়, যাবতীয় অন্যায় ও লুণ্ঠন থেকে মানবজাতিকে সুরক্ষা দেওয়া যায়, এমন সমাজব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যায়, যেখানে সবল দুর্বলকে শোষণ করে এবং সম্পদশালী কেড়ে নেয় অসহায়ের পুঁজি।

মোটকথা, একসময়ের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ তার হাতে হয়ে ওঠে সাম্য, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জিহাদ—যার মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য বিদূরিত হয়, দুর্বলেরা সবলের কাছ থেকে তাদের অধিকার বুঝে পায় এবং অক্ষম পুরুষ ও দুর্বল নারী-শিশুরা পায় বাঁচার অধিকার। একসময় যারা ফরিয়াদ করে তাদের রবের কাছে বলত, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের এ জালিম অধ্যুষিত জনপদ থেকে উদ্ধার করুন। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। সেইসাথে নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারীও।'[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু জিহাদের বিধান প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর অবকাঠামো ও নিয়মনীতিও নির্ধারণ করেন। মুসলিম সেনা ও সেনাপতিদের জন্য সে নিয়মের পূর্ণ অনুসরণ বাধ্যতামূলক করেন। কারও জন্যই তিনি আইনের বাইরে কিছু করার সুযোগ রাখেননি। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সবসময় সহজতার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, 'সহজ করো, কঠোরতা আরোপ কোরো না। স্বস্তির বার্তা দাও, ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ো না।'[২]

তিনি যখন ছোটবড় কোনো সেনাদলের জন্য আমির নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহভীতির উপদেশ দিতেন। তার সহযোদ্ধাদের দেখেশুনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিদায়ের সময় বলতেন, 'যুদ্ধ করবে কেবলই আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। গনিমতের সম্পদে খিয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের অঙ্গ-বিকৃতি করবে না এবং শিশুদের হত্যা করবে না।'[৩]

তিনি নিজে যখন রাতের বেলা কোনো শত্রুসম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছতেন, তখন সকাল হওয়া পর্যন্ত তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তিনি। শিশু ও নারী হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল তার প্রণীত নতুন আইনে। এছাড়াও তিনি ছিনতাই করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, ছিনতাইকৃত পণ্য মৃত পশুর মতোই অপবিত্র ও হারাম।

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৭৫

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬১৩৫

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ৪৪১৪, ৪৪২০

খেতখামার, ফল-ফসলাদি ধ্বংস করতেও বারণ করেছেন তিনি। অবশ্য এর পেছনে উপযুক্ত কারণ থাকলে এবং নিরুপায় হলে ভিন্ন কথা।

মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ঘোষণা করেন, আহত বিদ্রোহীর সেবা করবে না, পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তির পিছু নেবে না, কয়েদিকে হত্যা করবে না। কখনো কোনো দূতকে হত্যা করবে না। জিম্মি ও অমুসলিম নাগরিকদের অন্যায়ভাবে হত্যার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা ছিল তার। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবন্ধ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুবাস ৪০ বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।'

উল্লিখিত এসব আইন এবং এগুলোর সম্পূরক অন্য অনেক আইনের ফলে জাহিলিয়াতের অনাচারপূর্ণ যুদ্ধ পরিণত হয় পবিত্র জিহাদে।[১]

দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে

মক্কাবিজয়ের অভিযান ছিল এক যুগান্তকারী অভিযান। এই অভিযানের মাধ্যমেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আরবদের সামনে সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেইসাথে বিদূরিত হয় তাদের মনের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়। ফলে তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে।

আমর ইবনু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একটি ব্যস্ত রাস্তার পাশে বসবাস করতাম। সেখানে একটি ঝরনা ছিল। ফলে পথচারীদের আনাগোনা লেগেই থাকত। আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতাম, মক্কার লোকেরা কেমন আছে? মুহাম্মাদ নামের লোকটারই-বা কী অবস্থা? তারা বলত, মুহাম্মাদ দাবি করছে, আল্লাহ তাকে রাসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তার প্রতি ওহি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করে বলত, আল্লাহ নাকি এ রকম ওহি নাযিল করেছেন তার ওপর।

আমর ইবনু সালামা বলেন, তাদের মুখ থেকে শুনে ওহির বাণীগুলো আমি মুখস্থ করে নিতাম। সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকত। সমগ্র আরবই যেন তখন ইসলামগ্রহণের জন্য মুখিয়ে ছিল। তারা অপেক্ষা করছিল মক্কাবিজয়ের। তাদের কথা ছিল, মুহাম্মাদকে আগে তার নিজ গোত্রের লোকেদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে দাও। তিনি যদি তাদের ওপর জয়ী হন, তবে তিনি সত্য নবি। এরপর মক্কাবিজয়ের ঘটনা ঘটে। এবার সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। কে কার আগে ইসলাম গ্রহণ করবে।

আমার সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ত্বরাপ্রবণতা লক্ষ করা যায়। মক্কাবিজয়ের পরপরই

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৪-৬৮; *আল-জিহাদু ফিল ইসলাম*, আবুল আলা মওদুদি, পৃষ্ঠা : ২১৬-২৬২

আমার বাবা নবিজির কাছে ছুটে যান। ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি সত্য নবির কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন—অমুক অমুক সময়ে তোমরা অমুক অমুক সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় হলে তোমাদের একজন আজান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন অধিক জানে, সে সালাতের ইমামতি করবে।

এ হাদিস থেকে খুব সহজেই অনুমান করা যায়, মক্কাবিজয়ের ঘটনা আরবের পরিবেশ পরিবর্তনে, ইসলামকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে, আরবদের ভূমিকা নির্ধারণে এবং ইসলামের প্রতি তাদেরকে নিবেদিতপ্রাণ করে তোলার পেছনে ঠিক কতটা ভূমিকা রেখেছিল। তাবুকের যুদ্ধের পর অবস্থার আরও উন্নতি হয়। ফলে আমরা দেখতে পাই, হিজরতের নবম ও দশম বছরে মদিনায় বহু প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। ফলে মক্কাবিজয়ের সময় যেখানে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০ হাজার, ১ বছরের ব্যবধানে তাবুক যুদ্ধের সময় সে সংখ্যা পৌঁছায় ৩০ হাজারে। বিদায় হজের সময় দেখা যায়, সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৪ হাজার মতান্তরে ১ লক্ষ ৪৪ হাজারে।

বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন

ঐতিহাসিকগণ মক্কাবিজয়ের আগে ও পরে যেসব প্রতিনিধিদল আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের সংখ্যা সত্তরেরও বেশি। সবগুলোর ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা এখানে সম্ভব নয়। তাছাড়া এগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা করায় বিশেষ উপকারিতাও নেই। কাজেই আমরা কেবল সংক্ষিপ্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তুলে ধরব। তার আগে পাঠকের মনে রাখতে হবে, প্রতিনিধিদলের আগমনধারা যদিও পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হয়েছে মক্কাবিজয়ের পরে, তাছাড়া এর আগেও অনেকগুলো প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটেছে, সেসবের বিবরণ তুলে ধরা হলো—

আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদল

এই গোত্র থেকে সর্বমোট দুটি প্রতিনিধিদল এসেছিল। প্রথমটি পঞ্চম হিজরি কিংবা তারও আগে। এদের একজনের নাম মুনকিয ইবনু হাইয়ান। তিনি ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে মদিনায় যাতায়াত করতেন। নবিজির মদিনায় আগমনের পর তিনি যখন ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে সেখানে আসেন, তখনই প্রথম ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন। ইসলাম ধর্ম তার খুব ভালো লাগে। নবিজির প্রথম সাক্ষাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নবিজির পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে নিজ গোত্রে ফিরে যান।

ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর ১৩-১৪ জনের একটি দল নবিজির নিকট আগমন করে। সেবার তারা রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম ও পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এই দলের প্রধান ছিলেন আল-আশাজ আল-আসরি। নবিজি তার সম্পর্কে বলেছিলেন, তোমার মাঝে এমন দুটি গুণ রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ ভালোবাসেন। একটি হলো ধৈর্য, অপরটি ধীরস্থিরতা।

তাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল আগমন করে নবম হিজরিতে। এ দলের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন। তাদের মধ্যে একজনের নাম জারুদ ইবনুল আলা আল-আবদি। তিনি প্রথমে খ্রিষ্টান ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিমে পরিণত হন।[১]

দাউস গোত্রের প্রতিনিধিদল

সপ্তম হিজরির প্রারম্ভে এ প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। নবিজি তখন খাইবারে অবস্থান করছিলেন। এর আগে আমরা তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাউসির ইসলামগ্রহণ সম্পর্কিত হাদিস উল্লেখ করেছি। নবিজি মক্কায় থাকাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি। একপর্যায়ে তিনি নিরাশ হয়ে নবিজির কাছে ফিরে আসেন এবং নিজ গোত্রের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে বলেন।

নবিজি তখন এই বলে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, আপনি দাউস গোত্রকে হিদায়াত দিন।' পরে এই গোত্রের সবাই ইসলাম কবুল করে নেয়। তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ৭০-৮০টি পরিবারের লোকজনকে নিয়ে সপ্তম হিজরির শুরুতে মদিনায় চলে আসেন। নবিজি তখন খাইবারে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে নবিজির সঙ্গে মিলিত হন।

ফারওয়া ইবনু আমর আল-জুযামির দূত

ফারওয়া ছিলেন রোমান সৈন্যদের একজন আরব কমান্ডার। রোমসম্রাটের পক্ষ থেকে তিনি শামের মাআন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। অষ্টম হিজরিতে সংঘটিত মুতার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে তিনি সত্য উপলব্ধি করেন। এর পরপরই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে ইসলামগ্রহণের সংবাদ জানিয়ে নবিজির কাছে দূত পাঠান। সাথে হাদিয়াস্বরূপ দেন একটি সাদা খচ্চর।

এদিকে রোমানরা তার ইসলামগ্রহণের সংবাদ শুনে তাকে বন্দি করে। এরপর ইসলাম ত্যাগ অথবা মৃত্যু—দুটোর কোনো একটি বেছে নিতে বলে। তিনি ইসলাম ত্যাগের পরিবর্তে শহিদি মৃত্যুকে বেছে নেন। জালিমরা তাকে ফিলিস্তিনের আফরা নামক

---

[১] *শারহু সহিহ মুসলিম*, ইমাম নববি : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৫-৮৬

একটি জলাশয়ের কাছে নিয়ে শূলীতে চড়ায় এবং শহিদ করে দেয়। রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

সুদা গোত্রের প্রতিনিধিদল

অষ্টম হিজরিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিরানা থেকে ফিরে আসার পর এই প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। এর প্রেক্ষাপট ছিল, নবিজি ৪০০ জনের একটি সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন ইয়েমেনের সুদা ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলোতে অভিযানের উদ্দেশ্যে। সেনাদলটি কানাত নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু খাটালে, যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সদায়ির কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নবিজির কাছে ছুটে আসেন। তাকে অনুনয় করে বলেন, আমি আমার গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। দয়া করে আপনি সৈন্যদের ফিরিয়ে আনুন। আমি আমার গোত্রকে বোঝানোর জিম্মাদারি নিচ্ছি।

নবিজি তখন সৈন্যদের ফিরিয়ে আনেন। যিয়াদ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের কয়েকজনকে নবিজির কাছে আসতে অনুরোধ করেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সুদা গোত্রের ১৫ জন লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করে। গোত্রের অন্যান্য লোকেরাও তাদের দাওয়াত কবুল করে নেয়। বিদায় হজের দিন তাদের গোত্রের প্রায় ১০০ জন লোক উপস্থিত ছিল।

কাব ইবনু যুহাইর ইবনি আবি সালামার আগমন

কাব ছিলেন আরবের বিখ্যাত কবিদের একজন। বংশগতভাবে কাব্যরচনা তার রক্তে মিশে আছে। একসময় তিনি নবিজির নামে কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতেন। তায়েফ যুদ্ধের পর তার ভাই বুজাইর ইবনু যুহাইর তার কাছে পত্র লেখেন—'আল্লাহর রাসুল মক্কায় তার দুর্নামকারীদের হত্যা করেছেন। যে কয়জন প্রাণে বেঁচে আছে, তারাও বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে গেছে। তুমি যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে দ্রুত নবিজির সাথে সাক্ষাৎ করো। কেননা তিনি তাওবা করে ফিরে আসা লোকদের হত্যা করেন না। আর যদি এমনটা না করো, তবে কোথাও পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাও।'

দুই ভাইয়ের মধ্যে এ বিষয়ে একাধিক পত্র বিনিময় হয়। কাব আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা আঁচ করতে পারেন এবং মদিনায় এসে জুহাইনা গোত্রের এক লোকের মেহমান হন। সকালে তাকে সঙ্গে করে নবিজির সাথে ফজরের সালাতে শরিক হন। সালাত শেষে জুহাইনা গোত্রের লোকটি তাকে ইশারা করলে, তিনি নবিজির কাছে গিয়ে হাতে হাত রেখে বসেন। নবিজি তাকে আগে কখনো দেখেননি। তাই নাম শুনে থাকলেও চেহারাটা তার কাছে অপরিচিতই। কাব এই অপরিচিতির সুযোগ নিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল,

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫; *তাফহিমুল কুরআন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৯

এখন যদি কাব ইবনু যুহাইর আপনার নিকট এসে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং জীবনের নিরাপত্তা চায়, আপনি কি তা মেনে নেবেন? নবিজি বলেন, অবশ্যই। তখন কাব বলেন, আমিই কাব ইবনু যুহাইর। এ কথা শোনামাত্র একজন আনসারি সাহাবি তাকে জাপটে ধরে এবং নবিজির কাছে তাকে হত্যার অনুমতি চায়। নবিজি বলেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে তার কৃতকর্মের জন্য তাওবা করেছে, অনুতপ্ত হয়েছে।

এ সময় কাব তার কৃতকর্ম ও নবিজির প্রশংসা তুলে ধরে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

মুছে গেছে সুআদের পদছাপ, আকুলিবিকুলি মন!
তার প্রেমে আজও অস্থির আমি, নেই কি মুক্তিপণ!
এরই মাঝে শুনি রসুল দিলেন শাস্তির ফরমান।
শাস্তি কেন! ক্ষমা চাই আমি—জানি তো নবির শান!
নবির মুখে নসিহার বাণী, কতই চমৎকার!
আপনার কাছে কুরআন আছে পূর্ণ ওজনদার—
আপনি যেন সঠিক পথটি পান!
মারিনি, ধরিনি—কী দোষ করেছি আমি!
আপনি রাসুল ফিরিয়ে রাখুন কান।
আমায় নিয়ে হচ্ছে বাজার মাত!
আমার বদল হস্তী হলে পরে—
ভয়ের দেনায় সেও হত বরবাদ।
আমি আর নেই আমি! ছুঁয়েছি নবির হাত—
আমার ওপর আসবে জানি মুক্তির সংবাদ!
যদিও সে হাত ধরতে পারে পাকড়ে আমার গলা—
সঁপে দিলাম জেনেবুঝে, জবান আমার খোলা!
'পায়ের নিচের জমিন গেছে দেবে!' হচ্ছে বলাবলি।
আমার নাকি দণ্ড হবে ভারি—এও শুনেছি আমি!
ভেবেছি আমি আপনি বুঝি সিংহের চোখ পেয়ে—
'আছার' পাহাড়ে লুকিয়ে আছেন আমার পথটি চেয়ে।
ভেবেছি আমার ধ্বংস বুঝি-বা মাথার ওপর ঝুলে।
এখন রয়েছি আপনার কোলে! ছিলাম কেমন ভুলে!

এও জেনেছি, রাসুল রবের আলোময় বাতিঘর
আল্লাহ-পাকের সেপাই তিনি, খাপখোলা খঞ্জর!

এরপর কুরাইশি মুহাজিরদের প্রশংসায় কবিতা পাঠ করে শোনান। কারণ তিনি এখানে আসার পর তাদের কেউ তার ব্যাপারে কটু মন্তব্য করেননি। মাঝে একজন আনসারি সাহাবি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়ায় তাদেরকে খোঁচা দিয়ে এক লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন যার অর্থ—

কুরাইশ চলে সাজানো উটের মতো, বাঁচায় তাদের শানিত তরবারি
জান বাঁচাতে পালায় তখন বেঁটেখাটো লোক, কুৎসিত ও আনাড়ি।

ইসলামগ্রহণের পর অবশ্য তিনি আনসারদের প্রশংসায়ও কবিতা রচনা করেন এবং নিজেই তার পূর্বের কবিতার জবাব দেন—

সম্মানজনক জীবন যেজন চায়
সে যেন থাকে আনসারদের মাঝে,
তাদের আছে সৌন্দর্যের মিরাস
বংশগুণেই মানুষ সুন্দর সাজে।

আযরা গোত্রের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরির সফর মাসে এ প্রতিনিধিদল মদিনায় আগমন করে। সংখ্যায় তারা ১২ জন। তাদের মধ্যে হামযা ইবনুন নুমানও ছিলেন। গোত্র পরিচয় জানতে চাওয়া হলে, তাদের মুখপাত্র জানান, আমরা বনু আযরার লোক। সম্পর্কের দিক থেকে বনু কুসাইর বৈমাত্রেয় ভাই। আমরা বনু কুসাইকে সহযোগিতা করেছি এবং খুযাআ ও বনু বকরকে মক্কা ভূমি থেকে বিতাড়িত করেছি।

নবিজি তাদের সাদরে বরণ করে নেন। শাম বিজয়ের সুসংবাদ দেন। জ্যোতিষদের দ্বারস্থ হতে এবং জাহিলি যুগের পশু বলিদান করতে নিষেধ করেন তাদের। তারা সবাই ইসলাম কবুল করে নেয় এবং কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করে নিজ গোত্রে ফিরে যায়।

বালা গোত্রের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে তারা মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামগ্রহণের পর মদিনায় ৩ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তাদের দলনেতা আবুয যবিব নবিজিকে প্রশ্ন করেন, মেহমানদারিতে কোনো সাওয়াব আছে কি? নবিজি বলেন, হ্যাঁ, আছে। ধনী কিংবা গরিব যে-কারও সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা হলে সেটা সাদাকা

হিসেবে গণ্য হবে। আবুয যবিব আবার জিজ্ঞেস করেন, মেহমানদারির সময় কত দিন? নবিজি বলেন, ৩ দিন।

এরপর আবুয যবিব হারিয়ে যাওয়া বকরির ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। নবিজি বলেন, এটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের কিংবা নেকড়ের। সর্বশেষ হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে নবিজি বলেন, হারানো উটের ব্যাপারে জেনে কী করবে? তোমার কাজ কারও উট পেলে ছেড়ে দেওয়া। সে নিজেই পৌঁছে যেতে পারবে তার মালিকের কাছে।

সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল

এই প্রতিনিধিদল নবম হিজরির রামাদান মাসে আগমন করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সবেমাত্র তাবুক অভিযান থেকে ফিরে এসেছেন। এই প্রতিনিধিদলের ইসলামগ্রহণের পটভূমি হলো—নবিজি অষ্টম হিজরির জিলকদ মাসে তায়েফ যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফেরার পথে তাদের গোত্রপ্রধান উরওয়া ইবনু মাসউদ আস-সাকাফি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন।

তার ধারণা ছিল, গোত্রের লোকজন তার কথা মেনে নেবে। কারণ তিনি তাদের মান্যবর নেতা। তারা পরিবার ও সন্তানসন্ততির চেয়েও বেশি ভালোবাসত তাকে। কিন্তু তিনি তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা বেশ মারমুখী হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে তিরবিদ্ধ করে তাকে হত্যা করা হয়।

এরপর কেটে যায় কয়েক মাস। চারপাশের লোকজন ধীরে ধীরে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে। তাদের তখন মনে হয়, তারা দিনদিন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। অপরদিকে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। মুসলিমরা এখন চাইলেই তাদেরকে পদানত করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে তারা জরুরি পরামর্শ-সভায় বসে এবং সেই সভায় তাদের পক্ষ থেকে নবিজির কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আব্দু ইয়ালিল ইবনি আমরকে পাঠানোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সে এতে অসম্মতি জানায়। তার ভয় হচ্ছিল, উরওয়া ইবনু মাসউদের সঙ্গে যা করা হয়েছিল, ফিরে আসার পর তার সঙ্গেও তেমনটাই করা হয় কি না! তাই সে বলে, আমার সঙ্গে আরও কয়েকজনকে পাঠানো হলে, আমি যেতে পারি। ফলে তারা আহলাফ গোত্রের দুজন এবং বনু মালিকের তিনজন-সহ তাকে নবিজির কাছে পাঠায়। এই ৬ জনের মধ্যে উসমান ইবনু আবিল আস ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ।

তারা মদিনায় আসার পর নবিজি মাসজিদে নববির এক পাশে তাদের অবস্থানের জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করেন, যাতে তারা সাহাবিদের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পায় এবং সালাত আদায়ের দৃশ্য দেখতে পায়। মদিনায় অবস্থানের সময়টাতে তারা নবিজির কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকে। নবিজি তাদের নিয়মিত ইসলামের দাওয়াত দিতে

থাকেন। শেষ দিকে এসে তাদের দলনেতা নবিজির নিকট অনুরোধ করে—তিনি যেন সাকিফ গোত্রের নামে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন, যাতে তাদের জন্য যিনা, মদ্যপান ও সুদি কারবারের অনুমতি থাকবে। আরও থাকবে লাত মূর্তির পূজা-অর্চনার অবকাশ, সালাত থেকে অব্যাহতি এবং মূর্তি না ভাঙার অঙ্গীকার।

নবিজি তাদের কোনো প্রস্তাবই মেনে নেননি। তারা নিজেদের মধ্যে পুনরায় পরামর্শে বসে। কিন্তু নবিজির কথা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পায় না। অবশেষে তারা এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করে যে, নিজ হাতে তারা লাত মূর্তি ভাঙবে না। নবিজি তাদের শর্ত মেনে নিয়ে তাদের উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন। উসমান ইবনু আবিল আস আস-সাকাফিকে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন। কারণ তিনি ছিলেন ইসলামি বিধিবিধান, দ্বীন ও কুরআন শেখার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশি আগ্রহী। অথচ মদিনায় অবস্থানকালে তারা প্রতিদিন সকালে নবিজির কাছে আসত, তবে উসমানকে সঙ্গো আনত না। দুপুরে সবাই বিশ্রাম নেওয়ার সময় উসমান নবিজির কাছে আসতেন, তার কাছ থেকে কুরআন-সহ দ্বীনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিতেন। কোনোদিন নবিজিকে না পেলে আবু বকরের কাছ থেকে এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতেন। উল্লেখ্য, আবু বকরের শাসনামলে ইসলাম ত্যাগের ফিতনা চলাকালে এই উসমানই সাকিফ গোত্রের জন্য রহমত হিসেবে আবির্ভূত হন। সাকিফ গোত্রের লোকজন ইসলাম ত্যাগের কথা ভাবলে তিনি তাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা সবার পরে ইসলাম গ্রহণ করেছ, এখন সবার আগে ইসলাম ত্যাগ করবে? তার এ কথা তাদের মনে দাগ কাটে। তারা ফিরে আসে ইসলাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে।

সাকিফের এই প্রতিনিধিদল ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামগ্রহণের কথা গোপন রাখে। উলটো মুসলিমদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ও সংঘাতের ভয় দেখায় তাদেরকে। কপালে রীতিমতো দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে বলে, 'মুহাম্মাদ তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছেন। সেইসাথে বলেছেন, যিনা, মদ্যপান ও সুদ ছেড়ে দিতে। অন্যথায় তিনি তোমাদের সঙ্গো যুদ্ধ করবেন।' সাকিফের লোকজন ২-৩ দিন সময় নেয় চিন্তাভাবনার জন্য। কেউ কেউ যুদ্ধের পরামর্শ দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাদের সবার অন্তরে ভয় ঢেলে দেন। ফলে নেতৃস্থানীয়রা যুদ্ধের পরামর্শে কান না দিয়ে প্রতিনিধিদের বলে, 'তোমরা আবার মুহাম্মাদের কাছে যাও। গিয়ে বলো, আমরা তার কথা মেনে নেব।' তখন প্রতিনিধিদলের লোকজন নিজেদের ইসলামগ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করেন। পাশাপাশি নবিজির সঙ্গো তাদের চুক্তির কথাও উল্লেখ করেন। অন্যরা তখনই ইসলামের ছায়াতলে এসে নিজেদের পরিতৃপ্ত করে।

এদিকে নবিজি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল লোক পাঠান তাদের লাত মূর্তি ভাঙতে। গন্তব্যে পৌঁছে মুগিরা ইবনু শুবা রাযিয়াল্লাহু আনহু লোহার একটি মুগুর হাতে নিয়ে সতীর্থদের কানে কানে বলেন, আমি সাকিফ গোত্রকে বোকা বানানোর

জন্য তোমাদের সামনে একটু মজা করব। এরপর তিনি মুগুর দিয়ে মূর্তির গায়ে সজোরে আঘাত করেন। কিন্তু তাতে মূর্তির কিছুই হয় না। উলটো তিনিই মাটিতে পড়ে যান চিত হয়ে। মুশরিকরা উল্লসিত হয়ে বলতে থাকে, আল্লাহ মুগিরাকে ধ্বংস করুন। 'লাত' দেবী তাকে মেরে ফেলেছে।

তখনই মুগিরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাদের অমঙ্গাল করুন। এটা তো মাটি আর পাথরের তৈরি একখানা মূর্তিমাত্র। এর কি কোনো ক্ষমতা আছে? আমি তো তোমাদের বোকা বানানোর জন্য এমনটা করেছি। এ কথা বলে তিনি মূর্তিঘরের দরজায় আঘাত করে সেটা গুঁড়িয়ে দেন। তারপর উঁচু দেওয়ালে উঠে দাঁড়ান। কয়েকজন সাহাবিও তাকে অনুসরণ করেন এবং সবাই মিলে মূর্তিটি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেন। এরপর মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে মূর্তির জন্য উৎসর্গ করা অলংকার ও উন্নত পোশাকসামগ্রী উদ্ধার করেন। এই দৃশ্য দেখে সাকিফের লোকজন একেবারে থ হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ এসব অলংকারসামগ্রী নিয়ে নবিজির দরবারে হাজির হন। নবিজি আল্লাহর সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করেন। এরপর সেগুলো বণ্টন করে দেন সবার মাঝে।

ইয়েমেনের রাজা-বাদশাহদের চিঠি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর হিমইয়ার অঞ্চলের বেশ কয়েকজন রাজাবাদশাহ তাকে চিঠি লেখেন। তারা হলেন যথাক্রমে আল-হারিস ইবনু আবদি কুলাল, নুআইম ইবনু আবদি কুলাল এবং রায়িন, হামদান ও মাআফিরের শাসনকর্তা আন-নুমান ইবনু কাইল। তাদের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে মালিক ইবনু মুররা আর-রাহাওয়ি আগমন করেন। সেসব চিঠিতে তারা নিজেদের ইসলামগ্রহণ এবং শিরক ও মুশরিকদের সঙ্গো সম্পর্কচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

নবিজিও তাদের উদ্দেশে ফিরতি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তাদের বিভিন্ন কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন। যারা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তারা জিযিয়া প্রদানের শর্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে বলেও উল্লেখ করেন। এরপর মুআজ ইবনু জাবালেরর নেতৃত্বে একদল লোক পাঠান তাদের কাছে।

হামাদানের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর এই প্রতিনিধিদল আগমন করে। নবিজি তাদের সকল আবেদন মঞ্জুর করে তাদের উদ্দেশে একটি চিঠি লেখেন। মালিক ইবনুন নামতকে তাদের আমির ও সেখানকার নওমুসলিমদের গভর্নর মনোনীত করা হয়। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের উদ্দেশে পাঠানো হয় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি তাদেরকে

ইসলামের দাওয়াত দেন। ৬ মাস অনবরত দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু এতেও তাদের কারও থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

নবিজি তখন আলি ইবনু আবি তালিবকে সেখানে পাঠিয়ে খালিদকে ফিরে আসতে বলেন। আলি হামাদানবাসীর সামনে নবিজির চিঠি পাঠ করে শোনান। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আলি সঙ্গে সঙ্গে এই সুসংবাদ জানিয়ে চিঠি পাঠান নবিজিকে। নবিজি চিঠিটি পড়েই আল্লাহর শুকরিয়াস্বরূপ সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর সিজদা থেকে মাথা তুলে বলতে থাকেন, হামাদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হামাদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!

বনু ফাযারা গোত্রের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর এই প্রতিনিধিদল আগমন করে। এতে ১২-১৫ জন লোক ছিল। এরা এসে তাদের ইসলামগ্রহণের কথা জানায়। সেইসাথে তাদের অঞ্চলের প্রচণ্ড খরা ও দুর্ভিক্ষের কথাও বলে তাকে।

নবিজি তখন মিম্বারে আরোহণ করে দুহাত তুলে বৃষ্টির দুআ করেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আপনার সৃষ্ট জমিন ও চতুষ্পদ প্রাণীদের বৃষ্টিজলে সিক্ত করুন। আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন। মৃতপ্রায় জমিনকে প্রাণবন্ত করে তুলুন। হে আল্লাহ, আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন—যে বৃষ্টি আমাদের জন্য উপকারী এবং আমাদের আরাধ্য, যে বৃষ্টি আমাদেরকে প্রশান্তি দেবে ও পরিতৃপ্ত করবে। দিগন্ত-বিস্তৃত মেঘের দল খুব শীঘ্রই যেন ছুটে আসে। কল্যাণকর ও উপকারী বৃষ্টি কামনা করি, ক্ষতিকর বৃষ্টি নয়। হে আল্লাহ, আপনি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আজাব, ধ্বংসাত্মক ও সর্বনাশা বৃষ্টি চাপিয়ে দেবেন না। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের বৃষ্টিতে সিক্ত করুন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।'[১]

নাজরানের প্রতিনিধিদল

মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে ১২২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর নাজরান। এই শহরে তখন ৭৩টি বসতি। দ্রুতগামী অশ্বারোহী এই শহরটি অতিক্রম করতে পুরো ১ দিন লেগে যেত। এখানে প্রায় ১ লক্ষ খ্রিস্টান যোদ্ধার বসবাস।

নবম হিজরিতে এই প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। এতে ছিল ৭০ জন সদস্য। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ২৪ জন। ৩ জন আবার সর্বজন শ্রদ্ধেয়। প্রথম জনের নাম আব্দুল

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮

মাসিহ। তার হাতেই মূল নেতৃত্ব। দ্বিতীয় জন আল-আইহাম কিংবা শুরাহবিল। তিনি রাজনীতি ও সংস্কৃতি-বিষয়ক দায়িত্বশীল। তৃতীয় ব্যক্তির নাম হারিসা ইবনু আলকামা। তিনি একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরু।

এই প্রতিনিধিদল মদিনায় এসে নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় নবিজি তাদের বেশকিছু প্রশ্ন করেন, তারাও নবিজির কাছে কিছু বিষয় জানতে চায়। এরপর নবিজি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরআন তিলাওয়াত করেও শোনান। কিন্তু ইসলামগ্রহণে তারা কোনো আগ্রহ দেখায় না। এরপর তারা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে নবিজির মতামত জানতে চায়। নবিজি ওহির আশায় অপেক্ষা করেন। তখন আল্লাহ নিচের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٥٩ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ۝٦٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝٦١

আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতোই। তিনি আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে বলেছিলেন, হও। অমনি সে হয়ে যায়! (এ) সত্য (সংবাদ এসেছে) আপনার রবের পক্ষ থেকে। কাজেই আপনি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার কাছে সঠিক জ্ঞান আসার পর, কেউ ঈসার ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্কে জড়াতে চাইলে বলবেন, এসো! আমরা আহ্বান করি আমাদের ও তোমাদের পুত্র ও নারীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের। এরপর সবাই বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের দিই আল্লাহর লানত![১]

পরদিন সকালে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতগুলোর আঙ্গিকে তাদেরকে ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অবহিত করেন। এরপর তাদেরকে এ ব্যাপারে চিন্তাগবেষণা করার জন্য ১ দিন সময় দেন। কিন্তু তারা কুরআনের বক্তব্য গ্রহণে এবারও অসম্মতি জানায়। নবিজি তখন তাদেরকে মুবাহালার[২]

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৫৯-৬১

[২] মুবাহালা একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ একে অপরকে অভিশাপ দেওয়া। ইসলামি পরিভাষায় মুবাহালা বলা হয়, কোনো অমীমাংসিত বিষয়ে দুটি দলের মধ্যে কে হক আর কে বাতিল তা প্রমাণ করতে পরস্পর

আহ্বান করেন। এরপর আদরের দুই নাতি হাসান ও হুসাইন-সহ একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে তিনি উপস্থিত হন। ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তাদের পেছনে।

খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল নবিজির এমন দৃঢ়তা দেখে নিভৃতে গিয়ে পরামর্শে বসে। উপস্থিত নেতৃবর্গ একে অপরকে বলে, মুবাহালায় যেয়ো না। আল্লাহর কসম, যদি তিনি নবি হয়ে থাকেন আর আমরা তার সঙ্গে মুবাহালা করি, তাহলে আমরা নিজেরাও ব্যর্থ হব, আমাদের উত্তরসূরিরাও ব্যর্থ হবে। সবাই নির্মূল হয়ে যাব। পৃথিবীতে আমাদের কোনো নামনিশানা থাকবে না।

অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয়—এ ব্যাপারে নবিজিকে সালিশ মানবে। নবিজির কাছে গিয়ে তারা বলে, আপনি যা চাইবেন, আমরা তা-ই দেব। নবিজি তখন তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ২ হাজার জোড়া কাপড় দেওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা হয়। ১ হাজার জোড়া রজব মাসে, বাকি ১ হাজার সফর মাসে। প্রতি জোড়া কাপড়ের সঙ্গে এক উকিয়া তথা ১৫২ গ্রাম রুপা দিতে হবে। এর বিনিময়ে নবিজি তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তাদের দ্বীন পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন এবং এ বিষয়ক একটি নির্দেশনা লিখে দেন তাদেরকে। তারা নবিজির কাছে আবেদন করে, তাদের কাছে যেন একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানো হয়। তখন নবিজি আমিনুল উম্মাহ খ্যাত আবু উবাইদা ইবনুল জাররা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন সেখানে।

ঘটনাক্রমে নাজরানবাসীর মধ্যে ইসলাম ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে। সিরাত-বিশেষজ্ঞগণ বলেন, তাদের প্রধান দুজন নেতা ইসলাম গ্রহণ করে। নবিজি তখন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান, তাদের কাছ থেকে যাকাত ও জিযিয়া উসুল করতে।[১]

বনু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদল

নবম হিজরিতে এরা আগমন করে। সর্বমোট ১৭ জন ছিল এই দলে। এদের মধ্যে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসাইলামা কাযযাবও ছিল।[২] মুসাইলামার পূর্ণ নাম মুসাইলামা ইবনু সুমামা ইবনি কাবির ইবনি হাবিব ইবনিল হারিস। এই প্রতিনিধিদল প্রথমে একজন আনসারি সাহাবির ঘরে অবস্থান নেয়। তারপর নবিজির কাছে ইসলাম গ্রহণ করে।

জড়ো হওয়া এবং সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় একে অন্যকে অভিশাপ দেওয়া এই মর্মে যে, তাদের মধ্যে বাতিলপন্থি দল যেন ধ্বংস হয়ে যায়। সুরা আলি-ইমরানের ৬১ নং আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯৪-৯৫; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮-৪১; নাজরানের প্রতিনিধিদলের বিবরণ নিয়ে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষকের মতে, নাজরানের প্রতিনিধিদল দুইবার পাঠানো হয়। এখানে উল্লেখিত মতটিই আমাদের দৃষ্টিতে অধিক গ্রহণযোগ্য।

[২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৭

মুসাইলামার চিন্তাচরিত্র নিয়ে নানা ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়—তার মাঝে অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও ক্ষমতার লিপ্সা ছিল। সে প্রতিনিধিদলের সবার সঙ্গো একসাথে উপস্থিত হয়নি। নবিজি তাকে অত্যন্ত শান্ত ও নমনীয় ভাষায় সংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার মাঝে এর কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা না যাওয়ায় তিনি বুঝতে পারেন, এই লোক ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে।

এদের আগমনের আগে নবিজি একদিন স্বপ্নে দেখেন, দুনিয়ার সকল ধনভান্ডার তার সামনে হাজির করা হয়েছে। সেখান থেকে দুটি স্বর্ণের কাঁকন তার হাতে এসে পড়ে। কাঁকনদুটি ওজনে ভারী হওয়ায় তিনি কিছুটা বিব্রতবোধ করছিলেন। তখন আল্লাহ তার ওপর ওহি নাযিল করেন, 'আপনি এগুলোতে ফুঁ দিন।' তিনি ফুঁ দিতেই সেগুলো উড়ে চলে যায়। এর ব্যাখ্যায় নবিজি বলেন, তার পরে দুজন লোক নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার হবে। এরপরই মুসাইলামার পক্ষ থেকে এমন দুর্বিনীত আচরণ প্রকাশ পায়।

মুসাইলামা বলে, মুহাম্মাদ যদি তারপর আমাকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি তার অনুসরণ করব। এ সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে আসেন। তার হাতে তখন খেজুর গাছের একটি ডাল ছিল। সঙ্গো ছিলেন তার মুখপাত্র সাবিত ইবনু কায়িস ইবনি শাম্মাস। তিনি সাঙ্গোপাঙ্গা পরিবেষ্টিত মুসাইলামার সামনে গিয়ে দাঁড়ান এবং তার সঙ্গো কথা বলেন। মুসাইলামা বলে, আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলে, শাসনক্ষমতার ব্যাপারে আপনাকে আমি ছাড় দিতে রাজি আছি। সেক্ষেত্রে আপনার পরে আমাকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে হবে। প্রত্যুত্তরে নবিজি বলেন, তুমি যদি আমার কাছে খেজুর গাছের এই ডালটিও চাও, আমি তোমাকে সেটাও দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ যা ফয়সালা করেছেন, তা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারবে না। যদি তুমি কিছুদিন বেঁচেও থাকো, তবু আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আর তোমার ব্যাপারে স্বপ্নে আমাকে আগেই জানানো হয়েছে। আর এই হলো আমার মুখপাত্র সাবিত, সে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এটা বলে নবিজি সেখান থেকে চলে যান।[১]

অবশেষে নবিজির আশঙ্কাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। মুসাইলামা ইয়ামামায় ফিরে গিয়ে ফন্দি আঁটতে শুরু করে। একপর্যায়ে সে দাবি করে বসে, নবুয়তের ক্ষেত্রে তাকেও মুহাম্মাদের অংশীদার বানানো হয়েছে। ফলে সে নিজেকে নবি হিসেবে দাবি করে। সে আগে থেকেই অতিমাত্রার মদ্যপায়ী। গানবাদ্যেও ছিল তার বেজায় নেশা। নবুয়ত দাবির পর সে তার এ নেশা ছড়িয়ে দেয় গোত্রের লোকদের মধ্যে। সবার জন্য সে যিনা ও মদ্যপান বৈধ বলে ঘোষণা করে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬২০; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৭-৯৩

কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে, এসব করেও সে নবিজিকে নবি বলে সাক্ষ্য দিত। এ কারণে তার গোত্রের লোকেরা ফিতনায় পড়ে যায় এবং তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে। এতে তার অবস্থান পাকাপোক্ত হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, তাকে 'ইয়ামামার আশীর্বাদ' খেতাবেও ভূষিত করা হয়। সে নবিজির কাছে চিঠি পাঠায়—নবুয়তের ক্ষেত্রে আমি আপনার অংশীদার। তাই অর্ধেক কর্তৃত্ব আমার। বাকি অর্ধেক কুরাইশের। নবিজি তার জবাবে লেখেন—

...إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আর শেষ কল্যাণ তাকওয়াবানদের জন্যই সুনির্ধারিত।[১][২]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইবনুন নাওয়াহা ও ইবনু উসাল নামে মুসাইলামার দুজন প্রতিনিধি একবার নবিজির কাছে আসে। নবিজি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এটা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? তারা উত্তরে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুসাইলামা আল্লাহর রাসুল। নবিজি বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ঈমান এনেছি। যদি দূতহত্যা অপরাধ হিসেবে গণ্য না হতো, তবে আমি তোমাদের দুজনকেই হত্যা করতাম।[৩]

মুসাইলামা নবুয়তের দাবি করে দশম হিজরিতে। দ্বাদশ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ইয়ামামার যুদ্ধে তাকে হত্যা করা হয়। তাকে হত্যা করেন ওয়াহশি রাযিয়াল্লাহু আনহু।

নবুয়তের আরেক মিথ্যা দাবিদার হচ্ছে আসওয়াদ আল-আনাসি। সে ইয়েমেনের অধিবাসী। নবিজির মৃত্যুর একদিন আগে ফাইরুয রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করেন। ওহির মাধ্যমে মদিনায় বসেই নবিজি সাহাবিদের এই সংবাদ জানিয়ে দেন। পরে ইয়েমেন থেকে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই সংবাদ এসে পৌঁছায়।[৪]

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১২৮

[২] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩১-৩২

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৭০৮, ৩৭৬১; *শারহু মাআনিল আসার* : ৫১০৯; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৩৯৮৪; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৯৩

বনু আমির ইবনু সা'সাআর প্রতিনিধিদল

এই দলে আছে আল্লাহর দুশমন আমির ইবনুত তুফাইল, সাহাবি লাবিদের বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ ইবনু কাইস এবং জাব্বার ইবনু আসলামসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। এরা প্রত্যেকেই গোত্রপ্রধান ও শয়তানি মনোভাবসম্পন্ন। এদের দলনেতা হচ্ছে সে-ই নরাধম, যে বিরে মাউনায় সাহাবিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই প্রতিনিধিদল যখন মদিনায় আসার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমির ও আরবাদ মিলে নবিজিকে গুপ্তহত্যার ফন্দি আঁটে। দলটি মদিনায় পৌঁছলে, আমির ও আরবাদ যথারীতি তাদের মিশনে নামে। আমির নবিজির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাকে আনমনা করার চেষ্টা করে। এই ফাঁকে আরবাদ নবিজির পেছনে গিয়ে তরবারি কোষমুক্ত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু তরবারি সামান্য একটু বের করতেই আল্লাহ তার হাত আটকে দেন। সে আর তরবারিটি কোষমুক্ত করতে পারে না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নবিকে রক্ষা করেন। পরে তাদের দুরভিসন্ধি জানতে পেরে নবিজি তাদের জন্য বদদুআ করেন।

তারা দুজন মদিনা থেকে ফিরে যায়। পথিমধ্যে আল্লাহ তাআলা আরবাদের ওপর একটি অগ্নিকুণ্ডলী নিক্ষেপ করেন। তার উটও তার সাথে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওদিকে ফেরার পথে আমির যায় সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে। সেখানে তার গলায় ফোড়া (এক ধরনের প্লেগ রোগ) দেখা দেয়। এ রোগেই সে ধুঁকে ধুঁকে তীব্র যন্ত্রণার সাথে মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর আগে আমির বলত, হায় কপাল! এত রোগ থাকতে শেষে কিনা আমার এই রোগটাই হলো! আর আমার মৃত্যু হবে এক সালুলি মহিলার ঘরে!

সহিহুল বুখারির বর্ণনায় এসেছে, আমির নবিজির কাছে এসে বলে, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি বেছে নিতে বলছি। **এক.** পল্লি এলাকায় আপনার কর্তৃত্ব থাকবে আর শহর এলাকায় থাকবে আমার কর্তৃত্ব। **দুই.** আমি আপনার পরে খলিফা হব। **তিন.** গাতফান গোত্রের ২ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

এরপর আমির এক মহিলার ঘরে গিয়ে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। (মৃত্যুর আগে) সে বলে, হায়! শেষে কিনা উটের মতো আমারও প্লেগ রোগ হলো! আর আমার মরণ হবে সালুল গোত্রের এক মহিলার ঘরে? এটা হতেই পারে না। কোথায় আমার ঘোড়া? নিয়ে এসো। ঘোড়া আনা হলে সে তাতে চড়ে বসে এবং ঘোড়ার পিঠেই মৃত্যুবরণ করে।[১]

তুজিব গোত্রের প্রতিনিধিদল

এরা তাদের এলাকার গরিবদের যাকাত দেওয়ার পর বাকি অংশটুকু নবিজির কাছে নিয়ে আসে। ১৩ জনের এই দল মদিনায় এসে নবিজির কাছ থেকে কুরআন ও

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪০৯১

সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ করে। এ সময় তারা কিছু বিষয় জানতে চাইলে নবিজি সেগুলো লিখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তবে তারা মদিনায় বেশিদিন অবস্থান করেনি। নবিজি কিছু উপঢৌকন দিয়ে বিদায় জানানোর সময় তাদের বাহন ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা এক যুবককে নবিজির কাছে পাঠানো হয়। যুবক এসে নবিজিকে বলে, আল্লাহর কসম, আমি কেবল আপনার দুআ নিতে এত দূর থেকে এসেছি। দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন, আমার প্রতি দয়া করেন এবং মানুষ থেকে আমার অন্তরকে রাখেন অমুখাপেক্ষী। নবিজি তার জন্য দুআ করেন।

পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়লেও এই যুবক দ্বীনের ওপর অটল থাকে। তার গোত্রের লোকদের উপদেশ দিতে থাকে। ফলে তারাও ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকে। দশম হিজরিতে বিদায় হজের সময় এই প্রতিনিধিদল নবিজির সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করে।

তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল

এ দলে আরবের বিখ্যাত বীর যাইদ আল-খাইলও ছিলেন। নবিজির সঙ্গে আলাপের পর তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবিজি তখন যাইদের ব্যাপারে বলেন, 'আরবের যত খ্যাতিমান লোকদের সম্পর্কে জেনেছি, সরাসরি সাক্ষাতের পর, প্রশংসার তুলনায় বাস্তব যোগ্যতা তাদের মধ্যে খুব কমই পেয়েছি। কিন্তু যাইদ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। খ্যাতির তুলনায় তার যোগ্যতা অনেক বেশি। এরপর নবিজি তার নাম রাখেন যাইদ আল-খাইর।'

নবম ও দশম হিজরিতে এভাবেই বিভিন্ন প্রতিনিধিদল মদিনায় আসতে থাকে। ইতিহাসবিদ ও সিরাহ রচয়িতাগণ ইয়েমেন, আল-আযদ, বনু সাদ, বনু আমির ইবনু কাইস, বনু আসাদ, বাহরা, খাওলান, মুহারিব, বনুল হারিস ইবনি কাব, গামিদ, বনুল মুনতাফিক, সালামান, বনু আবস, মুযাইনা, মুরাদ, যুবাইদ, কিন্দা, যু-মুররা, গাসসান, বনু আইশ, নাখ-সহ আরও অনেক গোত্র ও অঞ্চলের প্রতিনিধিদলের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। নাখের প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে সবার শেষে। ২০০ জনের এ প্রতিনিধিদল মদিনায় আসে একাদশ হিজরির মুহাররম মাসে।

প্রতিনিধিদলের এই আগমনধারা প্রমাণ করে, ইসলাম তৎকালীন বিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। আরব-অনারব সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায়। আরববাসী মদিনাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। একসময় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাদের আর উপায় থাকে না। মদিনা হয়ে পড়ে আরব ভূখণ্ডের রাজধানী। ফলে একে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগও আর থাকে না। তবে এ কথা বলা যায় না যে, ইসলাম এদের প্রত্যেকের অন্তরে পুরোপুরি জায়গা করে নিয়েছিল। কারণ এদের মধ্যে কঠোর মনোভাবাপন্ন অনেক আরব বেদুইন ছিল, যারা কেবল নিজেদের গোত্রপ্রধানদের

অনুকরণে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের অন্তর তখনো পাপাচার পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইসলামি শিষ্টাচার ও অনুশাসন তখনো এদের মাঝে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

কুফর ও নিফাকে বেদুইনরাই অধিক কঠোর। অবশ্য আল্লাহ তাঁর রাসুলের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকাও তাদের পক্ষেই বেশি সাজে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী; পরম প্রাজ্ঞ। আর বেদুইনদের কিছু লোক (আল্লাহর পথে) নিজেদের ব্যয়কে মনে করে জরিমানা এবং অপেক্ষায় থাকে আপনাদের বিপর্যয়ের। তাদেরই ওপর নেমে আসুক শোচনীয় বিপর্যয়। আল্লাহ সব শোনেন; সব জানেন।[১]

এদের অপর এক শ্রেণির প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন—

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

আবার কিছু বেদুইন আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এবং নিজেদের ব্যয়কে মনে করে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর রাসুলের দুআ লাভের উপায়। বাস্তবেই সেটা তাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্যলাভের উপায়। শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে আপন রহমতের অধিভুক্ত করবেন। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল; চির দয়ালু।[২]

মক্কা, মদিনা, সাকিফ গোত্র এবং ইয়েমেন ও বাহরাইনের বহুসংখ্যক লোক এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের অন্তরে ইসলাম যথাযথভাবে গেঁথে গিয়েছিল। ফলে পরবর্তী সময়ে তারা পরিণত হন চমৎকার মানুষে।[৩]

---

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৯৭-৯৮

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ৯৯

[৩] *মুহাজারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৪; *সহিহুল বুখারি*, মক্কাবিজয় পরবর্তী

দাওয়াতি কাজে কল্পনাতীত সাফল্য

নবিজীবনের সমাপ্তি-পর্বের আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা তার কর্মমুখর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব, যে কার্যক্রম তাকে সকল নবি ও রাসুলের মাঝে অনন্য ও অতুলনীয় করে তুলেছে এবং যার ফলে আল্লাহ তাকে ঘোষণা করেছেন সকল নবির শিরোমণি বলে।

নবিজিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢

হে চাদরে আবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়ান, তবে কিছু অংশ বাদে।[১]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١ قُمْ فَأَنذِرْ ۝٢

হে চাদরে আবৃত! উঠে পড়ুন, সতর্ক করুন।[২]

এই নির্দেশনার পর নবিজি ঠিকই উঠে পড়েন। ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব, মানবসভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ, তাদের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস এবং শান্তির পথে জিহাদের ভার বয়ে যান।

তিনি প্রথমে মানুষের চিন্তা ও মনোজগতে আল্লাহর প্রতি প্রেম ও জিহাদের চেতনা প্রতিস্থাপন করেন—একসময় যেখানে ছিল অন্ধকার ও জাহিলিয়াত, পার্থিব জগতের নানামাত্রিক মোহ; ছিল প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের প্রাবল্য। এরপর তিনি অবতীর্ণ হন নতুন সংগ্রামে; কঠোর সাধনায়। এসব সংগ্রাম-সাধনা ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু কাফির-মুশরিক-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ সংগ্রাম শেষ হওয়ার আগেই নতুন শত্রুর আবির্ভাব ঘটে। রোমান শক্তি মুসলিম উম্মাহর জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরবের

বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আগমন সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ : ৪৩৬৫ থেকে ৪৩৯৩ পর্যন্ত; *সিরাতু ইবনি হিশাম,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০১, ৫০৩, ৫১০-৫১৪, ৫৩৭-৫৪২, ৫৬০-৬০১; *যাদুল মাআদ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬-৬০; *ফাতহুল বারি,* খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৮৩-১০৩; *রহমাতুল-লিল আলামিন,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৮৪-২১৭

[১] সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত : ১-২

[২] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১-২

উত্তরাঞ্চলে মুসলিমদের ওপর মোক্ষম আঘাত হানতে মরিয়া হয়ে ওঠে ওরা।

ইতিহাসের নানা বাঁকে এসে অস্ত্রের যুদ্ধে নিতে হয় বিরতি। শত্রু পরাস্ত হলে অথবা নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে এই বিরাম নিতে হয়। কিন্তু চিন্তা ও প্রবৃত্তির সঙ্গে যে যুদ্ধ, সেখানে কোনো বিরাম নেই। এ যুদ্ধ অনন্তকালের। এখানে প্রতিপক্ষ হলো শয়তান। সে মানব-মনের গহীনে প্রবেশ করে প্রতিমুহূর্তে তার কুমন্ত্রণা চালিয়ে যেতে থাকে।

অপরদিকে নবিজি ছিলেন তার দাওয়াতি কার্যক্রমে, মাঠে-ময়দানে সশস্ত্র সংগ্রামে সদা অবিচল। দুনিয়ার যাবতীয় আয়েশ পায়ে ঠেলে, অভাব-অনটনকে সঙ্গী করে এই কার্যক্রম চালিয়ে যান তিনি। অথচ দুনিয়া তার চরণে এসে লুটিয়ে পড়েছিল। মুমিনরা তার চতুর্দিকে বিছিয়ে রেখেছিলেন নিরাপত্তার চাদর। আর তিনি দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নিয়ে, ধৈর্যকে সঙ্গী করে, রাত্রিজাগরণ করে, রবের ইবাদতে নিমগ্ন থেকে, দুনিয়ার তাবৎ বস্তুকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহমুখী হয়ে জীবন পার করে দিয়েছেন—ঠিক যেমন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তাকে তার রবের পক্ষ থেকে।

এই অব্যাহত যুদ্ধে তিনি ২০ বছরেরও অধিক সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে কখনো এমন হয়নি যে, তিনি একটি কাজে আত্মনিয়োগ করে অন্য কাজের কথা ভুলে গিয়েছেন। একসময় তার দাওয়াতি কাজ এত ব্যাপক সফলতা লাভ করে যে, সবার কাছে তা অবিশ্বাস্য ঠেকে। পুরো আরব ভূখণ্ড তার পদানত হয়, জাহিলিয়াতের কালো ছায়া দূর হয়ে যায়, অসুস্থ বিবেকগুলো সুস্থ হয়ে ওঠে। মূর্তিপূজা বন্ধ হয়, লোকজন নিজ হাতে মূর্তি ভাঙে, চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হতে থাকে কেবল তাওহিদের ধ্বনি। ঈমানি চেতনায় উদ্দীপ্ত মরুর বুক আজানের সুমধুর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়। পৃথিবীর দিকে দিকে কুরআনের তিলাওয়াতে মুখরিত হয়ে উঠতে থাকে। আল্লাহর বাণীর পাঠ আর তাঁর বিধান বাস্তবায়িত হয় জমিনের বুকজুড়ে।

আরবের সকল গোত্র পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একতাবদ্ধ হয়। মানুষ বান্দার দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহর দাসত্বে ফিরে আসে। মিটে যায় সবল-দুর্বল, গরিব-আমির, শাসক-শোষিত এবং জালিম-মজলুমের পরিচয়। সকল শ্রেণির সর্বস্তরের মানুষের তখন একটাই পরিচয়—আল্লাহর বান্দা; পরস্পর ভাই-ভাই। একে অন্যের প্রিয়ভাজন। তারা সবাই নবিজির এই ঘোষণাটি তাদের জীবনে শতভাগ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন—

আল্লাহ তাআলা জাহিলি যুগের সকল গর্ব-অহংকার ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে আত্মগৌরব তোমাদের থেকে অপসারণ করেছেন। এখানে অনারবের ওপর আরবের কিংবা আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। নেই কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড তাকওয়া। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি।

এভাবেই ইসলামি দাওয়াতের প্রভাবে গোটা আরবে সাম্য ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে মানবীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবজাতি দুনিয়ার বিভিন্ন সমস্যা ও আখিরাতের নানাবিধ কাজে চরম সৌভাগ্যের সন্ধান পায়। সময়ের স্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর চিরাচরিত রূপ আমূল পালটে যায়। ইতিহাসের বাঁক বদলায়। সেইসাথে পালটে যায় মানুষের ভাবনা-চিন্তা।

এ দাওয়াতের আগে পৃথিবীজুড়ে চলছিল জাহিলিয়াতের জয়জয়কার। মানুষের বিবেক তখন অন্ধপ্রায়। মনন পচে গিয়েছিল বহু আগেই। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় বিরাজ করত সবখানে। অন্যায়, অবিচার ও দাসত্বের বঞ্চনা গ্রাস করে নিয়েছিল গোটা সমাজকে। মানুষের উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচার মানবসভ্যতাকে পৌঁছে দিয়েছিল অবনতির অতলে। কুফর ও ভ্রান্তির অমানিশা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সারা পৃথিবীকে। আসমানি ধর্ম-বিশ্বাসের উপস্থিতি থাকলেও তাতে ঘটেছিল বিকৃতি। মানুষের অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়েছিল তার কল্যাণ-প্রভাব। যার কারণে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস পরিণত হয়েছিল প্রাণহীন দেহে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামের দাওয়াত মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে, মানবাত্মা মুক্তি লাভ করে যাবতীয় সংশয়, অনাচার, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, নৈরাজ্য ও নোংরামি থেকে। মানবসমাজ মুক্তি পায় জুলুম, সীমালঙ্ঘন, হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য, শ্রেণি বৈষম্য, শাসক শ্রেণির অবিচার ও জ্যোতিষদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে। পৃথিবী তখন সততা, স্বচ্ছতা, ইতিবাচকতা, নির্মাণ, আবিষ্কার এবং স্বাধীনতা ও সংস্কারের আলয়ে পরিণত হয়। বিশ্বস্ততা, ঈমান, ন্যায়নীতি ও অনুগ্রহের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয় এই জগৎ। কঠোর সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে মানবজীবনে উন্নতি, অগ্রগতি, সুবিচার ও সাম্যের ছোঁয়া লাগে। এই ক্রমাগত উন্নতির ফলে আরব ভূখণ্ড এমন বরকতময় উত্থান ও জাগরণের সাক্ষী হয়, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।[১]

[১] *মাযা খাসিরাল আলম বিন হিতাতিল মুসলিমিন*, ভূমিকা, পৃষ্ঠা : ১৪

বিদায় হজ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতি কার্যক্রম, রিসালাতের প্রচার-প্রসার, আল্লাহর একত্ববাদ ও গাইরুল্লাহকে বর্জনের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠনের কাজ সবেমাত্র সুসম্পন্ন হয়েছে। নবিজি বুঝতে পারেন, দুনিয়া থেকে তার চলে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ তাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছেন, তা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আর এজন্যই দশম হিজরিতে নবিজি মুআজ ইবনু জাবালকে ইয়েমেনের গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করে মদিনা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় বলছিলেন, মুআজ, এই বছরের পরে হয়তো তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। তুমি আমার এই মসজিদ আর কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে...। নবিজির মুখে এতটুকু কথা শুনেই মুআজ অঝোরে কাঁদতে শুরু করেন।

এই পর্যায়ে এসে আল্লাহ তাআলা চাইছিলেন, তাঁর প্রিয় নবি দীর্ঘ ২৩ বছর সাধনা করে এবং যন্ত্রণা সয়ে যে দাওয়াত দিয়েছেন, তার ফলাফল তাকে চোখের সামনে দেখাবেন। আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন তার কাছে এসে দ্বীন ও শরিয়তের জ্ঞান আহরণ করবে। সেইসাথে সবাই এটাও সাক্ষ্য দেবে—তিনি নবুয়তের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

এ লক্ষ্যেই নবিজি বরকতময় এই হজের ঘোষণা দেন। ঘোষণা শুনে বহু লোক মদিনায় এসে সমবেত হয়। সবাই নবিজির সাথে হজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। অবশেষে জিলকদ মাসের ২৬ তারিখ রোজ শনিবার নবিজি নিজের বাহন প্রস্তুত করেন। সুন্দরভাবে চুল আঁচড়ান। লুঙ্গি ও চাদর পরেন। কুরবানির পশুর গলায় বিশেষ একটি মালা পরিয়ে দেন। এরপর যুহরের সালাত শেষ করে রওনা হন মক্কার উদ্দেশে।

আসরের আগেই যুল-হুলাইফায় পৌঁছে যান। সেখানে ২ রাকাত সালাত আদায় করেন।

সকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর সাহাবিদের বলেন, গত রাতে আমার রবের পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা এসে আমাকে বলেছেন, আপনি এই বরকতময় উপত্যকায় সালাত পড়ুন এবং বলুন, উমরাতুন ফি হাজ্জাতিন (হজের সাথে উমরা)।[১]

যুহরের সালাতের আগে ইহরামের গোসল করেন। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবিজির গায়ে ও মাথায় সুগন্ধি মেখে দেন। তার দাড়ি ও অন্যান্য অঙ্গেও তখন সুগন্ধির শুভ্রতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। সুগন্ধি ধুয়ে ফেললেও তার রং থেকে যায়। এরপর লুঙ্গি ও চাদর পরেন। যুহরের সালাত কসর করে ২ রাকাত পড়েন। এরপর সালাতের স্থানে বসেই হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে তালবিয়া পাঠ করেন এবং একসাথে উমরা ও হজের জন্য ইহরাম বাঁধেন। তারপর নবিজি তার উটনী কাসওয়ার পিঠে করে সেখান থেকে রওনা করেন। পথে অনবরত তালবিয়া পড়তে থাকেন। উটনীটি 'বাইদা' উপত্যকায় পৌঁছলেও তার তালবিয়া অব্যাহত থাকে।

একসময় মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে যান। রাত্রিযাপন করেন যু-তুয়া নামক স্থানে। ফজরের সালাত পড়ে নবিজি মক্কায় চলে যান। দশম হিজরির জিলহজ মাসের ৪ তারিখ রবিবার সকালে নবিজি গোসল করেন। এ যাত্রায় মক্কায় পৌঁছতে তার ৮ দিন লেগে যায়। মাঝারি দূরত্বের সফর ছিল এটা। মক্কায় পৌঁছে তিনি সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে যান। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। সাফা-মারওয়ায় প্রদক্ষিণ করেন ৭ বার। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে ইহরাম ভেঙে হালাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিরান হজের নিয়তে কুরবানির পশু সঙ্গে আনার কারণে উমরা শেষ করেও ইহরাম বহাল রাখেন।[২] মক্কার একটি উঁচু অঞ্চল হাজুনে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি হজের তাওয়াফ ব্যতীত অন্য কোনো তাওয়াফ করেননি।

সাহাবিদের মাঝে যারা সাথে করে কুরবানির পশু আনেননি, নবিজি তাদের শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধতে বলেন। এরপর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় ৭ বার সায়ি[৩] সম্পন্ন করে ইহরাম ভেঙে হালাল হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু নবিজি ইহরাম না ভাঙার কারণে সাহাবিরা দ্বিধায় পড়ে যান। নবিজি তখন অভয় দিয়ে বলেন, আমি এ বিষয়ে এখন যা জানতে পেরেছি, তা যদি আগে জানতাম, তাহলে কুরবানির পশু সঙ্গে করে নিয়ে আসতাম না। আর আমার সঙ্গে কুরবানির পশু না থাকলে আমিও

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৫৩৪, ২৩৩৭, ৭৩৪৩

[২] একই সফরে একসঙ্গে উমরা ও হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধাকে কিরান হজ বলা হয়। এই ধরনের হজকারীদের মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা করতে হয়। এরপর ইহরাম অবস্থায় অপেক্ষা করতে হয় হজের জন্য এবং ১০ জিলহজ কুরবানি (দমে শোকর) না করা পর্যন্ত এভাবে ইহরাম অবস্থায়ই থাকতে হয়।

[৩] বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার পর সাফা-মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার নির্ধারিত পদ্ধতিতে দৌড়ানোকে সায়ি বলা হয়। [*আল-কামুসুল ফিকহিয়া আল কুয়েতিয়া*, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৫৩]

ইহরাম ভেঙে হালাল হয়ে যেতাম এবং হজের জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধতাম। তাই যারা কুরবানির পশু সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি, তারা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। নবিজি তার এ কথাটি সবাইকে মনে রাখতে ও মেনে চলতে আদেশ করেন।

এরপর জিলহজের ৮ তারিখে অর্থাৎ ইয়াওমুত তারওয়িয়ায় নবিজি মিনায় গমন করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর—সর্বমোট ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন। সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর আরাফায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, নামিরা প্রান্তরে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এরপর তার আদেশে কাসওয়া উটনীটি প্রস্তুত করা হয়। তিনি সেটায় চড়ে বাতনুল ওয়াদিতে চলে যান। এ সময় তার চারপাশে ১ লক্ষ ২৪ হাজার মতান্তরে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার লোক জমায়েত হয়। ঠিক এই সময়ে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যা বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত। সেই ভাষণের সারসংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো—

‘উপস্থিত জনতা! খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো আমার কথা। জানি না—এই বছরের পর এই জায়গায় তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে কি না।[১]

তোমাদের পরস্পরের জীবন ও সম্পদ তোমাদের ওপর হারাম, যেভাবে আজকের এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে তা হারাম। সাবধান! জাহিলি যুগের যাবতীয় অনাচার আমার পদতলে পিষ্ট। জাহিলি যুগের রক্তপণ দাবিও বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের গোত্রের যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হলো রবিআ ইবনুল হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদ গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল। এরপর হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। সবার আগে আমি আমাদের গোত্রের যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের সুদ। তার সব সুদই বাতিল।

স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কোরো। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ। আল্লাহর নামে তোমরা তাদের লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার—তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে স্থান দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এই কাজ করে, তবে তোমরা তাদের সতর্ক করতে মৃদু প্রহার করতে পারবে। আর তোমাদের জিম্মায় রয়েছে তাদের ন্যায্য ভরণপোষণ।

আমি তোমাদের কাছে এমন এক গ্রন্থ রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথহারা হবে না। সেই গ্রন্থটির নাম আল-কুরআন।[২]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০৩

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১২১৮; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩৯৮৭

শোনো হে জনতা! আমার পরে আর কোনো নবি আসবে না। কোনো উম্মতও আসবে না। সাবধান! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে। ৫ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে। রামাদান মাসে সিয়াম রাখবে। নিজেদের পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্পদের যাকাত দেবে। বাইতুল্লাহয় হজ করবে। তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করবে। তাহলেই তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১]

তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা আমার ব্যাপারে কী বলবে? উপস্থিত জনতা তখন সমস্বরে বলে ওঠে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যথাযথভাবে আমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব ঠিকভাবে আদায় করেছেন এবং কল্যাণ কামনা করেছেন আমাদের জন্য।

এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানের দিকে তর্জনী উঁচু করে বলেন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, সাক্ষী থাকুন, সাক্ষী থাকুন!’[২]

সেদিন নবিজির কথাগুলো উচ্চকণ্ঠে সবাইকে শোনাচ্ছিলেন রবিআ ইবনু উমাইয়া ইবনি খালফ।[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভাষণ সমাপ্ত করামাত্রই পবিত্র কুরআনের এই আয়াতাংশ নাযিল হয়—

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا...﴿٣﴾...

আজ তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম তোমাদের দ্বীন। সেইসাথে তোমাদের প্রতি পূর্ণ করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে।[৪]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কানে আয়াতটি পৌঁছলে, তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন। কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৬১৬; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ২২৫৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২২৫৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৭১; হাদিসটি সহিহ। *রহমাতুল লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৩

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১২১৮; *শারহু মুশকিলিল আসার* : ৪১

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০৫

[৪] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩

বলেন, পূর্ণতার পরেই ক্ষয় শুরু হয়।[১]

ভাষণ-পর্ব পুরোপুরি সমাপ্ত হওয়ার পর বিলাল আজান দেন। সালাতের সময় তিনিই ইকামত দেন। নবিজি সবাইকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন। যুহরের সালাত শেষ হলে বিলাল আবার ইকামত দেন। এবার নবিজি আসরের সালাত আদায় করেন। এই দুই সালাতের মাঝখানে আর কোনো সালাত তিনি আদায় করেননি।

এরপর নবিজি উটনীর পিঠে চড়ে আরাফার ময়দানে চলে যান। পায়ে হাঁটা লোকদের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করেন। পাশেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে জাবালে রহমত (রহমতের পাহাড়)। খানিক বাদে সূর্য হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে। নবিজি তখন উসামাকে পেছনে বসিয়ে মুযদালিফায় যান। সেখানে গিয়ে মাগরিব ও ইশার সালাত এক আজান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে আদায় করেন। এ সময় দুই সালাতের মাঝখানে অন্য কোনো সালাত পড়েননি; কোনো আমলও করেননি। সালাত শেষ করেই ঘুমিয়ে পড়েন নবিজি। ঘুম থেকে উঠে সুবহে সাদিকের ব্যাপারে নিশ্চিত হন। তারপর এক আজান ও এক ইকামতে ফজরের সালাত আদায় করেন।

এরপর কাসওয়ায় করে মাশআরুল হারামে আসেন। কিবলা অভিমুখী হয়ে সেখানে দুআ করেন। তাকবির-তাহলিল পাঠ করেন। পূর্ব দিগন্তের শুভ্র আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত ওভাবেই দাঁড়িয়ে অবস্থান করেন সেখানে।

এরপর মুযদালিফা থেকে মিনায় আসেন। তখনো সূর্যের দেখা মেলেনি। এ সময় ফজল ইবনু আব্বাসকে বাহনের পেছনে বসিয়ে তিনি মিনার বাতনু মুহাসসার নামক স্থানে আসেন। সেখানে কিছুক্ষণ পায়চারি করেন।

এরপর জামরাতুল কুবরাগামী পথ ধরে এগিয়ে যান। পথের মাথায় একটি গাছ দেখা যায়। নবিজি ওই গাছের কাছাকাছি জামরাতুল কুবরায় গিয়ে উপস্থিত হন। এটিকে জামরাতুল আকাবা ও জামরাতুল উলাও বলা হয়। তিনি এখানে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলেন। বাতনুল ওয়াদি নামক স্থান থেকে এই কঙ্করগুলো নিক্ষেপ করেন তিনি।

এরপর মিনার জবাইয়ের স্থানে যান। ৬৩টি উট তিনি নিজ হাতে জবাই করেন। এরপর আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব দেন জবাই করার। তিনি জবাই করেন ৩৭টি। অর্থাৎ সর্বমোট ১০০টি উট জবাই করা হয় সেদিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার কুরবানিতে শামিল করেন। কুরবানি শেষে তার নির্দেশে

---

[১] উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানতে দেখুন, *সহিহুল বুখারি* : ৪৫, ৪৪০৭; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৫

প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরো করে গোশত নিয়ে রান্না করা হয়। নবিজি ও আলি সেই গোশত ও তার ঝোল আহার করেন।

এরপর নবিজি বাহনে করে বাইতুল্লাহয় ফিরে আসেন। সেখানে যুহরের সালাত আদায় করেন। তারপর যমযমের দায়িত্বে থাকা বনু আব্দিল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বলেন, ও আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরেরা! পানি তোলো। আমার যদি এই ভয় না থাকত—আমাকে পানি তুলতে দেখলে লোকেরাও পানি তোলার কাজে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেবে এবং তাতে তোমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের সঙ্গে পানি তুলতাম। তখন নবিজিকে তারা এক বালতি পানি দেয়। তিনি সেখান থেকে পান করেন।[১]

জিলহজের ১০ তারিখ, অর্থাৎ কুরবানির দিন দ্বি-প্রহরে নবিজি শাহবা নামক একটি খচ্চরের পিঠে লোকদের উদ্দেশে আরও একটি ভাষণ দেন। এ সময় আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ভাষণ লোকদের পুনরাবৃত্তি করে শোনান। লোকজন দাঁড়িয়ে ও বসে সেই ভাষণ শোনে।[২]

এ ভাষণে নবিজি আগের দিনের চুম্বকাংশ তুলে ধরেন। আবু বাকরা বলেন, নবিজি কুরবানির দিন আমাদের সামনে একটি ভাষণ দেন। সেখানে তিনি বলেন—

'যেদিন আল্লাহ আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছিলেন, সেদিনের মতো আজও একই নিয়মে সময়ের আবর্তন ঘটছে। এক বছর হয় ১২ মাসে। এর মধ্যে ৪ মাস সম্মানিত। ৩ মাস ক্রমান্বয়ে আসে। সেগুলো হচ্ছে জিলকদ, জিলহজ ও মুহাররম। আর অপর মাসটি হলো রজব, যা জুমাদাল আখিরা ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস।'

এরপর তিনি প্রশ্ন করেন, এটি কোন মাস? আমরা বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। আমাদের উত্তর শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। আমাদের মনে হতে থাকে, তিনি হয়তো এ মাসের নতুন কোন নাম রাখবেন। এরপর নীরবতা ভেঙে বলেন, এটি কি জিলহজ মাস নয়? আমরা বলি, জি, এটা জিলহজ। এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন শহর? আমরা বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো বলতে পারবেন। আমাদের উত্তর শুনে এবারও তিনি চুপ করে থাকেন। আমরা যথারীতি ধারণা করি, তিনি হয়তো এ শহরের নাম পালটে নতুন কিছু রাখবেন। এমন সময় তিনি নীরবতা ভেঙে বলেন, এটি কি মক্কা শহর নয়? আমরা বলি, জি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এটি কোন দিন? আমরা বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। প্রশ্ন করে এবারও তিনি চুপ হয়ে যান। আমরা ভাবি, তিনি হয়তো এ দিনটির

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১২১৮; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৯০৫; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪১৫৩

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৯৫৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৯৬১৮; হাদিসটি সহিহ।

অন্য কোনো নামকরণ করবেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, এটি কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বলি, জি।

এরপর তিনি বলেন, তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস যেমন হারাম (পবিত্র), তেমনই তোমাদের পরস্পরের ইজ্জত ও সম্পদও তোমাদের ওপর হারাম (নিষিদ্ধ)। তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।

সাবধান! তোমরা আমার বিদায়ের পর পথভ্রষ্ট হয়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ো না। এরপর আবার জিজ্ঞেস করেন, আমি কি দাওয়াতি কাজ ঠিকভাবে করেছি? লোকজন বলে, জি, অবশ্যই। তিনি তখন বলেন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন। এরপর সবার উদ্দেশে বলেন, শোনো, এখানে যারা আসেনি, তোমরা আমার কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। কারণ অনেক সময় প্রত্যক্ষ শ্রোতাদের তুলনায় পরোক্ষ শ্রোতারা অধিক বোধসম্পন্ন ও সংরক্ষণশীল হয়ে থাকে।[১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সেদিনের ভাষণে নবিজি এ-ও বলেছিলেন—

'সাবধান! অপরাধী নিজেই তার অপরাধের জন্য দায়ী। পিতার অপরাধের দায় পুত্রের ওপর কিংবা পুত্রের অপরাধের দায় পিতার ওপর চাপিয়ে দেবে না। শোনো, শয়তান তোমাদের এ অঞ্চলে তার উপাসনা পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছে। তবে তোমরা এখন যেসব কাজ তুচ্ছ মনে করছ, অতি শীঘ্রই তোমরা সেসব ক্ষেত্রে শয়তানের অনুসরণ করবে এবং এতেই সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।'[২]

আইয়ামে তাশরিক তথা জিলহজের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দিনে নবিজি মিনায় অবস্থান করেন। সেখানে হজের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পাশাপাশি লোকদের শরিয়তের বিধানাবলি শিক্ষা দেন। আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকেন এবং মিল্লাতে ইবরাহিমের শাশ্বত সুন্নাহর প্রচার ও শিরক-কুসংস্কার নির্মূল করেন। এই দিনগুলোতে মাঝে মাঝেই তিনি ভাষণ দিয়েছেন।

সাররা বিনতু নাবহান রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইয়ামে তাশরিকের দ্বিতীয় দিন আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য তুলে ধরেন। এ সময় তিনি জানতে চান, আজ কোন দিন? আমরা বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো বলতে পারবেন। তিনি বলেন, এটা কি আইয়ামে তাশরিকের মাঝখানের দিনটি নয়?[৩]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৭৪১, ৪৪০৬

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ২১৫৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩০৫৫; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ২৬৭০; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ১৯৫৩; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ২৯৭৩; হাদিসটি সহিহ লিগাইরিহি।

তার এই দিনের ভাষণ অনেকটা ১০ তারিখের ভাষণের মতোই। তবে এই ভাষণটি সুরা নাসর নাযিলের পর মুহূর্তে অনুষ্ঠিত হয়।

জিলহজের ত্রয়োদশ দিনে নবিজি মিনা ত্যাগ করেন। বনু কিনানার খাইফ উপত্যকায় গিয়ে তাঁবু খাটান। দিনের বাকি অংশ ও রাত সেখানেই যাপন করেন। সেহেতু যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা সেখানেই আদায় করেন। রাতে কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নেন। এরপর বাইতুল্লাহয় ফিরে এসে বিদায়ি তাওয়াফ করেন। সাহাবিদেরকেও এমনটা করতে বলেন।

হজের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করে তিনি মদিনার দিকে রওনা করেন—নব উদ্যমে দ্বীনের কাজে ব্যাপৃত হতে।[১]

নবিজির পাঠানো সর্বশেষ সামরিক বাহিনী

এদিকে রোমান-সম্রাট ইসলাম ও মুসলিমদের অস্তিত্বই মেনে নিতে পারছিল না। ঠিক এজন্যই রোমান-সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত কেউ নবিজির আনুগত্য স্বীকার করলে তার জীবন হুমকির মুখে পড়ত, যেমনটা মাআনের গভর্নর ফারওয়া ইবনু আমর আল-জুযামির সঙ্গে ঘটেছিল।

রোমানদের দম্ভ ও অহংকার ধূলিসাৎ করতে নবিজি একাদশ হিজরির সফর মাসে তাদের বিরুদ্ধে বড় একটি সেনাদল প্রস্তুত করেন। উসামা ইবনু যাইদকে তাদের আমির নিয়োগ করেন। তাকে আদেশ দেন, বালাকা ও ফিলিস্তিনের দারুম অঞ্চলে অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দিয়ে মহড়া করতে। রোমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার পাশাপাশি তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাসকারী আরবদের মনে সাহস সঞ্চার করাই ছিল এ মহড়ার মূল উদ্দেশ্য। এ মহড়া সফল হলে, তাদের কেউ আর ভাবতে পারবে না, গির্জার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কেউ নেই। এ-ও মনে করবে না, ইসলাম গ্রহণ করা মানেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনা।

উসামা বয়সে কিছুটা ছোট হওয়ায় তার নেতৃত্ব মেনে নিতে ইতস্তত বোধ করেন অনেকেই। তখন নবিজি বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমরা এর আগে তার পিতা যাইদের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছ, এখন তারও সমালোচনা করছ! কিন্তু আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, তার পিতা যেমন নেতৃত্বের যোগ্য ছিল, সে-ও তেমনই সুযোগ্য।

---

[১] বিদায় হজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *সহিহুল বুখারি*, হজ অধ্যায়; *সহিহ মুসলিম*, নবিজির হজ অধ্যায়; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৩, অধ্যায় : ৮, পৃষ্ঠা : ১০৩-১১০; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০১-৬০৫; *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৬, ২১৮-২৪০

তাছাড়া সে ছিল আমার প্রিয় একজন মানুষ। তার পরে উসামাও আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব।[১]

নবিজির এ কথা শুনে সাহাবিগণ সঙ্গে সঙ্গে উসামার পাশে এসে দাঁড়ান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়। উসামা সবাইকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে গিয়ে প্রথমবারের মতো যাত্রাবিরতি করা হয়। এ সময় নবিজির অসুস্থতার উদ্বেগজনক সংবাদ আসে তাদের কাছে। তারা সেখানে বসেই আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করতে থাকেন।[২] আল্লাহর ফয়সালা ছিল, এই সেনাদলের অভিযান হবে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের সর্বপ্রথম অভিযান।[৩]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৬৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৪২৬

[২] আলি ও আব্বাস মদিনায় ছিলেন নবিজির শুশ্রূষার জন্য। পরে জুরুফ নামক স্থান থেকে উসামা ইবনু যাইদের কাছে অনুমতি নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন আবু বকর ও উমার। ইশার সালাত নবিজি আবু বকরের ইমামতিতে পড়তে আদেশ দেন। পরদিন সোমবার সকালবেলা তিনি একটু সুস্থতা বোধ করলে সাহাবিরা ভাবলেন, নবিজি সুস্থ হয়ে গেছেন। উসামাও কাফেলা রওনার ঘোষণা দিলেন। সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমন সময় উম্মু আইমান লোক মারফত খবর পাঠান, নবিজির অসুস্থতা অনেক বেড়ে গেছে। তার কিছুক্ষণ পরে মদিনার অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়ে নবিজির ইন্তেকালের হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ। সৈন্যদল মদিনায় ফিরে আসে। বুরাইদা যুদ্ধের পতাকা নবিজির দরজার সামনে পুঁতে রাখেন। পরবর্তীকালে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পর অনেকের অসম্মতি সত্ত্বেও সর্বপ্রথম উসামার সৈন্যদল পাঠানোর কাজটি করেন। [*আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৫-১৪৬; দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া, বৈরুত]

[৩] প্রাগুক্ত; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬০৬, ৫৬০

প্রিয়তমের সান্নিধ্যে

নবিজির শেষ দিনগুলি

এভাবে যখন আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পূর্ণতা পায় এবং আরব ভূখণ্ড ইসলামের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তখন নবিজির জীবনেও বেজে ওঠে বিদায়ের সুর। তার কথাবার্তা, আচরণ ও বেশ-ভঙ্গিতে এই সুরই যেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ক্রমাগত।

দশম হিজরির রামাদানে তিনি ২০ দিন ইতিকাফ করেন। অথচ অন্যান্য বছর স্বাভাবিকভাবে তিনি ইতিকাফ করতেন ১০ দিন। এবারের রামাদানে তিনি জিবরিল আলাইহিস সালামকে দুইবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করে শোনান। জিবরিলও তাকে দুইবার শোনান। অথচ অন্যান্য বছর তারা মাত্র একবার এমনটা করতেন। বিদায় হজের জনসমাবেশে বলেন, হয়তো এ বছরের পরে এই জায়গায় তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না। হজের শেষদিকে জামরাতুল আকাবার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধানগুলো শিখে রাখো। এই বছরের পরে হয়তো আর হজ করা হবে না আমার। এরই মধ্যে জিলহজের ১২ তারিখে সুরা নাসর অবতীর্ণ হয়। তখন তার কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়, এটাই তার জীবনের শেষ বছর। তখন থেকেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে নবিজির মন।

হিজরি ১১ সালের সফর মাসের শুরুতে নবিজি একদিন উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হন। শহিদদের জন্য দুআ করেন। দেখে মনে হয়, তিনি বুঝি জীবিত-মৃত সবাইকেই বিদায় জানাচ্ছেন। সেখান থেকে ফিরে মাসজিদে নববির মিম্বারে এসে দাঁড়ান। সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত হব আর তোমাদের হয়ে আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দেব। আল্লাহর কসম! এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের সকল চাবি দিয়ে দেওয়া

হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার মৃত্যুর পর তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে—এ আশঙ্কা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার ভয় হয়, পার্থিব সম্পদ লাভে তোমরা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।[১]

এরই মধ্যে একবার মধ্যরাতে তিনি মদিনার জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে যান। মৃতদের জন্য ইস্তিগফার করেন। এরপর তাদের উদ্দেশে বলেন—

'হে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে, তার চেয়ে তোমাদের অবস্থা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হোক। আঁধার রাতের মতো একের পর এক ফিতনা ধেয়ে আসছে। আগেরটার চেয়ে পরেরটা আরও মন্দ হবে। এরপর তাদের সুসংবাদ জানিয়ে বলেন, আমিও মিলিত হতে যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।'

চিরবিদায়ের কিছু আলামত

হিজরি ১১ সালের সফর মাসের ২৯ তারিখ রোজ সোমবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে একটি জানাযায় উপস্থিত হন। ফেরার পথে রাস্তায়ই তার মাথাব্যথা শুরু হয়। সাথে প্রচণ্ড জ্বর। জ্বরের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, সাহাবিরা জলপট্টির ওপর থেকেও তাপ অনুভব করছিলেন। সে অবস্থায়ও নবিজি জামাতে সালাত আদায় করেন। এ সময় ১১ দিন অসুস্থ ছিলেন তিনি। আর তার মোট অসুস্থতার সময় ১৩-১৪ দিন।

জীবনের শেষ সপ্তাহটি

নবিজির অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার পর স্ত্রীদের বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'আগামীকাল তোমাদের কার পালা? আগামীকাল আমি কার কাছে থাকব?' তার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না কারও। তাই তারা মন থেকেই বলেন, 'আপনার যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই থাকতে পারেন।' তিনি আয়িশার ঘরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ফজল ইবনু আব্বাস ও আলি তাকে দুই পাশ থেকে ধরে আয়িশার ঘরে নিয়ে যান। এ সময় তার মাথায় জলপট্টি বাঁধা ছিল। আলতো ভরে পা-দুটো কোনোরকম মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল তার। নবিজির জীবনের শেষ সপ্তাহটি আয়িশার ঘরেই কাটে।

এ সময়ে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা সুরা ফালাক, সুরা নাস এবং নবিজির শেখানো অন্যান্য দুআ পড়ে ফুঁ দিতেন আর বরকতের আশায় তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন।

বিদায়বেলার ৫ দিন আগে

নবিজির মৃত্যুর ৫ দিন আগের কথা। সেদিন ছিল বুধবার। গায়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৩৪৪, ৩৫৯৬; *সহিহ মুসলিম* : ২২৯৬

সাথে তীব্র যন্ত্রণা আর প্রচণ্ড মাথাব্যথা। এ সময় নবিজি বলেন, বিভিন্ন কূপ থেকে পানি এনে আমার গায়ে ৭ বালতি পানি ঢালো।

নবিজির নির্দেশ অনুসারে লোকেরা তাকে বাইরে এনে বসায়। তার গায়ে পানি ঢালতে শুরু করে। সারা শরীর ভালোভাবে ভিজলে তিনি বলেন, ব্যস, যথেষ্ট। গোসলের পর তিনি অনেকটা স্বস্তিবোধ করেন। তারপর মসজিদে যান। তখনো তার মাথায় পট্টি বাঁধা। সে অবস্থায়ই মিম্বারে বসে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। লোকজন তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে বসে। তিনি বলেন, ইহুদিদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ! এরা তাদের নবিদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধ্বংস করুন। এরা তাদের নবিদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে ফেলেছে।[১] তোমরা আমার কবরকে মূর্তির মতো পূজনীয় বানিয়ো না।[২]

এরপর তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেন, যদি আমি কারও পিঠে চাবুক মেরে থাকি, তবে এই হলো আমার পিঠ, সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। যদি কাউকে অপমান করে থাকি, তবে এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে, সে যেন এসে প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।

এ কথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে আসেন। যুহরের সালাত আদায় করেন। তারপর আবার ফিরে এসে মিম্বারে বসেন এবং আগের মতো সেই দেনা-পাওনা-সংক্রান্ত কথাগুলো বলেন। এ সময় এক ব্যক্তি বলে, আমি আপনার কাছে ৩ দিরহাম পাওনা আছি। নবিজি সঙ্গে সঙ্গে ফজল ইবনু আব্বাসকে বলেন, তার পাওনা পরিশোধ করে দাও।

এরপর আনসার সাহাবিদের ব্যাপারে অসিয়ত করে বলেন, আমি আনসারদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখার জন্য তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি; কারণ তারা আমার অতি আপনজন, তারা আমার আস্থাভাজন। তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে। তাদের যা প্রাপ্য, তা তারা এখনো পায়নি। তাদের নেক লোকদের নেক আমলগুলো গ্রহণ করবে; আর ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।[৩]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তবে আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। শেষমেশ তাদের অবস্থা হবে খাবারে থাকা লবণের মতো। তখন তোমাদের মধ্যে অন্যের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা যার থাকবে, সে যেন আনসারদের ভালো কাজ গ্রহণ করে। আর ভুলত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলে।[৪]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৩৭; *সহিহ মুসলিম* : ৫৩০; *মুআত্তা মালিক* : ১৭

[২] *মুআত্তা মালিক* : ৮৫; হাদিসটি সনদের দিক থেকে মুরসাল।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৭৯৯

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬২৮

এরপর বলেন, আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেছেন। এক. দুনিয়ার আরাম-আয়েশ। দুই. আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত প্রতিদান। সেই বান্দা দ্বিতীয়টি পছন্দ করেছেন। নবিজির মুখে এ কথা শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করেন। এরপর নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলেন, 'আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক।' তার কথায় আমরা বেশ অবাক হলাম। আশপাশের লোকজন বলতে লাগল, আবু বকরের আবার কী হলো! নবিজি আল্লাহর এক বান্দার সংবাদ দিয়েছেন, আর সে বলছে, আপনার প্রতি আমাদের মাতাপিতা কুরবান হোক। কীসের সাথে কী মিলাচ্ছে! পরে অবশ্য তারা বুঝতে পারে, আল্লাহর সেই বান্দা আর কেউ নন, আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবু বকর ছিলেন আমাদের ভেতর সবচেয়ে প্রাজ্ঞ একজন মানুষ! (তাই নবিজির সামান্য ইঙ্গিতেই তিনি মূল বিষয়টি বুঝে গিয়েছিলেন।)[১]

এরপর নবিজি বলেন, এই আবু বকরই তার সম্পদ ও সংস্পর্শ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে। যদি আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ পেতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তার সঙ্গে রয়েছে আমার ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এবং গভীর ভালোবাসার এক সম্পর্ক।[২] আর মসজিদে আবু বকরের দরজা ছাড়া অন্য সবার দরজা বন্ধ করে দাও।[৩]

চিরনিদ্রার ৪ দিন আগে

সেদিন বৃহস্পতিবার। নবিজির মৃত্যুর ৪ দিন আগে। তার অসুস্থতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এমন সময় নবিজি লোকদের ডেকে বলেন, তোমরা কাগজ-কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাই—যাতে তোমরা ভবিষ্যতে গোমরাহ হয়ে না যাও। ঘরে তখন অন্য অনেকের সাথে উমারও উপস্থিত ছিলেন। উমার বলেন, নবিজি এখন ভীষণ অসুস্থ, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন আছেই। সেটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এই মুহূর্তে তাকে কষ্ট দেওয়া ঠিক হবে না। এ নিয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। একদল বলছিল, এসো, আল্লাহর রাসুল তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেবেন। আরেকদল উমারের মত সমর্থন করছিল। একসময় তাদের কথাবার্তা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৬৫৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৮২

[২] খাওখাতুন (خَوْخَةٌ) অর্থ পাশাপাশি দুটি বাড়ি বা ঘরের মাঝে ছোট দরজা, যা দেখতে অনেকটা বড় জানালার মতো। সে সময় মাসজিদে নববিতে ৩টি মূল ফটক ছাড়াও কিছু সাহাবির ঘরবাড়ির সাথে মসজিদে আসা-যাওয়ার জন্য আরও কিছু ছোট ছোট দরজা কাটা ছিল। মৃত্যুর আগে নবিজি আবু বকরের দরজা ছাড়া বাকি সবার দরজা বন্ধ করার আদেশ দেন। *শারহু মাসাবিহিস সুন্নাহ*, ইবনুল মালাক, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪০২; দারুস সাকাফাতিল ইসলামিইয়া।

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯০৪; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৬০; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৬০১৯

তুমুল শোরগোলে রূপ নেয়। নবিজি তখন বলেন, সবাই এখান থেকে চলে যাও।[১]

নবিজি সেদিন তিনটি অসিয়ত করেন। **এক.** ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিতে হবে। **দুই.** যেসব জায়গায় তিনি প্রতিনিধিদল পাঠাবেন বলে মনস্থির করেছিলেন, সেসব জায়গায় প্রতিনিধি পাঠানোর ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। নবিজির তৃতীয় পরামর্শটি বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছেন। তবে সেটি হয়তো কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যদলের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, অথবা সালাত ও দাস-দাসীদের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।

এমন অসুস্থ অবস্থায়ও নবিজি সালাতের ইমামতি করে গিয়েছেন। এমনকি মৃত্যুর ৪ দিন আগে তিনি সুরা মুরসালাত তিলাওয়াতের মাধ্যমে মাগরিবের সালাত আদায় করেন।[২]

ইশার সময়ে তার অসুস্থতা খুব বেশি বেড়ে যায়। মসজিদে যাওয়ার ন্যূনতম শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট থাকে না। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসুল জানতে চেয়েছেন, লোকজন কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বলি, না, কেউ সালাত পড়েনি এখনো। সবাই আপনার অপেক্ষায় আছে। তিনি বলেন, তোমরা আমার জন্য পানি নিয়ে এসো। আমরা পানি আনলে তিনি তা দিয়ে গোসল করেন। এরপর উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর জিজ্ঞেস করেন, লোকজন কি সালাত পড়ে ফেলেছে? এভাবে ২-৩ বার একই অবস্থা হয়। উঠতে গিয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। শেষমেশ সংবাদ পাঠিয়ে আবু বকরকে ইমামতি করতে বলেন। এরপরের দিনগুলোতে আবু বকরই ইমামতি করেন।[৩] নবিজির জীবদ্দশায় তিনি মোট ১৭ ওয়াক্ত সালাত পড়িয়েছেন।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ৩-৪ বার অনুরোধ করেন, 'বাবার কাছ থেকে ইমামতির দায়িত্ব নিয়ে নিন। কারণ আপনার কিছু হয়ে গেলে লোকজন তাকে অশুভ মনে করতে পারে।' নবিজি এতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, 'তোমরা তো নবি ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী সেই রমণীদের মতো। আবু বকরকে আদেশ করো, সে যেন ইমামতি চালিয়ে যায়।'[৪]

---

[১] ইমাম বুখারি উম্মুল ফজলের সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; *সহিহুল বুখারি,* নবিজির অসুস্থতা অধ্যায় : ৭৩৬৬।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪২৯; *সহিহ মুসলিম* : ৪৬২; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৮৩২

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৮৭; *সহিহ মুসলিম* : ৪১৮

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৬৬৪; *সহিহ মুসলিম* : ৪১৮

মৃত্যুর দুয়েক দিন আগে

শনি অথবা রবিবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থবোধ করেন। তাই দুজন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সালাতের জন্য উপস্থিত হন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন ইমামতি করছিলেন। নবিজিকে দেখে তিনি পিছু হটতে যান। কিন্তু নবিজি তাকে ইশারায় বারণ করেন। এরপর সহযোগীদের বলেন, তোমরা আমাকে আবু বকরের পাশে নিয়ে বসাও। তারা তাকে আবু বকরের পাশে নিয়ে বসিয়ে দেয়। আবু বকর তখন সালাতে নবিজিকে অনুসরণ করতে থাকেন। আর নিজে মুকাব্বিরের[১] দায়িত্ব পালন করেন।[২]

চিরপ্রস্থানের ঠিক আগের দিন

মৃত্যুর মাত্র এক দিন আগে রবিবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাসদের মুক্ত করে দেন।[৩] তার কাছে থাকা ৭ দিনার সাদাকা করে দেন।[৪] নিজের যুদ্ধাস্ত্র মুসলিমদের দিয়ে দেন।[৫] রাতে আয়িশা বাতি জ্বালানোর জন্য প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল ধার করে নিয়ে আসেন।[৬] ৩০ সা গমের জন্য তার লৌহবর্মটি তখনো এক

---

[১] মুকাব্বির হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সালাতের তাকবিরগুলো ইমামের কাছ থেকে শুনে লোকদের কানে পৌঁছে দেন।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭১২

[৩] নবিজি মৃত্যুর এক দিন পূর্বে রবিবার তার সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন। এখানে নির্দিষ্টভাবে মৃত্যুর এক দিন পূর্বের কথাটি নির্ভরযোগ্য কোনো উৎসগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে সহিহ হাদিসে এসেছে, আমর ইবনুল হারিস বলেন, আল্লাহর রাসুল মৃত্যুর সময়ে তার সাদা খচ্চর, যুদ্ধাস্ত্র এবং সেই জমি—যা তিনি সাদাকা করেছিলেন, তা ছাড়া কোনো দিনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), দাস-দাসী কিংবা অন্য কোনো জিনিস রেখে যাননি। [*সহিহুল বুখারি* : ২৭৩৯] এ হাদিস থেকে মৃত্যুর পূর্বে সকল দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বুঝা যায়। তবে এতে নির্দিষ্ট দিনের কথা উল্লেখ নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

[৪] *তাবাকাতু ইবনি সাদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৭; হাদিসটি সহিহ।

[৫] নবিজি কর্তৃক নিজের যুদ্ধাস্ত্রগুলো মৃত্যুর এক দিন পূর্বে মুসলিমদের দান করে দেওয়ার বিষয়ক বর্ণনা নির্ভরযোগ্য কোনো উৎসগ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে *সহিহুল বুখারিতে* বর্ণিত আমর ইবনুল হারিসের হাদিস—যা আমরা পূর্বের একটি টীকায় উল্লেখ করেছি—থেকে বোঝা যায়, নবিজি মৃত্যুর সময়ে যুদ্ধাস্ত্রও রেখে গেছেন। এর দ্বারা এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়, মৃত্যুর এক দিন পূর্বে রবিবার সকল যুদ্ধাস্ত্র দান করে দেওয়ার বিষয়টি সহিহ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

[৬] *তাবাকাতু ইবনি সাদ,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৯; হাদিসটি সহিহ। নবিজি তার কাছে থাকা ৭ দিনার সাদাকা করে দেওয়া এবং আয়িশা বাতি জ্বালানোর জন্য প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল ধার করে নিয়ে আসার বর্ণনার বিষয়ে শাইখ আলবানি বলেন, বর্ণনাটির সূত্র ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহিহ। মুনজিরি ও হাইসামি বলেন, এটি তাবারানি *আল-মুজামুল কাবিরে* বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির সকল

ইহুদির কাছে বন্ধক রাখা ছিল।[১][২]

রাবি সিকাহ এবং তাদেরকে সহিহ হাদিসের কিতাবে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। (তাদের বর্ণনা *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিম* কিংবা কোনো একটিতে আনা হয়েছে।) [*আস-সিলসিলাতুস সাহিহাহ,* শাইখ আলবানি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা ; ৩২২; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪২; *মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ,* খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৪]

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৯১৬

[২] উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, নবিজি মৃত্যুর আগে তার পার্থিব সকল সম্পদ দান করে দিয়েছেন। আজাদ করেছেন মালিকানাধীন দাস-দাসীদের। অথচ সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তার সমুদয় সম্পদ দান করে দিতে চাইলে নবিজি তাকে সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করার অনুমতি দেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'মৃত্যুর সময় আল্লাহর রাসুলের লৌহবর্মটি এক ইহুদির কাছে ৩০ সা গমের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল।' [*মুসনাদু আহমাদ* : ৩৪০৯; হাদিসটি সহিহ]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত নবিজি বলেন, মুমিনের আত্মা (প্রথম আসমানে) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করা হয়। [*জামিউত তিরমিযি* : ১০৭৮; হাদিসটি সহিহ]

এই দুটি হাদিস বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলে! প্রশ্ন জাগে, তাহলে কেন আল্লাহর রাসুল এমনটি করেছেন?

উত্তরটি জানার পূর্বে একটি বিষয়ে অবগত হওয়া খুবই জরুরি—

ইসলামের সকল বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে নবিজি ও সাধারণ মুসলিম সমান হলেও কিছু বিষয়ে নবিজির ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মৃত্যুর সময় নবিজির রেখে যাওয়া সকল সম্পদ সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। তার ওয়ারিশগণ সেই সম্পদের অংশীদার হতে পারবে না। তার কোনো সম্পদ বণ্টন করা যাবে না।

নবিজির মৃত্যুর পরে আবু বকরের কাছে নবিকন্যা ফাতিমা, আলি ও আব্বাস নবিজির রেখে যাওয়া খাইবারের সম্পত্তির ভাগ চাইলে তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমি যে সম্পদ রেখে যাব, তা আমার ওয়ারিশগণের মাঝে বণ্টন করা যাবে না; বরং তা সাদাকা হিসেবে গণ্য করতে হবে।' [*সহিহুল বুখারি* : ৪০৩৫]

নবিজি-সহ দুনিয়ায় আগত সকল নবি-রাসুলের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। নবিজি বলেন, নিশ্চয়ই আলিমরা নবিগণের ওয়ারিশ। আর নবিগণ মিরাসস্বরূপ কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থসম্পদ) রেখে যান না। তারা বরং ওয়ারিশদের জন্য রেখে যান আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান। অতএব যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান অর্জন করল, সে (যেন মিরাসের) পূর্ণ একটি অংশ (ভাগ) গ্রহণ করল। [*সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৪১; হাদিসটি সহিহ]

নবিজি চাননি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হোক যখন তার কাছে এই তুচ্ছ দুনিয়ার কোনো সম্পদ থাকবে। তিনি বলেন, 'আমার ব্যাপারে আল্লাহ কী ভাববেন, যদি আমি এগুলো সাথে নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি!' [*আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৮৩]

কিন্তু নবিজির লৌহবর্মটি তখনো বন্ধক অবস্থায় ছিল। আর বন্ধকও তো এক ধরনের ঋণ। ঋণ পরিশোধ না করার ব্যাপারে শুরুতেই আমরা নবিজির সতর্কবাণী শুনেছি। এর উত্তরে আলিমরা বলেন, 'এই সতর্কবাণী

নবিজির জীবনের শেষ দিনটি

আনাস ইবনু মালিক বর্ণনা করেন, সোমবার সকল সাহাবি আবু বকরের ইমামতিতে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এ সময় নবিজি আয়িশার হুজরার[১] পর্দা সরিয়ে তাদের দিকে একবার তাকান। আবু বকর একটু পেছনে সরে আসেন এটা ভেবে যে, নবিজি হয়তো এখন কাতারে প্রবেশ করবেন। তাছাড়া নবিজির উপস্থিতি টের পেয়ে কাতারবন্ধ লোকজনও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তখন তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাত সম্পন্ন করতে বলেন। তারপর হুজরার ভেতর থেকে পর্দা টেনে দেন।[২]

এটাই ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ সালাত।

দ্বি-প্রহরের সময় নবিজি তার আদরের দুলালি ফাতিমাকে ডাকেন। এরপর তার কানে কানে কী যেন বলেন। এতে ফাতিমা বাচ্চাদের মতো কাঁদতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর নবিজি আবার তাকে ডাকেন। আগের মতোই কানে কানে কিছু একটা বলেন। এবার ফাতিমার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আয়িশা বলেন, আমি পরে ফাতিমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, প্রথমবার বাবা আমাকে বলেছিলেন, এই অসুস্থতায় তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেবেন। এটা শুনে আমি কাঁদতে শুরু করি। দ্বিতীয়বার তিনি বলেছিলেন, তার বিদায়ের পর পরিবারের সবার আগে আমিই তার সঙ্গে

সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয়, ঋণদাতার কাছে যার এমন কিছু বন্ধক রাখা আছে, যা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। মুমিনের আত্মা তখনই ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে, যদি সে কারও হক নষ্ট করে যায়। বন্ধককৃত জিনিস দিয়ে যদি সেই ঋণ আদায় হয়ে যায় তাহলে হাদিসের সতর্কবাণী তার জন্য আর প্রযোজ্য হবে না।' অনেকে আবার মনে করেন, 'এই হাদিসটি নবি-রাসুলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।' [*ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪২; দারুল মাআরিফা , বৈরুত]

ইন্তিকালের সময় নবিজির ৯ জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তাদের জন্য তিনি কোনো সম্পদ রেখে না গেলেও একটি বিশেষ ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তিনি অসিয়ত করে যান, 'জীবদ্দশায় আমি যেভাবে আমার স্ত্রীদের বাৎসরিক খরচ দিয়েছি, আমার মৃত্যুর পর তোমরা একইভাবে খাইবারে উৎপন্ন হওয়া ফসল থেকে তাদের খোরপোশের ব্যবস্থা করবে। আর বাকি ফসলগুলো গরিব-দুখী মানুষদের মাঝে বিলিয়ে দেবে।'

মুসলিম খলিফাগণ তার অসিয়ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। আসলে নবিজির তার প্রতিটি কাজ করেছেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা অনুসারে। তাই এমনটা ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই যে, সমস্ত সম্পদ সাদাকা করে তিনি তার স্ত্রীদের ওপর জুলুম করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদিসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মৃত্যুর আগে নবিজি আল্লাহর বিশেষ আদেশেই সমস্ত সম্পদ সাদাকা করে গিয়েছেন। তবে এই হুকুমটি উম্মতের ওপর প্রযোজ্য নয়—এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত।

[১] হুজরা অর্থ কক্ষ বা কামরা। নবিজির প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য মাসজিদে নববি সংলগ্ন আলাদা কক্ষ বা ছোট রুম ছিল। এই কক্ষগুলোকে বলা হতো হুজরা।

[২] *সহিহুল বুখারি*, নবিজির অসুস্থতা অধ্যায় : ৪৪৪৮; *সহিহ মুসলিম* : ৪১৯

জান্নাতে দেখা করতে পারব। এতে আমি স্বস্তি পাই।[১]

এ সময় নবিজি তাকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, জান্নাতে তুমিই হবে বিশ্বের সকল নারীর সর্দারনি।[২]

নবিজির শেষ সময়ের কষ্ট দেখে ফাতিমার দুচোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি মুখ ফুটে বলে ফেলেন, আহ, কী কষ্ট হচ্ছে আমার বাবার! সেই কঠিন মুহূর্তেও নবিজি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আজকের পর তোমার বাবার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।[৩]

এরপর আদরের দুই নাতি হাসান ও হুসাইনকে কাছে ডাকেন। তাদের চুমু দেন। বেশ কিছু অসিয়ত করেন তাদের ব্যাপারে। এরপর স্ত্রীদের ডেকে উপদেশ দেন।

এ সময় তার যন্ত্রণা যেন ক্রমেই বাড়তে থাকে। খাইবারের বিষমিশ্রিত সেই খাবারের বিষক্রিয়াও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্যে। তিনি আয়িশাকে ডেকে বললেন, আয়িশা, আমি এখনো সেই খাবারের বিষক্রিয়া টের পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমার মেরুদণ্ডটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে সেই বিষের কারণে।[৪]

এ সময় তিনি গোটা মানবজাতিকে অসিয়ত করে বলেন, তোমরা সালাতের প্রতি যত্নশীল হবে। দাস-দাসীদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে। এ কথাদুটো তিনি বেশ কয়েকবার বলেন।[৫]

বিদায়বেলার অন্তিম মুহূর্ত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হলে আয়িশা তাকে নিজের শরীরের সাথে হেলান দিয়ে বসান। আয়িশা বলতেন, আমার ওপর আল্লাহর বিশেষ এক অনুগ্রহ—আল্লাহর রাসুল আমার ঘরে, আমার পালায়, আমার গলা ও বুকের মাঝখানে মাথা রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে আল্লাহ তাঁর রাসুলের লালার সাথে আমার লালা মিলিয়ে দিয়েছেন। সেদিন আল্লাহর রাসুল আমার গায়ে ভর দিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ আমার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৩৩; *সহিহ মুসলিম* : ২৪৫০

[২] কিছু কিছু বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ফাতিমার সঙ্গে এই আলাপ ও সুসংবাদ প্রদানের ঘটনা সর্বশেষ দিনে ঘটেনি; বরং সর্বশেষ সপ্তাহে ঘটেছে। [*রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮২]

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৬২

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪২৮

[৫] প্রাগুক্ত

আবি বকর মিসওয়াক হাতে নিয়ে সেখানে উপস্থিত। আমি লক্ষ করি, আল্লাহর রাসুল বারবার মিসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক পছন্দ করেন। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াকটি নেব? তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়েন। তখন আমি আব্দুর রহমানের কাছ থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে আল্লাহর রাসুলকে দিলাম। কিন্তু সেটা তার কাছে বেশ শক্ত লাগছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি মিসওয়াকটি নরম করে দেব? এবারও তিনি আগের মতো মাথা নাড়েন। আমি তা চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি সেটা ব্যবহার করলেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, নবিজি সেদিন খুবই চমৎকারভাবে মিসওয়াক করেন। তার সামনে একটি পাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল। তিনি সেই পানিতে হাত চুবিয়ে বারবার চেহারায় হাত বোলাচ্ছেন আর বলছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুযন্ত্রণা বড় কঠিন...![১]

মিসওয়াক করা শেষ হলে তিনি ওপরের দিকে আঙুল তুলে ইশারা করেন। চোখ মেলে ছাদের দিকে তাকান। হঠাৎ ঠোঁটদুটো আলতো করে নড়ে ওঠে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন পূর্ণ মনোযোগ নিবন্ধ করেন তার দিকে। কান পাতেন ঠোঁটের কাছে। তখন তিনি শেষবারের মতো উচ্চারণ করছিলেন—

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ . أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى ، أَللَّهُمَّ الرَّفِيْقُ الْأَعْلَى

মা' আল্লাযীনা আন্' আম্তা 'আলাইহিম মিনান নাবিইয়ীনা ওয়াস স্বিদ্দীক্বীনা ওয়াশ শুহাদা-ই ওয়াস স্ব-লিহীন। আল্ল-হুম্মাগ্ফির্লী, ওয়ার্হাম্নী, ওয়া আল্হিক্বনী বির রফীক্বিল্ আ' লা-। আল্লাহুম্মার রফীকুল আ' লা-।

অর্থ : হে আল্লাহ, নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল-সহ আরও যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে মিলিত করে দিন আমার প্রিয়তমের সাথে। হে আল্লাহ, আপনিই তো আমার প্রিয়তম।[২]

শেষের বাক্যটি তিনি ৩ বার উচ্চারণ করেন। এরপর তার হাত একদিকে ঝুলে পড়ে। তিনি মিলিত হন তার পরম প্রিয়তম মহান রবের সাথে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

---

[১] *সহিহুল বুখারি*, নবিজির অসুস্থতা অধ্যায়, হাদিস নং : ৪৪৪৯

[২] *সহিহুল বুখারি*, নবিজির অসুস্থতা অধ্যায় ও নবিজির শেষ বাক্য অধ্যায়, হাদিস নং : ৪৪৪০, ৪৪৬৩, ৬৩৪৮, ৬৫০৯

এই মর্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দ্বি-প্রহরে। মৃত্যুর সময় নবিজির বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪ দিন।

সীমাহীন শোকে মুহ্যমান পৃথিবী

মুহূর্তের মাঝে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তীব্র শোকের এই বার্তাটি। মদিনার বুকে হঠাৎ নেমে আসে এক অনন্ত যাতনার নিকষ কালো আঁধার। আকাশ-বাতাস নিমেষের ভেতর ভারী হয়ে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে ছোট-বড় সবাই। আনাস ইবনু মালিক বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন মদিনায় আগমন করেন, সেদিনের চেয়ে আনন্দময় আর উৎসবমুখর দিন আগে কখনো দেখিনি আমি। আবার যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান, সেদিনের মতো শোকার্ত ও দুঃখভারাক্রান্ত দিনটিও আমার জীবনে দ্বিতীয়বার আসেনি।[১]

নবিজির মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলে ওঠেন, বাবা, আপনি আপনার রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন! বাবা, জান্নাতুল ফিরদাউস হয়েছে আপনার ঠিকানা! বাবা, আপনার বিরহের বেদনা জিবরিল ছাড়া আর কাকে জানাব! (সেদিন জিবরিলও ছিল ভীষণ শোকাতুর; প্রিয় রাসুলের কাছে আল্লাহর কালাম নিয়ে আসা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল যে!)[২]

উমারের বক্তব্য—নবিজি মারা যাননি

নবিজির মৃত্যুসংবাদ শুনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তীব্র হুংকার ছেড়ে বলেন, কিছু কিছু মুনাফিকের ধারণা আল্লাহর রাসুল মারা গিয়েছেন। অথচ তিনি মারা যাননি। তিনি কেবল তার রবের সান্নিধ্যে গিয়েছেন, ঠিক যেভাবে মুসা ইবনু ইমরান ৪০ দিনের জন্য গিয়েছিলেন মহান রবের সান্নিধ্য পেতে। পরে তিনি ফিরে এসেছেন, যখন সবাই ভাবছিল, 'মুসা নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে!' আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসুলও আবার ফিরে আসবেন এবং সেসব লোকের হাত-পা কেটে দেবেন, যারা ভাবছে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩]

আবু বকরের আগমন, ভুলভ্রান্তির অবসান

সে সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু মদিনার 'সুনাহ' এলাকায় তার নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। নবিজির মৃত্যুর খবর শুনে অস্থির হয়ে ওঠেন। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হন ঘটনাস্থলে। কারও সাথে কোনো কথা না বলে সোজা মাসজিদে

---

[১] *মুসনাদুদ দারিমি* : ৮৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪০৬৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪৬৬৭; হাদিসটি সহিহ।

[২] *সহিহুল বুখারি*, নবিজির অসুস্থতা অধ্যায় : ৪৪৬২

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৫৫

নববিতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে আম্মাজান আয়িশার কামরায়। এরপর ধীর পায়ে এগিয়ে যান নবিজির দিকে। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকেন কয়েক মুহূর্ত। হাত-পা যেন অবশ হতে শুরু করে। নবিজির পবিত্র দেহখানি ডোরাকাটা ইয়েমেনি চাদরে ঢাকা। মুখমণ্ডলের ওপর থেকে কিছুটা কাপড় সরিয়ে কপালে আলতো চুমু খান আবু বকর। এরপর নীরবে কাঁদতে শুরু করেন। ভেতরের চাপা কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে ঝরতে থাকে অবিরল ধারায়। খানিক বাদে বলে ওঠেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যুকে একত্র করবেন না। আপনার ভাগ্যে যে মৃত্যু লেখা ছিল, তা তো হয়েই গেল।[১]

এরপর তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। উমার তখনো তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। লোকজন মন দিয়ে তার কথা শুনছে। আবু বকর শান্ত গলায় বলেন, 'হে উমার, বসো, শান্ত হও।' কিন্তু উমার তার কোনো কথা কানে তোলেন না। তাতেও অবশ্য বিশেষ সমস্যা হয় না। কারণ সকলের মনোযোগ তখন আবু বকরের দিকে। আবু বকর বলতে শুরু করেন, তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ মারা গিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব। মৃত্যু কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

আর মুহাম্মাদ কেবলই একজন রাসুল! তার আগেও বহু রাসুল বিগত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা দ্বীন থেকে সরে যাবে? কেউ দ্বীন থেকে সরে গেলেও সে আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দেবেন।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকরের মুখে এই আয়াতটি শোনার আগে লোকেরা যেন জানতই না, কুরআনের পাতায় এমন একটি আয়াত

---

[১] অর্থাৎ মানুষের জীবনে মৃত্যু একবারই আসে। আপনার মৃত্যু যেহেতু বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, তাই দ্বিতীয়বার আপনাকে আর মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে না।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল নবিজির মৃত্যু নিশ্চিত করা এবং যারা তার মৃত্যুর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিল, তাদের সংশয় দূর করা।

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৪৪

রয়েছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, সেদিনই তারা এই আয়াতটি প্রথমবারের মতো শুনেছে। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন, উমার বলেছেন, আল্লাহর কসম! আবু বকরের মুখে আয়াতটি শুনে আমি ভয়ে চুপসে গেলাম। পা-দুটি আমার নিজের ভার সইতে পারছিল না। আমি মাটিতে বসে পড়লাম। তখনই আমার বিশ্বাস হলো, নবিজি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন।[১]

কাফন-দাফন এবং অন্যান্য কার্যক্রম

নবিজির কাফনের কার্যক্রম শুরু করার আগে খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ নিয়ে সাহাবিদের মাঝে নানারকম মতভেদ দেখা দেয়। বনু সাইদার ছাউনিতে আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা দীর্ঘসময় আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। খানিকটা বাক-বিতণ্ডাও সৃষ্টি হয় তাদের মাঝে। সবশেষে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হন। এভাবেই সোমবার দিন গড়িয়ে রাত নেমে আসে। শেষ রাতেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ চাদরাবৃত অবস্থায় বিছানায় শায়িত থাকে।

প্রিয় নবিজিকে গোসল করানো হয় পরদিন (মঙ্গলবার) সকালে। পরনের কাপড় যথাস্থানে রেখেই তার গোসল সম্পন্ন হয়। গোসলের দায়িত্ব পালন করেন আব্বাস ও আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। সঙ্গে ছিলেন আব্বাসের দুই ছেলে ফজল ও কুসাম, নবিজির আজাদকৃত গোলাম শাকরান, উসামা ইবনু যাইদ এবং আউস ইবনু খাওলা রাযিয়াল্লাহু আনহুম। আব্বাস, ফজল ও কুসাম নবিজির পার্শ্ব পরিবর্তনে সহায়তা করেন। উসামা ও শাকরান নিয়োজিত ছিলেন পানি ঢালার কাজে। আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে গোসল করিয়ে দেন। আর আউস পরম যত্নের সাথে তাকে আগলে রাখেন বুকের সাথে।

গোসল শেষে তাকে ৩ টুকরো সুতি কাপড়ের কাফন পরানো হয়। সে কাফনে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না। সাধারণ কাপড়ের টুকরোগুলো আলতো করে জড়ানো হয় তার পবিত্র দেহে।[২]

কাফন শেষে দাফনের বিষয়টি সামনে আসে। খলিফা নির্বাচনের মতো দাফনের স্থান নিয়েও মতবিরোধ দেখা দেয় সাহাবিদের মাঝে। তখন আবু বকর বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নবিরা যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেখানেই তাদের কবরস্থ করা হয়। এরপর আবু তালহা নবিজির বিছানাটি

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৪৫২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১২৭২; *সহিহ মুসলিম* : ৯৪১

সরিয়ে সেখানে কবর খনন করেন। তার কবরটি ছিল বোগলি কবর।[১]

কাফন পরানোর পর সাহাবিরা দশজন-দশজন করে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হুজরায় প্রবেশ করে যার যার মতো করে জানাযার সালাত পড়েন। তাদের কোনো ইমাম ছিল না। প্রথমে তার পরিবার-পরিজন ভেতরে যান, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনসারগণ। পুরুষদের সালাত শেষ হলে, নারীরা এক-এক করে ভেতরে প্রবেশ করেন। সবশেষে শিশু-কিশোরেরা যান সালাত আদায় করতে।

এসবের মধ্য দিয়েই মঙ্গলবার কেটে যায়। বুধবার তার দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি জানি না নবিজিকে ঠিক কখন দাফন করা হয়েছে। তবে বুধবার মধ্যরাতে কবর খোঁড়ার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। সম্ভবত তখনই দাফন করা হয়েছিল।[২]

---

[১] ইসলামি শরিয়ত অনুসারে দুভাবে কবর দেওয়া যায়। যথা—

এক. اللحد (লাহদ) : বোগলি কবর। খাড়াভাবে কবর খনন করার পর কিবলার দিকের দেওয়ালের নিচের অংশে মৃত ব্যক্তির পরিমাপ অনুসারে খনন করা হবে এবং ডান দিকে কাত করে তাকে কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হবে। এ ধরনের কবরে অনেকটা গুহার মতো ওপরে ছাদ থাকে। শক্ত মাটি বা পাথুরে জমিতে এ ধরনের কবর উত্তম। নরম মাটিতে এই কবর ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। আরব দেশের মাটি যেহেতু শক্ত ও পাথুরে, তাই নবিজির জন্য বোগলি কবর খনন করা হয়েছিল।

দুই. الشَّقّ (শাক্ক) : সিন্দুক কবর। স্বাভাবিকভাবে চারকোনা-বিশিষ্ট কবর। এ সকল কবর মৃতদেহের মাপ অনুসারে এমনভাবে খনন হয় যেন ইট, চাটাই বা বাঁশের খাবাচি তার শরীরের সাথে লেগে না যায়।

[২] *মুখতাসারু সিরাতির রাসুল*, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব নাজদি, পৃষ্ঠা : ৪৭১; ওফাত-সম্পর্কিত বিস্তারিত জানতে দেখুন, *সহিহুল বুখারি*, নবিজির অসুস্থতা অধ্যায় এবং এরপরের কয়েকটি অধ্যায়; সেইসাথে *ফাতহুল বারি, সহিহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবিহর* নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত অধ্যায়; *সিরাতু ইবনি হিশাম* : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৪৯-৬৬৫; *তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার*, পৃষ্ঠা : ৩৮-৩৯; *রহমাতুল-লিল আলামিন*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৭-২৮৬ ও অন্যান্য।

প্রিয় নবিজির পরিবার-পরিজন

নবিপত্নী উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদের ভালোবাসায় আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নবিজির পারিবারিক জীবন। দুজনার বয়সের ব্যবধান ১৫ বছর হলেও স্ত্রীর জীবদ্দশায় তিনি আর কাউকে বিয়ে করেননি। খাদিজার ঘরে বেশ কজন পুত্র ও কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। কন্যারা দীর্ঘায়ু পেলেও পুত্ররা খুব বেশি দিন বাঁচেননি। কন্যাদের নাম যথাক্রমে—যাইনাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা। হিজরতের আগেই যাইনাবের বিয়ে হয়ে যায়। তার খালাতো ভাই আবুল আস ইবনুর রবির সঙ্গো। প্রথমে রুকাইয়াকে এবং তার মৃত্যুর পর উম্মু কুলসুম রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বিয়ে করেন উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর ফাতিমাকে বিয়ে করেন আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু; বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। তার ঘরে জন্ম নেন চার সন্তান—হাসান, হুসাইন, যাইনাব ও উম্মু কুলসুম।

বিভিন্ন কারণে নবিজির জন্য চারের অধিক বিয়ের অনুমতি ছিল। তার সঙ্গো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এমন নারীর সংখ্যা সর্বমোট ১৩ জন। তাদের মধ্যে খাদিজা ও যাইনাব বিনতু খুযাইমা তার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। ৯ জন তার মৃত্যুর সময় জীবিত ছিলেন। বাকি দুজনের সঙ্গো বিয়ে হলেও, ঘর-সংসার করার সুযোগ হয়নি নবিজির। এখানে নবিজির স্ত্রীদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো—

১. খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লাহু আনহা। তার সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. সাওদা বিনতু যামআ রাযিয়াল্লাহু আনহা। নবুয়তের দশম বছর খাদিজার মৃত্যুর কিছুদিন বাদে নবিজি তাকে বিয়ে করেন। তার প্রথম স্বামী আস-সাকরান ইবনু আমর ছিলেন সম্পর্কের দিক থেকে সাওদার চাচাতো ভাই। স্বামীর মৃত্যুর পর নবিজির সাথে

তার দাম্পত্যজীবনের সূচনা ঘটে।

৩. আয়িশা বিনতু আবি বকর রাযিয়াল্লাহু আনহা। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা। নবুয়তের একাদশ বছর অর্থাৎ সাওদার সঙ্গো বিবাহের ১ বছর পর বা হিজরতের ২ বছর ৫ মাস আগে নবিজির সাথে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হন। সে সময় তার বয়স ছিল ৬ বছর। হিজরতের ৭ মাস পর শাওয়াল মাসে মদিনায় নবিজির সঙ্গো তার বাসর সম্পন্ন হয়। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তখন ৯ বছরের বালিকা। নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন কুমারী। একই সাথে তিনি নবিজির সর্বাধিক প্রিয়জন এবং এই উম্মতের সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী নারী।

৪. হাফসা বিনতু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহা। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা। প্রথমে তিনি খুনাইস ইবনু হুজাফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী ছিলেন। এই সাহাবি যুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় হিজরিতে তাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে নেন।

৫. যাইনাব বিনতু খুযাইমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বনু হিলাল ইবনি আমির ইবনি সা'সাআ গোত্রের নারী। গরিবদের প্রতি মমতা ও সহানুভূতির কারণে মদিনায় উম্মুল মাসাকিন (অসহায়দের মা-জননী) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করেন। উহুদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ শহিদ হন। এরপর নবিজি যাইনাবের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হন। তবে বিয়ের ২-৩ মাস পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা। প্রথম জীবনে তার বিয়ে হয়েছিল আবু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গো। চতুর্থ হিজরির জুমাদাল আখিরা মাসে আবু সালামা মারা গেলে একই বছরের শাওয়াল মাসে বিধবা উম্মু সালামাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন নবিজি।

৭. যাইনাব বিনতু জাহশ রাযিয়াল্লাহু আনহা। তিনি বনু আসাদ ইবনি খুযাইমা গোত্রের নারী। আত্মীয়তার সূত্রে নবিজির ফুফাতো বোন। প্রথমে নবিজির পালকপুত্র যাইদের সঙ্গো তার বিয়ে হয়। পরে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হলে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সুরা আহযাবে নবিজিকে সম্বোধন করে আয়াত নাযিল করেন—

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا... ﴿٣٧﴾

এরপর যাইদ যখন যাইনাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ করলাম।[১]

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৭

এই আয়াতে পালকপুত্র ও ঔরসজাত সন্তান সমতুল্য নয় বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা শীঘ্রই আসছে। পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে যাইনাবের সঙ্গে নবিজির বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

৮. জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা। আরবের খুযাআ গোত্রের বনুল মুস্তালিক শাখার সর্দার হারিসের কন্যা। বনুল মুস্তালিকের যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। গনিমত হিসেবে তাকে সাবিত ইবনু কাইসের ভাগে দেওয়া হয়। পরে নবিজি তাকে নিজের দায়িত্বে নেন এবং ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন তারা।

৯. উম্মু হাবিবা রামলা বিনতু আবি সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহা। প্রথমে উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহাশের স্ত্রী ছিলেন তিনি। দুজনই ইসলাম গ্রহণ করে আফ্রিকার হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে উবাইদুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যায়। সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে নবিজি আমর ইবনু উমাইয়ার মাধ্যমে হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি উম্মু হাবিবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। নাজাশি তাকে নবিজির সঙ্গে বিয়ে দেন এবং শুরাহবিল ইবনু হাসানার সঙ্গে করে তাকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

১০. সাফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাব রাযিয়াল্লাহু আনহা। বংশীয় দিক থেকে তিনি বনি ইসরাইলীয়। খাইবারের যুদ্ধে বন্দি হন। নবিজি তাকে নিজের জন্য বেছে নেন এবং সপ্তম হিজরিতে খাইবার জয়ের পর তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন।

১১. মাইমুনা বিনতুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা। আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী উম্মুল ফজল লুবাবা বিনতুল হারিসের বোন। সপ্তম হিজরিতে উমরাতুল কাজা আদায়ের সময় নবিজি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই ১১ জনের সঙ্গে নবিজির বিয়ে ও ঘর-সংসার দুটোই হয়েছে। এদের মধ্যে খাদিজা ও যাইনাব বিনতু খুযাইমা নবিজির জীবদ্দশাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। বাকি ৯ জন তার মৃত্যুর সময় জীবিত ছিলেন। এদের বাইরে আরও দুজন রয়েছেন, যাদের সঙ্গে তার ঘর-সংসারের সুযোগ হয়নি। তাদের একজন বনু কিলাবের, অপরজন কিন্দার। শেষের জন 'জুনিয়া' নামে পরিচিত। এই দুজনের ব্যাপারে অবশ্য কিছুটা মতভেদ আছে, যা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

এবার দাসীদের ব্যাপারে আলোচনা করা যাক। প্রসিদ্ধ মতে, নবিজির দুজন দাসী ছিলেন। তাদের একজন মারিয়া কিবতিয়া। নবিজি তাকে রোমের বাদশাহ মুকাওকিসের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছেন। তার গর্ভে ইবরাহিম জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু শৈশবেই তার মৃত্যু হয়। সময়টা তখন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ দশম হিজরির শাওয়াল মাসের ২৮ বা ২৯ তারিখ।

নবিজির অপর দাসীর নাম রায়হানা বিনতু যাইদ। ইহুদি গোত্র বনু নাজির কিংবা বনু

কুরাইজার বাসিন্দা। বনু কুরাইজার বন্দিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। নবিজি তাকে নিজের জন্য বেছে নেন। কোনো কোনো মতে, তিনি নবিজির স্ত্রী ছিলেন। নবিজি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বিয়ে করেছিলেন। তবে ইমাম ইবনুল কাইয়িম প্রথম মতটি অর্থাৎ দাসী হিসেবে থাকার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর বাইরে সিরাতগবেষক আবু উবাইদা আরও দুজন দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। এদের একজন হলেন জামিলা, যিনি কোনো এক যুদ্ধে বন্দি হয়ে আসেন। অপরজনকে হাদিয়া দিয়েছিলেন নবিজির স্ত্রী যাইনাব বিনতু জাহশ।[১]

কেউ যদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী নিয়ে গবেষণা করে, তবে সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে, তার যৌবনের বড় একটি সময় কেটেছে বয়স্কা এক নারীর সঙ্গে। টানা ২৫ বছর। প্রথমে খাদিজা, তার মৃত্যুর পর সাওদা—এই দুজন বিধবা নারীই তার যৌবনের সঙ্গী। এ দুজনের বাইরে বাকি নারীরা এসেছেন তার যৌবনের একেবারে শেষ ভাগে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিছক যৌনতা কিংবা নারী-আসক্তির কারণে নবিজি একাধিক বিয়ে করেননি; বরং তার প্রতিটি বিয়ের পেছনে ছিল যুক্তিসংগত কারণ। তাকে এমন কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিয়েগুলো করতে হয়েছে, যেগুলো সাধারণ বিয়েতে অনুপস্থিত। আমরা এখানে পাঠকের জন্য সেই উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করব—

১. আবু বকরের কন্যা আয়িশা এবং উমারের কন্যা হাফসাকে নবিজির বিয়ে করা, আলির কাছে আদরের দুলালি ফাতিমাকে এবং উসমানের কাছে রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমকে পাত্রস্থ করা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নবিজি এই মহান চার ব্যক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ তারা সবসময় ইসলামের জন্য সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলাও চেয়েছেন, তাদের এই বন্ধন অটুট থাকুক।

বৈবাহিক সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করা ছিল, আরবের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে এটি ছিল তাদের অব্যর্থ এক মাধ্যম। বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ গোত্রের সাথে বিরোধ করাকে তারা নীচতার পরিচয় হিসেবে বিবেচনা করত। তাই নবিজি বিভিন্ন গোত্রের নারীকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা ও প্রতিহিংসার অনল ইসলামের স্বার্থে অবদমিত করতে চেয়েছিলেন। যেমন, উম্মু সালামা ছিলেন বনু মাখযুম গোত্রের। আবু জাহল ও ইসলামের প্রথমদিকের শত্রু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ছিলেন এই গোত্রেরই। তাই নবিজি তাকে বিয়ে করার কারণে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের যে ইস্পাত-কঠিন অবস্থান ছিল, পরে সেটা অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে যায় এবং অল্প কিছুদিন বাদেই তিনি

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯

ইসলাম গ্রহণ করেন।

উম্মু হাবিবার সঙ্গে বিয়ের পর আবু সুফিয়ান নবিজির বিরুদ্ধে আর কোনো যুদ্ধে মুখোমুখি হননি। শুধু তা-ই নয়, জুওয়াইরিয়া ও সাফিয়ার সঙ্গে বিয়ের পর ইহুদিদের শক্তিশালী দুটি গোত্র—বনুল মুস্তালিক ও বনু নাজিরের সঙ্গে সংঘাত ও শত্রুতা মিটে যায়। জুওয়াইরিয়ার বিয়ে তার গোত্রের জন্য কল্যাণকর হয়ে ধরা দেয়। নবিজির সঙ্গে তার বিয়ের পর সাহাবিরা তার গোত্রের অন্তত ১০০টি পরিবারকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলেন, এরা নবিজির শ্বশুরবাড়ির লোক। তাই এদেরকে গোলাম করে রাখা যাবে না। নবিজির এই কল্যাণ-চিন্তার গভীর প্রভাব পড়েছিল মানুষের হৃদয়ে।

২. এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, নবিজির মিশন ছিল সেসব মানুষকে শিষ্টাচার ও সভ্যতা শেখানো, যাদের শুদ্ধ সংস্কৃতি ও কল্যাণ-রাষ্ট্রের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। ইসলামি সমাজ গঠনের মৌলিক চিন্তাধারা কখনো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সমর্থন করে না। কিন্তু এই মৌলিক চিন্তাধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে আবার তৎকালীন আরবের বিদ্যমান পরিবেশে নারীদের শিষ্টাচার ও শিক্ষাদীক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছিল না। অথচ নারীশিক্ষা কোনো অংশেই পুরুষদের শিক্ষাদীক্ষার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কখনো। বরং জ্ঞানীদের কাছে একটি সুস্থ ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণে নারীশিক্ষার গুরুত্ব পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার চেয়েও অনেক বেশি এবং কার্যকরী।

এক্ষেত্রে নারীদের শিষ্টাচার ও ইসলামি সংস্কৃতি শিক্ষাদানে বিভিন্ন বয়সি ও চিন্তাধারার নারীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না নবিজির সামনে। রবের নির্দেশনায় নবিজি তাই সে পথেই অগ্রসর হয়েছেন। বিয়ে করে তিনি স্ত্রীদের পরিশুদ্ধ করেন, শিষ্টাচার শিক্ষা দেন, শরিয়তের বিধিবিধান শেখান এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সংস্কৃতিতে গড়ে তোলেন, যাতে তারা সর্বস্তরের নারীদের জন্য ইসলামি জ্ঞান ও শিষ্টাচার অর্জনের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠেন এবং নারীদের কাছে দ্বীনের যাবতীয় বিষয় পৌঁছে দিতে পারেন খুব সহজে।

কারণ নারীশিক্ষার এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, যেগুলো নবি হওয়া সত্ত্বেও একজন পুরুষের জন্য নারীর সামনে উপস্থাপন করা বেমানান ও লজ্জাকর। অপরদিকে সেই জরুরি শিক্ষাগুলো নবিজির কাছ থেকে তার স্ত্রীদের শিখে নেওয়া এবং অন্য নারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ছিল খুবই সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। আর একাধিক বিয়ে করা ছিল এ কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও বিকল্পরহিত এক সহায়ক। নবিজির ইন্তেকালের পর এর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মতো আরও যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন, তারা নিরলসভাবে নারীশিক্ষা নিয়ে কাজ করেন। নারীদের প্রতি নবিজির উপদেশগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। এভাবে তারা ভব্য, সভ্য ও শিক্ষিত এক নারীপ্রজন্ম গড়ে তোলেন।

৩. তাছাড়া এসব বিয়ের পেছনে জাহিলি যুগের কুসংস্কার উচ্ছেদ করাও ছিল অন্যতম কারণ। যেমন একটি কুসংস্কার ছিল পালকপুত্রকে ঘিরে। আরবের লোকেরা মনে করত, বিয়ে ও অন্যান্য বিধানে পালকপুত্র আপন পুত্রের মতোই। এ ধারণাটা তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল। তারা এর বিপরীত দিকটা ভাবতেই পারত না যেন। কিন্তু এটি ইসলামি শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলাম ধর্মে বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পালকপুত্রের বিধান আপন পুত্রের মতো নয়। কিন্তু জাহিলি যুগের এই উদ্ভট প্রথার কারণে সমাজে নানারকম জটিলতা তৈরি হচ্ছিল, যেসব জটিলতা দূর করতেই ইসলামের আবির্ভাব।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত এ প্রথাটি উচ্ছেদ করতে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দেন পালকপুত্র যাইদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাইনাব বিনতু জাহশকে বিয়ে করতে। তাদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না দেখে যাইদ তাকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা ছিল সে সময়ের কথা, যখন সকল কাফির-মুশরিক নবিজির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। সবাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। ঠিক তখনই পালকপুত্র-বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়। ফলে নবিজি আশঙ্কা করছিলেন, এই পরিস্থিতিতে যদি যাইদ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং নবিজি তাকে বিয়ে করেন, তাহলে মুনাফিক ও মুশরিকরা কুৎসা রটনার সুযোগ পেয়ে যাবে। তারা ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালাবে। এতে দুর্বল ঈমানের মুমিনরা বিভ্রান্তিতে পড়বে। তাই তিনি চাইছিলেন যাইদ যেন যাইনাবকে তালাক না দেন এবং তাকেও যেন এক মহাপরীক্ষায় পড়তে না হয়।

কিন্তু আল্লাহ যে সুসংহত শরিয়ত দিয়ে নবিজিকে পাঠিয়েছেন, তার সাথে এই দোটানাপূর্ণ অবস্থান একদমই সংগতিপূর্ণ নয়। তাই আল্লাহ তাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেন—

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ
وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ﴿٣٧﴾

স্মরণ করুন, আল্লাহ যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করেছিলেন যার প্রতি, তাকে যখন আপনি বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো—তখন আপনি মনে মনে একটা বিষয় গোপন রেখেছেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকলজ্জার ভয় করছিলেন। অথচ আল্লাহকে ভয় করাই ছিল (আপনার জন্য) অধিক সংগত।[১]

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৭

অবশেষে যাইদ যাইনাবকে তালাক দিয়ে দেন। যাইনাবের ইদ্দত শেষ হলে বনু কুরাইজার ওপর অবরোধ চলাকালে নবিজি তাকে বিয়ে করেন। উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা নবিজির ওপর এই বিয়ে আবশ্যক করে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তার কোনো প্রকার ইচ্ছা বা এখতিয়ারের সুযোগ দেননি। এমনকি আল্লাহ নিজেই এই বিয়ে সম্পন্ন করেন। তিনি বলেন—

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا... ﴿٣٧﴾

এরপর যখন যাইদ তার (স্ত্রীর) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম—যেন মুমিনদের পালকপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদেরকে বিয়ে করতে (মুমিনদের) কোনো সমস্যা না থাকে।[১]

এ বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পালকপুত্র-সম্পর্কিত কুসংস্কার সমূলে উপড়ে ফেলা, যেমনটা অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ... ﴿٥﴾

তোমরা তাদের ডাকো (আপন) পিতৃপরিচয়ে। এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায়সংগত।[২]

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ... ﴿٤٠﴾

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুত্রসন্তানের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবি।[৩]

এমন অনেক আইন ও বিধিনিষেধ রয়েছে, যা বাস্তবায়ন করতে কেবল মৌখিক আদেশই যথেষ্ট নয়; বরং আদেশকারীকেই তা কাজে বাস্তবায়ন করে দেখাতে হয়।

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৭

[২] সুরা আহযাব, আয়াত : ৫

[৩] সুরা আহযাব, আয়াত : ৪০

এক্ষেত্রে হুদাইবিয়ার উমরা-সম্পর্কিত ঘটনাটি খুবই প্রাসঙ্গিক। উরওয়া ইবনু মাসউদ আস-সাকাফি সেদিন দেখেছিলেন, নবিজি থুথু ফেললেও সাহাবিদের কেউ না কেউ তা হাতে তুলে নিচ্ছে। নবিজি ওজু করার পর অবশিষ্ট পানিটুকু নেওয়ার জন্য তারা হুড়োহুড়ি ও হাতাহাতি করছে। সেখানে এমন অনেক সাহাবিও ছিলেন, যারা আমৃত্যু জিহাদ করবে বলে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে তার হাতে বাইআত হয়েছিলেন। আবু বকর ও উমারের মতো আরও অনেক মান্যবর সাহাবিও ছিলেন সেখানে।

অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর যখন এদেরকেই বলা হলো হজের উদ্দেশ্যে সঙ্গে করে নিয়ে আসা কুরবানির পশুগুলো জবাই করে দিতে, তখন তারা অদ্ভুতভাবে বেঁকে বসেন। নবিজি অবাক হয়ে যান। কিছুটা অস্বস্তি ও দুঃখও বোধ করেন তিনি। পরে উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে পরামর্শ দেন, কারও সাথে কোনো কথা না বলে সোজা উঠে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসা পশুটি জবাই করে ফেলতে। তিনি তা-ই করেন। নবিজিকে নিজ হাতে এমনটা করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সকল সাহাবি তার অনুসরণে নিজেদের পশু জবাই করতে শুরু করেন। এই ঘটনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, সেরেফ মুখে বলা আর সেটা কাজে বাস্তবায়ন করে দেখানোর মধ্যে রয়েছে আকাশ-জমিন ফারাক!

কিন্তু মুনাফিকদের সেসব বোঝার সময় কোথায়! তারা বরং পেয়ে যায় এক সুবর্ণ সুযোগ। এ বিয়েকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালায়। জনমনে সংশয় সৃষ্টির কোনো চেষ্টাই বাদ রাখে না তারা। এতে দুর্বল মুমিনদের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মুনাফিকদের এই প্রোপাগান্ডা ছাড়াও আরও একটি কারণে বহু মুসলিমের মনে সংশয় জেগে ওঠে। সেটি হচ্ছে, যাইনাব ছিলেন নবিজির পঞ্চম স্ত্রী। আর মুসলিমদের জানামতে চারের অধিক বিয়ে করা ইসলামে বৈধ নয়। তাছাড়া আরব সমাজে পালকপুত্রকে আপন পুত্রের মতোই গণ্য করা হয়। তাই পুত্রবধূকে বিয়ে করা স্বভাবতই একটি গর্হিত কাজ।

মহান আল্লাহ তখন সুরা আহযাবে এ দুটি বিষয়ে বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিল করে মুমিনদের সমস্ত সংশয় দূর করে দেন। সাহাবিরা নতুন করে জানতে পারেন, ইসলামে পালকপুত্র আপন পুত্রের মতো নয় এবং বিশেষভাবে শুধু নবিজির জন্য চারের অধিক বিয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে।

স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্য কখনোই নবিজির বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ হয়নি। সবার প্রতি তার আচরণ ছিল সৌজন্যমূলক, সম্মানজনক ও সহানুভূতিপূর্ণ। স্ত্রীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তারাও যথেষ্ট সম্মানবোধ, অল্পেতুষ্টি, বিনয় ও পতিভক্তি নিয়ে তাকে সঙ্গ দিয়েছেন। তার দাওয়াতি কাজ ও জীবনযাত্রা সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট করার চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় অর্থকষ্টে অনাহারে ও অর্ধাহারে দিন কেটেছে তাদের। তবু এমন কোনো চাহিদা তারা প্রকাশ করেননি, যেটা নবিজির জন্য পিছুটানের কারণ হতে পারে অথবা

তার দাওয়াতি কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

আনাস ইবনু মালিক বলেন, আল্লাহর রাসুল তার মৃত্যুর আগপর্যন্ত কখনো পাতলা রুটি অথবা বকরির ভুনা গোশত দেখেছেন কি না, আমার জানা নেই।[১] আয়িশা বলেন, আমরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম। একমাসের চাঁদ ডুবে আরেক মাসের চাঁদ উঠত। তবু আল্লাহর রাসুলের স্ত্রীদের ঘরে চুলা জ্বলত না। উরওয়া তখন জিজ্ঞেস করেন, খালা, আপনারা তাহলে এখনো বেঁচে আছেন কীভাবে? তিনি বলেন, দুয়েকটা খেজুর আর গলা ভেজানোর মতো সামান্য একটু পানিই ছিল আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল।[২]

এত অভাব-অনটন সত্ত্বেও নবিজির স্ত্রীদের পক্ষ থেকে তেমন অভিযোগ-অনুযোগ আসেনি কখনো। শুধু একবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। মানবীয় দুর্বলতাবশত নবিপত্নীগণ তাদের খোরপোশ বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অবশ্য তাদের এই অনুরোধের মধ্য দিয়ে নতুন একটি বিধান অবতীর্ণ করাই ছিল আল্লাহর মূল লক্ষ্য। তাই তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٩

হে নবি, আপনার স্ত্রীদের বলে দিন, যদি তোমরা পার্থিব জীবন আর তার শোভা-সৌন্দর্য কামনা করো, তাহলে এসো, তোমাদের ভোগসামগ্রী দিয়ে দিই এবং সম্মানের সাথে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও পরকালীন নিবাস কামনা করো, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন মহাপুরস্কার।[৩]

এই ঘোষণার পর নবিজির সকল স্ত্রী দুনিয়ার তুচ্ছ সামগ্রীর প্রয়োজন ভুলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে নিজেদের আপন করে নেন।

উল্লেখ্য, সতীনদের মধ্যে সচরাচর যে ধরনের মনোমালিন্য ঘটতে দেখা যায়,

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৫৪২১, ৬৪৫৭; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৪১৭০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৫৬৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৯৭২

[৩] সুরা আহযাব, আয়াত : ২৮-২৯

নবিপত্নীদের মধ্যে সেসব ছিল না বললেই চলে। নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কারণে কখনো কিছু ঘটে থাকলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী আসার পর সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়নি আর কখনো। সুরা তাহরিমের প্রথম পাঁচ আয়াতে এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একাধিক বিয়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইউরোপীয়দের জীবনাচার লক্ষ করলে দেখা যায়, তারা একাধিক বিয়ের বিরোধিতা করে, আবার একাধিক উপপত্নীও রাখে। ফলে তাদের দাম্পত্যজীবনে নেমে আসে অবিরাম কষ্ট আর সীমাহীন বিষাদ। একসময় সে বিষাদ জন্ম দিতে থাকে ঘৃণ্য ও নোংরা সব কর্মকাণ্ডের। এভাবে শেষপর্যন্ত তাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন পরিণত হয় সাক্ষাৎ এক নরকে। কেউ যদি তাদের এই জীবনাচার ও তার কুফলের দিকে দৃষ্টি দেয়, তবে এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন পড়বে না। তাদের জীবনাচারই হবে একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতার চাক্ষুষ প্রমাণ। আর জ্ঞানীদের চোখ কখনো এসব বিষয় এড়িয়ে যায় না।

শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক গুণাবলি

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাহ্যিক ও চারিত্রিক গুণাবলিতে ছিলেন অনন্য, যা বর্ণনা করার মতো শব্দভান্ডার আমাদের নেই। তার প্রতি মানুষের যে দুর্বার আকর্ষণ ও মুগ্ধতা, তা পৃথিবীর আর কারও ছিল না। যারা তার সান্নিধ্য পেয়েছে, তার ভালোবাসায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি তাদের কেউ। মানুষের এই অকুণ্ঠ ভালোবাসা ছিল তার সৃষ্টিজাত গুণাবলির কারণে, যা অন্যদের মাঝে অনুপস্থিত। আমরা এখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সৃষ্টিজাত সৌন্দর্য ও গুণাবলির ওপর সামান্য আলোকপাত করব। যদিও প্রতিটি বিষয় এখানে তুলে আনা সম্ভব নয়।

নবিজির শারীরিক বিবরণ

হিজরতের সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু মাবাদ আল-খুযাইয়া নামক এক মহিলার ডেরায় কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। এরপর রওনা হয়ে যান মদিনার পথে। তার চলে যাওয়ার পর উম্মু মাবাদ তার স্বামীর কাছে নবিজির দৈহিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—উজ্জ্বল গায়ের রং, নুরানি চেহারা, সুন্দর গঠন, সটান দেহ। একেবারে সোজাও নয়; আবার কুঁজোও নয়। অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি মনোমুগ্ধকর শারীরিক গঠন, ঋজু কণ্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, সুরমা-মাখানো সাদা-কালো চোখ, কুচকুচে কালো পাপড়ি, সরু ও জোড়া ভ্রু, ঝলমলে কালো চুল।

নীরব থাকলে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, কথা বললে আকর্ষণীয় লাগে, দূর থেকে মনে হয় সবার চেয়ে উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যপূর্ণ, কাছ থেকে দেখলে সুদর্শন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তার প্রকাশভঙ্গি সুস্পষ্ট, কথা খুব সারগর্ভ, কথা বলার সময় মনে হয় যেন মুক্তো ঝরছে। দেহের উচ্চতা মধ্যম। বেঁটেও নন আবার লম্বাও নন, এই দুইয়ের মাঝামাঝি। সুন্দর,

সুঠাম। সহচররা ঘিরে থাকে তাকে। তার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। তিনি কোনো আদেশ করলে, তারা ছুটে গিয়ে তা পালন করে। সবাই তার সেবা করে, তার চতুর্দিকে জড়ো হয়ে থাকে। তিনি কারো নিন্দা করেন না, কারো প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন না।[১]

আলি ইবনু আবি তালিব বলেন, তিনি অতি দীর্ঘকায় ছিলেন না; আবার একেবারে খাটোও নন; বরং ছিলেন তিনি মাঝারি গড়নের। তার মাথার চুল খুব বেশি কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও নয়, কিছুটা ঢেউ খেলানো। তিনি স্থূলকায় নন, তার মুখাবয়ব কিছুটা গোলাকার, তবে পুরোপুরি গোলগাল নয়। তার গায়ের রং হলদে ফর্সা। ভ্রু-যুগল সরু ও দীর্ঘ। তার হাড়ের গ্রন্থিগুলো বেশ মজবুত, বাহু-দুটিও যথেষ্ট মাংসল। তার দেহে অতিরিক্ত লোম ছিল না, বুক থেকে নাভি পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল হালকা একটি লোমের রেখা। তার হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছিল গোশতে পুরু। যখন হাঁটতেন, দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতেন, যেন ওপর থেকে অবতরণ করছেন। কারও দিকে তাকালে গোটা দেহ ঘুরিয়ে তাকাতেন। তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল নবুয়তের মোহর। নবিদের আগমনধারা তার মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়েছে।

নবিজি ছিলেন উদার, দানশীল, সাহসী, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তার হৃদয় ছিল কোমল আর মনন ছিল আভিজাত্যপূর্ণ। প্রথম দেখাতেই তার প্রতি সমীহ জেগে ওঠে মনের গভীরে। আর পূর্বপরিচয় থাকলে, প্রতি সাক্ষাতে তার ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে যায় হৃদয়। কেউ তার শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিতে গেলে বলতে বাধ্য হয়, 'তার আগে কিংবা পরে তার মতো সুদর্শন কাউকে দেখিনি কখনো।'[২]

অন্য একটি বর্ণনায় আলি বলেন, তার মাথা কিছুটা বড়, পেশি চওড়া। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি সরু রেখা বিদ্যমান। পথ চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকেন, যেন কোনো উঁচু স্থান থেকে নিচে নামছেন।[৩]

জাবির ইবনু সামুরাহ বলেন, আল্লাহর রাসুলের মুখমণ্ডল কিছুটা বড়। চোখজোড়া লালচে। পায়ের গোড়ালি ছিপছিপে।[৪]

আবুত তুফাইল বলেন, তিনি ছিলেন বেশ ফর্সা এবং লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী। তার উচ্চতা মাঝারি ধরনের।[৫]

---

[১] *যাদুল মাআদ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৩৮; *শামায়িলুত তিরমিযি* : ৭; আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এর সনদ জইফ; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০১-৪০২

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৩৭; *শামায়িলুত তিরমিযি* : ৫; হাদিসটি হাসান সহিহ।

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ২০৯৮৬

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪০; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৭৯৭

আনাস ইবনু মালিক বলেন, নবিজির হাতের তালু বেশ প্রশস্ত। গায়ের রং যথেষ্ট আকর্ষণীয়। তিনি ককেশীয়দের মতো সাদা নন, আবার একদম গমের মতো বাদামিও নন। মৃত্যুর সময় তার মাথায় ও দাড়িতে সব মিলিয়ে ২০টি চুলও সাদা হয়নি।[১] তিনি আরও বলেন, শুধু কান ও মাথার কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।[২]

আবু জুহাইফা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহর নিচের ঠোঁটের নিম্নাংশে অর্থাৎ অধরে কয়েকটি সাদা দাড়ি দেখেছি।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধরে কয়েকটি শুভ্র দাড়ি ছিল।[৪]

বারা ইবনু আযিব বলেন, রাসুলুল্লাহ ছিলেন মাঝারি গড়নের মানুষ। উভয় কাঁধের মাঝখানে বেশ খানিকটা দূরত্ব ছিল। মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত। তাকে একটি লাল চাদরে আবৃত অবস্থায় দেখেছি। তার চেয়ে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখিনি।[৫]

আগে তিনি আহলুল কিতাবদের মতো চুল আঁচড়ানোর সময় সিঁথি করতেন না। পরবর্তীকালে সিঁথি করা শুরু করেন।[৬]

বারা ইবনু আযিব বলেন, আল্লাহর রাসুল সুন্দরতম চেহারা ও আকর্ষণীয় শারীরিক গঠনের অধিকারী ছিলেন।[৭]

একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহর রাসুলের মুখমণ্ডল কি তরবারির মতো ছিল? তিনি বলেন, না বরং চাঁদের মতো।[৮] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তার চেহারা ছিল গোলাকৃতির।[৯]

রুবাইয়ি বিনতু মুআওয়িয বলেন, আল্লাহর রাসুলকে দেখলে মনে হতো সূর্য উদিত

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪১

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৫

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৬

[৫] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫১; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩৭

[৬] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫৮, ৩৯৪৪

[৭] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩৭

[৮] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫২; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৪

[৯] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৪

হয়ে গিয়েছে।[১]

জাবির ইবনু সামুরা বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে চাঁদনি রাতে দেখেছিলাম। তার গায়ে তখন একটি লাল চাদর জড়ানো। আমি একবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। শেষমেশ আমার মনে হলো, নবিজি চাঁদের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর।[২]

আবু হুরাইরা বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলের চেয়ে সুন্দর কিছু কখনো দেখিনি। তাকে দেখলে মনে হতো সূর্য যেন তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে আছে। আমি তারচেয়ে দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেও দেখিনি কাউকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। তিনি হেঁটে হেঁটে অনায়াসে বহু দূর চলে যেতেন আর আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।[৩]

কাব ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি আনন্দিত হলে তার চেহারা ঝলমল করে উঠত। মনে হতো যেন এক টুকরো চাঁদ।[৪]

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে অবস্থানকালে একবার তিনি বেশ ঘেমে যান। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম আলোর মতো ঝলমল করছে। আয়িশা তখন আবু কবির আল-হুযালির এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে থাকেন—

পড়ল নজর যখনই তার ঝলমলে নুর চেহারায়
আঁধার রাতে মেঘের মাঝে বিজলি যেন চমকায়।[৫]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলে বলতেন—

নির্বাচিত, কল্যাণকামী এবং আমানতদার
আপনি এমন পূর্ণচন্দ্র, হটায় যা অন্ধকার।[৬]

---

[১] *মুসনাদুদ দারিমি* : ৫৯, ৬১; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৭৯৩; এর সনদ জইফ। কারণ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বা উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা আত-তাইমি নামক ব্যক্তি অনেকের মতে দুর্বল বর্ণনাকারী।

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ৯৫৬২; *জামিউত তিরমিযি* : ২৮১১; *শামায়িলুত তিরমিযি* : ১০; *মুসনাদুদ দারিমি* : ৫৮; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৭৯৪; হাদিসটি সহিহ।

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৪৮; *শামায়িলুত তিরমিযি* : ১২৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৭৯৪; হাদিসটি দুর্বল।

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫৬; *সুনানুন নাসায়ি* : ১১১৬৮

[৫] *রহমাতুল-লিল আলামিন* : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭২

[৬] *খুলাসাতুস সিয়ার* : ২০

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে দেখে কবি যুহাইরের একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। এ কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন হরম ইবনু সিনানকে উদ্দেশ্য করে—

অন্যকিছু হতেন যদি
আপনি মানুষ বিনে,
চতুর্দশী কিরণ পেত
আপনার আলোর ঋণে।

কবিতাটি আবৃত্তির পর উমার বলতেন, এমনই ছিলেন আমাদের প্রিয় নবি।[১]

নবিজি রাগান্বিত হলে তার চেহারা লাল হয়ে যেত। যেন তার দুই গালে আনারের রস ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২]

জাবির ইবনু সামুরা বলেন, আল্লাহর রাসুলের পায়ের গোড়ালি ছিপছিপে। তিনি সাধারণত মুচকি হাসতেন। তাকে দেখে মনে হতো, তিনি দুচোখে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তার চোখে কোনো সুরমা ছিল না।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, আল্লাহর রাসুলের সামনের দুটি দাঁতের মাঝে সামান্য ফাঁকা ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন, মনে হতো তার দুই দাঁতের মাঝখান থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।[৪]

তার গলদেশ রুপার পাত্রের মতো ঝকঝকে। চোখের পালক দীর্ঘ। ঘন দাড়ি, প্রশস্ত ললাট। ভ্রু ছিল পৃথক। নাক সামান্য উঁচু। নাভি থেকে বুক পর্যন্ত ছিল হালকা লোমের রেখা। বাহুতে সামান্য পরিমাণে লোম দেখা যেত। তার পেট ও বুক ছিল এক বরাবর। বুকের ছাতি চওড়া। হাতের তালু প্রশস্ত। পথ চলার সময় কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে পথ চলতেন। হাঁটার গতি ছিল মধ্যম প্রকৃতির।

আনাস বলেন, আল্লাহর রাসুলের হাতের তালুর চেয়ে মোলায়েম কোনো রেশম আমি কখনো স্পর্শ করিনি। তাছাড়া নবিজির শরীর থেকেও এক ধরনের সুগন্ধি ছড়াত। এই সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুঘ্রাণও আমি পাইনি কখনো।

---

[১] প্রাগুক্ত

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ২১৩৩; *মুসনাদুল বাযযার* : ১০০৬৩; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৯৮; এর সনদ হাসান।

[৩] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৬৪৫; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৪১৯৬; ইমাম তিরমিযির মতে, এর সনদ হাসান গরিব, আলবানির মতে, এর সনদ জইফ।

[৪] *মুসনাদুদ দারিমি* : ৫৯; *শামায়িলুত তিরমিযি* : ১৫; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৭৯৭; আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এর সনদ জইফ।

অপর বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর রাসুলের গায়ের গন্ধের চেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ আমি কোনো কস্তুরী বা মিশকের মাঝেও পাইনি।[১]

আবু জুহাইফা বলেন, একবার আমি আল্লাহর রাসুলের হাত টেনে নিয়ে আমার মুখের ওপর বুলিয়ে দিলাম। তার হাত বরফের চেয়েও শীতল, শিশিরের চেয়েও স্নিগ্ধ এবং কস্তুরীর চেয়েও সুগন্ধিময়।[২]

জাবির ইবনু সামুরাহ বলেন, আল্লাহর রাসুল আমার গালে একবার হাত বুলিয়ে দেন। আমি তখন এমন শীতল পরশ এবং মনমাতানো সুবাস পেয়েছি যেন তিনি আতরের পাত্র থেকে হাত বের করেছেন।[৩]

আনাস বলেন, আল্লাহর রাসুলের ঘাম ছিল মুক্তোর মতো।[৪] উম্মু সুলাইম বলেন, তার ঘাম সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধিময়।[৫]

জাবির বলেন, আল্লাহর রাসুল কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে তার পরবর্তী লোকটি সেখানে সুগন্ধি পেয়েই বুঝে ফেলত, কিছুক্ষণ আগে এই রাস্তা দিয়ে কে হেঁটে গিয়েছেন।[৬]

তার পিঠের উপরিভাগে ছিল নবুয়তের মোহর। আকারে এটা বেশ ছোট। কবুতরের ডিমের সমান। দেখতে অনেকটা মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের মতো। বাম কাঁধের নরম হাড়ের কাছে অবস্থিত। নবিজির গায়ের রংয়ের সাথে মিলে যাওয়ায় দূর থেকে বোঝা যায় না। তবে এর চারপাশে আঁচিলের মতো অনেকগুলো তিল রয়েছে।[৭]

নবিজির চারিত্রিক মাধুর্য

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুপম বাকশক্তি ও সুনিপুণ ভাষালংকারে ছিলেন অনন্য। এক্ষেত্রে তিনি সর্বজনবিদিত; উচ্চ মর্যাদায় আসীন। তার সাবলীলতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সমৃদ্ধ শব্দভান্ডার, অর্থপূর্ণ ও নির্মোহ কথামালা ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য তার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। আরবের

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৬১; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫৩

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৩২৯

[৪] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩০

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩১

[৬] *মুসনাদুদ দারিমি* : ৬৭; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৭৯২; আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এর সনদ জইফ।

[৭] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৬

সকল গোত্রের ভাষা জানতেন তিনি। প্রত্যেক গোত্রের সঙ্গে তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতেন। শব্দচয়নে তাদের পরিভাষা টেনে আনতেন। আরবের গ্রামীণ বাগ্মিতা ও শহুরে শুদ্ধতার সুসমন্বয় ঘটেছিল তার ভাষায়। তাছাড়া ওহির সাহায্যে ঐশী সমর্থন তো ছিলই।

ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমাসুলভ আচরণ ও পরিস্থিতি মেনে নেওয়ার মতো অসাধারণ সব গুণাবলি আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছিলেন। একজন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ যত ধৈর্যশীলই হোন, একটা সময় তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ঘটে সাময়িক স্খলনও। অথচ নবিজি এক্ষেত্রে পুরোপুরি ভিন্ন। তিনি যত কষ্ট পেয়েছেন, ততই যেন বৃদ্ধি পেয়েছে তার ধৈর্যের পরিসীমা। অজ্ঞদের অযাচিত আচরণে তিনি সহনশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করেছেন সবসময়।

আয়িশা বলেন, আল্লাহর রাসুলকে দুটো বিষয় থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলা হলে সহজটাই বেছে নিতেন। তবে তা গুনাহের আওতায় পড়লে অবশ্যই বর্জন করতেন। কখনো ব্যক্তিগত বিষয়ে কারও ওপর চড়াও হতেন না। কেবল আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে তবেই তিনি প্রতিশোধ-পরায়ণ হয়ে উঠতেন।[১] নবিজি খুব সহজে রাগ করতেন না। কখনো রেগে গেলেও অল্পতেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যেতেন।

নবিজি ছিলেন উদারতা ও দানশীলতার এক অনন্য উদাহরণ। যখন তিনি দান করতেন, মনে হতো অভাব বলতে কিছুর ভয় নেই তার মাঝে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, নবিজি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। রামাদানে তিনি দানের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিতেন। নিশ্চয়ই তিনি বহমান বাতাসের চাইতেও অধিক দানশীল।[২]

জাবির বলেন, কেউ আল্লাহর রাসুলের কাছে কিছু চেয়েছে, আর তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমনটা কখনো ঘটেনি।[৩]

বীরত্ব, সাহসিকতা এবং ক্ষিপ্রতায় তিনি ছিলেন অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয়। তার সাহস ছিল অসীম। বিপৎসংকুল অভিযানগুলোতে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন তিনি। শত্রুরা তার ভয়ে পালিয়ে বেড়াত। যুদ্ধের ময়দান থেকে তিনি কখনো পালিয়ে যাননি। এমনকি নির্ধারিত স্থান থেকেও কখনো সরে দাঁড়াননি। সকল যোদ্ধাই জীবনে অন্তত একবার হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে পিছু হটেছে। ভীরুতার চুনকালি কমবেশি সবার মুখেই পড়েছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল নবিজি। আলি বলেন, যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা দিলে এবং কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমরা নবিজির কাছে আশ্রয় নিতাম। শত্রুর বিপক্ষে

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৬০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭৮৫

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৬, ৩৫৫৪

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬০৩৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৩১১

সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচেয়ে এগিয়ে।[১]

আনাস বলেন, এক রাতে মদিনাবাসী বিকট এক শব্দে ভয় পেয়ে যায়। কিছু লোক তখন শব্দ-উৎসের দিকে ছুটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তিনি সেখান থেকেই ফিরছিলেন। শব্দের উৎস খুঁজতে তিনিই সবার আগে বের হয়েছিলেন। তার বাহন হিসেবে ছিল আবু তালহার ঘোড়া। তাড়াহুড়োর কারণে গদিও চড়াতে পারেননি ঘোড়ার পিঠে। কাঁধে ছিল তলোয়ার। তিনি সবাইকে তখন অভয় দিচ্ছিলেন, ভয় পেয়ো না। ভয় পেয়ো না।[২]

স্বভাবজাতভাবে নবিজি ছিলেন লাজুক ও অন্তর্মুখী। আবু সাইদ খুদরি বলেন, নবিজি একজন কুমারী নারীর চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। কোনোকিছু তার অপছন্দ হলে, চেহারা দেখেই অনুমান করা যেত।[৩] কারও চেহারার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারতেন না। দৃষ্টি অবনত রাখতেন। ওপরের চেয়ে নিচের দিকে বেশি সময় ধরে তাকিয়ে থাকতেন। তাকানোর সময় সাধারণত তার দৃষ্টি নিম্নমুখী থাকত। লজ্জা ও সম্মানবোধের কারণে কারও মুখের ওপর সরাসরি অপ্রিয় কথা বলতে পারতেন না। কারও ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো তথ্য পেলে সরাসরি তার নাম উল্লেখ করতেন না। বরং এভাবে বলতেন, লোকদের কী হলো যে তারা এমন করছে! কবি ফারাযদাকের পঙ্‌ক্তিটি তার ক্ষেত্রেই যথার্থ মনে হয়—

থাকত নয়ন আনত তার
সাথিরাও মানত তা,
থাকত ঠোঁটে হাসির রেখা
যখনই বলত কথা।

সবচেয়ে নীতিবান, স্বচ্ছ, সত্যবাদী ও আমানতদার ছিলেন নবিজি। তার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের সকলেই তা স্বীকার করত। নবুয়তের আগেই তাকে 'আল-আমিন' তথা বিশ্বস্ত নামে ডাকত সবাই। ইসলামের পূর্বে জাহিলি যুগে সকলেই তার কাছে সুষ্ঠু বিচারের জন্য আসত। আলি বলেন, একবার আবু জাহল নবিজিকে বলেছিল, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না। বরং মিথ্যা মনে করছি তোমার ধর্মকে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন[৪]—

---

[১] *আশ-শিফা*, কাজি ইয়াজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৯; হাদিসের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থগুলোতেও বর্ণনাটি পাওয়া যায়।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ২৯০৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৩০৭

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৬২

[৪] সুরা আনআম, আয়াত : ৩৩

...فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং এসব জালিম আল্লাহর নিদর্শনাবলিকেই অস্বীকার করে।[১]

রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নবুয়তের দাবি করার আগে তোমরা কি তাকে মিথ্যাবাদী বলেছ কখনো? আবু সুফিয়ান তখন উত্তরে 'না' বলেছিল।

নবিজি ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী মানুষ। কখনো অহংকার করতেন না। তাকে অন্যান্য রাজাবাদশাহদের মতো দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তিনি অনাথ ও অসহায়দের সেবায় বিলিয়ে দিতেন নিজেকে। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন সবসময়। এমনকি ক্রীতদাসরা তাকে দাওয়াত করলে তিনি তাও গ্রহণ করতেন। সাহাবিদের সঙ্গে তাদের মতো করেই বসতেন (বৈঠকে তাকে আলাদাভাবে চেনার উপায় ছিল না)।

আয়িশা বলেন, আল্লাহর রাসুল নিজ হাতে জুতা মেরামত এবং কাপড় সেলাই করতেন। ঘরের কাজগুলো নিজ হাতেই করতেন, যেমনটা তোমরা করে থাকো। সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন তিনি। কাপড়ে উকুন থাকলে নিজেই তা দূর করতেন, বকরির দুধ দুইয়ে দিতেন, নিজের কাজ নিজেই করতেন সবসময়।[২]

অঙ্গীকার পূরণে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় অতি যত্নশীল। মানুষের প্রতি অতিশয় দয়ার্দ্র, নমনীয় ও অনুগ্রহপ্রবণ। শিষ্টাচারে অতুলনীয়, চরিত্রগুণে অনন্য। অসৎ আচরণ থেকে দূরে থাকতেন সর্বদা। তিনি কখনোই অশ্লীল ও কটুভাষা ব্যবহার কিংবা কারও সাথে দুর্ব্যবহার করতেন না। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে হট্টগোল করতেন না এবং অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। বরং তিনি উদার মন নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন সবাইকে। চলার সময় কাউকে পেছন পেছন চলতে দিতেন না।

দাস-দাসীদের সঙ্গে খাবার ও পোশাকে ভিন্নতা বজায় রেখে চলতেন না। কেউ তার সেবা করলে তিনিও তার সেবা করতেন। কখনো সেবককে বিরক্তিবশত 'উহ' বলতেন না। কোনো কাজ না করা কিংবা মাঝপথে ছেড়ে দেওয়ার কারণে সেবককে

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ৩০৬৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮৩৪; আলবানি রাহিমাহুল্লাহর মতে, এর সনদ জইফ।

[২] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ১৭৮৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬১৯৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫৮২২; হাদিসটি সহিহ।

কখনোই তিরস্কার করতেন না। অসহায় মানুষদের ভালোবাসতেন। তাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। কাউকে তার অসহায়ত্বের জন্য হেয় করতেন না।

একবার তিনি সফরে গিয়েছেন। এ সময় একটি বকরি জবাই করতে বলেন। তখন সাহাবিদের মধ্যে কেউ জবাই করার দায়িত্ব নেন। কেউ চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব, কেউ নেন রান্নার দায়িত্ব। নবিজি বলেন, তাহলে আমার দায়িত্ব জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা। তখন সবাই সমস্বরে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, এটা আমরাই করতে পারব। জবাবে তিনি বলেন, আমি জানি, এটা তোমরাই করতে পারবে। কিন্তু আমি তোমাদের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চাই না। কেননা আল্লাহ তাআলা এমন বান্দাকে অপছন্দ করেন, যে তার সাথিদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এরপর তিনি উঠে দাঁড়ান এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের কাজে লেগে যান।[১]

এবার তাহলে হিন্দ ইবনু আবি হালার বক্তব্য শোনা যাক। তিনি নবিজির গুণাবলির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসুল সর্বদা (আখিরাতে উম্মতের মুক্তির) চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এ কারণে তার কোনো স্বস্তি ছিল না। অনর্থক কিংবা অপ্রয়োজনে কথা বলতেন না। বেশিরভাগ সময় নীরব থাকতেন। কথা বলতেন সুস্পষ্ট উচ্চারণে। ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করতেন। তার বাক্যগুলো ছিল একটি অপরটি থেকে পৃথক। তার কথাবার্তা অধিক বিস্তারিত কিংবা অতি সংক্ষেপ ছিল না। তার কথাবার্তায় না থাকত কঠোরতার ছাপ, না থাকত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব।

আল্লাহপ্রদত্ত রিজিক যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, সেই নিয়ামতের অমর্যাদা করতেন না। কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না, আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করতেন না। এমনকি খাবারের কোনো ত্রুটি চোখে পড়লেও তা এড়িয়ে যেতেন।

সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থি কিছু দেখলেই তিনি ভীষণ রেগে যেতেন। মজলুমকে সাহায্য করে তবেই নিবৃত্ত হতেন। অবশ্য ব্যক্তিগত কারণে কখনোই রেগে যেতেন না, কারও থেকে প্রতিশোধও নিতেন না। তিনি কোনো জিনিসের প্রতি ইশারা করতে (আঙুল ব্যবহার করতেন না বরং) হাতের তালু ব্যবহার করতেন। আবার কোনো বিষয়ে বিস্মিত হলে হাতের তালু উলটে দিতেন।

কারও ওপর রেগে গেলে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং তাকে এড়িয়ে যেতেন। আনন্দিত হলে দৃষ্টি অবনত রাখতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মুচকি হাসতেন। তখন তার দাঁতগুলো সাদা বরফের মতো উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত।

---

[১] *খুলাসাতুস সিয়ার*, পৃষ্ঠা : ২২

সাথি-সঙ্গীদের একসাথে জুড়ে রাখতেন, তাদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতেন না। সকল সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের ন্যায্য সম্মান দিতেন। তাদেরকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতা নিযুক্ত করতেন। মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে সবসময় বিরত থাকতেন।

সাহাবিদের খোঁজখবর নিতেন। তাদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন। ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতেন এবং প্রশংসা করতেন। খারাপকে খারাপ বলতেন এবং নিন্দা জানাতেন। সব বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতেন। প্রান্তিকতা মুক্ত থাকতেন। সাহাবিরা অমনোযোগী কিংবা বিরক্ত হতে পারেন, এই ভয়ে তিনিও অমনোযোগী হতেন না কোনো বিষয়ে।

যেকোনো পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে ছাড় দিতেন না, আবার বাড়াবাড়ি করে সত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়েও যেতেন না। তার চারপাশে যারা থাকতেন, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরোপকারী ব্যক্তিটিই তার কাছে সর্বোত্তম। আর যার মাঝে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব ছিল বেশি, তিনিই ছিলেন নবিজির কাছে সবচেয়ে সম্মানিত।

উঠতে-বসতে আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকতেন তিনি। নিজের জন্য কোথাও আলাদাভাবে জায়গা রাখতেন না। মজলিসে উপস্থিত হওয়ার পর যেখানে জায়গা পেতেন, সেখানেই বসে যেতেন। অন্যদেরকেও এমনটা করার নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বসার পর্যাপ্ত জায়গা দিতেন, যাতে বসে থাকা মানুষগুলোর মাঝে কেউ মনে না করে, অপরজন তার চেয়ে সম্মানিত।

কেউ নিজ প্রয়োজনে তার সঙ্গে বসলে কিংবা দাঁড়িয়ে আলাপ শুরু করলে, যতক্ষণ না সে নিজ থেকে বিদায় নিত, তিনি ধৈর্য ধরে সময় দিতেন। কেউ তার কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে এলে তাকে কখনো খালিহাতে ফিরিয়ে দিতেন না। নিদেনপক্ষে তাকে কথার মাধ্যমে হলেও সন্তুষ্ট করতেন।

উন্নত চরিত্র ও উদারতার মাধ্যমে সবার মন জয় করে নিতেন। ফলে তিনি হয়ে যান সবার পিতৃতুল্য। তার সামনে সবাই ছিল সমান। কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে তাদের মর্যাদা নির্ণীত হতো।

তার মজলিস থাকত ধৈর্য, লজ্জাশীলতা ও আমানতদারিতায় পরিপূর্ণ। কেউ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলত না। কারও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করত না। তাকওয়ার ভিত্তিতে যার যার সম্মান বজায় থাকত। বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করতেন। যাদের যা প্রয়োজন তা পূরণ করা হতো। অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ পেত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়-নম্র। রুক্ষতা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। উঁচু গলায় কিংবা অশালীন ভাষায় কথা বলতেন না। চিৎকার

চ্যাঁচামেচি, অনর্থক ও নোংরা কথা, তিরস্কার-ভর্ৎসনা এসব ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। অতি মাত্রায় প্রশংসা করতেন না কারও। কোনো বিষয়ে আগ্রহী না হলে সেটাকে এড়িয়ে চলতেন। অসাধ্য কাজ না হলে কেউ তার কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে যেত না কখনো। ৩টি বিষয় থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতেন—**এক.** রিয়া ও লৌকিকতা। **দুই.** কোনো বিষয়ে অতিরঞ্জন। **তিন.** অনর্থক কথা বা কাজ।

একইভাবে ৩টি বিষয় থেকে অন্যকে নিরাপদ রাখতেন—**এক.** পরনিন্দা। **দুই.** কাউকে লজ্জা দেওয়া। **তিন.** কারও দোষ খুঁজে বের করা।

যেসব কথায় সাওয়াবের আশা করা যায় না, সেসব বলা থেকে দূরে থাকতেন। তিনি কথা বলার সময় সাহাবিরা মাথা নিচু করে এমনভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতেন যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। যখন তিনি চুপ হতেন, তখনই কেবল তারা কথা বলতেন। তার সামনে নিজেদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা করতেন না। তার সামনে কেউ কথা বললে অন্যরা চুপ করে তা শুনত। যে কথা শুনে সাহাবিরা হাসতেন, সে কথায় নবিজিও হাসতেন। যে কথায় তারা অবাক হতেন, তিনিও সেই কথায় অবাক হতেন। অপরিচিত আগন্তুকের অসংযমী কথাবার্তা ধৈর্য সহকারে শুনতেন। তিনি বলতেন, 'কোনো সাহায্যপ্রার্থীকে দেখতে পেলে তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করবে।' কারও কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার আশা করতেন না। তবে কেউ উপকার পেয়ে সৌজন্যমূলক কিছু বললে তাকে বাধা দিতেন না।[১]

খারিজা ইবনু যাইদ বলেন, মজলিসে থাকা সবচেয়ে সম্মানিত ও অভিজাত ব্যক্তিটি নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শালীন পোশাক পরতেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখতেন সবসময়। অশোভন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতেন। সদা মুচকি হাসতেন। তার মুখনিঃসৃত বাক্যগুলো ছিল স্পষ্ট ও আলাদা আলাদা। তার কথা অতি বিস্তারিত নয়, আবার অতি সংক্ষেপও নয়। তার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে সাহাবিরাও তার সামনে মুচকি হাসতেন, অট্টহাসি দিতেন না কখনো।[২]

সারকথা, নবিজি ছিলেন অতুলনীয় গুণাবলির অধিকারী এক মহামানব। তার রব তাকে সর্বোত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। তার প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤

---

[১] *আশ-শিফা*, কাজি ইয়াজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২১-১২৬; *শামায়িলুত তিরমিযি* : ৩৫২

[২] প্রাগুক্ত

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[১]

এসব গুণাবলিই তাকে মানুষের কাছে এনে দিয়েছে। সবার অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়েছে। তাকে পরিণত করেছে একজন অবিসংবাদিত নেতায়, যার জন্য সকল শ্রেণির মানুষ ছিল নিবেদিতপ্রাণ। তার স্বজাতির রুক্ষতা নমনীয়তায় পরিবর্তিত হয়েছে কেবল এই সব গুণের কারণেই। মানুষ দলে দলে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে নির্দ্বিধায়।

ওপরে আলোচিত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি সেরেফ কিছু রেখাচিত্র। বাস্তবে তার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা আমাদের পক্ষে তুলে ধরা অসম্ভব। আরও স্পষ্ট করে বললে সেগুলো আমাদের অনুধাবন-শক্তিরও বাইরে।

মানব-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানবের ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা কি আদৌ সম্ভব কারও পক্ষে? তিনি তো সেই মহামানব, যিনি রবের প্রদত্ত আলোয় আলোকিত হয়েছেন, যার আখলাক ছিল পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন।

হে আল্লাহ, আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম ও তার পরিবারের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ, আপনি বারাকাহ ঢেলে দিন মুহাম্মাদ ও তার পরিবার-পরিজনের প্রতি, যেভাবে আপনি বারাকাহ ঢেলে দিয়েছেন ইবরাহিম ও তার পরিবারের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

[১] সূরা কলম, আয়াত : ৪

লেখক পরিচিত

ইসলামি সাহিত্য জগতে সফিউর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ একটি সুপরিচিত নাম। রাবিতাতুল আলামিল ইসলামি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিরাত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে তার *আর-রাহিকুল মাখতুম* গ্রন্থটি। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে কালজয়ী এই গ্রন্থই তাকে বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি এনে দিয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে হাদিসবেত্তা, সিরাত-বিশেষজ্ঞ ও ইতিহাসবিদ।

শিক্ষকতা ও একাডেমিক গবেষণার মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণের পাশাপাশি নিজেকে জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত রাখেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় মদিনায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে (আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ায়) অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ১০ বছর নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এখানে। একইসাথে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিরাত-গবেষণার কাজটিও চালিয়ে গেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। তার এই বহুমুখী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাবিতাতুল আলামিল ইসলামি তাকে সম্মানিত সদস্যপদে ভূষিত করে।

শাইখ সফিউর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন, ভারতের এক প্রত্যন্ত গ্রাম মুবারকপুরে। এখানেই কেটেছে তার শৈশব ও বাল্যকাল। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন ফয়জে আম মাদরাসা থেকে। এরপরই শুরু হয় তার কর্মব্যস্ত সুন্দর জীবনের পদযাত্রা। জ্ঞানপিপাসু এই মানুষটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ২০০৬ সালের পয়লা ডিসেম্বর। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসিব করুন। আমিন।
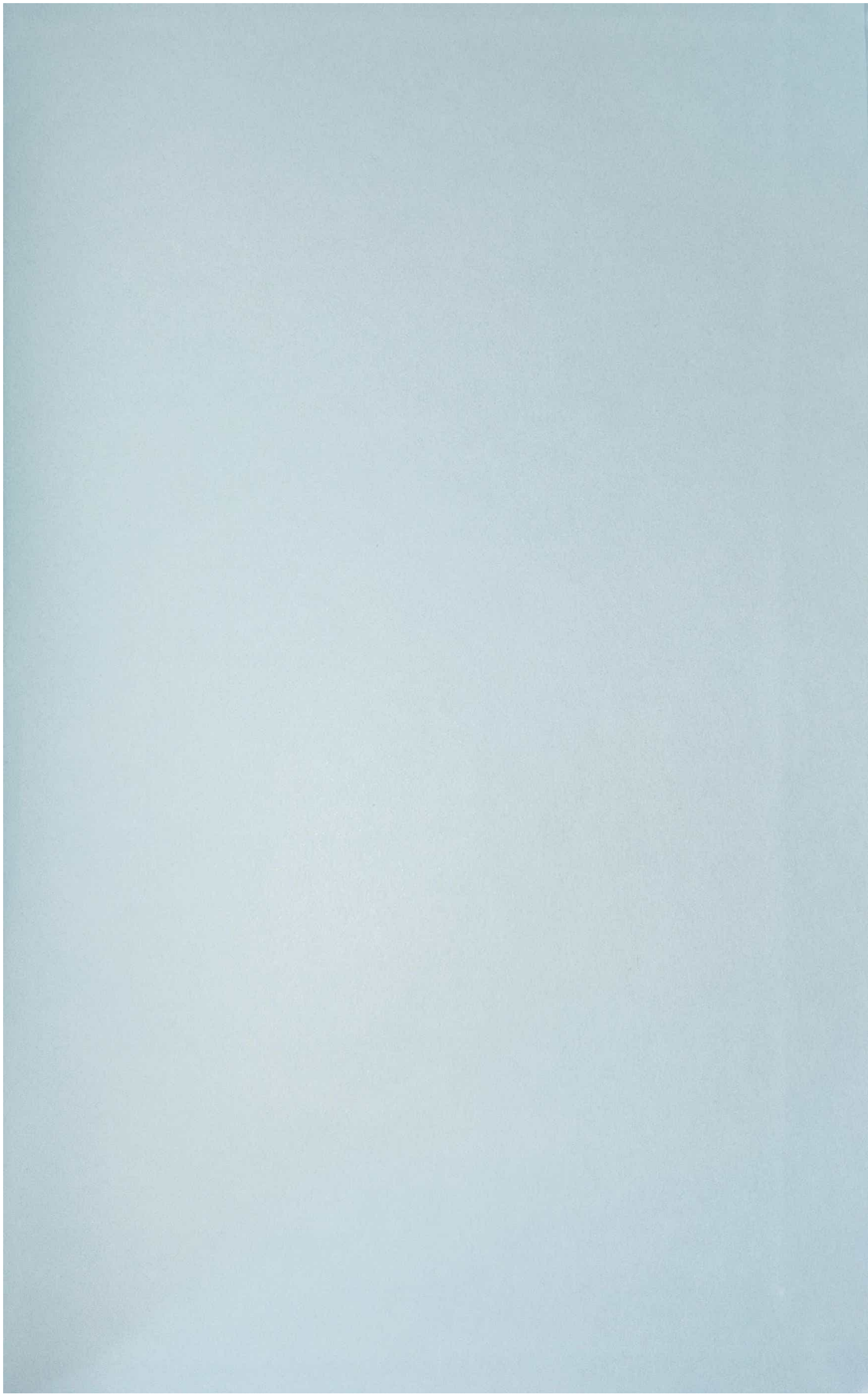
মহামহিম আল্লাহর পরম প্রিয় বান্দা যিনি, সমগ্র জগতের জন্য যিনি সাক্ষাৎ রহমত, যাকে কেন্দ্র করে আসমান-জমিনের এতসব আয়োজন, দেড় হাজার বছর আগে না-দেখেও যিনি আমাদের ভালোবেসেছেন, কাতর হয়েছেন আমাদের বেদনায়, না-দেখা সত্ত্বেও আমরা যাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, যার অনুপম আদর্শকে বুকে ধারণ করে হতে চাই অনন্যসাধারণ—সেই প্রিয় নবি, প্রিয়তম রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোহরাঙ্কিত সুরভিমাখা জীবনালেখ্য এ বই।

ইসলাম নামক চারাগাছটিকে যিনি বিশাল বৃক্ষে রূপান্তরিত করেছেন, যার দাওয়াত ও মেহনতের বদৌলতে এই বৃক্ষ আরবের উষর মরুর বুক থেকে ডালপালা ছড়িয়েছে বিশ্বময়, দ্বীনের জন্য তাওহিদের জন্য মানবতার জন্য যিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন, মক্কায় হয়েছেন সমাজচ্যুত, তায়েফে হয়েছেন রক্তাক্ত, উহুদে হয়েছেন জর্জরিত, খন্দকে পেটে বেঁধেছেন পাথর—সেই প্রিয় নবি, প্রিয়তম রাসুলের মহিমান্বিত জীবনগাথা আর আনন্দমধুর ও বেদনাবিধুর ঘটনাপ্রবাহের অনবদ্য শব্দচিত্র এ বই।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

সমকালীন প্রকাশন